তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তম খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯ (৩৩০০)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৯ (২২০০)

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীস্থমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

॥ ১ ॥

দুর্লভ মুহূর্তে সার্থক লেখকের জন্ম হয়।

পাঠক ও সমসাময়িক সমাজ লেখকের কাছ থেকে অনেক বস্তু আশা করে।

তিনি সততার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ও চরিত্র-চিত্রণ করবেন; কোথাও চড়া বা অবাস্তব রঙ লাগালে চলবে না; অতএব তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তি নিখুঁত হবে। কতকগুলি শক্তির যথাযোগ্য বিকাশ দ্বারা লেখকের উৎকর্ষের মান নির্ণয় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি বা পর্যবেক্ষণের কথা মনে পড়ে।

এই দৃষ্টি আবার সাংবাদিকের দৃষ্টি হবে না। সাহিত্যের রং লাগবে তাতে।

চিন্তাশীলতা, ভাষাভঙ্গি, প্রাঞ্জলতা, আঙ্গিক, জীবনদর্শন, মহত্ত্ব—বহু বহু উপাদান প্রয়োজন হয় সৃজনশীল সাহিত্যের সার্থকতার হেতু। সমসাময়িক কালকে ইতিহাসের ন্যায় বিধৃত করার পরে সর্বজনীন মূল্যায়নে চিরকালের সামগ্রী সেই সাহিত্য।

ঝিনুকের বুকে স্বাতী নক্ষত্রের জলবিন্দু মুক্তা হয়ে ওঠার মত দুর্লভ নয় কি এমন সাহিত্যের স্রষ্টা?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর অতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। সেই প্রখর, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির সীমানায় যা কিছু উপনীত হত তা-ই নিগূঢ় দিকটি পর্যন্ত উন্মোচন করে দিয়ে তবে মুক্তি পেত। তাঁর 'ডাইনী' গল্পের নায়িকার চোখের কথা মনে পড়ে—"দৃষ্টিতে ছুরির মত একটা ঝক্‌মকে ধার!…চোখ দুইটি আর'ও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত, আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়।"

এখানে অবশ্যই আমি চোখের আয়তনের কথা বলছি না, ভ্রান্তিগ্রস্ত 'ডাইনী'র দৃষ্টি বা স্রষ্টার দৃষ্টি এক নয়। কিন্তু স্রষ্টার দৃষ্টি এই 'ডাইনী'-মিথ্যা-আখ্যায় নিন্দিতা নারীর স্তরে স্তরে যে মর্মোদ্ঘাটন করেছে, বাংলা সাহিত্যে তার জোড়া নেই। চেতন ও অচেতনের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ সীমারেখা, সেখানে নেমে তারাশঙ্কর আহরণ করেছেন উপকরণ। চমৎকৃত বিস্ময়ে গল্প পাঠককে নাড়া দেয়। অতীন্দ্রিয় লোকের রস দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লোক তিনি এঁকেছেন সযত্নে। অনেক সমালোচক বলে থাকেন ভাষাভঙ্গি ও আঙ্গিকের দিক থেকে তারাশঙ্কর কখনও বা শিথিল ছিলেন, ক্র্যাফ্‌টসম্যানশিপ্ বা নিপুণতার অভাবও দেখা যেত। কিন্তু 'ডাইনী' গল্পটি আশ্চর্য সুসম্বদ্ধ। এমনি 'অগ্রদানী', 'জলসাঘর,' 'বেদেনী', 'তাসের ঘর', 'তমসা,, শ্মশানঘাট', 'রসকলি' প্রভৃতি নানা গল্পে তাঁর সংযম অপরিসীম। এখানে অনেক বলা যেত কিন্তু তিনি ছোটগল্পের মধ্যে **suspense** বা প্রত্যাশা অটুট রেখে শেষ করে দিলেন। এমনি কতকগুলি ছোট গল্পকে তিনি বীজ গল্প ধরে বিস্তৃত করেছিলেন। 'কবি' গল্প থেকে 'কবি'

উপন্যাস, 'হুটু মোক্তারের সওয়াল' থেকে নাটক 'দুইপুরুষ,' 'না' গল্প থেকে 'না' উপন্যাস, 'বড়বৌ' গল্প থেকে 'চাঁপাডাঙার বৌ' ইত্যাদির কথা মনে পড়ে। এ ছাড়া 'সন্দীপন পাঠশালা', 'গণদেবতা' থেকে শেষ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মঞ্জরী অপেরা' পর্যন্ত অসংখ্য গ্রন্থ বার বার লেখা হয়েছিল, বিস্তৃততর হয়েছিল। তিনি সত্যই অতৃপ্ত লেখক ছিলেন।

কিন্তু আমাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনা বেশী ভাল লেগেছে। বীজ-গল্পের মধ্যে অনৈপুণ্য, পুনরুক্তি বা শৈথিল্য কোথাও নেই। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর অপেক্ষা গল্পকার তারাশঙ্কর ন্যূন নন, কখনও অধিক উত্তম। চৈতালি ঘূর্ণি উপন্যাসের বীজ-গল্প শ্মশানের পথে অধিক প্রশংসা পেয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে 'ধাত্রীদেবতা' 'কালিন্দী' 'রাইকমল' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' থেকে তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নিরবচ্ছিন্ন বিজয়গীতি। পরবর্তী যুগে উল্লেখ-যোগ্য লেখা 'সপ্তপদী' 'বিচারক' 'মঞ্জরী অপেরা' 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতির স্বাদ ও লিপি-কুশলতা ভিন্ন। তিনি আরও পরবর্তী যুগে একটু হাল্কা কলমে লিখে গেছেন 'মণিবৌদি', 'ব্যর্থ-নায়িকা' 'মহাশ্বেতা' 'নিশিপদ্ম' 'যতিভঙ্গ' 'দীপার প্রেম' 'অভিনেত্রী' 'সুতপার তপস্যা' ইত্যাদি। 'একটি চড়ুইপাখী ও কালোমেয়ে', 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (কালবৈশাখী)' 'ফরিয়াদ' ইত্যাদির মধ্যে গাম্ভীর্য পূর্বের মত ঘনীভূত হবার মুখেই কিঞ্চিৎ প্রতিহত। তাঁর ৫৭টি উপন্যাস, ১০৮টি গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কিছু কবিতা সমস্ত মিলিয়ে অজস্র দান তাঁর বাংলা সাহিত্যে। হয়তো সর্বত্রই রচনা রসোত্তীর্ণ নয়, কিন্তু বিস্ময়কর।

তারাশঙ্কর নামটির মধ্যেই দৃঢ়তা, তায় তিনি কঠিন রাঙামাটির দেশ বীরভূমের সন্তান। তাঁকে বলতে শুনেছি, "আমি রেঢ়ো বামুন, আমি কারুকে ভয় পাই না।"

পিতা ও মাতা তাঁর ছিলেন অতি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশিষ্ট চরিত্র। ধাত্রীদেবতা পিসীমা শৈলজা দেবীও অসাধারণ। এঁদের শিক্ষা, সাহচর্য ও উত্তরাধিকার তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশের পুত্র।

আমাদের দেশ পদ্মাপারে উত্তরবঙ্গে এঁদের বলা হয় "খোমা গুক্ষু" অর্থাৎ আহত ক্রোধী ও তেজী গোক্ষুর সর্প।

তারাশঙ্করের রচনায় সর্প একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বলেই এই উপমাটি মনে হচ্ছে না। বীরভূমে বন্যা, সাপ এদের সঙ্গে মানুষের ঘর করতে হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিশ্চিন্দিপুরকে বনগাঁর পল্লীপ্রান্তে দেখেন, সরল ছোট গ্রাম একটি। আর তারাশঙ্কর দেখেন রাজসিক প্রায় মহকুমাশহর লাভপুর, যেখানে বর্ধিষ্ণু ভূস্বামী রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যায় ব্যবসায়ের ফলে।

তারাশঙ্করের প্রকৃতি আর প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের গ্রাম এক নয়। তাছাড়া বীরভূমের রুক্ষতা যেখানে বিহারের প্রান্তে মাটিকে পাথর করে তুলেছে, যেখানে হড়্পা বান মুহূর্তে সব ভাসিয়ে নেয় সেখানে তারাশঙ্কর প্রকৃতিকে দেখেছিলেন—**"Nature red in tooth and claw"**—সেই অকরুণা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অহোরাত্র বেঁচে থাকার যুদ্ধে কখনও মানুষ, কখনও প্রকৃতি জয়ী হয়েছে। সংগ্রামের ফলে মানুষ হয়েছে শক্ত, সংগ্রামী ও

জেদী। সেই কৃশ, খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ মানুষের ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই বলেছেন) প্রতিনিধিত্ব করতে এলেন তারাশঙ্কর বাংলাসাহিত্যে। বীরভূমীয় শক্তি, তেজ ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হল প্রাচীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সুপ্ত তান্ত্রিক ঐতিহ্য, সাধনার পীঠস্থান বীরভূমের সাধকদের অতীন্দ্রিয় অভীপ্সা, আধ্যাত্মিক চেতনা। এর সঙ্গে নির্বাপিতবহ্নি জমিদারবংশের মর্যাদাবোধ ও অভিমান।

বিভিন্ন উপাদানে পরিগঠিত এই তারাশঙ্কর চরিত্র। সাহিত্যবিচারে তাঁর ব্যক্তিসত্তার অন্বেষণ স্বাভাবিক। এই ব্যক্তিসত্তাই লেখকের লেখকসত্তাকে পরিচালিত করেছে, কখনও বা অতিক্রম করেছে।

তারাশঙ্করের সুপ্রচুর সাহিত্যসম্ভার আমার সম্মুখে। কিন্তু তার কতটা আমার বক্তব্যকে অলঙ্কৃত করার জন্য কাজে লাগাব ভেবে পাই না। হতাশ হয়ে সমস্ত এলোমেলো করে ফেলি। একখানি বৃহৎ গ্রন্থে যে কাজ করা শক্ত, কয়েক পৃষ্ঠার ভূমিকা সে বক্তব্য কেমন করে তুলে ধরবে। অতি উচ্চমানের পাশাপাশি আবার নিম্নমানের সাহিত্য সাজানো। সাময়িক প্রয়োজনে তাগিদে পড়ে অনিচ্ছুক স্রষ্টার লেখা।

অবশ্য যে কোনও উৎকৃষ্ট রচনায়ই সর্বত্র একই মানের উৎকর্ষ থাকে না। স্থানবিশেষে সিনেমার ভাষায় 'ঝুলে যায়'। অনিবার্য এ ঘটনা। বহু রচনা পৌনঃপুনিকভাবে লিখে গেছেন, তৃপ্তি পাননি তবু। অশান্ত অন্বেষণ পূর্ণতার উদ্দেশে। তাই জাগতিক অর্থে অনেক পেয়েও তিনি বিমনা হতেন।

রবীন্দ্রনাথ যদি দারুণ ক্ষোভে বলে থাকেন—

"বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।"

অতি মার্জিত, বার বার পরিশীলিত প্রায় নিখুঁত কাব্য রচনার পরেও কবি 'নিজের ভাষা' পাননি বলে দুঃখ করছেন 'পূরবী' পর্যায়ে, তবে সব কিছু পেয়ে তারাশঙ্কর কেন অতৃপ্ত বা অসন্তুষ্ট থাকবেন না ? 'মহাশ্বেতা'র বিখ্যাত আর্টিস্ট শিবনাথ বাঁড়ুজ্জেও অনলস শিল্পকর্মের অবসরে আকাশের দিকে চেয়ে অশ্রু ফেলেন—"যা আঁকতে চাই তাকে কল্পনা করতে পারছিনে।—মিছে—আমার সব মিছে হয়েছে।"

এই শিবনাথকে প্রথম দেখি 'ধাত্রীদেবতা'য়, তার সংগ্রামী সত্তার প্রথম জাগরণে। এই শিবনাথকে দেখলাম 'বিমল' রূপে 'মহানগরী' পুস্তকে। এঁর সফল মূর্তি 'পদচিহ্নে'। 'মহানগরী'র বিমল আদর্শবাদী শিবনাথের বিবর্তনে আশাবাদী। 'পদচিহ্নে' গৌরীকান্ত সফল—বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে গ্রামে ফিরেছে সে। 'গণদেবতা'র ডেটিনিউ যতীনের মধ্যে শিবনাথ আবার দেখা দেয়। কিন্তু অসংখ্য আত্মজীবনী-গন্ধী রচনায় (আরম্ভ 'ধাত্রীদেবতা'য়) নিজের

সম্বন্ধে বেদনার সুর 'মহাশ্বেতা'র মত বাজে কম। অনেক দেখা তখনও বাকী ছিল যে।

অতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি অপরিসীম বুদ্ধি নিয়ে তারাশঙ্কর চোখ মেলে অনেক দেখেছেন। শুধু দর্শন নয়, তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন। যথাসময়ে স্মৃতিপথারূঢ় হয়ে তারা এসেছে ভিড় করে। সত্যব্রত লেখক অনেক সময়ে অবিকৃত প্রকাশের নেশায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লেখকের প্রয়োজন বা সুরুচির বাইরেও তুলে ধরেছেন। তিনি যা দেখেছেন সঞ্চয়ের কোঠায় সর্বত্র তারা মণিমানিক হয়ে ওঠেনি, সম্ভব নয়। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থকে আবার স্মরণ করি—

"They flash upon that inward eye,
Which is the bli<s of solitude."

কিন্তু স্মরণমাত্রে তুলনার ক্ষেত্র অন্তর্হিত। নির্জনতার মধুক্ষরা স্মৃতি কি সব? যে-কোন বস্তুনিষ্ঠ লেখকের কাছে ব্যতিক্রম বহুল।

তারাশঙ্কর নির্ভীক দৃষ্টি মেলে জীবনকে দেখেছেন সামগ্রিক রূপে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রও অনেক দেখেছেন। বীভৎসতা মানিককে বীতরাগ করেনি। তারাশঙ্কর আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে এলেন। বীভৎসতা নিরাপদ রইল না, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। 'নারী ও নাগিনী' 'তারিণীমাঝি' 'আখড়াইএর দীঘি' 'তিনশূন্য' ইত্যাদি গল্পে যে ভয়ঙ্করকে দেখলাম, প্রচুর উপন্যাসের মধ্যে দেখা দিল সে। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'কালিন্দী' সর্বত্র মধ্যে মধ্যে পদক্ষেপ ভয়ঙ্করের। আগাগোড়া তারাশঙ্করীয় রচনায় উপস্থিত ভীতি ও ভাবনা। 'তাসের ঘরে'র মত গল্প, 'রাইকমলে'র মত বৈষ্ণবীয় উপন্যাস পড়ে যে স্বস্তি বা আনন্দ জাগে, তারাশঙ্করের অধিকাংশ রচনায় তা অনুপস্থিত।

তারাশঙ্কর জৈবিক প্রয়োজনে মানুষের নিষ্ঠুরতম মূর্তির স্বরূপ বহুবার উদ্ঘাটন করেছেন। 'তারিণী মাঝি'তে দেহে জীবন রাখার প্রয়োজনে তারিণী প্রেয়সী পত্নী মুখীকে জলে ডুবতে দিয়ে নিজেকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিল। মনের থেকে দেহ অনেক ক্ষেত্রে প্রবল তারাশঙ্করে, তাই অপার্থিব ইন্দ্রধনু তাঁর প্রেমগগনে সর্বদা উদয় হয়নি।

আখড়াইয়ের দীঘির ঠ্যাঙাড়ে বাগদী কালীচরণ পুত্র তারাচরণকে ভ্রমে হত্যা করে নিজের বাঁচবার তাগিদে হত্যার চিহ্ন লোপ করে ফেলে। অবশ্য সে ধরা পড়েছিল। এই নিষ্ঠুর কাহিনী উপজীব্য করে তারাশঙ্করের 'সোনার কমল' নাটক লেখা, অর্থাৎ ঠ্যাঙাড়ের কথা। 'সোনার কমল' মঞ্চে দেখে হতবাক হয়েছি। লোকসঙ্গীত, 'সোনার কমলে'র রূপ কিছুই সে নিষ্ঠুরতাকে মনে তুলে নিতে দেয় না। স্রষ্টা যদি নিষ্ঠুর হন, নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ত দর্শনে নিষ্ঠুরতা তুলে ধরেন—তবে অপরিসীম শক্তিধর তিনি। সাহিত্যের আদি জনক হোমারের মত চারণ-গাথায় সমস্ত গেঁথে তুলে বাংলাকে উপহার দিলেন লেখক—নিষ্ঠুরতা বাদ গেল না, বরঞ্চ আরও জোরদার হয়ে উঠল পরিবেশ রচনার অসামান্য নৈপুণ্যে। গ্রীক নাট্যকার প্রায়শঃ ভয়াবহ দৃশ্যগুলি অন্তরালে সাধিত করেছেন রুচিকে আঘাত না করে। কিন্তু তারাশঙ্করের সুপ্রচুর রচনার সর্বত্র অনাবৃত প্রকাশে নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর। সাধারণ প্রতিদিনের মানুষকেও দৈহিক বীভৎসতায় বিচিত্র ও অদ্ভুত করে তোলা হয় কখনও। সেখানে মানুষ হয়তো উৎকৃষ্ট, কিন্তু

ভীষণতার মধ্যে সুন্দরকে দেখার সাধনায় তন্ময় কথাশিল্পী বিকৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনায় অস্বস্তি জাগিয়ে তোলেন, যথা—অতি সহৃদয় মানুষ মতিলাল ('মতিলাল' গল্প), সাধারণ মানুষ সনাতন ('সনাতন' গল্প), সন্তানবৎসল গোবিন্দ ('সন্তান' গল্প), অন্ধপল্টী ('তমসা' গল্প, কেবল অন্ধ নয়, কুৎসিত)—এদের কথা বলা চলে। এরা দর্শনে নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। জন্তু-জানোয়ারের রাজত্বেও এই ভীষণ। রংলাল চাষী বিরাট একজোড়া হাতীর মত মোষ কেনে ('কালাপাহাড়')। তাদের বর্ণনা ভীতিকর। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' তুলনায় কত নিরীহ।

তবে কি অধুনা বিগত বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক নেতিবাচক রচনায় এই চিত্রাবলী শেষ করেছেন ? অস্বাভাবিকত্ব কি তিনি বৈচিত্র্য আনবার উদ্দেশ্যে এনেছেন ?

বৈচিত্র্য শুধু নয়, মানুষের মধ্যে চিরন্তন সংগ্রামে মানবাত্মা অশুভ পশুপ্রতিমাকে পরাভূত করে কুশ্রীর মধ্যে সুন্দরকে এনেছে। আদ্যন্ত তারাশঙ্করের প্রতিপাদ্য তাই। মতিলালের স্নেহ-মহত্ত্ব, গোবিন্দের বাৎসল্য, সনাতনের প্রভুপ্রীতি, পল্টীর অসাধারণ সঙ্গীতশক্তি পঙ্কের ঊর্ধ্বে কমলপুষ্প। এমন কি ভয়াবহ মহিষ কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড়ের রংলালের জন্য প্রাণ বিসর্জনও উচ্চগ্রামে বাঁধা।

মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে উচ্চ ভাবের অহরহ সংগ্রাম 'দেবতার ব্যাধি' গল্পে সুস্পষ্ট। ডাক্তার গরগরি রূঢ়ভাষণ ও নিষ্ঠুরতার অন্তরালে পরদুঃখ গোপন করে রাখতেন, কারণ দেবত্বই তাঁকে প্রলুব্ধ করে ডেকে নিত পতনের পথে—

—"শয়তান ক্ষুধার্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করলে মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায়, মানুষ বহুক্ষেত্রেই তাকে বধ করেছে, বহু দৃষ্টান্তই আছে"—

লেখকের বহু আখ্যানেই এই তথ্য উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু—"দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ কিন্তু অসহায়।"

এখানে অপরিসীম লিপি-কুশলতা সত্ত্বেও পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে। লেখকের ব্যাখ্যা তৃপ্তি দেয় না। 'দেবত্ব' কথাটির মধ্যে পঙ্কিল কিছু থাকতে পারে না। কল্লোলযুগের 'ভুখা ভগবান' আর এ 'দেবতা' এক নয়। কিন্তু লেখক অবশ্যই বলতে চেয়েছেন যে মানুষ যাকে 'দেবতা' বানায় তার কাছে অবশেষে মানুষেরই আত্মবিসর্জন দিতে হয় কখনও। সে বানানো দেবতা, নিজে দেবতা নয়। বহু দেশসেবক ও জনসেবকের জীবনের আলেখ্য এ প্রকার হয়। তবে অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শ কোথায় ?

—"সমস্ত রাত্রি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছিলাম। অজগরকে ঝাঁপিতে পুরে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।"

মানবিক চরিত্রের এই মহত্ত্ব নির্দেশনা তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য।

ওখানে লক্ষণীয় 'শয়তান' নয়, 'অজগর' উপমা। তারাশঙ্করের চেতনায় সর্প প্রায় সর্বত্র উপস্থিত অল্পবিস্তর। তিনি বহুক্ষেত্রে প্রবল বিষধর সাপের মধ্যে রূপ দেখেছেন ও শিল্পীর মত বর্ণনা করেছেন, যথা 'নারী ও নাগিনী,' 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ইত্যাদি। 'নাগিনী কন্যায়' কাব্যিক অনুপ্রবেশ সর্পকেন্দ্রিক।

প্রথম গল্প 'রসকলি'র (পূর্ণিমায় প্রকাশিত 'স্রোতের কুটো' ধরছি না) প্রথম লাইন :—

"পালপুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে।" প্রথম উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণিতে' একখানা সাধারণ খয়েরীপাড় শাড়ীর বর্ণনা দেখি—"হাঁড়িটার ভিতরে খয়রা রঙের কাপড়খানা যেন বিবরের নাগের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়াই ফেরে"—উদাসী সনাতন (সনাতন) দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দেশে ফিরিয়া আলকেউটে 'কালকুটীকে' খুঁজিয়া ফেরে। সাপের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক নানা গল্পে বর্ণিত। 'নারী ও নাগিনী' প্রায় দাম্পত্য প্রেম। বিস্তারের আশঙ্কায় সবিশেষ বর্ণনায় বিরত হলাম। তিনি মাঠেঘাটে নির্ভয়ে বিচরণ করতেন, সংসারে কাল কাটাবার বহু উপাদান থাকতেও একা একা রাঢ়ভূমির মধ্যে ভ্রমণ করতেন, যাযাবরের মত। একাকী বোধ করতেন সংসারে হয়তো। নিঃসঙ্গ মনের আবেগ দিয়ে মেলা-খেলা, সাপ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—সমস্ত কিছু সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। আমাদের ভাগ্য তিনি ঐশ্বর্যে ও সম্পদে সুখী জমিদার অথবা উচ্চ চাকুরিয়া হননি। ব্যবসায়, সিনেমা কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারেনি। তাই এক দুর্লভ নিঃসঙ্গ মনের গোপন সঞ্চয় পেলাম আমরা, পেলাম অনাবিষ্কৃত এক সাম্রাজ্য।

আজ তারাশঙ্কর অদৃশ্য, রাঢ়ের বিশাল ভূভাগও অদৃশ্য। তারাশঙ্করকে মনে পড়ে—শীর্ণ ব্রাহ্মণ, দেহ প্রায়ই অপটু। কেবল মনের তেজে ও আত্মিক উৎকর্ষে তিনি নিঃসহায় অবস্থায় কলকাতায় এসে মহানগরীকে জয় করে নিলেন। 'আমার সাহিত্য-জীবনে'র দুইটি খণ্ড পড়ে আমরা শিক্ষণীয় উদাহরণ পাই। ধৈর্য, অধ্যবসায়, মনের জোর দিয়ে কঠিনকে তিনি হাতের মুঠোয় সহজ করে এনেছিলেন। নিজেকে 'প্রতিষ্ঠা' করবার ব্রত সফল হল।

ঊষাকাল থেকে সূর্যের দিকে চেয়ে যাত্রা তারাশঙ্করের। জনসেবক, রাজনৈতিক নেতা হবার সম্ভাবনা কৈশোরে দেখা দেয়। কিন্তু অবশেষে সাহিত্যের পথ তিনি বেছে নিলেন কারাবরণের পরে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। নেতা ও সেবক অনেক পেয়েছি আমরা, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর এক ও অদ্বিতীয়। যে একাগ্রতা তাঁকে লক্ষ্যে স্থির রেখে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, সেই জেদ—যা দেখেছেন, নিঙড়ে সব দেখাতে বদ্ধপরিকর করল। মনের কোণে সমগ্র সঞ্চয় শেষ করার পরেও ছিটেফোঁটাও তিনি বাদ দিতে পারেননি। প্রয়োজন হলেই বাঁদরের যুদ্ধ উত্তর কিষ্কিন্ধাকাণ্ড আরম্ভ করে সমস্ত ঝুলি ধরে টেনেছেন। কিন্তু দেখার বাইরে কিছু তিনি কমই নিয়েছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর মত একটা 'আদরা' বা মডেল তাঁর প্রয়োজন। এত বেশী দেখা হয়েছিল যে, ফলে যে সাহিত্য পেলাম আমরা, তাকে 'God's Plenty' বলে আখ্যা দিতে হয়।

আজ বীরভূমের সমস্ত প্রকৃতি, সমস্ত মানুষ অনাথ। রবীন্দ্রনাথ যাদের 'অন্ত্যজ' বলেছেন তাদের সুখদুঃখের কাহিনীকার কোথায়?

যে অসাধারণ শক্তি নিয়ে এই অসাধারণ লেখক কলম ধরেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সেখানে হাত দেবে কে সাহস করে? তুলনায় নিভে যেতে হবে যে।

তারাশঙ্কর বাংলাসাহিত্যে সুপ্রচুর উপাদানও পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের ইঙ্গিত তিনি পূর্ণ-বিস্তারে অন্য ভুবনে উপস্থাপিত করেছিলেন। 'পণ্ডিত মশাই'র বৃন্দাবনের সঙ্গে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামের' দেবুপণ্ডিতের অতি সাদৃশ্য। মহামারী সেখানেও তৃষিতা ধরিত্রীর বুকে ভয়াবহ রূপে

জাগে। বৃন্দাবনের মা ও পুত্র চরণ মারা গেল 'পণ্ডিতমশাই'তে, গণদেবতায় দেবনাথের স্ত্রী বিলু ও পুত্র খোকনের মত। পরখণ্ড পঞ্চগ্রামে তিনকড়ির বিধবা কন্যা স্বর্ণের সঙ্গে মিলন হল দেবুর। কিন্তু 'পণ্ডিতমশাই'য়ে কুসুমের আত্মবিরোধী অভিমানী সত্তা প্রেমের ফুলঝুরির আলোতে পটভূমিকার যে বর্ণলেপ আনে, সে কোথায়? পূর্বস্বামীর পিতার দোষে পরিত্যক্তা কুসুম পূর্বস্বামী বৃন্দাবনকে ভালবাসল। মান-অভিমান সমস্ত কিছু প্রেমকে প্রাধান্য দেয়। উচ্চশিক্ষিত কেশবের বৃন্দাবনকে শ্রদ্ধার চিত্র নজরবন্দীবাবু যতীনের দেবুর প্রতি প্রীতি মনে করায়। ধাত্রীদেবতায় পত্নীহারা ভোলার পুকুরে ময়লা কাচার সঙ্গে তারিণী ঘোষালের পুকুরে মৃতের কাপড় কাচা তুলনীয়। অতি-বাস্তব বর্ণনা মহামারী কলেরার 'পণ্ডিতমশাই'এ। গণদেবতায় ততোধিক। লণ্ডনের সপ্তদশ শতাব্দীর প্লেগের ভয়ঙ্করত্ব মনে করায়।

কিন্তু যারা নিরপরাধ, যারা অন্যের সেবায় নিজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করেছিল সেই দেবু পণ্ডিত ও পণ্ডিতমশাই বৃন্দাবনের সর্বনাশ হয়। এখানে উভয় ঔপন্যাসিক অতি বাস্তববোধে অনুপ্রেরিত। ওধারে পঞ্চগ্রামের ছিরু মণ্ডল জমিদার হয়, তারিণী ও ঘোষালের দল নিশ্চিন্তে পরচর্চা করে। বৃন্দাবনের অন্তরাত্মা প্রশ্ন তুলেছিল চরণের প্রাণ নিয়ে কি মঙ্গল হল, যদি ঈশ্বরের সৃষ্টির সর্বত্র মঙ্গল? বিদ্রোহী দেবু বলে ওঠে, "স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা, পাপ মিথ্যা, পুণ্য মিথ্যা।" বৃন্দাবন ত্যাগের মধ্যে সান্ত্বনা পায়, পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নায়ক গোবিন্দলালের নজিরে।

'গণদেবতা'র দেবু পরের খণ্ড 'পঞ্চগ্রামে' আবার ঘর বাঁধে। ত্যাগ ঠিকই কিন্তু সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য দিয়ে উপন্যাসের উপসংহার না লিখে, গঠনমূলক কর্মে মানুষের মুক্তি তারাশঙ্কর নির্দেশ করেছেন। তাঁর প্রায় সমস্ত বইতে, কর্ম ধর্মের চেয়ে ন্যূন নয়।

'পণ্ডিতমশাই'-এ নিম্নস্তরের মানুষের সোচ্চার জয়গান, তাদের শোষণ করা হয়েছে উচ্চস্তরের মানুষের দ্বারা আজীবন। এই সুরটি তারাশঙ্করের প্রধান বাণী।

'দেনাপাওনা'য় প্রজা ও জমিদারের নূতন সম্পর্কের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। বিশ্বব্যাপী জটিল এক প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন—জমি কার? যে মালিক সে-ই, না যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে সমৃদ্ধ করে সে-ই? ষোড়শী জীবানন্দকে বলে যে প্রজাদের কাছে তাদের ঋণ "পুরুষানুক্রমেই শোধ করতে হবে।" আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ও রাজনীতির আবর্তে তারাশঙ্কর নানা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় সত্যের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন ভূমিজীবীর ক্ষেত্রে।

'ধাত্রীদেবতা'র তৃষিতা মাটির ফাটল ও জলকামনা শরৎচন্দ্রকেই মনে করায়।

'পল্লীসমাজে'র রমেশের বাঁধ কাটার চিত্রখানি আবার দেবু পণ্ডিতের টামনা হাতে শ্রীহরির নালা কাটার দৃশ্য ('পঞ্চগ্রাম'), কুড়ুলের মুখে গাছ কাটার প্রতিরোধে দেবু পণ্ডিতের দাঁড়ানো ('গণদেবতা') মনে করায়। লাঠিয়ালের মুখে রমেশের বীরত্বের ব্যাখ্যান দ্বারিকা চৌধুরীর মুখে দেবনাথের বীরমূর্তির বর্ণনা পাঠকের মনে একই ভাব জাগায়।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা বিশদভাবে করার অর্থ হয় না। তারাশঙ্করের প্রথম নিশ্চিহ্ন উপন্যাস এক পয়সার 'শিশিরে' প্রকাশিত, সেখানে তিনি শরৎচন্দ্রকে "অসম অনুকরণে"

আরম্ভ করেন ('আমার সাহিত্য-জীবন" পৃঃ ৩৫)। বীরভূমের পথে পথে তাঁর শরৎচন্দ্রকেই মনে পড়ে। এদেশের জমি, দুঃস্থ চাষী, বৈষ্ণব, (শরৎচন্দ্রে 'কমললতা' থেকে অনেক) গ্রাম্যসমস্যা ও সম্পদ নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা অনেক সময় পরস্পরের পরিপূরক। 'পঞ্চগ্রামে' দশমীর দিনে গরুর দৌড়, নবান্নের দিনে কুস্তি মনে পড়ায় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে। 'পঞ্চগ্রামে'র ভীষণ বন্যা সতীনাথ ভাদুড়ীর 'বানভাসি' গল্পটি মনে পড়ায়—বিহার অঞ্চলের বন্যা। 'পদ্মানদীর মাঝি'র আশ্বিনের ঝড় পদ্মার বুকের মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে—একই নিঃসহায় বেদনায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্ট অবশ্য স্বতন্ত্র।

আগেই বলেছি শরৎচন্দ্রের থেকে একধাপ অগ্রসর হলেন তারাশঙ্কর। নরনারীর প্রেমভালবাসা তাঁকে তন্ময় করে রাখেনি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় পূর্ণ উদ্দীপ্ত তারাশঙ্কর পরিণত প্রজ্ঞা ও জীবনের বিভিন্ন স্তরে অভিজ্ঞতা ও দর্শন নিয়ে এলেন।

শরৎচন্দ্রের দেবদাস পার্বতীকে পেল না, পতিতা চন্দ্রমুখী তাকে ভালবাসল। দেবদাসের সকরুণ মৃত্যুর করুণসজল দৃশ্যে পুস্তকের সমাপ্তি। ভালবাসার গল্প।

কবিয়াল নিতাই ('কবি') ঠাকুরঝিকে ছেড়ে এল ঝুমুর নায়িকা বসন বা বসন্তের আশ্রয়ে। এই বইটি তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ও অসাধারণ জনপ্রিয়। লেখক যে কবি, প্রথম জীবনে কাব্যচর্চা করেছেন, তার অনবদ্য প্রকাশ এখানে। একটি লিরিক্যাল কবিতা যেন। কিন্তু তারাশঙ্করের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রভেদ যে তারাশঙ্কর আরও বাস্তব, আরও নিষ্ঠুর। এখানে প্রধান উপজীব্য প্রেম নিঃসন্দেহে কিন্তু কি ছন্নছাড়া পটভূমি! বসন এখানে মরে, কিন্তু সে মৃত্যু সান্ত্বনাবিহীন আশ্বাসহীন। কুপ্রিনের বিখ্যাত উপন্যাস 'Yama, the Pit'-এর নায়িকার মত হতাশ্বাসে বসন বলে—"কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র, সংসার কি দিয়েছে? না। ……গোবিন্দ, রাধানাথ দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো।"

এই সমাপ্তি তুলনাবিহীন। আধুনিক ও সজাগচিত্ত লেখক সত্যদৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছেন, রং লাগাননি সে বস্তুতে। অতি প্রত্যক্ষ ও নিজস্ব দৃষ্টি, খুঁটিনাটি বর্ণনার, পরিবেশসৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতা হলেই পাঠকের অদেখা জগতের কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ করে তোলা যায়।

তারাশঙ্করের জগৎ প্রচুর বিরোধে আকীর্ণ। কৃষিপ্রধান সভ্যতা শিল্পনির্ভর সভ্যতায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রণালী তিনি দেখেছেন। কিন্তু বিনা বিরোধে হয়নি। সেই সংঘর্ষ দেখেছেন তিনি। দেখেছেন দ্বন্দ্ব—সামাজিক, শ্রেণীবৈষম্যের, দেখেছেন জমিদারী প্রথার ডেকাডেন্স্ বা অবসাদগ্রস্ত বিলয়।

প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নবীনের বিরোধ 'পঞ্চগ্রামের' ন্যায়রত্ন ও পৌত্র বিশ্বনাথে, কৃষি ও কারখানার সংগ্রাম 'হাঁসুলী বাঁকের' বনওয়ারী ও করালীর মধ্যে, প্রাচীন পতনোন্মুখ জমিদারের নূতন বড়লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 'জলসাঘর' ইত্যাদি অনেক নব চেতনার অঙ্কুর তারাশঙ্কর সাগ্রহে তুলে নিয়ে বিরাট বৃক্ষশ্রেণী প্রস্তুত করেছেন। 'কঙ্কনার মুখুজ্জে জমিদারেরা' বারে বারে নানা আখ্যানে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের দেখামাত্র চিনেছি। রং লেগেছে পরিচয়ের। কলিকাতার শহরেরও পরিচয় পেয়েছি বার বার লেখকের দৃষ্টিকোণের নব নব কটাক্ষে। 'বেদেনী'

'ডাইনী' 'নাগিনী কন্যা' সকলে অচেনা ও ভয়াবহ। কিন্তু অসাধারণ শক্তির স্পর্শে যেন স্পর্শগ্রাহ্য। 'আরোগ্য নিকেতনে' মৃত্যুর আসা-যাওয়ার রূপটিও যেন দৃশ্যগ্রাহ্য। গ্রামীণ আধাশহর, আধামফস্বল স্থানের রচনায় সিদ্ধহস্ত লেখক যখনই শৈশবস্মৃতির আলোছায়ায় চেনা মুখ দেখেছেন তিনি আশ্চর্যভাবে রসোত্তীর্ণ। আমরাও বার বার ওঁর চেনা জগতে আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছি। কয়লাকুঠি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 'ঘাসের ফুল' গল্পাদি থেকে নানা কাহিনীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত। 'মঞ্জরী অপেরা'য় কয়লাকুঠির বাবুদের জীবন বিধৃত। 'খাজাঞ্চিবাবু'তে ফায়ারব্রিক্‌স্ কারখানার চিত্র।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠির পুরোধা লেখক। তারাশঙ্কর কিছুদিন কয়লার কাজ করলেও কয়লার প্রেমে পড়েননি শৈলজানন্দের মত। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন সেই হৃতসর্বস্ব অভিজাতের বিলয়, পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত, বাবুদের বাড়ীর ঐশ্বর্যের রেশলাগানো অলিন্দ-প্রকোষ্ঠ, কায়দাকানুন ইত্যাদির সঙ্গে। প্রায় সমস্ত পুস্তকে বাস্তবধর্মী তারাশঙ্কর শ্রমিক-চাষী অনুন্নত মেহনতী মানুষের সঙ্গে অল্প হোক, বিস্তর হোক উত্থাপিত করেছেন ওঁদের কথা। যা স্বাভাবিক। একটা বর্ডার হিসাবে মূল শিল্পকর্মে গ্রথিত। কলিকাতার শহরও দেখা জগৎ লেখকের। মনোহরপুকুর ইত্যাদি দক্ষিণ অঞ্চল, বাগবাজার এলাকা, টালা স্বাভাবিকত্ববশতঃ বিভিন্ন সময়ে লেখকের বাসভূমি হিসাবে বড় চেনা। 'মহানগরী' 'কালবৈশাখী' 'মণিবৌদি' 'মহাশ্বেতা' নানা আখ্যানে এরা চেনার আলো লেগে উজ্জ্বল। কলিকাতা কেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে 'মন্বন্তর' বহু-বিতর্কিত। কলিকাতা নগরের যুদ্ধকালীন পটভূমিকায় লিখিত এই উপন্যাস যুদ্ধ, সাম্যবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রে শেষ হয়েছে। পরস্পরকে 'কমরেড' বলে ডাকলেও, নীলা-কানাইয়ের প্রেম যে নূতন জগতের সন্ধান খোঁজে সে জগতের কংক্রীট রূপ কোথায়? নানা বিষে জর্জরিত কলিকাতার শক্তিশালী আলেখ্য ইতিহাসের পাতা হিসাবে এই গ্রন্থের অবদান। তিনটি পরিবারের ইতিহাসে অনিবার্যভাবে পচনশীল বিলাসী চক্রবর্তী পরিবার উপস্থিত। বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি মেলে স্রষ্টা যত দেখেছিলেন, যোগ্যতা সত্ত্বেও অর্থাভাবে বঞ্চিত হয়ে ধনশালীর জীবনযাত্রার প্রহসন, অযোগ্যের অহেতুক সম্মানলাভ, ছলনা-মেকি আড়ম্বর—সমস্ত আদ্যন্ত তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সুযোগ মাত্রে রচনায় অনুপ্রবেশ লাভ করে। বরঞ্চ দিল্লী বাস সত্ত্বেও আপন হয়নি। দূর থেকে দেখা যা তিনি লিখেছেন অসাধারণ লিপিকুশলতা সত্ত্বেও বয়স্ক পাঠকের কাছে 'মেলোড্রামার' আধিক্য মনে হয়েছে। দিল্লীধর্মী 'যতিভঙ্গ' বেশী নাটকীয়। মনে হয় লেখক নাটক দিয়ে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন তাই তাঁর বহু আখ্যান নাটকধর্মী। অবশ্য নাটকীয় 'সপ্তপদী' সংযমশাসিত অপরূপ সৃষ্টি। প্রথম নাটক 'মারাঠাতর্পণ' অগ্নিসাৎ করলেও রক্তে নাটকের নেশা ছিল। মঞ্চকে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর শৌখিন সাহিত্যিক অভিনীত নাটকে অবতরণ দেখেছি মঞ্চে ও বেতারে। অতি সম্পূর্ণ নিখুঁত অভিনয়। পরবর্তী যুগে যাত্রা, শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়, সিনেমা, থিয়েটার নিয়ে লিখেছেন তিনি। যা-যা দেখেছেন সম্যক উন্মোচন ব্যতিরেকে স্বস্তি ছিল না। 'মঞ্জরী অপেরা', 'অভিনেত্রী', 'নিশিপদ্ম', 'কালরাত্রি', 'মহাশ্বেতা' ইত্যাদি বহু নাটকধর্মী আখ্যায়িকা ও ঝুমুর-কবি-ভাদুগান, বাজীকরীর নৃত্যগানখচিত গল্প-উপন্যাস স্রষ্টার নাটক-সঙ্গীত-নৃত্যে অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা দেখায়।

অতি নাটকীয়তার আধিক্য আর্টের অঙ্গে কখনও চড়া ও কড়া রং লাগায় সত্য কিন্তু বিস্ময়করভাবে জীবন্ত ও প্রদীপ্ত করে তোলে। বাস্তবতার সঙ্গে প্লটবিন্যাস ও নানা বিচিত্র চরিত্র ও অজানা সম্প্রদায়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা আমদানি করেন শক্তিধর তারাশঙ্কর। প্রাচীন ঐতিহ্যে পা রেখে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি। পল্লীতে নূতন গণচেতনার উদ্বোধন তারাশঙ্করের অমর সৃষ্টি 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম'। 'চৈতালি ঘূর্ণিতে' এর সুর বেজেছে শ্রমিক-কণ্ঠে। 'ধাত্রীদেবতা'র জমিদার এই চেতনায় আস্থা রেখেছেন। দেশকে তিনি ভালবেসে কারাবরণ করেন শুভমুহূর্তে। রাজনীতির সর্বগ্রাসী বন্ধন ভেঙে 'পাষাণপুরী'র স্বরূপ দেখলেন। জেল নিয়ে বহু কাহিনী অবশ্য পরে রচনা হয়েছে। সতীনাথের 'জাগরী' 'পাষাণপুরী'র পশ্চাৎসূরী।

দেশ বা স্বাদেশিকতা ও নবচেতনায় তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে আধুনিক একটি নূতন সুর এনেছিলেন যা বঙ্কিম শরৎ ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ছিল না। 'গোরা'র সুর অন্য জগতের। অতি সাধারণ মানুষ, অনুন্নত মানুষ, নূতন যুগের মানুষ চলে এল। তীক্ষ্ণধী কাহিনীকার—তাঁর সতেজ সংস্কারমুক্ত মনের স্পর্শে রচনার স্তরে স্তরে মননশীলতার হীরকদীপ্তি, মৌলিক ভাবনার নূতন আলো। বৈচিত্র্যে তিনি অসামান্য, উপাদান সংগ্রহে তিনি মধুকর। অনলস পরিশ্রমে নিজেকে ক্ষয়-করা সাধনায় তিনি বাংলা কথাকাহিনীর ক্ষেত্র এত বিস্তারিত ও এত সমৃদ্ধ করে গেছেন সে তথ্য শুধু গবেষণায় ধরা দেবে। ইতিহাস-সচেতন তারাশঙ্কর, 'গন্নাবেগম', 'সঙ্করবাই' সুলিখিত। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা 'অরণ্যবহ্নি' অপূর্ব। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের দোষগুণ এমন করে আগে কে দেখেছে? তাঁর সামন্ততন্ত্রে মোহ ছিল বিদ্বেষের টানাপোড়েনে। আগাগোড়া নানা কাহিনীতে তারা উপস্থিত। অবক্ষয়ের চিত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়, অভিজাত শ্রেণী থেকে দরিদ্রতম চাষীটির মূল্যায়নে, মানবিক মহত্ত্ববোধে মহীয়ান তারাশঙ্করের সাহিত্য যুগজয়ী।

॥ ২ ॥

সন্দীপন পাঠশালা

তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালা' জনপ্রিয়তার শিখরে উঠল লাঞ্ছনা দ্বারা। চলচ্চিত্ররূপে রূপায়িত কাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা হাওড়ার একটি সভা থেকে ফেরার পথে তাঁকে গাড়ীতে আক্রমণ করে (১০ই এপ্রিল ১৯৪৯)। মাহিষ্যশ্রেণী কেন এই পুস্তকের চিত্র দেখে ক্ষুব্ধ হলেন অবোধ্য। সীতারাম পণ্ডিতের আলোকসাধনায় সে তার সমাজ ও জাতিকে চিরভাস্বর করে গেল। সীতারাম মাহিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে চায় তার কুলকর্মের সীমার ঊর্ধ্বে জ্ঞান ও বিদ্যার জগৎ। উপন্যাসখানির প্রারম্ভে তারাশঙ্কর চাবিকাঠি প্রথমেই হাতে তুলে দিয়েছেন—"মানুষের প্রতিষ্ঠার কামনা যখন অন্নবস্ত্রের ভাবনাকে ভুলিয়ে দেয়,

তখন তার পথ চলাটা ঠিক আকাশের দিকে মুখ তুলে পথ চলা। অতি বাস্তব মাটির পৃথিবীর বুকের বাধাবিঘ্নের কথা তখন সে ভুলেই যায়।" (সন্দীপন পাঠশালা—প্রথম পৃষ্ঠা, প্রথম প্যারা) এই কামনা উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সে পণ্ডিত হতে চায়। বাবা রমানাথের বাধা অতিক্রম করে সীতারাম জমিদারবাড়ীর ছেলেদের গৃহশিক্ষক হয়ে কয়েকবার নর্মাল পরীক্ষায় ফেল হয়। তারপরে সে খোলে পাঠশালা জমিদারবাড়ীর উৎসাহে। অথচ কুলকর্ম চাষবাস করলে সে অনেক লাভবান হত। নানা বাধার মধ্য দিয়ে সীতারামের পাঠশালা চলে যতদিন না ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের পত্তন হয় ও সীতারাম পণ্ডিতের চক্ষু দু'টি যায়। স্ত্রী বিগতা, একমাত্র সন্তান রত্না বিধবা।

এই সীতারাম পণ্ডিতের কাহিনী উগ্রতার সাধক তারাশঙ্কর লিখেছেন সীতারামের খাতায় ধীরাবাবুর উদ্দেশে লেখা অনুরোধের ঢংএ।—"তবে যেন মিথ্যে রঙ-চঙ চড়াবেন না। একতারায় যেমন সুর ওঠে তেমনি বাজাবেন। বাউলের গান যেমন হয় তেমনই রাখবেন। একরঙা ছবি যেমন লাগুক, দোসরা রংয়ের আঁচড় দেবেন না।"

('সন্দীপন পাঠশালা—তা র ৭ম খণ্ড—পৃঃ ১৬৬)

শেষপাতায় সীতারাম পণ্ডিত—"ভীরু দুর্বল হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে দারিদ্র্যশীর্ণ বক্ষপঞ্জরের অন্তরালে।" (ঐ—পৃঃ ১৬৭)

স্ত্রী মনোরমা সীতারামের মনোরমা নয়, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর প্রতি চোখে-দেখা-জাত গোপন প্রেম সার্থক নয়। সে-ও চলে যায়। স্ত্রী নেই, নাতিনাতনী নেই, পাঠশালা নেই। কেউ কাছে বসার নেই। চোখের জলধারায় অতিক্ষীণ দৃষ্টি—লেখাপড়া নেই। কিন্তু তবে কি আছে যাতে ধীরানন্দের মত খ্যাতনামা অভিজ্ঞ এবং লেখক তাকে "দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল।" (সন্দীপন পাঠশালা—শেষ পংক্তি)

জাগতিক অর্থে ব্যর্থতাবোধকে মহত্ত্ববোধকে রূপান্তরিত করে একটি সামান্য ক্ষুদ্র জীবনকে অপরিসীম মর্যাদা দিলেন স্রষ্টা। কোথাও নাটকীয়তা নেই এখানে, কোন ভয়ঙ্কর নেই। সহজ স্বচ্ছ জলস্রোতের মত একটি নিস্তরঙ্গ জীবন নিজের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করল।

'মালাচন্দনে'র মত গল্পের সরলতা, স্নিগ্ধতা দিয়ে লেখা এই উপন্যাস স্তিমিত-দৃষ্টি বৃদ্ধ সীতা-রাম পণ্ডিতের জয়যাত্রা। শেষ যে অশেষ এখানে সে প্রমাণিত।

জটিল লেখক তারাশঙ্কর এখানে সরল। বাংলার একটি শাশ্বত সাদা লোকের চিত্রে তিনি ইংরেজ কবি টমাস গ্রের অমর কবিতা 'এলেজি'র ভাবধারা রেখে গেছেন, যথা—

"Let not Ambition mock their useful toil,
Their homely joys, and destiny obscure :
Nor Grandeur hear with a disdainful smile,
The short and simple annals of the poor."

'ধাত্রীদেবতা'র প্রধানতঃ গ্রামীণ ও গৃহস্থ আবহাওয়ার মধ্যেও নাট্যকার তারাশঙ্কর প্রকট উপস্থিত। কাহিনীর নাটকীয় বিন্যাসে, মহামারীর ভয়াবহ চিত্র-অঙ্কনে, ডোম মেয়ের পিস্তল

সরানোর দৃশ্যে, দেশসেবকের হত্যা ইত্যাদির মধ্যে যে উদগ্র পুরুষালী সুর বাজে, 'সন্দীপন পাঠশালা'য় সে সুর শান্ত সমাহিত আত্মত্যাগের মহিমায় সকরুণ। এই উপন্যাসে দরিদ্র ও চাষীজীবন উপজীব্য হলেও সাদা সাধারণ বস্ত্রে জরির পাড়ের মত অভিজাত সম্প্রদায় উপস্থিত। ঘাত-প্রতিঘাত তাদের সঙ্গে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ এখানে ধীরানন্দ। সে-ও স্বদেশী করে, জেলে যায়, পরবর্তী যুগে খ্যাতনামা লেখক। সীতারাম পণ্ডিতের ছাত্রবাড়ীর জমিদারী কায়দাকানুন স্মরণ করায় 'ধাত্রীদেবতা'র জমিদার-পরিবারের পরিবেশ। নিজের জীবন ও যৌবনের পরিবেশকে তারাশঙ্কর বহু গ্রন্থেই স্মরণ করেছেন বারে বারে। ধাত্রীদেবতার মায়ের প্রতিচ্ছবি ধীরাবাবুর মায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সীতারামের মনোরমার অভ্যর্থনায় ঘর সাজানো, ধাত্রীদেবতা'র পিসীমা শৈলজা দেবীর শিবনাথ-পত্নী গৌরীর আগমনের আশায় ঘর সাজানো মনে পড়ায়। 'চক্র' উপন্যাসে বিনয়ের উড়ন্ত মনকে ধরবার আশায় অনুরূপা দেবী মা জগদ্ধাত্রীকে দিয়ে অনুরূপভাবে ঘর সাজিয়েছিলেন।

সীতারামের সৃষ্টিকার্যে স্রষ্টার পরিমিত জ্ঞান ও আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকট সমীক্ষা দেখি। সীতারামকে ভালবাসা যায়। সীতারাম উচ্চাশায় পরিপূর্ণ হয়ে নাগালের উর্ধ্বের বস্তুর সন্ধানে নিজেকে হাস্যাস্পদ করেনি। অন্যান্য গ্রন্থের মত লেখক এখানেও জমিদার সম্প্রদায়ের দুই শ্রেণী দেখেছেন। মহত্ব, উদারতা, প্রজাবাৎসল্য, গুণগ্রাহিতা ইত্যাদির সঙ্গে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশে উদ্ধত অন্য শ্রেণী। এদের সঙ্গে সাধারণতঃ নায়কদের প্রতিঘাত ও বিরোধ ঘটে প্রায় সর্বদা। কাহিনীর বেগে জোয়ার লাগে।

সীতারাম কিন্তু দেবতা নয়। রক্তমাংসের মানুষ সে, স্রষ্টা তাই গড়েছেন তাকে, যেটা স্বাভাবিক। ভাল বই দেখলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখনও অপহরণ সীতারামের দুর্বলতা। কিন্তু এতে তার প্রতি পাঠকের স্নেহ আরও বৃদ্ধি পায়। নিজের মর্যাদা, নিজের সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা, শিক্ষার্থীদের বেদম প্রহার, কখনও এক-আধটু অনৃতভাষণ, চুরি করে পরস্ত্রীকে দেখা ইত্যাদি সীতারামকে বড় কাছের মানুষ করে তুলেছে। তার পরিবেশ অতিক্রম করে সে উর্ধ্বে উঠলেও সে পরিবেশমুক্ত সর্বদা নয়। একজন সাধারণ মানুষের বিকাশে সে অসামান্য।

বইখানি 'উদয়াস্ত' নামে পূর্বে 'কৃষকে' (১৩৫২) প্রকাশিত হয়। সেই রূপটি পড়ে John Sedges-এর লেখা '**The Townsman**' উপন্যাস স্মরণ হয়েছিল তখন।

Kanasas plainএ **Median** একটি ছোট গ্রাম। লাজুক কিন্তু দৃঢ়চেতা জোনাথান সীতারামের মত। তার বিরক্ত পিতা ক্লাইড রমানাথের মত গজগজ করে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে জোনাথান স্কুল খোলে সীতারাম যেমন করে স্কুল খুলেছিল। উভয়ে ছাত্রদের মঙ্গলে সর্বত্যাগী এবং দেশের লোক ও গ্রামের উন্নতির জন্য ব্যাকুল। অভিজাত ইভানের বন্ধুত্বলাভ করে জোনাথানও বন্ধুর কাছ থেকে স্কুল স্থাপনে সহায়তা পায়। জুডির ঘটনা সীতারাম পণ্ডিতের ব্যর্থ প্রেম। উভয় ক্ষেত্রে রোমান্টিক কিন্তু অপ্রাপ্য। শেষ পর্যন্ত মিল এই যে সীতারাম প্রাপ্য সম্মান পেয়েছিল। জোনাথান বিষয়ে মেয়রের ভাষণ ধীরানন্দের আনীত ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যানের ভাষণ মনে পড়ায়। রচনাবলীর ১৪৯ পৃষ্ঠার উৎসবটিও তদ্রূপ।

আমার বিস্ময় বোধ হয়েছিল পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই ভাষার সম্পূর্ণ পৃথক দুই লেখকের চেতনায় মিল দেখে। তারাশঙ্কর এই প্রায়-অখ্যাত বইখানির পাঠক ছিলেন না নিঃসংশয়ে। তিনি প্রাচীন পুস্তক, দলিল-দস্তাবেজ নাড়াচাড়া করতেন, স্বদেশীয় সাহিত্য পা‍ঠ করতেন অবকাশ সময়ে। তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার জগৎ কোন প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়নি, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। সন্দীপন পাঠশালার আলোচনা করতে বসে সদৃশ সৃষ্টি স্মরণ করছি মাত্র।

অতৃপ্ত লেখক তারাশঙ্কর 'উদয়াস্ত' আবার লেখেন। প্রথম অংশে অনলস মধুকরের মত সীতারামের কাজ, পাঠশালা গড়ে তোলা ইত্যাদি প্রায় অবিকৃত আছে। শেষাংশ অন্যরূপ, অন্য চরিত্রেরও আমদানি হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন আধুনিক বিশ্বে সজাগদৃষ্টি তারাশঙ্কর কিন্তু এক বিশ্বাসনির্ভর আদর্শলোকে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত এক নিরাসক্ত ঈশ্বর। তিনি বিনাদোষে শাস্তি দেন বা শাস্তি-পুরস্কার না দেন ক্ষতি নাই। আমরা তাঁকে ভালবাসব, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব। তারাশঙ্কর তাই চান।

মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট তাঁর কবিতায় জোবের সঙ্গে ঈশ্বরের কথোপকথনে আশ্চর্য স্বচ্ছতা দেখিয়েছেন। নিরপরাধ মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে জোব সেই জিজ্ঞাসায় মনোযোগী। প্রাথমিক দ্বিধা ও আত্মরক্ষার পরে ঈশ্বর নবযুগ প্রবর্তনা কর্মে জোবের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদের সুযোগ দেন। বাংলায় তাঁর কথার অনুবাদ :—

সহস্র বৎসর ধরে আমার তোমার কথা মনে ছিল,
তুমি সাহায্য করেছো, ধন্যবাদ দিতে চেয়েছি,
তুমি এই নীতিস্থাপনায় সাহায্য করেছো যে,
মানুষের ন্যায্য পাওনা ও প্রাপ্তির মধ্যে
কোন যৌক্তিক সূত্র ভেবে পাওয়া যাবে না।

এই যুক্তির আলোকে শুধু তারাশঙ্করীয় জগৎকে মেনে নেওয়া চলে—ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণা সম্পূর্ণ পৃথক প্রথায় কাজ করে।

বস্তুতান্ত্রিক বা প্র্যাকটিকাল লেখক আবার ভারতবর্ষের গান্ধী এবং ধর্মগুরুতে, দেশের সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। তাই সীতারাম চাষীঘরের ছেলে, কিন্তু পাঠশালার নামটি ধীরানন্দ দিয়েছেন 'সন্দীপন পাঠশালা', অর্থাৎ যে সন্দীপন মুনির পাঠশালায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা নেন। সর্বত্র, প্রায় সমস্ত পুস্তকগুলিতে তাঁর রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ন্যায়সঙ্গত উদ্ধৃতি ও স্মরণের মাধ্যমে—পুরাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসন সর্বদাই তাঁর সম্মুখে খাড়া। আমাদের দেশের মাটি ওসব দ্বারাই পুষ্ট, তবু যুগের আবর্তন অস্বীকার্য। অতএব অস্বীকার করা যায় না যে ইন্টেলেকচুয়াল পাঠকের কখনও বা ক্লান্তি আসে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে তাঁর বিশ্বাস বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত তিনি দেখেন কোথায় ? পুণ্য বা পাপ আপন ফলাফল পায় কম। 'সন্দীপন পাঠশালা'য় সীতারাম প্রায় সর্বহারা হয়, যেমন 'পঞ্চগ্রামে' দেবু পণ্ডিত হয়। সীতারামের একের পর এক হারানোর বর্ণনায় 'সন্দীপন পাঠশালা'র

শেষাংশ ভারাক্রান্ত।

যদি কর্মের, অধ্যবসায়ের, সুন্দর জীবনযাপনের ফলে মানুষ উন্নীত হয়, তবে পুণ্য ও নীতি অনুসরণ করার পরে কেন মানুষের বিজয় সর্বত্র ঘোষিত নয়? তবে তাঁর প্রত্যয় পাঠকমনে সঞ্চারিত হয় কোথায়? জীবন নিষ্ঠুর, সে পাপপুণ্যের ধার ধারে না, অনিবার্য গতিতে সে ইতিহাস রচনা করে যায়। তারাশঙ্কর জীবনের সেই রূপই দেখেছেন পরম সততার সঙ্গে।

মহৎ জীবনযাত্রার পরে কেন মানুষের পরাজয়? শাস্ত্রবাগীশ বলবেন পূর্বজন্মকৃত্যং। কিন্তু তারাশঙ্কর কি বলেন আমাদের শোনা হয়নি।

তিনি হয়তো বলবেন, 'আত্মিক জয়ই মানুষের জয়।' সীতারাম বলে ওঠে—"সংসারে দুঃখই তো পরম বস্তু, রায়কাকা। সুখের সময় ভগবানকে লোকে ভুলে যায়, দুঃখ তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয়।" (তা. র. ৭ম খণ্ড—পৃঃ ১৪৮)

এই জরাজীর্ণ প্রবোধ কি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে বিশ্বাসী রাজনীতিজ্ঞ, নবীন ভাবধারার বাহক তারাশঙ্করের পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট?

॥ ৩ ॥

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

শিস উঠছে।

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি বিখ্যাত হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। চন্দনা নয়, দয়েল বা কোন পাখী নয়। অত তীব্র ধ্বনি তাদের গলায় আসত না। এ কিসের শিস তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পটভূমিকায় তারাশঙ্কর তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হাঁসুলী বাঁকের স্বপ্নপ্রবাদ লোকশ্রুতিখচিত উপকথার প্রথম সূচনা করলেন।

হাঁসুলী বাঁক অর্থাৎ কোপাই নদীর বাঁকে বাঁশবাদি গ্রামের কাহারেরা কাহিনীর উপজীব্য। 'জাঙল' গ্রাম একটু দূরে; সেখানে বাস করেন ভদ্রলোকেরা। বেহারা কাহার ও আটপৌরে কাহার—দুই সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত কাহারেরা। নিজেদের মধ্যে পেশাগত জাতিভেদ হেতু দুই ঘরে বিবাহাদি নিষিদ্ধ ছিল। ফলে উপন্যাসের নায়ক কোশকেঁধে বনওয়ারীর মানসী 'আটপৌরে কাহারকন্যে' কালোশশী তাদের দলসর্দার পরমকে বিবাহ করে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে। পরম ও বনওয়ারীর শত্রুতা চলে। শেষ পর্যন্ত বনওয়ারী মারামারিতে পরমকে পরাস্ত করলেও ভীতা কালোশশী দহের জলে ডুবে যায় পরমের তাড়া খেয়ে। অবশ্য গাছের ডাল বেয়ে উঠতে যেয়ে শিকড়ের তলা থেকে সাদা গোখুরোর নাটকীয় আবির্ভাবে কালোবউ কত্তার দহে ডুবে মরে। নানা ভাগে বিভক্ত উপন্যাসখানির একটি প্রধান অংশে এখানে ছেদ পড়ে। নায়ক বনওয়ারী কাহারপাড়ার মাতব্বর, প্রায় রাজার মত। নিজেকে সংযত করে রাখলেও পূর্বপ্রেমের আবেশে মধ্যে মধ্যে সে ধরা পড়ত।

বইখানির দ্বিতীয় নায়ক করালী। বনওয়ারী তাকে আগাগোড়া শাসন করতে প্রয়াস পায় মাতব্বর হিসাবে। পিতৃহারা ও মাতা-পরিত্যক্ত করালী বারো বছর বয়সে বাবুদের বাড়ী রাখালী করার সময়ে তুচ্ছ অপরাধে প্রহৃত ও বরখাস্ত হয়। মনিবের পার্শেল থেকে স্টেশনমাস্টারের শিশু মেয়েকে দুটি ও জমাদারকে দুটি আম সহৃদয়ভাবে দিয়েছিল। একফালি আম জোর করে তাকে খাওয়ায় জমাদার। মুখে গন্ধ পেয়ে বাবু প্রহার দিলেন, বনওয়ারী সাহায্য করল। অভিমানে ও রাগে তখন থেকে করালী বনওয়ারীকে মাতব্বরের মর্যাদা দিতে চায় না। স্টেশনমাস্টারের অনুগ্রহে করালী রেল লাইনের কুলীগ্যাঙের মধ্যে ভর্তি হয়ে প্রচুর রোজগারের সঙ্গে শহুরে কেতা নিয়ে এল গ্রামে। ছেলেছোকরারা তার ভক্ত, প্রবীণতমা সুচাঁদের রূপসী নাতনী পাখীর সে মনের মানুষ।

কিন্তু শিস কার? অবশেষে প্রমাণিত যে 'কত্তার থানের' গাছে তাঁর বাহন চিত্রবিচিত্র বৃহৎ চন্দ্রবোড়ার শিস এটা। 'ডাকাবুকো' দুর্দান্ত করালী বাঁশবনে আগুন দিয়ে দগ্ধ করেছে তাকে অনুমানে। করালীর পোষা কুকুরটা মারা গেছে ওরই বিষে কিনা।

বাবাঠাকুর কাহারদের রক্ষক উপাস্য দেবতা। বর্ণনায়—"এই ন্যাড়ামাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম"—(তা. র. ৭ম খণ্ড—পৃঃ ১৬৯)

এই 'কত্তার' বাহন সাপটিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে করালীকে শাস্তি দিতে যায় বনওয়ারী। ইতিমধ্যে প্রেমিকা পাখী ও পিসতুতো ভাই নসুবালাকে নিয়ে করালী চলে যায় চন্দনপুরে। পাখী আবার পূর্বে বিবাহিতা, কিন্তু হাঁপানীরোগী স্বামী নয়ান তাকে রাখতে পারে না। 'হাঁসুলী বাঁকের' দ্বিতীয় পর্ব শেষ।

অতঃপর নানা উৎসব, চাষবাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ পর্বের দিকে মুখোমুখি কাহিনী গড়ায়, যখন দুই নায়ক মুখোমুখি দাঁড়ায়। চন্দনপুর থেকে গ্রামে ফিরিয়ে আনে বনওয়ারী করালীকে, পাখীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ঘর বাঁধায়। কারণ গ্রামের মেয়ে সিধু শহরে বেশ্যাবৃত্তি করে। বনওয়ারী সিধুকে স্নেহ করে। তাই তার অধঃপতনে ব্যথা পেয়ে করালী-পাখীকে ফিরিয়ে আনে, যাতে তারা শহরে বয়ে না যায়। তাছাড়া নিজের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা আছে। নয়ানের মা ও তার অভিশাপ উপেক্ষা করে পাখীর নয়ানের সঙ্গে ছাড়পত্র ও করালীর সঙ্গে সাঙা হয়ে যায় বনওয়ারীর আদেশে। এখানে করালীর প্রতি প্রচ্ছন্ন স্নেহ প্রবল হয়ে ওঠে বনওয়ারীর। পুত্রহীন সে করালীকে পুত্রের আসনে দেখে। করালীও তাকে অত্যন্ত মান্য করে যদিও নানা ঘাত-প্রতিঘাত চলে দুজনের মধ্যে। অবশেষে করালীর পাকা ঘর তোলা নিষেধ করালী না মানায় বনওয়ারী করালীর ঘর ভেঙে দেয় মাতব্বরের শাসন হিসাবে। করালী আবার চন্নপুরে চলে যায়। বনওয়ারী আদেশ দেয়, যে শহরে লাইনে খাটতে যাবে তার গাঁয়ে ঠাঁই হবে না।

তারপর বনওয়ারী আটপৌরে পাড়ারও মাতব্বরী পেল। তাদের মাতব্বর পরম পলাতক। চুরি-ডাকাতিতে আটপৌরেদের নাম থানার খাতায়। একমাত্র বনওয়ারী জামিন হ'লে তারা নিশ্চিন্ত হয়। বনওয়ারী অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে কালোশশীর মত রূপসী তার বিধবা বোনঝিকে বিবাহ করে—প্রথম আটপৌরে ঘরের মেয়েকে আনবার গৌরবে ও রূপযৌবনের নেশায় পূর্বস্মৃতি স্মরণে।

তারপর শেষ অঙ্ক। কালোশশীর বোনঝি সুবাসী কালোশশীর মত চপলা-চটুলা। করালীর সঙ্গে তার প্রেম বেধে যায়। টের পেয়ে বনওয়ারী করালীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে পরাজিত। শেষে ওই দিন থেকে সে অসুখে পড়ে মারা যায়। সুবাসী যথাসর্বস্বসহ পালায় করালীর বাসায় চন্নপুরে। পাখী আত্মহত্যা করে। যুদ্ধের বাজারে কলকারখানার কাজে করালী দু'হাতে 'ওজগার' করে। গ্রামের সকলকে ডেকে নিয়ে কারখানায় কাজ দেয়। যুদ্ধের ঠিকেদারেরা হাঁসুলী বাঁকের বাঁশের বেড় কেটে নেয়, গাছ নির্মূল করে, ছাগল-ভেড়া চালান যায়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার দিন শেষ হয়। কিন্তু আবার করালী ফিরবার উদ্যোগ করে এখানে।

এই তারাশঙ্করের সুদীর্ঘ উপন্যাসের স্থূল কাঠামো। গল্পাংশ অনেক গল্পেরই মত কিন্তু শিল্পীর কলমে অনন্য। নানা উপাদানে, নানা চরিত্রে সমৃদ্ধ এই কাহিনী কাহার-কুলের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিচয়ে অন্য এক জগতের সন্ধান দেয়। অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, পুনরুক্তি, তথ্য, ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে লৌকিক প্রবাদ, পারিবারিক প্রবাদ মিশিয়ে 'হাঁসুলী বাঁক' অমর সৃষ্টি। এখানে মোজাইকের মত রংয়ের গাঁথুনি, জমাটবাঁধা সিমেন্টের কাজ, কোন্‌টুকু বাদ দেওয়া চলে ভেবে কূল পাই না।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বলার ঢংএ ঔপন্যাসিক আয়েসে গা ছেড়ে যেন ডুবে গেছেন সেই ভৌগোলিক সীমানাটুকুর মধ্যে। কখনও বা শিথিলধর্মী বলা চলে। অনেকে একটানা পাঠে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হন। কিন্তু টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' পড়তে কি অনুরূপ ক্লান্তি হয় না? বরিস প্যাস্টারনেকের 'ডক্টর জিভাগো' কজনে লীলাভরে শেষ পর্যন্ত পড়েন? অনেক কালজয়ী উপন্যাসও ক্লান্তি আনে। বাহুল্যবোধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন স্থানে বার বার এক বর্ণনা ফিরে এসেছে কোন নূতনত্ব না নিয়ে। অনেক প্রবাদ, অনেক উক্তি পুনরুক্ত হয়েছে। কিন্তু অপরাধ বলে মনে হয় না। শক্তিশালী লেখক যেন কাহিনীর চাঁদের মত চারণগাথায় নেমেছেন। এখানে যান্ত্রিক পরিমাপ নেই, নেই সভ্যতার সঙ্কেতচিহ্ন। তাই বোধহয় উৎসর্গপত্রে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—"এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে লাগবে কেমন জানি না।"

তারাশঙ্করের নিমগ্নচিত্ততা, কাহিনীর অঙ্গে অঙ্গে কাহার ভাষার ঘন অনুপ্রবেশে বৈচিত্র্য ও atmosphere বা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কখনও লেখক কাহার ভাষার জবানী ছেড়ে নিজের মানসিকতা প্রকাশসাধ্য রচনার মধ্যেও তৎসদৃশ শব্দের আগাগোড়া প্রয়োগ করেছেন, যথা :—

"যার হাঁস ছিল সে না-দেওয়া হয়নি।" (তা. র. ৭ম খণ্ড পৃঃ ২০১)

'মোটা আলু' 'মোটা শিল' 'মোটা মোটা গ্রাস' তিনি বলেন বড় শিল ও আলুকে, ও বড় গ্রাসে খাওয়াকে।

চন্দনপুরকে আগাগোড়া 'চন্নপুর', কাহার কন্যাকে 'কাহারকন্যে' ইত্যাদি পাই। আর 'তন্ময়তায়' ('আমার সাহিত্য-জীবন') মজ্জমান তারাশঙ্কর আদ্যন্ত নিজের জবানীতে লেখার মধ্যেও ডুবে যান অপভ্রংশ ভাষায় :—

"শিবো হে। সকল বুড়ার আদি বুড়া সকল দেবতার বড় দেবতা—বাবা বুড়া শিব, বাবা কালারুদ্দু! বেলতলার বাবাঠাকুর, কাহারদের দেবতা।" (ঐ পৃঃ ২৮৩)

এখানকার ধর্মউৎসবের বর্ণনা পুরোপুরি কাহার ভাষায়। তাদের ধর্মবিশ্বাসে লেখক তাদেরি একজন হয়ে লিখেছেন।

যেন দূর আধো-আলোছায়া ও রূপক-রহস্যঘেরা এক অনাদৃত বিশেষ ভূভাগ ও তাদের নানা সংস্কার, বাধানিষেধ, বিচিত্র জীবনযাত্রার দিকে চোখ রেখে তারাশঙ্কর স্মৃতি ও শ্রুতিমন্থিত ইতিহাস-রচনায় গা ঢেলে দিয়েছেন। লিপিকুশলতার অভাব কখনও স্বেচ্ছাকৃত। যতদূর সম্ভব বাঁশবাদির কাহারকুলের মন নিয়ে লিখেছেন লেখক, ভাষা যথারীতি তৎভাবে ভাবিত। পালিশ করা হয়নি সত্য, সেটাই হাঁসুলী বাকের cross এবং crown. হয়তো অন্যভাবে লিখতে গেলে এর আবেদন ক্ষুণ্ণ হত।

তারাশঙ্করের কবিত্ব বইখানির স্থানে স্থানে অপরূপ মাধুর্য ও শক্তি এনেছে। সময়ে সময়ে প্রকৃতির বর্ণনা ছবির মত বাঁশবাদি গ্রামকে তুলে ধরে :—

"—হাঁসুলী বাঁকে পৃথিবীর সঙ্গেই যথানিয়মে রাত্রি প্রভাত হয়। সেখানে ব্যতিক্রম নেই। গাছে গাছে পাখী ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু ছোট ছোট মুক্তোর দানার মত টলমল করে। বাঁশবনের মাথা, বনশিরীষ, নিম আম জাম কাঁঠাল শিরীষ বটপাকুড়ের মাথা থেকে টুপটাপ করে শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুলই ফোটে!" (তা. র. ৭ম খণ্ড পৃঃ ২২৪)

তারাশঙ্কর শেষজীবনে 'কাটুম-কুটুম' ধরণে বস্তুনির্মাণ ও চিত্রঅঙ্কনে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু কালিকলমে আঁকা এই চিত্রের তুলনা নয় সেই চিত্রগ্যালারি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প এখানে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিসর্গপ্রেম।

চাষবাসের বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি বিবরণ তারাশঙ্করের বহু পুস্তকে পাই এ বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা থাকা হেতু। মাটিকে ভালবাসে বনওয়ারী—"নিচে মোলাম কালো মাটি। বাহবা বাহবা!" (তা. র. ৭ম খণ্ড পৃঃ ২৭৫)

মাটি ও শস্য নিয়ে চাষীর মনোবিলাস তিনি প্রায় দেহবিলাসের স্তরে তুলেছেন। বড় গল্প 'পৌষলক্ষ্মী'র কথা উল্লেখ করতে পারি। ইংরেজ কবি কীট্‌সের হেমন্তবন্দনার লাস্য ও বর্ণ দিয়ে ফলফুলেভরা মাটির তিনিও বন্দনা করেছেন।

আবার উগ্র বর্ণনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় :—

—"মা-লক্ষ্মীর গলার সোনার সাতনরী হয়ে উঠেছে, যেন মনসার গলার অজগরের বেড়; নদী সেখানে অজগরের মতই ফুঁসছে। ঢেউএ ঢেউএ ফুলে ফুলে উঠছে, যেন হাজার ফণা তুলে দুলছে। এরই মধ্যে কখনও ওঠে আকাশে টুকরো খানেক কালো মেঘ—দেখতে দেখতে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় তার উপর, যেন কেউ আগুনে গড়া হাতের আঙুলের ঘা মেরে বাজিয়ে দেয় এই কালো মেঘের 'বিষমঢাকীর' বাজনা। যে বাজায় তার মাথার জটার দোলায় আকাশ-পাতাল দুলতে থাকে। অজগর তখন তার বিরাট অঙ্গে আছড়ে আছড়ে হাজার

ফণায় ছোবল মেরে নাচে—ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে মাতনে মাতা নদীর জলে তুফান জাগে।" (পৃঃ ৩)

বাংলাদেশের নদীর এই বর্ণনার মত বহু ক্ষেত্রে বহু অসাধারণ লিপিকুশলতা আছে। সংক্ষিপ্ত ভূমিকার আয়তনে উদ্ধার সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য 'হাঁসুলী বাঁকেও' অতি প্রচুর সর্পবৃত্তান্ত। বইএর আরম্ভ সাপের শিসের প্রভাতী সানাই সহ।

বনওয়ারী ও করালীর পাশে দাঁড়ায় তৃতীয় অদৃশ্য নায়ক বাবার বাহন দগ্ধ ও মৃত চন্দ্রবোড়া সর্প। বনওয়ারী ক্ষণে ক্ষণে মেঘের ফাঁকে তারি চিত্রবিচিত্র বর্ণ দেখে শিউরে ওঠে। নয়ানের মা বিদ্যুতের ঝলসানি বাবার বাহনের 'জিভ কাড়া' মনে করে। সর্পকে কাহারপ্রথামত দগ্ধ করে, অশৌচে গোটা কাহারপাড়া স্নান করে, বাবার থানে সরলি পুজা দিয়েও সর্পের আত্মার শান্তি নেই; সমগ্র বইতে সুচাঁদ বুড়ীর হায়-হায় বিলাপ—তার জন্য কোন অকল্যাণ দেখলেই তাকে হত্যা করার পাপ স্মরণে এনে কাহারপল্লী আতঙ্কে শিউরে উঠে। বাবার বাহনের অনুচরেরও অভাব নেই। শ্বেত গোক্ষুরের দংশনে কালোশশী মরে। আলাদেরা মাটিতে ছোবল কাটে। কুসংস্কারজড়িত, অনার্যসুলভ মানসিকতা শিক্ষিত পাঠক দিব্য উপভোগ করেন।

তারাশঙ্কর পরিহাসরসসৃজনে মনোযোগী ছিলেন না। তবু শ্লেষমিশ্র ইঙ্গিতব্যঞ্জক পরিহাস বিজলীঝলকে কখনও রচনা দীপ্ত করে তুলেছে। 'হাঁসুলী বাঁকের' দীর্ঘ কলেবরে এটা সুপ্রচুর।

সুচাঁদের আচরণ, কথাবার্তায় হাস্যরস আমরা উপভোগ করি। হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা ভুতপ্রেত মানে, নানা অলীক ছায়া ও বিভীষিকা দেখে কাতর হয়। বনওয়ারীর মত মাতব্বর কোশকেঁধে শূরবীরের ভয় ও আতঙ্ক কৌতুক জাগায় ও স্নেহের উদ্রেক করে পাঠকমনে। যার প্রচণ্ড বিক্রম, অসীম শক্তি, পাথরে গড়া বিরাট দেহ, গলায় গর্জন—সে-ও অপদেবতাকে ভয় পায়, মাদুলী ধারণ করে পরিত্রাণের আশায়।

সুচাঁদ গল্প করে, নয়ানের পূর্বপুরুষ মরেছিল চুরি করতে যেয়ে থালাভাঙা কপালে গেঁথে।— "তা পরেতে তিনি তাই হলেন। মা, দিন-আত ঘরের সাঙায়, না হয়তো বাড়ীর পাঁদাড়ে, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন। লোকে ভয়ে টটরস্থ।"

হাঁসুলী বাঁকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিহাস এমনি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নিশাচর পাখী দেখে ভয় পেয়ে বনওয়ারী মূর্ছা যায়। অতঃপর ঠাণ্ডায় জ্বর, করালীর নিকট পরাজিত হবার পরে।

নানারকম বিধিনিষেধ, ধর্মভয় ইত্যাদি আকীর্ণ রাঢ়ভূমির এই হাঁসুলী বাঁক। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়, কাহার ভাষার চমকপ্রদ অনুশীলনে চোখের সম্মুখে অজানা রাজ্য দেখেন মুগ্ধ পাঠক। দীনবন্ধু মিত্রের দক্ষতায় চলতি ভাষার সম্যক ব্যবহারে এ একটি কাহার-দর্পণ। যত ভাবে দেখা যায় যত কথা বলা যায় এখানে বলা ও দেখা হয়েছে সেই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের বিষয়ে। তাদের মুখের ভাষা আশ্চর্যরকম নির্ভুল ও আদ্যন্ত কথাপ্রসঙ্গে রক্ষিত।

সুচাঁদের দীর্ঘ কথার মালায় উদাহরণ সর্বাপেক্ষা বেশী মিলবে—পূর্বে একবার আলোচিত কথ্য ভাষার ব্যবহার। আর গভীরে গেলাম না। 'কবি'তে ডোম নিতাই কবির মত বনওয়ারী এবং অন্যদের মুখে কথ্য ভাষার মধ্যে সাধুভাষার চেষ্টা এখানেও পরম উপভোগ্য, যথা 'জেবন' 'বেথা' 'বহন' 'ভোবন' 'ব্যাশ' 'সামিগ্রি' ইত্যাদি। সাধারণ আঞ্চলিক কথার মধ্যে এই ধরনের কথা গেঁথে বাচনভঙ্গি নূতন রকম হয়েছে। ধর্মপরায়ণ চড়কের পাটায় শায়িত বনওয়ারীর সভ্যতা, ধর্ম ও ভব্যতার অনুসরণে উক্ত কথাগুলি চমৎকার শোনায়।

'হাঁসুলী বাঁকে'র বিশেষত্ব, এখানে তারাশঙ্করীয় সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও উপকরণের ব্যবহার হয়েছে। নিষ্ঠুর ও সুন্দর কাব্য, প্রেম, ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রকাশ, আঞ্চলিক ভাষা ও মানুষের নিখুঁত রূপায়ণ, চরিত্রচিত্রণ ও রস পরিবেশন, মধ্যে মধ্যে গ্রথিত, ছড়া, ভাদুগান, ঘেঁটুগান, পাঁচালী, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি উজ্জ্বল করে তুলেছে বক্তব্য। আর ধৃত হয়েছে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও পর্বদিন। কারখানায় গেলে অকল্যাণ সুতরাং তারাশঙ্কর গান বাঁধলেন পাগলের কণ্ঠে :—

"জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।"

তারাশঙ্করের এই উপন্যাসের বিশেষত্ব মূল কাহিনীর গতি ও সমস্যার মধ্যে সমান ভাবে প্রেম দেখা দিয়েছে, যাকে কাহার ভাষায় 'অঙ' অর্থাৎ রং বলে। এতে কেউ লজ্জা পায় না, সমাজ লোকনিন্দা গ্রাহ্য করে না, মনের মানুষের জন্য গৃহকুল ত্যাগ করে। পাখীর রং হয় করালীর সঙ্গে, পাখীর মা বসনের রং ছিল চৌধুরীবাবুর পুত্রের সঙ্গে, বনওয়ারীর পুরাতন রং ধরে কালোশশীর সঙ্গে, সুবাসী করালীর রং বনওয়ারীর বিপত্তি আনে।

"সুবাসী লতার ফুল পরিবে কানে
সুবাস জাগিবে রস বুড়ানো প্রাণে—"

দুইটি অতি নিষ্ঠুর মারামারির চিত্র আছে—সে-ও প্রেমের দায়ে। 'কবি'র দুরন্ত সমাজ-বহির্ভূত প্রেম এখানে কিছু নিরাপদ হলেও আবেগে দুর্দান্ত। দেহাশ্রয়ী, নিষ্ঠাহীন এ সকল প্রেম অবশ্য হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরি উপযুক্ত। তেমনি করেই আঁকা হয়েছে কোথাও চড়া বা স্বাভাবিকের বাইরে নয়। এখানেই বইখানির বিশেষত্ব, কোথাও এর অলীক বস্তু বা অস্বাভাবিকত্ব নেই।

'হাঁসুলী বাঁকে'র স্মৃতি নিয়ে তারাশঙ্কর পরে 'শুকসারী কথা' বলে একখানা উপন্যাস লেখেন (প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৩০)। সীমার গল্পের মধ্যে নসুবালা অনুপ্রবিষ্ট হাঁসুলী বাঁকের ইতিকথা, পালপার্বণ গান নিয়ে। 'পূর্বকথায়' লেখক বলে নিয়েছেন।

আমরা জানতে পারি হাঁসুলী বাঁকে করালী ফেরার উদ্যোগ করলেও (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা —শেষ পৃষ্ঠা), হাঁসুলী বাঁক বাঁশগাছশূন্য পরিত্যক্ত হয়ে এল। চারণ সুচাঁদ মারা গেলে নসুবালা ভাদু নিয়ে চলে আসে গান গেয়ে বেড়ায় পুরনো স্মৃতির। হাঁসুলী বাঁকের বুকে বিস্মৃতির সন্ধ্যা নামে। 'রেবেকা'র নায়িকার মত বলতে ইচ্ছা হয়—"Manderley is no more." "নসুরও পালা শেষ হল"। ('শুকসারী কথা'—শেষ পৃষ্ঠা)

'হাঁসুলী বাঁক' জীবন্ত মানুষে ভরা। রহস্যময় বাঁশবনের ছায়ায় আলো-আঁধারির খেলায় স্রষ্টার মত আমরাও মজ্জমান হয়ে ডুবে যাই কোপাই নদীর বাঁকে—বড় কাছাকাছি চলে যাই বাঁশবাদির কাহারকুলের।

সুচাঁদ বুড়ী হাঁসুলী বাঁকের রূপকথার চারণ। বধিরতা, ব্যাঙ দেখে ভয়, মোটা গলার গালিগালাজ, উপর অঙ্গের বস্ত্র নিঃসঙ্কোচে খুলে রাখা, ছুতো ধরে অনর্গল বিলাপ,—সমস্ত জড়িয়ে যেন কালীঘাটের পটের সমান বর্ণাঢ্য ও প্রাকৃত। আগাগোড়া সুচাঁদের উপস্থিতি, যেন সে গ্রীক কোরাস। নানা মন্তব্যে, সমালোচনায়, কখনও, বা গ্রীস দেশের ডেলফাই অরাকেলের ভবিষ্যৎ-কথনে সুচাঁদ প্রয়োজনীয়। পুরাতন কথার সে ঝুলি, বিধিনিষেধের পাঁতি। সুচাঁদের মুখে সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের মত একই ধারণায় গ্রথিত ; যথা :—

......"কিছুই ছিল না...অন্ধ-কা-র, আঁ-ধা-র, থম্‌থম্ করছে।...আঁধারের মধ্যে শুধু কালারুদ্দের চড়ক ঘুরছিল বন্-বন্, বন্-বন্, বন্-বন্।" (তা র. ৭ম খণ্ড পৃঃ ৩০৮)

তবু হাঁসুলী বাঁকে নায়িকা নির্দেশ করা শক্ত। পাখী, কালোশশী, সুবাসী কাহিনীর বেগ বাড়ালেও নায়িকা নয়। সুচাঁদের মেয়ে ও পাখীর মা বসন্ত, গোপালীবালা, নয়ানের মা প্রয়োজনে উপস্থিত। নসুবালার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বনওয়ারীর শেষ সময়ে সে কাজে লাগে।

'নসুবালা' বিচিত্র সৃষ্টি। সে পুরুষ কিন্তু নারীর সাজ ও আচরণ। করালীর পিসতুতো ভাই নসুরাম। "ভাবেভঙ্গিতে কথাবার্তায় একেবারে মেয়ের মত।" চুল রাখে ও খোঁপা বাঁধে। নাকছাবি, মাকড়ী, কাঁচের চুড়ি, লাল রুলি ও শাড়ী পরে। মেয়েদের সঙ্গে মেয়ের কাজ করে। গান গায়, নাচে—সব চেয়ে বড় নেশা ও ছুটি। ব্রতপার্বণ করে,—মেয়েদের সঙ্গে ভাঁজো ও ঘেঁটুপরবে নাচগান করে। আলতা, রঙীন শাড়ী, সিঁদুর টিপ সহ বিয়ের বাসরে নাচে গায়। নসুবালার ধরনধারণ, কথাবার্তা কৌতুকবহ। 'হিজড়ে' নামক শ্রেণীতেও একে ফেলা চলে না, কারণ এ পুরুষ। 'কল্লোলযুগে' লেখা শৈলজানন্দের একটি গল্পে এমন একটি চরিত্র পেয়েছিলাম।

'হলুদমণি পাখী' কাহিনীর সেরা নায়িকা। রংএর মাতনে সে উগ্র, বেপরোয়া, কিন্তু কোথাও নীচতা দেখা যায় না। হেঁপো, রুগী নয়ানকে ফেলে সে করালীর ঘরে যায়। তাই হয়তো অভিসম্পাত নেমে আসে সুবাসী রূপে। গোরো মেয়ে আগুনের হল্কার মত পাখী করালীর মাথায় কাটারি বসিয়ে গ্রামে চলে এসে আত্মহত্যা করে। মাথায় ফেটাবাঁধা করালী পরদিন আর তাকে এসে পায় না।

কালোশশী ডাকাত পরমের অবহেলায় নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও বনওয়ারীকে সত্যই ভালবাসত।

প্রথমা স্ত্রী গোপালীবালাও বনওয়ারীকে ছেড়ে অন্যের বিবাহ প্রস্তাব নেয়নি।

এই কয়েকটি বিশ্বস্ত নারীর পরে সুবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা কিন্তু অবাস্তব নয়। বনওয়ারী বৃদ্ধ, করালী তরুণ। কাহার সমাজের মেয়ের স্বকীয় চরিত্র 'বেদেনী'র রাধিকার পথ ধরে।

বনওয়ারী 'কোশকেঁধে বাড়ীর ছেলে, বিধাতার মোটা হাতে পাথর কেটে গড়া বনওয়ারী'।

'করালীর দেহে শক্তির শোভা', 'মিষ্টি চেহারা', 'লম্বা দীঘল চেহারা, সরু কোমর, চওড়া বুক' ….।

দুই নায়কের পার্থক্য সর্বদিকে।

করালী তরুণ, সেই যুগের প্রতিনিধি, সে পুরনো ধর্ম, বিধিরীতি গ্রাহ্য করে না। বেপরোয়া সাহসে নিষিদ্ধ পথে পদক্ষেপ করে। বনওয়ারীর সঙ্গে সংঘাত বাধে। অথচ করালী বনওয়ারীকে ভালও বেসেছিল। শেষে সে সুবাসীর রং মনে মেখে বনওয়ারীর সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধে মাতে—কিন্তু পূর্বে আক্রমণ ছিল বনওয়ারীর। নিজেকে বাঁচাতে চেয়ে সংগ্রাম করা ভিন্ন উপায় করালীর ছিল না। তাছাড়া বনওয়ারীর অপমানের সে শোধ নেবে। তবু অজ্ঞান বনওয়ারীর মাথায় লাথি মেরে তাকে ফেলে আসা, সুবাসীকে নিয়ে নেওয়া করালীর তারুণ্যজাত নিষ্ঠুরতা ও জাতিগত আচরণ।

বনওয়ারী সুবাসীর ও করালীর সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবার পরে দেখা যায় তার মমতাহীনতা। প্রৌঢ় বনওয়ারী বৃদ্ধ হয়েছে, শক্তিশালী করালীকে সে সহ্য করতে পারে না, তরুণী ভার্যা ও মাতব্বরী হারাবার শঙ্কায়। সুবাসীর চটুল চরিত্রে আস্থা হারায় সে। দুইটি প্রীতিবদ্ধ পুরুষ শত্রু হয়ে দেখা দেয়। বনওয়ারী তারাশঙ্করের এক শ্রেষ্ঠ চরিত্র। দোষেগুণে, ভালমন্দে সরল-সহজ ধর্মভীরু বনওয়ারীকে পাঠক ভালবাসেন। তার জয় আমরা চাই, পরাজয়ে আমাদের চোখে জল আসে। দৃঢ়, প্রবল শক্তিশালী, কর্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত বনওয়ারী সকলের ভালমন্দ দেখে, খোঁজ নেয়। অবশ্য মনিবের জমি চৌরস করার জন্য অন্য জমি ঈষৎ কেটে নেওয়া, এক-আধটু স্বার্থরক্ষা তাকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে ভালবাসায়। সমগ্র বইখানি বনওয়ারী-কেন্দ্রিক।

বনওয়ারীর মানবিক দুর্বলতার মধ্যে প্রধান দুর্বলতাটি দেখে মিল্টনের স্যামসনের কথা মনে পড়ে। ডেলাইলার রূপে মুগ্ধ স্যামসনের পতন সুবাসীমোহিত বনওয়ারীর পতন। এর চরম মূল্য নিয়ে তবে নিয়তি নিরস্ত। অবশ্য উচ্চকুলের কন্যা, পুত্রলাভ, কালোশশীর স্মৃতি এক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মূল। তবু বনওয়ারী সমস্ত ভুলে যায় সুবাসীর যৌবনমদির শরীরের নেশায়।

পূর্বে কালোশশীর নেশায় ভুলে বনওয়ারীর অপযশ, পরমের হাতে জীবন বিপন্ন, কালোশশীর মৃত্যু—সব ঘটে যায়। দুইবার প্রেমান্ধ পুরুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামে সে! পরস্ত্রী কালোশশীর নেশা সংবরণের চেষ্টা করলেও বনওয়ারী কালোশশীর অহোরাত্র আকর্ষণ এড়াতে পারে না।

দুইবারেই নারীঘটিত দুর্বলতায় বনওয়ারীর প্রমাদ। অতএব সে প্রেমিক পুরুষ। প্রথমা স্ত্রী গোপালীবালাকেও সে নিস্তরঙ্গ প্রেমে ভালবাসে।

করালীর রক্তে বিষ—অবাধ উচ্ছৃঙ্খল তারুণ্যের বিষ। তারাশঙ্কর চরিত্র দুইটিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

যৌবন ও স্থবিরত্বের যুদ্ধ—যৌবনের জয়।

নূতন যুগ ও প্রাচীন যুগের সংঘর্ষ—নূতনের জয়।

শিল্পনির্ভর সভ্যতা ও কৃষিনির্ভর সভ্যতা—কলকারখানার জয়।

ক্রমশ পরিবর্তিত যুগের হাওয়া এই দুইটি প্রতীক বনওয়ারী ও করালীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন

ঔপন্যাসিক। এরূপ সংঘর্ষ তাঁর বহু গ্রন্থে আছে।

হাঁসুলী বাঁককে কি আঞ্চলিক সাহিত্য বলা চলে?

দেখা অঞ্চল নিয়ে নানা দেশে নানা ভাষায় সাহিত্য রচনা হয়েছে। সর্বজনীন আবেদন হেতু তারা আঞ্চলিক নয়।

হাঁসুলী বাঁকও তাই আঞ্চলিক সাহিত্য নয়।

ইতিপূর্বে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলাম, এখানেও সেই জিজ্ঞাসা। 'হাঁসুলী বাঁকে' বনওয়ারীর ধ্বংস কেন? লৌকিক ধর্ম, জাগতিক ন্যায়—বনওয়ারী অধ্যবসায়ের সঙ্গে পদে পদে মেনে চলত। পূর্বেই বলেছি ন্যায় ও করুণা যুক্তি-সূত্রে বাঁধা নয়। একথা তারাশঙ্কর খোলাখুলি স্বীকার করেছেন বলে জানা যায়নি, কিন্তু রচনায় প্রতিফলিত। তবে ধর্মবিশ্বাস, ও আচরণ অভ্যাসগত অনুস্মৃতি মাত্র, কিন্তু পশ্চাতে ফলকামনা হেতু চিন্তনীয়।

অনেক কথা বলা হলেও সমালোচনার বাইরে যে অনির্বচনীয় রসাস্বাদ তা তো খুলে বলা যায় না। স্বল্প পরিসরে সম্ভবও নয়। সুখেদুঃখে, হাসিকান্নায় গাঁথা হাঁসুলী বাঁক—আমাদের কাছে রূপকথার দেশ হয়ে থাক।

পাগল উপকথায় যাত্রার বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পাগলের কথায় বলি :—

হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায়?
কোপাই নদীর জলে—কথা ভেসে যায়।

তারাশঙ্করের কালজয়ী সাহিত্যকে প্রণাম।

॥ ৩ ॥

ডাইনী

'ডাইনী' গল্পটির কথা পূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। অধিক বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নেই।

'ডাইনী' তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

বিভিন্ন দেশেই নারীকে কখনও witch বা ডাইনী বলে চিহ্নিত করার প্রথা আছে। লোকালয়ের বাইরে ঘৃণিত জীবন ডাইনীকে যাপন করতে হয়।

তারাশঙ্করের 'ডাইনী'র বিশেষত্ব লোকাপবাদে সুরধনী বা সরার ভাবান্তর হয়েছে। সে নিজেও নিজেকে অলক্ষণা ডাইনী মনে করে লজ্জায় ধিক্কারে লোকালয়ের বাইরে থেকেছে। ছোট-খাটো ঘটনার ফলে অলীক কুসংস্কারটি সরলা অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটির মনে নির্দয়ভাবে নানাজন গেঁথে দিয়েছে। অতি নিপুণতায় গল্পকার ঘটনাগুলি বিবৃত করেছেন। সে আশ্চর্য চোখদুটি নিয়ে কোন বত্তেচিলির দেখা পেলে সে হতে পারত দ্বিতীয়া মোনালিসা, সেই চোখের দৃষ্টির জন্য তাকে 'ডাইনী' বলা হল।

তবু ভালবাসা পেল, স্বামী পেল সে। কিন্তু স্বামীর গলায় রক্ত উঠে সে মারা গেলে সবাই ভাবল সে-ই বুঝি স্বামী খেয়েছে। সহায়হীন মা-বাপ মরা অনাথা মেয়েটিকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল লজ্জায় গ্লানিতে। আঘাতের পর আঘাতে হয়তো নার্ভগুলো একেবারে গেল। অশিক্ষিতা ডোমকন্যার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের অন্ধকার কোণে বার বার শোনার ফলে নিজের ডাইনী বৃত্তান্তে বিশ্বাস জন্মে গেল। আর কি? গল্পের সবাপেক্ষা কৌশল এখানে।

অনাহারী, অনাথা, সবার খাদ্য দেখলে জিভে জল আসে, নধরকান্তি মানুষ দেখলে অবচেতন মনের বানানো ডাইনী জেগে উঠতে চায়, শিশু দেখলে জড়িয়ে ধরার ব্যাকুলতা দেখা যায়। 'ছাতি-ফাটা মাঠে'র একপ্রান্তে ভিক্ষাজীবিনী নারী চল্লিশ বছর একাকী কাটায়। ভয়ে লোকে আসে না।

অতিভোজনে কারুর ভেদবমি হ'লে তারি দৃষ্টি-দোষ বলা হয়। সেই রুক্ষ-শুষ্ক মাঠে সর্দিগর্মি হ'লে ডাইনীর শোষণকে দোষ দেয় লোকে। এমন কি পায়ে হাড় ফুটে টিটেনাসকেও মানুষের অজ্ঞতা ডাইনীর 'বাণ' বলে।

মানুষের অজ্ঞতা এমনি করেই অনেক যুগ আগে বিদেশের মাটিতে আর একটি নারীকে ডাইনী আখ্যায় দগ্ধ করেছিল—জ্যঁা দ্যার্ক (জোয়ান অফ্ আর্ক)।

মানুষের নিষ্ঠুরতার ইতিহাসের সঙ্গে চৌদ্দ-পনেরো বছরের নিরপরাধ নির্দোষ মেয়েটির নিজের মনে ডাইনীতে রূপান্তরের ক্রমবিকাশ আশ্চর্য সাহিত্যসৃষ্টি। লেখক স্পষ্ট করে কোথাও নিজেকে ব্যাখ্যা করেননি; প্রচ্ছন্নতা, ইঙ্গিত ও আভাসের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ চিত্রখানি তারাশঙ্করের অসাধারণ শক্তির একটি চিহ্ন।

ছোট ছোট চিত্রের মাধ্যমে ডাইনীর মনকে, জীবনকে দেখিয়েছেন শিল্পী তারাশঙ্কর। অসহায় নির্দোষ বৃদ্ধার একা বঞ্চিত ধিকৃত দিনযাপন, অবশেষে আত্মহত্যা, সেন্টিমেন্ট-বর্জিত কারুণ্যের চিত্র। আগাগোড়া মানুষী ডাইনী শেষ সময়েও নিজের সঞ্চয় দিয়ে অন্য প্রেমকে সার্থক করতে চেয়েছিল, মায়ামমতায় সর্বদাই সে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চায়। একদিন ভালবাসা পেয়েছিল সে, অকস্মাৎ একমাত্র আশ্রয় স্বামীর বিয়োগে নিজেকে ডাইনী ভাবার বাধা রইল না। জীর্ণ দেহে ভগ্ন গৃহে সাধারণ মমতাময়ী নারীর জীবনযাপনে কেবলমাত্র জনতার বিষজিহ্বা তাকে ডাইনীর সজ্জা পরিয়েছিল। অবজ্ঞাত ঘৃণিত লাঞ্ছিত এই জীবটির প্রতি স্রষ্টার মমতা নিরাসক্ত-নিষ্ঠুর শিল্পী-সুলভ চাতুর্যে বর্ণিত হলেও অধরা নয়। তাই আমাদেরও মন করুণায় অভিষিক্ত হয়ে যায়।

ছোট ছোট রেখাচিত্রে ডাইনীর বিভিন্ন মেজাজের বর্ণনা অপূর্ব। "বুড়ী দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল।"

"প্রহৃত পশু যেমন মরীয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জন করিয়া উঠে, ঠিক তেমনই ই-ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মত চুলগুলোকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটা মাঠের দিকে নরুণ-চেরা চোখের চিলের মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে লাগিল।"

"একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল, সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটি প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল।"

"মাটিতে হাতের ভর দিয়া কুঁজীর মতো সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল···হাসিয়া সে ডাকিল, বলি, ওহে লাগর, শুনছ?"

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। এই খণ্ডে 'ডাইনী' পড়লেই গল্পকারের আর্ট ধরা যাবে।

যে-কোন সাহিত্যে তারাশঙ্করের এই ছোট গল্পটির তুলনা কমই আছে।

বাণী রায়

সন্দীপন পাঠশালা

সাহিত্যিক অগ্রজ শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

শ্রীচরণেষু

বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য মহাস্থবির, আমাদের স্নেহময় বুড়োদা,

তোমার মত স্নেহময় সত্যকারের দাদা জগতে দুর্লভ। তোমাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
১৫।১।৪৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'সন্দীপন পাঠশালা' ১৩৫২ সালের 'কৃষকে' "উদয়াস্ত" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে নাম পরিবর্তন করলাম। 'সন্দীপন পাঠশালা'ই বইখানির সঙ্গত নাম। বাংলা দেশের শিক্ষক-জীবন অবহেলিত, অনাদৃত। পাঠশালার শিক্ষক বা পণ্ডিতমহাশয়দের তো কথাই নাই। এঁদের সুখ-দুঃখ অবহেলিত, সমাজ-জীবনে সামান্যতম সম্মান থেকেও এঁরা বঞ্চিত। এঁদের নিয়ে দু-চারটি হাস্যরসাত্মক রচনা আমাদের সাহিত্যে আছে—সেইগুলিই এঁদের প্রতি অবহেলার নিদর্শন। সীতারাম আমার কাছে বাস্তব; তার মনের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। তাকে সাহিত্যে রূপদানের বাসনা ছিল, এতদিনে তা সম্ভবপর হওয়ায় আমি নিজে আনন্দিত হয়েছি সবচেয়ে বেশি।

বইখানি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ে অনেক কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করেছি, এবং তাতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
টালাপার্ক, কলিকাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের প্রতিষ্ঠার কামনা যখন অন্ন-বস্ত্রের ভাবনাকে ভুলিয়ে দেয়, তখন তার পথ চলাটা ঠিক আকাশের দিকে মুখ তুলে পথ চলা। অতি বাস্তব মাটির পৃথিবীর বুকের বাধা-বিঘ্নের কথা তখন সে ভুলেই যায়।

একটা গল্প আছে, এক জ্যোতির্বিদ অন্ধকার রাত্রে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে গিয়ে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল; তাকে যে ব্যক্তি উদ্ধার করেছিল, সে তাকে উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে একটি অমূল্য উপদেশও দিয়েছিল। বলেছিল, বাপু হে, মাটির খবর জান আগে, তার পর আকাশের দিকে তাকিও।

এ বিখ্যাত ইংরাজী গল্পটি সীতারাম জানে, বাল্যকালে পড়েছে, মনেও আছে।

সীতারামের বাবা ও-গল্প জানে না, সে ইংরেজী পড়ে নাই, বাংলা লেখাপড়া যাও জানে সেও না-জানারই সামিল, সেও এই কথাই বলে অন্যভাবে। বলে, বাবা, উপরের দিকে তাকিও না। নীচের দিকে চেয়ে দেখো। তোমার চেয়ে কত লোকের অবস্থা ভাল, কত লোক তোমার চেয়ে বেশি মান-সম্মান পায়, সে হিসেব করতে যেও না, অশান্তির আগুন তা হলে আর নিববে না; তার থেকে তোমার চেয়ে কত লোকের অবস্থা খারাপ, তোমার চেয়ে মানে-সম্মানে ছোট কতজন আছে, তারই হিসেব করে দেখ; তা হলে সুখ না হোক, শান্তিতে দিন কাটবে তোমার।

সীতারামদের কুলগুরু বলেন, বাবা, কামনাতে আর আগুনে কোন তফাত নাই। আগুনের শিখার মত কামনার স্বভাবও হল ঊর্ধ্বমুখী। যতই তাকে নীচের দিকে ঘুরিয়ে দাও, সে তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে উপরের দিকে মাথা তুলবে। কিন্তু যখন সে নেভে, তখন জীবনটা হয় পুড়ে-যাওয়া কাঠের মত, ছাই আর কয়লার স্তূপের মত।

কথাগুলি সীতারামের অন্তরও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তবুও সেসব কথা সে আজ কোন মতেই মানতে পারছে না। চাষীর ছেলে কালের রেওয়াজ অনুযায়ী স্থানীয় হাই-স্কুলে পড়তে গিয়েছিল। সেখানে ইংরেজীটা আয়ত্ত করবার শক্তির অভাবে ব্যর্থমনোরথ হয়ে অবশেষে গিয়েছিল হুগলী নর্মাল স্কুলে পড়তে, সেখানেও দু-দুবার ফেল করে মাথা হেঁট করে বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে কখন উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন মনে ধরে গিয়েছে, সে চাকরি করতে চায়। সে চাকুরে বাবু হবে। পণ্ডিত হিসাবে মান্যগণ্য হবে সংসারে। কিন্তু বাপ রমানাথ বললে, না। ও মতলব ছাড় তুমি। আমরা চাষী, ছিষ্টি থেকে পিতিপুরুষের কুলকম্ম হল চাষ। এই চাষ করেই আমরা খেয়ে-পরে ছেলেপুলেকে জমিজমা দিয়ে হরি বলে চোখ বুজে আসছি। সেই সব ছেড়ে তুমি চাকরি খুঁজছ। তাও যদি চাকরির মত চাকরি হত তো বুঝতাম! হায়, হায়রে কপাল! ডান হাতে খুরপি চালিয়ে সে একটি লেবুর চারার গোড়ার ঘাস ছাড়াচ্ছিল, বাঁ হাতে হুঁকো ধরে তামাক খাচ্ছিল; ছেলেকে

কথাগুলি বলবার সময় দুইই বন্ধ ছিল, এখন কথাটা মাঝখানে অসমাপ্ত রেখে সে আবার দুইই আরম্ভ করলে।

সীতারাম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইল।

হঠাৎ আবার হাতের কাজ থামিয়ে রমানাথ মুখ তুলে বললে, কী? বল? 'রবিপ্যায়টা' বল? অর্থাৎ অভিপ্রায়।

সীতারাম এবার বললে, যা হোক একটা চাকরি যখন মিলেছে, তখন আমি দেখব চেষ্টা করে।

রমানাথ আক্ষেপ এবং শ্লেষ দুই মিশিয়ে বললে, কপাল তোমার! চাকরি তো পেটভাতা আর চার টাকা মাইনে। আজ দশ বছর ইস্কুলের মাইনে, বোর্ডিঙের খরচ যুগিয়ে, শেষে চার টাকা মাইনে আর খোরাক, তাও পোশাক নাই। লেখাপড়া না করে যারা চাকর-খানসামার কাজ করে, তারাও যে খোরাক-মাইনের ওপরে পোশাক পায় বাবা!

সীতারাম নীরবে মাথা নীচু করেই বাপের সান্নিধ্য থেকে চলে গেল এবার।

ওই নীরবে ছেলের চলে যাওয়ার মধ্যেই রমানাথ তার জবাব পেলে। সে মৌনভাবে বাপের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে গেল না। ওই কাজই সে করবে। ওই পেটের ভাত আর চার টাকা মাইনেই তার অনেক। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার রমানাথ কাজে লাগল। হঠাৎ তার এতক্ষণে নজর পড়ল, কথা বলার অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন সে চারাগাছটির বেশ একটি মোটা শিকড় কেটে ফেলেছে। হয়তো গাছটা আর বাঁচবে না। রমানাথ তিক্ত হাসি হাসলে, মনে হল, তার জীবনের আশাতরুটিরই মুখটি কেটে ফেলেছে সে।

"মোড়লদাদা রয়েছেন নাকি?"—এসে দাঁড়াল তাদের গ্রামের আট-আনা রকমের জমিদার-বাড়ির পুরানো এবং চাষের তদ্বিরকারক বিশ্বস্ত কর্মচারী কানাই রায়। সাক্ষাৎ কলি এই কানাই রায়টি। নল-দময়ন্তী যখন একখানি কাপড় পরে বনবাসে দিন যাপন করেছিলেন—পরস্পরের থেকে দূরে যাবার যখন উপায় ছিল না—তখন কলি নলের হাতে যুগিয়ে দিয়েছিল ধারালো ছুরি। ঠিক তেমনিকার সাক্ষাৎ কলির মত কানাই রায় সীতার হাতে ওই চাকরিটি তুলে দিয়েছে। এই কানাই রায়ই সীতারামের চাকরি স্থির করেছে। সে-ই তাকে প্রলুব্ধ করেছে। তাকে দেখে রমানাথ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বলে উঠল, আপনি আমার এ শত্রুতা কেনে করছেন, বলুন দেখি?

শত্রুতা!—বিস্মিত হয়ে গেল কানাই রায়।

শত্রুতা বৈকি। রমানাথ বললে, একটি মাত্র সন্তান আমার। মা-মরা ছেলে মানুষ করেছি বুকে করে। নেকাপড়া করে আজ চার বছর কাছছাড়া হয়ে রইল, তাও বলি, ঝক মারুকগে, ছেলে পড়তে চাইছে, পড়ুক। ফেল যে করবে, তা আমি জানতাম। তা বলি,

মিটুক, শখই মিটুক, সে-ই ফেল করে বাড়ি এল। ভেবেছিলাম, যাক, ছেলের সাধ মিটল, এইবার ঘরে এসে বসবে থির হয়ে। আমার ডান হাত হবে, চাষ-বাস দেখবে। বিদ্ধ হয়েছি, কাছে কাছে থাকবে। তা না, এ তুমি তাকে কি বুদ্ধি দিলে বল দেখি ?

রায় এমন অভিযোগ প্রত্যাশা করে নাই। সীতারামকে সে ভালবাসে, সেই প্রীতিবশেই সে তার মনের অভিপ্রায় বুঝে এই ব্যবস্থাটি করে দিয়েছে।

রমানাথ চোখ মুছলে, চোখে তার জল এসেছে, বললে, হঠাৎ যদি মরে যাই, তবে হয়তো পুত্তের আগুনও মুখে জুটবে না।

এবার রায় না হেসে পারলে না। বললে, এই তো আড়াই মাইল পথ গো, এ আবার দূর কি ? সন্ধ্যেবেলায় ছেলেদের পড়িয়ে খেয়ে-দেয়ে তো রোজ বাড়ি আসতে পারবে। আপনার মাথা ধরলে খবর পাঠালে এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি আসবে।

রমানাথ এ কথার জবাব খুঁজে পেলে না। নীরবে মাটির দিকে চেয়ে এক গুচ্ছ ঘাসের গোড়া ধরে টানতে আরম্ভ করে দিল।

রায় তাকে বুঝিয়ে বললে, আপনি অমত করবেন না। সীতারামের এতে ভাল হবে, আপনারও ভাল হবে। আট-আনা রকমের জমিদারের বাড়ির ছেলেদের মাস্টার হবে সীতারাম, তাতে—

রমানাথ তার হাতটা ধরে হঠাৎ বললে, সেরেস্তার কাজকম্ম যাতে শেখে, তাই যেন করে দেবে ভাই।

রায় বললে, তা আর এমন কঠিন কি। সময়-অবসরে যদি সেরেস্তার নায়েবের কাছে বসে, তবে কদিন লাগবে শিখতে। তা বলব আমি রাণীমাকে।

হ্যাঁ। বাবুদের গোমস্তাগিরি যদি পায় আমাদের গেরামের, তবে খাতির বল খাতির, দশ টাকা রোজগার, বাড়িতে থাকা, সবই হবে।

অদৃশ্য বিধাতা হাসলেন, আগুনের ছোঁয়াচে এলেই আগুন ধরে।

ঠিক এই সময় সীতারাম এসে দাঁড়াল।

আমি যাচ্ছি বাবা।

রমানাথ উঠে দাঁড়াল। বললে, 'যাচ্ছি' বলতে নাই, 'আসি' বলতে হয় বাবা। চল, ফোঁটা পুষ্প দি, ঠাকুরদের সব পেরণাম কর। চল।

সীতারাম চলে গেল, রমানাথ উদাস মনে হুঁকো নিয়ে দাওয়ার উপর বসল। তার এই সাজানো চাষকর্মের টাট, পুরুষানুক্রমে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা এই টাট, সেই টাটের দেবতার আজ পূজা বন্ধের সূচনা হল। রমানাথ অনেকটা পাগলের মতই এক-একা বোধ করি নিজেকে শুনিয়েই বলে উঠল—হয়ে গেল, লুটিশ আজ হয়ে গেল। কালপুরুষ এসে

বাঁশগাড়ি করে—এ টাটে শিলমোহর করলেই বাস, সব ফরস্থা! কাল, কাল, কালের গতিক! সেকালের গ্রাম সোনার গ্রাম। আঃ, কি সব সংসার! সোনার সংসার! সে কাল সে গ্রাম চোখের উপর ভাসছে। সেকালের গ্রাম। চোখে জল এল রমানাথের।

সে কালের কথা।

চাষী সদ্‌গোপের গ্রাম।

তের শো সালের চাষীদের গ্রাম। তাদের পাড়ার প্রান্তে বাউরীদের পল্লী। মণ্ডল মহাশয়দের চাষকর্মে তারা কৃষানি মান্দেরি করে, গো-পালনে তাঁদের সাহায্য করে। ভোর রাত্রে কর্তা ওঠার পূর্বেই তারা বাড়িতে এসে হাজির হয়। কর্তা নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারা গরুগুলিকে গোয়াল থেকে বাইরে এনে খেতে দেয়। কর্তা তামাক সেজে তামাক খান, গরুগুলির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন, তিরস্কার করেন, শাসন করেন। আবার রাত্রিতে কাজের শেষ করেন গো-সেবা করে। গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে মশা-মাছি তাড়িয়ে গরুগুলিকে আপন আপন স্থানে বেঁধে দেন। কেউ জায়গা ভুল করলে তিরস্কার করে বলেন—বেকুব-বেহুদ্দ-বদমাশ কোথাকার, নিজের জায়গা চেন না? তার পর তামাক খেতে খেতে স্মরণ করেন দয়াময় হরিকে।

মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাঁশ অথবা কাঠের আটপলা খুঁটি দেওয়া দাওয়া, আলকাতরা মাখানো দরজা, রাঙা মাটিতে নিকানো দেওয়াল; তার উপর খড়ি ও গিরিমাটির আঁকা আল্‌পনা, গোবরে-মাটিতে লেপা মেঝে এবং উঠান, এই নিয়ে তাদের ঘর। কারও কারও ঘর কোঠা অর্থাৎ দোতলা; অধিকাংশই ঘর কোঠা নয় অর্থাৎ একতলা। বাড়ির পাশে খিড়কি ডোবা, ডোবায় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট, সেই ঘাটে বসে চাষীবউয়েরা বাসন মাজে, কলমি-সুষনির দল থেকে শাক তোলে, পুরুষেরা পলুই ফেলে নিত্যকার মাছ সংগ্রহ করে।

ডাবার চারিপাশে সবজির ঘরুটে ক্ষেত, শাকের আড়া, লাউ-কুমড়োর মাচা, তারই মধ্যে-মাঝে জাফরি-ঢাকা দুটি একটি ভাল জাতের আমের চারা, এ ছাড়া পেঁপে গাছ, জবা-করবীর গাছ আছে, ঘন সবুজ ফ্রেমের মত ডোবার জলটুকুকে ঘিরে থাকে। জবা-করবী গাছের ফুল তুলে ওরা নিজেরাই দেবস্থানে দিয়ে আসে, ফল-শাকও দিয়ে আসে, তাতে বিধিনির্দেশে মৃত্তিকা পরিচর্যার জন্য নিয়োজিত ওদের হাত দুখানি ধন্য হয়ে যায়। বাড়ির অন্য দিকে খামার এবং গোয়াল; এই দিকটাই ওদের বাড়ির সদর,—জমিদারের যেমন কাছারি, বাবুলোকের যেমন বৈঠকখানা, ওদের তেমনি খামার গোয়াল। একটা প্রশস্ত চালা, চালার সামনে অনাবৃত খামারে ধান, খড়, মরাই, গোয়ালের ঘরগুলির সামনে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি করে মাটি দিয়ে বাঁধানো ডাবার সামনে গরুগুলি সারি সারি বাঁধা থাকে। প্রশস্ত চালাটার মাথায় মাচায় তোলা থাকে চাষের সামগ্রী—লাঙল, জোয়াল, দুনি, সিনি, দড়ি; এমন কি দুনি ব্যবহারের 'এঁকা কাঠ' এবং লম্বা বাঁশটি পর্যন্ত তোলা থাকে।

সবল পেশীবহুল দেহ ; মাথার চুল কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, তার মাঝখানে টিকি, গলায় তুলসীকাঠের মালা, পুরুষদের পোশাক সাত হাত লম্বা দু হাত চওড়া—তাঁতে বোনা মোটা কাপড়, কাঁধে গামছা ; মেয়েদের পোশাক ন হাত বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ওই তাঁতেরই শাড়ি ; ভোরে উঠে পুরুষেরা যায় মাঠে, মেয়েরা গৃহকর্ম করে, গোসেবা করে, তার পর এক প্রহর বেলার পর রান্না চড়ায়, খাওয়াদাওয়া হতে দু প্রহর গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়, বাবুদের গ্রাম রত্নহাটার ইস্কুলে তখন ঢং ঢং করে টিফিনের পর ইস্কুল বসার ঘণ্টা বাজে। ছেলেরা দশ বারো বৎসর পর্যন্ত গাঁয়ের পুরুতমশায়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শেখে, তার পর পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করে কর্তাদের সঙ্গে চাষের কাজে লাগে। ওরা জীবনে বেশী লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। কি প্রয়োজন? ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, ঘরের দুধ, ঘরের গুড় পরিতৃপ্তিসহকারে পেট পুরে খায়, ভগবানকে স্মরণ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে পরিশ্রম করে, ক্ষেতের ফসল ফুলে ফলে ভরে ওঠে, ওদের জীবনও ভরে ওঠে অপরিসীম আনন্দে। সেই আনন্দে দু হাত তুলে সন্ধ্যায় খোল বাজিয়ে কীর্তনের দল নিয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ে গায়—"ও নামের গুণে গহন বনে মৃততরু মুঞ্জরে। বল মাধাই মধুর স্বরে, হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে।" ওর বেশি ওদের ভাববার প্রয়োজন নাই, ভাবতেও চায় না। সুতরাং বেশী লেখাপড়া হবে কি? কোন রকমে মোটা আঁকাবাঁকা হরফে সই করতে পারলেই হল, দলিলে সাক্ষী হতে হয়, হ্যাণ্ডনোট তমসুক কোবলায় সই করতে হয়, সুতরাং ওটুকু প্রয়োজন। আর দরকার শুভঙ্করীর ধানের হিসাব, মণকষা হিসাব, মণকষা কাঠাকালি—ওগুলো জানতেই হয়। ওরই মধ্যে যারা ভাল লেখাপড়া শেখে, তারা মান্যের ব্যক্তি, জ্ঞানবান লোক। তাদের দাওয়ায় ওরা গিয়ে সন্ধ্যাবেলা বসে, তারা সুর করে রামায়ণ মহাভারত পড়ে, ওরা শোনে। জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা তাদের কাছেই ওরা সংগ্রহ করে।

এর অধিক ওদের জীবনে প্রয়োজন ছিল না। পাপ এবং পুণ্যের একটি সরল সহজ মীমাংসাবোধ ছিল। সেই বোধ অনুযায়ী জীবনসত্যকে গভীরভাবে অনুভব করবার মত অন্তরের পরিসর এবং গভীরতাও ছিল। বাস্তব জীবনেও স্বল্প প্রয়োজন ছিল, অভাবের অশান্তি ছিল না, অন্তরে পরম সত্যকে পাওয়ার বিশ্বাসে ছিল গভীর শান্তি। চাষীর গ্রামখানির শান্ত কোলাহলহীন দিনরাত্রির সঙ্গে ওদের জীবনও চলে যাচ্ছিল প্রসন্নতার মধ্যে।

হঠাৎ দেশে এল এক জোরালো বাতাসের ঝাপ্‌টা। ঝাপ্‌টা ঠিক নয়, ঝাপ্‌টা হলে অল্প কিছুক্ষণ পরেই থেমে যায় ;—এ বাতাস থামল না, উত্তরোত্তর জোর তার বাড়তে লাগল। বর্ষার পশ্চিমে বাতাসের মত।

ভদ্রবাবুদের রত্নহাটা গ্রামে প্রথমে হল মাইনর ইস্কুল। রত্নহাটার ব্রাহ্মণেরা প্রায় সবাই জমিদার। পাখা থাকলেই পক্ষী হয়, দু-চার গণ্ডা জমিদারী স্বত্বের মালিকানায়

সবাই জমিদার। এত কাল দু-আনা ছ'পয়সা বোতল পাকি মদ আর বারো আনায় পাঁঠা কিনে ফিষ্টি এবং ফিষ্টির আসরে ফষ্টিনষ্টি করে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নতুন ঢেউ জাগল, লেখাপড়া শিখবেন। মাইনর পাস করে বাবুদের ছেলেদের কজন সদরে গিয়ে আমমোক্তার হল, সাবরেজেস্ট্রী আপিসে কেরানী হল, আদালতেও চাকরি পেলে, কতক মাইনর পাস করে কীর্নাহারের ইংরাজী ইস্কুলে পাস দিয়ে রেলে চাকরি পেলে —কলকাতায় সরকারী চাকরি পেলে—দারোগা হল, পোস্টমাস্টার হল, দু-একজন কলেজে পড়ে উকিল হল, একজন হল হাকিম। হাওয়া এসে চাষীর গ্রামেও লাগল। তাঁরা ওদিকে মুখ ফেরালেন। সদ্গোপপাড়ার মাতব্বর রঙলাল তার দুই ছেলেকে দিলে মাইনর ইস্কুলে। বড় ছেলে মাইনর পাস করে পাঠশালা খুললে। তার ছোটটিও মাইনর পাস করে পাঠশালার চেষ্টায় ঘুরতে লাগল। তার পরেরটি মাইনর ইস্কুলে পাস করে বৃত্তি পেলে। সেইবারই রত্নহাটায় হল বড় ইংরেজী ইস্কুল। রঙলালের বৃত্তি পাওয়া ছেলেটি বড় ইস্কুলে পড়ে পাস করে গেল কলেজে পড়তে। সঙ্গে সঙ্গে সদ্গোপপাড়ার সকল ছেলেই ভর্তি হল ইস্কুলে। বর্ষা নামল, মনের চাষ শুরু হল, নতুন ফসলের চাষ।

হঠাৎ একদিন সদ্গোপপাড়ায় প্রবীণ মহলও উৎসাহে গৌরবে চঞ্চল হয়ে উঠল। ছেলেরা বিস্ময়কর সংবাদ এনেছে। রত্নহাটার ইস্কুলে এসেছেন এক তরুণ সদ্গোপ শিক্ষক। চেয়ারে বসে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বাবুদের ছেলেদের গুরুগিরি করছেন। সমারোহের আসর বসল। সদ্গোপ মাস্টারটিকে তারা নিমন্ত্রণ করে একদিন নিয়ে এল। আসরে বসে মাস্টার অনেক বিচিত্র কথা বললেন। এমন সময় একটা পরম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। গ্রামের পথে হাজির হলেন রত্নহাটার বাবুদের বাড়ির ছেলেরা। রবিবারের ছুটিতে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা শিকার সেরে ফেরার পথে সদ্গোপ মাস্টারের সামনে পড়ে গেলেন। বাবুদের ছেলেরা শিকারের পথে প্রায়ই যান আসেন এ গ্রামে—দয়া করে মধ্যে মধ্যে তেষ্টা পেলে বাতাসা ও গুড় মুখে দিয়ে জল খান। মণ্ডলেরা হেঁট হয়ে জমিদার ব্রাহ্মণকুমারদের প্রণামও জানায়। আজ আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। সদ্গোপ মাস্টারকে দেখে তারা দাঁড়াল এবং সম্ভ্রমভরে নমস্কার করলে তাঁকে। সদ্গোপ প্রবীণেরা ব্রাহ্মণনন্দনদের প্রণাম জানাতে গিয়ে থমকে গেল সবিস্ময়ে। মাস্টার হেসে বললেন —শিকার?

—হ্যাঁ স্যার।

বলে তারা চলে গেল।

সেই দিনই এ গাঁয়ে দ্বিগুণ বেগে ওই বাতাস বইতে শুরু করল।

রমানাথও তার ছেলে সীতাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে এই উৎসাহে।

আঃ, সেদিন যদি সে বুঝতে পারত! পাঁচ বছর পড়ে সীতারাম থার্ড ক্লাস পর্যন্ত নিয়মিত

উঠে হঠাৎ থমকে গেল। ইংরিজীর বাধায় আর অগ্রসর হতে পারলে না। পর পর দু বছর ফেল হল। দু বছরের পর রমানাথ হঠাৎ একদিন তাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দিলে। কারণ ঘটেছিল। তখন রমানাথ লেখাপড়ার আর একটা দিকের চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এদিকটা তার চোখে পড়ে নি, মনে ওঠে নি; তা হলে সীতাকে সে ইংরাজী ইস্কুলে পড়তে দিত না। ওপাড়ার মহাদেব পালের ছেলে চণ্ডী সীতারামের বয়সী এবং পড়তও সীতারামের সঙ্গে, সে সীতারামকে ছাড়িয়ে আরও এক ক্লাস উপরে উঠে আটকে ছিল। তাকে সেদিন এক হাতে একটি ফুল ঘুরাতে এবং অন্য হাতে জ্বলন্ত বিড়ি নিয়ে গান গাইতে দেখলে সে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের বাইরে একটি গাছতলায় বসে সন্ধ্যার আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে ছোকরা গান গাচ্ছিল, "সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা"। অবাক হয়ে গেল রমানাথ। সীতার প্রমোশনের জন্য ইস্কুলে বড় মাস্টারের কাছেই গিয়েছিল, রমানাথ খারাপ মন নিয়েই ফিরছিল; হঠাৎ চোখে পড়ল এই দৃশ্য। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। পরের দিনই সকালে তার জ্ঞাতিভাইয়ের বাড়িতে গোলমাল শুনে গিয়ে দেখলে, জ্ঞাতি ভাই বল্লভ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, তার ছেলে ঈশ্বর বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়েছে! ঈশ্বরও সীতারামের বয়সী। সে ফিফ্‌থ ক্লাসেই আটকে ছিল আজ কয়েক বৎসর। এবারও ফেল করেছে এবং তাই নিয়ে আগের দিন ঝগড়া করেছিল বাপের সঙ্গে; তার ফলে রাত্রেই কখন বাক্স ভেঙে একমুঠো টাকা—পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন টাকা নিয়ে সে পালিয়েছে।

বল্লভ বললে, ইস্কুলে ছেলে যেন আর পড়িও না কেউ।

রমানাথের ভাল লাগল কথাটা। বাড়ি এসেই সে সীতারামের পড়া ছাড়িয়ে দিলে, আর পড়াতে কাজ নাই।

সীতারাম অবশ্য ওদের মত ছিল না। সে বরাবর মোটা কাপড়-জামাতেই সন্তুষ্ট, জুতোর দরকার তার সেদিনও হয় নাই; মাথায় চুল সে সমান করেই ছাঁটত। কোন নেশাও সে করত না,—রমানাথের হুঁকো-তামাক আজও নড়ে নাই। তবুও সে ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে ওঠে, বললে, আর পড়তে হবে না, চাষবাস দেখ।

সীতারাম চুপ করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন প্রতিবাদ করলে না। দু দিন পর হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে রমানাথ চমকে উঠল। গরমের দিন—সীতারাম দাওয়ায় বেরিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে গুনগুন করে গান গাচ্ছিল। গরমের দিনেও গ্রামাঞ্চলে বাইরে কেউ শোয় না; অল্পবয়সীরা দু-চারজন কর্তাদের লুকিয়ে শুলেও কর্তারা কখনও শোয় না। চোর-ডাকাতের ভয়ে নিষেধ আছে পিতৃপুরুষের। তারা এসে সর্বাগ্রে আয়ত্তের মধ্যে চায় কর্তাকে। অন্য লোককে অল্পস্বল্প নির্যাতন করেই রেহাই দেয় ডাকাতরা, কর্তার রেহাই নাই। সর্বস্ব দিয়েও রেহাই নাই। আর কিছু নাই—এ কথা ডাকাত-চোরে বিশ্বাস করে না; নির্মমভাবে প্রহার

করে; অনেক সময় খুন করে দিয়ে যায়। যাক সে কথা। বাইরের গুনগুন শব্দে ঘুম ভেঙে রমানাথ জানলা দিয়ে দেখলে, সীতারাম বাইরে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে গুনগুন করে গান গাইছে, "আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল—সকলি ফুরায়ে যায় মা"। রমানাথ আরও আশ্চর্য হয়ে গেল, সীতারামের চোখে জল দেখে; চাঁদের আলো তার মুখের উপর পড়েছে, জ্যোৎস্নার ছটায় চোখের কোণ থেকে চিবুকের প্রান্ত পর্যন্ত জলের ধারা দুটি চকচক করছে। বুকটা তার টন টন করে উঠল। সীতারাম তার মায়ের জন্য কাঁদছে। নিজের চোখেও জল এল তার। ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাইরে এসে সে ছেলের মাথাটি নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

কিছুক্ষণ পর তার চমক ভাঙল, চৌকিদারের ডাকে। রাত্রি দুপহর পার হতে চলেছে। ছেলেকে সে বললে, আয়, আমার ঘরে শুবি আয়। চিরদিনই সীতারাম শান্ত বাধ্য। সে প্রতিবাদ করলে না, নিজের ঘরের মাদুর এবং বালিশটা নিয়ে বাপের কাছে এসেই শুলে।

সস্নেহে রমানাথ এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করলে, মাকে তোর স্বপন-টপন দেখেছিলি নাকি?

সীতারাম কোন উত্তর দিল না।

রমানাথ কিছুক্ষণ পর আবার প্রশ্ন করলে, তোর মা কিছু বললে?

সীতারাম তবুও চুপ করে রইল।

রমানাথ বললে, ঘুমো। স্বপন মানুষ দেখে। তার পর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তোকে নিয়েই তো আমার সংসার। তোর মুখের দিকে তাকিয়েই তো আমি চুপ করে থাকি। আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, তুই কাঁদলে আমি বুক বাঁধি কি করে, বল্? সে উঠে এসে ছেলের বিছানার পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ঘুমো।

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল, কিন্তু ঘুম তার এলো না, সে কথা রমানাথের বুঝতে দেরি হল না। সে পাখাটা নিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলে। এবার সীতারাম হাত বাড়িয়ে পাখাটা নিয়ে বললে, না।

রমানাথ পাখাটা দিলে না এবং সীতারামের কথার জবাব পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠল; সেই উৎসাহের মধ্যে হঠাৎ সান্ত্বনার উপায় খুঁজে পেলে, বললে, এই বছরই তোর বিয়ে দোব আমি।

সীতারাম চমকে উঠল, উঠে বসল। বললে, না।

না! রমানাথ আশ্চর্য হয়ে গেল। না—কি? বিয়ে করবি না? একি অসম্ভব কথা!

না। আমি পড়ব।

পড়বি? রমানাথ স্থির দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে রইল অন্ধকারের মধ্যেই। এতক্ষণে

সব তার কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল। 'সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল'—হরি হরি, পড়ার সাধ-আশা! রমানাথ উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল, বলল, বেশ তাই পড়বি। এখন ঘুমো। মিটবে তোর সাধ-আশা!

সীতারাম বললে, আমি হুগলীতে নর্মাল পড়ব।

হুগলীতে? চমকে উঠল রমানাথ। হুগলী যে অনেক দূর! তা ছাড়া এখানে পড়া ঘরের ভাত খেয়ে হয়, সেখানে খরচ।

মাসে বারোটা টাকা হলেই হবে আমার।

রমানাথ জবাব দিল না। পাশ ফিরে শুল।

পরদিন রমানাথ সকালে উঠেই রান্না চড়ালে। সীতারাম উঠতেই বললে, ভাত নামিয়ে নিস। আমি মাঠে চললাম। খেয়ে তুই তাই ইস্কুলেই যাস। এই ভাবেই তার বিপত্নীক সংসার চলে আসছিল। সে ডাল নামিয়ে একটা তরকারি রান্না করে ভাত চাপিয়ে দিয়ে মাঠে চলে যেত, সীতা পড়ত, পড়ার মধ্যেই ভাতটা নামিয়ে ফেলত। বাপের জন্য ঢেকে রেখে নিজে খেয়ে জ্যাঠার বাড়ি চাবি রেখে ইস্কুলে যেত। ফিরত বেলা পাঁচটায়। রত্নহাটা আড়াই মাইল পথ। সেদিন অপরাহ্ণে সীতারাম ফিরল ছটায়। রমানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল; সকল ছেলে ফিরল, সীতা ফিরল না, তার ভয় হল; সর্বাগ্রে সে বাক্স-প্যাটরা দেখলে। বাক্স ভেঙে টাকাকড়ি নিয়ে বল্লভদাদার ছেলে ঈশ্বরার মত পালাল না তো? না, বাক্স-প্যাটরা ঠিক আছে। কিন্তু তবুও মন মানল না। ঈশ্বরার মত বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে না পালাক, এমনই এক-কাপড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে তো পারে! কাল রাত্রেই তো সে কাঁদছিল আর গাইছিল—'সাধ না মিটিল'। রমানাথ গ্রামের বাইরে পথের উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সীতা ফিরল, তার সঙ্গে রত্নহাটারই সেই সদ্‌গোপ পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত বললেন, মণ্ডল মশাই, সীতারাম আমাকে ধরেছে, ও নর্মাল ইস্কুলে পড়বে। আপনার মত আমাকে করিয়ে দিতে হবে।

রমানাথ কি বলবে খুঁজে পেলে না।

পণ্ডিত বললেন, ইংরিজী ও ভাল পারে না, তাই এখানে ফেল হচ্ছে, নর্মাল পড়লে ওর ভাল হবে।

রমানাথ এবার বললে, সে তো হুগলীতে পড়তে যেতে হবে।

হ্যাঁ, এই হুগলীতে। আজ চিঠি দিলে কাল চিঠি যায়। সকালে চড়লে বেলা বারোটায় পৌঁছানো যায়, এ আর দূর কি?

রমানাথ চুপ করে রইল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সীতা দাওয়ার এক কোণে বসে কাঁদছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বেশ, তাই হবে।

রমানাথ তাই করলে। এক মুখ হাসি নিয়ে সীতারাম বাপের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে

হুগলী যাত্রা করলে।

পণ্ডিত মশাইটিও হেসে বললেন, সীতারাম আপনার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। চন্দ্রসূর্যের মত পারবে না—তবে মাটির প্রদীপের মত পারবে।

রমানাথ শুষ্ক হাসি হাসলে, কোন জবাব দিলে না। নীরবে ছেলেকে রত্নহাটা স্টেশনের একধারে ডেকে নিয়ে বললে, একটি কথা কিন্তু আমাকে দিতে হবে। এইবার তোমার বিয়ে দোব আমি। 'না' বললে হবে না।

সীতারাম মাথা নীচু করে বললে, বেশ।

নর্মাল ইস্কুলে পড়ার প্রথম বৎসরেই তার বিয়ে দিলে রমানাথ, বউটির নাম মনোরমা, সীতারামেরও তাকে ভাল লাগল। এই তিন বৎসরের মধ্যে ছুটিতে যতবার বাড়ি এসেছে, ততবারই কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে সীতারাম। রমানাথই তাকে পাঠাত। বিয়ের সময় মনোরমা ছিল বারো বছরের ছোটখাটো মেয়েটি। তখন তার সঙ্গে কথা বলতে সীতারামের অনেক সময় হাসি পেত। বিয়ের পর গরমের ছুটিতে সীতারাম প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি গেল, সঙ্গে নিয়েছিল একখানা পাঠ্য বই—মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। গরমের দিন খাওয়ার পর শাশুড়ী তাকে তাদের নতুন মাটির কোঠাঘরের সিঁড়ির দরজা দেখিয়ে বললেন, উপরে গিয়ে শোওগে বাবা, বিছানা করা আছে। তোমার জিনিসপত্র সব উপরেই রেখে দিয়েছি।

সীতারাম উপরে এসে ঘরের দরজা খুলে দেখলে, মনোরমা আগেই এসে বসে আছে, তার বইখানা খুলে পড়ছে। সীতারাম পুলকিত হয়ে উঠল। মনোরমা লেখাপড়া জানে! দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে সীতারাম এসে বসল মনোরমার পাশে। মনোরমা তখন অবশ্য একহাত ঘোমটা টেনে সরে বসেছে বইয়ের কাছ থেকে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রথম আলাপ। প্রথা অনুযায়ী জোর করেই তার ঘোমটা খুলতে হবে, সাধ্যসাধনা করে তাকে কথা বলাতে হবে। সাধ্যসাধনাতেও কথা না বললে স্বামীকে অভিমান করতে হবে।—বেশ, আমার সঙ্গে কথা বলবে কেন, বল? আমি তোমার কে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে হবে, কালই চলে যাব আমি। সীতারামকে এতটার কিছুই করতে হয় নাই, ঘোমটা খুলে দিতেই মনোরমা ফিক করে হেসে ফেলেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে শুরু করলে।

সীতারাম হঠাৎ বইখানা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করলে, কোন্‌খানটা পড়ছিলে? কেমন লাগল?

মনোরমা ঠোঁটের ভঙ্গীতে ভাল না লাগার ভাব ফুটিয়ে তুলে ঘাড় নেড়ে বললে, ছাই বই তোমার। একটাও ছবি নাই।

সীতারাম বললে, তুমি একটা পাগলী। পড়ে বুঝতে পারলে না, এ হল মহাকাব্য।

এতে কি ছবি থাকে?

শব্দটার ধ্বনিতে বিস্মিত হল মনোরমা, মহাকাব্যের—মহা শব্দের গাম্ভীর্য এবং গুরুত্বটা ধ্বনির প্রভাবে ওর মনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললে, মহাকাব্য! তার পর অপরাধবোধে লজ্জিতের মত বললে, কে জানে! আমি তো পড়তে জানি না। আমি ছবি দেখতে গেলাম। পাঁজিতে কত ছবি থাকে। দাদার ইস্কুলের বইয়ে কত ছবি আছে। একটা বাঘ আছে খুব ভাল।

হাসলে সীতারাম। বললে, আচ্ছা শোন। সে পড়তে আরম্ভ করলে—

"সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে—
অকালে। কহ, হে দেবী অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
রাঘবারি?"

বুঝলে? রামায়ণের ব্যাপার। লঙ্কার যুদ্ধে রাবণের বীরপুত্র বীরবাহু মারা পড়েছেন। রাম তাকে বধ করেছে। তার পর থেকে আরম্ভ হচ্ছে আর কি।

বালিশে মাথা রেখে মনোরমা তখন শুয়েছে। সে বললে, হুঁ।

তাই কবি মা-সরস্বতীকে বলছেন আর কি। সে আরম্ভ করলে। একেবারে পড়ে গেল—"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" পর্যন্ত। তার পর সে থামলে। বললে, এইবার আরম্ভ হল। রাবণ সিংহাসনে বসে আছেন, বুঝেছ?

মনোরমার সাড়া পাওয়া গেল না। সীতারাম একটু ঝুঁকে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, মনোরমা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন।

সন্ধ্যেবেলা মনোরমা বললে, ওসব পড়লে কিন্তু ভাল হবে না বাপু। গান গাইতে পার তো একটি গান গাও, সবচেয়ে ভাল বলব যদি একটি গল্প বল—ভূতের গল্প।

তিন বৎসর এমনিই কেটেছে। এর পর শেষ পরীক্ষায় সীতারাম ফেল হয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার আগে আর শ্বশুরবাড়িই গেল না। মনোরমার কথাও সে এক রকম ভাবলে না। প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সে শুধু পড়লে, পড়লে আর পড়লে। পরীক্ষা শেষ করে তার পর মনে হল মনোরমার কথা। শীতের শেষে রিক্তপত্র রক্তকাঞ্চনের গাছ অকস্মাৎ যেমন একদিন ফুলে ভরে উঠে, তেমনই ভাবেই মন সেদিন মনোরমার চিন্তায় ভরে উঠল। পরীক্ষা শেষ করে মেসে যখন ফিরল, তখনও তার মনোরমার কথা মনে হয় নাই, তখনও কে কেমন লিখেছে সেই নিয়ে আলোচনা চলছিল। তার পর এল জিনিস গুছিয়ে নেবার পালা। এই সময়ে মনে হল একবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাবাকে। বাড়ি যেতে হবে আগে।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই স্বপ্ন দেখলে বাবাকে নয়, মনোরমাকে। সকালবেলায় তার মন মনোরমার জন্যই আকুল হয়ে উঠল। সে বাড়ি না এসে উঠল শ্বশুরবাড়িতে। এক বৎসর—প্রায় এক বৎসর সে মনোরমাকে দেখে নাই; সে তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। মনোরমা মাথায় বেড়েছে, যৌবন-উচ্ছ্বাসে সর্বাঙ্গ ভরে উঠেছে ভরা নদীর মত। বাড়িতে ঢুকে অবগুণ্ঠনবতী মনোরমাকে সে চিনতে পর্যন্ত পারলে না; অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করে মনোরমা তার দিকে তাকালে, সীতারাম তবু চিনতে পারলে না। মনে হল চেনা কিন্তু ঠিক মনে পড়ে না। মনোরমা ঈষৎ হাসলে, সম্বর্ধনা জানালে। এবার চিনলে সীতারাম। বিস্ময়ে-আনন্দে সে আকুল হয়ে উঠল। ঘরে নির্জনে দেখা হল। নিজে এগিয়ে এসে দুটি হাত দিয়ে সে সীতারামের কণ্ঠ বেষ্টন করে কাঁধের উপর মুখ রাখলে। জিজ্ঞাসা করলে, এবার ঠিক পাস করবে তো?

মনোরমার কথার জবাব দিতে গিয়ে সীতারাম হঠাৎ তার উত্তরপত্র সম্বন্ধে কেমন সন্দিহান হয়ে উঠল। এই প্রথম তার মনে হল, হয়তো পরীক্ষা তার ভাল হয় নাই। বললে, চেষ্টার তো কসুর করি নাই।

মনোরমা বললে, এবার তুমি নিশ্চয় পাস হবে।

যদি না হই?

হবে না? কেনে? এত পড়লে?

পড়া ছাড়া অদৃষ্ট বলে একটা জিনিস তো আছে।

তা আছে।

তবে?

হেসে মনোরমা বললে, তা হয়তো হবে। অদৃষ্ট!

অদৃষ্টই বটে। সীতারাম এবারও আবার ফেল হল; ব্যর্থতার সংবাদ এল চিঠিতে। তখন সে বাড়িতে।

পরীক্ষায় ব্যর্থতার খবর সীতারাম মাথা হেঁট করেই গ্রহণ করলে। আর সে কাঁদলে না। রমানাথ গোপনে কাঁদলে। ছেলের পড়াশুনার জন্য খুব বেশী কামনা তার ছিল না, তবে সীতা পড়ে-শুনে একজন খুব পণ্ডিত লোক হোক, এমন কল্পনা করতে তার অবশ্যই ভাল লাগত, এই পর্যন্ত। রঙলাল মণ্ডলের সেজো ছেলে বি. এ. পাস করে এম এ. পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওকালতিও পড়ছে। তাকে ভাগ্যবান বলেই মানতে হয়, ওই ছেলেটিকে—কিশোরকৃষ্ণকে দেখে দশের সঙ্গে তারও মন খুশিতে ভরে ওঠে। বাইরের দশজনের কাছে কিশোর তার গ্রাম-সম্পর্কে ভাইপো—এ অহঙ্কার করতেও ইচ্ছে হয়; সঙ্গে সঙ্গে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবত, সীতা যদি নর্মাল না পড়ে এখানকার পাস দিয়ে অন্তত একজন মোক্তারও হত, তবে ভাল হত। এ সবই সত্য, তবুও তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে এ নিয়ে একটা অনির্বাণ দাহময় আকাঙ্ক্ষা

তার ছিল না। শান্ত সরল মানুষ রমানাথ। বিপত্নীক হয়ে ওই সীতারামের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশেই সে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নাই। বিবাহের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হত, সে তো এ বাড়িতে তার সীতারামের মা হয়ে আসবে না, সৎমা হয়ে আসবে। অন্তরে অন্তরে সে তার অকল্যাণ কামনা করবে। সভয়ে শিউরে উঠে সে বিবাহের কল্পনা মন থেকে মুছে ফেলত। বুকে করে সীতাকে সে মানুষ করেছে; সীতা তার কাছে অহরহ চোখের সম্মুখে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে, এইটাই তার সবচেয়ে বড় কামনা। তাই লেখাপড়া শিখে সীতা চাকরি করতে বিদেশে যাবে, এই কাল্পনিক বিরহের আশঙ্কায় তার লেখাপড়ার সার্থকতার কল্পনাটা বরাবরই খাটো হয়ে এসেছে। সীতা কতবার বলত, নর্মাল পাস করে কাব্যতীর্থটা যদি পাস করতে পারি, তবে হাই ইস্কুলে হেডপণ্ডিতের চাকরি একটা পাবই।

রমানাথ নীরবে পুড়ুৎ পুড়ুৎ শব্দে নিজের হুঁকোটিতে টান দিয়েই যেত।

প্রসঙ্গক্রমে সীতারাম তুলত চাকরিস্থানে বাসার কথা। বলত ছোটখাটো বাসা করা যাবে। আপনি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত, দু বেলা দুটো ছেলে পড়ালে আরও বিশ-পঁচিশ টাকা আসবে। আপনি সংসার দেখবেন, আমার ভাবনা কি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমানাথ বলত, বাড়ি ছেড়ে কি আমার যাওয়া চলে বাবা? জমি-জেরাৎ, গরু-বাছুর, ধান-পান, চাষ-বাস, নবান্ন-লক্ষ্মী—

সীতারাম এ সমস্যার সমাধান করে দিত অতি সহজে। কেন? জমি-জেরাৎ ভাগে দেবেন, গরু-বাছুর পালনে দেবেন, ধান-পান বছরে একবার এসে বেচে দিয়ে গেলেই হবে। নবান্ন-লক্ষ্মী সে আমরা যেখানে থাকব, সেখানেই হবে।

রমানাথ ঘাড় নাড়ত, না না না। তা হবে না। ভিটেতে দুবেলা সন্ধ্যে পড়বে না! তা ছাড়া—। একটু চুপ করে রমানাথ মনে মনে ভাবত, তার পর বলত, বাবা, আমার জমি অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতে সোনাফলানো জমি হয়েছে। ডাকলে রা কাড়ে। উঁহু। আবার একটু চুপ করে থেকে বলত, তুই বরং বউমাকে নিয়ে বাসা করবি। আমি কালে-ভদ্রে যাব, দেখে আসব। সীতারাম চুপ করে থাকত এর পর। তার পর বলত, তা হলে বাড়িতেই সব থাকবে। আমি আসব ছুটি-ছাটায়। আপনি না গেলে বাসা করে কি করব?

রমানাথের চোখে জল আসত, সে একটু বেশী জোরে টান দিত হুঁকোয়। তামাকের ধোঁয়ায় আপনার মুখের সামনে ধূম্রজালের সৃষ্টি করত।

সীতারাম আবার বলত, রত্নহাটায় যদি কাজ পাই, তবে তো কোন কথাই নাই। বাড়ির খেয়েই চলবে। যেমন খেয়ে-দেয়ে ইস্কুলে পড়তে যেতাম, তেমনই চলবে আপনার।

রমানাথ হেসে বলত, এখানকার ইস্কুলে কাজ দেবে না বাবা। দেবেও না, আর

নেওয়াও, ইয়ে কি বলে, মানে, ঠিক হবে না। রত্নহাটার বাবুরা আমাদিগে 'চাষা' বলে। উঁহু—না না, না। তার চেয়ে বিদেশ-বিভূঁয়ে ভাল।

হঠাৎ সব কল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে ডাকে চিঠি এল—সীতারাম এবারও ফেল হয়েছে।

রত্নহাটার ডাকঘর থেকে সীতারাম নিজেই চিঠি নিয়ে এল। মাথা হেঁট করে নিজেই বললে, এবারও পাস করতে পারি নাই বাবা।

তার শুকনো চোখ দেখে রমানাথ নিজের চোখের জল সম্বরণ করলে, নইলে তার চোখেও জল এসেছিল।

দিন তিনেক পরে রমানাথ বললে, সীতা বাবা, ঘরে বসে চাষ-বাস দেখ্‌। বউমাকেও নিয়ে আসি। তুই বাড়িতে না থাকলে তারও এখানে মন টেকে না। এক মাস দু মাস না যেতেই বাপের বাড়িতে যেতে চায়। বাপের বাড়িতে রাখাও আর তাকে ভাল দেখায় না।

সীতারাম অভ্যাসমত একটু চুপ করে থেকে বললে, যা আপনার ইচ্ছা হয় করুন। দিন দেখে একটা চিঠি লিখে দিন।

রমানাথ বললে, যা আমার আছে, তাতে তো তোর কিছু অভাব হবে না। পড়া তোর ভাগ্যে নাই; নইলে চেষ্টার তো কসুর করিস নাই তুই, আমি তো জানি। আর একবার না হয়—। রমানাথ কথাটা শেষ করতে সাহস পেল না।

সীতারাম বললে, নাঃ, আর পড়ব না।

রমানাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হেসে বললে, মুখ্যু তো বলতে পারবে না কেউ তোকে।

সীতারাম হাসলে। বাবার এ সান্ত্বনায় তার চোখ ফেটে জল এল, তাই সে হাসি দিয়ে সেটাকে ঢাকতে চেষ্টা করলে। পরমুহূর্তে সে উঠে চলে গেল।

বউটিকে এখানে আনবার দিন হয়েছে এই মাসের পঁচিশে। রমানাথ নিজেই গিয়ে নিয়ে আসবে। সীতানাথ যেতে সঙ্কোচ বোধ করবে—এ কথাটা মনে বুঝে রমানাথ নিজেই বলেছে, বুঝলি, আমিই যাব বউমাকে আনতে। অনেকদিন বেয়াই মশায়ের সঙ্গে দেখা হয় নাই, তা ছাড়া বেয়াইবাড়ির বেয়ানের রান্না ভালটা-মন্দটা খেয়ে আসব; কাছেই দু কোশ দূরে মা গঙ্গা—একবার চানও হবে। তোকে কিন্তু বাপু কটি কাজের ভার দিয়ে যাব, সেগুলি যেন করে রাখিস। কাজ—তক্তাপোশ মেরামত, প্রতিবেশীর বাড়িতে দুখানা নতুন কাঁথা তৈরি করানো, ঘর-দুয়ার একবার খড়িমাটি দিয়ে নিকোনো। আরও কয়েকটি এমনিধারা ছোটখাটো কাজ। বেয়াই-বাড়ি রওনা হবার আগে নিজেই সব শেষ করবার জন্যও রমানাথ চেষ্টা করবে, তবে যদিই না হয়, সেগুলোর ভার নিতে হবে সীতারামকে।

রমানাথ সেই সব কাজেই ব্যস্ত ছিল—ব্যস্ত কথাটায় ঠিক ব্যক্ত হবে না, সে প্রায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। রমানাথের কত সাধের সংসার, সেই সংসারে লক্ষ্মী আসবে। সীতারাম সংসারী হবে।

সীতারাম চুপ করে বসে দেখত সব। প্রাণপণে ভাল লাগাবার চেষ্টা করত। ব্যর্থতার দুঃখ ভুলতে চাইত। মনোরমাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করত এই পরিমার্জিত ঘরকন্নার মাঝখানে। পুলকিত হতে ইচ্ছা হত। কিন্তু সে ইচ্ছা মনে উঠেই যেন মিলিয়ে যেত। কেউ যেন চাবুক মারত সঙ্গে সঙ্গে।

বিবাহের পর প্রথম পরিচয় থেকেই সে মনোরমাকে জানিয়ে এসেছে, সে লেখাপড়া শিখছে, সে পণ্ডিত হবে, সে সদ্‌গোপ হয়েও চাষী হবে না। কি করে, কোন্ মুখে সে দাঁড়াবে মনোরমার সামনে?

তা ছাড়া কামনার আগুন অহরহ জ্বলে তাকে অস্থির করে তুললে। যে কামনার পথ রুদ্ধ হওয়ায় একদিন রাত্রে সে 'সাধ না মিটিল আশা না পুরিল' গান গেয়েছিল, যে কামনার অস্থিরতায় সে হুগলী পড়তে গিয়েছিল, সেই কামনার অস্থিরতা। শেষে সে সেই চাষীতে পরিণত হবে? আগুন জ্বলেছে সেই কবে, তখন বুঝা যায় নাই। আজ আর সে নিভবে না।

এই গ্রামে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে জমিদারের নায়েব একদিন বলেছিল অনেকদিন আগে, তার স্পষ্ট মনে আছে, বলেছিল, চাষাসে বিনা দাতা নেহি, বিনা জুতাসে দেতা নেহি। বাবুরা বলে—চাষা!

সীতানাথ আবার উঠে দাঁড়াল শক্ত পায়ের উপর ভর দিয়ে। বাপ্‌কে না বলেই চারিদিকে খুঁজতে আরম্ভ করলে শিক্ষকতার কাজ। নর্মাল পাস করেও সে যা করত, তাইই করবে।

তার পর সে রমানাথের কাছে নিয়ে এল এক অদ্ভুত প্রস্তাব। রত্নহাটায় তাদেরই গ্রামে আট-আনা রকমের জমিদারের বাড়িতে দুটি ছেলেকে পড়াবার জন্য গৃহ-শিক্ষকের প্রয়োজন; দু বেলা খাওয়া আর বেতন চার টাকা। সীতারাম কদিন ধরে চারিদিক ঘুরেছে। একদিন গিয়েছিল বিপ্রহাট। বিপ্রহাট এখান থেকে চার মাইল দক্ষিণে। সেখানে একটা মাইনর ইস্কুল আছে। দিন দুই গিয়েছিল অভয়াপুর। রত্নহাটা তাদের গ্রামে থেকে আড়াই মাইল উত্তরে, রত্নহাটার আরও সাত মাইল উত্তরে অভয়াপুর, অভয়াপুরেও একটা মাইনর ইস্কুল আছে। কিন্তু কোথাও কিছু হল না, সীতারাম শুকনো মুখেই বাড়ি ফিরছিল, হঠাৎ দেখা হল জমিদার-বাড়ির চাষ-সরকার কানাই রায়ের সঙ্গে। কানাই রায় সমস্ত শুনে প্রস্তাব করলে, আমাদের বাড়িতে ছোট দুটি বাবুকে পড়াবার পণ্ডিত চাই। পড়াবে? সীতারাম দ্বিধা করলে না, সম্মত হল। দুটি ছেলেকে পড়াতে হবে, দু বেলা খাওয়া আর চার টাকা বেতন। রমানাথ জানে, ওই চার টাকা বেতনও সে নিয়মিত পাবে না, হয়তো পুরোও পাবে না। জমিদার-বাড়ি প্রজার ছেলের কাছে বিদ্যে সেলামী নিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। তবে মানবে না সীতারাম। সে দু বেলা ছেলেদের পড়াবে, আর দশটা থেকে চারটে বাবুদের

ঠাকুরবাড়িতে ছোট ছেলেদের জন্যে একটা লোয়ার প্রাইমারী পাঠশালা খুলবে, মাইনে ছেলে-পিছু চার আনা। তাতেই বা ক'টাকা হবে? আর জমিদারবাবুদের বাড়ির ছেলেরা—এই চাষীরা গাঁয়ের ছেলেকেই কি তারা মাস্টার পণ্ডিত বলে খাতির করবে?

সীতারামই জানে।

রমানাথ বলেছিল, পাঠশালাই যদি করবি তো গেরামেই কর্ না কেন?

সীতা বলেছে, জেঠার ছেলে জাঠতুত ভাই বড় দাদা, গোবিন্দদাদা—সে পাঠশালা করছে, আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করব?

রমানাথ এ কথার জবাব দিতে পারলে না। কিন্তু পেটভাতা আর চার টাকা মাইনের পণ্ডিতি করে হবে কি?—এ কথার জবাবও সীতারামও দিতে পারলে না। না পারুক, জবাব হয়তো নাই, তবু—

তবু সীতারাম কিছুতেই মানবে না। তার চোখের উপর ভাসছে একদিনের ছবি। রত্নহাটার বাবুদের ছেলেরা এই গ্রামের সদ্গোপ শিক্ষককে নমস্কার করেছিল। আগুন সেইদিন জ্বলেছে।

শেষ পর্যন্ত খেয়ে-দেয়ে রোজ বাড়ি আসবে এবং জমিদার সেরেস্তার কাজ শেখার ব্যবস্থা হবে—কানাই রায় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় রমানাথ আর আপত্তি করলে না।

একখানি রামায়ণ, কৃষ্ণের শতনাম, লক্ষ্মীর পাঁচালী, এই নিয়ে একটি দপ্তর রমানাথ ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে দিলে। তুলসীতলার মৃত্তিকা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ফোঁটা দিল কপালে। তার পর মাথায় হাত দিয়ে একশো আটবার কৃষ্ণনাম জপ করে সর্বাঙ্গে তিনবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ভগবানের নাম করে যাত্রা কর বাবা। পাপ কিছু করো না, উঁচু দিকে চেয়ো না। বলতে গিয়ে ঠোঁট তার কাঁপতে লাগল। চোখের কোণে দু ফোঁটা জলও এসেছে।

সীতারাম প্রণাম করলে।

আবার একবার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে রমানাথ বলল, রোজ রাত্তিরে বাড়ি আসবে। লণ্ঠন নিয়ে আসবে, আর একটি লাঠি।—বলে সে নিজের যৌবনের সহচর—বাঁশের লাঠিগাছটি ছেলের হাতে তুলে দিলে। সাপখোপ শেয়াল-নেকড়ে দুষ্টু বদমাশ এতেই ঠেকিয়ো।

সীতারাম যাত্রা করলে। গ্রাম পার হয়ে মাঠ, মাঠের ওপারেই রত্নহাটার দালানকোঠা দেখা যায়। বড়লোকের গ্রাম। শিক্ষায়-দীক্ষায় সভ্যতায় বাবুরা বিশিষ্ট। সীতারাম বাল্যকালে ওই ইস্কুলে পড়েছে। তারপরও বহুবার গিয়েছে। তবুও এই গ্রামের বিচিত্র লোকগুলিকে দেখে বিস্ময় তার কাটে নাই, শুধু বিস্ময় নয়, খানিকটা ভয়ও যেন হয়, ভয়ও শুধু নয়, ওদের প্রতি ক্ষোভও আছে। বাবুরা তাদের ঘৃণা করে, সে কথা তারা প্রকাশ করে অসঙ্কোচে।

বলে চাষা। অসঙ্কোচে বলে, তোমরা তো জাতে চাষা। বুকটা আপনিই পাক খেয়ে ওঠে।

কিন্তু তার অন্তরের ক্ষোভ সে প্রকাশ করতে পারে না। তাদেরই মধ্যে সে চলল। সেইখানে থাকতে হবে তাকে।

ভয় সে করে না। কিসের ভয়, কেন ভয়? অন্যায় সে করবে না, কারও অন্যায় সহ্যও সে করবে না! তবুও যেন কেমন মনে হচ্ছে।

স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে সে মাঠের পথে এগিয়ে চলল রত্নহাটার দিকে।

দুই

মস্ত বড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আধা শহর। সে দু দিকেই—ভিতর এবং বাহির দু দিকের রূপেই। সীতারামের জাঠতুত ভাই কিশোরকৃষ্ণ এম. এ. পড়ে। রত্নহাটার কথা উঠলেই সে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলে, রত্নহাটার তুলনা হয় একমাত্র পাড়াগাঁয়ের কলকাত্তাই কলেজী ছেলের সঙ্গে—অবশ্য নেহাত হালী নয়, আবার একেবারে পাকাও নয়, এই ফার্স্ট ইয়ার পার হয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে আর কি। বাড়ির অবস্থা ভাল, নিয়মিত টাকা আসে, পনেরো দিন অন্তর চুল কাটে, এক দিন অন্তর কামায়, কিন্তু সেলুনে এখনও ঢুকতে পারে না। রেস্তোরাঁয় চা টোস্ট মামলেট খায়, কিন্তু ফারপো কি অন্য সাহেবী হোটেলে যায় না, ভয়ও করে, রুচিতেও বাধে; কবিতা লেখে না, কাব্যচর্চা করে, ইউরোপীয় লেখকদের এবং বইগুলোর নাম মুখস্থ করেছে, কিন্তু বইগুলো পড়ে নি, শক্ত ঠেকে; রাজনীতি কপচায়, বন্দেমাতরম্ থেকে ইনক্লাব পর্যন্ত বুলি সবই আওড়ায়। কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাঙ্গামায় থাকে দলের পিছনে, সঙ্গেও থাকে, কিন্তু স্ট্রাইক হলে কলেজে আসে চুপি চুপি। পোশাক ফ্যাশন-দুরস্ত, কিন্তু ইস্ত্রী খারাপ।

কিশোরকৃষ্ণ নিজে গোঁড়া হিন্দু, মস্ত টিকি রাখে। সুতরাং কথাগুলি মুখে শোনায় ভাল।

ধর না, সাবরেজেস্ট্রী আপিস, পোস্ট-আপিস, থানা আছে, এমন কি একজন সার্কেল ডেপুটি পর্যন্ত এখানে তাঁর হেডকোয়ার্টার করেছেন। স্কুল, বোর্ডিং, গার্লস ইউ. পি. স্কুল আছে, লাইব্রেরি আছে, অ্যামেচার থিয়েটার আছে, মহিলা-সমিতি আছে, এমন কি সাহিত্য-সভা পর্যন্ত আছে। ফুটবল ম্যাচ খেলার জন্য একটা কাপ পর্যন্ত রয়েছে, দিয়েছেন একজন ভদ্রসন্তান, ইস্কুলের পরলোকগত বাংলা-সাহিত্য-শিক্ষক পণ্ডিত মশায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে) প্রবীণেরা তামাক খান, নতুন কালের বাবুরা কিন্তু খান সিগারেট। সকলেরই কিছুটা দেবত্র সম্পত্তি আছে। কিন্তু তরুণেরা প্রায় সকলেই পৌত্তলিকতার বিরোধী। যাত্রাকালে দইয়ের ফোঁটা কপালে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হন সকলেই, কিন্তু বাইরে এসেই সর্বাগ্রে রুমাল ঘষে ফোঁটাটা

মুছে ফেলেন। নতুন কালের মেয়েদের বউদের জুতো প্রায় সকলেরই আছে, কিন্তু গ্রামে কেউ পায়ে দেয় না, কোথাও যেতে হলে কাগজে মুড়ে নিয়ে ইষ্টিশনে এসে পায়ে দেয়।

প্রবীণ বাবুরা সোজা গালাগাল দেন, 'শালা, হারামজাদা, বদমাশ, বজ্জাত' বলে, নতুন বাবুরা গালাগাল দেন ইংরেজীতে, 'ড্যাম, সোয়াইন' বলে। কথায় কথায় বলেন, 'নন্‌সেন্স'।

কিশোরের কথায় সীতারাম কৌতুক বোধ করছে, খুশীও হয়েছে। তবে সে অবশ্য এত সব বিবেচনা করে কখনও দেখে নাই। তার নিজের খারাপ লাগে, এখানে নতুন আমলের কেউ তালব্য-শ উচ্চারণ করতে পারে না, সবই তাদের ইংরেজী 'এস্'। বাজারপাড়ার এবং বাবুপাড়ারও যারা নিম্নস্তরের, তারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলেই সানন্দে সম্ভাষণ করে, কি রে স্লা?

ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত উত্তর আসে, কেন রে স্লা?

আর একটা ভয় আছে সীতারামের। ভয়ের সঙ্গে ঘৃণাও আছে। এখানে মদ প্রায় সকলেই খায়, প্রবীণেরা তন্ত্রমতে 'কারণ' করেন, নতুনেরা নিজেদের আড্ডায় ইজ্জত রেখে খান। জনকয়েক কিন্তু নিয়মিত মাতাল আছে, যারা দোকানের মদ খেয়ে রাস্তায় হল্লা করে, আস্তিন গুটিয়ে গুণ্ডামিও করে, কিন্তু ছুরি-ছোরা চালাতে সাহস করে না, তবে নিরীহ কাউকে পেলে অপরাধ খুঁজে বার করে দু-চারটে কিল-চড়-ঘুষি চালিয়ে দেয় অমিতবিক্রমে।

রত্নহাটায় ঢুকে গ্রামের মুখেই সীতারাম একবার থমকে দাঁড়াল। সামনেই মণিলালবাবুর বাড়ি। মণিলালবাবু কাছারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছেন। তাঁর ছোট ভাই ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে একখানা বাইসাইকেলের সীটে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছেন, কোথাও যাবার মুখে বোধ হয় কিছু বলছেন দাদাকে।

কানাই রায় বললে, কি, দাঁড়ালে যে?

সীতারাম পিছন ফিরে নিজের গ্রামের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। তাল, শিরীষ, আম এবং বাঁশ বনের ঘন নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে বসতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কানাই রায় আবার বললে, চল।

সীতারাম আবার একবার নিজেকে সংযত এবং দৃঢ় করে নিলে, বললে, চলুন।

মণিলালবাবুর কাছারির সামনে এসে তার বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ করে উঠল। মণিলালবাবুকে এখানে 'জাঁদরেল লোক' বলে থাকে, কথায়বার্তায়, চালচলনে সবেই তিনি বিশিষ্ট। সীতারামের মনে পড়ল, বাপের উপদেশ। তা ছাড়া কানাই রায় আগেই হেঁট হয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে তাঁকে প্রণাম জানালে, সীতারামও অনুরূপ ভঙ্গীতে প্রণাম করলে। সীতারামের ভাগ্য, মণিলালবাবু তাদের প্রণামটা আমলে আনলেন না। তারা পার হয়ে গেল মণিবাবুর কাছারি। কিন্তু খানিকটা আসতেই মণিলালবাবুর ছোট ভাই ডাকলেন, কানাই রায়, ওহে!

আজ্ঞে?

কানাই ফিরল, সীতারাম দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কানাই ডাকলে, সীতারাম, শোন, বাবু ডাকছেন।

সীতারাম এসে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে মণিলালবাবু বললেন, রমানাথ মোড়লের ছেলে তুমি? নর্মাল পাস করেছ? বাঃ! কি নাম তোমার?

সীতারাম সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে, আমার নাম সীতারাম মণ্ডল।

মণিলালবাবু বললেন, বাঃ! ভাল। নর্মাল পাস করেছ তুমি! ভাল, ভাল। বাবুদের ছেলেদের পড়াবে? বেশ বেশ। তোমাদের গ্রামে লেখাপড়ার বেশ ঢেউ উঠেছে, না?

চুপ করে রইল সীতারাম।

মণিবাবুর ছোট ভাই বললেন, হ্যাঁ, এর এক জাঠতুতো ভাই, কিশোরকৃষ্ণ পাল বি-এ পাস করে এম-এ আর ল পড়ছে। কিশোরেরই আর একটি ভাই এবার ম্যাট্রিক দেবে। সে ছেলেটিও ভাল।

মণিলালবাবু বললেন, বাঃ বেশ। খুব ভাল। ম্লেচ্ছ-বিদ্যার তো ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই, সবারই অধিকার; তোমরা লেখাপড়া শেখ, মানুষ হও, তোমাদের জাতের একটা দুর্নাম আছে মুখ্যু বলে, সেটা ঘোচাও তোমরা।

একটা অদম্য উচ্ছ্বাসে সীতারামের বুকটা ভরে উঠল, চোখ ফেটে জল এল তার। সে আশঙ্কা করেছিল তীক্ষ্ণ শ্লেষভরা আচরণ। এমন সস্নেহ আচরণ, এমন অকৃপণ প্রশংসা সে প্রত্যাশা করে নাই। সেই অপ্রত্যাশিত উদার ব্যবহারে তার অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, নত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে সে মণিলালবাবুকে প্রণাম করলে।

মণিলালবাবুর মুখে অভিজাতসুলভ হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, তুমি কাঁদছ?

সীতারামের চোখে জল এসেছিল, সেই জল তাঁর পায়ের উপর ঝরে পড়েছে। উত্তপ্ত সজল স্পর্শ থেকে অনুমান করে নেওয়া মণিলালবাবুর মত বিচক্ষণ লোকের পক্ষে কঠিন হয় নাই।

সীতারাম অপ্রতিভের হাসি হেসে চোখ মুছে বললে, আজ্ঞে না, তার পর সে মণিবাবুর ছোট ভাইকে প্রণাম করলে।

মণিলালবাবু বুঝতে পেরেছিলেন তার অন্তরের উচ্ছ্বাসের কথা। তাঁরও ভাল লাগল একটু, এবং এই উচ্ছ্বাসের স্পর্শে তাঁরও মধ্যে ঈষৎ ভাবস্পন্দন জেগে উঠল বোধ হয়। তিনি বললেন, আমাদের গ্রামে ইস্কুল,—ভদ্রলোকের গ্রাম, ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে না। ইস্কুল হওয়া অবধি দুটি ছেলে বি-এ পাস করেছে, আর কেউ

এন্ট্রান্স পাসই করতে পারলে না। তা তোমরা শেখো, তোমরা বড় হও।

হঠাৎ সীতারাম হাত জোড় করে বললে, আমি নর্মাল পাস করেছি—কে আপনাকে বলেছে জানি না, আমি পরীক্ষা দিয়েছি দুবার, পাস করতে পারি নাই।

মণিলালবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন এবার।

সীতারাম, বললে, আমি তা হলে যাই।

মণিলালবাবু বললেন, ভাল হবে তোমার। আমার সঙ্গে এর পর দেখা করো।

সীতারাম ভাগ্যকে মানে। সকল সুখ এবং দুঃখের নিয়ন্তা হিসাবে তাকে ভয় করে, ভক্তি করে। আপন ভাগ্যকে সে বার বার প্রণাম জানায়। আজকের দিনটির জন্য এত তৃপ্তি, এত আশ্বাস, এত আনন্দ সঞ্চয় করে সে রেখেছিল!

মণিলালবাবুর ওই আশীর্বাদ, স্নেহপূর্ণ ব্যবহারই সব নয়, আরও সে পেলে। তার কর্মস্থল, তাদের আট-আনা রকমের জমিদার বাড়িতে এসে ছেলেদের পড়ার ঘরে তার সুটকেসটি রাখলে। এ কাছারি সে আগেও দেখেছে। আগেও এসেছে এখানে। তখন জমিদারবাবু বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন ভয়ানক রাশভারী লোক। মণিলালবাবুর সমকক্ষ তো ছিলেনই প্রতাপে প্রতিষ্ঠায়—উপরন্তু তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাঁর সহজ সত্য ব্যবহারের জন্য, স্পষ্টবাদিতার জন্য। বিষয়ী লোক ছিলেন, কিন্তু কুটিল পন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিরোধ বাধলে তিনি যা করতেন, বলে করতেন, এবং অন্যায় যারই হোক ও যেখানেই হোক—প্রতিবাদ করতেন। তাঁর একটা কথা দাগ কেটে রয়েছে সীতারামের মনে। এখানে একটা খুন হয়েছিল, এই গ্রামে এবং থানার সামনে। পুলিস সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করলে এই গ্রামেরই দুজন ভদ্রসন্তানকে; ভদ্রসন্তানদের মধ্যে যারা মদ খেয়ে গুণ্ডামির ভাঁড়ামি করে নিজেদের ভয়াল রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদেরই মধ্যে অমূল্য এবং ভূপতিকে। এ বিষয়ে পুলিস সাহেব গ্রামের সমাজপতিদের ডেকে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ বাড়ির কর্তাকেও ডেকেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অমূল্য আর ভূপতি—এদের দুজনকে জানেন? এরা মদ খায়?

কর্তা উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, জানি। দুজনেই গ্রাম-সম্পর্কে আমার আত্মীয় এবং মদ খায়।

এরা ভয়ানক প্রকৃতির লোক?

ভয়ানক প্রকৃতি বলতে কি বলছেন, আমি ঠিক জানি না। তবে মদ খেয়ে চীৎকার করে, আস্ফালন করে, হয়তো নিরীহ দু-এক জনকে দু-একটা ঘুষি মারে।

একে কি ভয়ানক প্রকৃতি বলেন না আপনি? মদ খায়, চীৎকার করে, লোককে মারে।

কর্তা উত্তর দিয়েছিলেন, দেখুন সাহেব, মদ অনেকেই খায়, আমিও খাই, হয়তো আপনিও খান; সুতরাং মদ খেলেই ভয়ানক প্রকৃতি হয় না; মদ খেলেই তার একটা ক্রিয়া আছে। কেউ চীৎকার করে, কেউ রাস্তায় পড়ে থাকে, কেউ সাবধানে ইজ্জত বাঁচিয়ে ঘরে থাকে। সাধুরা কারণ ক'রে ভগবানের নাম জপ করে, কালীসাধনা করে। এরা চীৎকার করে মদ খেয়ে কখনও রাস্তায় পড়ে থাকে, কিন্তু আপনি যে অর্থে ভয়ানক প্রকৃতি বলছেন, তা ওদের নয়। যা সন্দেহ করেছেন, সে ওদের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

সাহেব বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। কর্তা আবার হেসে বলেছিলেন, ওরা মদ খেয়ে আস্ফালন করে, লোককে মারে-ধরে এ থেকে যদি ভয়ানক প্রকৃতি হয় সাহেব, তবে আরও একটা কথা বলি, মদ খেয়ে পরের দুঃখে আমি ওদের কাঁদতে দেখেছি। আমি নিজের চোখে অনেকবার দেখেছি; একবার এখানকার একজন মহৎ ব্যক্তির কঠিন অসুখের সময়, আমি দেখেছি, ওরা দুজনেই মদ খেয়ে ভগবানকে ডেকে বলছে, ভগবান, আমাদের পরমায়ু নিয়ে মহৎ লোকটাকে বাঁচিয়ে দাও। তা হলে কি ওরা মহৎ লোক নয় আপনার যুক্তি অনুসারে?

এ বাড়ির কর্তা ওই কথার স্মৃতির মধ্য দিয়ে সীতারামের মনের মধ্যে বেঁচে আছেন। শ্রদ্ধা এবং ভয়, এই দুটো মিশে তাকে এ বাড়ি সম্বন্ধে বিহ্বল করে রেখেছে। সীতারামের ধারণা, এ বাড়ির ছেলেদের রক্তের মধ্যে প্রচণ্ড দম্ভের একটা ধারা আছে। সে শুনেছে, নাবালকের রাজত্বে, বড় ছেলেটি ভয়ানক উগ্রস্বভাবের। সীতারামের সৌভাগ্য, তাকে পড়াতে হবে না, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। পড়াতে হবে ছোট দুটিকে। কিন্তু তাদের মধ্যেও তো এই রক্ত! এ বাড়ির মালিক এখন রাণীমা; সীতারামের ভরসা, তিনি নাকি বড় ভাল লোক।

সুটকেসটি রেখে ঘরখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। বেশ ঝকঝকে তকতকে মাঝারি আয়তনের ঘর। আসবাবের মধ্যে কেবল একখানি তক্তপোশ আর একটি পুরানো আমলের টেবিল।

কানাই রায় বললে, এই ঘরে তুমি থাকবে। এখন চল, হাত-পা-মুখ ধুয়ে নাও, রাণীমাকে প্রণাম করে আসবে।

কাছারির একেবারে গায়েই বেশ বড় পুকুর, জলও বেশ ভাল, বাঁধানো ঘাট; পুকুরটিও বাবুদের। সব মিলিয়ে এ দিকটা ভালই লাগল সীতারামের।

বাড়ির ভিতর ঢুকতে দুটো দরজা পার হতে হয়। দরজা দুটির মাঝখানের স্থানটুকু এমন যে, সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরের কথা শোনা যায়, কি দেখা যায় না। বাড়ির ভিতর বেশ একটি গোলমাল উঠছে। কানাই রায় থমকে দাঁড়াল, কি হল? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলে অত্যন্ত মৃদুস্বরে এবং শঙ্কার সঙ্গে।

সীতারাম শুনতে পেলে, বাড়ির ভিতর ছেলেমানুষের গলায় কেউ বলছে, আমি চোর

নই, চুরি করতেও আমি যাই নি। ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছিলাম, দেখলাম ও পাড়ার ছকু কড়ি আরও কজন ছেলে ক্ষেতের মধ্যে সন্ধ্যের অন্ধকারে মূলো আর বেগুন তুলছে। জিজ্ঞাসা করলাম তো ছকু বললে, আমরা ফীস্ট করব রাত্রে, তাই তরকারি চুরি করছি। আমিও ওদের কতকগুলো আলু তুলে দিলাম।

স্ত্রীকণ্ঠে প্রশ্ন হল, কেন দিলে ?

উত্তর হল, ওদের সাহায্য করলাম। আর—চুরি কখনও করি নি, চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম।

স্ত্রীকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, কিন্তু ওই চাষীটি যদি তোমাকে না দেখত, তা হলে তো সকাল-বেলায় নিশ্চয় গাল দিত, কোন্ গুখোরব্যাটা, কোন্ হারামজাদা আমার মূলো-বেগুন চুরি করেছে। তখন সে গাল তোমার মরা বাপকেও লাগত! গাল দিলে তো দোষ দিতে পার না তুমি! এই বর্ষায় অসময়ে ও কত কষ্টে মূলো-বেগুন লাগিয়েছে।

ভারী পুরুষের গলায় কেউ বললে, থাক্ মা, থাক্। ছেলেমানুষ করে ফেলেছেন।

ছেলেমানুষ বলবেন না নায়েববাবু, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে; ষোল বছর পার হতে চলেছে, ছেলেমানুষ কিসের ?

কানাই রায় বিস্ময়ে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সীতারামের উপস্থিতি সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়েই বলে উঠল, রাণীমা বড়বাবুকে বকছেন!

ছেলেমানুষের গলায় এবার কথা শোনা গেল। সীতারাম বুঝতে পারলে এইটিই সেই উগ্রস্বভাবের বড় ছেলেটি। সীতারাম শিউরে উঠল, ছেলেটি অনায়াসে বলে গেল চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম! এবার সে কি উত্তর দেয় শুনবার জন্য সীতারাম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। ছেলেটি বলছে, সে শুনলে, হ্যাঁ, আমার অন্যায় হয়েছে, তার জন্য আমি ওর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তারপরই সে অন্য কাউকে বললে, আমি দোষ করেছি, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

বিব্রত কণ্ঠস্বরে বোধ হয় চাষীটি বলে উঠল, আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে না। আমাকে বললে, আমি নিজে তুলে দিতাম আপনাকে।

রাণীমা আবার বললেন, নায়েববাবু, ওই লোকটিকে পাঁচ সের আলুর বাজার-দরে দাম দিয়ে দেবেন। দামটা ধীরার জলখাবারের টাকা থেকে কাটা যাবে।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সীতারাম। এ কোথায় এসে পড়ল সে! এদের এই ধারা-ধরুন, এই রীতি-নীতি তার কাছে শুধু বিস্ময়করই নয়, কেমন যেন শ্বাসরোধী বলে মনে হচ্ছে তার। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে, ওরই মধ্যে কোথায় একটা এমন কিছু নিহিত আছে, যা ইঙ্গিতে তাকে শাসন করছে। সে যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে গেল।

নায়েববাবুর গলা শোনা গেল, এস হে, এস।

পদশব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল; কানাই সচেতন হয়ে উঠল মুহূর্তে, এমন লুকিয়ে কথা শোনা তার অভ্যাস আছে। সে গলা ঝেড়ে শব্দ করে আগমনবার্তা জ্ঞাপন করে বললে, এস, এস। এ তো তোমাদের জমিদারের বাড়ি, আপন বাড়ি হে। এস, লজ্জা কি?

নায়েববাবু বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে একটি নিম্নশ্রেণীর চাষী। সীতারাম বুঝলে, এরই জমি থেকে আলু চুরি করেছে এ বাড়ির বড় ছেলেটি, পরীক্ষা করে দেখেছে, চুরি করতে কেমন লাগে।

কানাই নায়েববাবুকে বললে, এইটি আপনার—আমাদের রমানাথদাদার ছেলে, সীতারাম। মায়ের কাছে নিয়ে যাই?

নায়েব কিছু বলবার আগেই রাণীমা বেরিয়ে এলেন, নায়েববাবু, ওই লোকটিকে যেন আপনি কিছু বলবেন না। ও আমার কাছে নালিশ করে নি। আমি খবর পেয়েছি অন্য লোকের কাছে। যে দেখেছে ওদের আলু তুলতে, সে-ই আমাকে বলে গিয়েছে।

মায়ের কথা শেষ হবামাত্র কানাই বললে, সীতারাম এসেছে মা।

এইটিই সীতারাম? এস, এস বাবা, বাড়ির ভিতরে এস।

সীতারাম অবাক হয়ে এই মা-টিকে দেখছিল। দেহবর্ণের দীপ্তিতেই তাঁর সকল অবয়ব-বৈশিষ্ট্য যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, কৃশকায়া দীপ্তগৌরবর্ণা মধ্যবয়সী এই মা-টিকে দেখে মনে হয় যেন জ্বলন্ত একটি শিখা। চোখ দুটি বড় নয়—ছোট, কিন্তু দেহ-দীপ্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রখর দুটি চোখ। বিপরীত শুধু কণ্ঠস্বরটি, অতি মিষ্ট; সীতারামের মন অভয় পেলে তাঁর কণ্ঠস্বরে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করলে তাঁকে।

* * *

রাণীমা নয়, মা। সীতারামের মনে হল, রাণীমার চেয়ে অনেক বড় উনি—শুধু মা। মা বললেন, সীতারামকে বসতে আসন দে।

সীতারাম বাড়ি ঢুকে সর্বাগ্রে খুঁজছিল সেই উগ্র এবং বিচিত্র প্রকৃতির বড় ছেলেটিকে। কই সে? তার উগ্র প্রকৃতির কথা সে কানে শুনেছিল, তার উপর নিজের কানে তার অদ্ভুত কথা শুনে কৌতূহল এবং শঙ্কার তার আর সীমা ছিল না। অপরিসীম শঙ্কিত কৌতূহল! "চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম!" এ কী ছেলে? কই সে? কিন্তু সে নাই, বোধ হয় উপরে গিয়েছে। এরই মধ্যে হঠাৎ আসনের কথা শুনে সে প্রায় চমকে উঠল, আসন সে প্রত্যাশা করে নাই। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে, হাত-পা ঘামতে লাগল। আত্মসম্বরণ করে সে বিব্রত এবং লজ্জিত হয়ে বললে, না না, মা। আসন কি জন্যে? আসন চাই না। আপনার সামনে—

তার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই কানাই রায় বলে উঠল, ঠিক কথা, আপনার সামনে

আমরা কি আসনে বসতে পারি মা ? আপনারই অন্নে বেঁচে আছি, তা ছাড়া প্রজা।

মা হাসলেন, আশ্চর্য স্নেহমধুর কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললেন, না না, রায়, এ বাড়িতে সীতারাম আজ এসেছে শ্যাম্-দেবুর শিক্ষাগুরু হয়ে। এ বাড়িতে অন্নও আমরা দয়া করে দেব না, উনিই দয়া করে গ্রহণ করবেন। জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ আলাদা। সীতারাম, আসনে উঠে বসো বাবা।

সীতারামের মনের মধ্যে সে এক আশ্চর্য আলোড়ন উঠল মুহূর্তে। তার স্পষ্ট কোন রূপ নাই, কিন্তু একটা আবেগ আছে ; সে আবেগ তাকে একটা মর্যাদাময় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করলে, সংকোচ কাটিয়ে দিলে। সে আসনটা টেনে নিয়ে বসল।

মা চলে গেলেন, বলে গেলেন—বসো, আমি আসছি।

সীতারাম বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে এতক্ষণে। জমিদার হলেও ছোট জমিদার, ধনী বলা চলে না, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, ঘরদোরও অবস্থানুযায়ী। কতকটা অংশ পাকা দালান, কতকটা অংশ মাটির কোঠা ; মাটির হলেও কোঠাগুলি পাকা ঘরের মতই দেখতে ; থামওয়ালা বারান্দা, পাকা মেঝে, পরিপাটী মাটির পলেস্তারার উপর পাকা ঘরের মত চুনকাম করা ; উঠান-দাওয়া এগুলিও সবই পাকা।

কানাই হেসে কাউকে বললে, এস দেবুদাদা, তোমার মাস্টার মশাই। এস।

সীতারামের চোখ পড়ল সামনের বারান্দায় একটি থামের আড়াল থেকে ফুটফুটে একখানি মুখ উঁকি মারছে। তার চোখে চোখ পড়তেই সে ফিক করে হেসে মুখ লুকিয়ে ফেললে।

সীতারাম তাকে সস্নেহে ডাকলে, এস খোকাবাবু, এস।

ঠিক এই সময়েই মা এসে দাঁড়ালেন। নিজে হাতে নিয়ে এসেছেন একখানি রেকাবিতে দুটি মিষ্টি—দুটি ক্ষীরের নাড়ু, এক গ্লাস জল। নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তুমি ওদের 'বাবু' বলো না বাবা।

তার পর বললেন, খাও, জল খাও। প্রথম এলে, সকলের আগে মিষ্টিমুখ কর। ওই একটু মধু আছে, ওইটুকু আগে মুখে দাও।

সীতারামের এতক্ষণে চোখে পড়ল, এক পাশে একটু মধু রয়েছে।

কোন সঙ্কোচ প্রকাশ না করেই সে রেকাবিটি তুলে নিলে। মধুটুকু খেয়ে সে সন্দেশ একটি তুলে নিলে। দোকানের তৈরী নয়, বাড়ির তৈরী ; কিন্তু এমন চমৎকার মিষ্টি সীতারাম কখনও খায় নাই। মুখে রেখে গিলতে যেন ইচ্ছা হচ্ছিল না, খেলেই তো ফুরিয়ে যাবে, আর তো মাত্র একটি।

মা ইতিমধ্যে ছেলেটিকে এনে সীতারামের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।—তোমার মাস্টার মশাই, নমস্কার কর।

ছেলেটি মায়ের রঙ পেয়েছে, মুখখানিও বড় মিষ্টি, শুধু চোখ দুটি বড় প্রখর এবং চঞ্চল, আর শরীরটি বড় হাল্‌কা, শীর্ণ বলে মনে হয়। সে মুখ টিপে টিপে হাসছিল, সে হাসির মধ্যে তার চঞ্চল প্রকৃতির পরিচয় ফুটে বেরিয়ে আসছে, যেন ফুলের কুঁড়ির সবুজ আবরণের অন্তরালবর্তী তার মুদিত দলগুলির ভিতরের রঙের খানিকটা আভাসের মত। চোখে চোখ পড়লেই সে চোখ নামাচ্ছে। তাতে হাসি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মা আবার বললেন, নমস্কার কর।

ছেলেটি এবার চট করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সীতারামের পায়ে হাত দিয়ে কপালে ঠেকালে।

সীতারাম বিব্রত হয়ে উঠল, না না; আমাকে এমন করে প্রণাম করতে নাই। নমস্কার করতে হয়।

মা হেসে বললেন, তা করুক। ওদের প্রণাম নিলেও তোমার দোষ নেই।

সীতারাম বললে, কি নাম তোমার?

ছেলেটি নীরবে অভ্যাসমত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

মা বললেন, বল, নাম বল।

সিরি দেবানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বাঃ, ভারি ভাল নাম। তেমনই ভাল ছেলে।

মা হেসে বললেন, ভাল উনি মোটেই নয়। ভারি চঞ্চল। ওকে নিয়ে বেগ পেতে হবে তোমাকে। কিন্তু শ্যামু কোথা গেল? শ্যামু! শ্যামু!

উপরের কোন ঘর থেকে উত্তর এল, এই যে আমি।

কি করছ? নীচে এস।

উত্তর এল, দাদা আমায় কয়েদ করে গিয়েছে।

মা বললেন, তা হোক, তোমার মাস্টার এসেছেন, নেমে এস।

দাদা খালাস না দিলে কেমন করে যাব?

দাদাকে বল। ধীরা!

দাদা নাই।

তা হলে আমি খালাস দিচ্ছি। আমি মা, তোমার দাদারও গুরুজন। আমি খালাস দিলে দাদা কিছু বলবে না।

এইবার দোতলা থেকে বেরিয়ে এল একটি সাত-আট বছরের ছেলে; এ ছেলেটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখখানি মিষ্টি, কিন্তু একটু গম্ভীর।

মা বললেন, তোমার মাস্টার মশাই, নমস্কার কর।

ছেলেটি ছোট হাত দুটি তুলে বেশ চমৎকার নমস্কার করলে। আড়ষ্টতা নাই, চাঞ্চল্য

নাই, ধীর এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে নমস্কার করলে।

মা বললেন, ও বড় ধীর, শান্ত। কথা কম কয়।

সীতারাম তাকে কাছে টেনে নিলে। বললে, কি নাম তোমার?

শ্রীশ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কি পড়?

শ্যামু বলে গেল, সরল বাংলা পাঠ প্রথম ভাগ, সহজ পাটিগণিত, শিশু ভূগোল পাঠ, ইতিহাসের গল্প প্রথম ভাগ, সচিত্র লিখনপ্রণালী, আর দাদা পড়তে দিয়েছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী'।

ওরে বাপ রে, তুমি যে অনেক বই পড়!

শ্যাম অসঙ্কোচে স্বীকার করে বললে, হ্যাঁ।

বাঃ, খুব ভাল ছেলে।

ছোট দেবানন্দটি সম্ভবত দাদার সমাদর দেখে ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছিল। সে এবার এগিয়ে এসে বললে, আমিও কবিতা জানি, বলতে পারি। বলব? বলেই সে আরম্ভ করে দিলে—সম্মতির অপেক্ষা রাখলে না, হাত-পা নেড়ে চমৎকার বলে গেল—

"নামটি আমার গডাধর, সবাই বলে গডা,
সারা ডিনটা রোদে টো-টো গায়ে ধুলো কাড়া,
ডাডা বললে, গাঢা তুই—লিখবি পড়বি নে?
অমনি আমি কেঁডে দিলেম—এঁ-এঁ-এঁ-এঁ।"

চোখে হাত দিয়ে সে এঁ-এঁ করে চমৎকার কান্নার অভিনয় করে গেল। সীতারাম এবং সকলেই হাসলে সে ভঙ্গী দেখে। আরও উৎসাহিত হয়ে দেবু আবৃত্তি করে গেল—

"ডিডি বললে—না না না না, তুমি ভাল ছেলে,
সোনা মানিক এস খানিক—হাডুডুডু খেলে।"

বলেই সে 'চোল, চোল-মারা হাডু-ডু-ডু-ডু' বলে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল বাড়ি থেকে।

মা শ্যামুকে বললেন, তুমি কিছু শুনিয়ে দাও।

শ্যামু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল দেবুর সাফল্যে। সে সীতারামের কোলের কাছ থেকে সরে এসে দাঁড়াল, একটি নমস্কার করলে, তার পর বললে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রার্থনাতীত দান"—

"পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল,
সুহিদগঞ্জে রক্তবরণ হইল ধরণীতল।"

অবাক হয়ে গেল সীতারাম। স্পষ্ট উচ্চারণ, ছন্দপতন নাই আবৃত্তির মধ্যে,

যুক্তাক্ষরগুলিতে ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ-কৌশলে দুই অক্ষরের ক্রিয়া এনে সুন্দর আবৃত্তি করে যাচ্ছে। এমন আবৃত্তি সীতারাম নিজে করতে পারে না। আর কবিতাটিও কি সুন্দর! নর্মাল ইস্কুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়ানো হয় না। এখানকার ইস্কুলে যখন সে পড়ত, তখনও হত না। তিনি নোবেল প্রাইজ-ই পেয়েছেন, সে কথা সীতারাম জানে। কিন্তু তাঁর কবিতা বিশেষ সে পড়ে নি। অথচ এই ছোট ছেলেটি!

শ্যামু শেষ করলে আবৃত্তি—

"তরুসিং কহে, করুণা তোমার হৃদয়ে রহিল গাঁথা,
যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব, বেণীর সঙ্গে মাথা।"

তার পর সে বললে, শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়। এ তথ্যটিও সীতারামের পক্ষে নূতন। সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এক মুহূর্তে মনে হল, এদের সে কেমন করে পড়াবে?

হাসিটি যেন মায়ের সহজাত, তিনি হেসে বললেন, ধীরা শিখিয়েছে এসব ওদের। ধীরানন্দকে চেন তো? আমার বড় ছেলে?

সীতারামের কণ্ঠতালু যেন শুকিয়ে গেল। ধীরানন্দ পরিচয়-বৈচিত্র্যে তার কাছে প্রায় এ বাড়ির কর্তাবাবুর কাছাকাছি ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছে। সে ঢোঁক গিলে বললে, না।

মা ডাকলেন, ধীরা!

শ্যামু বললে, দাদা সাহিত্য-সভায় লেখা দিতে গিয়েছে।

মা শ্যামুকে বললেন, যাও, মাস্টার মশাইকে নিয়ে যাও।

একা ঘরের মধ্যে বসে সে ভাবছিল। ভাগ্য তার আজকের দিনটিকে বিপুল সম্পদে ভরে দিয়েছে—রূপে-পরিমাণে সে সম্পদ বিস্ময়কর। অন্য দিকে কিন্তু ভয়ে তার মন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সিমেন্ট-করা মেঝের উপর বসে ছিল সে, হঠাৎ এক বাড়ির পালিশ করা মার্বেলের মেঝের কথা মনে পড়ে গেল তার। হুগলীতে থাকতে এক বিখ্যাত বড়লোকের বাড়ি দেখতে গিয়ে এই মেঝে সে দেখেছিল, হিমশীতল পিচ্ছিল, আলোকচ্ছটায় ঝকমক করছে; দেখে বিস্ময় যেমন তার হয়েছিল, তেমনই ভয় হয়েছিল ওই মেঝেতে পা দিতে। তাদের গোবর ও রাঙা-মাটি নিকানো গৃহাঙ্গণের মধ্যে যে সস্নেহ অন্তরঙ্গতা আছে, তার এক বিন্দুর সন্ধান না পেয়ে সেই মেঝেকে অনাত্মীয় মনে হয়েছিল, সেখানে সে পা দিতে পারে নাই, অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, দরজার মুখ থেকেই ফিরে এসেছিল। এখানকার পরিচয়ের মধ্যে সেই মার্বেলের মেঝের রূপ সেই অনাত্মীয়তায় ফুটে উঠেছে যেন। এদের এখানে কেমন করে সে পড়াবে?

বাড়ি ফিরে যাবে ? যেমন সে ফিরে এসেছিল ওই মার্বেলের মেঝের প্রান্তসীমা ওই দুয়ারের মুখ থেকে ?

না সেও ইচ্ছা হচ্ছে না।

তার জাঠতুত ভাই রত্নহাটা সম্বন্ধে যেসব কথা বলে, সে কথা শুনে, সে এবং তার গ্রামের লোক সকলেই আনন্দ পায়, কথাটা অসত্যও নয় ; এতদিন এই পরিচয়ই পেয়েছে ; কিন্তু আজ আর একটা যে বিচিত্র পরিচয় পেলে সে, তাতে ব্যঙ্গ করার, উপেক্ষা করার শক্তি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে তার। এই স্নেহ, এই সমাদর এ যে তার কাছে দুর্লভ বস্তু। যারা এই দুর্লভ বস্তু দিতে পারে, তাদের কেমন করে সে মন্দ বলবে ? ওরাও ভাল, এরাও ভাল—ভালতে-মন্দতে মানুষ, এরা মন্দও বটে, আবার ভালও বটে, যত ভাল তত মন্দ।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। ভাবলে।

না, ভয়ে সে পালাবে না। শিখে নেবে সে। কতদিন লাগবে শিখতে ? এখানে সে অনেক শিখতে পারবে। ঘরে অবশ্য তার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নাই। কিন্তু তাই কি সব ? ভাত-কাপড়ের অভাব থাকলে—চাষী সদ্‌গোপের ছেলে সে, তার লেখাপড়া শেখাই হত না, না, ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের জমি চাষ করত, চাষে খাটত। কিংবা এমনি কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরের কাজ করত। ভাগ্য ভাল হলে বড় জোর কানাই রায়ের মর্যাদা পেতে পারত। কিন্তু যখন বহু চেষ্টায় বহু ব্যর্থতার মধ্যেও সেই অবস্থা থেকে সে উত্তীর্ণ হয়েছে, হোক সামান্য লেখাপড়া, কিছু শেখার ভাগ্য তার হয়েছে, তখন সে ওই জীবনে ফিরে যাবে কেন ?

এই যে আজ জমিদার-বাড়িতে, সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরে শিক্ষাগুরুর আসন সে পেলে, সে 'আসন উপেক্ষা করে উঠে যাবে সে ভীরুর মত ?

না। যাবে না সে।

কিছুক্ষণ পর তার কি খেয়াল হল, পকেট থেকে পেন্সিল বার করে তক্তপোশের গায়ে যে জানালাটি, তার মাথার উপর লিখলে—৮ই শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। আজকের তারিখ।

আজকের দিনটি তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। তার পিতৃ-পিতামহের গ্রাম ও বংশের কুলকর্মের গণ্ডিকে অতিক্রম করে সে আজ ভদ্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম এই রত্নহাটায়—তাদের গ্রামেরই জমিদার-বাড়িতে শিক্ষকরূপে সসম্মানে আসন পেয়েছে। এ কি কম গৌরবের কথা! অনেকক্ষণ চুপ করে সে বসে রইল। এই ক্ষুদ্র স্বার্থকতাটুকুর উপর ভিত্তি করে সে ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনার দেউল গড়তে লাগল। বাবুদের বাড়ির এই চাকরিটুকু নিয়ে থাকলে তো তার চলবে না। মাসিক চার টাকায় জীবন কাটাতে পারবে না ; সংসার আছে, সংসার বাড়বে। তা ছাড়া দেবু-শ্যামু বড় হলে তখন তার কি হবে ? অবশ্য ওই বড় ছেলেটির ততদিনে বিয়ে হবে—হয়তো ছেলেও হবে। দেবু-শ্যামুর

পর সে তাদের পড়াতে পারবে। তার পর শ্যামুর সন্তান হবে, তার পর দেবুর সন্তান হবে। কল্পনাটা বড় বেশি মিষ্টি হল। এ যেন ওই বাড়িতে মৌরসীখত লিখে দেওয়া—মাস্টারির মৌরসীখত। তার চেয়ে সে যদি এখানে একটি পাঠশালা করতে পায়!

পাঠশালার কথা সে কানাই রায়কে বলেছে। কানাই রায় এ বাড়ির মাকে বলেছে। মাও আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি চেষ্টা করবেন। পাড়ার ঠিক মাঝখানে এঁদের চণ্ডীমণ্ডপ। সেইখানে পাঠশালার স্থান করে দেবেন বলেছেন, কিন্তু—। কিন্তু বাবুদের ছেলেরা কি তার কাছে পড়বে—বড় ইস্কুলের পাঠশালা ছেড়ে? সীতারাম ভাবে।

ব্রাহ্মণ জমিদারদের ছেলে নিয়ে পাঠশালার কল্পনায় সে আশাও পায় না, স্বস্তিও পায় না। মন কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। বেনেপাড়ায়, সাহাপাড়ায়, কৈবর্তপাড়ায় পাঠশালা হলে বড় ভাল হয়। তাদের সে পড়াতে পারে। তারা যেন এদের চেয়ে অনেক সহজ, অনেক আপনার।

অন্যমনস্কভাবে পেন্সিল বুলিয়ে বুলিয়ে দেওয়ালে লেখা ৮ই শ্রাবণ তারিখটাকে মোটা ডগডগে করে তুলতে আরম্ভ করলে।

তিন

সাত দিন পর। আজ মাসের পনেরোই।

মাটির প্রদীপের আলোয় অভ্যস্ত মানুষের হঠাৎ জোরালো ইলেক্‌ট্রিক আলোর সামনে এসে চোখ ধেঁধে যায়, চোখের স্নায়ু-শিরাগুলো টনটন করে ওঠে; আবার দু-চার দিনের অভ্যাসেই সে তীব্রতা চোখে সয়ে যায়, ক্রমে ওই আলোর উজ্জ্বল মনোহারিত্বই দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়। তেমনই এই কয়দিনের অভ্যাসেই, সীতারামের মনের সঙ্কোচ এবং ভয়টা ক্রমশঃ কমে এসেছে। এখানকার হালচাল ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে আসছে। এ বাড়ির মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের ভালও লাগছে। এ বাড়িতে ঢুকেই যাকে তার সব চেয়ে বেশী বিস্ময়কর এবং ভয়ের পাত্র মনে হয়েছিল, যার উগ্রস্বভাব-খ্যাতি বাইরে থেকেই সে শুনেছিল এবং বাড়িতে প্রবেশমুখে 'দেখলাম চুরি করতে কেমন লাগে, এই বিচিত্র বিস্ময়কর উক্তি শুনেছিল, এ বাড়ির সেই বড় ছেলেটির সঙ্গেও তার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল সে প্রথম পরিচয়ের সময়, এবং এখনও মনে মনে ওইটাই সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে পরিচয় হল অত্যন্ত সহজ ভাবে, পথে যেতে পাশের পথিকের সঙ্গে যেমন সহজভাবে আলাপ হয়, তেমনই সহজভাবে। আশ্চর্য!

ওই প্রথম দিনেই সন্ধ্যার সময় ধীরানন্দের সঙ্গে দেখা হল। মেজো ভাইয়ের মত অবিকল

চেহারা। খালি পায়ে, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে ঘামে ভিজে গেঞ্জি গায়ে এসে কাছারির দাওয়ায় উঠে থমকে দাঁড়াল। সীতারাম ঘরে আলো জেলে বসে ছিল ছাত্রদের প্রতীক্ষায়। অন্য কেউ ছিল না বাইরের বাড়িতে। ধীরানন্দ এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল।

আপনি নতুন মাস্টার মশাই ?

মেজো খোকার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখে তাকে চিনতে সীতারামের দেরি হল না। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বুঝতে পারলে না, প্রণাম করবে অথবা নমস্কার করবে—কোন্‌টা করা উচিত।

আপনার আলোটা একবার নেব ? ফুটবল খেলে এলাম, পা-হাতটা ধুয়ে নিই।

চলুন। আমিই দেখাই আলো।

ঘাটে হাত-পা ধুয়ে বললে, তা হলে বাড়ির গলিটাতেও একটু আলো দেখান, আমাদের বাড়ির চারিপাশে বেজায় সাপ।

সীতারাম উৎসাহিত হল এবং সহজ আলাপের ধারার মধ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে অনায়াসে ধীরানন্দের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, দাঁড়ান, তা হলে আলো নিয়ে আমি আগে যাই।

ধীরানন্দ বললে, গেল বার আমাদের বাড়িতে একদিনে ছত্রিশটা গোখরোর বাচ্চা বেরিয়েছিল।

ছত্রিশটা। বাড়িতে কোথাও বাচ্চা হয়েছিল তা হলে।

না। বাড়িতে হয় নি। সবগুলোই প্রায় বাড়ির বাইরে থেকে ভিতরের দিকে আসছিল। রাস্তা-ঘরেই মারা পড়েছিল ষোলটা, বারদরজায় পাঁচটা, সব বাইরে থেকে বাড়ির দিকে ঢুকেছিল। উঠানে তেরোটা। ঘরের ভেতরে কেবল দুটো। একটা ভাঁড়ার-ঘরে, আর একটা—সেইটেই অবাক করে দিয়েছিল সকলকে। দালান—ঘর—দরদালান পার হয়ে লক্ষ্মীর ঘর, তার পিছনে বাসনের ঘর, তার জানলা নাই, একটি শুধু দরজা, দিনের বেলা আলো নিয়ে ঢুকতে হয়। সেই ঘরে গঙ্গাজলের বড় হাঁড়ির মধ্যে কেমন করে গিয়ে পড়েছিল। আচ্ছা, আপনাদের গাঁয়ে সাপ কেমন ?

সাপ আছে বৈকি।

কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে সাপ কখনও মেরেছেন ?

না। সীতারাম বললে, তবে শুনেছি বটে যে, কার্বলিক অ্যাসিড দেবামাত্র সাপ মরে যায়।

দেবামাত্র মরে না। সেবার আমি দিয়ে দেখেছি। কুঁকড়ে অনেক ছট্‌ফট করে মরে। ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। তবে গন্ধে সাপ আসে না, এটা ঠিক।

বলতে বলতে তারা বাড়ির মধ্যে এসে পড়েছিল। ধীরানন্দ হেঁকে বললে, শ্যামু, দেবু, মাস্টার মশায় দাঁড়িয়ে আছেন তোমাদের। মেক হেস্ট্‌।—বলেই সে উপরে চলে গিয়েছিল।

সে চলে গেলে সীতারামের মনে হয়েছিল, বড় চমৎকার লোক তো! কোথায় উগ্রভাষী! বিস্ময়জনকই বা কি আছে এর মধ্যে!

এই সাত দিনের মধ্যে আরও অনেকবার দেখা হয়েছে, বিশ-ত্রিশ বার তো হবেই, কথাবার্তাও হয়েছে বার দশেক। ওই এক ধারারই কথা।

ধীরানন্দ সকালবেলা পড়তে যায় এখানকার স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টারের কাছে। রাত্রে পড়ে বাড়িতে, বাড়ির ভিতরে উপরে ধীরানন্দের পড়ার ঘর। সেখানে নাকি অনেক বই আছে। ভাল ভাল বাংলা ইংরেজী বই। সীতারামের ইচ্ছা হয়, বই নিয়ে পড়ে। পড়ার ঘরও দেখতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বলতে পারে না। আলাপ-পরিচয় হয়েছে, বেশ সহজ সরল ভাবেই হয়েছে, কোথাও কোনখানে এতটুকু বাধার কাঁটাও অনুভব করে না; কিন্তু তবু ছেলেটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে ওকে জড়িয়ে ধরবার মত সান্নিধ্যে আসা যায় না। সংসারে এক-একজন লোক আছে, যাদের গায়ে হাত রাখলে মুখেও কিছু বলে না, হাতও ঠেলে ফেলে দেয় না, অথচ হাসতে হাসতে এমন অত্যন্ত সহজভাবে হাতখানি নামিয়ে দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নেয়, যাতে আঘাত লাগে না, এমন কি এতটুকু অপ্রতিভও হতে হয় না—তেমনই ভাবে ও নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে।

সীতারামও অগ্রসর হয় নাই। সেও এরই মধ্যে নিজের দৈনন্দিন কাজের একটি বাঁধাধরা ছক তৈরী করে নিয়েছে। রাত্রে বাড়ি যায়। ভোরবেলা তার বাবার সঙ্গেই ওঠে। জামা এবং গেঞ্জিটি কাঁধে ফেলে ছাতা, লণ্ঠন ও লাঠি হাতে সে রওনা হয়। রত্নহাটা এবং তাদের গ্রামের মধ্যে ছোট নালা আছে, উপরের একটি ঝরনা থেকে জল বারো মাস প্রবাহিত হয়ে নদীর দিকে চলে যায়, সেই নালার কাছে এসে জামা গেঞ্জি ছাতা লণ্ঠন লাঠি রেখে প্রাতঃকৃত্য সেরে নেয়; নালার দুই ধারে অজস্র বাঘাভেরেণ্ডার গাছ, একটি গাছ তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে দাঁতন করে। আরও খানিকটা এসে রত্নহাটার প্রান্তভাগে বহুকালের পুরানো ছায়াঘন যে বটগাছটি আছে, তার তলায় এসে গেঞ্জি জামা পরে নেয়; চাপ দিয়ে দুই হাত বুলিয়ে চুলগুলিকে বসিয়ে আঙুল চালিয়ে বিন্যস্ত করে, কোঁচাটি বার দুয়েক ঝেড়ে নিয়ে আবার রওনা হয়; সাড়ে ছটার মধ্যেই সে এসে বাবুদের বাড়িতে হাজির হয়। ঘরখানির চাবি দুটি—একটি থাকে বাড়িতে, অন্যটি থাকে তার কাছে। ঘর খুলে সে জামা গেঞ্জি রাখে; একটি দেওয়াল-আলনা সে এনেছে বাড়ি থেকে, হুগলীতে কিনেছিল, সেই আলনায় ঝুলিয়ে দেয়। নিজের গাড়ু এবং গ্লাসটি মেজে নেয়। গামছাখানিতে বারকয়েক মুখ মুছে কেচে মেলে দেয়। তারপর ঘরে যে পুরানো আমলের টেবিলটি আছে, সেই টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ায়। টেবিলটির একটি ড্রয়ার সে নিয়েছে, সেই ড্রয়ারটি একবার গুছিয়ে নেয়; পেন্সিলের কাটা মুখ ঘুরিয়ে দেখে, কাটবার প্রয়োজন থাকলে কাটে, ভোঁতা হয়ে থাকলে লঘুহাতে ছুরি চালিয়ে স্মচালো করে; তার পর এক টুকরো ভাঙা প্লেটে ছুরিটিতে বারকয়েক

শান দিয়ে নেয়। এই সময় আসে শ্যাম্ এবং দেবু, সদ্য-ঘুমভাঙা ফুলো ফুলো মুখে এসে দাঁড়ায়। মায়ের ব্যবস্থায় এবং শৃঙ্খলায় তারা পরিচালিত, মুখ ধুয়েই তারা আসে। সীতারাম তবু নিজের কর্তব্য করে, সে দেখে তাদের দাঁত বেশ ভাল পরিষ্কার হয়েছে কিনা, চোখের কোণে পাতায় পিচুটির কণা লেগে আছে কিনা। দেখবার সময় সীতারাম ওদের মুখ থেকে সদ্য-লুচি-খাওয়ার দরুন একটা গন্ধ পায়। এই গন্ধে এবং তাদের গ্রামের আপনাদের ছেলেদের পাটালি-গুড়মুড়ি-খাওয়া মুখের গন্ধের সঙ্গে একটা পার্থক্য সে অনুভব করে। যতদিন ছেলেরা দুধ খেয়ে বড় হয়, ততদিন সব ছেলের মুখের গন্ধ একরকম। তার পরই তফাত আরম্ভ হয়।

ছেলেরা পড়তে বসে। কানাই রায় চা নিয়ে আসে বাড়ির ভিতর থেকে, নায়েব খায়, কানাই রায় খায়, সীতারাম কিন্তু খায় না। নিয়মিত খায় না। মাত্র একদিন সে এর মধ্যে খেয়েছে, সেদিন খুব বর্ষা নেমেছিল।

আটটা নাগাদ আসে জলখাবার। সীতারাম জল খেতে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু মা শুনবেন না কিছুতেই। তিনি পাঠাবেনই, চাকর নিয়ে আসে—চারিখানি রুটি, ঘিয়ে-ভাজা মরিচ-মাখানো চারটি সিদ্ধ আলু, খানিকটা গুড়। সীতারাম রোজই একটা রুটি, দুটি আলু এক চামচে পরিমাণ গুড় নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দেয়। আজই অবশেষে একটা রফা হয়েছে, মা সীতারামের একখানি রুটি নেওয়াই মেনে নিয়েছেন।

সীতারাম হাত জোড় করে বলেছে, আর তো দুদিন বাদেই পাঠশালায় বসতে হবে মা, এগারোটার সময়; সাড়ে দশটায় ভাত খেতে হবে। চারখানা রুটি খেয়ে কি আর ভাত খেতে পারব মা?

চারদিন পর বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু, স্বর্গের বিদ্যাদাতা তিনি, তাঁর নামাঙ্কিত বারেই পাঠশালা খোলা প্রশস্ত, তা ছাড়া ওই দিন দিনটাও ভাল আছে। ওই দিনই সীতারামের পাঠশালা বসবে। পাঠশালার জন্য মা অনেক চেষ্টা করেছেন। ফলও অবশ্য কিছু সীতারাম যা আশা করেছিল, তা হয় নাই।

মা বলেছিলেন, ছোট ছোট ছেলেদের দশটার সময় ভাত খেয়েই ইস্কুলে ছুটতে হয়, আধ মাইলের বেশি পথ। তুমি যদি পাড়ার' মধ্যে ঘরের দরজায় চণ্ডীমণ্ডপে এগারোটায় পাঠশালা খোল, ইস্কুলের মাইনে কম নাও, তবে সকলেই ছেলে তোমার পাঠশালায় দেবে।

সীতারামের কাছেও এ যুক্তি আকাট্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে গেল, যুক্তি অকাট্য হলেও লোকে যুক্তির ধার দিয়ে গেল না। তারা ইস্কুল ছাড়িয়ে ছেলেদের পাঠশালায় পড়তে দিতে রাজী হল না।

জগদ্ধাত্রী-ঠাকুরুন এ পাড়ার প্রবীণা ঝিউড়ি মেয়ে। তিনি সেদিন এই বাবুদের বাড়িতেই মাকে বললেন, সীতারাম উপস্থিত ছিল তখন, বললেন, হাজার হলেও ইস্কুলের পড়ায় আর

পাঠশালার পড়ায় ধীরুর মা। তুমিই বল। কই, তুমি ছাড়াবে ইস্কুল ছেলেদের?

হেসে মা বললেন, আমার ছোট ছেলে দুটি তো ইস্কুলে পড়ে না ঠাকুরঝি, তারা তো ওর কাছেই পড়ে।

সে পেরাইভেট পড়ে। দুটি ছেলেকে নিয়ে মাস্টারটি দু বেলা ঘষে। সে এক, আর তোমার পাঠশালার গোলে হরিবোল এক। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমার ভাইপো তিনটিকে দিতে পারি যদি মাস্টার তোমার ছেলেদের মত পেরাইভেট পড়ায় দু বেলা। তা তিনজনের জন্যে তিন টাকা দোব। ছোটটি তো ধর পড়ে না—অ-আ আর ক-খ। তার পড়া নামে, আগলানো শুধু। তা তবুও তোমার তিন টাকাই দোব।

এ পাড়ার পতিতপাবনবাবু একজন প্রবীণ এবং মাতব্বর—তাঁকেও মা ডেকেছিলেন, তিনি বললেন, ও তো একটা বালক। শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ও কি জানে? ইস্কুলে পাঠশালা থাকতে আবার পাঠশালা। হুঁ।

এখানকার ইস্কুলের প্রাইমারী বিভাগ ইস্কুলের সঙ্গে নামে স্বতন্ত্র হলেও ইস্কুলেরই একটা অংশ। সেখানে তিনজন মাস্টার আছেন। একজন শুধু প্রবীণ, সে আমলের ছাত্রবৃত্তি পাস, আর দুজনের একজন ম্যাট্রিক ফেল, অন্যজন নর্মাল পাস। দুজনের একজন সেকেণ্ড মাস্টারের জামাই, অন্যজন হেডমাস্টারের গুরুদেবের ভাইপো। এদের কিন্তু দুজনেরই বয়স কম, সীতারামেরই বয়সী, পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। প্রবীণ যিনি তিনি প্রবীণ হয়েছেন বলে পাঁচ ঘণ্টা ইস্কুলের মধ্যে আড়াই ঘণ্টা চেয়ারে বসে না ঘুমিয়ে পারেন না।

মা সীতারামকে তবু আশ্বাস দিলেন, হাসিমুখে বললেন, ওঁদের কথায় তুমি দমে যেয়ো না বাবা। একটা ভাল কাজে অনেক বাধা আসে।

এল, পরের দিনই আবার বাধা এল। সীতারাম খেতে বসেছিল; হঠাৎ একটি মহিলা এসে উপস্থিত হলেন। কই ধীরুর মা?

কে?—মা বেরিয়ে এলেন।

আমি। দাদা পাঠালে তোমার কাছে।

বাইরে থেকে পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, বল্, আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

কি বল?

মহিলাটি গম্ভীরভাবে বলে গেলেন, চণ্ডীমণ্ডপের তোমরা অবিশ্যি মোটা শরিক, বারো আনা অংশ তোমাদের—সব সত্যি কথা, কিন্তু তা বলে তো যা-ইচ্ছে তাই করতে পার না চণ্ডীমণ্ডপ নিয়ে।

মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কি ব্যাপার?

তিনি বললেন, পাড়ার মধ্যে মাঝখানে দেবস্থান, বউ-ঝি এরা সব যায় আসে, এখানে তুমি তোমার স্বামীর নামে নাকি পাঠশালা বসাচ্ছ? এটা কি ঠিক হচ্ছে?

বাইরে থেকে মহিলাটির দাদা এবার হেঁকে বললেন, ঠিক হচ্ছে-টচ্ছে নয়। সে হবে না। সে আমি করতে দোব না। চলে আয় তুই।

তিনি চলে গেলেন।

সীতারাম বললে, থাক্ মা, যখন এত—। কথা শেষ করতে পারলে না সে।

মায়ের মুখ থমথম করছিল। তিনি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবছিলেন কিছু, হঠাৎ বললেন, আমাদের কাছারির পূর্ব দিকের বারান্দায় পাঠশালা খুলবে তুমি।

সেই স্থির করেই সন্ধ্যার মুখে সে গেল ইস্কুল-সাব্-ইন্সপেক্টারের কাছে। রত্নহাটায়ই একজন সার্কল-সাব্ইন্সপেক্টার থাকেন। পাঠশালাগুলির তিনিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সাব্ইন্সপেক্টার বসে ছিলেন বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের বাসায়। ভালই হল সীতারামের, হেডমাস্টার মশায় তার এককালের শিক্ষক, তাঁর কাছেও অনুমতি নেওয়া হবে। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে সে, সাব্ইন্সপেক্টারবাবুকে নমস্কার করলে। তার পর সবিনয়ে নিবেদন জানালে।

সাব্ইন্সপেক্টার বললেন, বেশ, করুন পাঠশালা, চলুক কিছুদিন, বছরখানেক যেতে দিন, তার পর দরখাস্ত করবেন। তখন দেখেশুনে যা উচিত হয় করা যাবে।

হেডমাস্টার গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন প্রথম থেকেই, তিনি বললেন, এর জন্য আমায় বলছ কেন তুমি?

আমি আপনার ছাত্র। আমি এখানে পাঠশালা করছি, তাই অনুমতি চাচ্ছি।

অনুমতি তো পারব না দিতে। এখানে আমাদের একটি প্রাইমারী সেক্শন রয়েছে। তোমাকে পাঠশালা করবার অনুমতি দিয়ে কেমন করে তার ক্ষতি করতে বলব, বল?

এর উত্তর দিতে পারলে না সীতারাম; শুধু একটু দুঃখিত হল। সেও তো তাঁর ছাত্র। তার মঙ্গল দেখাও কি তাঁর কর্তব্য নয়?

মাস্টার মশায় আবার বললেন, নিজের গ্রামে পাঠশালা করলে না কেন?

আজ্ঞে, সেখানে আমার জাঠতুত ভাই পাঠশালা করেন।

তবে? এখানে যে আমাদের নিজেদের পাঠশালা-বিভাগ আছে বাপু।

এবার সীতারাম উত্তর দিলে, বললে, আমাদের গ্রাম ছোট, সেখানে কটিই বা ছেলে! এখানে বড় গ্রাম, কুড়িটা ছেলে হলেই আমার পাঁচটা টাকা হয়ে যাবে। আর অনেক ছেলে তো পড়ে না আপনাদের পাঠশালায়, বেশি মাইনে—

তা হলে, ভদ্রপাড়া ছেড়ে তুমি অন্য পাড়ায় পাঠশালা করবার চেষ্টা কর। হেসে বললেন, দেশের সেবাও হবে। তাদের জুটিয়ে পাঠশালা করে যদি 'অন্ধকার থেকে আলোকে' আনতে পার, তবে একটা কীর্তি থাকবে তোমার।

সীতারাম মর্মাহত হল তাঁর কথার ভঙ্গীতে। সে চলে এল সেখান থেকে।

মা আবার পাঠালেন তাকে মণিলালবাবুর কাছে।—ওঁকে একবার বলে এস। উনি বললে, চণ্ডীমণ্ডপের আপত্তি আর কেউ তুলবে না।

মণিলালবাবুকে প্রণাম করে সে দাঁড়াল। বললে সব। আশ্চর্য! সেদিনের সে মানুষই নন ইনি, কথার স্বরও আলাদা। তিনি শুধু বারকয়েক বললেন, হুঁ। হুঁ। হুঁ। শুনলাম বটে। শেষে নির্লিপ্তের মত বললেন, দেখ, চেষ্টা কর। তার পর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ডাকলেন, চৈতন! চৈতন!

উত্তর না পেয়ে বললেন, গড়গড়ার কল্কেটা নিয়ে বাইরে কাউকে দাও তো হে ছোকরা, আগুন কেটে গেছে, আগুন দিতে বল।

সীতারাম স্তম্ভিত হয়ে গেল, কিন্তু আজ্ঞা পালন না করে পারলে না। মা শুনে বললেন, মণি ঠাকুরপো এমন অদ্ভুত মানুষই বটেন। যখন যেমন খেয়াল হয় বলেন।

বৈঠকখানায় এলে কানাই বললে, ভদ্দলোক মাত্রেই খেয়ালী হে।

সীতারাম মর্মান্তিক বিষণ্ণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। উত্তর না দিয়ে সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তার পর মুখ নামিয়ে বসে রইল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল; হেডমাস্টার মশায়ের কথাটা মনে পড়ল। ভদ্রলোক পাড়া বাদ দিয়ে অন্য পাড়ায় পাঠশালা করলে কি হয়? অনেক ভেবে সে একটি ক্ষেত্রও আবিষ্কার করলে। সাহাপাড়া এবং জেলেকৈবর্ত-পাড়ায় পাঠশালা খোলার কথা মনে হল।

সাহাপাড়ার ছেলেরা অবশ্য অধিকাংশই লেখাপড়া শেখবার চেষ্টা করে। সাহা অর্থাৎ শৌণ্ডিকেরা সমাজে জল-অচল সম্প্রদায় হলেও, আর্থিক অবস্থায় খুব সম্পন্ন শ্রেণী। কুলগত মদের দোকান তো আছেই, তার উপরে এদের আছে মহাজনী ব্যবসা। যে যেমন, তার তেমন কারবার—গহনা বাসন বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়; খালাসের একটা সময় নির্দিষ্ট থাকে, সে সময় পার হলেই খাতককে জানিয়ে দেয়, ও জিনিস আর তুমি পাবে না। আচারে বেশ-ভূষাতেও ওরা ভদ্র, কিন্তু তবু ইস্কুলে পাঠশালায় ওদের স্থান নীচে। শিক্ষকেরা ওদের ঘৃণার চোখে দেখেন। সীতারামের মনে আছে, তাদের সঙ্গে পড়ত, সাহাদের খুদে আর পচা। মাস্টারেরা ডাকতেন, এই শৌণ্ডিক!

কেউ কেউ বলতেন, মদ-ঘাঁটার বেটা। সীতারামের মনে হল, ওদের জন্য যদি সে পাঠশালা করে, তবে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হয়ে তার পাঠশালায় পড়বে।

জেলে-কৈবর্তদের ছেলে অনেক। শীত গ্রীষ্ম বারোমাস বটতলায় সকাল থেকে সন্ধ্যে এক জায়গায় জমে বসে তারা, হি-হি করে হাসে, পরস্পরকে গালিগালাজ করে। ওরা পাঠশালায় যায় না। ওদের অনেকের ধারণা, লেখাপড়া শিখতে নাই ওদের। যে শিখবে, সে মরে যাবে। অথচ কৈবর্তদের পয়সা আছে—মাছের ব্যবসার পয়সা। ওদের মোড়ল বিপনের একান্ত ইচ্ছে ছেলেকে পাঠশালায় দেবার। হাইস্কুলের পাঠশালায় ভর্তি করেও দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে

দুদিন গিয়েই ছেলেটা আর যেতে চায় নাই। কেন যেতে চায় না, সে সীতারাম অনুমান করতে পারে। সে ভয় না থাকলে, ওরাই বা আসবে না কেন?

উঠে বসল সীতারাম। জ্যোতিষ সাহা সাহাপাড়ার মাতব্বর, লোকও ভাল। কৈবর্তরাও সাহা মহাশয়ের অনুগত। বিপনেকে জ্যোতিষ 'কাকা' বলে, বিপনে বলে, 'জ্যোতিষ বাবা'।

হ্যাঁ, তাই করবে সে। ওদের কাছেই যাবে।

শ্যামু এবং দেবুকে দশটার সময় ছুটি দিয়ে স্নান সেরে নিলে; স্নান করতে তার খানিকটা সময় লাগে। পুকুরে সে স্নান করে না। এ বিষয়ে তার স্কুল-জীবনে দুজন প্রাচীন শিক্ষকের সে অনুগামী হয়েছে। যে পণ্ডিত মশায়টি তার বাপকে, তাকে নর্মাল ইস্কুলে পড়াতে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি এবং এই স্কুলের থার্ডমাস্টার দুজনে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর খুব পবিত্র-চরিত্রের মানুষ। কর্মজীবনে যতদিন ছিলেন, ততদিন তাঁরা দুজনে সাড়ে নটায় গাড়ু নিয়ে গামছা এবং কাপড় কাঁধে ফেলে চলতেন, গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরবর্তী ঝরনার দিকে। ঝরনায় স্নান করে গাড়ু দুটিকে ঝরনার জলে ভরে নিয়ে ফিরতেন। সমস্ত দিন সেই ঝরনার জলই খেতেন। সীতারামও গাড়ুটি হাতে নিয়ে গামছা এবং কাপড় কাঁধে ফেলে ঝরনায় যায়। দ্রুতপদে যায়, দ্রুতপদে ফেরে। নিজের ঘরের মধ্যেই একটি দড়ির আলনা টাঙিয়েছে সে। সেই আলনায় কাপড়খানি মেলে দেয়, গাড়ুটি রাখে টেবিলের নীচে। কোন বাক্সভাঙা এক টুকরো বেশ প্লেন কাঠ যোগাড় করেছে, সেটি ঢাকা দিয়ে তার উপর একটি নুড়ি চাপা দেয়, তার পর হুগলীতে পাঠ্যজীবনের অভ্যাসমত বাঁ হাতে আয়নাটি ধরে চিরুনি চালিয়ে চুল আঁচড়ায়। টেরি কাটে না, সমান করে সামনে টেনে কপালের উপরে চুল বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দেয়। একটি টিকি আছে, সেটিকে সযত্নে সামনের দিকের চুলের সঙ্গে টেনে মিশিয়ে বেমালুম মিলিয়ে দেয়। এর পর ভাত খায়।

আজ ভাত খেয়েই গেঞ্জি জামা পরে ছাতাটি হাতে বার হল; গেল সাহাপাড়ার দিকে। জ্যোতিষ সাহা মশায়ের পাকি মদ ও গাঁজা-আফিং-সিদ্ধির দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

জ্যোতিষ আশ্চর্য হয়ে গেল। তার দোকানে রমানাথ মোড়লের ছেলে কেন? ছেলেটি লেখাপড়া শিখেছে, তা ছাড়া ভাল ছেলে বলেই তো সকলে জানে তাকে।

একটি নমস্কার করে সীতারাম বললে, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি? বল।

আপনাদের পাড়ায় আমি পাঠশালা করতে চাই। আপনাদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা।

জ্যোতিষ সবিস্ময়ে বললে, পাঠশালা!

হ্যাঁ, পাঠশালা। সীতারাম তার ভেবে-রাখা যুক্তিগুলি সাহাকে জানাল। বললে, ইস্কুলে ছোট ছেলেদের দশটার সময় ভাত খেয়ে ছুটতে হয়—দেড় মাইল পথ—ভদ্রলোকের বাড়িতে অবিশ্যি দশটায় ভাত হয়, কিন্তু আমাদের মত গেরস্ত-বাড়িতে মেয়েদের অসুবিধে

হয়। এ ধরুন, আমি এগারোটার পাঠশালায় আসব ; বাড়ির দোরে পাঠশালা—মেয়েরা এক ঘণ্টা সময় পাবে, তা ছাড়া ভাত না হল, মুড়ি খেয়ে পাঠশালায় এল, একটায় টিফিন—দিব্যি এক দৌড়ে বাড়ি এসে খেয়ে আবার চলে গেল। হঠাৎ কারও ছেলেকে দরকার হল, হাঁক দিলে—মাস্টার, রামকে ছুটি দাও। হয়ে গেল। তা ছাড়া মাইনেও কম করব আমি, গেরস্ত-ঘরে দু আনা পয়সা কম নয়।

এতগুলি যুক্তির অবতারণা করে সে সাহার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, কথাগুলি সাহা মশায়ের মনে লাগল কিনা! সাহা মশায় ভাবছিল। কথাগুলি তার সত্যই মনে লেগেছে।

সীতারামের আবার একটা কথা মনে এল, বললে, এ ছাড়াও ধরুন, ইস্কুলের মাইনে মাসের সাত তারিখে না দিলে ফাইন লাগে, তার পর মাস শেষ হল, অমনিই নাম কেটে দিলে। গরিব গেরস্ত যারা, তারা প্রতি মাসেই কি মাইনে ঠিক ঠিক দিতে পারে? পাঠশালাতে সেও একটা সুবিধে, নাম কাটা যাবে না, ফাইন লাগবে না।

এতে সাহা মশায় হাসলেন, বললেন, ফাইন লাগবে না, সেটা সুবিধে বটে, কিন্তু মাইনে না দিলে মাসের শেষেও যদি নাম কাটা না যায়, তবে তাতে তোমার সুবিধে হবে না, মাইনে আর কেউ দেবে না।

লজ্জিত হল সীতারাম, মনে হল, সে যেন কাঙালপনা করে ফেলেছে। নিজেকে সম্বরণ করে সে বললে, তার জন্যে একটা কমিটির মত থাকবে, আপনারা পাঁচজন একমত হয়ে একটা কমিটি করে দেবেন। আপনি প্রেসিডেন্ট হবেন। মাসের শেষে আমি খাতাপত্র একদিন দেখাব। আপনার নাম কেটে দিতে বলেন, দোব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বললে, অবিশ্যি আমি প্রাণ দিয়ে খেটে পড়াব, মাইনে চাই বৈকি আমার। কিছু পাব বলেই তো কাজ করতে এসেছি। কিন্তু আমিও তো চাষী গেরস্ত-ঘরের ছেলে—গেরস্ত-ঘরের দুঃখ বেদনা আমি জানি। আমার দুঃখের সঙ্গে ছাত্রদের বাড়ির দুঃখের কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে। কেউ যদি এক মাস মাইনে দিতে না পারে, আপনারা যদি দেখেন, মাইনে বাকি ইচ্ছে করে পড়ে নাই, তবে তার নাম কাটব না, থাকবে। আর অভাব যদি বেশী হয়, তবে থাকবে দু মাস মাইনে বাকি। দেবে পরে। তাও যদি মনে করেন আপনারা যে, বাকি মাইনে ছেড়ে দিলে ভাল হয়, তাই দোব আমি।

সাহার দোকানের সামনেই বাবুদের একটি বাগানওয়ালা পুকুর। সেই পুকুরের জলে তখন বাতাসে ঢেউ উঠেছে, শ্রাবণের বর্ষার উতলা বাতাস। ঢেউয়ের মাথায় সূর্যের ছটা ঝকমক করছে। সাহা সেই দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বললে, আমি ভাই ভেবে দেখি। পাড়ার পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

সীতারাম এইবার শেষ কথা বললে, তা ছাড়া এ হবে আপনাদের ছেলেদের জন্যে

পাঠশালা, বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে আপনাদের ছেলের তফাত থাকবে না। অসম্মান হবে না আপনাদের।

জ্যোতিষ চকিত হয়ে মুখ তুললে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রথমে সীতারামের মুখের দিকে, তার পর সামনের দিকে ওই আলো-ঝলমল পুকুরের দিকে।

* * *

আরও দুদিন চলে গেল।

পাঁচজনকে নিয়ে সেই পরামর্শই চলছে এখনও।

গন্ধবণিকপাড়ায় কয়েকজন ইস্কুলের বন্ধু আছে তার। দুদিন সে তাদের ওখানেও গেল। সেখানে বিশেষ উৎসাহ পেলে না। এরা আবার এক বিচিত্র মানুষ। ওদের মহলেই অল্পবয়সীরা তালব্য 'শ' ইংরাজী 'এস' এর মত উচ্চারণ করে। বন্ধু দেখলেই সমাদর করে সম্ভাষণ করে বলে—স্না। এদের প্রবীণেরা অত্যন্ত বিজ্ঞ। বললে, আচ্ছা, কর পাঠশালা। দেখি পড়াশুনা কেমন হয়, তারপর দেখা যাবে।

সেদিন সমস্ত দিনটা দোরে দোরে ঘুরে বিকেলে ফিরল। জল খেয়ে অবসন্ন মনেই গাড়ু হাতে নিয়ে গামছাটি কাঁধে ফেলে খালি গায়ে সে বেরিয়ে পড়ল। এটি তার নিত্যকর্ম। ঝরনার ধারে বেড়াতে যায়। আরও একটি জিনিস থাকে—একখানি আসন, আসনখানি সে বাড়ি থেকে এনেছে। আকাশে মেঘ থাকলে ছাতাটি নেয় বগলে। গ্রাম পার হয়ে চলে যায় সেই ঝরনার ধারে। একটা কাঁকর-পাথর-ভরা গাছপালাশূন্য অনুর্বর টিলার নীচে ঝরনা। সে ওই টিলাটার কোন একটা স্থানে গিয়ে আসনখানি পেতে বসে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসেই থাকে। এইটুকুও তার সেই পুরানো আমলের পণ্ডিত মশায়ের অনুকরণ। ভাবে বসে বসে। ভাবনা তার—পাঠশালার ভাবনা। পাঠশালা না হলে খাওয়াদাওয়া আর চার টাকা মাইনেতে চাকরি সত্যই অত্যন্ত লজ্জার কথা। বাবার কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

বাবা তার এখনও বলছেন, ঘরে বসে চাষবাস দেখ বাবা। মা-লক্ষ্মীর সেবা কর। "নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন, এই খেয়ে যায় যেন জন্ম জন্ম।" চাষ ছাড়লে চাষ জাহান্নমে যাবে। আমি আর কদিন! এসব হল পিতিপুরুষের কথা।

কথা পিতিপুরুষের বটে। সত্যও বটে। তার জাঠতুত ভাইয়েরা—ওই কিশোরদের চাষের অবস্থা সত্যই খারাপ হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। বড়দাদা মাইনর পড়ে পাঠশালা করেছে গাঁয়ে, সে হাল ধরে না, চাষও দেখে না। মেজো চাকরি-চাকরি করে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর এম. এ আর ল পড়ছে। ছোটকা এবার ম্যাট্রিক দেবে। জেঠা বুড়ো হয়েছে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। তবুও চাষের ভার সব ওই বুড়োর উপর। কৃষাণের উপর

ষোল আনা নির্ভর। ফলে, জেঠার ক্ষেতে তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সকলের চেয়ে কম ফসল হয়। কথা ঠিক। কিন্তু বাড়িতে থেকে চাষ নিয়ে থাকার কথা ভাবতে গেলে বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। চাষ করলে আর কি তাকে জমিদার-বাড়িতে বসতে আসন দেবে? ওই মণিলালবাবু সেদিন তাকে কল্কেটা নিয়ে বাইরে দিতে বলেছেন, সে চাষীর ছেলে বলে। বললেও, তাকে তামাক সেজে আনতে বলতে পারেন নাই। লেখা-পড়া শিখে মাস্টারি করবে শুনে তাঁকে সেদিন ভালও বলতে হয়েছে। নিজ হাতে চাষ করলে আর কি তিনি এটুকুও বলবেন? এবার তামাক সেজে আনতে বলবেন।

পেটে খেয়ে বেঁচে থাকাই কি সব?

তার সেই পুরানো পণ্ডিত মশায় বলতেন, শূকরেও দিনাতিপাত করে, সমস্ত দিন ঘুরে সেও নিজের উদরপূর্তি করে।

তার বাবা আরও বললেন, বেশ তো পাঠশালা করলি যদি, তবে গাঁয়ে তোর দাদা করছে, দাদার সঙ্গে লেগে যা। না হয় তো পাশের গাঁয়ে এই রাধিকাপুরে কর্।

রাধিকাপুর তাদের গ্রামের পাশেই, তাদেরই গ্রামের মতো ছোট চাষীর গ্রাম, করলে অবশ্য হয়। হয়তো মাসে পাঁচ-সাত টাকা মাইনে উঠবে। কিন্তু সেও তার মনে ধরে না। রাধিকাপুরের পণ্ডিত মশাইয়ে আর রত্নহাটার পণ্ডিত মশাইয়ে কি তুলনা হয়? তা ছাড়া ছাত্র? ওই যে জমিদার-বাড়ির দুটি ছেলে, ফুটফুটে মুখ, ঝকঝকে চোখ, টপটপ কথার উত্তর দেয়, চটপটে ভাব, এসব রাধিকাপুরের ছেলেরা পাবে কোথায়? মণিবাবু সেদিন বলেছেন বটে, গ্রামে ইস্কুল থাকতেও আমাদের ছেলেরা কেউ কিছু করতে পারলে না, তোমরা করছ, ভাল, ভাল। তবু ওরাই তো এ অঞ্চলের প্রধান। ওরাই তো এগিয়ে যায় সব কাজে। সাহেবসুবোরা এসে ওদের সঙ্গেই আলাপ করে, কথা বলে। ওরা লেখাপড়া শেখে না অবহেলা করে, জানে, পাস না করলেও ওদের প্রতিষ্ঠা কেউ কাড়তে পারবে না। ওদের মাস্টার মশায় হতে পারায় একটা কত বড় গৌরব! শ্যামুকে আর দেবুকে যদি সে পড়ায় তারা যদি এককালে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়, তা সে তো বলতে পারবে, শ্যামু-দেবুর মাস্টার সে। শ্যামু-দেবুর একজন যদি জজ হয়, একজন হয় ম্যাজিস্ট্রেট—তা হলে? বুকের ভিতরটা তার কেমন করতে থাকে।

ঝরনার কাছাকাছি গ্রাম তাদেরই গ্রাম। তাদের গ্রাম থেকেই মেয়েরা এসে ঝরনার জল নিয়ে যায়। সবুজ ধানে ভরা মাঠের পথ দিয়ে ক্ষারে কাচা মোটা কাপড় পরে বউয়েরা মেয়েরা জল নিয়ে যায়। বউদের মাথায় ঘোমটা, মেয়েরা ঘোমটা দেয় না, তাদের মাথার খোঁপাগুলির উপর সন্ধ্যার সূর্যের আলো পড়ে; রুক্ষ চুলের এলো-খোঁপাগুলি কলসী নিয়ে চলতে পা ফেলার ঝোঁকে ঝোঁকে দোলে, বাঁধা খোঁপা যাদের তাদের তৈলাক্ত চুলে আলোর

ছটা বাজে।

মনোরমাও আসবে জল নিতে এদের সঙ্গে। তার সঙ্গে এই সুযোগে রাত্রে বাড়ি গিয়ে দেখা হবার আগেই একবার দেখা হয়ে যাবে। মনোরমা আসছে শুক্রবারে। তার ইচ্ছা ছিল, ওই বৃহস্পতিবারেই আসে। আসবার ট্রেন পাঁচটায়। বৃহস্পতিবার এগারোটায় পাঠশালা খুলবে, ওই দিন পাঁচটায় মনোরমা আসবে, এটা ভাবতে তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার শুধু গুরুবারই নয়, লক্ষ্মীবারও বটে। ধান বেচতে নাই, কন্যা ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপা—কন্যাও পাঠাতে নাই। কাল বাবা রওনা হবেন। তার শ্বশুরবাড়ি থেকে গঙ্গা খুব নিকটে, মাইল দুয়ের মধ্যেই। চাষ শেষ হয়ে গেছে, নিড়ানোর কাজেও কয়েকদিন দেরি আছে। শ্রাবণের শেষে নিড়ান দিলেই ভাল হবে, আগাছাগুলো এখনও বেশ মাথা তুলে উঠে নাই। এই অবসরে বাবা গিয়ে কয়েকদিন থাকবেন, গঙ্গাস্নান হবে। এই চার দিনের মধ্যে বাড়িতে তার কাজ অনেক। বাবা থাকবেন না, এই সময়েই নিজের মনোমত করে ঘরখানিকে সাজিয়ে ফেলতে হবে। বাবা নিজেই অবশ্য বলেছেন, কিন্তু তবুও বাবার সামনে এই সব করতে কেমন লজ্জা লাগে।

আলনাটা সে রত্নহাটায় নিয়ে গিয়েছে। আলনাটা বড় ছোট। ওটাতে ঘরে কোন কাজও হত না। মনোরমার কাপড়, তার জামা কাপড় গেঞ্জি রাখতে একটা বড় আলনা চাই। আলনা একটা সে কিনতে দিয়েছে বাবুদের বাড়ির নায়েবকে, তিনি সদরে গিয়েছেন। দুটো প্যাকিং কেস কিনে রত্নহাটায় সতীশ সূত্রধরকে দুটো শেল্ফ করতে দিয়েছে—বড়টা বাড়ির জন্য, ছোটটা সে রাখবে রত্নহাটার পাঠশালায়।

সন্ধ্যে হয়ে এল, সে উঠল। ঝরনায় মুখ হাত ধুয়ে গাড়ুটি ভর্তি করে নিয়ে সে ফিরল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভ—

"অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কৌমুদী;
মুদিলা সরমে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী।"

তার পর আর ঠিক মনে নাই। স্মৃতিশক্তিটা ভাল নয়। তার জীবনের অকৃতকার্যতার এইটাই সব চেয়ে বড় কারণ। সে কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। আবার ফিরল ঝরনার ধারে। কিছু ব্রাহ্মীশাক তুলে নিয়ে সে ফিরল। রান্না করে খাওয়ার তো সুবিধা হবে না, ছেঁচে রস করে নিয়ে খাবে সকালে। হ্যাঁ। আরও আছে, সামনে আসছে ভাদ্র মাস, পিত্তবৃদ্ধির সময়, এ সময় চিরেতার জল অন্তত এক সপ্তাহ খেতে হবে। শরীরটা ভাল রাখতে হবে। শরীরমাদ্যম্।

বাবুদের বাড়ি ফিরতেই কানাই রায় বললে, কি গো পণ্ডিত, ভমন হল নাকি?

অর্থাৎ ভ্রমণ।

কথাটা একটু যেন বিঁধল সীতারামের গায়ে। কানাই রায় যেন কেমন কদিন ধরে বাঁকা কথা বইছে। 'সীতারাম' বলে ডাকে না। বলে পণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে 'পণ্ডিত মশায়' বলে। বুঝতে পারে সীতারাম কানাই রায়ের কথা। কিন্তু সে কি করবে তার!

'মূর্খ যে, বিছার মূল্য কভু কি সে জানে!'

বণিক সেই যে কুক্কুটকে বলেছিল—"নহে দোষ তোর মূঢ়, দৈব এ ছলনা, জ্ঞানশূন্য করিল গোসাঁই।" মিথ্যা কথা নয়।

কানাই রায় বললে, কি রকম? কথা বলবে না নাকি?

হেসে সীতারাম বললে, রায়, তোমাকে আমি 'কাকা' বলি, তোমাকে অমান্য করতে, কি অশ্রদ্ধা করতে কবে দেখেছ বল দেখি?

রায় একটু অপ্রস্তুত হল। না, না, না।—বলেই কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব ফুটিয়ে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বললে, জ্যোতিষ সাহা লোক পাঠিয়েছিল। তোমাকে একবার যেতে বলেছে সন্ধ্যেতে।

সীতারাম গাড়ুটি রেখে জামা ও গেঞ্জি টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত দেরি করলে না সে।

সাহার দোকানের বারান্দায় একটি গোলমাল হচ্ছে। সীতারাম দোকানের সামনেই থমকে দাঁড়াল। জ্যোতিষ হাত জোড় করে বলছে এই গ্রামেরই বাবুদের ছেলে শিবকিঙ্করকে, আমাকে মাপ করবেন বাবু, আমি হাতজোড় করছি। আমি পারব না। দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে; খাতায় ঠিক দিয়েছি, এখন আর দিতে পারব না।

জড়িত কণ্ঠেই শিবকিঙ্কর বললে, আর দিতে পারবে না?

আজ্ঞে না। জোড়হাত করছি আপনাকে।

জোড়হাত করছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ?

জ্যোতিষ এ কথার উত্তর খুঁজে পেল না।

শিবকিঙ্কর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জড়িত স্বরে বললে, বেশ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

জ্যোতিষের এবার নজরে পড়ল, সীতারাম দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে ডাকলে, এস এস। পণ্ডিত এস।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। শিবকিঙ্কর দাওয়া থেকে নামছিল, সে থমকে দাঁড়াল। বললে, পণ্ডিত? কে পণ্ডিত? পণ্ডিতে মদ খায়?

সীতারামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠল। কি বলবে সে বুঝতে পারলে না। সাহা মশায় তাড়াতাড়ি বললে, আজ্ঞে না, ওটি আমাদের পাশের গাঁয়ের রমানাথ মণ্ডলের ছেলে সীতারাম। নর্মাল পাস করেছে।

রমানাথ মণ্ডলের ছেলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সীতারাম ? সীতারাম মণ্ডল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নর্মাল পাস করেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখানে কি ? মদ খায় না তো, হিঁয়া কাহে ?

আমাদের পাড়ায় পাঠশালা খুলবে, তাই।

হঠাৎ হাসতে লাগল শিবকিঙ্কর। বললে, মণ্ডল, মণ্ডল! অ্যাঁ! মণ্ডল!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চাষা! চাষা! অ্যাঁ! চাষা পণ্ডিত হয়েছে! অ্যাঁ! চাষা কথাটার 'চ'য়ের উচ্চারণটা অদ্ভুত শ্লেষ-তীক্ষ্ণ, ইংরেজী 'এস' এর সঙ্গে উচ্চারণকে মিশিয়ে এমন ধারালো, এমন তীক্ষ্ণ করে তুলেছে যে, ওই শিসালো শব্দটা ধারালো অস্ত্রের মত সীতারামের অন্তরটা ছিন্নভিন্ন করে যাচ্ছে বলে মনে হল। সে সবল যুবা। তার দেহের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল।

জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি বললে, ছি, আপনি ভদ্রসন্তান, বাবুলোক, আপনার কি ওই রকম করে কথা বলতে হয় ?

মাতাল শিবকিঙ্কর নেশার ঘোরে ক্রমাগত হেসেই চলেছিল, বলছিল, চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শুঁড়ি ছাত্র ? চাষা পণ্ডিত হয়েছে, এইবার শুঁড়ি পণ্ডিত হবে। হে-হে-হে—হে-হে-হে!

সীতারাম এবার এগিয়ে এল—বাবুটির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

শিবকিঙ্কর তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলে। কালো চেহারা, পাথরের মত শক্ত শরীর, চোখের দৃষ্টি যেন রাগে জ্বলছে। সে কোন কথা না বলে চলতে আরম্ভ করলে। সীতারামও এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্যোতিষ বাধা দিলে, থাক, যেতে দাও।

কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়ে তখন শিবকিঙ্কর আবার হাসতে শুরু করেছে, হে-হে-হে—হে-হে-হে। চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শৌণ্ডিক ছাত্র! কাগজং কলমং খরচং মাত্র।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সীতারাম ভদ্রঘরের ছেলের মনের কদর্যতা দেখে। জ্যোতিষও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রৌদ্রতপ্ত পাথরের মূর্তির মত।

চার

আকস্মিক একটি ছোট ঘটনা থেকে অঘটন অর্থাৎ যা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না তেমন ঘটনা অনেক সময় ঘটে। ঘটলে, সীতারাম তাকে ভাগ্যের খেলা বলে। শিবকিঙ্করের এই গালি-গালাজ করাটা, ওটা যেন সীতারামের ভাগ্যের খেলা। জ্যোতিষ সাহা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সীতারামকে বললে, তাই হল পণ্ডিত। তুমি পাঠশালা খোল।

সীতারাম তখনও আত্মসম্বরণ করতে পারে নাই। সে শিবকিঙ্করের গমনপথের দিকে রূঢ় পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল; শিবকিঙ্করকে দেখা যায় না, শুধু অন্ধকার থমথম করছে। মনের জ্বালায় আবেগভরে—রূঢ়ভাবেই বলে উঠল, শিবকিঙ্করের ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক চাষা শব্দটা নকল করে সে বললে, চাষা, চাষা! চাষারা মানুষ নয়! শুঁড়িরা মানুষ নয়!

জ্যোতিষ বললে, শুঁড়ির দোর না হাঁটলে বাবুদের দিন যায় না। মদের দোকান নেবার জন্যে বাবুদের ছেলের চেষ্টা কত। দশ-বারোটা দরখাস্ত করেছে আমার নামে, আমি রাত্রে মদ-গাঁজা বিক্রি করি। তা ছাড়া—। হাসলে জ্যোতিষ। শিবকিঙ্করের পথের দিকে সেও একবার তাকালে, তার পর বললে, শুধু মদ নয়। বাবুদের টাকার দরকার হলে তখন কাপড় ঢাকা দিয়ে গয়না এনে—মিষ্টি কথা কত? জান পণ্ডিত, দু-তিনটি ঘর ছাড়া হেন বাবু নাই এখানে, যার কিছু-না-কিছু আমার বাড়িতে নাই। এই যুদ্ধের বাজারে বাবুদের সম্পত্তি আমরাই তিন-চার ঘরে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

সীতারাম বললে, আপনি যদি না মাঝখানে পড়তেন, তবে আমি আজ শিক্ষা দিতাম ওকে।

কজনকে শিক্ষা দেবে? জ্যোতিষের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। নিম্নস্বরে বললে, ও না হয় মাতাল। মুখের সামনে বললে। ওই কথা বাবুদের না বলে কে? আমরা জাতিতে সাহা, আচ্ছা, ভাল। আমাদের জল খায় না, আমরা নীচে মাটিতে বসি, ডাকে আমাদের শুঁড়ি বলে। বেশ, দেশের আচার চলে আসছে, শাস্ত্রে আছে, বহুত আচ্ছা। কিন্তু আমাদের জ্ঞাতি নরেন সাহা ডাক্তারী পাস করে এসেছে, কই, তার ওষুধ—জল-মেশানো ওষুধে তো আপত্তি হয় না? কই, তার বেলা তো এসব কথা বলতে পারে না কেউ? জান, ইস্কুলে তার ছেলেদের মেয়েদের খাতির আলাদা। হঠাৎ জ্যোতিষের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, আমার মনে আছে, ইস্কুলে পড়তাম, পড়াশুনায় ভাল ছিলাম না। একটু থামলে সে। থেমে আবার বললে, তা এখনকার বাবুদের ছেলেরাও তো ভাল ছিল না। এই শিবকিঙ্কর, ও তো আমার সঙ্গে পড়েছে। আমরা যাও বা পারতাম, ও তাও পারত না। মাস্টারের একটি কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না। আর আমাকে কি বলত জান? বলত, মেয়া-ঘাঁটা শুঁড়ি, মেয়া ঘাঁট্‌গে যা। পচুই বেচ্‌গে যা।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার পর চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

বোধ হয় সেই আমলের এই ধরনের অনেক কথা। সীতারামের মনে পড়ে গেল। ইংরেজী উচ্চারণ তাদের গ্রামের এবং তাদের সজাতিদের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের শুদ্ধ হত না। 'এম'কে 'অ্যাম', 'এন'কে 'অ্যান', 'এল'কে 'অ্যাল', 'এস'কে 'অ্যাস' ব'লে ফেলত তারা, সেকেণ্ড মাস্টার বলতেন, 'অ্যাল' নয়—'এল', 'অ্যাম' নয়—'এম', 'অ্যান' নয়—'এন', 'অ্যাল' নয়—'এল' 'র‍্যাল' নয়—'রেল' বুঝলে? 'এস'টা 'অ্যাস' নয়—'এস', অ্যাস তুমি। গর্দভ কোথাকার!

লজ্জিত হত তারা। রসিকতা করে তিনি আবার বলতেন, ভাল করে জিভ ছুলবে, বুঝেছ? পার তো কামার বাড়ির উখো দিয়ে ঘষে পাতলা করে নিও। তার পর শাসন করে বলতেন, এবার যদি 'অ্যাল', 'র‍্যাল' বলবে তো, একটা ব্যাল এনে ঠুকে ঠুকে তোমার মাথায় ভাঙব। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। দিয়ে কুলকর্ম যা আছে করগে যা।

জ্যোতিষ সাহা বললে, তা হলে তাই হল। তোমাকে ডেকেছিলাম, বলতে চেয়েছিলাম, এখন পাঠশালা তুমি বাবুদের ওখানেই কর; আমাদের সব দোনা-মোনা করছে। তুমি আমাকে বলেছিলে বৃহস্পতিবারই খুলতে চাও পাঠশালা। তাই বলেছিলাম আমি সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখি। তা—। মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থেকে সে বললে, না, তা বৃহস্পতিবারে তুমি এই পাড়াতেই পাঠশালা খোল। শুঁড়ির ছেলে, কৈবর্তের ছেলে পড়বে, চাষাপণ্ডিতই আমাদের ভাল। হ্যাঁ তাই ভাল। কথা পাকা।

সীতারাম বললে, দেখবেন আপনি, বছর বছর যদি আমি বৃত্তি নেওয়াতে না পারি, তবে—। কি শপথ সে করবে বুঝতে পারলে না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, দেখবেন, আপনি দেখবেন।

পরের দিন থেকে পাঠশালা খোলার আয়োজন নিয়ে মেতে উঠল। এমন উৎসাহটি সে যেন মায়ের সাহায্যে পাঠশালা খোলার প্রস্তাবে পায় নাই। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী পাঠশালার উদ্যোগ-আয়োজনে তার যেন কিছু করবারই থাকত না। সব ব্যবস্থাই হত মায়ের হুকুমে। আর এ পাঠশালার উদ্যোগ সমস্তই নির্ভর করছে তার উপর। সাহা সম্মতি দিয়েছে, কিছু ছাত্র সে প্রথমে সংগ্রহ করে দেবে এবং পাঠশালার জন্য জায়গাও সে-ই দেবে। সাহা একটা নতুন খামার-বাড়ি করেছে; সেই খামার-বাড়িতে পাঠশালা বসাবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। সাহাপাড়া এবং কৈবর্তপাড়ার প্রান্তভাগেই একটি পুকুরের পাড়। পুকুরের মালিক এখানকার এক ঋণগ্রস্ত বাবু, অর্থের জন্য বন্দোবস্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সাহার বাড়ির কাছেই পুকুর। সাহা নেহাত দর্শক হিসাবে বন্দোবস্তের ডাক দেখতে গিয়েছিল। তার পর চেপে গেল কেমন নেশা, সে-ই সর্বোচ্চ দরে বন্দোবস্ত নিয়ে ফেললে। বন্দোবস্ত যখন নিলে, তখন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখতেও হল; পাঁচিল দিয়ে ঘেরার সময়

একখানা ঘরও তুলে ফেলেছিল। সাহার তিন-চার ছেলে, ভবিষ্যতে লাগবে কাজে।

সাহা নিজেই হেসে বললে, কোন্ কাজের জন্য যে কি হয়, কার ভাগ্যে কে ভোগ করে, এ কেউ বলতে পারে না। ইদানীং ভাবছিলাম, গাঁজা-আফিঙের দোকানটা এইখানে আনব। তা পাঠশালা হয়ে গেল। এখন যোগাড়যন্ত্র কর তুমি।

একখানা চেয়ার চাই, একটা টুল, টেবিলও একটা হলে ভাল হয়। বোর্ড—ব্ল্যাকবোর্ড একখানা তো চাই-ই। তা ছাড়া একটা ঘড়ি। দুটো জলের কলসী, দুটো গেলাস, খানকয়েক খেজুরপাতা অথবা তালপাতার চ্যাটাই; কলসী-গেলাস অবশ্য এগুলো সামান্য ব্যাপার। অল্প কয়েকটা টাকা হলেই হয়ে যাবে। চিন্তা প্রথম কয়েক দফা নিয়ে। এই সব চিন্তায় সে-রাত্রে তার ভাল ঘুম হল না। সকালে উঠেই সে অন্যদিন অপেক্ষা অনেক দ্রুত পদক্ষেপে রত্নহাটার পথে চলতে আরম্ভ করলে। হয়ে যাবে, কোন রকমে সব হয়ে যাবে। "উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ!" চেয়ার-টুল পাওয়া যাবে, ও দুটো বাবুদের বাড়ি থেকেই এখন নেবে, শেষ পর্যন্ত মোড়া দিয়েও কাজ চলতে পারে। টেবিল একটা তৈরী করিয়ে নেবে প্যাকিং কেস কিনে। ভাবনা কেবল ঘড়ি আর ব্ল্যাকবোর্ডের। এখানকার যামিনী বাঁড়ুজ্জে ঘড়ি মেরামত করে, দরকার হলে নতুন ঘড়িও আনিয়ে দেয়; একটা টাইমপিস তার কাছে কিনলেই এখন চলবে। সাত-আট টাকা হলেই হবে। অবশ্য একটা ক্লক হলেই ভাল হয়। আধ ঘণ্টায় বাজবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠিক ঠিক ঘণ্টার আওয়াজ দিয়ে যাবে, ছেলেরা শুনবে এক-দুই-তিন-চার—। জাপানী ঘড়ি সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে এখন, পনেরো-ষোল টাকায় পাওয়া যেতে পারে। এ টাকাটা না হয় ধার করবে। কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ড? ভাবতে ভাবতে এ সমস্যারও সমাধান করে ফেললে সে। খানিকটা কাঁঠাল-কাঠের তক্তা যোগাড় করে রত্নহাটার পাকা মিস্ত্রী সতীশকে দিয়ে ছোটখাটো বোর্ড বানিয়ে নিলেও তো হবে। কাঁঠালকাঠে পালিশ হবে ভাল, ভাল করে পালিশ করিয়ে তার উপর কেরোসিন মিশিয়ে পাতলা আলকাতরার আস্তরণ মাখিয়ে দিলেই চলবে। ফ্রেমের বদলে মাথায় দুটো কড়া বসিয়ে দিয়ে দড়ি বেঁধে দেওয়ালে-পোঁতা হুকে ঝুলিয়ে দেবে।

রত্নহাটায় পৌঁছেই সে সতীশ মিস্ত্রীর কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেললে। নষ্ট করবার মত সময় কোথায়? "সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।" যামিনী বাঁড়ুজ্জের কাছে একটা ক্লক ঘড়িও সে ঠিক করে ফেললে। এর পর হিসেব করলে টাকার। তার নিজের যা সম্বল ছিল, তা থেকে চার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, কাঁঠালতক্তা কিনতে। আরও দু টাকা গিয়েছে কেরোসিন, আলকাতরা, লোহার পেরেক কড়া প্রভৃতির দামে, এ ছাড়া ডোমদের কাছে চ্যাটাই কিনতে হয়েছে। সম্বল এখন আর ছটি টাকা।

স্তব্ধ দুপুরবেলায় বাবুদের বাড়ির ঘরের ভিতর বসেছিল। টাকা ছটি কয়েকবার নাড়া-চাড়া করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থির করলে, এখন একটা টাইমপিসই ভাল। আঃ,

মনোরমা যদি আগে আসত। তার কাছে কয়েকটা টাকা নিলেই হত। মনোরমার কিছু সঞ্চয় আছে, সে জানে। ভারি লক্ষ্মী, সঞ্চয়ী মেয়ে সে। ত্রিশ-চল্লিশ টাকা তার আছে। যখন যা সে পেয়েছে, সব সঞ্চয় করে রেখেছে—পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা সব নিয়ে তার সঞ্চয়। খুচরো ঘুচিয়ে টাকা করতেও তার মনে হয় নাই। একবার শুধু সে খরচ করেছে—কানের পুরানো মাকড়ি ভেঙে পার্সী মাকড়ি গড়িয়েছে, আর আংটি ভেঙে লাল পাথর বসিয়ে নতুন আংটি গড়িয়েছে।

হঠাৎ সে উঠে পড়ল। উপায় সে খুঁজে পেয়েছে। ঘরটি বন্ধ করে একেবারে এসে উঠল কেষ্ট স্বর্ণকারের বাড়ি। নাকের ডগায় ঝুলেপড়া চশমা পরে কেষ্ট কাজ করছিল। চশমা এবং ভুরুর ফাঁক দিয়ে সীতারামের দিকে তাকিয়ে বললে, এস পণ্ডিত; আমার ছেলেটাকে তোমার পাঠশালাতেই দোব। বেজায় মোটা বুদ্ধি হে। একটুকু দেখো। বসো। সামনেই ছিল কয়েকটা মোড়া, কেষ্ট সেই সবগুলোকেই দেখিয়ে দিলে।

সীতারাম নিজের হাত থেকে খুলে দিলে দুটি আংটি, দেখুন দেখি, কত ওজন। সোনাটা অবিশ্যি গিনি, আমি জানি।

আংটি দুটির একটি দিয়েছেন তার বাবা, অন্যটি তার বিয়ের যৌতুক।

বিক্রি করব আমি।

স্বর্ণকার আংটি দুটি হাতে নিয়ে একবার তাকালে সীতারামের মুখের দিকে, তার পর আংটি দুটি হাতের তালুতে নিয়ে ওজনটা অনুভবে অনুমান করে নিয়ে বললে, ভরি দেড়েক, কি ছ আনা, মানে এক ভরি ছ আনা হবে। তার পর সে নিক্তি বার করে ওজন করলে। নিক্তির মাথায় সুতোটি সন্তর্পণে তুলে ধরে দুটি কুঁচ ফেললে ওজনের দিকে; নিক্তির দাঁড়ি স্থির হয়ে দাঁড়াল। কেষ্ট হেসে বললে, এক ভরি সাড়ে ছ আনা।

আংটি বেচে হল তেত্রিশ টাকা কয়েক আনা। আজ সে যুদ্ধের বাজারকে ধন্যবাদ দিলে। যুদ্ধ বাধার জন্য দেশের বাজারে প্রায় আগুন লেগে গিয়েছে। যুদ্ধ থেমে গিয়েছে, গত নভেম্বর মাসে, কিন্তু আগুন আজও নেবে নাই। সীতারাম নিজেই কত সময় বলেছে, কাল-যুদ্ধ। কিন্তু আজ সে সোনা বেচে এতগুলি টাকা পেয়ে যুদ্ধ বাধার জন্য খুশী হল। উনিশশো উনিশ সালের যুদ্ধের বাজার।'

টাকা নিয়ে সে প্রথমেই গেল অনন্ত বৈরাগীর বাড়ি; বৈরাগী মাথায় করে মনিহারি ফিরি করে বেড়ায়। মালা-ডোর-আয়না-চিরুনি, পুতুল-তেল-সাবান, কিছু কিছু গিল্‌টির গয়না। সে দেখেছে বৈরাগীর দোকানে কাচের কেসের মধ্যে কালো ভেলভেটের খোপে খোপে হরেক রকমের আংটি থাকে। দুটি আংটি সে বেছে কিনলে, অনেকটা তার সেই আংটি দুটির মত। তার বাবা এবং মনোরমাকে সে এ কথা জানতে দিতে চায় না। বাবা দুঃখিত হবেন, রাগ করবেন, তাঁর দেওয়া আংটি সে বিক্রি করেছে; হয়তো বকবেন, বলবেন,

লক্ষ্মী ছাড়াবি তুই। মনোরমা হয়তো মুখ ভার করবে, বিয়ের আংটি, তার বাপের দেওয়া জিনিস সে বিক্রি করে দিয়েছে।

তারা তো বুঝবে না, তার মনের কথা।

তার পর সে গেল রঘুনাথ রাজমিস্ত্রীর বাড়ি। ঠিক করে এল, কাল সকাল থেকেই সে লোকজন নিয়ে সাহার খামার-বাড়িতে যাবে। টুকরো-টাকরা মেরামত যা আছে সেরে দেবে এবং কলি-চুন দিয়ে ঘরখানা এবং বারান্দাটাকে চুনকাম করে দেবে। রঘুনাথকেই সে কলি-চুন এবং তুলির পাটের জন্য দাম দিয়ে এল। খানিকটা এসে আবার ফিরে গিয়ে সে বললে, খানিকটা নীল ওর সঙ্গে না দিলে ভাল হবে না। নীলও খানিকটা কিনে নিও।

রঘুনাথ বললে, তা হলে চিনিও খানিক দেন এর সাথে! নইলে তো ধরে না, গায়ে ঘ্যাষ লাগবে আর উঠে যাবে চুন। টাক-পড়া মাথার মত মাটি বেরিয়ে পড়বে।

তা বেশ। কত লাগবে বল ?

চিনি আপনার আধপোটাক, আর নীল। তা দিয়ে যান আনা চারেক পয়সা।

আরও একটু ভেবে নিয়ে সীতারাম বললে, আর একটি কাজের ভার নিতে হবে। ঘরের ভার তো তোমার। বাইরে উঠানটিকেও ঝরঝরে করে দিতে হবে। বেশ সমান করে চেঁচে-ছুলে গোবরমাটিতে নিকিয়ে দিতে হবে। একটি বাড়তি মজুর আর একটি মজুরনী নেবে, কেমন ?

তা বেশ। তাও করিয়ে দোব।

কালকের মধ্যে আমার সব শেষ চাই। আজ ধর মঙ্গলবার। কাল বুধবার সব তোমরা শেষ করবে। পরশু দিনই আমার পাঠশালা খোলা হচ্ছে, বুঝেছ ?

আপনি দেখে নেবেন। বেলা চারটার সময় আসবেন। সব কম্‌পিলিট করে রাখব। না হয়, কানটা ধরে আমার ম'লে দেবেন, ব্যাস্।

চারটের সময় পর্যন্ত তার ধৈর্য থাকল না, ছাত্রদের পড়িয়ে তাড়াতাড়ি সে স্নান সেরে নিলে পুকুরে। ঝরনা পর্যন্ত যাওয়ার সময় নাই আজ। স্নান সেরে খেয়েই এসে হাজির হল পাঠশালা-বাড়িতে। সমস্ত কাজ শেষ করিয়ে সে যখন বার হল, তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত চুনের দাগে ভরে গিয়েছে। পা-হাত চুনের তেজে হেজে গিয়েছে। নিজেও সে সমানে খেটেছে রঘুনাথের সঙ্গে। বেলা প্রায় পাঁচটা। জামা গেঞ্জি জুতো পুকুরের পাড়ে রেখে সে জলে নেমে পড়ল।

বৈকালে বেড়াতে যাওয়াও হল না। আরও অনেক কাজ বাকি। আজ একটু চা খেলে সে। পরিশ্রম হয়েছে, দুবার পুকুরে স্নান হয়েছে। চা খেয়ে আবার চলল সে। এইবার আসবাব। বাবুদের বাড়ি থেকে একখানা চেয়ার পেয়েছে,—সাহা একখানা চেয়ার দিয়েছেন। সতীশ মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে ছোট সেল্‌ফ, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড আনালে। ঠিক

দরজার সামনে দেওয়ালের গায়ে রাখলে নিজের চেয়ার, তার সামনে টেবিল, চেয়ারের ডান দিকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলে ব্ল্যাকবোর্ড, এ পাশে বড় দুটো হুকে প্যাকিং কেস থেকে তৈরি সেল্‌ফটি বসালে। চেয়ারের ঠিক মাথার উপরে শক্ত করে লম্বা আড়াই ইঞ্চি পেরেক ঠুকে ক্লক-ঘড়িটা বসিয়ে দিলে। দম দিয়ে চালিয়ে দিলে ঘড়িটা। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা এসে জুটেছিল। তাদেরও উৎসাহের অন্ত নাই। তাদের জন্য পাঠশালা হচ্ছে, এইখানে তারা পড়বে। এরই মধ্যে তারা সীতারামকে 'মাস্টা-মশায়' বলে ডাকতেও শুরু করেছে। ঘড়িটা চালিয়ে দিয়ে সে তাদেরই মধ্যে বড় দেখে একজনকে বললে, সাহা মশায়ের দোকানে শুধিয়ে এস তো কটা বাজছে। কটা ক মিনিট ঠিক ঠিক জেনে আসবে।

আর একজনকে বললে, তুমি যাও, ধীরানন্দবাবুদের বাড়ি যাও তো এই চাবি নিয়ে। কানাই রায় আছে, তাকে দেবে, বলবে, মাস্টার মশায়ের লণ্ঠনটা দেন।

তার পর সে ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে আরম্ভ করলে। নটা বেজে রয়েছে। শ্রাবণ মাস, সন্ধ্যা হয়েছে। এখন অন্তত সাড়ে ছটা পৌনে সাতটা। দশ এগারো বারো ঢং ঢং শব্দে ঘড়িটা বেজে চলেছে। সুন্দর আওয়াজ এবং জোর আওয়াজ।

মাস্টার মশাই!

চমকে উঠল সীতারাম। ধীরাবাবুর গলা। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল চেয়ার থেকে। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার বুকটা আবেগে পূর্ণ হয়ে গেল। আপনি, ধীরাবাবু?

ধীরানন্দই বটে। সে একা নয়, শ্যামু-দেবুও এসেছে, সঙ্গে কানাই রায়ের দুই হাতে দুটি লণ্ঠন। তার মধ্যে একটি সীতারামের।

ধীরানন্দ বললে, দেখতে এলাম আপনার পাঠশালা কেমন হল। শ্যামু-দেবুও এসেছে।

সীতারাম দেবুকে কোলে তুলে নিলে। দেবু হাসি চাপবার চেষ্টায় দাঁতে খামচ কেটে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ধীরানন্দ বললে, বাঃ! বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে।

সীতানাথ লজ্জা পেলে অকারণে। তার পর কুণ্ঠিত স্বরে বললে, পাঠশালা তো!

ধীরানন্দ বললে, পাঠশালার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। বাঃ! ঘড়িটা নতুন দেখছি।

মাথা নীচু করে সীতারাম বললে, সুন্দর হয়েছে?

সীতারাম এই মুহূর্তটিতে নিজের একটি খুঁত আবিষ্কার করলে। পাশের দেওয়ালে যেমন ঘড়ি রয়েছে, ওদিকের দেওয়ালেও যদি তেমনি একখানা ছবি থাকত!

ধীরানন্দ বললে, খুব ভাল হয়। এক দেওয়ালে নয়, তিন দেওয়ালে তিনখানা—স্বামী বিবেকানন্দ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর একখানা—বিদ্যাসাগরের ছবি তো পাওয়া যায় না, একখানা মা-সরস্বতীর ছবি। খুব ভাল হয়।

ধীরানন্দের কথাটি ভাল লাগল সীতারামের। তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে, মনে হল, এই ছেলেটি যদি ছোট হত! এ যদি তার ছাত্র হত। এমনই না হলে ছাত্র!

ধীরানন্দ বললে, এর পর কতকগুলো হাতী ঘোড়া গরু মোষ সাপ—এই সব রঙিন ছবি আনাবেন। দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবেন, ছেলেদের ভাল লাগবে।

আবার সে বললে, পাঠশালার কি নাম দিলেন? নাম দিন—সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন মুনির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখেছিলেন। এই বারান্দায় দেওয়ালে মোটা মোটা করে লিখে দিন। না হয় নিজেই তৈরি করে নিন একটা সাইনবোর্ড।

বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সীতারাম। প্রথম দিন বাইরে থেকে ছেলেটির কথা শুনে তার যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এই দশ দিন পর আবার তার কথায় তেমনই বিস্ময় জেগে উঠল।

কানাই রায় বললে, চলুন দাদাবাবু।

চল। ধীরানন্দ উঠল।—আপনিও আসুন মাস্টার মশায়।

চলুন। আমি একটু পরে যাচ্ছি। কিন্তু দেবু যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরানন্দ বললে, ওটা ভারি চঞ্চল, একটু স্থির হলেই ঘুমিয়ে পড়ে, রায়জী তুমি ওকে নাও।

চলে গেল তারা। সীতারাম একা বসে রইল। টেবিলের উপর আলোটা রেখে, চেয়ারে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে। তার পাঠশালা। ছেলেরা কলরব করে পড়বে, সে বসে থাকবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, যেখানে যার ভুল হবে সংশোধন করে দেবে। তারা সব লোহার তাল। সে কামার। সে লোহার তাল থেকে নানান অস্ত্র গড়ে তুলবে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তার গায়ে ঘাম ঝরবে। সযত্নে শান ধরাবে তাদের ধারের মুখে। বছর বছরে ছেলেদের কতক লোয়ার প্রাইমারী পাস করে চলে যাবে, তারা বড় ইস্কুলে যাবে, সেখান থেকে যাবে কলেজে। কতজন কৃতী হবে জীবনে। দেখা হলে সবিনয়ে সম্ভ্রম করে 'পণ্ডিত মশায়' বলে তাকে সম্বোধন করবে। এখানে পড়াতে পড়াতে প্রৌঢ় হবে, বৃদ্ধ হবে, মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে, চালশেধরা চোখে চশমা নিয়ে সে তখনও পড়াবে। তারা তার চারিপাশে থাকবে, কচিকচি মুখ কলরব করে পড়বে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। অনেক রাত্রি হয়েছে; বাবুদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার সময় হল। সে উঠল। আলোটা নিয়ে আবার একবার ঘরখানি দেখলে। তার পর দুয়ারে তালাবন্ধ করে উঠানে নামল। তার পাঠশালা। আঃ।

উঠানে একটি বাগান করতে হবে। ছোট খুরপি কয়েকটা আর দুটো ছোট বালতি কিনবে। ছেলেরা গাছের গোড়া খুঁড়বে, পুকুর থেকে জল তুলে গোড়ায় দেবে;—চারিদিকে ফুল ফুটে থাকবে, চমৎকার শোভা হবে।

ছেলেদের একটা ফুটবল কিনে দিতে হবে। কয়েক পা গিয়ে মনে হল ঘড়িটার তলায়

দম দেওয়ার দিনটা লিখে দিতে হবে—বুধবার, সন্ধ্যা সাতটা।

নিত্য ভোরবেলা উঠে সে পুণ্যশ্লোকদের স্মরণ করে। বাল্যকাল থেকেই বাবার কাছ থেকে এটি সে শিখেছে। বাবা যা বলেন, ছেলেবেলায় সে যা শিখেছিল, তাতে ভুল ছিল কয়েকটা; এখন অবশ্য সে শুদ্ধ শ্লোকই বলে। আজ সে প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে শ্লোকটি উচ্চারণ করলে। সরস্বতীর মূর্তি মনে মনে কল্পনা করলে, সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করলে। তার পর সে স্মরণ করলে পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের, রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করলে; সেই নর্মাল পাস পণ্ডিত মহাশয়কে স্মরণ করলে, প্রণাম করলে; এখানকার হেডমাস্টারকেও স্মরণ করলে, প্রণাম করলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীনের মূর্তি। তাঁকেও প্রণাম জানিয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে সে অত্যন্ত খুশী হল। সামনেই বাগানে ভোরের আব্‌ছায়ার মধ্যে বাঁধানো বেদীর উপর বসে ছিল ধীরানন্দ। আঃ, ভাল লোকের মুখই দেখলে সে; দিন তার ভাল যাবে। আজকের দিন ভাল যাওয়ার মানেই হল—তার পাঠশালার ভবিষ্যৎ ভাল হবে। গত রাত্রে সে বাড়ি যায় নাই। সকাল থেকে অনেক কাজ আছে। স্মিতমুখে এগিয়ে এসে সে ধীরানন্দকে বললে, বাঃ, আপনি তো খুব ভোরে ওঠেন।

ধীরানন্দ কিছু লিখছে। সে বললে, হ্যাঁ। লিখতেই থাকল সে। সীতারাম এই ছোট্ট উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সে একটু ক্ষুণ্ণ হল। তবুও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আজ আপনাকে প্রণাম করব।

কেন? প্রণাম করবেন কেন?—মুখ না তুলেই বললে ধীরানন্দ।

আজ আমার পাঠশালা খুলব।

কিন্তু আমি তো কারও প্রণাম নিই না, নিজের লোক, মানে—ভাই-বোনদের ছাড়া।

আমিও তো আপনাদের আপনার লোক হয়ে গিয়েছি।

ধীরানন্দ লিখতেই লাগল, উত্তর দিলে না।

সীতারাম বিস্মিত হল না, কিন্তু মনে হল, এটা ধীরাবাবুর বাড়াবাড়ি, খানিকটা চালবাজির মত। সে প্রণাম না করেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল এবং ফিরল যথাসম্ভব দ্রুত। অনেক কাজ আছে। শুভ কাজ, তার জীবনের সাধের কাজ আরম্ভ করবে সে। গ্রামের সমস্ত দেবমন্দিরগুলিতে প্রণাম করতে হবে। তার পর এখানকার গ্রাম্যদেবতা—জাগ্রত বুড়ীকালী মায়ের স্থানে পূজা করাবে। পূজা শেষে নির্মাল্য নিয়ে কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে পাঠশালার দুয়ারের মাথায় টাঙিয়ে দেবে। মায়ের প্রসাদী সিঁদুর দিয়ে দরজার মাথায় লিখবে—সিদ্ধিদাতা গণেশ জয়তি। তার নীচে পাঠশালা খোলার দিনটি লিখে রাখবে, ২০ শ্রাবণ, সন ১৩২২ সাল।

ঝরনা থেকে ফিরে দেখলে, ধীরানন্দ আর লিখছে না, লেখাটা পড়ছে। সীতারাম গাড়ুটি রেখে দিয়ে জামা-গেঞ্জি পরে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘরে তালা দিলে। এই সকালেই মন্দিরে প্রণাম সেরে আসবে।

ধীরানন্দ বললে, কতদূর বেড়িয়ে এলেন ?

ঝরনা পর্যন্ত।

আমিও সকালে বেড়াই রোজ, কিন্তু আজ আর হল না। ঘুম পাচ্ছে বড্ড।

বেশি সকালে উঠেছেন বলে বোধ হয়।

না, কাল রাত্রে ঘুমুই নি একেবারে। সমস্ত রাত্রি ধরে একটা কবিতা লিখেছি।

কবিতা !—অবাক হয়ে গেল সীতারাম, এইটুকু ছেলে কবিতা লেখে! সে প্রশ্ন করলে—কবিতা লিখলেন ?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনার এখন যাবেন কোথায় ?

ঠাকুর-দেবতাকে একটু প্রণাম করে আসি। একটা শুভ কাজ করতে যাচ্ছি—

একটু চুপ করে থেকে ধীরানন্দ বললে, কিন্তু একটা দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে যে। রঘুনাথ রাজের ছেলে এসেছিল আপনার খোঁজে। কাল রাত্রে কজন লোকে পাঠশালার উঠোনে খুব উপদ্রব করেছে। ওদের বাড়ি তো কাছেই। ওরা দেখেছে। মদ-টদ খেয়ে নেচেছে বোধ হয়, ক্ষতিও করেছে কিছু। কয়েকজন বাবুপাড়ার লোকের নাম করলে।

সীতারামের মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

দাঁড়ান, আমিও যাব।

পাঠশালায় ঢুকে সীতারাম স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠান এবং বারান্দাটাকে কদর্যভাবে নোংরা করে গিয়েছে। উচ্ছিষ্ট শালপাতা, মাংসের অবশিষ্ট, হাড়ের টুকরা পড়ে আছে চারিদিকে। এঁটো মাটির হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়েছে। সাদা ধবধবে দেওয়ালে কাঠকয়লার টুকরো দিয়ে লিখেছে—চাষা-চাষা-চাষা, শুঁড়ি-শুঁড়ি-শুঁড়ি। একটা সংস্কৃত শ্লোক' লিখেছে। বিচিত্র তার ভাষা, বিচিত্র তার ভাব।—

"অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে যদি বা—
দোলায়াং যাতে—
ন চাষা সজ্জনায়তে।"

উঠানটা দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে। ইতরতম উপায়ে উঠানটাকে ময়লায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছে; এর মধ্যে দর্শকও অনেক জমে গিয়েছে। নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে তারা কেউ বা মন্দ বলছে ওই কুকীর্তির কর্তাদের, কেউ কেউ এই রসিকতার রসগ্রাহীর মত মৃদু

হাস্যের সঙ্গে মৃদুস্বরে তাদের তারিফ করছে। সীতারাম মাটির পুতুলের মত নির্বাক নিস্পন্দ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। এমন নিষ্ঠুর এবং ইতর অপমানের দুঃখ সে জীবনে অনুভব করে নাই। এর চেয়ে শিবকিঙ্কর যদি তাকে ধরে পথের উপর হাজার লোকের সামনে অকারণে জুতা খুলে মারত, তা হলেও তার এত দুঃখ হত না। জ্যোতিষ সাহাও এসে উপস্থিত হল, সে-ও স্তব্ধ হয়ে গেল প্রথমটা। তার পর সে সজাগ হয়ে উঠল। দৃষ্টি ফিরিয়ে চারিদিকের লোকদের দেখে নিয়ে ব্যস্তভাবে বললে, এই, যা তো, আমার বাড়ি থেকে টামনাটা নিয়ে আয় তো। রঘুনাথ, আছ ?

রঘুনাথ ছিল। সে বললে, আজ্ঞে।

চুন আছে আর ?

তা, খানিক-আধেক আছে বোধ হয়।

আছে ভাল, না থাকে দেখে-শুনে নিয়ে এস। দেওয়ালের লেখাগুলো ঘষে মুছে চুন লাগিয়ে দাও। যাও যাও, দেরি করো না। এই যে টামনা এনেছিস ? আচ্ছা, চার আনা পয়সা দোব, টামনা করে চেঁচে ময়লাগুলো ফেলে দে দেখি কেউ।

কেউ সাড়া দিলে না। সকলে সরতে আরম্ভ করলে।—আজ্ঞে, উ কে করবে।

আট আনা পয়সা দোব।

একজন বললে, গোটা টাকা দিলেও উ মাশায় হবে না। মতিয়া মেথরকে ডেকে পাঠান।

হঠাৎ একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল ; ধীরানন্দ এগিয়ে এসে টামনাটা তুলে নিলে।

জ্যোতিষ হাঁ-হাঁ করে উঠল, এ কি, ধীরাবাবু ?

ধীরানন্দ মালকোঁচা মেরে জামার আস্তিন গুটিয়ে টামনাটা নিয়ে একটা স্থানের ময়লার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচে টামনায় তুলে নিলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

তার পর বললে, ব্যস্ত হয়ো না জ্যোতিষ। মতিয়াকে এগারোটার আগে পাবে না।

কিন্তু তাই বলে আপনি। দেন, দেন, আমাকে দেন।

আমার অভ্যেস আছে। মতিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের বাড়ির ড্রেন আমি নিজে এক বছর পরিষ্কার করেছি। পাড়ার কুকুর মরলে সে বেওয়ারিস পচা জানোয়ার আমিই ফেলি। ধীরানন্দ হাসলে।

সীতারাম এবার এগিয়ে এল, তার নিস্পন্দ অসাড়তাটা এতক্ষণে কাটল বিপরীত একটা ভাবের আঘাতে। সে বললে, না, আমাকে দেন। আমার পাঠশালা।

তার চোখ দুটি থমথম করছে, ঠোঁট কাঁপছে। ধীরানন্দ বললে, এটা আমি ফেলে দি ; এটা নিয়ে টানাটানি করে লাভ নাই। তাই সে করলে, ফেলে দিয়ে টামনাটা সীতারামের হাতে দিলে, বললে, আপনার পাঠশালা আপনি করবেন বৈকি, নিন।

সকল ক্লেদ যেন ধীরানন্দই মুছে দিলে। আবার সমস্ত পরিষ্কার করে স্নানকরে যখন

সে দেবস্থানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, তখন তার মন দিব্য প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। সকল দেবস্থানে প্রণাম করে বুড়ীকালীমায়ের পূজা করিয়ে সে এসে পাঠশালায় উঠল। ততক্ষণে পাড়ার মাতব্বরেরা এসে বারান্দায় জমিয়ে বসেছে সব। জ্যোতিষ সাহা একজন মজুরকে দিয়ে আমের পল্লব খড়-পাকানো দড়িতে গেঁথে বারান্দাটার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টাঙিয়েছে ; দরজার দু পাশে, আমের পল্লব মুখে দুটি জলপূর্ণ কলসীও দিয়েছে ; কলসী দুটির পাশে দুটি ছোট কলাগাছ। উঠানে ছেলেদের ভিড় জমেছে। তারা কলরব করছে। সীতারাম প্রসাদী নির্মাল্য নিয়ে উঠানেই দাঁড়াল। ভারি ভাল লাগল। সকালে যতখানি দুঃখে ভরে উঠেছিল তার মন, যতখানি ক্ষোভে বিষিয়ে উঠেছিল, তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি সুখে এবং আনন্দে তার মন ভরে উঠল। পৃথিবীতে মন্দ মানুষ যত আছে ভাল মানুষ তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি আছে ; পাপের চেয়ে পুণ্য বেশি। এতে আর সন্দেহ নাই আজ তার। ভগবানের সৃষ্টি যে। ভগবানকে আবার একবার এই মুহূর্তে স্মরণ করে প্রণাম করে সে বারান্দায় গিয়ে উঠল।

নির্মাল্য বাঁধা, নাম লেখা শেষ করে সে চেয়ারে বসল।

জ্যোতিষ বসল পাশের চেয়ারে। নাও, ভর্তি আরম্ভ কর। আমার ছেলের নাম লেখ প্রথম—সীতেশচন্দ্র সাহা। ও বাবা সীতেশ, প্রণাম কর্ মাস্টার মশাইকে। দে, ভর্তির ফী দে। হ্যাঁ। আচ্ছা, স্বর্ণকারকাকা তোমার ছেলে কই গো ?

একে একে ষোলোটি ছেলে ভর্তি হল। তার প্রসন্ন মনের কাছে এই ষোলো সংখ্যাটিও ভাল লাগল। ষোলো, শুভ সংখ্যা, পূর্ণতার লক্ষণ।

বিকেলবেলা চারটের সময় ছুটি। ছুটি দিয়ে, সমস্ত গুছিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে যখন পথে বেরিয়ে এল, তখন সে ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে। চাবিটা দিতে হবে সাহা মশাইকে, তিনি লোক শোবার ব্যবস্থা করেছেন।

একটা জিনিস ভুল হয়েছে। টিফিনের সময় সেটা মনে হয়েছিল, ছুটির সময়েও আবার মনে হয়েছে। একটা ঘণ্টা চাই। ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে ইস্কুল বসবে। ঢং-ন-ন শব্দে ঘণ্টা বাজলে ছুটি হবে। তার পাঠ্যজীবনের কথা মনে পড়ল, ইস্কুল বসবার ঘণ্টা বাজত, সে যেন ডাক দিত। আবার ছুটির ঘণ্টা। ওঃ, এই শব্দটা কি ভাল লাগে ছেলেদের কানে। ঘণ্টা একটা চাই।

একটা দুঃখ। ধীরাবাবু এমন ব্যবহার করলেন, মা এত আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু শ্যামুদেবুকে কিছুতেই ভর্তি করলেন না তার পাঠশালায়। বলেছেন—নানা রকমের সঙ্গ থেকে বাঁচাবার জন্যেই তো বাড়িতে তোমাকে রেখেছি বাবা। তুমিই তো পড়াবে ওদের।

ট্রেনের বাঁশী বাজল দূরে, গ্রামের স্টেশনে। চমকে উঠল সীতারাম। পাঁচটার ট্রেনে

মনোরমা আসবে। ইচ্ছা হল ছুটে যায়। পর-মুহূর্তেই সে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হল আজ নয়, সে কাল। আজ বৃহস্পতিবার।

পাঁচ

বৃহস্পতিবারটা সে বাবুদের বাড়িতে ছুটি নিয়েছিল। শুক্রবার সকালে মনে হল, শুক্রবারটাও তার ছুটি নেওয়া উচিত ছিল। আজ মনোরমাকে নিয়ে বাবা আসবেন। পাঠশালা খোলার মত এটাও তার একটা সাধের দিন। কিন্তু লজ্জায় সে বলতে পারে নাই। হয়তো কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করত না, কিন্তু তবু লজ্জা বোধ করেছে সে।

মনটা খুঁতখুঁত করছে। মনোরমা আসবার আগে সে যা যা করবে ভেবেছিল, তার কিছুই করতে পারে নাই। এ কদিন সে কথা মনে করবার অবসরই হয় নাই; অবসর কেন, মনেই যেন পড়ে নাই। ঘরখানা শুধু খড়িমাটি দিয়ে কৃষাণটা আর তার বউ দুজনে মিলে নিকিয়ে দিয়েছে। বাবা বড় তক্তপোশখানা মেরামত করতে দিয়েছিলেন, সেখানা যা হোক মতিলাল সূত্রধর পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেখানা বাইরেই পড়ে আছে। বড় শেল্‌ফ যেটা তৈরী করিয়েছে, সেটাও রত্নহাটার সতীশ মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে আনা হয় নাই। আলনা এনেছেন নায়েববাবু, সেটা পড়ে আছে বাবুদের বাড়িতে। ইচ্ছা ছিল চার-পাঁচ টাকা দিয়ে একটা টাইমপিস অথবা পকেটওয়াচ কেনার; টাকায় টান পড়ায় তা হল না। মনে পড়ল, ওখানকার ওষুধের দোকানে আরও দুটো প্যাকিং কেস কিনেছে; পুরানো কাপড় অথবা রঙিন গামছা ঢাকা দিয়ে রাখলে চমৎকার দেখাবে। একটার উপর থাকবে মনোরমার বাক্স। অন্যটা তক্তোপোশের পাশে রাখলে তার উপর আলো, জলের গ্লাস, পান, মশলা রাখা চলবে। বিছানায় শুয়ে মনোরমা না আসা পর্যন্ত বইটই পড়বে সে, বই রাখা চলবে। ইচ্ছা আছে, একখানা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ সে নেবে। পাঠশালার টিফিনের সময় কিছু পড়বে, বাকিটা রাত্রে বাড়ি ফিরে পড়বে, সেখানা রাখবে ওইটার উপর। আর একটি ইচ্ছা আছে তার, রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় বাবুদের বাড়ি থেকে কিছু ফুল নিয়ে যাবে। বাবুদের বাড়িতে রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই ফুলের কয়েকটা গাছ আছে; আর আছে একটি মালতীলতার গাছ, অজস্র ফুলে ভরে থাকে, সন্ধ্যার সময় থেকে গোটা বাড়িটাকে যেন মদির করে রাখে। প্রতি সন্ধ্যায় কিছু ফুল বাবুদের বাড়ির চাকর তুলে দিয়ে আসে ধীরাবাবুর পড়ার ঘরে। মাঝে মাঝে ডাঁটা সুদ্ধ রজনীগন্ধা কেটে নিয়ে যায়। ফুলদানিতে জল ভরে বসিয়ে রাখলে নাকি অনেক দিন থাকে। ফুল সে নিয়ে যাবে রোজ রাত্রে। ফুলগুলি কাঁসার রেকাবিতে সাজিয়ে ওই বাক্সের উপর রাখবে। কিন্তু প্যাকিং কেস দুটো রত্নহাটায়—ওই দোকানেই

পড়ে রয়েছে। খড়িমাটি নিকানো দেওয়ালে জানলা-দরজা কুলুঙ্গির মাথায় গিরি রঙ দিয়ে কয়েকটি আলপনা আঁকবার ইচ্ছা ছিল তাও হয় নাই। কিছু ছবি তার সংগ্রহ আছে, হুগলীতে থাকতে মাসিকপত্র থেকে কেটে একখানি খাতার মধ্যে রয়েছে, সেগুলির কয়েকখানা পিসবোর্ডে আঠা দিয়ে এঁটে চারিধারে কালো কাগজের সরু পাড়ের মত বসিয়ে টাঙাবার কল্পনাও তার আছে। কিন্তু কিছুই হয় নাই। না হয়েছে, হবে! সব চেয়ে যেটা বড় কাজ সেটা তো হয়েছে, পাঠশালা তো হয়েছে। এই তার সব চেয়ে বড় আনন্দ। এইবার এগুলিও সে একে একে করবে। জয় ভগবান!—বলে সে শুয়ে পড়ল।

ভোরবেলা উঠে জামা গেঞ্জি লণ্ঠন লাঠি ছাতা নিয়ে বেরিয়েও কিন্তু গ্রামের প্রান্ত থেকে ফিরে এল। কিছুতেই তার যাবার ইচ্ছা হল না। সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত গুছিয়ে নিলে সে অনেক গুছিয়ে নিতে পারবে।

কৃষাণটাকে নিয়ে সে প্রথমেই চৌকিখানা ঘরের মধ্যে এনে পাতলে ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। শিয়রেই একটি জানলা, পাশেও একটি। জানলা অবশ্য নামেই, চওড়ায় এক হাত, লম্বায় দেড় হাত মাত্র। হোক, উপায় কি! পুরানো আমলের ঘর। হোক ছোট, তবু তো জানলা। তার পর সে কৃষাণটাকে বললে, রত্নহাটায় যা তুই। দৌড়ে যেতে হবে, আসতে হবে কিন্তু। প্রথমেই যাবি বাবুদের বাড়ি। বলবি, এ বেলা আমি যেতে পারলাম না। যদি বলে, কেন? তবে বলবি,—। সে চুপ করে গেল।

কি বলব?

বলবি,—। আরও কিছুক্ষণ ভাবলে সে, মিথ্যা শরীর খারাপ বলতে কেমন সঙ্কোচ হল তার। সত্য কথাটা শোভনভাবে কি করে বলা যায় ভেবে না পেয়ে সে বললে, বলবি, সে তিনিই বলবেন এসে। হ্যাঁ, সেখানে আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরে একটা নতুন আলনা আছে, কাঠের আলনা, নায়েববাবু বর্ধমান থেকে কিনে এনেছেন, সেইটা নিবি, কানাই রায়কে বললেই সে দেবে বার করে। এই ঘরের চাবি। ওষুধের দোকানে, সেখানে দুটো কাঠের বাক্স কেনা আছে। বলবি, সীতারাম মাস্টারের কৃষেণ আমি, দেন আমাকে। হাল্কা বাক্স, সে দুটোকে নিয়ে তার পর আসবি সতীশ মিস্ত্রীর কাছে। সেখানে আর একটা কাঠের জিনিস আছে।—সতীশকে বলবি, সেই কাঠের তাকটা দাও। সেও খুব হাল্কা। উপরে উপরে সাজিয়ে মাথায় নিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে আসবি, বুঝলি? জোর কদমে যাবি, জোর কদমে আসবি। তার জন্যে এই তোমায় দু আনা আগাম দিলাম, তাড়াতাড়ি এলে আরও দু আনা দোব।

কৃষাণটা চলে গেল। কৃষাণের বউটাকে বললে, ঘরের মেঝেটা, উঠোন বেশ করে নিকিয়ে দাও ভাজ বউ। তুমিও দু আনা পাবে।

কৃষাণীটি তরুণী নয়, মধ্যবয়সী, সীতারামকে সে কিশোর দেখেছে, দেবর সম্পর্ক ধরে

কথাবার্তা বলে, সে হেসে বললে, আজ পয়সা লোব না। আজ তোমার বউ আসবে, আজ যা বলবে খুব ভাল করে করে দোব। কিন্তুক পুজোতে কাপড় লোব। কি, পলাইছ যি? ও দেওর!

আসছি। সীতারাম ছুটে বেরিয়ে গেল। ভাল কৈফিয়ত খুঁজে পেয়েছে সে। কৃষাণটাকে ডেকে ফিরিয়ে বললে, যদি বাবুদের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে, এল না কেন, তবে বলবি,—

হ্যাঁ, বলব, সে তিনি এসে বলবে।

না। বলবি—বাবা বাড়িতে নাই, বাড়ির কি কাজ আছে, তাই এ বেলা আসতে পারলে না। একেবারে পাঠশালায় আসবে। কেমন?

হ, তাই বলব।

হঠাৎ সত্য কথাটা বেশ সুন্দরভাবে গুছিয়ে তার মনে এসে গিয়েছে। সেই কথাটা বলে দিয়ে খুশি মনে সে বাড়ি ফিরল। পথে একটা গলিতে ঢুকে খানিকটা গেলেই তাঁতীদের বাড়ি। দুখানা বেশ রঙিন গামছা আনতে হবে। আঃ, বড় ভুল হয়ে গেল! কিছু ছোট পেরেক কিনতে দিলে হত। আকাশের দিকে চাইলে সে। উঠানে ছায়া দেখলে। সে আমলে উঠানের এই ছায়া দেখে সে ইস্কুলে যেত। শ্রাবণ মাসে বোধ হয় এইখানে—সিঁড়ির মাঝখানে পুবদিকের ঘরখানার ছায়া পড়লে, সাড়ে নটা বাজত, তারা ইস্কুলে যেত। এখনও সময় আছে অনেক। পাঠশালা তার এগারোটায়, সে এখান থেকে যাবে দশটায়। তন্তুবায়দের বাড়ি থেকে গামছা কিনে এনে ছবিগুলি বের করলে। আঠা তৈরি করে ছবিগুলো তৈরি করতে বসল।

বাবুদের সম্পর্কে কোথায় যেন তার একটা সঙ্কোচ আছে। হাতের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই একসময় সে ছুটল বাবুরের বাড়ি। পৌঁছল ঠিক সময়েই—সাড়ে দশটার মিনিট পাঁচেক আগেই। সংকল্প ছিল, ওখানে গিয়ে স্নান করে খেয়ে নিয়ে পাঠশালা যাবে। কিন্তু রত্নহাটা পৌঁছে বাবুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে সে একটা সঙ্কোচ অনুভব করলে। যদি না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে? জিজ্ঞাসা করে, কি এমন কাজ ছিল গো? তবে সে কি বলবে? মনোরমা আসবে আজ, তারই জন্য ঘর-দুয়ারগুলো একটু গুছিয়ে রাখছিলাম—এ কথা কি বলা যায়? তা ছাড়া, সীতারামের বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল, যদি বলে—এমন করে কামাই করলে কি কাজ চলে? বলা তো অসম্ভব নয়। মা হয়তো মিষ্টি কথায় বলবেন, ধীরাবাবু ঘুরিয়ে বলবেন। কিন্তু ওই ট্যারা নায়েববাবুটি তো সোজাই বলে দেবে, এমন কি কানাই রায়ও বলতে পারে। ওই মধ্যপদলোপী কর্মধারয় আর উপপদ এই দুজনের উপর ক্রমশ যেন তার মন বিরূপ হয়ে উঠছে। নায়েবের নাম দিয়েছে সে মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, সবের মধ্যেই আছেন, কেউ নন অথচ উনিই সব ঘটান। কানাই রায় নিতান্ত অপ্রধান

হয়েও, সকল কথাতেই আছে, অধিকার থাক না থাক, মাতব্বরি করবেই, তাই ওর নাম দিয়েছে 'উপপদ'। ওরা যদি কৈফিয়ত চেয়েই বসে, তখন উপেক্ষা করে জবাব না দিলে মান অবশ্য তার বাঁচবে, কিন্তু কাজ না করে ভাতের জন্য গিয়ে দাঁড়ালে, অপমান তার হয়ে যাবে, নিজেই করে ফেলবে ; তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল। সে ফিরল। অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতেই এসে পাঠশালা খুলে বসল।

ছুটির পর সে বাবুদের বাড়ি গেল। কিন্তু এবারও তার আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। নায়েব হেসে বললে, কই পণ্ডিত, সন্দেশ কই ?

সন্দেশ !

কানাই হেসে বললে, শ্বশুরবাড়ির ?

নায়েব বললে, বউ এল ! ও, না, পাঁচটার ট্রেনে আসবে বুঝি ?

সীতারামের কান দুটো লজ্জায় গরম হয়ে উঠল। সে বুঝলে হতভাগা কৃষাণটা সব বলে ফেলেছে।

কানাই বললে, যাও, বাড়ির ভেতর যাও। শ্যামু-দেবু খেপেছে, মাস্টার মশায়ের বউ দেখতে যাবে।

সীতারাম আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এবং ও-বেলার সঙ্কোচের জন্য নিজের কাছেই সে লজ্জিত হল। নায়েব এবং কানাইয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্যও গ্লানি কম হল না। সে ঠিক করলে, ঠকতে যদি হয় তবে মানুষকে ভাল ভেবে ঠকাই ভাল। মন্দ ভেবে ঠকার চেয়ে অপরাধ আর হয় না, তাতে অপরাধী সাজতে হয় নিজের কাছে। এই মুহূর্তে সেই সংকল্পই নিলে সে।

শ্যামু আর দেবু ঝগড়া বাধিয়ে যুদ্ধ লাগিয়েছিল, আর কেউ নাই বাড়িতে। নির্জনে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা জমেছে ভাল। শ্যামু বড়, তার সঙ্গে দেবু পেরে উঠছে না, মাটির উপর পড়েছে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু আশ্চর্য ছেলে, তবু কাঁদছে না। সীতারাম একটু হেসে এগিয়ে গেল, ছাড়, ছাড় শ্যামু।

এই সময়টিতে মা বেরিয়ে এলেন। তিনিও বললেন, শ্যামু ! দেবু !

সীতারাম দেখলে, মায়ের গলার শব্দে ম্যাজিক হয়ে গেল, শ্যামু সরে এল, কিন্তু দেবু উঠল না, স্থির হয়ে মাটির উপর পড়ে রইল।

সীতারাম সস্নেহে তাকে তুলতে চাইলে, কিন্তু কিছুতেই সে উঠবে না। কোন অবলম্বন না পেয়ে সে উঠানটাকে নখে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। সীতারাম হেসে তাকে কোলে তুলে নিলে। সে মুহূর্তে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দুই হাত দিয়ে পাগলের মত মাস্টারের মুখে চড়-কিল মারতে লাগল। সীতারাম বিব্রত হয়ে তাকে দুই হাতে ঝুলিয়ে একটু দূরে ধরলে। সে এবার পা দুটো ছুঁড়তে লাগল। অত্যন্ত অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছে সে পরাজয়ের লজ্জায়।

মা আবার একবার বললেন, দেবু!

দেবুর পা দুটো স্থির হল, হাত দুটো শিথিল হয়ে গেল, মাথাটা ঝুঁকে পড়ল, পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত।

মা বললেন, সীতারাম, ওকে নামিয়ে দাও এইখানে—নামিয়ে দাও।

সীতারাম অমান্য করতে সাহস করলে না সে কণ্ঠস্বরের আদেশ।

মা বললেন, দেবু, তোমার এই দোষের জন্যে তুমি স্টেশনে যেতে পারবে না মাস্টার মশায়ের বউ দেখতে। শ্যামু, তুমি জামা গায়ে দাও।

সীতারাম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বড়লোকের বাড়ির শাসন অদ্ভুত; তার মনে হল এই ব্যাপারটায় সে যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, এমন শাসনপ্রণালী যাদের তাদের পড়াবার যোগ্যতা তার নাই। তার বড় ইচ্ছা ছিল, শ্যামুর হাত ধরে, দেবুকে কোলে নিয়ে স্টেশনে যাবে, মনোরমাকে দেখাবে তাদের। দেখাবে কেমন তার ছাত্র দুটি। কিন্তু এই ঘটনার পর সে কথা তুলতে তার সাহস হচ্ছে না।

মা বললেন, বউমাকে এখানে জল খাইয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে বাবা?

সীতারাম বললে, অন্য একদিন আসবে। আজকে—। অভিমান করেই কথাটা বললে সে। নইলে ইচ্ছা ছিল তার। পাঠশালাটি পর্যন্ত দেখাতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু—, ক্ষুণ্ণ মনে শ্যামুকে নিয়েই সে স্টেশনে গেল।

মনোরমা নামল ট্রেন থেকে। ট্রেনের মধ্য থেকেই ঘোমটার ভিতর দিয়ে তার চোখের কালো তারা দুটি সীতারাম দেখতে পেলে, তারই দিকে সে চেয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছে। লজ্জা হল সীতারামের, সে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কর্মতৎপর হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলতে আরম্ভ করলে।

বাবা বললেন, তুই এত ব্যস্ত হোস না, লাগাবি কোথায়। কৃষাণটাকে দে না নামাতে।

কৃষাণটা এসেছে, সেই সব জিনিসপত্র নিয়ে যাবে, তার বউটাও এসেছে, ওদের বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেটাও এসেছে। মুনিবান যে ওদের। তা ছাড়া প্রথম বউ যখন আসছে, তখন জিনিসপত্র একজনের ভারের চেয়ে বেশি হবে এ ওরা জানে। জিনিসপত্র বেশ দিয়েছেন শ্বশুর।

সীতারাম বললে, বাবুদের মেজো ছেলে, আমার বড় ছাত্র এসেছে দেখতে।

বাবা বললেন, কই?

ঘোমটার ভিতর থেকে মনোরমার উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সীতারামের মুখের উপর নিবদ্ধ হল। সীতারাম হেসে পিছন ফিরে দেখলে, শ্যামুর পাশে কানাই রায় দেবুকেও কোলে নিয়ে কখন এসে দাঁড়িয়েছে। দেবু মুখ টিপে হাসছে।

কানাই হেসে বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন। বউমাকে জল খাইয়ে নিয়ে যেতে বললেন।

সীতারাম দেবুকে কোলে নিয়ে বললে, তুমি চল রায়কাকা, আমি যাচ্ছি।

বাবা কৃষাণদের মাথায় জিনিসপত্র চাপাতে ব্যস্ত। সীতারাম মৃদুস্বরে দেবুকে বললে, এই দেখ, মাস্টারের বউ—তোমাদের মাস্টারনী। যাও কোলে যাও। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা হাত বাড়াল।

দাঁতে খামচ কেটে হাসি চেপে দেবু আঁকড়ে ধরলে মাস্টারকে।

সীতারাম হেসে মনোরমাকে বললে, ভারি লাজুক আর জেদী। আজ আমাকে মেরেছে। তুমি বরং শ্যামুকে নাও।

মনোরমা শ্যামুকে কোলে তুলে নিলে। সীতারাম বললে, এস, রাণীমা বলেছেন, বাড়িতে জল খেয়ে তবে যেতে পাবে। আমার ছাত্র বটে, জমিদার-বাড়িও বটে—দেখাও হবে।

মা বললেন, বেশ বউ। চমৎকার মেয়ে। আশীর্বাদ করলেন দুটি টাকা দিয়ে। বললেন, নিজে সুখী হও, স্বামীকে সুখী কর। সীতারামকে বললেন, তুমি আজ বউমাকে নিয়ে বাড়ি যাও বাবা। শ্যামু-দেবুকে আজ ছুটি দাও, ওদের গুরুমা এসেছেন।

সীতারাম মুগ্ধ হয়ে গেল কথা কটি শুনে। এমন কায়দা করে কথা বলা সে আর শোনে নাই। শ্যামু-দেবুর ছুটি তাকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে তাকে ছুটি দিচ্ছেন। সে বললে, না। আমি পড়িয়ে খেয়ে যেমনই যাই, তেমনই যাব। নাঃ, আর কর্তব্যে অবহেলা করবে না সে।

সন্ধ্যার পর ছেলেদের পড়িয়ে খেয়ে যাবার সময় সে সকলের অলক্ষ্যে কতকগুলি মালতী ফুল তুলে নিলে। দিনের বেলায় তুলতে পারে নাই লজ্জায়। ছুটি নিতে আপত্তি ছিল না তার, কিন্তু ফুলগুলি তোলা হত না।

মনোরমা খুশী হল। বললে, পণ্ডিত লোক।

সীতারাম হাসলে। তার পর বললে, ঘরদোর পছন্দ হয়েছে?

মনোরমা বললে, আমার লজ্জা লাগছিল।

কেন?

বাবা ঘরে ঢুকে বললে—বাঃ, এ যে খুব ভাল করে রেখেছে সীতারাম। বা, বা, বা! তার পর বললে—বউমা, সীতাকে নিয়ে আমার ঘরটাও এমনিই করে দিও বাছা। শুনে, আমার ভারি লজ্জা লাগল বাপু।

সীতারামও লজ্জা পেলে। ছি ছি ছি! শুধু ছি-ছি-ই নয়, অন্যায় হয়েছে। বাবার ঘরখানা আগে সাজানো উচিত ছিল তার। ছি!

মনোরমা বললে, সেই থেকেই তো দেখছি আর ভাবছি, পণ্ডিত লোক বটে বাপু!

সীতারাম তাকে এবার সাদরে বুকে টেনে নিলে।

ঘাড়ে মুখ রেখে মনোরমা বললে, জান, যখন খবর গেল, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পার নাই, তখন আমার কান্না পেয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম আমি। তা, আর খেদ নাই আমার। বাবুদের বাড়িতে খাতির দেখলাম, ছাত্র দেখলাম, এই আমার ঢের।

আবেগে সীতারামের বুক ভরে উঠল। মনে হল তার চেয়ে সুখী আর কেউ নাই।

ছয়

সুখী সীতারাম। সুখের জীবনে বর্ষার সতেজ গাছের মত সে বাড়তে আরম্ভ করেছে। সুস্থ দেহে সবল পদক্ষেপে সে পথে হেঁটে চলে, উৎসাহদীপ্ত চোখে ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ায়। প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাদের মনের মত গড়ে তুলতে। আদর করে, তিরস্কার করে, প্রহারও দেয়। মনোরমাকে সুখী করবার চেষ্টা করে, মনোরমা তাকে সুখী করেছে। বাবার সেবা করে। কিন্তু ওইখানে যেন হঠাৎ একটা কাঁটা উঠেছে, অহরহ খচখচ করছে—নিষ্টুররূপে দুঃখদায়ক সেটার স্পর্শ। বুঝতে পারে না—এ কাঁটাটা কেমন করে কোথা থেকে উঠল।

না বুঝলেও সীতারাম ধীরভাবেই এ দুঃখকে গ্রহণ করলে।

সুখ আর দুঃখ—এই নিয়ে জীবন। আলো আর অন্ধকার, দিন আর রাত্রি—এই নিয়ে কাল। পৃথিবীর মাটি, যে মাটিতে ফসল ফলে, যে মাটিতে শুলে মনে হয়, মায়ের কোলে শুয়েছি, সেই মাটিতে পাথর আছে, সে পাথর পায়ে বেঁধে, নখে আঘাত দেয়, তার উপর আছাড় খেয়ে মানুষ মরেও যায়। জল, যে জলে অঙ্গ শীতল হয়, বুকের ভিতরটা জুড়িয়ে যায়, সেই জল মধ্যে মধ্যে বন্যা হয়ে এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এসব কথা সীতারাম জানে। তাই ছোটখাটো বাধা-বিঘ্ন এবং দুঃখ সত্ত্বেও সে তার জীবনকে সুখের জীবন বলেই মনে করে।

হঠাৎ এই দুঃখের মধ্যে একদিন বাবা রমানাথ মারা গেলেন। আঘাতটা তার পক্ষে ভয়ঙ্কর আঘাত ; মর্মান্তিক হয়ে উঠল। চার বৎসর বয়সে সে মাতৃহীন হয়েছিল, সেই সময় থেকেই বাবা তার মা এবং বাবা দুই-ই হয়েছিলেন।

মরবার সময় বাবা তাকে বললেন, কাঁদিস না যেন। আমি তোর সুখের যাওয়া যাচ্ছি রে। তুই আমার বংশের মান বাড়িয়েছিস, দশজনা তোকে পণ্ডিত বলে খাতির করছে, ঘরে আমার লক্ষ্মীর মতন বউমা ; আমার যেতে খেদটা কিসের ? একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিলেন, খেদ একটি থাকল, তোর ছেলে দেখতে পেলাম না। তা—তা আমিই আসব ফিরে তোর ছেলে হয়ে।

সীতারাম পাথরের মূর্তির মতন বসেছিল। সে চঞ্চল হলে, তার চোখে জল দেখলে তার বাবা হয়তো মহাযাত্রার সময় চঞ্চল হবেন। একটা গল্প তার বার বার মনে পড়ছিল। সে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। সে সময় শান্তিনিকেতনে একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়েছিল সর্বত্র। পূর্বে পূর্বে যেমন দেখেছিল, ঠিক তেমনটি যেন নয়। খবর নিয়ে জেনেছিল, কবিবর রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে দীপেন্দ্রনাথ সদ্য মারা গিয়েছেন। সে নিজেও দুঃখিত হয়েছিল, আহা, বৃদ্ধ বয়সে এ কি দুঃখ পেলেন তিনি! এত বড় কঠোর আঘাত কি আর হয়? ভগবানকে বলেছিল, তোমার কি এই বিচার? ফিরবার সময় দ্বিজেন্দ্রনাথের বাংলো-বাড়িটির পাশ দিয়েই সে ফিরেছিল। একবার তাঁকে দেখবার ইচ্ছা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের বাংলোর সামনে খোলা বারান্দায় বোলপুরের উকিলেরা এসে বসে ছিলেন, তাঁকে সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রশান্ত মুখে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কটি কথা তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। দেহের লয় মৃত্যু, এ তো অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য শোক—। কথা শেষ না করেই তিনি হেসেছিলেন। অপূর্ব সে হাসি! এমন হাসি সীতারাম জীবনে কাউকে হাসতে দেখে নাই। তার পর তিনি অন্য কথা বলতে আরম্ভ করলেন। উকিলদের জনে জনে কুশল জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলেন।

তিনি অবশ্য মহাপুরুষ, ঋষিতুল্য মানুষ; সে সামান্য জন; তাঁর সঙ্গে তুলনা কার? কিন্তু মহাজনদের অনুসরণই তো মানুষের করা উচিত। সে কাঁদলে না।

লোকে কিন্তু অন্য কথা বললে, জঘন্য নিন্দা করলে তার। বললে, বাবা ম'ল ভাল হল— কথায় বলে না, সীতারামের তাই হয়েছে। বুড়ো অহরহ খিটখিট করত, বুড়ো মরেছে, ও খালাস পেয়েছে।

ইদানীং বাবার ওই একটা কেমন ভাব হয়েছিল। সুখের জন্য যে সংসার তিনিই পেতেছিলেন, সে সংসার যেন তাঁর অসুখের কারণ হয়েছিল। সর্বদা যেন অসন্তোষ লেগেই থাকত। কিছুই পছন্দ হত না। মনোরমার উপর বিরূপতাটা ছিল বেশী, কোন যত্ন করতে গেলেই বলতেন, থাক্, বাছা, থাক্। 'বাছা' বলতেন, 'মা' বলতেন না।

মনোরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অপরাধিনীর মত।

বাবা এতেও রাগ করতেন, রাগ যেন বেড়ে যেত, বলতেন, যাও না বাছা, কাজকর্ম যা আছে করগে যাও। যাও, সীতা কি চাইছে দেখ।

শেষের কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকত, ছাইয়ের পাতলা স্তরঢাকা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। উত্তাপের জ্বালা গায়ে লাগত সঙ্গে সঙ্গে।

একদিন বাবা খাবারের থালা পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অরুচি ধরেছিল তাঁর। সীতারামই বলেছিল, রাত্রে একটু হালুয়া করে দিও, মুখেও ভাল লাগবে, ঘি-দুধও একটু পেটে পড়বে। চাষীর বাড়িতে মুড়িই জলখাবার, গুড়ই মিষ্টান্ন, সুজি-চিনির কারবার ছিল

না। ঘি চিরদিনই আছে, দুধের সর জমিয়ে ঘি তোলা হয়, অবশ্য বিক্রির জন্যই তোলা হয়। সুজি-চিনি সীতারাম এনে দিয়েছিল রত্নহাটা থেকে। মনোরমা রাত্রে হালুয়ার থালাখানি তাঁর সামনে নামিয়ে দিতেই তিনি হাত দিয়ে নেড়ে নাকে শুঁকে, আলোটা উস্কে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, এ আবার কি?

একটু হালুয়া তৈরী করেছি আপনার জন্যে।

হালুয়া? মোহন-ভোগ?

হ্যাঁ। কিছুতেই খেতে পারছেন না। খই-দুধই বা আর খাবেন কত? তাই—

তাই হালুয়া হয়েছে?

এবার ভয় পেয়ে গিয়েছিল মনোরমা। সে উত্তর দিতে পারে নাই।

চিনি আমার ক্ষেত থেকে হয়? না, সুজি আমার ক্ষেত থেকে হয়? এর পর আকস্মিক বিস্ফোরণের মত তিনি ফেটে পড়েছিলেন, আমি চাষার ছেলে চাষা। নুনটি বাদে ক্ষেতের জিনিস ছাড়া আর কিছু কিনে আমি তো আমি—আমার চৌদ্দপুরুষ খায় নাই। আমি খাব হালুয়া?—বলে থালা-খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে গিয়েছিলেন। আক্ষেপ তখনও তাঁর থামে নাই, তিনি বলেই গেলেন, লক্ষ্মী ছাড়ালে, তুমিই আমার লক্ষ্মী তাড়ালে।

সমস্ত পাড়াময় তিনি এই কথা বলেও বেড়িয়েছিলেন। লক্ষ্মীছাড়া বউ আমার লক্ষ্মী ছাড়ালে।

সীতারামকেও তিনি রূঢ়ভাবে অকারণে তিরস্কার করতেন মধ্যে মধ্যে। রবিবার দিন, সে এখন রবিবার দিনেও বাড়িতে খায়, ভোরে বাবুদের বাড়ি গিয়ে ছেলেদের পড়িয়ে সাড়ে দশটায় বাড়ি ফেরে, সমস্ত দিনটাই বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যায় আবার যায়, রাত্রে ফিরে আসে নিত্যকার মত। একটা রবিবারে বাবা মাঠ থেকে ফিরেছিলেন ক্লান্ত হয়ে, সীতারাম গিয়েছিল বাতাস করতে। পাখাখানা হাত থেকে নিয়ে বলেছিলেন, থাক্ বাবা, থাক্। আমি চাষার ছেলে চাষা, রোদে জলে চাষে খেটেই জীবন গেল, যাবেও। আমরা চেয়ারেতে বসে পণ্ডিতি করি না। পাখার বাতাস খাওয়া আমাদের অভ্যেস নাই।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সীতারাম।

বাবা তবু ক্ষান্ত হন নাই, বলেছিলেন খুব মিষ্ট ভাবে, রবিবার ছুটির দিন, আজ একটুকু আমোদ-আহ্লাদ করগে যাও।

এজন্য সীতারাম একটু দূরেই থাকত। মনোরমার সে উপায় ছিল না, সেইজন্য সে মনোরমাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু মনোরমা অদ্ভুত মেয়ে, সে হেসে বলত, তোমারই বাবা, আমার কেউ নয় বুঝি?

তবু লোকে এই কথা বললে। বলুক, তার জন্য সীতারামের আক্ষেপ নাই। সে শুধু মধ্যে

মধ্যে ভেবে দেখে, বাপের সেবায় কোন ত্রুটি সে করেছে কিনা। তার পারলৌকিক কাজ সে যথাসাধ্য করেছে কিনা।

মধ্যে মধ্যে গভীর চিন্তা করে সে, খতিয়ে হিসেব করে দেখে।

পাঠশালার ছেলেরা তার অন্যমনস্কতা ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে চেয়ে দেখে; একজন অন্যজনকে ইশারা করে দেখায়। বড় ছেলেরা মধ্যে মধ্যে ফিসফাস শব্দে গবেষণা করে।

কি রকম হয়ে গিয়েছে পণ্ডিত।

হুঁ ভাই।

বাবা মরেছে কিনা।

হুঁ।

বেঁচেছি কিন্তু। আর মারে না। আকু বলে ছেলেটা খুকখুক করে হাসতে আরম্ভ করে। ছোট ছেলেরা গবেষণা করে না, তারা একটু অবাক হয়। মাস্টার আর মারে না কেন ভাই?

বাবার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এটা সীতারামের একটা অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, যার ফলে ছেলেদের সে আর মারবে না, অন্তত গুরুতর অপরাধ না হলে মারবে না ঠিক করেছে। সে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

বাবার অসুখের প্রথম দিক তখন। সেই দিনই সকালে সে অসুখের গুরুত্ব বুঝে ডাক্তার ডেকেছিল। ডাক্তারকে দেখিয়ে সে ডাক্তারের সঙ্গেই এল রত্নহাটা, তখন সবে সাড়ে দশটা। ছেলেরা সব এসে পাঠশালায় কলরব করছিল; সে পাঠশালায় ঢুকে তাদের বললে, তোমরা নিজেরা বসে পড়। আমি একবার ডাক্তারবাবুর দোকানে যাচ্ছি; ওষুধ নিয়ে শিগগির আসব আমি, বুঝলে?

ডাক্তারের কাছে ওষুধ নিয়ে কৃষাণটার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু ডাক্তার বললেন, আপনি নিজে নিয়ে যান। ও বলতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবে। প্রথমে পারগেটিভ, তার পর একটা পাউডার, তার পর মিক্‌শ্চার দু দাগ পর পর, বিকেলবেলা আবার একটা পাউডার, এ ও বুঝতেও পারবে না, বোঝাতেও পারবে না।

সীতারাম বললে, হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছেন। আবার বাড়ি ফিরল সে। ফিরবার সময় পাঠশালায় বলে গেল, পড় তোমরা, আমি আসছি। আমার বাবার অসুখ, ওষুধটা দিয়ে শীগ্‌গির আসছি।

একবার ছুটি দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সে তার ভরসা হল না। রত্নহাটা বড় কঠিন স্থান। এখানে দশ দিনের সেবার বিনিময়েও একদিনের ত্রুটির মার্জনা নাই। ওদিকে বড় ইস্কুলের পাঠশালার সজাগ দৃষ্টি তার গলদের দিকে। তাই সে ওষুধটা দিয়ে ফিরে আসাই

স্থির করলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, সওয়া এগারোটা। দু মাইল পথ, যেতে আসতে চার মাইল। একটার মধ্যেই সে ফিরতে পারবে। টিফিনের পর থেকে পড়ানো হবে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেরি হয়ে গেল। খাওয়া হয় নি, মনোরমা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। পাঠশালায় ফিরতে বেজে গেল দুটো। পাঠশালার বাইরের দরজায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। ভাবছিল, পা ধুয়ে ঢোকাই উচিত। ভিতরে ছেলেরা কলরব করছে, হঠাৎ ভেতর থেকে তার কানে এল—একজন বলছে :

চল্ রে চল্, আজ আর আসবে না। বক্তা আকু। আকু বাবুদের পাড়ার একটি বিচিত্র জন্তু। সীতারাম বলে, জন্তু, মূর্তিমন্ত বিঘ্নরাজ। সীতারাম ওকে 'আকু' বলে না, বলে 'অক্রূর'। অক্রূরের কথা শুনে সীতারামের হাসি পেল ; ওরা বেরিয়ে আসবে এই প্রত্যাশায় সে দরজার বাইরেই দাঁড়াল, এসেই থমকে যাবে ওরা। কানে এল, জ্যোতিষের ছেলে সীতেশের কথা, না ভাই, যদিই আসে।

কক্ষনো না। আমি বলছি। আমি ঠিক জানতে পারি যে। মাস্টার বাড়ি গিয়েছে, আর তার বাবাও মরে গিয়েছে। বাস্। এখন আর এক মাস আসবে না। এক মাস অশুচ তো। ভারি মজা, এক মাস এখন কিলচড় নাই।

সীতারামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠল। রাগে ভিতরটা গর্জে উঠল।

একজন বললে, তার পরে তো আসবে, তখন সুদে-আসলে পুষিয়ে দেবে ; লাগ্ ধমাধম, লাগ্ ধমাধম। বাবা রে। ছেলেটা বোধ হয় শিউরে উঠল।

আকু বললে, দাঁড়া, দাঁড়া, আমি ধ্যান করে দেখি। হ্যাঁ, শোন্, ঠিক তখুনি মাস্টারের বউ মরে যাবে। বাস্, আবার এক মাস। তার পরে, অশুচটি যেই যাবে, হ্যাঁ, ঠিক তখুনি মাস্টার নিজেই মরে যাবে। বাস্।

সীতেশ বললে, না ভাই। আহা, কি দোষ করেছে পণ্ডিত যে মরে যেতে বলছ ?

বেজায় মারে ভাই। বাবাঃ। আমাকেই বেশি মারে। এক-একসময় মনে হয়, আমি এইবার মরেই যাব।

সীতারাম ভিতরে ঢুকল। পা ধুতে সে ভুলে গেল। চুপ করে গিয়ে চেয়ারে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলে। হঠাৎ তার চোখে জল এল। ছোট কচি দেহে বড় লাগে, বড় যাতনা হয় ওদের, মনে হয়, মরে যাবে। না, ওদের দোষ নাই। দোষ তার। না, আর সে তাদের মারবে না।

বাবার মৃত্যুর মাস দুয়েক পর পাঠশালায় বসে সে কথাগুলি মনে করছিল। আজও সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবছিল এদের দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপেই হয়তো সে বাবাকে হারিয়েছে। আজও সে বাবার কথাই ভাবছিল।

বাবা নাই। সংসারটা খাঁ-খাঁ করছে। অশান্তি ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু বাবার জমজমাট ছিল কত। কথার হুল বাদ দিলে, আবদেরে ছেলে আর বাবার মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। অন্যদিকেও অসুবিধা হয়েছে, চাষের ভার এসে পড়েছে তার উপর। অবশ্য মনোরমা খুব হিসেবী মেয়ে, চাষের কাজকর্ম সবই সে জানে। কিসে কী লাগে, কত লাগে, ও-ও জানে। কিন্তু মাঠের অবস্থা সে তো বউ হয়ে দেখতে পারে না। সীতারামকেই এখন একটু বেশী ভোরে উঠতে হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠ ঘুরতে ঘুরতে সে রত্নহাটায় চলে যায়। ভর্তি চাষের সময়, ঝরনার ধারে আর বসে না, বাড়ি আসে, মাঠ দেখে। তা সত্ত্বেও চাষের অবনতি কিছু হয়েছে। তার আর উপায় কি? কথাটা বাবা বলতেন।

মধ্যে মধ্যে বাবুদের বাড়ির চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু বড় বেশি মমতা পড়ে গিয়েছে শ্যামু-দেবুর উপর। তা ছাড়া মায়ের স্নেহ, ধীরাবাবুর স্নেহ, সেও তার জীবনের একটা সম্পদ। ধীরাবাবু এখন কলকাতায় পড়ছেন, তিনি তাঁর পড়ার ঘরের বইগুলি দেখবার ভার দিয়ে গিয়েছেন তাকে। সীতারাম যখন সেই ঘরে ঢোকে, তখন মনে হয়, একটা নতুন রাজ্য। বই পড়ে। বই বাড়ি নিয়ে যায়। বই নিয়ে যেতে ধীরাবাবুর বারণ। বলেছেন, ঘরে বসে পড়বেন, কিন্তু বাইরে নিয়ে যাবেন না। বাইরে গেলে বই ফেরে না। অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু আমি ওটা পছন্দ করি না। সীতারাম কাপড় ঢাকা দিয়ে বই নিয়ে যায়, আবার ফিরিয়ে আনে, রেখে দেয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, সব বই ফেরত দেওয়া হয় নাই।

এই, এই, কি হচ্ছে সব?

পাঠশালার ছেলেরা, অঙ্ক কষছিল, চমকে উঠল। ভাল ছেলেরা শ্লেট নিয়ে আরও সাবধান হয়ে বসল। কেউ দেখছে, টুকছে। যারা দেখছিল, তারা নিজেদের শ্লেটের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ল। দু-একজন ঢুলছিল, তারা জেগে নড়ে-চড়ে বসল। সীতারাম কিন্তু লজ্জা পেলে,—ছি, ছি, অন্যমনস্কভাবে ধমকটা দিয়ে ফেলেছে সে। ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার জন্য সে গম্ভীরভাবে বললে, অঙ্ক কষ। হল সব? শেষ কর। সে চুপ করলে। পুরানো কথা আবার মনে হল। বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, কয়েকখানা বই দীর্ঘদিন ধরে তার ঘরে রয়ে গিয়েছে। বই কখানা ভাল লেগেছিল, তাই আরও দুই-একবার পড়বার ইচ্ছায় রেখে দিয়েছে।

আবার সে সজাগ হয়ে পড়াতে বসল।

বাইরে রাস্তার উপর থেকে কেউ হেঁকে উঠল, হ্যাঁ রে অর্বাচীন, আঁচলে করে মুড়ি খাচ্ছিস ক্যা—ন, আঁচল যে এঁ—টো—হবে।

সীতারামের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তাকেই কেউ ব্যঙ্গ করে গেল। সে পণ্ডিত

শিক্ষক, তাই যথাসাধ্য শুদ্ধ উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে তার অজ্ঞাতসারে তার বাল্যজীবনের শেখা তাদের গ্রাম্য চাষী-সমাজের দু-একটা কথা বেরিয়ে যায় মুখ থেকে, গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে যায়। একদিন একটি ছেলেকে আঁচলে মুড়ি খেতে দেখে, আঁচলটা উচ্ছিষ্ট হল এই বিষয়ে তাকে সচেতন করতে এঁটোর পরিবর্তে গ্রাম্য কথা আঁটো সত্যিই বেরিয়ে পড়েছিল। রত্নহাটার উচ্চনাসার দল কি করে জেনেছে এবং এই নিয়ে তাকে ব্যঙ্গ করে। প্রথমে 'কেন'র শব্দের উচ্চারণের উপর জোর দিয়ে, পরে গ্রাম্য কথা আঁটোর উপর জোর দিয়ে ব্যঙ্গটাকে প্রকট এবং প্রখর করে তোলে। এর মূলে আছে শিবকিঙ্কর।

তার পাঠশালার ছাত্রই কথাটা প্রথম বলতে আরম্ভ করে। এমন কি ব্যঙ্গের সুরটুকু পর্যন্ত সংযোজন করেছে সে-ই; এবং সে ছেলেটি হলেন শ্রীমান আকু। তার কাছে শুনে শিবকিঙ্কর হাটে বাজারে ছড়িয়েছে। আজকাল তার পাঠশালায় কিছু বাবুদের ঘরের ছেলে আসছে। বেশী বেতন এবং বেতন দেওয়ার সমস্যায় বড় ইস্কুলের পাঠশালায় তাদের পড়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখানে ছেলে পড়ানো অনেক সুবিধাজনক মনে হয়েছে অভিভাবকদের। এ ছাড়া ছেলেগুলিও অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির, তাই বড় বড় ইস্কুলের পাঠশালায় মাস্টারেরা মাইনের জন্য কড়া তাগাদার অছিলায় কঠোর শাসনে তাদের তাড়িয়েই দিয়েছে। ওখানকার পণ্ডিতেরা বলেও দিয়েছেন, যা না বাবা, রত্নহাটায় রত্নতৈরির আখড়া সীতারামের পাঠশালায়। এখানে কেন? বাধ্য হয়েই ওরা এসেছে।

বড় ইস্কুলের এই ধরনের কথায় এবং আচরণে সীতারামের দুঃখ হয়। খারাপ ছাত্র দিয়ে তার পাঠশালার ভাল ছাত্রগুলিকে ভাঙিয়ে নেয় ওরা। ছ মাস চেষ্টা করে পাঠশালার সরকারী গ্র্যাণ্ট পেয়েছে মাসিক চার টাকা। কিন্তু সে গ্র্যাণ্ট রাখা দায় হয়ে উঠেছে। আজও তার একটি ছাত্রও বৃত্তি পায় নাই। গতবার কৈবর্তদের একটি ছেলের উপর তার খুব ভরসা ছিল। বৃত্তিও সে পেয়েছে। কিন্তু তার পাঠশালা থেকে তার ছাত্র হিসেবে নয়, ইস্কুলের পাঠশালার মাস্টারেরা তাকে ভাঙিয়ে নিয়েছিল। ওখান থেকেই সে বৃত্তি পেয়েছে।

ছেলেদের একজন অঙ্ক শেষ করে স্লেট এনে নামিয়ে দিলে, সব চেয়ে ভাল ছেলে এইটি। এর উপরই তার এখন ভরসা আছে। আগামী বৎসর ছেলেটি নিশ্চয় বৃত্তি পাবে। একে ভাঙিয়ে নিতে পারবে না বড় ইস্কুল। ছেলেটি জ্যোতিষ সাহার ভাগ্নে। স্লেটখানি তুলে নিলে সীতারাম।

বা বা বা! রাইট। রাইট। এটাও রাইট। এটা—এটা কি করলি রে? কোথায় মাথা খেলি আমার, অ্যাঁ? হ্যাঁ, এই যে ফাদার মণি আমার, বাবামণি, এটা কি করেছ মানিক, অ্যাঁ? পাঁচ-সাতে কত হয় বাবা, কত হয়?

পঁয়ত্রিশ স্তার। উচ্চারণের সময়, ওদের 'মশায়ে'র 'ম' উড়ে যায় বলে 'স্তায়'।

পঁয়ত্রিশের কত নামবে? পাঁচ, না শূন্য?

পাঁচ। ওই তো পাঁচই লিখেছি স্তায়।

এটা পাঁচ তো, যোগের সময় কি করেছ? নিজেই যে শূন্য ধরে নিয়েছ বাবা। বলি, বার বার বলি, মানিকচাঁদ, পাঁচ লেখাটা ঠিক করে ফেল। তা তুমি করবে না। এর ফল দেখ। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গো-মূত্র। সব বরবাদ। তবে প্রসেস রাইট। আচ্ছা যাও, তুমি টিফিনে বাড়ী যাবে তো চলে যাও। আর পাঁচ মিনিট আছে।

আর একজন এসে দাঁড়াল। বাবুদের ছেলে আকু, যে তার কথার বিকৃতি প্রচার করেছে সেই শ্রীমান। সীতারাম জানে, ওর কোন অঙ্কটাই ঠিক হয় নাই। তবু এসেছে, স্লেটখানা দিয়েই সে টিফিনের ছুটিটা পাঁচ মিনিট বাড়িয়ে নেবে। সে বক্রহাসি হাসলে, বললে, কি, অক্রুরের সব হয়ে গিয়েছে? বলিহারি, বলিহারি, দাও দেখি। নির্লজ্জ ছেলেটা স্লেট মুখে দিয়ে তবু হাসছে। সে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলে স্লেটখানা।

অ্যাঁ! অ্যাঁ! আরে দেখি দেখি। শো .মি ইওর টিথ। দাঁত দেখি, দেখি। স্লেট রেখে সীতারাম উঠে দুই হাতে তার ঠোঁট বিস্ফারিত করে দাঁতগুলিকে প্রকট করে ফেলেছে।

দেখ, তোমরা দেখ। দাঁত মাজে নাই। দেখ তোমরা।

ছেলেটা তবু হাসে। আশ্চর্য নির্লজ্জ ছেলে। ঠোঁট ছেড়ে সে তার কান ধরলে। তবুও সে হাসে। যাও, যাও, দাঁত মেজে এস, যাও।

ছেলেটা মুখে কাপড় দিয়ে বললে, এখনও আজ ভাত খাই নাই স্যার, একবারে দাঁত মেজে ভাত খেয়ে আসব।

বাবুদের ছেলেদের লেখাপড়ার ভাগ্যে যাই থাক্ চাল ঠিক আছে। ওরা 'স্তায়' বলে না, 'স্তার' বলে। মারধোর করে লাভ নাই; মার খেয়ে ওদের পিঠে প্রায় কড়া পড়েছে। নিত্যানন্দের মত মার খেয়েও ওরা হাসে। সীতারাম ওকে অক্রুর বলে—আবার বলে, নির্যাতনে সিদ্ধ।

ঢং শব্দে একটা বাজল। টিফিনের ছুটি হল।

ঘড়িটার একটা দোষ হয়েছে এরই মধ্যে, বড় কাঁটাটা বারোটার ঘরে যাবার দু মিনিট পরে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করে। ছেলেরা স্লেট এনে নামিয়ে দিলে। টিফিনের ছুটিতে বসে সীতারাম স্লেটগুলি দেখবে। ছেলেদের কতক যাবে খেতে, কতক করবে খেলা। ছোট ছেলেগুলো গুলি-মার্বেল খেলতে উঠানময় গর্ত করেছে। রোজই প্রতি দলে একটা ঝগড়া হয়, দল ভেঙে নতুন দল করে, নতুন গাব্ব্ করে। তা করুক, রাস্তায় ধুলো মাখার চেয়ে তাই করুক। ওদের জন্যই তো উঠান। উঠান কেন, সবই তো ওদের জন্য।

আবার ঘণ্টা পড়ল; টিফিন শেষ হল। ঘণ্টা একটা কিনেছে। আরও অনেক জিনিস কিনেছে। দুখানা ম্যাপ, একটা গ্লোব, কলকাতায় কেনা একটা ভাল ব্ল্যাকবোর্ড; দুখানা চেয়ার। বাবুদের চেয়ার, সাহার চেয়ার ফেরত দিয়েছে। ঘণ্টা পড়তেই টিফিন শেষে ছেলেরা আবার সব বসে গেল। কিন্তু আকু? কই সে? দাঁত মেজে খেয়ে আসি—বলে গিয়ে এখনও পর্যন্ত আকু ফিরল না। টিফিনের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। এই সব ছেলে নিয়ে কারবার করতে হলে, মারব না—এ সংকল্প করেও রাখা যায় না। মনে হল, এমন সংকল্প করা ঠিক নয়। মার বন্ধ করাতেই আকুটা আরও পাজী হয়ে উঠেছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের একটা গল্প আছে। একটা বাঁদর তাঁর সভাতে রোজ সকালে এসে হাজির হত, রাজাকে একটি মোহর দিয়ে পায়ের কাছে বসত। রাজা তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তার পিঠে সপসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিতেন। বাঁদরটা সুড়সুড় করে চলে যেত। একদিন মন্ত্রী সবিনয়ে প্রতিবাদ করলে, এটা মহারাজার ন্যায় কাজ হয় না। বাঁদরটা মোহর উপহার দেয়, আর মহারাজ তাকে প্রহার করেন।

রাজা হেসে বললেন, ভাল। কাল থেকে মারব না।

পরের দিন বাঁদরটা এল, মোহর দিলে, কিন্তু রাজা তাকে নিত্যকার মত প্রহার করলেন না। বাঁদরটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁত দেখিয়ে চলে গেল। পরের দিনও প্রহার করলেন না। সেদিন বাঁদরটা রাজার কাপড় ধরে টানল। তার পরের দিন প্রহারের অপেক্ষা করে হঠাৎ লাফ দিয়ে সিংহাসনের হাতলে উঠে বসল। তার পরদিন উঠে বসল রাজার ঘাড়ে। রাজা সেদিন বাঁদরকে টেনে নামিয়ে, হিসেব করে সব দিনের পাওনা বেত্রাঘাত তার পিঠে ঝেড়ে দিলেন। বাঁদর আবার সেই পূর্বের মত সুড়সুড় করে চলে গেল। আকুকে আজ তার পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে। সীতারাম হরিসাধনকে ডাকলে, সাধন!

সাধন, ছেলেদের মধ্যে বয়স্ক ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল নয়, কিন্তু তবু ভাল ছেলে, নিষ্ঠা আছে। কোন মন্দ বুদ্ধি নাই। সাধনকে দেখলেই তার নিজের কথা মনে পড়ে। নিজে সে ওই ধরনের ছেলে ছিল। সাধন এসে দাঁড়াল। সীতারাম বললে, তুই যা একবার আকুদের বাড়ি। গিয়ে ওকে ডাকবি, বলবি—মাস্টার মশাই ডাকছেন। যদি বাড়িতে না থাকে, তবে ওর মা কিংবা যার দেখা পাবি, বলবি—আকু টিফিনের আগে এসে আর পাঠশালায় যায় নাই। ও প্রায়ই এই রকম করে। মাইনে দেয় নাই আজ দু মাস। মাইনে দিয়ে কাল পাঠিয়ে দেবেন, না হলে আর পাঠশালায় পাঠাবেন না। বুঝলি তো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, কি বলবি, কই বল্‌ দেখি।

সাধন পাখির মত বলে গেল। সীতারাম খুশী হয়ে বললে, ঠিক। যা তো তুই।

সাধন যেতে গিয়ে পাঠশালার দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে গেল। বললে—সে আসছে স্যার।

আসছে? আচ্ছা। নেপলা, ছড়ি কেটে আন্।

নেপাল ছড়ি কাটতে ওস্তাদ। নিজে মার খায় কাঁদে না; পরে মার খেলে খুব খুশী হয়, হাসে। ছড়ি কাটতে তার অদম্য উৎসাহ।

আজ অনেক দিন পরে মার হবে; শুধিয়ে নিলে, কঞ্চি না ডাল স্যায়?

তার আগেই আকু মলিন মুখে নিজেই এসে তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, কলকাতায় ধীরানন্দবাবুকে পুলিসে বন্দী করেছে স্যার, চিঠি এসেছে ওদের বাড়িতে। শ্যামু-দেবু দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছে।

ধীরাবাবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে?

না স্যার। গ্রেপ্তার করে নাই, বন্দী করেছে—রাজবন্দী।

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সীতারামের সর্বাঙ্গ। রাজ-ব-ন্দী!

হ্যাঁ স্যার, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন কিনা।

উনিশশো একুশ সাল। অসহযোগ আন্দোলন চলেছে দেশে। সীতারামের সাপ্তাহিক পত্রিকা আসে, সারাটা বুক জুড়ে থাকে ওই খবর, ওই দেশবরেণ্য নেতাদের ছবি। ধীরাবাবুর ঘরে সে একখানা বই পেয়েছে, বইখানার নাম—'লাঞ্ছিতের সম্মান'। উনিশশো পাঁচ সালের আন্দোলনে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাঁদের কাহিনী এবং তাঁদের সকলের ছবি আছে তার মধ্যে। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' বড় ভাল নাম। লাঞ্ছনা সম্মান হয় তাঁদেরই সাধনায়, কপালের গুণেই পঙ্কতিলক চন্দনতিলকের চেয়েও সহনীয় হয়। ধীরাবাবু উপযুক্ত মানুষ। এবার ধীরাবাবুর ছবি কাগজে উঠবে, এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে তাঁর জীবনী, তাঁর ছবি।

বয়স্কের মত, বিজ্ঞের মত আকু বললে, ধীরাবাবুর মা স্যার, বসে আছেন, মুখে একটি কথা নাই, চোখ থেকে শুধু টপটপ করে জল পড়ছে।

সীতারাম উঠে দাঁড়াল। বললে, ছুটি, তোমাদের ছুটি।

নিজেই ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে।

পাঠশালা বন্ধ করে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে দ্রুতপদে সে বাবুদের বাড়ির দিকে চলল। তার বুকের ভিতরটা উথলে উথলে উঠছে।

মায়ের মূর্তি দেখে কিন্তু সে স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না, এ তাঁর সুখের কান্না অথবা এ তাঁর দুঃখের কান্না। নিজের মনেও তার যেন এমনই দ্বন্দ্ব চলছে।

অপরাহ্ণে ঝরনার ধারে গিয়ে সে উদাস মনে বসে রইল। এখানটায় ছোট ছোট বনফুলের ঝোপ আছে, সেখানে তিতির পাখির বাসা। তিতিরেরা সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে ছুটে বেড়ায়, কলরব করে, পোকা ধরে খায়, উইঢিপিতে হানা দেয়। অল্পদূরে রক্তহাটার এক

বাবুদের একটা বাগান আছে, বাগানের চারিধারে তালগাছের সারি। সন্ধ্যায় তালগাছের মাথায় সূর্যের রাঙা আলো পড়ে, ঘুঘু ডাকে; এর মধ্যে সে বেশ থাকে, যেন ধ্যানস্থ হয়ে থাকে। আজ সে সব কিছুর দিকেই আর দৃষ্টি পড়ল না। বারেকের জন্যও যাকে বলে, তাও না। কিছু যে ভাবলে, তাও না। শুধু তার চোখের সামনে যেন অহরহ ভেসে বেড়াল ধীরাবাবুর কত ছবি।

সন্ধ্যায় শ্যামু-দেবুকে নিয়ে বসল সে।

শ্যামু বিষণ্ণতার মধ্যেও গম্ভীর হয়ে রয়েছে। দেবু তার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তার মুখে যে হাসি দিগন্তের মেঘের কোলের বিদ্যুৎচমকের মত ক্ষণে ক্ষণে নিঃশব্দ-কৌতুকে শুধু দীপ্তিতে খেলে যায়, সে হাসি তার মুখে আজ একবারও ক্ষীণ আভাসে কোন কৌতুকে দেখা দিল না। সে মুখ যেন আজ বর্ষণমুখর শ্রাবণ-রাত্রির মেঘে ঢেকে গিয়েছে। অবিরাম বর্ষণ চলেছে, আজ বিদ্যুৎ নাই। শুধু অন্ধকার।

সে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললে, জান, দাদা কত বড় কাজ করেছেন?

শ্যামু ঘাড় নেড়ে বললে, জানি।

দেবু, তুমি জান?

দেবু উত্তর দিলে না। সে কাঁদছে।

কেঁদো না। ছিঃ! মাথায় তার হাত বুলিয়ে দিলে সে। আবার বললে, বড় হয়ে তোমাদেরও দাদার সঙ্গে দেশের কাজ করতে হবে যে। জান তো?—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।"

বাইরে থেকে নায়েববাবু বললে, মাস্টার, থাক্। ওদের আর এই সব শিক্ষা দিও না তুমি এখন থেকে।

কানাই রায় সায় দিল, হ্যাঁ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, এতেই তোমার ঠেলা সামলানো দায় হবে। পরে বুঝবে।

উপপদ-তৎপুরুষ নামটি মিথ্যা হয় নাই তার। মধ্যপদলোপীকে তবু সে সহ্য করতে পারে।

রাত্রে মনোরমা সমস্ত শুনলে, সেও উদাস হয়ে গেল। সীতারামের মনের স্পর্শকে সে অদ্ভুত ভাবে গ্রহণ করতে পারে পৃথিবীর রৌদ্রস্পর্শ গ্রহণের মত। তার উদাসীনতা দেখে সীতারাম বললে, কথাটা ঠিক দুঃখের নয় মনু। আমরা ছোট মানুষ, আমরা বুঝতে পারি না।

মনোরমা বললে, আহা, কত বড় ঘরের ছেলে, কত সুখের দেহ, জেলের কষ্ট আর

মান-সম্মান—

সীতারাম তাকে বোঝাতে বসল, এ দেশসেবার জন্য কারাবরণ, এ হল পরম গৌরবের কথা। হোক সুখের দেহ, কিন্তু মনের দৃঢ়তায় অসম্ভব সম্ভব হয়, বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেওয়া যায়।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মনোরমা স্বামীর দিকে চেয়ে রইল।

সীতারাম বললে, আমরা আর কি করব? কতটুকু ক্ষমতা? যতটুকু ততটুকু তো করতে হবে। চরকা কিনে আনব। পুরনো আমলের চরকাটা সব ভেঙেই গিয়েছে। চরকা কাটব। নিজের সুতোয় আমাদের কাপড় হবে। বুঝলে? আর রামকাপাসের বীজ আনব, চারিদিকে লাগিয়ে দোব।

অকস্মাৎ মনোরমা বললে, তোমার ধীরাবাবু কেমন বটে, তা একবার দেখলাম না।

সীতারাম বললে, অবিকল শ্যামুর মত। উঠে গিয়ে সে দাঁড়াল শেল্‌ফের ধারে। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' বইখানি উপরেই ছিল। সেইখানি খুললে অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ একটা কথা তার মনে হল। সে বইখানা মনোরমাকে দিয়ে বললে, বইখানার ছবিগুলোকে রোজ দেখো, প্রণাম করো।

এইবার মনোরমা মা হবে। তারও ঘর এবার শিশুর হাসিতে আলো হবে। শিশুর হাসি স্বর্গীয় বস্তু। শিশুরা দেবদূত। অনেক বইয়ে সে পড়েছে। আর তা যে সত্য, সে বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু বড় হতে আরম্ভ করলেই যত গোলমাল। শয়তান এসে ঘাড়ে চাপে। ছেলেদের সে দু ভাগে ভাগ করে। এক হল—কুকুরের জাত, ছেলেবেলায় ভারি সুন্দর, যত বড় হবে তত খেঁকী হবে, অবশেষে হবে নেড়ী কুত্তা। আর এক—ময়ূরের জাত, যত বাড়বে তত বিচিত্র বর্ণের পালকে ভরে উঠবে, প্রতিটি পালকে ধরা পড়বে আকাশের চাঁদ। এ জাত বড় দুর্লভ। মনে পড়ে ধীরানন্দকে। শ্যামু-দেবু কেমন হবে কে জানে। তবে নেহাত খারাপ হবে না। কথায় আছে, "আগের লাঙল যেখানে যায় পিছনের লাঙলও সেথায় ধায়"—ওরা ধীরাবাবুর মত না হোক, ওর কাছাকাছি তো যাবে।

তার নিজের ছেলের সম্বন্ধেও অনেক গোপন আশা সে পোষণ করে। সেইজন্যই সে ঐ বইখানা মনোরমাকে দিয়ে ছবিগুলিকে প্রণাম করতে বললে। সে শুনেছে, এতে ভাল ফল। মহাত্মাদের প্রভাব গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। বড় অন্যায় হচ্ছে, ধীরাবাবুর বইখানি আজও ফেরত দেওয়া হল না।

সাত

দিন কয়েক পর সীতারামের জাঠতুতো ভাই সীতারামকে খুঁজে গেল। তিন-তিনবার।

সীতারামের জাঠতুতো ভাই পণ্ডিতদাদা মানুষটি বড় ভাল। শান্ত নিরীহ মানুষ, গ্রামেই পাঠশালা করে, গ্রামের দলিল-পত্র লেখে, এ ছাড়া জপতপ করে। পণ্ডিতদাদা পাঠশালাটি নিয়েই আছে। গ্রামের বাদবিসংবাদ যেখানেই হোক, মীমাংসা করবার জন্য নিজেই গিয়ে দু পক্ষকে অনুরোধ করে। জমিদারের খাজনা আদায়ের গোমস্তার আসরেও নিজে থেকেই যায়; লোকের বাকি-বকেয়ার হিসাব দেখে দেয়, লোকজনকে খাজনা বাকির জন্য তিরস্কার করে, সুদ মাপের জন্য গোমস্তাকেও অনুরোধ করে।

সেদিন সন্ধ্যার পর তিনবার সে এসে সীতারামের খোঁজ করলে। সীতারাম তখনও রত্নহাটা থেকে ফেরে নাই। রান্নাবান্না শেষ করে মনোরমা দাওয়ার উপর বসে চরকার জন্য তুলো পাঁজ করছিল। কৃষাণ-বউ একটু দূরে বসে কাজের অভাবে নিজের পায়েই হাত বুলাচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে বলছিল, কি যে বাপু তোমাদের বাতিক; বলে, উঠল বাই তো মক্কা যাই। দিনরাত চরকা, না করকা! তার চেয়ে পায়ে খানিক ত্যাল-ট্যাল দাও। মশা-টশা কামড়াবে না, সরদি-টরদি লাগবে না।

যতক্ষণ সীতারাম না ফেরে কৃষাণ-বউ বাড়িতে থাকে। বসে বসে সে আপন মনেই বকছিল, মনোরমার কিন্তু কানে গেল না, সে একটু চিন্তিত হয়েছে। পণ্ডিত-ভাসুর তিন-তিনবার এল কেন? সহজে তো পণ্ডিত-ভাসুর আসে না!

কৃষাণ-বউ বললে, হবেন আর কি গো। খাজনা-মাজনা বাকি-টাকি পড়েছে হয়তো, গুঁপো গোমস্তা হয়তো কিছু-মিছু বলেছে। অমুনি ছুটে-মুটে আইচেন আর কি পণ্ডিত-খণ্ডিত।

মনোরমা লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু এবারও তো সীতারাম খাজনা দিয়ে রসিদ এনে তাকে রাখতে দিয়েছে। তার তো বেশ মনে পড়ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে বাক্সে রেখে দিয়েছে। খাজনা নিয়ে নিশ্চয় কিছু নয়। তবে কি?

কৃষাণ-বউ তারও মীমাংসা করে দিলে, তবে হয়তো গেরামের পেঁচালী-মেচালীরা (প্যাঁচালো লোকেরা) ঘোঁট-মোট কিছু পাকাচ্ছে-টাকাচ্ছে আর কি।

এটা সম্ভব হতে পারে। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই তাই। তার স্বামীকে কেউ বড় ভাল চোখে দেখে না। সকলেই বলে, ফেল্ করে করে কাঁধে ঘাটা পড়ে গেল, সে-ই হল শেষে পণ্ডিত! অনেকে বলে, আমি খুব ভাল লোকের কাছে শুনেছি, বাবুদের বাড়িতে ওকে মাইনে-টাইনে কিছু দেয় না। শুধু পেটভাতা। অনেকে অকারণে শাপ-শাপান্তও করে, বলে, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে—পড়বে, শিগগিরি পড়বে, দেখ না কেনে।

কৃষাণ-বউ দাওয়ার এক পাশে বসে ছিল, টিপ করে শুয়ে পড়ে বললে, শোও খানিক। ওসবের তরে ভেবো-টেবো না। উসব কক্কা-মক্কা হয়ে যাবে। কি করবে? আট আনার জমিদার বাড়িতে মাস্টেরি-ফাস্টেরি করছে তো হাজার হলেও। লাও, শোও। মালিশ-টালিশ কর খানিক। হঁ্যা।

না। তুই শুয়ে থাক্। আমি আসি। এলাম বলে।

শিগগিরি এস বাপু। ঘুমিয়ে-টুমিয়ে যাই তো বিড়েল-মিড়েল এসে হেঁসেল-টেসেল খেয়ে দেবে। দুধ-টুদ সামিলে রেখে ঢেকে যাও বাপু।

বাইরের দরজার মুখে এসে মনোরমা আবার থমকে দাঁড়াল। সে যাচ্ছিল ওই জ্যাঠাদের বাড়ি। কারু মারফত পণ্ডিত-ভাসুরকে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা কি জানবে। কিন্তু মনে পড়ল, সে গিয়ে দাঁড়াবামাত্রই তো ও-বাড়ির ননদ বাঁকা হেসে বলবে, মাস্টারনী এস।

সেই ইষ্টিশানে সীতারাম শ্যামু-দেবুকে বলেছিল, 'মাস্টারের বউ—মাস্টারনী।' সেই কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছে গ্রামময়। প্রচার করে দিয়েছে হয় কৃষাণ-বউ, নয় ওদের সেই ছেলেটা। ওরাই শুনেছিল কথাটা। তা ছাড়া মনোরমাকেও তারা কেউ ভাল চোখে দেখে না। বলে, অহঙ্কারী। কি যে অহঙ্কার সে করে, সে কথা মনোরমা বুঝতে পারে না।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। তারই ফলে বোধ করি ঘরের কথাটা মনে হল; কৃষাণ-বউটির আবার চুরি করা অভ্যাস আছে। কাঠকুটো, খড়, বাঁখারি তো নেয়ই নিয়মিত, তার উপর ছোটখাটো টুকিটাকি জিনিস পেলেও আঁচলে পুরে নিয়ে থাকে। ধরা পড়লেও লজ্জিত হয় না, লজ্জাবোধ করা দূরে থাক্, একেবারে ঝঙ্কার তুলে বলে, আ—ই, বাড়ির লোব না টৌব না, তো রামা-শ্যামা-যদো-মধোর বাড়িতে লোবটোব নাকি? ইয়েছে চোখ-টোক দিয়ো না বাপু, হঁ্যা। বলে, তিনপুরুষ খাটছি-মাটছি।

এ ছাড়াও, সে সন্তানসম্ভবা, প্রায় আসন্নপ্রসবা। শরীরটাও ভাল নাই। রাত্রে বাড়ি থেকে বাইরে বার হওয়াও ঠিক হবে না। এখন তো তবু বাড়ির ভিতর উঠানে নামে মেয়েরা, আগে নাকি রাত্রে বাড়ির ভিতরেও অনাচ্ছাদিত স্থানে বার হত না কেউ। সে ফিরল। কিষাণ বউয়ের নাক ডাকছে এরই মধ্যে। চিন্তার মধ্যেও তার হাসি এল। নাক ডাকার শব্দ দেখ না। ফর্—ফর্। আবার ফর্‌র্‌ফোৎ করে উঠছে এক-একসময়। সে তুলো নিয়ে বসল। কিন্তু সেও তার ভাল লাগল না।

প্যাঁচাটা ডাকছে দেখ। কালপ্যাঁচা বোধ হয়। কটা বাজল? উপরে ঘড়িটা দেখবার জন্য সে উঠল। সীতারাম বাড়ির জন্য একটা টাইম-পিস কিনেছে। মনোরমাকে ঘড়ি দেখতে শিখিয়েছে অনেকবার। মনোরমার বুদ্ধিটা মোটা, সে মনোরমা নিজেই বুঝতে পারে।

সীতারাম বলে, লোকের মাথায় গরুর গোবর পোরা থাকে, তোমার মাথায় গাধার,

গোবর পোরা আছে।

গাধায় নাকি আবার গোবর হয়। মনে পড়লেই মনোরমার হাসি পায়। পণ্ডিত লোকে কত উদ্ভট কথাই যে বার করতে পারে।

উপরে আর যেতে হল না তাকে। সীতারামের গলা শোনা গেল। পণ্ডিত-ভাসুরের সঙ্গেই কথা বলছে, আমাকে তিনবার খুঁজেছ সন্ধ্যে থেকে? তা আমি তো এই আসছি। কিন্তু খুঁজেছিলে কেন বল দেখি?

স্বভাবসিদ্ধ শান্তকণ্ঠে পণ্ডিত-ভাসুর বললে, চল্, তোর বাড়িতেই চল্।

বাড়িতে এসে ভাসুর বললে, ওপরে চল্।

ওপরে? কেন গো? কি এমন ব্যাপার বল দেখি? সীতারামও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

চল্, বলছি। নীচে আবার কৃষাণ-বউটা আছে।

উপরে গিয়ে বসল দুজনে। মনোরমা সিঁড়িতে না দাঁড়িয়ে পারলে না। বুকের ভিতরটা তার টিপটিপ করছে।

পণ্ডিতদাদা বললে, ধীরাবাবুর জেলের খবর যেদিন আসে, সেদিন কি তুই পাঠশালার ছুটি দিয়েছিলি?

সীতারাম চমকে উঠল, কথাটা ওভাবে সে কোনদিন তো ভেবে দেখে নাই। সে বললে, হ্যাঁ। খবরটা শুনলাম। শুনলাম চিঠি এসেছে বাবুদের বাড়িতে, মা কাঁদছেন, শ্যামু-দেবু কাঁদছে। ওঁদের বাড়িতে পড়াই, ওঁরা জমিদার, সে সম্বন্ধও একটা আছে। আমি থাকতে পারলাম না, ছুটে গেলাম। যাবার সময় ছুটি দিয়ে গেলাম।

পণ্ডিতদাদা বললে, ছুটিটা না দিলেই পারতিস। তুই না থাকলে ছেলেরা সব আপনিই পালাত।

সেই তো সেই একই কথা। সীতারাম হাসলে।

না। এক কথা নয়। ওখানকার লোকে সাব-ইন্সপেক্টারের কাছে দরখাস্ত করেছে।

দরখাস্ত করেছে? বুকটা ধড়াস করে উঠল তার।

হ্যাঁ। আমি আজ গিয়েছিলাম একটা কৈফিয়ত দাখিল করতে। তা উনি আমাকে গোপনে কথাটা বললেন। রত্নহাটার কেউ দরখাস্ত করেছে, পাঠশালায় অসহযোগ প্রচারও করিস তুই। ধীরাবাবুর জেলের খবর এলে পাঠশালা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করেছিল তাঁকে সম্মান দেখাতে। বাড়িতেও চরকা কাটে। চরকা কাটিস নাকি?

কাটি। সীতারাম এতক্ষণে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল।

তাই তো। পণ্ডিতদাদার মাথায় মাথাজোড়া টাক, টাকে হাত বুলানো তার একটা মুদ্রাদোষ—বিশেষ করে সমস্যাসঙ্কুল সময়ে। পণ্ডিতদাদা মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

সীতারাম বললে, করলে ওই শিবকিঙ্করেরা করেছে। তা করুক। আবার একটু পরে বললে, অন্যায় তো কিছু করি নাই। যা হয় হবে।

শিবকিঙ্কর বা তার দলটিই শুধু নয়। আশ্চর্য হয়ে গেল সীতারাম, প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকেই যেন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং এই দরখাস্তে অনেকেরই প্রেরণা আছে। তার প্রমাণ সে পরের দিন সকালেই পেয়ে গেল।

রত্নহাটায় ঢুকতেই মণিলালবাবুর সঙ্গে দেখা হল। মণিলালবাবু গোঁফে তা দিচ্ছিলেন অভ্যাসমত। একটু হেঁট হয়ে ছোট একটি নমস্কার করে সীতারাম চলে আসছিল। মণিবাবু বললেন, হ্যাঁ হে, তুমি নাকি তোমাদের জমিদারবাবুর জেল যাওয়ার অনারে পাঠশালা বন্ধ দিয়েছ শুনলাম?

সীতারাম একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে বেশ শক্ত করে নিলে, মাথার ভিতরে প্রথমেই যেন দপ করে আগুনের শিখার মত রাগ জ্বলে উঠেছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে সবিনয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আজ্ঞে, তা দিয়েছি। তবে আমাদের জমিদারবাবু বলে নয়, যিনিই এমন গৌরবের কাজ করবেন, তাঁর জন্যেই দোব। আপনার ছেলেও তো আমাদের ধীরাবাবুর বয়সী, তিনি গেলে তাঁর অনারেও দোব।

মণিবাবু এমন উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। সীতারাম কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চলে এল মণিবাবুকে অতিক্রম করে।

রত্নহাটার এই সব বাবুদের দেখে আর তার মনে পূর্বেকার মত সে বিস্ময় জাগে না। সে বিস্ময় আর ভয়ে কোন প্রভেদ নাই। সে ভেবে দেখেছে, ভক্তি আর ভয়ে মিশে এমনটা হয়। জমিদার, বাবুলোক, দালানবাড়ি, ধন-ঐশ্বর্য—এই ধারণাটা চাষী প্রজার ছেলে সে, তাকে ভক্তিমান করে তুলত। পাঠশালায় সে দেখেছে, অবস্থা-ভাল ঘরের ছেলেরা, যারা ভাল জামা-কাপড় পরে আসে, নতুন রকমের পেন্সিল, ঝকঝকে নতুন বই, রঙ-চঙে মার্বেল যাদের থাকে, লাল নীল লেবেঞ্চুস পকেটে নিয়ে যারা পাঠশালায় আসে, তাদের প্রীতিভাজন হবার জন্য এমন কি তাদের ঘেঁষে দাঁড়াবার জন্যও অন্য ছেলেরা লালায়িত হয়ে ওঠে। নেহাত গরীব যারা, তারা কাছে এসেও একটু তফাত বজায় রেখে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখে। ঐশ্বর্যবান ছেলেটির কোন জিনিস পড়ে গেলে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেটি তুলে তার হাতে দিয়ে কৃতার্থ হয়ে যায়। বাবুদের প্রতি ভক্তিও ঠিক এই জিনিস, এতটুকু প্রভেদ নাই।

আর ভয়? কিসের ভয়? ভয়ও আর তার হয় না। একটা জিনিস সে বুঝেছে। এরা হুঙ্কার করে উঠবেই, ওটা তাদের স্বভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হুঙ্কারের পিছনে আছে দু-চারটে চাপরাসী। সাহস করে হুঙ্কারকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়াতে পারলে ওরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আর ভয়ই বা করবে কেন? ওরাও মানুষ, আর সবাইও মানুষ।

হঠাৎ পিছন থেকে ডাকলেন মণিবাবু, শোন, শোন, ওহে ছোকরা।

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর চাপরাসী সাদৎ শেখ ছুটতে ছুটতে এসে, তার সামনে এসে দাঁড়াল, তুমাকে ডাকছেন বাবু।

সীতারাম স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার এখন সময় নাই। বাবুকে বলগে।

সময় নাই! বিস্মিত হয়ে গেল সাদৎ।

না। সেই স্থির দৃষ্টিতেই সে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সাদৎ বললে, চল ভাই একবার। কেন আমাকে হাঙ্গামা-হুজ্জৎ করাবে?

হাতের লণ্ঠন ছাতা লাঠি কাঁধের জামা এ সবগুলি পথের উপরেই রাখলে সীতারাম। সাদৎ বললে, হাতে করে নিয়েই চল পণ্ডিত। উ গুলান আর কী ভারী হবে?

সীতারাম উত্তরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, হাতাহাতি হাঙ্গামা করবে? না লাঠি নেবে? বল, তা হলে লাঠিখানা তুলে নিই।

চাষীর ছেলে, বাল্যকাল থেকেই পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাদের মানুষ হতে হয়, তার উপর জন্ম থেকেই তার দেহের গঠন বলিষ্ঠ। কিন্তু এমনভাবে জীবনে সে কোনদিন দাঁড়ায় নাই। কালে-কস্মিনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু তাতে এতে অনেক প্রভেদ। আজ তার মনে হল, খুন হতেও সে রাজী আছে। এ উদ্ধত অপমান সে সহ্য করবে না।

বলিষ্ঠ দেহে তার এইভাবে দাঁড়ানো বেমানান হয় নাই, সাদৎও সচকিত হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে হয়তো হাঙ্গামা সঙ্গে সঙ্গেই বেধে যেত। সাদৎও বলশালী ব্যক্তি, কিন্তু সাদতের দিক থেকে এটা মনিবের কাজ; হুকুমমত করতে হবে, বিশেষ করে মনিব ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন। সে হেঁকে বললে, পণ্ডিত বলছে, সময় নাই তার এখুন।

মণিবাবুর কাছারি অল্প দূরেই, তিনি নিজের চোখেই সব দেখছিলেন, তিনি বললেন, থাক্। তুমি চলে এস।

সাদৎ বললে, তুমার সঙ্গে মারামারি করতে আমি আসি নাই পণ্ডিতভাই। তুমি রাগ করিও না আমার উপর। কি করব বল? গরীবগুনা মুরুখ্যু লোক, এই করেই খেটে খাই। সে চলে গেল।

সীতারাম একটু লজ্জিত হল। সত্যই, সাদতের উপরে এতটা রাগ করা তার উচিত হয় নাই। সাদতের দোষ কি? কিন্তু এই মণিলালবাবু? এরা কি? ছাতা লাঠি লণ্ঠন জামা তুলে নিয়ে সে বাবুদের বাড়িতে ঢুকল।

পাঠশালার দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল জ্যোতিষ সাহা। সাহা বললে, পণ্ডিত, সেদিনের কাজটা ভাল হয় নাই।

সাহার বক্তব্যের মর্ম মুহূর্তেই সীতারাম বুঝতে পারলে। তবু সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ধীরাবাবুর জেলের খবর শুনে পাঠশালায় ছুটি দেওয়াটা ভাল হয় নাই।

সীতারাম মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে ভাবতে লাগল।

ইস্কুল সাব-ইনেসপেক্টারবাবু একবার ডেকেছেন তোমাকে। তুমি যাও একবার।

সীতারাম বললে, যদি ইস্কুলের এড বন্ধ করে দেয় সাহা মশায়, তা হলে আপনারা—আপনারাও কি পাঠশালা—

বাধা দিয়ে সাহা বললে, আগে থেকে এতটা ভাবছ কেন পণ্ডিত? একটা কৈফিয়ত দিলেই চুকে যাবে। সে আমাকে সাব-ইনেসপেক্টারবাবু বলেছেন। তা ছাড়া রজনীবাবু ইনেসপেক্টার লোক ভাল, ধার্মিক মানুষ, মহাশয় লোক। যাও, তুমি একবার ঘুরেই এস।

ইস্কুল সাব-ইন্সপেক্টার রজনীবাবু সত্যই ভাল লোক। একটু বেশী মাত্রায় ভাল লোক। রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, কোনক্রমেই মিথ্যা কথা বলেন না, কোন পণ্ডিতের কাছে এক টুকরাও জিনিস গ্রহণ করেন না। শুধু দুটি বাতিক আছে। ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, অসুখ-বিসুখ হলে তাঁর ওষুধ খেলে তিনি খুশী হন এবং রামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিরোধান উৎসব করলে রজনীবাবু তাঁকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ না করে পারেন না।

সীতারামের দুর্ভাগ্য, সীতারামের শরীর খুব ভাল, সে কখনও রজনীবাবুর ওষুধ খায় না। এবং রত্নহাটা গ্রামখানি রত্নহাটই বটে, এখানে মণিলাল ও শিবকিঙ্করের মত রত্নের দল এত প্রবল যে, রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব এখানে হওয়া আজ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। একবার হয়েছিল আয়োজন, ধীরানন্দের সমবয়সী এবং তারই কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শিবকিঙ্করের দল সে পণ্ড করে দিয়েছিল। তারা পরামর্শ করেছিল, উৎসব হলে একটা পাঁঠা নিয়ে গিয়ে তারা সেই উৎসবক্ষেত্রে বলিদান দিয়ে দেবে।

মণিলালবাবুর চাল কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের। জমিদারী কূটচাল। তিনি রজনীবাবুকে বলে পাঠিয়েছিলেন, সম্প্রতি তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে যে, রজনীবাবু আজকাল কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে অবলম্বন করে গ্রামের অভ্যন্তরে যাতায়াত করছেন। তিনি অর্থাৎ মণিলালবাবু বিশ্বাস করেন যে, রজনীবাবু সৎ এবং ভদ্র ব্যক্তি, কোন কুঅভিপ্রায় তাঁর নাই বা থাকতে পারে না; কিন্তু যেহেতু তাঁর আসা-যাওয়ার জন্য গ্রামের কন্যা এবং বধূদের অসুবিধা হয়, সেই হেতু তিনি সবিনয় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। দলিলের মুসাবিদার মত পাকা এবং প্যাচালো ভাষার এই উক্তি শুনে রজনীবাবুর হাত-পায়ের আঙুলের ডগাগুলি সত্যই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন সমস্ত আয়োজন। পর-বৎসর হতে তিনি বড় ইস্কুলের বোর্ডিঙে, সেখানকার ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিয়ে এইসব পুণ্য দিনগুলি প্রতিপালন করে থাকেন। সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা, বোর্ডিঙের ছাত্রদের নিয়ে আধ ঘণ্টা রিলিজিয়াস ক্লাস বসে; গান হয়।—

"মা আমারে দয়া করে
শিশুর মতন করে রেখো।
শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই,
মনটি শিশু করে রেখো।"

কিন্তু সীতারাম এর কোনটিতেই আজও যোগ দেয় নাই। তার কারণ সীতারামের ভক্তির অভাব বা অবিশ্বাস নয়। তার কারণ ওই বড় ইস্কুলের কোন আয়োজনে সে কোনমতেই যেতে চায় না, যেতে পারে না। বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের প্রথম দিনে সেই স্নেহহীন এবং সহানুভূতিহীন কথাগুলি অহরহ মনে পড়ে। হেডমাস্টার শ্লেষের সুরেই বলেছিলেন, সাহা কৈবর্ত এদের নিয়েই পাঠশালা কর তুমি তা হলে। পুণ্যও হবে—অন্ধকার থেকে ওদের আলোকে আনা হবে। তাই সে করছে। তবু তার একটা নিগূঢ় অভিমান আছে। তা ছাড়া, ইস্কুলের কোন উৎসবেই তারা তাকে নিমন্ত্রণও করে না। অন্য মাস্টারেরাও তাকে ঘৃণা করে। এমন কি শিবকিঙ্করের আবিষ্কৃত 'আঁচলে করে মুড়ি খাচ্ছিস ক্যা—নো, আঁচল যে এঁটো হবে'—এই কথাটা নিয়েও তারা রহস্যালাপ করে থাকে। সীতারাম অবশ্য ইচ্ছা করলেই এই ব্যঙ্গের উত্তরে ব্যঙ্গ করতে পারে। ওই ইস্কুলের মাস্টারদের অনেক খারাপ উচ্চারণ আছে; কেউ 'এবং' আর 'কেবল'কে বলেন, 'অ্যাবং' ও 'ক্যাবল'। কেউ 'অ্যামোন'কে বলে 'এমোন'। কেউ কর্তব্যকে বলে—কোর্তব্য। এসব নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারে, কিন্তু সে তা করে না। তবে ওদের সংসর্গ সে এড়িয়ে চলে। তাই রজনীবাবুকে খুশী করার সুযোগকে উপেক্ষা করেও বড় ইস্কুলের ধর্মসভায় সে যোগ দিতে যায় না।

ওখানে যাবার কথা হলেই একটা গল্প মনে পড়ে তার। নদীতে ভেসে যাচ্ছিল একটা স্বর্ণকুম্ভ আর একটা মৃৎকুম্ভ। স্বর্ণকুম্ভ মৃৎকুম্ভকে ডেকে বলেছিল, আমরা দুজনেই যখন কুম্ভ, তখন এস, একসঙ্গেই যাই। কাছে এস তুমি। মৃৎকুম্ভ নমস্কার করে বলেছিল, হে মূল্যবান স্বর্ণকুম্ভ, তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার বহুমূল্য উদারতার ঝঙ্কার আমার সহ্য করবার শক্তি নাই। আমার দূরে থাকাই ভাল। তাই সে দূরেই থাকে। রজনীবাবু এর জন্য কিছু মনে করেন কিনা সে জানে না। তবে ভরসা এই যে, রজনীবাবু অন্যায় করবার লোক নন। অন্যায় তিনি করবেন না—সে কথা সীতারাম বিশ্বাস করে। তবু চিন্তিত হয়েই সে আজ সবিনয়ে নমস্কার করে সামনে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, একটু বসো। বসতে হবে। এঁদের কাজ সেরে নিই।

ইস্কুল-সাব-ইন্সপেক্টারের দরবার। এই সার্কেলের পাঠশালার পণ্ডিতদের দুজন চারজন প্রতিদিনই আসে। বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ, চোখে-মুখে শীর্ণতা, বিনীত দৃষ্টি; সাব-ইন্সপেক্টারের দাওয়ায় খাতাপত্র নিয়ে বসে থাকে। রত্নহাটার বাবুরা চলে যান সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ঝলমলে পোশাক পরে; তারা বাক্যহীন হয়ে চেয়ে দেখে। কচিৎ এক-আধ

জন সেকেলে বুড়ো পণ্ডিত এখানকার বাবুদের কোন ছেলেকে একলা পেলে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করে; তারপর অকস্মাৎ কঠিন বানান, জটিল মানসাঙ্ক ধরতে শুরু করে, বাবুদের ছেলে নিরুত্তর হলে খুশী হয়; মুখে তৃপ্তির হাসি দেখা দেয়। কিন্তু দু-একজন ছেলে এখনও আছে, যারা এখানকার ভাবী শিবকিঙ্কর, তারা প্রথমেই ধমক মেরে দেয়, শাট-আপ। পড়া ধরবার তুমি কে? ইংরিজীতে বলে—হু আর ইউ?

একের পর একজনকে ডাকেন রজনীবাবু, মহেশপুর পাঠশালার পণ্ডিত মশাই। ভিতরে আসুন!

আজ্ঞে, যাই বাবু। বৃদ্ধ পণ্ডিত হাতজোড় করে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাসিক চার টাকা সাহায্য পায় পণ্ডিত। 'মহামহিম মহিমার্ণব রত্নহাটা সার্কেলের সাব-ইন্সপেক্টার মহোদয় সমীপে অধীনের একান্ত বিনীত প্রার্থনা এই, চারি টাকা পরিমাণ সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া মাসিক পাঁচ টাকা করিতে আজ্ঞা হয়।' বৃদ্ধ পণ্ডিত বললে, বাবু মশায়, আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পাঠশালা করছি, প্রথম ছিল দু টাকা সাহায্য। কিন্তু আজও পাঁচ টাকা হল না। হুজুর বিবেচক, অধীন কি বলবে? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরীক্ষার ফল দেখুন।

রজনীবাবু বললেন, আপনার তো আরও বাড়তি উপায় রয়েছে পণ্ডিত মশায়। গোমস্তার কাগজ সেরে দেন; দোকানের খাতা লেখেন। একটা টাকা এড বাড়লে আর কি এমন বেশী পাবেন?

পণ্ডিত হাত জোড় করে বললে, হুজুর গোমস্তার খাতা লিখে আমি কিছু পাই না। যে কদিন খাতা লিখি, সেই কদিন দু মুঠো অন্ন মেলে শুধু। তবে দোকানের খাতা লিখে দি, দোকানী দু টাকা করে দেয় মাসে। একটু চুপ করে থেকে পণ্ডিত আবার বললে, হুজুর অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন, এক টাকা এমন কি বেশি? কথা সত্য। কিন্তু হুজুর, আমার বড় সাধ, একান্ত বাসনা, আমার এড পাঁচ টাকা হয়। আশপাশের পাঠশালা পাঁচ টাকা পায়, আমি চার টাকা পাই, আমার লজ্জা হয়। এইটি আমার শেষ সাধ, আমার—

পণ্ডিতের বাক্যস্রোতে রজনীবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আমি উপরে পাঠিয়ে দিলাম দরখাস্ত। এবার কোতলঘোষার পণ্ডিত মশাই!

কোতলঘোষা ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। তাঁরা আবার তান্ত্রিক। সেখানকার পণ্ডিত এসে দাঁড়াল। পণ্ডিতটি জাতিতে কায়স্থ, ধর্মমতে বৈষ্ণব; দুর্বুদ্ধিবশত পণ্ডিত একটি দুর্বিনীত ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত শাক্ত তান্ত্রিকদের পাঁঠাবলি এবং কারণ করা নিয়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করেছে, বলেছে, কেন বাবা আমাকে কষ্ট দাও আর নিজেই বা কষ্ট পাও কেন? এমন কুলকর্ম রয়েছে, অনুস্বার বিসর্গ লাগালেই মন্ত্রং হয়ে যাবেং, আর তারঃ সঙ্গেঃ দু ঢোকং কারণং। বাস্, তোমার অন্ন খায় কে? এ কষ্ট কেন তোমার? সেই হেতু তার বিরুদ্ধে দরখাস্ত হয়েছে।

রজনীবাবু বললেন—এ সব কথা বললেন কেন আপনি ? তারা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ।

পণ্ডিতটি হাত-জোড় করে বললে—আজ্ঞে বাবু, কায়স্থ হলেও তো আমি মানুষ ; সহ্যের তো একটা সীমা আছে। ছেলেটা একেবারে ধর্মের ষণ্ড হয়ে উঠেছে!

মাথা চুলকে লজ্জা প্রকাশ করে বললে—তামাক খাই হুজুর—তা তামাক টিকে এ আর ছেলেটা রাখে না! তার উপর একে মারছে ওকে ধরছে। কারও বই ছিঁড়ে দিচ্ছে। সেদিন একজনের কান কামড়ে রক্তারক্তি ব্যাপার। কানে ধরলাম তো মহিষের মত রক্তচক্ষু করে বললে—খবরদার, কায়েত হয়ে কানে হাত দেবে না তুমি। আমার গুরুর কান ; মন্তর হয়েছে আমার।

রজনীবাবু চটে উঠলেন—কঞ্চি ? কঞ্চি কি হল আপনার ? কঞ্চি দিয়ে বেশ ঘাকতক দেন নি কেন ? অতি অযোগ্য লোক আপনি !

পণ্ডিত বললে—তা হলে কোন দিন অন্ধকারে আচমকা ঢেলায় আমার মাথা ফেটে যাবে হুজুর। ব্রাহ্মণ নই, নিরীহ শিক্ষক—সে যে, গো-বধ হবে বাবু।

রজনীবাবু এবার হেসে ফেললেন—কি বিপদ! তা হলে করবেন কি আপনি ? আমিই বা লিখব কি ? একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা। আর যেন এসব কথা বলবেন না।

আজ্ঞে না, আর কখনই বলব না হুজুর। তারপর সে বললে, আজ্ঞে বাবু, রামকৃষ্ণ-কথামৃতের কত দাম ? আমি একখানা আনাতে চাই ; দোকানের ঠিকানাটা যদি লিখে দেন। কায়স্থের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চিন্তার মধ্যেও সীতারাম তারিফ করলে। রামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রসঙ্গ ঝাঁ করে কায়দা-মাফিক এনে ফেলেছে কায়স্থ পণ্ডিত !

এর পর পালা এল পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিতের। এই পণ্ডিত মশায়টির সঙ্গেই এতক্ষণ সীতারাম কথা বলছিল। পণ্ডিত নিজের দুঃখের কথা বলছিলেন। অনেক দুঃখ করেছেন জীবনে। যে গ্রামে পাঠশালা করেছেন, সেখানে পাঠশালা করবার অনুমতি লাভের জন্য জমিদারের কাছারির পাচকবৃত্তি স্বীকার করতে হয়েছিল। সেকালে জমিদার মহলে এলে তাঁর রান্না করতে হত। জমিদারের গ্রামদেবতার পূজা করতে হত। এটায় অবশ্য লাভ ছিল। এর ফলে গ্রাম্য পৌরোহিত্য পেয়েছিলেন। আখমাড়াইয়ের সময় শালপুজো করে গুড় পেতেন, ইতুপুজো করে কলাই পেতেন। কিন্তু পণ্ডিত হেসে বললেন, বাবা, সকাল থেকে দেড় প্রহর বেলা পর্যন্ত পাঠশালা, তারপর স্নান, তারপর পুজো। তার মানে—বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত না খেয়ে কাটত। খাওয়াটা অবশ্য বাঁচত কিন্তু তার ফলে ব্যাধি জুটেছে এখন, তার উপর এই কন্যাদায়। জীবন শেষ হয়ে গেল। আর দু-এক বছর। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাদের আমল তো সোনার আমল বাবা। গেরস্তের বাড়িতে ছেলের জন্যে ধরণা দিতে হয় না। ছেলের বাবা বলে না, আমাদের ছেলে নেকাপড়া করে কি করবে ? ছেলের মা-পিসী বলে না, বংশে নাই, নেকাপড়া আবার সহ্য হবে তো ? ধ্যানত

হবে। না, না, ওতে কাজ নাই। তুমি তো বাবা সাহা-কৈবর্তদের ছেলে নিয়ে পাঠশালা করছ এখন। এখন সব লেখাপড়া শেখবার একটা চাড় হয়েছে। আরও হবে। আমরা দেখব না, তোমরা দেখবে।

সীতারাম স্বীকার করলে সে কথা, বললে, তা বটে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবলে।

রজনীবাবু ডাকলেন, পলাশবুনির পণ্ডিত মশাই !

ব্রাহ্মণ পৈতেটি হাতে জড়িয়ে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন, হুজুর, গরীব ব্রাহ্মণ, এইটুকুই আমার অন্ন। এটুকু আমার মারা গেলে ছেলেপিলে নিয়ে মারা যাব। তার উপর কন্যাদায়।

বৃদ্ধ পণ্ডিত কন্যার পাত্র সন্ধান করতে গিয়ে প্রায় দশ-বারো দিন পাঠশালা কামাই করেছেন।

সহৃদয় মানুষ রজনীবাবু। বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন—বসুন, বসুন আপনি।

পণ্ডিত বসতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

রজনীবাবু বললেন—আমাকেও তো জানিয়ে যেতে পারতেন। আমি ইন্‌সপেক্‌শনে গিয়ে দেখি—পাঠশালা বন্ধ। লোকে বললে—উনি এই রকম কামাই প্রায়ই করেন।

পণ্ডিত বললেন—ভয়ে, আজ্ঞে বাবু ভয়ে আমি আপনার কাছে—। আবার কেঁদে ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, বাবু ষোল বছরের কন্যা গলায় ফাঁসির মত লেগেছে, রাত্রে ঘুম হয় না, মুখে ভাত ওঠে না; সেদিন প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম—পাত্র যোগাড় না করে ফিরব না।

পাত্রের যোগাড় হয়েছে ?

পেয়েছি। এক বৃদ্ধ—তৃতীয় পক্ষ। দোব, তাই দোব। কি করব। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন পণ্ডিত।

রজনীবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আচ্ছা যান আপনি। তবে এ-রকম ভাবে না জানিয়ে একনাগাড়ে দশ-বারো দিন কামাই আর করবেন না।

পলাশবুনির পণ্ডিত চলে গেলেন। আর কেউ নাই।

সকলকে বিদায় করে রজনীবাবু ডাকলেন, সীতারাম !

সীতারাম নমস্কার করে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, বস। বড় খামের ভিতর থেকে একখানি দরখাস্ত বার করে তিনি নিজে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমাদের গ্রামের পণ্ডিত, সে তোমার দাদা; তাকে সব বলেছি, শুনেছ তুমি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি তো ইংরেজীও কিছু জান। পড়ে দেখ, মোটামুটি বুঝতে পারবে। সীতারামের হাতে দিলেন দরখাস্তখানি।

টাইপ করা দরখাস্ত—To the District Magistrate। একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছে। সাহেব পাঠিয়েছেন ইস্কুল সাব-ইন্সপেক্টারের কাছে, তদন্তের জন্য।

দরখাস্তের কারণ, অসহযোগ আন্দোলনে ধীরানন্দ মুখুজ্জের জেল হওয়ার সংবাদ এলে সন্দীপন পাঠশালার শিক্ষক সীতারাম পাল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঠশালা বন্ধ দিয়েছে। এ থেকেই প্রমাণ হবে, তার ধীরানন্দের প্রতি অনুরাগ। সীতারাম ধীরানন্দের প্রজা, তাদের বাড়িতেই সে থাকে, তারই আদর্শে সে অনুপ্রাণিত। এই মতিভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবা ধীরানন্দ বর্তমানে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিলেও আসলে সে সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সীতারাম ধীরানন্দের পরামর্শে এবং আদর্শে পাঠশালার ছেলেদের রাজদ্রোহ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সীতারাম অত্যন্ত দুর্বল মানুষের মত ধীরে ধীরে দরখাস্তখানি রজনীবাবুর সম্মুখে নামিয়ে দিলে। একটা দুরন্ত ভয়ে তার মন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ধীরানন্দ সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত? সীতারাম তার পরামর্শে এবং আদর্শে পাঠশালার ছেলেদের রাজদ্রোহ শিক্ষা দিয়ে থাকে? তার মনে হল, পাঠশালার এত বন্ধ হওয়া—এ তো সামান্য কথা, এতে তাকে পুলিসে ধরে নিয়েও যেতে পারে!

রজনীবাবু প্রশ্ন করলেন, পাঠশালা বন্ধ কেন দিলে তুমি? এ আমি কি লিখব?

নিজেকে সংযত করে সীতারাম ধীরে ধীরে বললে, আমি তো ঠিক ওভাবে পাঠশালা বন্ধ দিই নাই। আমি ওঁদের বাড়িতে থাকি, ওঁরা আমাকে বাড়ির ছেলের মতই দেখেন, যখন ওঁদের এই বিপদের কথা শুনলাম, মা কাঁদছেন, আমার ছাত্র দুটি কাঁদছে, তখন আমি—

রজনীবাবু বললেন, তুমি কি এমন কোন কথা বলেছিলে যে, আজ ধীরানন্দবাবু দেশের জন্য জেলে গিয়েছেন, সেই জন্যে পাঠশালা বন্ধ হল?

আজ্ঞে না বাবু। যে দিব্যি করতে বলেন, আমি সেই দিব্যি করতে পারি। আপনি ছেলেদিগে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। জ্যোতিষ সাহা মহাশয় আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রজনীবাবু বললেন, সাহা মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি অবশ্য, তুমি যা বলছ, তাই বলেছেন। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা, তাই আমি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটু সাবধান হবে এর পর থেকে, বরং—

একটু চুপ করে থেকে তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললেন, তুমি বরং ধীরানন্দবাবুদের বাড়িতে থাকা ছেড়ে দাও। তাতে ভাল হবে। বুঝলে?

সীতারাম চুপ করে রইল। দেবু-শ্যামুকে পড়ানো ছেড়ে দেবে? ওদের বাড়ির সঙ্গে সংস্রব ছেড়ে দেবে বিপদের সময়ে?

রজনীবাবু বললেন, দেখ এসব আন্দোলন, এই রাজনীতি, এ আমাদের দেশের নয়। এ হল বিদেশী জিনিস। এতে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে না। আমাদের একমাত্র পথ হল ধর্মের পথ, ধর্মনীতির মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তি আসবে। পরমহংসদেব স্বামীজী এ কথা বার বার করে বলে গিয়েছেন।

সীতারাম তাকিয়ে দেখলে, রজনীবাবুর দেওয়াল-আলমারিতে সারি সারি বই সাজানো রয়েছে। রামকৃষ্ণ-কথামৃত থেকে স্বামীজীর বইগুলি—'বীররাণী', 'পরিব্রাজক', কত বই।

রজনীবাবু বলেই যাচ্ছিলেন, বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের কথা। তিনি বলে গিয়েছেন, আমি ভারতবাসী। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতবাসী আমার ভাই।

বাইরে থেকে কেউ ডাকলেন, রজনীবাবু রয়েছেন নাকি?

কে? মাস্টার মশাই?

হ্যাঁ। আজকের জোর খবর। সি. আর. দাস অ্যারেস্টেড হয়েছেন।

তাই নাকি? বেরিয়ে গেলেন রজনীবাবু। সীতারাম বীরবাণী বইখানা টেনে নিলে।

করলে কি মশাই? কাঁপিয়ে দিলে যে।

হ্যাঁ।

ছেলেরা তো কেউ আজ ক্লাসে আসবে না।

হেসে রজনীবাবু বললেন, আপনারা বেঞ্চি আগলে বসে থাকুন, নইলে এ গ্রামকে বিশ্বাস নাই। দেবে হয়তো দরখাস্ত করে। বেচারী সীতারামের বিরুদ্ধে দরখাস্তের কথা জানেন তো? অথচ বেচারী ঠিক ওভাবে পাঠশালা বন্ধ দেয় নাই। ধীরানন্দের বাড়িতে থাকে, এমন একটা বিপদের খবর পেয়ে বেচারা ছুটে গিয়েছিল। বিপদে যেমন মানুষ মানুষের বাড়ি যায়।

হঠাৎ কেউ শ্রমিক বা কৃষাণ শ্রেণীর লোক কথা বললে। আজ্ঞে বাবু মাশায়—।

সীতারাম ঘরের মধ্যেই বসে ছিল। 'বীরবাণী'খানা টেনে নিয়ে উল্টে দেখছিল। হঠাৎ তার কৃষাণের ছেলের গলার আওয়াজে সে চমকে উঠল।

আজ্ঞেন, এখানে সীতারাম পণ্ডিত মশায় আইচেন না?

কি রে, কি?—সীতারাম বেরিয়ে এল।

আজ্ঞেন, কন্নেসন্তান হইচেন গো। তাই বাবা বললে, খবর দিয়ে আয় গা।

মনোরমা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছে। সে লজ্জিত হল।

রজনীবাবু একটু হেসে বললেন, যাও, তুমি বাড়ি যাও। ভেব না। আমি ঠিক করে দেব সব।

একটু পথ এগিয়ে সীতারাম বললে, ভাল আছে তো?

আজ্ঞেন হ্যাঁ। বাবা তো বলেন নাই। মুনিব্যানই বললে। তা ভদ্দর লোকদের ছামনে বাবার নামই করলাম।

সীতারাম একটু হাসলে। ছোঁড়াটার বুদ্ধি আছে।

ছোঁড়াটা পিছন থেকে হঠাৎ বললে, আজ্ঞেন, পকেট থেকে বইটা পড়ে যাবেন গো, বেরিয়ে পড়েছেন যে।

বই! পকেট থেকে টেনে বার করলে বইখানা। তার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল। রজনীবাবুর 'বীরবাণী'খানা উল্‌টে দেখছিল, তাড়াতাড়ি উঠে আসবার সময় সেখানা সে পকেটে পুরে নিয়ে এসেছে।

* * * *

পাণ্ডুর মুখে শুয়ে ছিল মনোরমা। কোলের কাছে সদ্যোজাতা শিশুকন্যা। অদ্ভুত! তাকাতে পারে না ভাল করে, আঙুলগুলো মুঠো বেঁধে রয়েছে, থরথর করে কাঁপছে। বড় ভাল লাগল সীতারামের।

মনোরমা হেসে বললে, তোমার মত হয়েছে।

সীতারাম বললে, তবে তো খুব ভাল হয়েছে! বিয়ে দিতেই চক্ষু চড়কগাছ! আমার মত কুচ্ছিৎ!

বাধা দিয়ে মনোরমা বললে, ও মাগো! কথার কি ছিরি তোমার! কুচ্ছিৎ আবার কোন্‌খানে তুমি? না, নিজেকে কুচ্ছিৎ বললে বেশী বাহাদুরি হয়?

সীতারাম হাসলে। তারপর বললে, কথাটা যদি তোমার ছলনা না হয়, তবে তোমাকে চশমা এনে দিতে হবে।

কথার প্যাঁচটা ঠিক বুঝতে না পেরে মনোরমা অবান্তর একটা রহস্য করলে। উত্তরে বললে, চশমা দিও জুতো দিও, একটা টুপি কিনে দিও, তোমার ইস্কুলে আমি একটিনি চালিয়ে দিয়ে আসব।

সীতারাম মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে, হোক কালো-কুচ্ছিৎ, ওকে আমি লেখাপড়া শেখাব। ভাল বিয়ে যদি না হয় তবে বিয়ে আমি দোবই না। লেখাপড়া শেখাব, ও আপনার কোন ইস্কুলে-টিস্কুলে মাস্টারি করবে। কাল কেটে যাবে।

কি অলুক্ষণে কথা তোমার!

কেন?

মাস্টারি করবে কি? মেয়েতে আবার মাস্টারি করে?

এই তো রত্নহাটা-বিদ্যালয়ে মেয়ে-মাস্টার আসছে।

মেয়ে-মাস্টার আসছে? ক্রীশ্চান নাকি?

উঁহু। ক্রীশ্চান কেন হবে, হিন্দু-কায়স্থের মেয়ে।

মনোরমা অবাক হয়ে গেল। কায়স্থ-ঘরের মেয়ে চাকরি করছে? বিয়ে করে নাই?

তা জানি না।

মনোরমা নিজেই অনুমান করে বললে, বিয়ে হলে কি স্বামীতে চাকরি করতে দেয়?

বিয়ে হয় নাই।

সীতারাম বললে, সেই তো বলছি, ভাল পাত্র—লেখাপড়া জানা পাত্র যদি না পাই, তবে মেয়ের বিয়ে আমি দোব না। বুঝলে?

মনোরমা বললে, অনেক করে টাকা দেবে, বিয়ের আবার ভাবনা!

অনেক টাকা! হেসে উঠল সীতারাম।

মনোরমা বললে, হ্যাঁ। তোমার যত সব ছাত্তর, তাদের কাছে নেবে—এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, যে যেমন—

সীতারামের মনে পড়ল, পলাশবুনির কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথা। সে অন্যমনস্কভাবে 'বীরবাণী' বইখানা নাড়তে লাগল।

হঠাৎ মনোরমারও মনে পড়ল, গত সন্ধ্যায় ভাসুরের কথা। সে বললে, সেই যে দরখাস্তের কথা বলছিল পণ্ডিত-ভাসুর, তার কি হল?

ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব হালকা এবং সংক্ষিপ্ত করে সীতারাম বললে রজনীবাবুর ওখানকার বিবরণ।

আট

রজনীবাবুকে দোষ দিতে পারবে না সীতারাম; রজনীবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। রিপোর্টে তিনি কি লিখেছিলেন না দেখলেও সীতারাম জানে, তিনি তাকে বাঁচিয়েই রিপোর্ট দিয়েছেন। দোষ বোধ হয় সীতারামের ভাগ্যের। তা ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পায় না সে।

হঠাৎ সেদিন মোটরকার এসে দাঁড়াল পাঠশালার দরজায়। মোটর থেকে নামলেন পুলিস সাহেব। আকু ছুটে বেরিয়ে গিয়ে আবার তখনই ফিরে এল। পুলিস সায়েব, মাস্‌শাই।

পুলিস সায়েব?

হ্যাঁ। দফাদারকে শুধালাম, দফাদার বললে।

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল সীতারাম। পুলিস সাহেব দরজার মাথায় কাঠের উপরের লেখা নামটা পড়ছিলেন—সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন, পিকিউলিয়ার নেম! দারোগার দিকে ফিরে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, হু ইস্ দিজ সন্দীপন? হু ইজ হি?

দারোগা বললেন, ঠিক জানি না সার্!

সীতারাম নমস্কার করে দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরটা দুরন্ত ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

গ্রাম্য পাঠশালায় সাহেব-সুবোরা বড় একটা আসেন না, এলেও আসেন এস. ডি. ও, নয়তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। পুলিস সাহেবের পাঠশালায় আসা আর কাঠুরের কাছে যমের কাঠের বোঝা তুলে দিতে আসায় কোন প্রভেদ নাই। গল্পের কাঠুরে যমকে ডেকেছিল, ফিরে যেতে বললে, সে ফিরে গিয়েছিল। এ কিন্তু যখন না ডাকতে নিজে থেকে এসেছে, তখন সে কি শুধু শুধু ফিরে যাবে?

গভীর সম্ভ্রম দেখিয়ে সীতারাম নমস্কার করে দাঁড়াল। দারোগা বললেন, এই পাঠশালার পণ্ডিত সার্।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সাহেব বললেন, ইউ পণ্ডিট? সীটারাম পাল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

সাহেব বাঙলা বললেন, সন্দীপন পাঠশালা। মানে কি?

কথাটা বুঝতে পারলে না সীতারাম, বিব্রত অপ্রতিভের মত বললে, আজ্ঞে?

সন্দীপন নাম কেন পাঠশালার? সন্দীপন কে?

একটু বিস্মিত হল সীতারাম। বাঙালী সাহেব, হিন্দুর ছেলে; শুনেছে সাহেব খুব বড় বৈষ্ণববংশের ছেলে, সন্দীপন কে তা সাহেব জানেন না! সে হাত জোড় করে বললে, হুজুর, শ্রীকৃষ্ণের গুরুর নাম সান্দীপনি মুনি। তাঁর সন্দীপন পাঠশালাতেই কৃষ্ণ-বলরাম লেখাপড়া শিখেছিলেন।

আই সী। স্থির দৃষ্টিতে সাহেব কিছুক্ষণ সীতারামের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার উপাধি তো পাল! চাষী সদ্‌গোপের ছেলে!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার গ্রামও তো ছোট চাষীর গ্রাম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। এই পাশেই—ক্রোশখানেক।

ইয়েস, ইয়েস। আই নো, আই নো। একটু চুপ করে থেকে বললেন, সন্দীপন কেন নাম দিলে পাঠশালার? অ্যাঁ? পরিত্রাণায় সাধুনাং? হাসলেন তিনি একটু। তারপর আবার বললেন, তোমার মাথা থেকে এয়েছে? অ্যাঁ? কৃষ্ণ তৈরীর কারখানা?

সীতারাম বুঝতে পারলে না, এই নামকরণের মধ্যে কোথায় অপরাধ লুকিয়ে আছে! তবে সে ভীত না হয়ে পারলে না। সাহেবের কথাগুলি ধমক নয়, কিন্তু রূঢ় নিষ্ঠুর; হাতুড়ির মত আঘাত করে না, ধারালো ছুরি দিয়ে অবলীলাক্রমে সহজ ছন্দে কেটে চলে। সীতারামের মনে হল, সাহেব ঠিক পেন্সিল কাটার মত যেন কেটে চলেছেন।

সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, কে পাঠশালার নামকরণ করেছে? তুমি?

সীতারাম বললে, আজ্ঞে ধীরানন্দবাবু।

আই সী। চল, তোমার পাঠশালা দেখব।

এসব ক্ষেত্রে কি করতে হয়, সে সব পাঠশালার ছেলেরা জানে। তারা ইতিমধ্যেই আপন আপন জায়গায় মনোযোগের সঙ্গে পড়তে বসে গিয়েছে, এমন কি আকু পর্যন্ত। সাহেব ভিতরে ঢুকতেই তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, নমস্কার করলে। সীতারাম চেয়ারখানি ঝেড়ে দিলে। টেবিলের উপর খাতাপত্রগুলি নামিয়ে দিলে। সাহেব সেগুলি বাঁ হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তিনি ঘরখানির আসবাব—সরঞ্জামগুলি দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ছেলেরা কয়েকজন এগিয়ে এসে নমস্কার করে আবৃত্তি শুরু করে দিলে—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে।
দরশক এসেছেন অন্ত বিদ্যালয়ে।
প্রণাম তোমার পদে ওহে মতিমান,
আশীর্বাদ কর যেন হই জ্ঞানবান।"

সাহেব হেসে বললেন, আচ্ছা হয়েছে। গুড।

সীতারাম ছেলেদের ইঙ্গিত করলে, তারা থেমে গেল।

সাহেব হঠাৎ উঠলেন, চারিদিকের দেওয়ালের কাছে গিয়ে বেশ ভাল করে দেখে এলেন কিছু। তিনি দেখে এলেন দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে লেখা ছেলেদের লেখাগুলি—বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, ভোলা চোর, আকু ডাকাত, বন্দে মাতরম্, গান্ধী মহারাজের জয়, বন্দে মাতরম্।

সাহেব ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা ভারতবর্ষের সম্রাটের নাম জান?

সীতারাম জ্যোতিষ সাহার ভাইপোর দিকে চেয়ে বললে, বল, ভয় কি?

সে জোড়হাত করে বললে, ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ।

সাহেব বললেন, মহামান্ত ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ। গুড। আচ্ছা, তোমরা ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় লোকের নাম জান? টাকার বড়লোক নয়—ভাল লোক, বড় লোক?

জ্যোতিষ সাহার ভাইপো বিহ্বল দৃষ্টিতে মাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কয়েকজন উপরের দিকে মুখ করে ভাবতে আরম্ভ করে দিলে। আকু মৃদু হাসছিল তার অভ্যাসমত। সাহেবের চোখে চোখ পড়তেই সে হেসে মুখ নামিয়ে বললে, মহারাজ গান্ধী।

জ্যোতিষ সাহার ভাইপো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, চিত্তরঞ্জন দাশ।

একজন বললে, মতিলাল নেহেরু।

আকু আবার বলে উঠল, সুভাষচন্দ্র বসু। জওহরলাল নেহরু।

সীতারামের হাত-পা সত্যই হিম হয়ে গেল। সে ঘামছিল।

সাহেব বললেন, হয়েছে। যাও, তোমাদের ছুটি। যাও।

ছেলেরা চলে গেলে সাহেব প্রশ্ন করলেন, তুমি শিখিয়েছ এসব ?

ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটতে কাটতে একসময় পেন্সিলও মারাত্মক রকমের সূক্ষ্ম ধারালো হয়ে উঠে। ভয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে মানুষ অনেক সময় অভয় না পেলেও নির্ভয় হয়ে উঠে। সে এবারে মুখ তুলে বললে, আজ্ঞে না। আমি শেখাই নাই। এসব আজকাল কাউকে শেখাতে হয় না হুজুর, দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওরা নিজেই শিখেছে। ভয়ে পশ্চাৎ অপসরণের শেষ সীমায় এসে আশ্চর্য রকমের ধৈর্য এবং সাহস উপলব্ধি করছিল সে, শান্তভাবে ধীরতার সঙ্গেই সে জবাব দিলে।

সাহেব আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলেন ধীরানন্দ সম্পর্কে। সীতারাম নির্ভয়েই উত্তর দিয়ে গেল। একটু মিথ্যা কথা বললে না। এর পর সাহেব চলে গেলেন।

সীতারাম যেন পাথর হয়ে গেল, সেইখানেই সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মাথার মধ্যে সব যেন তার গোলমাল হয়ে গিয়েছে। কোন স্পষ্ট ভাবনা নাই। মাথার মধ্যে শুধু একটা ক্ষোভ যেন ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে চারটে বেজে গেল।

সীতারাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল। হঠাৎ ঘর-দুয়ার বন্ধ করতে আরম্ভ করলে। হঠাৎ আবার বসল চেয়ারে। বসেই রইল।

জ্যোতিষ সাহা এল।—পণ্ডিত।

আসুন।

হ্যাঁ, এলাম। ব্যাপার যে বেজায় খারাপ হয়ে গেল পণ্ডিত।

সীতারাম বললে, কি করব বলুন ?

জ্যোতিষ একটু চুপ করে থেকে বললে, আমাকেও একদফা শাসিয়ে গেলেন, তুমি ঘর দিয়েছ কেন ? তা আমি বললাম, হুজুর, আমি তো ঘর ভাড়া দিয়েছি। একটু চুপ করে জ্যোতিষ আবার বললে, আমার আবার মহা মুশকিল তো। আমি তো একরকম গবর্মেণ্টের চাকর। মদ-গাঁজার লাইসেন্স রাখি। আমাকে হুকুম হল, ভাড়া তুলে দাও।

সীতারাম বললে, আমাকে একটা মাস সময় দেন। একটা জায়গা কিনে, চালা তুলেও আমি পাঠশালা চালাব। পাঠশালা আমি বন্ধ করব না। এই কয় মুহূর্তের মধ্যে সে আবার জেগে উঠেছে।

* * *

কয়েক দিন পর। এবার চরম ধাক্কা এল।

সীতারামের পাঠশালায় পুলিসী খানাতল্লাশ হয়ে গেল।

কানাই রায়—সীতারামের উপপদ-তৎপুরুষ, সে বললে, পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয় সীতারাম, বুঝলে তো! সাহেবের হাতে পায়ে ধরলেই হত। তা—। ঠোঁটের কোণে একটা বিচিত্র শব্দ করলে কানাই। তারপর আবার বললে, তা মাথা তোমার শক্ত হোক আর না হোক, গোঁ খুব শক্ত বটে।

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল বাবুদের বাড়িতে নিজের ঘরে। তক্তপোশের উপর তার সামনেই রাখা ছিল, তার সন্দীপন পাঠশালার ক্লকঘড়িটা। ঘড়িটার কাচ ভেঙে গিয়েছে। মেঝের উপর এক পাশে পড়ে আছে একখানা ভারতবর্ষের বড় ম্যাপ। ম্যাপখানা ছিঁড়ে গিয়েছে। কাচভাঙা ছবি ক'খানা পড়ে রয়েছে একপাশে। ব্ল্যাক-বোর্ডটার একদিকের ফ্রেমের জোড় ভেঙেছে।

আজই ভোরে পাঠশালায় খানাতল্লাশ হয়ে গিয়েছে। খানাতল্লাশীর পর জ্যোতিষ সাহা বলেছে, পণ্ডিত, তোমার জিনিসপত্র নিয়ে যাও ভাই। আমাকে মাপ কর তুমি। সীতারাম জ্যোতিষকে দোষ দিতে পারে নাই। কথা বলতে গিয়ে সাহার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। এর পর চুপিচুপি তাকে বলেছে, তুমি যদি পাঠশালার উপযুক্ত ঘর ভাড়া পাও পণ্ডিত, তবে দেখো, ভাড়াটা আমি মাসে মাসে দোব।

সীতারাম সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত পাঠশালার দাওয়ায় বসে শুধু কেঁদেছে। বসে ছিল সে ছেলেদের অপেক্ষায়। তার নিজের সমর্থ দেহেও যেন একবিন্দু শক্তি ছিল না। ছেলেরা এলে, ছেলেদের নিয়ে এসব ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে যা হয় ব্যবস্থা করবে, এই সে ভেবেছিল। কিন্তু বারোটা পর্যন্ত ছেলেরা কেউ এল না। তাদের পরিবর্তে তাদের বাপেরা একে একে এল, সকলেই ছেলের সার্টিফিকেট নিয়ে গেল। বড় স্কুলের সংলগ্ন পাঠশালায় তাদের তারা ভর্তি করে দেবে। এখানে পড়ানো আর নিরাপদ নয়। অবশ্য প্রত্যেকেই বললে, দোষ তোমার নাই, সে আমরা জানি পণ্ডিত। ছেলেটাও কাঁদছে। তোমাকে ভালও বাসে, আর বড় স্কুলের মাস্টারেরা আমাদের ছেলেদিগে হেন্টাকেন্টাও করে। কিন্তু করি কি বল? যদি ধরে নিয়ে যায়!

বেলা চারটে পর্যন্ত খাতায় মাত্র পাঁচটি ছেলের নাম রইল। জ্যোতিষ সাহার ভাইপো, আর তিনটি ছেলে—বিনা বেতনের ছাত্র। আর রইল আকু—আকুর বিষয়ে তার বাপমায়ের কোন চিন্তা নাই।

ঠিক এই সময় এল দেবু আর শ্যামু। সঙ্গে কানাই রায়, মজুর এবং বাড়ির গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে মায়ের নির্দেশে। পাঠশালার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। তারাই সব গুছিয়ে নিলে। সীতারাম পুতুলের মত সঙ্গে এল শুধু। মা তাকে অনেক অনুরোধ করে খাওয়ালেন; সে খাওয়াও নামমাত্র। তারপর ভাঙা ঘড়িটা সামনে রেখে সে নির্বোধ স্তম্ভিতের মত বসে আছে। ওই ঘড়িটার সঙ্গে জীবনের চলাটাও যেন হঠাৎ তার বন্ধ হয়ে

গিয়েছে আজ সকাল থেকে।

বৈকালে অভ্যাসমত সে গিয়ে ঝরনার ধারে বসল। ধীরানন্দের জেল হওয়ার খবর যেদিন এসেছিল, সেদিন যেমন সে উদাস দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চেয়ে ছিল, সেই দৃষ্টিতে, বোধ হয় সেদিনের চেয়েও গভীরতর ঔদাসীন্যভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল। সেদিন তবু ক্ষণে ক্ষণে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল ধীরাবাবুর মুখ। আজ দৃষ্টির সামনে কিছুই ভেসে উঠল না। সব হারিয়ে গিয়েছে, সব খাঁ-খাঁ করছে।

সীতারাম!—কেউ পিছন থেকে ডাকলে। পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু আজ ঠিক ধরতে পারলে না সীতারাম। পিছন ফিরে দেখলে, রজনীবাবু আসছেন ওদিক থেকে। সীতারাম একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল।

বসো তুমি, বসো। রজনীবাবু তার পাশেই বসলেন। তারপর বললেন, আমি শুনেছি সব।

সীতারাম চুপ করে রইল।

রজনীবাবু বললেন, ইচ্ছে ছিল সার্চের পরই একবার পাঠশালায় যাই। নিজের চোখে দেখে আসি। কিন্তু এখানকার মাস্টার মশাইরা বারণ করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, শুনেছিলাম তুমি রোজ এই ঝরনার ধারে বেড়াতে আস, তাই এলাম।

সীতারাম নির্বোধের মত শুধু প্রশ্ন করলে, আজ্ঞে?

রজনীবাবু তার পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে এবার বললেন, তুমি বড় মুষড়ে গিয়েছ। এমন মুষড়ে পড়লে তো হবে না।

সীতারাম চোখ মুছে নিয়ে বললে, আজ্ঞে না। একটু হাসতেও চেষ্টা করলে।

রজনীবাবু বললেন, মণিবাবুর সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল—জমিদার মণিলালবাবুর সঙ্গে?

সীতারাম মনে করতে পারলে না কথাটা, সবিস্ময়ে বললে, আজ্ঞে কই, কিছুই তো—। সে স্তব্ধ হয়ে গেল, মনে পড়েছে।

কি বলেছিলে তুমি তাকে?

সীতারাম অকপটেই সমস্ত বললে।

তিনিই এ ব্যাপারের মূলে আছেন। তিনিই জানিয়েছেন এসব পুলিস সাহেবকে।

সীতারাম এবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

রজনীবাবু বললেন, আগে যে দরখাস্তটা হয়েছিল, সেটা আমার রিপোর্টেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কোনও গণ্ডগোল আর হত না।

সীতারাম শক্ত হয়ে উঠল। মণিলালবাবুর দ্বারা এ ব্যাপারটা ঘটেছে, এই সংবাদটাই তাকে দৃঢ়শক্ত করে তুললে। সে একটু হেসে বললে, আমার অদৃষ্ট।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রজনীবাবু বললেন, কি করবে এখন?

সীতারাম প্রশ্ন করলে, পাঠশালা আমাকে আর করতে দেবে না?

ইচ্ছে করলে গভর্মেণ্ট না পারে কি? বন্ধ করতে পারে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে, কিন্তু—। হাসলেন রজনীবাবু, বললেন, সে করবে না, নিজেদেরও একটা লজ্জা আছে। একটা পাঠশালা—। নাঃ, ততদূর করবে না। তবে এডের টাকাটা বন্ধ হবে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, তবে এখন কিছুদিন চুপ করে থাকাই ভাল। বাবুদের ছেলে পড়ছে, ওই সঙ্গে আরও দু-চারটি ছেলে যদি নাও, তবে চলবে কোন রকমে তোমার। তা ছাড়া দুপুরবেলা যদি সব-রেজেষ্ট্রি আপিসে লোকজনের দরখাস্ত-দলিল লিখে দাও, তাতে ভালই হবে তোমার। পাঠশালার চেয়ে ভাল হবে। আমি সব-রেজিস্ট্রার বাবুকে বলেছি। তিনিও ব্যাপারটা শুনে দুঃখিত হয়েছেন। বললেন—বেশ, দেবেন পাঠিয়ে।

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, দেখি।

বাবুদের বাড়ি ফিরতেই কানাই বললে, মা ডাকছেন তোমাকে।

ধীরানন্দের মা এ ব্যাপারটায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। কোন মতেই ভুলতে পারছিলেন না যে, এর জন্য দায়ী ধীরানন্দ। ধীরানন্দ জেলে গিয়েছে, ধীরানন্দকে সীতারাম শ্রদ্ধা করে, ধীরানন্দের ভাইদের পড়ায়, তাদের বাড়িতে থাকে, তাই তার এই দুর্ভাগ্য। বহু কষ্টে বেচারা চাষীসদ্‌গোপের ছেলে, সামান্য লেখাপড়া শিখে ভদ্রভাবে জীবনযাপনের জন্য পাঠশালা খুলেছিল, সেটিই শুধু ভেঙে গেল নয়, বেচারার বোধ হয় ওই পথ ধরে চলাও এযাত্রার মত শেষ হয়ে গেল। একটুকু দায়িত্বই শুধু তাঁদের নয়, আরও দায়িত্ব আছে, সীতারাম তো শুধু ছেলেদের গৃহশিক্ষকই নয়, সে তাঁদের প্রজা। তিনি তাকে ডেকে ধীরানন্দের পড়ার ঘরে বসালেন; বললেন, বসো বাবা। ও-বেলা থেকে তুমি ভাল করে খাও নি। আগে জল খাও দেখি।

সীতারাম আপত্তি করলে না। ক্ষুধাও ছিল, পেট ভরেই সে খেলে। মা বললেন, দেখ বাবা, আমি ভুলতে পারছি না যে, ধীরার জন্যে তোমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হল।

সীতারামের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। সে চোখ মুছে বললে, আজ্ঞে না মা। ব্যাপারটা করেছেন মণিলালবাবু।

মণি ঠাকুরপো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সে সমস্ত কথা বললে।

মা হাসলেন—তিক্ত ধারালো হাসি। এই হাসি সীতারামের কাছে আশ্চর্য মনে হয়। এ হাসি এঁরা ছাড়া কেউ হাসতে পারে না।

মা বললেন, জানো বাবা, বনের সিংহ মরে যায়, তখন অন্য বনের সিংহ এসে এ বনের

আশ্রিতদের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু তারও প্রতিকার একদিন হয়। সিংহের শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তারা এর শোধ নেয়। গম্ভীরমুখে মা বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আমার ছেলেরাও একদিন বড় হবে। আসুক ফিরে ধীরা।

সীতারাম নীরবে বসে রইল। মায়ের এই কথাগুলি তার কাছে অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হল। তাঁর ছেলেরা সিংহ এবং তারা আশ্রিত।

মা বললেন, শোন বাবা, যার জন্যে আমি ডেকেছি তোমাকে। তুমি কি করবে? পাঠশালা তো উঠে গেল!

সীতারাম ব্যস্ত হয়ে বললে, আজ্ঞে না, উঠে যায় নাই, তবে হ্যাঁ, এভ বন্ধ হবে।

ছেলেরাও তো সব সার্টিফিকেট নিয়ে চলে গেল।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে?

সীতারাম এ কথার জবাব খুঁজে পেলে না। মা বললেন, আমাদের জন্যেই তোমার এ উপার্জনের পথ বন্ধ হল। আমি সমস্ত দিনই ভাবছি। তুমি এক কাজ কর বাবা। আমাদের সেরেস্তায় তুমি কাজ কর। তোমাদের গ্রাম, এ পাশে সুরভিপুর, রামচন্দ্রপুর, এই তিনখানা গ্রাম কাছে কাছে রয়েছে। এর আদায় নাও, সদর সেরেস্তার কাগজপত্র দেখ। তাতে তোমার পাঠশালার চেয়ে ভাল হবে। মাইনে আছে, তহুরী আছে, খারিজ ফীয়ের অংশ আছে।

ভাল হবে। ভাল হবে।—উপপদ-তৎপুরুষ কানাই রায় কখন এসে দরজার মুখেই বসেছে উপু হয়ে।

মা বললেন, তা ছাড়া বাবা, আমারও একটা স্বার্থ আছে। তুমি আমাদের সন্তানতুল্য। শুধু তাই নয়, সৎ প্রকৃতি তোমার, সাধু লোক তুমি। আমাদের নায়েববাবুর শরীর ভেঙেছে। ওঁর পর তোমার হাতেই সব ভার দিতে চাই আমি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ধীরা যে পথ ধরল, তাতে ওর ওপর আমার ভরসা নাই।

সীতারাম এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তে কল্পনায় নায়েব-জীবনের রূপ তার সামনে ফুটে উঠল। জমিদার-বাড়ির নায়েব! পিছনে কানাই রায় যাবে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাঁধে লাঠি নিয়ে। তক্তপোশের উপর ছোট গদি পাতা আসনে ক্যাশ-বাক্স সামনে নিয়ে বসবে। তা ছাড়া—সিংহের আশ্রিত হয়ে থাকতে পারবে না সে।

কানাই রায় বললে, লেগে যাও, লেগে যাও। শিখতে কদিন লাগবে? আমি সব শিখিয়ে দোব।

সীতারাম চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ভেবে দেখি মা। সম্মতি দিতে গিয়েও

যেন তার গলায় আটকে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল।

মনোরমা উৎকণ্ঠিত হয়ে তার জন্ম অপেক্ষা করছিল। থানাতল্লাশীর খবরটা সকালে পেয়েছিল সে। আশপাশের চার-ছয়খানা গ্রামেই ছড়িয়ে পড়েছিল। মনোরমা কৃষাণটাকেও পাঠিয়েছিল, সে রত্নহাটায় এসে দুবার খোঁজ নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সীতারামের সঙ্গে কথা বলে নাই। মনোরমার বারণ ছিল। উৎকণ্ঠিত হলে সীতারাম রাগ করে।

সীতারাম আসতেই কিন্তু সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। কাঁদতে লাগল। সীতারাম সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, কাঁদছ কেন?

মনোরমা বললে, যদি ধরে নিয়ে যায়?

ধরে নিয়ে যাবে না।

যাবে না?

না। একটু হেসে আবার সীতারাম বললে, আর যদি যায়ই, তাতেই বা কি? এ তো চোর ডাকাতের জেল নয়।

মনোরমা প্রতিবাদ করে বললে, না।

না?—হাসলে সীতারাম।

তোমাকে আর ওসব করতে হবে না বাপু।

কি?

পাঠশালা-মাঠশালা। হ্যাঁ। আর যদি করতে হয় তো আপন গেরামে কর। ও-বাড়ির পণ্ডিত-ভাসুর বলছিল, আমি তো এইবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই বাস করব, তা অমুক এই-খানেই পাঠশালা করুক না কেনে?

সীতারাম চুপ করে রইল।

আবদার করে মনোরমা বললে, কেমন গেরামের ছেলেরা আমাকে 'গুরুমা' বলবে উ-বাড়ির দিদির মতন, হ্যাঁ।

সীতারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। জমিদার-বাড়ির নায়েবি, গ্রামের পাঠশালা, কিছুতেই তার মন খুশী হতে পারছে না। তার বহু যত্নে গড়া—অনেক সাধের রত্নহাটায় সন্দীপন পাঠশালা। ওই পাঠশালাটি ছাড়া আর কিছুতেই তার মন উঠবে না। বোধ হয় রাজ্যপদ পেলেও না। পাঠাশালাটি জমে উঠেছিল বর্ষার ধানক্ষেতের মত। ঘোলাটে জলভরা ক্ষেতে ধানচারা রুয়ে দেয়, প্রথম প্রথম চারাগুলি দেখা যায় না—ঘোলাটে জলভরা ক্ষেতকে জলভরা পতিত জমির মত মনে হয়; দেখতে দেখতে ধানের চারাগুলি ঝাড় বেঁধে সবুজ হয়ে ক্ষেতকে ভরে দেয়। দূর থেকে তখন মানুষের চোখে ঠেকে তার সবুজ লালিত্য। চোখ জুড়িয়ে যায়। তার পাঠশালাটিও তেমনই ভাবে জমে উঠেছিল। সাহাপাড়া, স্বর্ণকারপাড়া,

কৈবর্তপাড়ায় সাড়া জেগেছিল। ঘরের মেঝে বারান্দা ভরে উঠেছিল ছেলেতে। কলরব করে তারা পড়ত, সুর করে নামতা বলত—দুই-এক্কে—দুই, দুই-দুকুনে—চার, তিন-দুকুনে—ছয়। সে যেন একটা গান। পাড়ার লোকে বলত, পাঠশালায় পড়ছে। যাত্রীরা পথে যেতে থমকে দাঁড়াত। যারা পড়তে জানে, তারা ওই সাইন-বোর্ডটা পড়ত—রত্নহাটা সন্দীপন পাঠশালা; শিক্ষক—সীতারাম পাল।

নয়

পরের দিনও লাঠি ছাতা এবং লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে ঠিক ভোরবেলায় উঠে রত্নহাটায় এল। ভারাক্রান্ত হৃদয়েই এসে শ্যামু এবং দেবুকে পড়াতে বসল।

কিছুদিন হল শ্যামু বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। দেবু এখনও বাড়িতে পড়ে। দশটার সময় তাদের ছুটি দিয়ে সীতারাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। স্নানের তাড়া নাই। পাঠশালা বন্ধ। চোখে তার জল এল, চোখের জল গোপন করার জন্যই সে তক্তপোশের উপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার উঠে বসল। কিছুতেই সে শান্তি পাচ্ছে না। হঠাৎ কি মনে হল—ভাঙা ঘড়িটা দেওয়ালে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে সেটাকে চালাবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলে সে। একবার ডাইনে ঠেলে, তারপর ঈষৎ বাঁয়ে ঠেলে, দেওয়াল এবং ঘড়িটার পিঠের মধ্যে খানিকটা কাগজ দিয়ে, পেণ্ডুলাম দুলিয়ে শব্দ শুনলে। হ্যাঁ, এইবার শব্দটা যেন অনেকটা এসেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে ঘড়িটার দিকে। চলছে ঘড়িটা। তারপর বসল সে ছেঁড়া ম্যাপটা নিয়ে। খানিকটা ময়দার আঠা চাই, খানিকটা পাতলা ন্যাকড়ার ফালি। তা হলে এটাও দাঁড়াবে।

পণ্ডিত!

কে?

শিশুশ্রেণীর একটি ছাত্রকে কোলে করে এসেছে তার বিধবা মা। একবার হাতটি দেখ দেখি পণ্ডিত। কাল রাত থেকে জ্বর। তা তুমি না দেখলে তো আমাদের হয় না বাবা! দেখ একবার।

এই কয়েক বৎসরে সীতারাম এই একটি বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। সে নাড়ী দেখতে শিখেছে। সর্দি-পিত্ত-বায়ু ইত্যাদির আধিক্যদোষও নির্ণয় করতে পারে।

কই, দেখি? দক্ষিণ হস্ত। ডান হাত কোন্‌টি হে? অ্যাঁ? যে হাতে ভাত খাও! বাঃ। বাঁ হাত ছেলেটির কনুইয়ের ভাঁজের তলায় দিয়ে ডান হাতে সে নাড়ী টিপে ধরলে।

জ্বর যে অনেকটা—এক শো এক আন্দাজ হবে। নেবে দুদিন বাপু। পিত্তদোষ রয়েছে।

ছেলেটি বললে, পাঠশালা বসবে না স্যার ?

ম্লান হাসি হেসে পণ্ডিত বললে, বসবে বৈকি। ভাল হয়ে ওঠ, উঠে চলে আসবে।

আমাকে টিপিনের ঘণ্টা বাজাতে দিয়েন স্যার।

দোব। তুমিই বাজাবে ঘণ্টা। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে মাস্টার বললে, ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

সে আবার বসল ম্যাপটা নিয়ে। একটু ময়দার আঠা চাই, পাতলা ন্যাকড়া খানিকটা। বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য সে উঠল।

কে ? কে যেন উঁকি মারছে বাইরে থেকে।

আমি স্যার্। আকু এসে দাঁড়াল সামনে।

আকু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আকু দরজার বাজুটি ধরে তার উপরেই মুখটি রেখে বললে, পাঠশালা কোথা বসবে স্যার্ ?

পাঠশালা ?

হ্যাঁ।

সীতারাম চুপ করে রইল। কি উত্তর দেবে সে ? পাঠশালা বসবে না—এ কথা কিছুতেই তার মুখ থেকে বেরুতে চাচ্ছে না।

আকু বললে, আমি স্যার্, আপনার পাঠশালা ছাড়া আর কোথাও পড়ব না—কোথাও না।

বসো, এইখানেই বসো।

আকু বসল। একবার বইটা খুললে, তারপর উঠে এসে পণ্ডিতের পাশে বসল। ময়দার আঠা নিয়ে আসব স্যার্ ? আঠা দিয়ে জুড়ে দেন কেন। আনব আঠা ?

আনতে পারবে ?

হ্যাঁ। ঠিক নিয়ে আসব আমি।

বাবুদের বাড়িতে ধীরাবাবুদের মাকে বলবি, পণ্ডিত একটু ময়দার আঠা আর একটু ন্যাকড়া চাইলেন।

চলে গেল আকু। ছুটল সে। ব্ল্যাকবোর্ডের ভাঙা জোড়াটায় একটা পেরেক মারতে হবে। তা হলেই চলবে। দড়ি বাঁধলেও চলতে পারে। একটা পেরেক খুঁজে ফিরতে লাগল সীতারাম।

কে ? এ কি, আপনি ?

আকুর মা এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আকুর মা মানুষটি বড় ভাল এবং বিচিত্র। ছেলেকে আদর দিয়ে নষ্ট করার অশেষ

যোগ্যতার সঙ্গে আর একটি দুর্লভ যোগ্যতা তাঁর আছে। পৃথিবীর লোককে সুদুর্লভ আদর করতে জানেন; স্বভাবটা তাঁর ঠিক একটি মধুর হাঁড়ি এবং সে হাঁড়িটি গল্পের মধুদাদার দেওয়া অক্ষয় ভাণ্ডের মত অফুরন্ত। সেই অফুরন্ত মিষ্টরস যার জিহ্বায় ঢালতে শুরু করেন, তাকে শেষ পর্যন্ত তোতলা করে ছেড়ে দেন। আকুর মায়ের হাতে একটি বাটিতে খানিকটা ময়দার আঠা আর খানিকটা ন্যাকড়া। আকুর মা হেসে বললেন, সে কই ?

আকু দেবুদের বাড়ির মধ্যে গিয়েছে, একটু আঠা আর—

আকুর মা আঠার বাটিটা নামিয়ে দিলেন, বললেন, আঠা এই নাও। সে তোমার বুঝি বাবুদের বাড়ি গিয়েছে ? সে গিয়েছিল আমার কাছে। বলে, ময়দার আঠা চাই। আঠা করতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি, আকু নিজের পোশাকী কাপড় দাঁত দিয়ে কাটছে। ও কি রে ? না, মাস্টারের পাতলা ন্যাকড়া চাই। থাম্, থাম্। আমি দিই, আমি দিই। সে মানে না, বলে, এখুনি দাও। তখুনি বাক্স খুলে ছেঁড়া কাপড় বার করে কাপড় ছিঁড়ে দিই, তবে ক্ষান্ত। ওদিকে ময়দার আঠা পুড়ে গেল, আবার বসালাম আঠা। তা বললে, তবে তুমি দিয়ে এস। আমি খাই।

পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে রইল, এ কথার কোন জবাব দিতে পারলে না। আকু! চণ্ডালের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন নাকি শিব! এ কি তাই ? চোখ ফেটে তার জল এল।

আকুর মা বললে, আকুর এই কাপড়খানি কিন্তু তোমাকে রিপু করে দিতে হবে পণ্ডিত। বেশি নয়। এই দাঁত দিয়ে একটু সবে কেটেছিল। তোমার হাতের রিপু বড় ভাল।

এই একটি বিদ্যা সীতারামের আছে। ছেলেবেলা থেকেই সে মাতৃহীন, বাপ চাষবাসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তখন থেকেই তার এ বিদ্যায় হাতেখড়ি হয়েছিল। জামার বোতাম সেলাই থেকে শুরু, ক্রমে ছোটখাটো ছেঁড়া সেলাই করত নিজে হাতে। এখন যেন এটাতে একটা শখ পড়ে গিয়েছে। মনোরমার হাতের সেলাই মোটা, তাদের সমাজে আপনার জনের মধ্যে জীবনের ধারা-ধরনটাই মোটা, সূক্ষ্ম জিনিসের প্রশংসা তারা করলেও ব্যবহার করবার মত ব্যগ্রতা নাই। কিন্তু সীতারামের সেটা পছন্দ হয় না। সেলাইয়ের কাজগুলি সে নিজেই করত। ক্রমে সেটা তার শখে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-জীবনে এটা তাকে কিছু সাহায্যও করে; পাঠশালায় পড়ানোর অবসরে বসে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সে দামী কাপড় রিপু করে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে, তাতে সে আনন্দও পায়, আবার বিনিময়ে লোকের স্নেহও সে অর্জন করে।

পণ্ডিত বললে, দেবেন। করে দোব।

এই নাও, দিয়ে গেলাম। হলে আকুর হাতে তুমি দিও।

আচ্ছা।

এই যে! আকুর মা বললেন, এই যে, কোথা ছিলি ? অ্যাঁ ?

এদের ডাকতে গিয়েছিলাম। আকু এসে সামনে দাঁড়াল, দুপুর রৌদ্রে ঘুরে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আকুর পিছনে এসে দাঁড়াল তিনটি ছেলে—জ্যোতিষের ভাইপো, কৈবর্তদের গোপাল এবং হরিলাল। অভ্যাসমত একমুখ হেসে সে বললে, ডেকে নিয়ে এলাম সব।

তারপর ছেলেদের বললে, বসো, সব বসো। আজকে এইগুলো মেরামত করতে হবে।

সীতারামের মুখে কোনও কথা যোগাল না। ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেল মেরামতের কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিজেও তাদের সঙ্গে কাজে লাগল। ওদের প্রাণরসেই সে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

কানাই রায় এসে বললে, চান কর, খাও। বাড়িতে ঠাকুর ব্যস্ত হয়েছে। ভাত নিয়ে বসে থাকবে কত? তারপর সে ঘরের মধ্যে ঢুকে ম্যাপ মেরামত করা দেখে মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের পিচ কেটে বললে, আবার এই নিয়ে বসেছ? তোমার আর আক্কেল হবে না।

সীতারাম উত্তর দিলে না।

রায় এবার অত্যন্ত বিজ্ঞের মত ভঙ্গি করে কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বললে, মা যা বললেন তাই কর সীতারাম। ভাল হবে। তাকে জমিদারির কাজে ঢুকিয়ে কানাই রায়ের কি সুবিধা হবে, সে সে-ই জানে। হয়তো তাকে ভালবাসে। কিংবা ভাবে সীতারাম নায়েব হলে তার অধিকার বাড়বে; সে-ই তো তাকে এনেছে এ বাড়িতে, কিংবা হয়তো আর কিছু। সীতারাম ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

উত্তর না পেয়ে কানাই রায় ক্ষুব্ধ হল, বললে, আবার একদিন এসে দেবে ছিঁড়ে।

উত্তর দিল আকু। বললে, আবার আঠা দিয়ে, ন্যাকড়া দিয়ে জুড়ব, নাকি স্যার্? আবার ছিঁড়ে দেয়, আবার জুড়ব, নাকি ভাই? এবার সে বললে নিজের সঙ্গীদের।

তারা সকলেই বললে, হ্যাঁ।

কানাই রায় বলল, তাই কর। ছেঁড়া কাঁথার মত সেলাই-ই কর, সেলাই-ই কর, সেলাই-ই কর।

* * * *

কানাই রায় সত্যিই দুঃখিত হয়েছিল। সীতারামকে সে ভালবাসে এবং তার উপর একটা অধিকারের দাবি সে মনে মনে পোষণ করে। সে দাবি কিন্তু তার গোপন দাবিতে পরিণত হয়েছে। তাকে প্রকাশ করতে সে সাহস করে না। প্রথম দিন যখন সীতারাম বাড়িতে এল এবং মা-ঠাকরুন যখন তাকে বসবার জন্যে আসন দিতে বললেন, মুখে বললেন, তুমি হলে এ বাড়ির ছেলেদের শিক্ষাগুরু, সেই দিন সেই মুহূর্তেই বোধ করি তার দাবিকে সে সসঙ্কোচে গোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর থেকে এই কয়েক বৎসর সে দেখছে, সীতারাম আর তার মধ্যের পার্থক্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। সীতারামের কথাবার্তা

রসিকতা সব আলাদা। অথচ সীতারামের সঙ্গে বিবাদ-কলহেরও অবকাশ নাই। সীতারাম তাকে অবহেলা করে না। সীতারামের কাজকর্মের প্রসঙ্গের মধ্যে কোন তর্ক তোলবার তার অবকাশ নাই। মনে মনে সে দুঃখ পেত। তাই আজ মা যখন তাকে জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করবার জন্য বললেন, তখন সে এই কারণেই খুশী হয়েছিল, সীতারাম তার নাগালের মধ্যে আসবে। হোক না কেন নায়েব, কানাই রায়ের পরামর্শ তাকে নিতে হবে। তাই সে এখানেই ক্ষান্ত হল না, বিকেলবেলায় সীতারামের বাড়িতে গিয়ে কৃষাণ-বউ মারফৎ মনোরমাকে সে তার সৎপরামর্শগুলি জানিয়েও এল। সীতারামের পণ্ডিতদাদাকে বললে। জনকয়েক প্রবীণকেও জানালে।

"সীতারামকে বল তোমরা। তোমাদের আপনার জন। ছোকরার ভাল হবে। তা ছাড়া, তোমাদের নিজের লোক যদি নায়েব হয়, তবে, ধর গিয়ে, তোমাদেরও সুবিধে।"

কথাটা সকলেরই মনে লাগে। কানাই রায়ের মত গোপন এবং অজানিত ক্ষোভ খানিকটা সকলেরই ছিল। হঠাৎ বাড়ির একটা ছেলে যদি গেরুয়া পরে ব্রহ্মচারী সেজে বসে, তবে যেমন অস্বস্তি অনুভব করে মানুষ, তেমনই অস্বস্তি অনুভব করত সকলে।

রাত্রে বাড়ি ফিরতেই কৃষাণ-বউ আরম্ভ করলে, বলি হ্যাগো মুনিব মাশায়!

ভাঙাচোরা জিনিসগুলি জোড়া দিয়ে সীতারামের মন খুব প্রসন্ন ছিল আজ। কানাই রায় বলেছিল, ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করার মত জোড়া দিচ্ছে সীতারাম। হ্যাঁ, জোড়া সে দিয়েছে, জোড়ের দাগ রয়েছে এবং থাকবেও, কিন্তু নির্জীব প্রাণহীন কাঁথা জোড়া সে দেয় নাই। মানুষের দেহে চোট লাগে, মাংস কাটে, হাড় ভাঙে, তাকে জোড়া দিলেও দাগ থাকে, কিন্তু দাগ থাকলেও সে আবার কার্যক্ষম অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত হয়, সে কাজ করে, সে পুষ্ট হয়, সে বাড়ে। এ জোড়া দেওয়া তার সেই জোড়া দেওয়া। আবার তার পাঠশালা বসবে, পাঠশালা বড় হবে, পাঁচটি থেকে দশটি, দশটি থেকে পনরোটি কুড়িটি পঁচিশটি ছেলে হবে। সে পড়াবে—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।"

কৃষাণ-বউ আবার বললে, বলি ও মুনিব মাশায়। শুনতে-টুনতে পেছ-টেছ না, নাকি গো? কানে-মানে খাটো-মাটো হলছ নাকি?

সীতারাম হেসে বললে, ব্যক্ত কর, কি বক্তব্য?

ওই দেখ। কটমট কথা-টথা আমি বুঝতে-টুঝতে লারি বাপু।

বলছি, কি বলছেন বলুন?

বলছি, বাবুরা তোমাকে লায়েব-টায়েব করতে চাইছে, তা তুমি লেবে না টেবে না বলছ কেনে?

—সে তুমি বুঝবে না। মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে না।

মনোরমা হেসে সবিনয়ে বললে, তুমি পণ্ডিত মানুষ, বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে না কেনে? বুঝিয়ে বল।

সীতারাম তার মুখের দিকে চাইলে সবিস্ময়ে। মনোরমা তো এমন নয়। সামান্য পাঠশালার পণ্ডিত সে, কিন্তু মনোরমা তো তাকে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পণ্ডিত বলে মনে করে। তার অহঙ্কারে মাটিতে মনোরমার পা পড়ে না। সীতারাম যা বলে, তাই তো তার ধ্রুব সত্য। তবে? মনোরমার কথার মধ্যে যেন আজ নতুন সুর বাজছে।

মনোরমা বললে, পাঠশালার পণ্ডিতের চেয়ে নায়েববাবু হবে, চাপরাসী লগ্‌দী পেজা সবাই পেনাম করবে, খাতির করবে; গাঁয়ে তোমার কত খাতির হবে। ধরে আন্‌ অমুককে, জোড়হাত করে সে এসে দাঁড়াবে। নবান-লক্ষ্মীতে লোকে ঘটি ঘটি দুধ দেবে; মেয়ের বিয়ের সময় চাঁদা চাও, লোকে চাঁদা দেবে।

কৃষাণ-বউ বললে, জমি-টমির জল-টল নিয়ে নিচ্ছিন্দি। কেউ আর আল-টালের ধার-টার দিয়েও যাবে না। ঘরে শুয়ে মজা করে নাকে ত্যাল দিয়ে ঘুমাও, হ্যাঁ।

মনোরমা বলেই যায়, ষষ্ঠীপুজোয় পুরুত আগে পুজো করে দেবে। লক্ষ্মীপুজোয় নবানে ঠাকুরদের ভোগ আমাদেরই আগে হবে। পুরুত বুড়ো বলবে, নায়েব-গিন্নীর পুজো আগে সেরে দি, দাঁড়াও বাপু।

সীতারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসলে, বললে, না।

ভোরবেলাতেই দেখা হল পণ্ডিতদাদার সঙ্গে। শান্ত মানুষটি বললে, কাল রাত্রে আর গেলাম না। কানাই রায় এসেছিল। বলছিল—

সীতারাম বললে, না দাদা, সে আমি পারব না।

পণ্ডিতদাদা নিজে পাঠশালার পণ্ডিত, আদায়ের সময় জমিদার-সেরেস্তাতেও গিয়ে বসে। প্রথম প্রথম সে যখন বসত, তখন তারও মন বিরূপ হয়ে উঠত; কিন্তু তবু তাকে যেতে হত। বারোয়ারি কালীতলায় পাঠশালা বসে, জমিদারই তার সেবাইত হিসাবে মালিক, সেই বাধ্যবাধকতায় গোমস্তা তাকে ডাকত আদায়ের হিসাব-নিকাশে সাহায্যের জন্য। আর গ্রামের লোকেও এটা পছন্দ করত, তারা বিশ্বাস করত তাদেরই গ্রামের ছেলের কথা হিসাবে ভুলের প্যাঁচ থাকবে না। পণ্ডিতদাদা সীতারামের বিতৃষ্ণা বুঝতে পারলে, সে একটু নীরব হয়ে রইল, তারপর বললে, হুঁ। তা পণ্ডিতি করে আর ওসব ভাল লাগে না। তা ছাড়া বড় পাজী কাজ, দশজনের সঙ্গে হাঙ্গামা, সে হবেই। তা বেশ। তা—

আবার একবার থামল পণ্ডিতদাদা, তারপর বললে, কিন্তু পুলিস যখন হাঙ্গামা একবার করলে, তখন—আবার কি পাঠশালা করা ঠিক হবে?

সীতারাম বললে, দেখি।

তা আমি তো চলে যাব। শ্বশুর বলেছেন—বুড়ো হয়েছি, এইবার দেখেশুনে নাও, তা তুই গাঁয়েই আমার পাঠশালা নিয়ে বসে যা।

পণ্ডিতদাদা শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পাচ্ছেন। সেখানে যাবেন।

সীতারাম বললে, তোমার মেজভাইকে বসিয়ে দাও পাঠশালায়। আমি দেখব, ওখানেই —ওই রত্নহাটায়ই দেখব দাদা। বারণ করো না তুমি। তার জেদ চেপেছে; সে দেখবেই।

দাদা বললে, এটা তোর খ্যাপামি। সেও পাঠশালা, এও পাঠশালা। তাতে এখানে যদি নিরাপদে থাকিস, ঘর বার দুই চলে, তবে ওই পাঠশালার ওপর এত ঝোঁক কেনে?

এ কথার উত্তর দিলে না সীতারাম।

দশ

দাদার কথার উত্তর দিলে না সীতারাম। রত্নহাটার সন্দীপন পাঠশালার উপর তার আশ্চর্য মমতা। পৈতৃক ভিটের উপর মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ থাকে, তেমনই প্রবল তার এ আকর্ষণ। অনেক সময় ভেবেছে, গ্রামেই যদি 'সন্দীপন পাঠশালা' নাম দিয়ে পাঠশালা করে, তবে গোল বোধ হয় মিটে যায়। কিন্তু না। মনের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করছে। কিছুতেই মনঃপূত হয় নাই। সন্দীপন পাঠশালা যদি রত্নহাটায়ই না থাকে, তবে আর সন্দীপন পাঠশালা কিসের? এ গ্রামের সন্দীপন পাঠশালায় ধীরাবাবু—মণিবাবু এদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না।

জীবনে তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, নর্মাল পাস করে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে সে বিদেশে যাবে। সেখানে বাসা করবে, মনোরমাকে নিয়ে যাবে। শিক্ষিত সমাজে স্থান পাবে, কত মহৎ লোকের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হবে, তাদের সাহচর্যে কত নতুন শিক্ষালাভ করবে। ছুটিতে গ্রামে ফিরে আসবে সপরিবারে। গ্রামের লোকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, হাসিমুখে কুশল প্রশ্ন করবে। গুরুজনদের সে প্রণাম করবে, বন্ধুজনকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরবে, কনিষ্ঠদের সস্নেহে আশীর্বাদ দেবে। গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুদের প্রীতিসম্ভাষণ, কনিষ্ঠদের প্রণাম—সমস্ত কিছুর মধ্যে আরও কিছু থাকবে; মানুষের জীবনে সেইটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কাম্য। থাকবে শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়। গুরুজনে বলবে, হ্যাঁ, তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। ছেলেদের বলবে, দেখ, সীতারামকে দেখে শেখো। বন্ধুজনের প্রীতিসম্ভাষণের মধ্যেও স্বীকৃতি থাকবে, ভাই তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠদের প্রণামের মধ্যে অকথিত কামনা থাকবে, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার মত হতে পারি।

সে আশা তার আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়েছে। ভাগ্যও বটে, আবার নিজের অক্ষমতাও

সে স্বীকার করে। তাই তো সে জীবনে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতার উপযুক্ত পাঠশালার পণ্ডিতের পদ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে রত্নহাটায় পাঠশালা করেছে, তার কারণ এই গ্রামের চেয়ে রত্নহাটায় সমাজের মর্যাদা অনেক বেশি। শিক্ষিতের সমাজ, মর্যাদাবান বিত্তশালীর সমাজ রত্নহাটা। তা ছাড়া, এতে তার বিদেশে চাকরি করার সাধ আংশিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। ভোরে উঠে যায়, রাত্রি দশটায় ফেরে, সপ্তাহে সোমবার থেকে শনিবার—এই ছটা দিন গ্রামবাসীর কাছে সে বিদেশবাসীরই সমান। তাদের সঙ্গে দেখা হয় রবিবারে। রবিবার দুপুরবেলা, গ্রাম্য মজলিশে গিয়ে বসে, রত্নহাটার গল্প করে। তাদের জমিদারবাড়ির গল্প, রীতি-নীতির কথা, তাঁদের অভিজাতসুলভ মর্যাদাজ্ঞানের কথা বলে, মণিবাবুর গল্প করে, বড় ইস্কুলের সংবাদ বলে, সেখানকার সমাজে দেশদেশান্তরের যে সব সংবাদ আসে, সে সবও বলে। তারা খানিকটা বিস্মিত হয় বৈকি। মুগ্ধ হয়ে শোনে। আবার বাজারদরের কথাও বলে, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ধান-চালের নির্ভুল দর তাদের জানায়। তাদের কাজে লাগে। আবার জানায়, রত্নহাটায় এবার মোটরকার আসছে, বড় ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রত্নহাটার বড়-বাবুরা এবার কলকাতায় মোটর গাড়ি কিনে ফেলেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই আসছে। আরও বলে, শিবকিঙ্করদের মত বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে তার বিরোধের কথা! বলে, আমি ওসব বাবুদের কেয়ার করি না। এই সবের মধ্যে তার বিদেশে চাকুরির আকাঙ্ক্ষা খানিকটা মেটে।

এছাড়া এতদিন রত্নহাটায় পাঠশালা করে আরও একটা আকর্ষণ তার হয়েছে। আজ কয়েক বৎসরই পাঠশালা করছে সে। রত্নহাটার ছেলেদের সে ভালবেসেছে। যে সব গৃহস্থের ছেলে পড়ে, তাদের সঙ্গেও তার একটা ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ হয়েছে। প্রথম সে স্বর্ণকার এবং কৈবর্তদের ছেলে নিয়েই পাঠশালা করেছিল অনেকটা জেদের বশে। বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার তাকে ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, ওদের নিয়েই পাঠশালা করগে, পুণ্য হবে—অজ্ঞানদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার পুণ্য হবে। সেই কথাটায় সে অনেকটা জেদের বশে তাদের নিয়েই পাঠশালা করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আশাও করেছিল, এদের ছেলেদের, যাদের ওই বড় ইস্কুলের পণ্ডিতেরা অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে, তাদেরই কৃতী করে তুলে সে নিজের শিক্ষকতার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রাণপাত করে পড়াবে সে। বৎসর বৎসর এদের ছেলেদেরই বৃত্তি পাওয়াবে সে। আপনার মনেই সে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে নিত। নর্মাল ইস্কুলে পড়বার সময় সে শিক্ষকদের কাছে শুনেছিল পণ্ডিত বোপদেবের সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প। বোপদেবের শিক্ষক তাঁর স্থূলবুদ্ধির জন্য হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তার কিছু হবে না। বোপদেব মনের দুঃখে দেশত্যাগ করে চলেছিলেন। পথে তিনি এক সরোবরের বাঁধানো ঘাটে বসেছিলেন বিশ্রামের জন্য। সেখানে দেখলেন পাথর কেটে ছোট ছোট বাটির আকারে গর্ত করা রয়েছে। বোপদেব আশীর্বাদ করলেন সরোবরের

মালিককে। দীর্ঘজীবী হোন তিনি। সুবিবেচক মালিক, নিঃস্ব পথিকদের খাবার জন্ত চমৎকার জায়গা করে রেখেছেন। যাদের সঙ্গে থালা বাটি গেলাস নেই, তারা অনায়াসে পরমানন্দে এই পাথর-কাটা আধারে ভিজিয়ে খিতিয়ে খেতে পারবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাঁর ভ্রম ভাঙল। দেখলেন, নগরের মেয়েরা এসে কলসীতে জল ভরে সেই গর্তগুলির উপর বসিয়ে রেখে স্নান করতে লাগল। তখন তিনি বুঝলেন, এই গর্তগুলি মালিক তৈরি করান নাই, দিনের পর দিন একই স্থানে কলসী রাখার ফলে ওই কলসীর ঘর্ষণে সৃষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত তাঁর মনে হল, পাথর যদি ক্ষয় হয় এইভাবে নিয়মিত ঘর্ষণে, তবে তাঁর বুদ্ধি, সে হোক না কেন যত স্থূল, তাই বা অধ্যবসায়ের ফলে নিয়মিত পাঠাভ্যাসে কেন তীক্ষ্ণ হবে না? সেইখান থেকে তিনি ফিরলেন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। তার ফলেই বোপদেব ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মুগ্ধবোধপ্রণেতা বোপদেব হলেন।

এই গল্প মনে করে সে ওদের কৃতী ছাত্র তৈরী করবার জন্য পরিশ্রম করতে আরম্ভ করেছিল। ছাত্রেরা কেউ কৃতী হতে পারে নাই, তার আশা সফল হয় নাই। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সে ওই ছেলেগুলির সঙ্গে, তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিচিত্রভাবে ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে। তারা তাকে ভালবাসে, কতখানি ভালবাসে, সে তার হিসেব করে না, কিন্তু তার ভালবাসার পরিমাণ সে জানে। তারা তাকে দলিল লিখতে, দরখাস্ত লিখতে ডাকে, বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলে নাড়ী দেখতে ডাকে, রেশম-পশমের কাপড় রিপু করতে দেয়, তার স্বার্থও আছে, ভালাবাসাও আছে। তার প্রকাশ হয় তাদের সাদর সম্ভাষণের মধ্যে, নবান্নে লক্ষ্মীপূজায় তারা মিষ্টান্ন দেয় তার মধ্যে। কৈবর্তরা মিষ্টান্ন দেয় না, মধ্যে মধ্যে কাঁচা মাছ-তরকারি দিয়ে ভালবাসার প্রকাশ জানিয়ে যায়। সীতারামের এই ভালবাসা এক বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছে। তার সাধ, তার আকাঙ্ক্ষা—ওদের ছেলেদের এক-জনকেও অন্তত সে লেখাপড়ার সত্যকার আস্বাদ দিয়ে শিক্ষিত মানুষ করে তুলবে।

সাহা-স্বর্ণকারদের ছেলেরা পড়ে, খানিকটা লেখাপড়া শিখতে হয়, না শেখাটা লজ্জার কথা বলে শেখে। পাঠশালার পড়া শেষ করে বড় ইস্কুলে কয়েক ক্লাস কোন রকমে পার হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে নিজের নিজের ব্যবসায়ে লেগে যায়। কৈবর্তের ছেলেদের পড়া পাঠ-শালাতেই শেষ। নেহাৎ শখের ব্যাপার। পাঠশালার পড়াটাও শেষ করে না। বারো তেরো বছর বয়স হলেই হাল গরু চাষ নিয়ে পড়ে, যারা জেলেকৈবর্ত তারা জাল ঘাড়ে মাছ-ধরা ব্যবসায়ে লেগে যায়।

এই তো সেদিন, দুকড়ি জেলের ছেলেটা পাঠশালা ছেড়ে দিলে। ছেলেটা মন্দ ছিল না। আর এক বৎসর হলেই পাঠশালার পড়াটা শেষ হত। হঠাৎ জাল ঘাড়ে করে এসে প্রণাম করে একটি মাছ দিয়ে দাঁড়াল নির্লজ্জ হাসিমুখে।

সীতারাম বললে, কি রে?

ছেলেটার বাপ দুকড়িও এসেছিল, সে বললে, পণ্ডিত মশায়, আজ থেকে ছেলেকে জাতব্যবসা ধরালাম গো।

আর পড়বে না?

না। মাথা চুলকে দুকড়ি বললে, আমাদের ছেলে আর পড়ে কি করবে গো? ক'য়ের পেছুতে খ দিতে শিখেছে এই ঢের। জলকরের দলিলে সই দিতে পারবে, দেখে লিতে পারবে দলিল, এই ঢের। বাস্।

কৈবর্তদের লেখাপড়া শেখার সামান্য চেষ্টার পেছনে শখের সঙ্গে ওই একটা তাগিদ আছে। ভদ্রলোকদের কাছে ওরা পুকুর জমা নিয়ে থাকে; জমিদারদের কাছে নেয় নদীর জলকর জমা। আগে কারবারটা চলত নিছক বিশ্বাসে। মৌখিক কথাবার্তা হত, ওরা দিয়ে আসত খাজনার টাকা, এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুনতে পারত—এককুড়ি, দুকুড়ি থাক্ সাজিয়ে টাকা দিয়ে জলকর-মালিকের পায়ের ধুলা নিয়ে চলে আসত। কাল এখন পালটেছে। এখন আর মুখের কথায় বন্দোবস্ত হয় না, দলিল—'ডেমি' কাগজে দুখানা দলিল হয়, টাকা দিয়ে রসিদ নিতে হয়। তাও প্রথম ওরা টিপছাপ দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে আসত সরল বিশ্বাসে, কিন্তু কাল যত এগুচ্ছে তত গোলমাল বাড়ছে, আজকাল দলিল রসিদে গোলমাল বেরিয়ে পড়ছে; কয়েক ক্ষেত্রে ওদের টাকা জলে পড়েছে। তাই নাম সই আর দলিল পড়তে পারবার মত লেখাপড়াটুকু মাত্র শিখতে চায়, তার বেশি নয়। তাতে সীতারামের পাঠশালার খুব বেশি ক্ষতি হয় না। আর এক বছর পড়লে, সে এক বছরের মাইনেটা পেত, সেইটা পায় না এইটুকু মাত্র ক্ষতি। কিন্তু সীতারাম সে লাভ-ক্ষতি খতায় না। সে ওদের ভালবেসেছে, তাই সে চায়, ওদের একজনও সত্যকারের লেখাপড়া শিখুক, ক'য়ের পিছুতে খ দিতে শেখাটাই ঢের লেখাপড়া নয়—এই কথাটা সে ওদের বুঝাতে চায় অন্তত একজনকে শিক্ষিত করে তুলে। সাঁওতালরা ক্রীশ্চান হয়ে লেখাপড়া শিখে ডেপুটি হয়েছে, সে শুনেছে। শুনেছে, এই সব ছোট জাত বলে যারা পরিচিত, তারা লেখাপড়া শিখলেই গবর্মেণ্টের ঘরে ভাল চাকরি পায়। কোনরকমে একজনকেও যদি সে সেই রকম ক'রে তুলতে পারে, তবে তার আশা পরিপূর্ণ হয়। শিবকিঙ্কর বলেছিল সেই প্রথম দিন, চাষা, চাষা পণ্ডিত, শুঁড়ি ছাত্র, জেলে ছাত্র! হা-হা করে হেসেছিল। তার সেই ব্যঙ্গের, তার সেই হাসির উপযুক্ত জবাব হয় তাহ'লে।

রত্নহাটার সন্দীপন পাঠশালা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। নায়েবি তো সে করবেই না। নায়েবি! মানুষের উপর অত্যাচারের কাজ নায়েবি। মানুষকে ঠকানোর কাজ নায়েবি। নীচ কাজ। সে তা করবে না। রত্নহাটা ছেড়ে গ্রামে পাঠশালাও করে তার তৃপ্তি হবে না।

সকালবেলা যথানিয়মে সে রত্নহাটা চলেছিল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা কথা কানে এল,

রত্নহাটার পণ্ডিত-রত্ন চলেছেন।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে না সে, তবু গলার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলে, কথাটা বলেছে তারই বন্ধু চণ্ডী। চণ্ডী এখন গ্রামে ডাক্তার সেজে বসেছে। ওই রত্নহাটার ডাক্তারখানায় দিন-কতক কম্পাউণ্ডারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে কাজ করছিল; সেখানে সুবিধে করতে না পেরে, গ্রামে এসে ডাক্তার সেজে বসেছে। তার কথা শুনে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলে সীতারাম। চণ্ডী রত্নহাটায় ঠাঁই পায় নাই, তাই সীতারামের উপর ঈর্ষা; সীতারাম ঠাঁই পেয়েছে।

অন্য একজন বললে, তা বাপু চালাচ্ছে তো গোঁজামিল দিয়ে।

চণ্ডী বললে, এইবার গোঁজা টেনে বার করে ফেলেছে পুলিস সাহেব। আর পাঠশালা করতে হবে না।

সীতারাম একটু জোরে হেঁটে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু পাঠশালা বসাবে কোথায়?—এই চিন্তাটাই তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। বাবুদের কাছারির বারান্দাটা পেতে পারে সে। কিন্তু ওখানে পাঠশালা করতে কেমন তার মন চাইছে না। ওই উপপদ-তৎপুরুষ, ওই মধ্যপদলোপী—কানাই রায়, ট্যারা নায়েব দশ কথা বলবে, ঠাট্টা করবে, ছেলেদের ধমক দেবে, ছেলেরা গোলমাল করলে বিরক্ত হবে। ছেলেরাও ওখানে যেতে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করে ভয় পায়। ওদের হাজার উদারতা, অসীম অনুগ্রহ, ধীরাবাবুর বৈচিত্র্য, মায়ের মিষ্টি স্নেহ, সব সত্ত্বেও বাবুদের আপনার ভাবতে পারে না, তাদের উপর মনের বিরূপতাকে কিছুতেই দূর করতে পারে না সে। তা ছাড়া রজনীবাবু তাকে ধীরাবাবুদের বাড়ির সংস্রব ছাড়তেই বলেছেন, তা অবশ্য সে ছাড়বে না, অকৃতজ্ঞ সে হবে না। তবে এমন ক্ষেত্রে ধীরাবাবুর বৈঠকখানাতেই পাঠশালা বসানো কোন ক্রমেই উচিত হবে না। তা ছাড়া ওঁরা হলেন সিংহ। হাসে সীতারাম।

কিন্তু জায়গা যে সে কোথাও পাবে না। পুলিসের এই হাঙ্গামার পর ঘর ভাড়া তাকে কেউ দেবে না। তবে?

সে থমকে দাঁড়াল। মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। দুঃখের হাসি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জলও এল। ভাবনার মধ্যে সে অন্যমনস্ক হয়ে বাবুদের বাড়ি না গিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পাঠশালা-বাড়ির দরজায়। দরজার মাথায় সাইনবোর্ডটা এখনও ঝুলছে।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরল। আবার দাঁড়াল। রাস্তার এপাশে পাঠশালা-বাড়ির বিপরীত দিকে একটা বাঁধানো অশ্বত্থগাছতলায় ছেলেরা খেলা করছে। ছায়াঘন গাছটার তলাটায় ঘাস গজায় না ছায়ার জন্য। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল শান্তিনিকেতনের কথা। শান্তিনিকেতনে আমগাছের ছায়ায় ইস্কুল বসে। সে দেখেছে। সে শোভা অপরূপ।

মুহূর্তে তার মনের সকল অবসাদ কেটে গেল। এইখানে সে পাঠশালা বসাবে। বর্ষা

আসতে দেরি আছে। বর্ষার সময় এইখানেই সে চালা তুলবে। সে জানে, এ জায়গাটা ধীরাবাবুর জাঠতুত দাদার। গাছটি তাঁর মায়ের প্রতিষ্ঠা করা গাছ। ধীরাবাবুর মাকে বলে এই গাছতলাটা সে খাজনায় বন্দোবস্ত করে নেবে। প্রয়োজন হয় শর্ত করে দেবে—প্রতিষ্ঠা করা গাছে তার কোনও অধিকার থাকবে না। গাছের তলাটি বাঁধানোই রয়েছে, সামনেটা আরও খানিকটা বাঁধিয়ে নেবে। পুরনো সন্দীপন পাঠশালার কাছেই, সাহাপাড়া স্বর্ণকার-পাড়া কৈবর্তপাড়া, যাদের ছেলেদের নিয়ে তার কারবার, তাদের মধ্যেই এইখানে এই গাছতলায় সে পাঠশালা আরম্ভ করবে। মন সে স্থির করে ফেলল।

* * * *

কিন্তু এতেও বাধা পড়ল। ধীরাবাবুর জাঠতুত দাদারা গাছতলাটা দিলেন, পাঁচ টাকা নমস্কারী দিলে সীতারাম; ঘর তুলে খাজনা দিতেও রাজী হল; বাধা সেখানে পড়ল না, বাধা দিলে অষ্টাবক্র গোবিন্দ বৈরাগী, হঠাৎ সে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল।—ও আমি দোব না। কিছুতেই না—ও জায়গা আমার।

গোবিন্দ জন্মাবধি বিকৃতাঙ্গ। হাত-পাগুলো কেমন বাঁকা, অসমান; বিচিত্র তার দেহের গড়ন; একটা পা ছোট—একটা পা বড়; মুখের চেহারাও তাই, নাকটা বসা—থুৎনীটা টেপা। আর তেমনি তার ক্রোধ। লোকটি ভিক্ষে করে খায়। একসময় সে ওই গাছতলায় একটা কুঁড়ে বেঁধে কিছুদিন বাস করেছিল। কোন অনুমতি নেয় নি, এঁরাও অনুমতি দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কিছুদিন পর কুঁড়েটা একটা ঝড়ে উড়ে গেল—তখন সে তালপাতা কেটে ছাইয়েছিল—কিন্তু বর্ষার জল তালপাতার ছাউনিতে আটকায় নি—বর্ষাতে ঘরখানা পড়ে গিয়েছিল। গোবিন্দও আর ঘর করবার চেষ্টা করে নি; জায়গাটা ছেড়ে সে এখানে ওখানে এর ওর দাওয়ায় বাস করে। সে এসে দাঁড়াল—একেবারে লাঠি হাতে—ও জায়গা আমার, মাথা ফাটিয়ে দোব আমি। বেশি চালাকি করলে মণিবাবুকে বেচে দোব। হ্যাঁ।

মণিবাবুর নাম শুনে সীতারাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে খপ করে গোবিন্দের হাতখানা চেপে ধরলে। বললে—মুচড়ে তোর হাতখানা ভেঙে দোব আমি।

গোবিন্দের দেহ বিকৃত—মনও বোধ হয় তাই। পৈত্রিক পাপের শাস্তি বহন করতে তার জন্ম। দুরন্ত তার ক্রোধ। সে ক্রোধে চিৎকার করে উঠে তার হাত কামড়ে ধরলে। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই দাঁতে কামড়ে খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে মুখ তুললে; তখন তার দাঁতের দু'পাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। সীতারামের হাতের ক্ষত থেকেও অনর্গল রক্ত ঝরছে। সীতারাম অবাক হয়ে গিয়েছিল।

গোবিন্দ নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল—নিজের এই কাণ্ডে। সেও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। কানাই রায় এসে ধরলে তার ঘাড়ে।—হারামজাদা! রাক্ষস!

গোবিন্দ, বর্বর গোবিন্দ হতবাক্ হয়ে গিয়েছে। সে তাকিয়ে দেখছিল—সীতারামের হাতের রক্ত। কানাই রায় ঘাড়ে ধরতেই সে বললে—তা বটে, তা বটে, রাক্ষসের মতন কাজই আমি করেছি। মার, তোমরা আমাকে মার।

সীতারাম বললে—না। ছেড়ে দাও কানাই কাকা। ছেড়ে দাও। বেচারা হঠাৎ করে ফেলেছে। আমি বুঝতে পেরেছি। ছেড়ে দাও।

গোবিন্দ হতবাক্ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললে—আমি ভিখিরী, বোষ্টম, জায়গাও আমার নয়। কিন্তু পরের মন্ত্রণায়—।

বার বার আক্ষেপভরে মাথা নাড়লে সে। তারপর হাত জোড় করে বললে—তুমি ওখানে পাঠশালা কর গিয়ে ভাই। হিয়ে খোসলে বললাম আমি। ছি-ছি-ছি। কি করলাম আমি? বল দিকিনি। রাধাকৃষ্ণ। এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সীতারাম তাকেও পাঁচটি টাকা দিলে। বললে—আমি দিচ্ছি তোমাকে। খুশী হয়ে দিচ্ছি।

গোবিন্দ টাকা ক'টি নিয়ে বললে—তা হলে ভাই আমার টিপ ছাপ নিয়ে একটা নিকে নাও। নইলে বুঝছ তো—মন না মতিভ্রম। এ গেরামকেও তো জান। আর—। ভাই।

থেমে থেমে সঙ্কোচ করেই সে বললে—চালা তো একটা তুলবেই সীতারাম, সেখানে যদি রাত্রিটা তাকে শুয়ে থাকতে দেয়—তা হলে সে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। এর জন্যে সে তার পাঠশালা ঝাঁট-পাট দিয়ে দেবে। কলসী করে জলও আনবে ছেলেদের জন্য।

বেশ তো। হাসলে সীতারাম।

এগারো

অশ্বত্থতলায় পাঠশালা বসল সীতারামের। ঘড়ি, ম্যাপ, বোর্ড এসব আসবাব ঘরে বন্ধ রইল। শুধু গাছটার কাণ্ডতে খড়ি দিয়ে লিখে দিলে—'রত্নহাটা সন্দীপন পাঠশালা'। মাত্র পাঁচটি ছেলে।

লোকে অবাক হল। অনেকে বললে, লোকটা পাগল। হয়তো পাগল; সীতারাম হেসে বললে—পাগল তোমরা সবাই। একটা না একটা পাগলামি না হলে কাল কাটবে কি করে। ধীরাবাবুর জেলখাটা পাগলামি, এ গাঁয়ের অন্য বাবুদের—কারও আছে জমিদারির দাপট ফলানো পাগলামি; শিবকিঙ্করের মদ খাওয়া পাগলামি, আমার পাঠশালা পাগলামি।

গোবিন্দ বৈরাগী বললে—ভাল বলেছ সীতেরাম, ভাল বলেছ।

সে সকালেই এসেছে। বসে আছে গাছতলাতে। নিজেই একটা ঝাঁটা যোগাড় করে ঝাঁট-পাট দিয়েছে, একটা কলসী করে জল এনে ছিটিয়ে দিয়েছে, খানিকটা গোবরও কুড়িয়ে

জমা করেছে। এ বেলায় পাঠশালা ভাঙলে—সে নিকিয়ে দেবে জায়গাটা।

সীতারাম খুব খুশী হয়ে তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিল—তুমি কেন এত খাটতে গেলে বাঁকা চাঁদ। অষ্টাবক্র গোবিন্দকে অনেকে বলে বাঁকা চাঁদ। গোবিন্দ ও-নামটাতে খুশী হয়। গোবিন্দ বললে—করলাম আমার খুশি।

তুমি কি সেই কথা মনে করে রেখেছ গোবিন্দ ?

করে যখন ফেলেছি পণ্ডিত তখন ভুলব কি করে বল ? তবে সে কারণে আমি করি নাই। বুয়েচ কিনা। তোমাকে কামড়ে রক্তপাত করেছি, তুমি না হয় মাথা ফাটিয়ে দেবে। তার লেগে লয়। বুয়েচ এ ক'দিন যত ভাবলাম তোমার কথা তত ভাল লাগল তোমাকে। লোকে চুরি করে, নষ্ট কাজ করে, লোককে ঠকায়, মারে ধরে, কত কি করে, তুমি এই ছেলে-গুলানকে নিয়ে পড়াবে। তাতেও কত বেঘটন, কত লোকের কত রোষ। তাই, তাই, ভালবেসে ফেললাম।

হাসতে লাগল গোবিন্দ।

তারপর বললে,—চালাখানা তোল তুমি। আমিও তোমার এখানেই ডেরা নোব। বুয়েচ না, আমিও হব তোমার পাঠশালার একজনা।

সীতারাম এবার প্রাণ খুলে হাসলে, বললে, পড়বে তুমি ?

তা পড়লে হয়। আকু আমি একসঙ্গেই পড়ব। আমি ফাষ্টো, আকু সেকেন। নাকি রে আকু ? তবে পড়ব না আমি। আমি হব তোমার ইস্কুলের সেকেন মাস্টার। ঘণ্টা বাজাব, ঝাঁট-পাট দোব। তুমি না থাকলে বাছুরগুলানকে আগলাবো, বুয়েচ।

ঠিক এই সময় শিবকিঙ্কর এসে রাস্তার উপর দাঁড়াল। ঠিক খবর পেয়েছে, গাছতলায় পাঠশালা আরম্ভ করেছে সীতারাম। সে এসে পথের উপর দাঁড়াল। তারপর হেসে আকুকে ডেকে বললে, এই আকু।

কি ? আকু ভুরু কুঁচকে উঠে গিয়ে দাঁড়াল।

হারাধনের দশটা ছেলে জানিস ?

জানি।

বল্ দেখি, হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ-ভেউ—তারপর কি ?

মনের দুঃখে বনে গেল রইল নাকো কেউ।

শিবকিঙ্কর হাসতে হাসতে চলে গেল। কোনও প্রতিবাদ করলে না সীতারাম, চুপ করে বসে রইল। আচ্ছা, দিন তার আসুক, শিবকিঙ্করকে একদিন ডেকে সে ছেলেদের দিয়ে হারাধনের দশটি ছেলে ফিরে আসার ছড়াটা আবৃত্তি করিয়ে শুনিয়ে দেবে।

তবে মণিলালবাবু আর কথা বলেন না। সেও আর মণিবাবুকে নমস্কার করে না। সটান সোজা মাথায় সে চলে আসে।

হঠাৎ ধীরাবাবুদের নায়েব এসে দাঁড়ালেন—সঙ্গে দেবু।

সীতারাম একটু চকিত হল—আবার কি হল ? সে প্রশ্ন করলে—কি নায়েববাবু ?

নায়েব বললেন—মা দেবুকে পাঠালেন, তোমার পাঠশালায় ভর্তি হবে।

আমার পাঠশালায় ? অবাক হয়ে গেল সীতারাম। এ কি সৌভাগ্য তার ?

গোবিন্দ বললে—জয় রাধা গোবিন্দ। লাও মাস্টার—ভর্তি করে লাও।

সেদিন দেবু পড়ছিল—নেই কো মোদের কোঠা-বাড়ি
নেই কো মোদের বিত্ত ;
গরব করি মোদের কভু
যায় নি ম'রে চিত্ত।
দিন-মজুরি করছি নিয়ে
ক্লান্ত দেহখানি ;
কুটির পানে যাই গো ধেয়ে
জেরটি দুখের টানি।

সীতারাম বললে, হ্যাঁ। কি হল তাহলে ? কথাটা কে বলছে ? বলছে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি মানে—গরীব লোক, যার দালান কোঠা-বাড়ি নাই, যার বিত্ত অর্থাৎ প্রচুর ধনসম্পদ, মানে—মেলা টাকাকড়ি সোনাদানা নাই, যে দিন-মজুর খেটে খায়, পায়ে জুতো নাই, গায়ে জামা নাই, দু-বেলা পেট পুরে যারা খেতে পায় না, এমনই একজন লোক বলছে, একজন গরীব লোক বলছে। বলছে—। কি বলছে, বল।

দেবু বললে, আমাদের কোঠা-বাড়ি নাই। আমাদের টাকাকড়িও নাই। তবুও আমাদের অহঙ্কার যে, আমাদের মন মরে যায় নাই।

সীতারাম বলল, মন মরে যায় নাই, কি রকম বল দেখি ?

বিপদ কিন্তু আকুটাকে নিয়ে। একটা কিছু নিয়ে ফিসফাস আরম্ভ করেছে। সব ছেলেকে চঞ্চল করে তুলেছে। সীতারাম আজকাল আকুকে আর কঠোরভাবে শাসন করতে পারে না। সে কিছুতেই ভুলতে পারে না আকুর সেদিনের সেই কথাগুলি, তার সেই কাজগুলি।

ও না থাকলে হয়তো ঠিক এইভাবে এত শীঘ্র ভাঙা পাঠশালাটি আবার গড়ে উঠত না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, যাতে আকুর মন ভালর দিকে ফেরে, পড়াশুনায় মন বসে। কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভবপর হচ্ছে না। সেদিন সে পড়াচ্ছিল 'চাষা' বলে একটি কবিতা—'সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা'। জিজ্ঞাসা করেছিল, চাষা কাকে বলে ?

আকু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, আপনারা স্যার্।

মাথাটা ঝনঝন করে উঠেছিল রাগে। ইচ্ছা হয়েছিল, কঞ্চির ছড়ি দিয়ে ছেলেটার

পিঠটা রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু পূর্বের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করে অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করেছিল সে। তারপর তাকে বুঝিয়েছিল, যে লোক চাষ করে খায়, নিজে হাতে চাষ করে, তারাই চাষা—চাষী। কৌশলে প্রসঙ্গক্রমে তাকে বলেছিল, তারা জাতিতে সদ্‌গোপ, সদ্‌গোপেরা চাষ করে খায় বলে তাদের লোকে চাষা বলে।

আকু বলেছিল, গাঁয়ের লোক বলে কি, তোদের মাস্টার চাষা।

আকুর দোষ নাই। মণিলালবাবুর গ্রাম, শিবকিঙ্করের গ্রাম, ভদ্র সভ্য বাবুদের গ্রাম রত্নহাটার ভাষাই এই, ধারাই এই।

এক-একদিন বাইরে আত্মসম্বরণ করেও অন্তরের আক্রোশ দমন করতে পারে না। সেদিন সে তার পূর্বপ্রতিজ্ঞা আর রক্ষা করতে পারে না। এ ব্যাপারটা ঘটে পাঠশালার শেষের দিকে; শরীরের ক্লান্ত অবস্থাতে সে এক-একদিন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হয়। সব ভুলে সে তখন নিষ্ঠুর কৌশলে নির্যাতন করে ছাত্রদের। কানের জুলপির চুল ধরে নির্মমভাবে টানে, দুটো আঙুলের মধ্যে একটা পেন্সিল পুরে দিয়ে সজোরে চাপ দিতে থাকে, পেটের মাংস ধরে টানে, অবশেষে সামনের চুলের মুঠো চেপে টেনে ঘাড় নুইয়ে দিয়ে বারকতক ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দেয়। ছেলেদের মারব না প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি সীতারাম। পারবে না। পারা যায় না।

দিন যায়।

মাস কয়েকের মধ্যেই সে চালা একটা তুলে ফেললে। যথাসম্ভব কম খরচেই হয়ে গেল। বাঁশ কাঠ কিছু সে নিজের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করলে—কিছু দিলেন রাণী-মা। সতীশ সূত্রধর অল্প টাকায় তার কাজ করে দিলে। মজুরের কাজ করলে সে নিজে এবং তার সঙ্গে খোঁড়া গোবিন্দ। শ্রীমান বাঁকাচাঁদ। এইবার নীচেটা বাঁধিয়ে নেবে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ছেলে বেড়েছে পাঠশালায়। পাঁচটি নিয়ে শুরু, তার পর দেবু—তারপর আর পাঁচটি। লোকের ভয় যেন খানিকটা কমেছে। কিছুদিন আগে গোবিন্দই তাকে বলেছিল—পণ্ডিত, তুমি একবার যাও ক্যানে ছেলেদের মুরুব্বিদের কাছে।

বিষণ্ণ হেসে সীতারাম বলেছিল—কি হবে?

হবে গো হবে। বোশেখ-জষ্টিতে কালবোশেখী হয়। ঝড় আসে। আষাঢ়ে বাতাস পাল্‌টায়—তখন বর্ষা নামে। বাতাস পাল্‌টাচ্ছে হে। আমি শুনে এসেছি। লোকে বলাবলি করছে। বড় ইস্কুলে ব্যাতন বেশি, মাস্টেররা গরুর মতন ঠ্যাঙায়, যা তা বলে। বুয়েচ না, ইন্দির সা-এর ছেলেটা ভয়ে ইস্কুল যায় না, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তা বলছিল—সীতারামের হোথাই আবার দি—যা হয় হবে। তা-পরেতে ব্যাতনের জন্যে ননী ধীবরের বেটার নাম কেটে দিয়েছে। তুমি একবার যাও।

সীতারাম গিয়েছিল। বলেছিল, যা হবে—সে তো আমারই হবে। ওরা তো ছেলেমানুষ, ওদের তো জেলে দেবে না—এই কথাটা ভেবে দেখুন।

তাতে ফল হয়েছে। আরও পাঁচটি ছেলে এসেছে। এখন ছেলে এগারটি।

সেদিন পাঠশালায় পড়াতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে সে বসে ছিল। হাতে একখানা চিঠি। একদিকে তার বুকের ভিতরটা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে আনন্দে গৌরবে তার চোখে জল আসছে। জেল থেকে ধীরাবাবু তাকে পত্র লিখেছেন—জেলখানার কর্তাদের সই করা পত্র। তাঁরা পাস করে দিয়েছেন। সীতারাম ভাবছে—জেলখানা থেকে নিশ্চয় তার নাম আবার পুলিসের খাতায় গিয়েছে। হায় ধীরাবাবু, কেন আপনি আমাকে এমন করে জড়াচ্ছেন! আমি গরীব, আমি সামান্য মানুষ, আমি কি আপনাদের সঙ্গে পথ চলতে পারি!

কিন্তু লিখেছেন বড় ভাল। বড় সুন্দর, মনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। "পণ্ডিত—আপনাকে আমি রামায়ণের ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করি। কেন জানেন? আমার কাছে শিক্ষাই হল সত্যকারের পতিত-পাবনী ধারা। অশিক্ষার অভিশাপে অভিশপ্ত ভস্মস্তূপে ঢাকা মানুষের আত্মাকে মুক্তি দেয়। তারা সশরীরে মুক্তি পেয়ে উঠে আসে উচ্চতার স্বর্গলোকে। শুধু তাই নয় পণ্ডিত—মানুষের অন্তরের মর্ত্যলোকে নেমে আসে স্বর্গমন্দাকিনীর ধারা, বেয়ে যায় প্রবল কল্লোলে, মানুষের ঊষর অন্তরকে করে উদারতার উর্বরতায় উর্বর, বিনয়ে করে তোলে স্নিগ্ধ, শ্যামলতায় সুশ্যাম সুন্দর। তার তটে তটে গড়ে ওঠে প্রসন্ন মহত্ত্বের পবিত্র তীর্থস্থল; গড়ে ওঠে দেশ-দেশান্তরের মানুষের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সমৃদ্ধ বন্দর।"

আরও অনেক লিখেছেন। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে শব্দ কয়েকটা লাইন—কেটে দিয়েছে, এমন করে কেটেছে যে পড়বার উপায় নাই। এগুলি জেলের কর্তারা কেটেছে।

হঠাৎ গোবিন্দের দিকে চোখ পড়ল তার। গোবিন্দ কার সঙ্গে ইশারায় কথা বলছে। তার চোখ-ভুরুর সে ভঙ্গি দেখে সীতারামের হাসি এল। সে চিঠির আড়াল দিয়েই রইল। আকুর সঙ্গে ইশারা চলছে। আকু কিছু চাচ্ছে, গোবিন্দ ঘাড় নাড়ছে, হাসছে এবং ভুরু ও চোখের ইশারায় সীতারামকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিছু নয়, গোবিন্দ আকুর বিড়ি দেশলাই কিংবা নস্যির কৌটা কেড়ে নিয়েছে, আকু ফেরত চাচ্ছে। গোবিন্দ সীতারামকে দেখিয়ে ইশারায় বলছে—বলে দোব মাস্টারকে।

গোবিন্দ আশ্চর্যভাবে তার জীবনে এসে গেল। তবু ভয় হয় সীতারামের। কোন দিন যদি তার সেই পাশব ক্রোধ ওঠে। কোন ছেলের উপর যদি ওঠে। তবে সে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। কোন কিছু তার চোখ এড়ায় না। সে পাঠশালায় আসে, পথে গাছের আড়ালে দাঁড়ায়; দূর থেকে দেখে গোবিন্দ কি বলছে কি করছে। গোবিন্দ তার আসনের পাশে হাতে ছড়ি নিয়ে বসে থাকে, কানে কলমটি গুঁজে রাখে। চিৎকার করে—এ্যাও, এ্যাও।

চোপ-চোপ! পড়, সব পড়। এই আকু! এই লাতু! বেকুব—বেহুদ্দা কোথাকার।

আকু এসে দাঁড়ায়—এইখানটা বুঝতে পারছি না স্যার্!

বুঝতে পারছ না? ডংকি-মংকি কোথাকার! এ হল, বলছে, "ভাল করে পড়গা পাঠশালে—নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।" কিংবা বলে—আমি হেড মাস্টার—ওসব ছোট পড়া আমি পড়াই না। সে সেই সেকেন মাস্টার আসুক। তার কাছে পড়বি, বুঝবি।

কোন দিন ইংরাজী পড়ায়—পড় সব—এ-বি-সি।

সাহেব হয়েছি।
এ—কে—জে
লেজ গজালছে।
এ্যাল—এ্যাম—এ্যান—
রামজী হুকুম ছান—
আর, এ্যাস, টি—
লাফ মেরে দি—

বলেই সে খোঁড়া পায়ে একটা লাফ মেরে দেয়। কোন কোন দিন লাফাতে গিয়ে বেচারা পড়েও যায়। বড় ভাল লাগে সীতারামের। মধ্যে মধ্যে ভাবে, বিকৃতাঙ্গ ভিক্ষুক ছেলেগুলির মায়ায় জড়িয়ে পড়ে এক অনাস্বাদিত অমৃত রস পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে। ওর দ্বারা আর কোন অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব।

সীতারাম এলেই গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বলে—লাও বাবু, তোমার পাঠশালা লাও। আমি চলি। পাঁচ দোর মেগে আসি।

অপরাহ্ণে ছুটির আগেই কিন্তু আসে; ঘণ্টাটি বাজায়।

সীতারাম চিঠিখানা সরিয়ে সাড়া দিয়ে ভাল করে বসল। তারপর বললে—ইশারাটা কিসের গোবিন্দ?

গোবিন্দ বললে—তেঁতুল। পণ্ডিত—একো তেঁতুল খাচ্ছিল। এই এতটা—এই দেখ! বলি অম্বল হবে—তা শুনবে না। হাত জোড় করে বলছে—দাও! দাও!

আকু! তুমি তেঁতুল খাচ্ছিলে?

আকু বিচিত্র! সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—স্যার্—একটা চরকা। একটা চরকা নিয়ে যাচ্ছে স্যার্।

চরকা?

হ্যাঁ। কুলীতে নিয়ে যাচ্ছে বাক্সর উপর চাপিয়ে। পাশেই স্টেশনের রাস্তা। আকু

রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলে।

তা হোক। বসো।

আকু টুপ করে বসে পড়ল, বললে, ইস্কুল-সাব-ইন্‌স্পেক্টার আসছে স্যার্। সঙ্গে একজনা কে রয়েছে! মেয়েছেলে। আকু সঙ্গে সঙ্গেই দুলতে দুলতে পড়তে আরম্ভ করে দিলে, "বহু নদ-নদীতে কুমীর দেখিতে পাওয়া যায়। কুমীর জলে থাকে এবং জলের মধ্যে থাকিয়া শিকার করিতে বেশ পটু।" সে পাঠশালার বহুদর্শী ছাত্র, সে জানে, ইস্কুল-সাব-ইন্‌স্পেক্টার পাঠশালার হর্তাকর্তা বিধাতা। খারাপ কিছু দেখলেই ইন্‌স্পেক্টার খাতায় খসখস করে লিখে নেবে সমস্ত কথা।

সীতারাম এবার নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠল। পাশেই স্টেশনের পথ। সত্যই সতীশ হাড়ি মাথায় একটা বাক্স নিয়ে চলেছে, তার উপর একটা চরকা। চরকা নিয়ে কে এল? কথাটা সেও জিজ্ঞাসা না করে পারলে না।

চরকা কার হে সতীশ?

আজ্ঞেন, পণ্ডিত মশায়, চরকা হল-গা যেয়ে, মেয়ে-ইস্কুলের দিদিমণির।

মেয়ে-ইস্কুলের দিদিমণির?

আজ্ঞে, হ্যাঁ গো। নতুন এলেন এখানে। ওই যে আসছেন। কালে কালে কতই দেখব পণ্ডিত মশাই! মেয়েনোকে চেয়ারেতে বসে বসে পড়াবে, পায়ে জুতো—। ওই দেখেন কেনে।

সীতারাম উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে অবশ্য হুগলীতে থাকতে শিক্ষিতা মেয়ে দেখেছে, তবু এখানে যিনি এলেন, তিনি কেমন—দেখবার জন্য তার কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মেয়েটি চরকা নিয়ে এসেছে। ঠিক এই কারণেই তার প্রতি সে একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করলে। অনেক দিন থেকে শুনেও আসছে দিদিমণির আসার কথা।

ওই রজনীবাবুর সঙ্গে আসছে একটি মেয়ে—চব্বিশ-পঁচিশ বছরের কালো লম্বা মেয়েটি, পরনে খদ্দরের জামা, খদ্দরের শাড়ি, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে দু-গাছি করে চুড়ি। মাথায় ঘোমটা নেই, রুক্ষ চুলে বেশ সাদাসিধে খোঁপা। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কালো মেয়ে, তবুও পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় মেয়েটিকে চমৎকার সুশ্রী দেখাচ্ছে। শ্রী শুধু মেয়েটির চোখে আর চুলে।

সীতারাম নমস্কার করলে রজনীবাবুকে। রজনীবাবু দাঁড়ালেন।

নতুন শিক্ষয়িত্রীটিকে নমস্কার করতে সীতারামের ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে পারলে না। লজ্জার কুণ্ঠাকে সে জয় করতে পারলে না।

রজনীবাবু বললেন, আমি চলে যাচ্ছি সীতারাম।

চলে যাচ্ছেন? ট্রান্‌স্‌ফার হচ্ছেন?

হ্যাঁ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রজনীবাবু বললেন, আমার দুঃখ থেকে গেল, তোমার জন্যে কিছু করতে পারলাম না। যাই হোক, নোট আমি উপরে দিয়েছি। এখানেও রেখে গেলাম। যিনি আসছেন, তিনিও লোক ভাল। তাঁর সঙ্গে দেখা করো, আমার বিশ্বাস, তিনি করে দেবেন তোমার কাজ। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আর একটা কথা তোমাকে বলে যাই। আমাদের দেশের নতুন স্বায়ত্তশাসন আইনের কথা জান তো? এই যে কিছুদিন আগে আইন-সভার ভোট হয়ে গেল!

সীতারাম ম্লান হেসে বললে, জানি। ম্লান হাসি হাসলে, তার কারণ কংগ্রেস-আন্দোলন, ধীরাবাবুর জেল—সবই তো এই ভোট-ব্যাপার নিয়ে। ভুয়ো স্বায়ত্তশাসন। কাগজে লেখে, 'মণ্টেগু মাকাল'।

রজনীবাবু বললেন, সেই আইন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আর ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে থাকবে না। নতুন ইলেক্‌শন হয়ে নন-অফিসিয়েল চেয়ারম্যান হবে। আমাদের এখানে রায় সাহেব মুখুজ্জে দাঁড়াচ্ছেন, আরও দাঁড়াচ্ছেন সব। তুমি এক কাজ করো। রায় সাহেবের ভোটে খেটে দিও। তা হলে উনি চেয়ারম্যান হলে তখন তোমার এড্ সহজেই হবে। এড্ তো ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যানের হাতে।

তিনি চলে গেলেন মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে।

রজনীবাবুর ট্রান্‌স্‌ফারের সংবাদে সীতারাম আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হল। সত্যই, এমন ভাল লোক বুঝি আর হবে না। কোমল চিত্ত, ধার্মিক মানুষ, কখনও কাউকে রূঢ় কথা বলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা গভীর অপরাধবোধও জেগে উঠল। তাঁর বাসা থেকে অন্যমনস্ক ভাবে সে খুকির জন্মদিনে 'বীরবাণী' বইখানা নিয়ে এসেছিল। সেখানা সে ফেরত দিতে পারে নাই লজ্জায়। সেখানা—সেখানা সে কি করে ফেরত দেবে? একবার ইচ্ছা হল, সে ছুটে গিয়ে প্রকাশ করে বলে আসে, রজনাবাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। গেলও সে ছুটে। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা তার গলা চেপে ধরলে। রজনীবাবু প্রশ্ন করলেন, আবার এলে পণ্ডিত! কিছু বলছ? সীতারাম কোন কথা না বলে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল, শুধু চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দু-ফোঁটা। রজনীবাবু আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, তোমার ভাল হবে সীতারাম। শিক্ষকতা তুমি ছেড়ো না।

তাঁরা আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। সীতারাম দাঁড়িয়েই রইল। পিছন থেকে মেয়েটিকে বড় ভাল দেখাচ্ছে। সব চেয়ে ভাল লেগেছে মেয়েটির আশ্চর্য রকম শান্ত ধীর অকুণ্ঠিত স্বভাব। শিক্ষা না হলে মানুষ সত্যকার মানুষ হয় না। সে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক দুইয়ের পক্ষেই।

পর সে বাজারের রাস্তা দিয়ে চলেছিল। একজন দোকানী বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, আরে পণ্ডিত, তুমি এদিকে ?

সীতারাম এ প্রশ্নে একটু ক্ষুব্ধ হল অকারণে, বললে, কেন, আমাদের কি আসতে নাই এদিকে ?

হেসে সে বললে, চটে গেলে যে হে! বলি, এদিকে তো আস না। তোমার তো সেই ঝরনার ধারে বসে তপস্যা আছে। তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সীতারাম বললে, এই দিকেই যাব আজ, দরকার আছে।

তা এস, একটু বসে যাও। তোমার প্রশংসা করি আমরা। বলি হ্যাঁ, সাহস আছে সীতারামের। তা ছাড়া এত কষ্টের মধ্যেও যে লোক পণ্ডিতি ছাড়ে নাই, তার কাছেই পড়তে দিতে হয় ছেলেকে। শিবকিঙ্কর ও মণিলালবাবুর আমরা নিন্দে করি। বুঝলে ?

সীতারামের ভাল লাগল একটু। সে বসল। কয়েক মিনিট পরই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, আজ উঠি ভাই।

কোথায় যাবে ? কি দরকার ?

সীতারাম বললে, একবার রজনীবাবুর কাছে যাব। উনি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে।

কথাটা সে মিথ্যা বললে। সে চলেছিল বালিকা-বিদ্যালয়ের দিকে। শিক্ষয়িত্রীটিকে তার বড় ভাল লেগেছে। তাকে যদি একবার দেখতে পায়—সেই উদ্দেশ্যে সে চলেছিল। সে জানে যে, এটা তার অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়, বার বার সে মনকে বুঝাতে চেষ্টাও করেছে, তবুও সে নিজেকে সংযত করতে পারে নাই।

গ্রামের বাজারের রাস্তার ধারেই বালিকা-বিদ্যালয়। ইটের গাঁথনি ঘরের উপর টিনের চাল। সামনে থাম-দেওয়া বারান্দা। বারান্দার কোলে একটুকরা বাগান। এতদিন ইস্কুলে বৃদ্ধেরাই মাস্টারি করে এসেছেন। সম্প্রতি উপরের নির্দেশে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হল। এই মেয়েটিই প্রথম শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের পাশেই একখানি মাটির কোঠা-ঘরে তার বাসা নির্দিষ্ট হয়েছে।

সীতারাম দাঁড়াল রাস্তার উপর।

ঘরের দরজা বন্ধ। জানলাটি খোলা, জানলায় পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওইটুকুতেই একটি মার্জিত রুচির ছাপ ফুটে উঠেছে।

শিক্ষিতা মেয়ে, সে কি বেড়াতে বার হয় না।

দূরে কে আসছে। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে তার আর সাহস হল না। সে হনহন করে একটু বেশি জোরেই অগ্রসর হল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার সে একবার দাঁড়াল বাড়িটার সামনে। ঘরে আলো জ্বলছে; পর্দায়

আলো পড়েছে, সেই আলোকিত পর্দায় সে দেখতে পেলে মেয়েটির মুখের ছায়া, বায়স্কোপের পর্দায় যেমন কায়ার ছাড়া পড়ে অবিকল সেই রকম; মুখখানি কালো ছায়ায় ফুটে উঠেছে। মাথার এলো খোঁপাটি পর্যন্ত ছায়াতে ফুটে উঠেছে; ঠোঁট দুটি নড়ছে। বোধ হয় বই পড়ছেন। না। একলা তো কেউ এমনভাবে বই পড়ে না। নীরবেই তো পড়ে যায়। তবে? তবে কি আপন মনে মৃদুস্বরে গুনগুনিয়ে গান গাইছেন?

হঠাৎ সে নিজেই চমকে উঠল। এ কি করছে সে? ছি! ছি! ছি! দ্রুতপদে সে চলতে শুরু করলে। যেন পালাচ্ছে। একেবারে এসে দাঁড়াল রজনীবাবুর বাসার দরজায়। পকেটে হাত দিলে। বীরবাণীখানা পকেটেই আছে।

রজনীবাবু ডাকলেন—সীতারাম! এস। এস। রজনীবাবু তাঁর খাতাখানি খুলে দিলেন। বললেন—পড়।

ইংরাজীতে লেখা মন্তব্য। রজনীবাবুর হাতের লেখাও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, পড়ে গেল সে। ইংরিজী ভাল জানে না সীতারাম, সকল শব্দের অর্থ সে বুঝতে পারলে না; তবু এটুকু বুঝলে যে রজনীবাবু লিখেছেন, 'নিরীহ পণ্ডিতটির উপর অবিচার হয়েছে। গ্রাম্য ষড়যন্ত্রের ফলেই সরকার পক্ষের মনে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। পণ্ডিতটি সৎ নিষ্ঠাবান মানুষ। তার উপর শাস্তিবিধান হওয়ায় আরও একটা ক্ষতি হয়েছে; গ্রামের অতি দরিদ্র এবং সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়ের ছেলেদের পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।'

আরও অনেক লিখেছেন তিনি। পড়ে সীতারামের চোখে জল এল। কি করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ভেবে পেলে না। পকেটের বীরবাণীখানিতে সে হাত দিয়েই ছিল। সেখানিও সে বের করতে পারলে না। এরপর কি করে বের করবে সে? রজনীবাবুর সব ধারণা উলটে যাবে। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। না—না থাক। এ পাপের শাস্তি সে পরলোকেই নেবে। এখানে সে পারবে না।

রজনীবাবু হেসে বললেন—তোমাকে আর একটি হদিস দিয়ে যাই সীতারাম। নতুন সাব-ইনস্পেক্টার যিনি আসছেন—তিনি ওল খেতে ভালবাসেন। ওল, বেল—আরও যেন কি কি সব। মানে ডিস্পেপটিক্ লোক, বুঝলে না? দেখা করবার সময় একটি ভাল ওল নিয়ে দেখা করো। আর একটি কথা, ধীরাবাবু তোমাদের গল্প লেখেন। নতুন ইন্স্পেক্টার বাবু—আধুনিক সাহিত্যের উপর ভারী চটা। বুঝেছ, তুমি ধীরাবাবুর গল্পের নিন্দা করো। বুঝেছ? নিন্দা যদি না করো, তবে কখনও যেন প্রশংসা করো না। বুড়ো তা হ'লে ক্ষেপে যাবে। আমার সঙ্গে একবার তর্ক হয়েছিল। শেষে রেগে একটা কাগজ-চাপা ছুঁড়ে দিলে আমার মাথায়। ভাগ্যে মাথাটা সরিয়েছিলাম—তাই রক্ষা। হাসতে লাগলেন রজনীবাবু। বললেন—এই তোমাদের এক বিপদ। আমাদের মন রেখে চলা। আমাদের বাতিক মাফিক নাচা।

সীতারাম ফিরবার পথে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পথ হাঁটছিল। সে যেন হারিয়ে গিয়েছে। রজনীবাবুর স্নেহে—আর কালো ছায়াতে আঁকা ছবির সৌন্দর্যে—সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

বারো

মাস দুয়েক পর সেদিন মনোরমা কাঁদছিল।

সীতারাম তাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করেছে, অপমান করেছে। তার কি অপরাধ, সে তা বুঝতে পারে নাই। সেই জন্যেই সে বেশী করে কাঁদছে। ইদানীং সীতারামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাতিক ক্রমশই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কাপড় ময়লা, বিছানা ময়লা, এখানে দুর্গন্ধ উঠেছে, এই নিয়ে সে অহরহই খুঁতখুঁত করে। শুধু তাই নয়, তার স্বভাবও যেন নিরতিশয় রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

আজ সীতারাম বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছিল, মনোরমা এসে সামনে ভাত নামিয়ে দিতেই সে বলেছে, ভাত নিয়ে যাও। আমি খাব না।

খাবে না? কি হল? খেতে বসলে—

নিয়ে যাও বাপু, নিয়ে যাও। ভাত আমার রুচবে না।

বলেই সীতারাম উঠে পড়েছে। বলেছে, তুমি কি নিজে গন্ধ পাও না? তোমার কাপড়ের কি দুর্গন্ধ উঠছে বুঝতে পারছ না?

মনোরমা লজ্জিত হয়েছিল। কাপড়খানায় দুর্গন্ধ হয়েছে বটে। ছোট ছেলের মা সে, তার উপর ভিজে কাপড়খানা বাতাসে গুটিয়ে গিয়েছিল, রোদ পায় নাই। কাপড়খানা ময়লাও হয়েছে। এর আর সে কি করবে? কোলে শিশু-সন্তান, ঘর দোরে রান্না বাড়ার কাজের অন্ত নাই; একা মানুষ সে, তার কি সেজেগুজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকব বললেই থাকা হয়? তা ছাড়া যে কাপড়খানা তখন তার পরনে ছিল, সেখানা রেশমের ঝাড়া, কাঁটের কাপড়—শুদ্ধ কাপড়। এ কাপড় আবার কে বারো মাস ক্ষারে কাচে? সে সেই উত্তরই দিয়েছিল, কি করব? শুদ্ধ কাপড় যে! এ কাপড় কি নিত্য কাচা হয়? এতে একটু গন্ধ হয়। নাও, বসো। খেয়ে নাও।

সীতারাম ব্যঙ্গভরে বলেছিল, শুদ্ধ কাপড়!

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ না? কাঁটের কাপড়!

অশুদ্ধ কাপড়। যাতে দুর্গন্ধ হয়, যা অপরিষ্কার, তাই অশুদ্ধ।

দেখ, যা জান না, তা নিয়ে বকো না। পণ্ডিত আছ পাঠশালায়, ঘরের আচার-

আচরণের কি জান তুমি ?

তা বটে। আচার-আচরণে মুখ্যুরাই পণ্ডিত হয়। সেটা জানলাম।

মনোরমা ওই মূর্খ কথাতেই বেশী আঘাত পেয়েছে। উত্তরে বলেছিল, বেশ, আমি না হয় মুখ্যুই বটে। কিছু জানি না। কিন্তু এই কাপড় আরও পাঁচখানা কিনে দাও কেনে, রোজ কাচব একখানা করে। কাচবই বা কেন, ধোবার ব্যবস্থা করে দিও, ধোবার বাড়ি দোব। তখন যে সবাই সাধলে, বাবুরা নায়েবি দিতে চাইছে, নাও। তা—

বাধা দিয়ে সীতারাম বলেছে, ইতর—তুমি অতি ইতর।

আমি ইতর ? এত বড় কথাটা তুমি বললে আমাকে ?

হ্যাঁ। তুমি মুর্খ, তুমি ইতর, তুমি লোভী। সীতারাম আসনের উপরেই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এবার উঠে গিয়ে হাতে মুখে জল দিতে আরম্ভ করলে।

মনোরমার বুকের মধ্যে অভিমানের অবরুদ্ধ কান্না তোলপাড় করছে তখন। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কৃষাণ-বউটা শুয়েছিল, অবাক হয়ে সব শুনছিল, এবার সে উঠে বসল। বললে, বলি মুনিব মাশায়। বলি তোমার রীতিকরণ-টরণ কেমন গো ?

সীতারাম তাকে ধমক দিয়ে উঠল, তুই থাম্। যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলতে নাই।

বলি, বুঝব না কেনে ? মুখ্য-সুখ্য মানুষ, ছোট-মোট জাত, তা বলে বোকা-টোকা তো আর লই। বুঝব না কেনে ? তিরিক্ষি-মিরিক্ষি মেজাজ নিয়েই তুমি এলে, এসে ওই একটা ছুতো-টুতো নিয়ে বউটাকে বকছ।

সীতারাম আর কোন কথা না বলে উপরে গিয়ে উঠল। কৃষাণ-বউয়ের কথাটা তার মনে গিয়ে তীরের মত বিঁধল।

উপরে এসে একা বসে অনেকক্ষণ ভেবে সে দেখলে ; সত্যই তাই। অত্যন্ত সামান্য কারণে সে মনোরমাকে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করেছে। কেন তার মন এমন রুক্ষ হল ? কি হয়েছে তার ? ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে। সত্যই কি তাই ? হ্যাঁ, তাই। তাতে আর কোন ভুল নাই। কিন্তু এ যে অপরাধ। হ্যাঁ, অপরাধ বইকি। শুধু মনোরমার কাছেই অপরাধ নয়, এ তার চিত্তের কলুষ, এ তার ভগবানের কাছে অপরাধ। এ ছাড়া এ যে তার ধৃষ্টতা। সে একজন পাঠশালার সামান্য পণ্ডিত, আর ওই মেয়েটি, শিক্ষিতা মেয়ে। এ কথা যদি কোন রকমে তার কানে ওঠে, তবে সে কি কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবে, কি বাঁকানো হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠবে, সে কল্পনা করেও সে শিউরে উঠল।

আজ প্রায় মাসখানেক সে এসেছে। মাসখানেক ধরেই ও ভূতগ্রস্তের মত দু-বেলা ওই পথে তাকে দেখবার গোপন উদ্দেশ্যেই যাওয়া-আসা করছে। আজকাল ও তার এতকালের যাওয়া-আসার নিয়মিত পথ পরিবর্তন করে, নতুন পথে, অর্থাৎ বালিকা-বিদ্যালয়ের সামনের বাজারের পথ দিয়ে যাতায়াত করছে। সকালে গ্রাম থেকে বেরিয়ে অনেকটা ঘুরে ওই পথ

দিয়ে বাবুদের বাড়ি যায়। বৈকালে আজকাল আর ঝরনার দিকে যায় না। বাজারের পথে, ওই বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যায়, খানিকটা পরেই ফিরে আসে ওই পথে। তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়। তার ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে, পর্দায় তাঁর ছায়া পড়ে মুখের; তাই দেখে সে ফিরে আসে। এক মাসের মধ্যে, বার-তিনেক তাঁকে বাইরে দেখেছে।

কালো লম্বা মেয়েটি, পরিপাটি করে এলো খোঁপা বাঁধা, পরনে ধোয়া পরিচ্ছন্ন খদ্দরের শাড়ি, গায়ে ব্লাউজ, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি। সীতারাম মুগ্ধ হয়ে যায় দেখে। একদিন দেখেছিল পোস্ট অফিসে, একদিন দেখেছিল বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের বাসার দরজায়, একদিন দেখেছিল নিজের বাসায় বারান্দায়; অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

কতদিন সে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কত উপায়ের কথা ভেবেছে। মেয়েটি চরকা কাটে। একদিন কতকটা রামকাপাসের তুলো পাঁজ করে তাঁকে উপহার দিলে হয় না? বালিকা বিদ্যালয়ের ঝি রোজই প্রায় এখানকার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায় তাঁর জন্য। ধীরাবাবুর অনেক বই আছে, ঝিকে বললে হয় না—তাঁকে বলো, তাঁর অমত না থাকলে, আমি বই দিয়ে যাব, আবার নিয়ে যাব। কিন্তু কোনটাই সে পারে নাই, শুধু ভূতগ্রস্তের মত তাঁর বাড়ির সম্মুখ দিয়ে চলাফেরা করেছে।

নাঃ, এ তার অন্যায়। সে একজন পাঠশালার শিক্ষক। তার জীবনে কোন কলুষ থাকা উচিত নয়। এ মোহ তাকে ত্যাগ করতে হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তাই করবে সে। মনে মনে বার বার সে ভগবানকে ডাকলে, ভগবান আমাকে বল দাও।

ভগবানকে প্রণাম করে প্রাণমন ঢেলে সে আবার পাঠশালা নিয়ে পড়ল। এই একমাসে আরও দুটি ছেলে বাড়ল তার পাঠশালায়। তেরোটি ছেলে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তেরোটি ছেলের একটিও তেমন ভাল ছেলে নয় কেউ। একশো ছেলের বদলে যদি একটিও ভাল ছেলে—সত্যকার ভাল ছেলে সে পায়, তবে সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। দেবুর উপরে ভরসা তার ছিল। কিন্তু সে ভরসা তার দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। দেবু ক্রমশই বেশী চঞ্চল এবং পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে উঠছে। জ্যোতিষের ভাইপোটি কেমন যেন বোকা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এক-একসময় নিজের উপর সন্দেহ হয়। এ কি তার নিজের অকৃতিত্ব? নিজের ক্ষমতার অভাব? তার জন্যই কি ওদের ওই রকম পরিণতি হচ্ছে?

সে এবার প্রাণপণে লাগল।

আকুর কিছু হবে না। ওকে পাঠশালা থেকে বিদায় করা উচিত। কিন্তু বিদায়ও নেবে না। ছেলেটা বিড়ি খেতে শিখেছে। আরও পাঁচরকম খারাপ বুদ্ধি জেগেছে ওর মনে। এবার ওকে প্রাইমারী পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে বিদায় করবে সে। আবার ধুলো

তুলেছে আকু, পাঠশালার ফুটবল টীম করতে হবে। এসবে গোবিন্দ হল তার উকিল। গোবিন্দ ওকালতি করে ভাল। বলে—তা—ধর ছেলের দল ওরা তো, গরীব বড়লোক মানে না। ওদের সাধ হবেই। বড় ইস্কুলের ছেলেরা বল খেলে। ওরাই বা খেলবে না কেন? তবে একটা গল্প বলি শোন। ভারী বাদশা ছিল এক। মস্ত দাড়ি। তেমনি রাগ। তেমনি দাপট। বুয়েচ। একদিন বাদশা এসে—দরবারে চোখ-মুখ রাঙা করে বললেন, আমার দাড়ি ধরে যদি কেউ টানে—তবে তার দণ্ড কি? সবাই তো শিউরে উঠল। হুজুরের দাড়ি ধরে টানা? তা কি কেউ পারে? বাদশা বললেন—পারে কি—পেরেছে, টেনেছে—টেনেছে। তবে দাও তাকে শূলে। না—না। তাকে টুক্‌রো টুকরো করে কাট। ডাল-কুত্তা দিয়ে খাওয়াও। উজীর কিন্তু চুপ করে আছেন। বাদশা বললেন—উজীর তুমি যে কিছু বলছ না? উজীর বললেন—হুজুর—কি বলব? বাদশার দাড়ি ধরে যদি কেউ টেনে থাকে তবে সে হল তাঁর শিশু ছেলে। আমি বলি তার হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হোক। গল্পটি তার সত্যই ভাল লেগেছে। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় এসব অবশ্য নাই; সেখানে পণ্ডিতেরা ছুটি দিয়েই খালাস। কিন্তু রত্নহাটার মত জায়গার পাঠশালায় তার তো খালাস নিলে চলবে না। এখানে বড় ইস্কুলের সংলগ্ন পাঠশালায় ছেলেদের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের কাছে সেটা একটা বড় আকর্ষণ। তা ছাড়া তার পাঠশালার ছেলেরা মুখ চুন করে ওদের ফুটবল খেলার গ্রাউণ্ডের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে সেও দুঃখ পায়। সুতরাং, তার পাঠশালাতেও এটা রাখতে হবে। আরও এক কারণে এটা তার ভাল লাগল। বৈকালে যদি সে ছেলেদের খেলার মাঠে গিয়ে বসে, তবে ওই মেয়েটির মোহ থেকে সে মুক্তি পাবে।

আর সে দ্বিধা না করে ফুটবলের অর্ডার দিয়ে চিঠি দিয়ে আকুর হাতে দিয়ে বললে, যা, ফেলে দিয়ে আয়।

আকু লাফাতে লাফাতে চলে গেল, 'সন্দীপন-পাঠশালা ফুটবল টীম'। চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ—হাই-ইস্কুলের প্রাইমারি সেক্‌শন ফুটবল টীমের সঙ্গে।

ছেলেরা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছে আনন্দে।

পড়। পড়। সব পড়। দেবু, সাহা, অঙ্ক নাও। এক মণ সন্দেশের দাম যদি চল্লিশ টাকা দশ আনা ছয় পাই হয়, তবে ওই দরে পাঁচ মণ সন্দেশ কিনিয়া কত টাকা সের দরে বিক্রয় করিলে একশত পঁচিশ টাকা লাভ হইবে? গণেশ, গোকুল, তোমাদের পড়া নিয়ে এস। বই বন্ধ করে মহাত্মা হাজী মহম্মদ মহসীনের গল্প বল।

স্তব্ধ দুপুর। ছেলেরা মৃদুস্বরে পড়ছে, মধুচক্রের মধুপানরত মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনধ্বনির মত গুঞ্জন উঠছে। পড়, পড়। বিদ্যাই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মধু। আকণ্ঠ পুরে পান কর সব। জীবন ধন্য কর। দেবু এবং সাহার স্লেটের উপর পেন্সিল পড়ছে, টুক-টুক শব্দ উঠছে।

গণেশ বলছে, মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থস্থল মক্কা। এই মক্কা তীর্থে যে সকল মুসলমান হজ্জ করিয়া আসেন তাঁহাদিগকে হাজী বলে। মহম্মদ মহসীন মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হাজী বলা হয়।

বাঃ, বাঃ। বলে যাও। পড়, পড়, তোমরা পড়। প্রাণ দিয়ে পড়। মন দিয়ে পড়। প্রাইমারি পাস কর। আমার কাছে যতটুকু আছে, নাও, তার সবটুকু তোমরা নাও। আদায় করে নাও। নিতে কষ্ট হলে বল। তারপর যাও বড় ইস্কুলে। সেখান থেকে যাও কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। মঙ্গল হোক তোমাদের, উন্নতি হোক তোমাদের, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য হও, দেশের মঙ্গল কর, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। সন্দীপন পাঠশালা ধন্য হবে। সীতারাম পণ্ডিত সামান্য ব্যক্তি, চাষী সদ্‌গোপের ছেলে, তার নাম তোমাদের কীর্তির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে, সে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাড়ে তিনটার ট্রেনের বাঁশি বাজে।

স্যার, সাড়ে তিনটে বাজল।

হ্যাঁ, নামতা পড়ে নাও। পড়াও, আজ দেবু পড়াও।

দেবু দাঁড়াল একা। ছেলেরা দপ্তর বেঁধে বসল। দেবু বলতে আরম্ভ করলে, একে —চন্দ্র।

সমস্বরে ছেলেরা বললে, একে—চন্দ্র।

দুয়ে—পক্ষ।

দুয়ে—পক্ষ। ক্রমে ক্রমে আশী নব্বুই পার হয়ে যায়, আসে নয়দশ—নব্বুই। দশ-দশে শূন্য, এক শো।

এইবার কড়া। এক কড়া পোয়া গণ্ডা।

সুর উঠতে থাকে। ক্লান্ত শরীরে সীতারামের এ সুর বেশ লাগে। ঘুমের মত ঝিমুনি আসে।

নামতা-পড়া শেষ হল। এ অঞ্চলে বলে নামতা ঘোষা—অর্থাৎ ঘোষণা করে পড়া। এইবার ছুটি।

ছোট ছুটি ছেলে এসে দাঁড়াল, কাল ষষ্ঠী স্যার। কাল ছুটি।

মায়ের ছোট ছেলে বুঝি? আচ্ছা, একবেলা ছুটি। টিফিনের পর আসবে। পাঠশালার ছোট ছেলেদের ছুটির ফর্দ বেশি। ষষ্ঠীপুজোয় এক বেলা ছুটি। নবান্নে ছুটি, লক্ষ্মীপুজোতে ছুটি। আহা, শিশুর দল! আনন্দ তো ওদেরই।

ছুটির পর ছেলেরা ছুটল স্টেশনের ধারে মাঠে। সীতারাম বসে রইল। তারা সকলে মিলে কোদাল হাতে নিয়ে মাঠ তৈরী করতে লাগল। উঃ, কি উৎসাহ তাদের। ভারী ভাল লাগল।

আজকাল সন্ধ্যার পর শ্যামু অন্য একজন মাস্টারের কাছে ইংরেজী পড়তে যায়। কানাই রায় লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে যায়। দেবু একা পড়ে এখন। খেলতে গিয়ে দেবুর পা মচকে গিয়েছে আজ। সে এল না পড়তে।

সীতারাম বেরিয়ে পড়ল। একটু মাঠের ধারে গিয়ে বসবে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে। জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে বসে বসে ভাববে, নিজের অদৃষ্টের কথা, দুঃখের কথা। ভাবতে তার ভাল লাগে। দুঃখ পেলে যেন সে ভাল থাকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে যেন তৃপ্তি পায়। সে মণিলালবাবুর আক্রোশের কথা ভাবে, শিবকিঙ্করের কূট-কৌশলে তাকে নির্যাতন করার কথা ভাবে। পাঠশালা-খানাতল্লাশির কথা ভাবে। আলোকিত পর্দার গায়ে ছায়ায় ফুটে-উঠা একখানি মুখের কথা ভাবে।

পথে চলতে চলতে হঠাৎ সে চমকে উঠল। এ কি! মাঠের ধারে যাবার সঙ্কল্প করে বেরিয়ে এ সে কোথায় এসেছে! সামনেই রাস্তার ধারে ঘরখানির জানালায় আলোয় উজ্জ্বল পর্দার উপর ছায়ায় আঁকা একখানি মুখ ফুটে রয়েছে। অন্ধকার গাছতলায় সে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তেমনি ভাবে বসে রয়েছেন তিনি। ঘাড়ের উপর এলো খোঁপাটি দুলছে। মধ্যে মধ্যে আজ হাত দুটি উঠে আসছে চোখের কাছে। কি যেন রয়েছে হাতে। আজ বোধ হয় কিছু সেলাই করছেন। হঠাৎ মাথার উপর গাছে পেঁচা ডেকে উঠল কর্কশ স্বরে। সে চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই তার চেতনা ফিরে এল। এতক্ষণ সে যেন আত্মস্থ ছিল না। মনে হল—এ কি? ছি-ছি-ছি! এখানে কেন এসেছে সে! অন্যমনস্কভাবে মাঠে না গিয়ে এখানে এসেছে সে! আশ্চর্য মনের ছলনা!

সে পালিয়ে গেল না। না, এইটুকু অধিকার তার থাক্। পাঠশালার পণ্ডিত সে, পাঠশালার পণ্ডিতের কি কোনও মুখ এমন ভাল লাগে না? ভাল লাগলে কি অপরাধ হয়? অপরাধ হয়তো হয়, কিন্তু তবু ভাল লাগে বইকি। পাঠশালার পণ্ডিত বলেই সে ভাল-লাগার কথা চিরদিন অজানাই থেকে যায়। হয়তো বুকের মধ্যে লেখা থাকে সে কথা। পণ্ডিত মরে, মরলে পণ্ডিতের দেহের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে কথা।

তারও তাই হবে। এ গোপন অধিকারটুকু তার থাক্, সে ছাড়তে পারবে না। মনে মনে মনোরমার কাছে বার বার সে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে। 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তোমার অসম্মান আমি কখনও করব না। তুমি লক্ষ্মী, তুমি দেবী। শুধু আমার এইটুকু গোপন অপরাধ ক্ষমা করো।'

রাত্রে ফিরে গিয়ে মনোরমাকে সমাদর করলে সে।

সে আদরে প্রায় বিগলিত হয়ে মনোরমা হেসে বললে, তুমি পণ্ডিত মানুষ, এত সব ভাল কথা আমি তো জানি না!

সীতারাম উৎসাহিত হয়ে বললে, আমাদের খুকিকে লেখাপড়া শেখাব। নিয়ে যাব স্কুলে

করে। বালিকা বিদ্যালয়ে দিয়ে পাঠশালায় যাব। দিদিমণিকে বলব, একটু দেখবেন। আবার পাঠশালা হয়ে গেলে সঙ্গে নিয়ে চলে আসব।

তেরো

দিন যায়। মাস যায়। এক বৎসর কেটে গেল। পাঠশালা চলে।

পাঠশালার পড়া শেষ করে একদল ছেলে বড় ইস্কুলে চলে গেল। নতুন একদল এল প্রথম ভাগ হাতে—স্লেট বগলে। নতুন কাপড় পরনে, নতুন জামা; ক'জনের চোখে আবার কাজল। বা। বা। বা।

সেদিন মাস্টার বসে রিপু করছিল।

ছেলেরা বসে পড়ছে। নতুন ছেলের দল। দেবু, জ্যোতিষ সাহার ভাইপো এবং তার সহপাঠীরা চলে গিয়েছে এখানকার পড়া শেষ করে। আকুর দল এবার বিদায় নিয়েছে। তারা কিন্তু কয়েকজন শিষ্য রেখে গিয়েছে—বিড়ি খায়, এক ক্লাসে দু বছর তিন বছর থাকে, মিথ্যা কথা বলে। আকুদের শিষ্য ঠিক বলা যায় না। সীতারাম অনেক ভেবে দেখে ঠিক করেছে, ওরা হল প্রথম ভাগের রাখাল নামক দুষ্ট ছেলেটির শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম তাকে পাঠশালায় ভর্তি করে ওদের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন। ওরা থাকবেই। আকু পাঠশালা ছেড়েছে নামেই। বদমাশটা ছেড়েও ছাড়ছে না। আকু পাঠশালায় পড়ে না কিন্তু আসা চাই একবার। ঘণ্টা দুয়েক থেকে আবার কোথায় চলে যায়। আসে, সীতারামকে রাজ্যের খবর দেয়। কিছু কাজ-কর্মও করে দেয়, ঘড়িতে দম দেওয়া তার মধ্যে প্রধান। আর ছেলেদের হাজিরা নেয়—নাম ডাকে। গোবিন্দের সঙ্গে গল্প করে। নস্য নেয়। ছেলেদের মধ্যে মধ্যে ধমকায়। এই ওর কাজ। আর কাজ বিকেলে সন্দীপন পাঠশালা ফুটবল টীমে বাঁশী বাজানো। বারণ করতে পারে না সীতারাম। হোক চণ্ডাল আকু, কোথায় যেন ওর মধ্যে শিবকে খুঁজে পায় সীতারাম।

নতুন কচি কচি মুখ সব।

সীতারামের সব চেয়ে বড় আনন্দ, এবার সে সত্যকার একটি ভাল ছেলে পেয়েছে। বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে সে। হঠাৎ তাকে সীতারাম আবিষ্কার করেছে। ফুটফুটে ছেলেটি, ঝকমকে চোখ, তার মুখের দিকে চাইলেই সীতারামের বুকটা ফুলে ওঠে। বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে—নাম তার জয়ধর।

ফুটফুটে ছেলেটাকে নিয়ে বিধবা মা এল বাবুদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ নিয়ে। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাবুদের বাড়িতে সীতারাম বসে ছিল বাগানের বেদীতে।

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বৈঠকখানার বারান্দা অতিক্রম করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সীতারাম তাকে ডাকলে—কে হে তুমি? ওহে, ও খোকা। শোন—শোন।

ছেলে দেখলেই সীতারামের মনে একটি ব্যবসাদার শিক্ষক জেগে ওঠে। পাঠশালায় ভর্তি করলে মাসিক চার আনা আয় বৃদ্ধি।

ছেলেটি ডাক শুনে দাঁড়াল, কাঁদতে কাঁদতেই বললে—কি?

তুমি কাঁদছ কেন? কি নাম তোমার?

সে উত্তর দিলে—আমি জয়ধর।

কাঁদছ কেন?

সন্দেশের মধ্যে আঁটি ছিল আমি খেয়ে ফেলেছি।

সন্দেশের মধ্যে আঁটি ছিল, খেয়ে ফেলেছ? হেসে ফেললে সীতারাম। ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হল না তার। আজ বিকেলে সেও আঁটিওয়ালা সন্দেশ খেয়েছে। অর্থাৎ হরিতকির মোরব্বা। হরিতকির আঁটিটা তার মধ্যেই থাকে। বেচারী গাঁয়ের ছেলে। বোধ হয় বাবুদের বাড়ি কোন অজ পাড়াগাঁয়ের কেউ এসে থাকবে। হরিতকির আঁটিটা গিলে ফেলেছে। হেসে সে বললে, তাতে ভয় কি? পেটে তোমার গাছ হবে না।

ছেলেটি থমকে দাঁড়াল, তার কান্নাও থামল।

সীতারাম প্রশ্ন করলে, তোমার নাম জয়ধর, জয়ধর কি?

জয়ধর ঘোষ।

এখানে কোথায় এসেছ?

মা যে কাজ করতে এয়েছে।

সীতারাম বুঝলে কি কাজ। ব্রাহ্মণ-বাড়িতে ঘোষের মেয়ে পরিচারিকার কাজ ছাড়া কি কাজ করবে। ঝিয়ের ছেলে। সে আবার প্রশ্ন করলে—তুমি? তুমি কি করবে?

আমি? মা বলেছে, বড়বাবু এলে তার চাকর হব।

লেখাপড়া জান?

হুঁ। বলেই সে আরম্ভ করলে—'ক' গরু চরাতে চ। গরু লাগল ধানে।

সীতারাম এবার উঠে তাকে তাড়া করলে। এবার ও বলবে—'ধর্ তো পণ্ডিতের কানে একেবারে তুখোড় ছেলে। সীতারাম তাড়া করের বললে—'ধর্ তো ছোঁড়ার কানে।'

ছেলেটা ছুটে পালিয়ে গেল সেদিন। তারপর মাস দুয়েক আর সে ছেলেটার দিক নজর দেয় নি। ওই ছেলের উপর নজর দিয়ে করবে কি? অথচ ছেলেটা আসত, ফড়িং ধরে ঘুরে বেড়াত, ওটা ওর নেশা। বাবুদের গরুর রাখালের কাছে বসে থাকত। কানাই রায় ছেলেটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না—সে বলত বিচ্ছিতি ছেলে। জান সীতারাম—এই বিধবার বেটা আর রাজার বেটা এদের মধ্যে তফাৎ নাই। ছোঁড়াটার মাথা খেলে ওর

মা। আমি একদিন পা টিপে দিতে বলেছিলাম—তা হারামজাদা সে তো দিলেই না, উল্‌টে মায়ের কাছে গিয়ে লাগিয়েছে। মা আবার কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছে রাণীমায়ের কাছে। অতি বজ্জাত।

সীতারামও তাই ভাবত। হঠাৎ একদিন তার ভুল ভেঙে গেল। সে চমকে গেল। সে আবিষ্কার করলে—দরিদ্র কুশিক্ষার মালিন্যের মধ্য থেকে তার বুদ্ধির হীরকদীপ্তি।

শীতকাল। ছেলেটা দেবু-শ্যামুর পড়ার ঘরের বাইরে দরজার পাশে দোলাই গায়ে মুড়ি খাচ্ছিল। শ্যাম-দেবু অঙ্ক কষছিল—সে নিজে বই পড়ছিল। অঙ্ক সেরে শ্যামু বললে—স্যার, এইবার প্রাইজের কবিতাটি মুখস্থ করি।

ইস্কুলে প্রাইজ হবে, শ্যামু রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা আবৃত্তি করবে। তাই নিয়ে সে মেতে উঠেছে। সীতারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—পড়। তাই পড়। তার ইস্কুলে প্রাইজ হয় না। হবেও না।

শ্যামু আরম্ভ করলে পড়তে। পড়া শেষ করে তারা বাড়ি চলে গেল। সীতারাম তেল মাখতে বসলে। হঠাৎ তার কানে এল বাইরে দরজার পাশে বসে ঐ ছেলেটি আপন মনে আবৃত্তি করে যাচ্ছে—

ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। জয়ধর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছে! সে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বললে—এ তুই কি করে শিখলি?

ছেলেটা ঝকমকে চোখ তুলে বললে—শুনে শিখলাম। মেজবাবু যে পড়ছিল। ঘরে যে বক্তৃতা করে পড়ে।

শুনে শুনে শিখেছিস?

হ্যাঁ।

কই বল্—বল্। কতটা শিখেছিস।

জয়ধর অনেকটা আবৃত্তি করে গেল। শেষে—

পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার—

এই পর্যন্ত আবৃত্তি করে হেসে বললে—

আর পারি নাই শিখতে।

সীতারাম উৎসাহিত হয়ে বলে গেল—

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

জয়ধরও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে গেল। সীতারাম তাকে প্রশ্ন করলে—আর কিছু শিখেছিস ?

কয়েকটা কবিতাই সে আবৃত্তি করলে। এগুলি দেবুর পাঠ্যপুস্তকের কবিতা।

সীতারাম জয়ধরের হাত ধরে বললে—সোনা ছেলে রে তুই, মানিক ছেলে! সে তাকে তেলমাখা গায়েই কোলে তুলে নিলে। অদ্ভুত ছেলে। শ্রুতিধর। বললে—আমার সঙ্গে পাঠশালায় যাবি চল। আমি তোকে পড়াব। বই স্লেট সব কিনে দোব। জামা কাপড় দোব। তুই জজ ম্যাজিস্ট্রেট্‌ হবি।

সেই দিনই সে তাকে এনে পাঠশালায় ভর্তি করে নিয়েছে। বই দিয়েছে। স্লেট দিয়েছে। জামা কাপড় দিয়েছে। তা ছাড়াও রোজ সকালে বাড়ি থেকে আসবার সময় সে আধ সের বাড়ির দুধ এনে জয়ধরের মায়ের হাতে দেয়।—খাওয়াবে জয়ধরকে।

ছোট ছেলে—সে দেহে বাড়বে—মনে বাড়বে—তার এখন বাড়বার সময়। কিন্তু পুষ্টি না পেলে বাড়বে কি করে? দুধ হল অমৃত। সে দেহ পুষ্ট করবে, লাবণ্য দেবে, মেধা বৃদ্ধি করবে। শুধু ভাত মুড়ি খেয়ে বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে পারবে কেন ?

আশ্চর্যের কথা, বদমাশ জয়ধর—ওই প্রথম দিনের বুকে তুলে আদর করার পর থেকেই যেন পাল্টে গেল। বললে না—পড়ব না!—হি-হি করে হাসলে না। প্রথম দিনেই সীতারাম দেখলে—অ-আ ক-খও জানে। খানিকটা চেনেও। মাস কয়েকের মধ্যেই ছেলেটা দ্রুতগতিতে এগুতে শুরু করলে। এখন জয়ধর ছুটছে! ছুটছে! অদ্ভুত ছেলে! সীতারাম মধ্যে মধ্যে বলে—জয়ধর আমার সন্দীপন পাঠশালার জয়ধ্বজা।

সময় সময় মনে হয়, তার ভাগ্যটা এখন ভাল চলছে। দীর্ঘদিনের পর একখানা চালা-ঘর সে তৈরি করিয়েছে। আটচালার মত শুধু একটা ছাউনি। ব্ল্যাক-বোর্ডখানা এনে লাগানো হয়েছে। ঘড়ি ম্যাপ—এগুলি এখনও টাঙাতে সাহস হয় না। চারিদিক খোলা, যদি কেউ নিয়ে যায় বা ভেঙে দিয়ে যায়! শিবকিঙ্করের দল এখনও আছে। তাদের অবশ্য আক্রোশ আর পূর্বের মত নাই, দীর্ঘদিনে তা হীনবল না হলেও, ক্রমশ যেন তাদের এই উৎসাহ শিথিল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীর গতিতে মণিবাবুর দীপ্তিও যেন ম্লান হয়ে এসেছে।

সীতারাম স্পষ্ট দেখতে পায়, শুধু মণিবাবু নয়, এই রত্নহাটার বাবুদেরই যেন সমস্ত বাহিরঙ্গটার চেহারা ক্রমশ ময়লা কাপড়-জামার মত হয়ে আসছে। প্রণাম গান্ধী মহারাজ, প্রণাম দেশবন্ধু, প্রণাম যতীন্দ্রমোহন, প্রণাম সুভাষচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে ধীরানন্দকেও সে প্রণাম করে। তোমাকেও প্রণাম। তুমিই তো এখানকার মান রেখেছ। এই স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে বাবুদের চেহারায় যেন কালের ছাপ পড়েছে। জমিদারদের,

মহাজনদের, সায়েব-সুবো-ঘেঁষা যারা, তারা যেন আগেকার আমলের শুভঙ্করী অঙ্করীতির মত পাঠ্যপুস্তক হতে বাদ যেতে বসেছে। তিন পাইয়ে এক পয়সার চলন হওয়ায় কড়া-গণ্ডার হিসেবের মত মান হারিয়েছে। হাল আমলে চলতি কথায় বই লেখার চলন হওয়ায় সে আমলের বিদ্যাসাগরী বড় বড় কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে লেখা বইয়ের মত অপ্রচলিত হয়ে যেতে বসছে বাবুরা। সীতারাম বেশ জানে যে, এ গ্রামের প্রধান জন এর পর হবে এই ধীরানন্দ সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ নাই। দীর্ঘজীবী হোক ধীরাবাবু। তাতে তার পরম আনন্দ। ধীরাবাবুরা তাদের জমিদার বলে আনন্দ নয়, ধীরাবাবু তাকে প্রীতির চোখে দেখেছিল, সে তাকে ভালবাসে, তাই তার আনন্দ। আঃ, ধীরাবাবু যদি তার বন্ধু না হয়ে তার ছাত্র হত তবে তার আনন্দ হত সব চেয়ে বেশী।

ধীরাবাবু আসবে—সেই পথ চেয়ে আছে সে। তার উন্নতি হচ্ছে কিন্তু তারও মধ্যে এড্ না-পাওয়ার দুঃখ অহরহ তাকে কষ্ট দেয়। রজনীবাবু বলেছিলেন, ভোটে রায়বাহাদুরকে সাহায্য করতে; সে তা করেছিল। কিন্তু তবু তার এড্ হয় নাই। হাজার হলেও রায়বাহাদুর! ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব, পুলিস সাহেবকে চটিয়ে তিনি কিছুই করতে সাহস করেন না। ধীরাবাবু এলে, তাঁকে নিয়ে সে একবার এর জন্য লড়বে। ধীরাবাবু ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর আবার কিছুদিন তাকে পুলিস নজরবন্দী করে রেখেছিল। তা থেকেও ধীরাবাবু খালাস পেয়েছে। এখানে কিন্তু আসে নাই। মা গিয়েছিলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। দেবু শ্যামুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মা ফিরে এসেছেন গম্ভীর মুখ নিয়ে। দেবু এবং শ্যামু কেঁদেছিল, এখনও মধ্যে মধ্যে কাঁদে। দাদা বাড়ি আসবে না।

ধীরাবাবু এখানকার সম্পত্তির সঙ্গেও সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে। তার অংশের সম্পত্তি ভাইদের দিয়েছে।

দেবুই হঠাৎ একদিন বলে ফেলেছে, দাদা সেখানে একজন কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করেছে। বউদিদি বি. এ. পাস। তাই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া।

চমকে উঠেছিল সীতারাম।

দেবু বলেছিল, বলবেন না, মা তাহলে আমাকে বকবেন।

আশ্চর্য শিক্ষা! আশ্চর্য ধৈর্য মায়ের। একদিন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই মা। এই ছোট ছেলে, এরাও না।

এক-একবার সীতারামের মনে হয়, মাকে সে বলে, জোড়হাত করে অনুরোধ করে, ধীরাবাবুকে, তার বউকে নিয়ে আসুন। না হোক বউ আপনার স্বজাতির মেয়ে; সে লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তাকে আনুন, ঘর আপনার উজ্জ্বল হবে, হেসে উঠবে, পবিত্র হবে। সকল জাত ছাড়া আরও দুটো জাত সংসারে আছে—শিক্ষিত আর অশিক্ষিত। আপনার

ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলের বউয়ের জাতের কোন তফাৎ নাই। ধীরাবাবু শিক্ষিত, বউও শিক্ষিত। তারা সত্যিই এক জাতের। এ কথা আমি বুঝেছি প্রাণ দিয়ে।

সে কথা বলতে কিন্তু সাহস হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এখনও ইচ্ছা হয়। সে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে। সে জানে, যতই স্নেহ করুন, তবু এঁদের সঙ্গে তার অনেক তফাত। ভাবতে ভাবতে সে উদাস স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। হঠাৎ একসময়ে কানে আসে, ছেলেরা গোলমাল করছে। তার অন্যমনস্কতার সুযোগে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে নিজেকে সংযত করে সজাগ হয়ে বসে, বলে, এই! এই! চুপ। পড়, পড় সব।

সাধারণ ছেলেরা পড়ায় মন দেয়। দুটি বাবুদের ছেলে সামনে এনে হাজির করে তাদের অভিযোগ।

—ও স্যার্ আমাকে মারলে। ঘুষি মেরেছে।

—ও আমাকে উল্লুক বলেছে স্যার্। দুটিই বাবুদের ছেলে।

সীতারামের ইচ্ছা হয় ওদের দুর্দান্তভাবে প্রহার করতে। তার দুর্ভাগ্য, বাবুদের যত দুষ্ট ছেলেগুলি হাই-স্কুলের পাঠশালার উচ্ছিষ্টের মত তার পাঠশালায় এসে জমে; তার ইচ্ছা হয়, চিৎকার করে বলে, ওরে, তোরা বাবুদের ছেলে, তোদের ঘরে ভাত আছে সিন্দুকে টাকা আছে। মান-ইজ্জৎ দালান-কোঠার ইঁটে চুনে চাপা হয়ে মজুত আছে, তোদের এতে দরকার কি? কেন গরীবদের ছেলের পড়ায় ব্যাঘাত করিস? আকু এসে তাকে পরিত্রাণ করে। সে ছাড়িয়ে দেয় ওদের। তার পিছনে খোঁড়া গোবিন্দ। গোবিন্দ চিৎকার করে।—এ চিৎকার গোবিন্দের অভিনয়। সীতারামের রাগ জল করে দিয়ে তাকে হাসাবার জন্যই সে এ অভিনয় করে। একেবারে প্রহ্লাদের গুরু ষণ্ডামার্কের মত—মেরেই ফেলব! খেয়ে ফেলব! ভাতে সেদ্ধ করে খাব! গরু-পেটা করব! উল্লুক-পেটা করব! সীতারামকে শেষ পর্যন্ত হাসতে হয়।

এখন পাঠশালায় ছেলে হয়েছে বাইশটি। আরও বাড়বে সে জানে। কৈবর্তদের মধ্যে, সাহা-স্বর্ণকারদের মধ্যে লেখাপড়ার ঝোঁক চেপেছে।

কখনও কখনও তার এই উদাসীনতা ভেঙে দেয় জয়ধর।

—মাস্টার মশাই!

—অ্যাঁ!

—এইখানটা দেখুন।

সাদরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে সীতারাম হেসে বলে, কোন্‌খানটা বৎস?

—এই যে।

সীতারাম তাকে বলে, বসো, এইখানে বসো। তারপর সে তাকে বুঝাতে আরম্ভ করে। কোনদিন সে আসে, মাস্টার মশাই, এই অঙ্কটা বইয়ের উত্তরের সঙ্গে মিলছে না।

সীতারাম ভাল করে দেখে জয়ধরের কষা অঙ্ক। কোনখানে ভুল নাই। নিজে কষে

দেখে একবার। জয়ধরের উত্তরের সঙ্গেই মিলে যায়। সে বলে, উত্তর ভুল আছে। কেটে তোমার উত্তর বসিয়ে দাও। তারপর সে অদ্ভুত ভাষায় জয়ধরকে আদর করে।—ওরে কুরকুরির মা! ভুরভুরির ছা! এর মানে যে কি সে তা জানে না। শিখেছে তার পণ্ডিতের কাছে হুগলীতে। তিনিও খুশী হলে এই বলে আদর করতেন। সেও করে। প্রাণ খুলে অকারণে হাসে। সব চেয়ে তার বড় আনন্দ, জয়ধর নিতান্ত গরীব ছেলে, বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে।

জয়ধর ছোট থেকে বড় হবে। সামান্য জয়ধর অসামান্য অসাধারণ হয়ে উঠবে—এই তার বড় আনন্দ। সে এই বাবুদের ছেলে হলে এত আনন্দ তার হত না। মধ্যে মধ্যে তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়, ওরে, ওরে তোরা বাবুদের ছেলেরা, তোরা দেখ্। তোরা দেখ্।

জয়ধর যে বৃত্তি পাবে, তাতে তার সন্দেহ নাই। জয়ধর পড়ে, নির্ভুল উত্তর দেয়, অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় ফুটে ওঠে তার পড়াশুনার মধ্যে। মধ্যে দেবুর পড়াশুনায় অমনোযোগ লক্ষ্য করে তার দুঃখের বদলে আনন্দ হয়। একদিন এই বাড়ির ঝিয়ের ছেলে জয়ধর, এ বাড়ির অন্যতম উত্তরাধিকারীকে ম্লান করে দিয়ে ফুটে উঠবে। পরক্ষণেই সে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হয়। না, এমন কামনা করা তার উচিত নয়। কামনা না করলেও, অবশ্য তাই যে হবে সে তা জানে; তবু কল্পনায় আনন্দ অনুভব করা তার পক্ষে অন্যায় হবে। এ বাড়ির কাছে তার ঋণ অনেক। হঠাৎ একটা ছেলের কান্নায় তার চিন্তার আনন্দ-স্বপ্ন ভেঙে গেল।

মরেছে রে, মরেছে! একটা ছেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কি হল? ওরে, এই রাধাশ্যাম, কি হল? কে মারলে?

রাধাশ্যাম ধীবরদের ছেলে। নাক দিয়ে দরদরধারে রক্ত পড়ছে। একদণ্ড শান্তি যদি আছে অদৃষ্টে। কে মারলে? গোবরা বুঝি?

—না স্যার্।—আকু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে। সে শুশ্রূষা করছিল রাধাশ্যামের, বললে, নাকে পেন্সিল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—পেন্সিল?

—হ্যাঁ। এত বড় একটা স্লেট-পেন্সিল নাকে ঢুকিয়ে ঠেলে দিয়েছে।

—কি বিপদ! সীতারাম ব্যস্ত হয়ে ছেলেটিকে নিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে মনে হল। কিন্তু উপায় করলে আকু। বললে, নস্যি দেন স্যার, হাঁচলেই বেরিয়ে যাবে। কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল সীতারামের। আকু তার নস্যির কৌটাটা সীতারামের হাতে দিলে।

গোবিন্দ ঠিক এই সময় এল; খোঁড়া পায়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, সাব-ইনস্পেক্টার

আসছে পণ্ডিত।

—স্যার্‌!

সাব-ইন্‌স্পেক্টার! তার জন্য সীতারাম ব্যস্ত হল না। এড্‌ই পায় না। তার পাঠশালাকে মঞ্জুরই দেয় নাই আজও পর্যন্ত; সাব-ইন্‌স্পেক্টারের জন্য ব্যস্ত হওয়ার তার তাগিদ কিসের? তার চেয়েও তাগিদ, রাধাশ্যামের নাকে রক্ত পড়ছে। নাকে নস্য দিয়ে দিলে সীতারাম।

বাইরে বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেটা ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল পেন্সিলটা। বাইসিক্লের ঘণ্টাটা আবার বাজল। সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবু বাইরে থেকেই ডাকছেন, পণ্ডিত! সীতারাম! নতুন সাব-ইন্‌স্পেক্টার অম্বলের রোগী, গুলপ্রিয়, আধুনিক-লেখকবিরাগী সাব-ইন্‌স্পেক্টার।

সাব-ইন্‌স্পেক্টার কিন্তু ভাল খবর নিয়ে এসেছেন। নতুন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ইলেক্‌শন হয়েছে আবার কিছুদিন আগে। ইলেক্‌শনের ফল বেরিয়েছে। এবার রায়বাহাদুরের দল হেরে গিয়েছেন। কংগ্রেস জিতেছে প্রায় সব থানাতেই। সাব-ইন্‌স্পেক্টার হেসে বললেন, এইবার তোমার উপায় হবে সীতারাম।

—উপায় হবে? সীতারাম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

—হবে হে হবে। এই নতুন বোর্ড হবার অপেক্ষা।

সীতারাম প্রণাম করলে সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে।

সাব-ইন্‌স্পেক্টার বললেন, পণ্ডিত, আমরা সরকারী চাকরি করি, চাকরির দায়ে আমরা নিজেকে বেচেছি। দেশের হয়ে কথা বলবার উপায় নাই। তোমার উপর যেসব কাণ্ড হয়েছে সামান্য অপরাধে, তাতে দুঃখই পেয়েছি মনে মনে; কিন্তু করতে তো কিছু পারি নাই। রজনীবাবু বার বার করে তোমার কথা বলে গিয়েছিলেন আমাকে—তা এইবার হবে। বোর্ড ফর্ম হলে পর চেয়ারম্যানের কানে একবার তুলতে পারলে হল। তোমার ইস্কুলের ছাত্রেরা বলেছে, মহাত্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। চেয়ারম্যান ডবল গ্র্যাণ্ট দেবেন তোমার পাঠশালায়। আমি চেষ্টা করছি ব্যাপারটা তাঁর কানে তুলতে।

প্রবীণ ইস্কুল সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুটি লোক ভাল। রজনীবাবুর মতই ভাল লোক। ভদ্রলোক রুগ্ন বলে মধ্যে মধ্যে অকারণে চটে ওঠেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যান। এক হিসেবে রজনীবাবুর চেয়েও ভাল, অন্তত পণ্ডিতদের পক্ষে ভাল। পণ্ডিতদের হয়ে তিনি উপরের সঙ্গে বাদানুবাদ করেন।

সীতারাম আজ শুধু খুশীই হল না, সে নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ করল সাব-ইন্‌স্পেক্টারের

কাছে। পরের দিনই সকালে সে সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুর বাসায় উপস্থিত হল বড় একটি ওল হাতে নিয়ে। সকৃতজ্ঞভাবে নামিয়ে দিয়ে বললে, আমার বাড়িতে হয়েছিল স্যার।

সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন, চমৎকার, চমৎকার ওল! চমৎকার! তিনি নিত্য ওলসিদ্ধ খান। যেখানেই যান খোঁজ করেন, পণ্ডিত, তোমাদের এখানে এখন ভাল ওল পাওয়া যায়? আজ সীতারামের হাতের ওল দেখে তিনি নিজেই গলে গেলেন। বাঃ বাঃ বাঃ!

তারপর ওলটি রেখে এসে বললেন, বসো সীতারাম, ফাইলটাই তোমাকে দেখাই। দেখ, আমি কত লিখেছি তোমার জন্য। হয়ে যাবে, আমি বলছি, হয়ে যাবে তোমার। তারপর আর একটি খবর দিই চুপি-চুপি। কংগ্রেসী বোর্ডের যিনি চেয়ারম্যান হবেন—তিনি তোমার ধীরাবাবুকে বড় ভালবাসেন যে। তাঁর মত হল, ধীরানন্দ একটা দিগ্‌গজ লেখক। কবে নাকি রবি ঠাকুরের কাছে গেছিলেন, রবি ঠাকুর তাঁকে বলেছেন—ওঁর মধ্যে জিনিস আছে। বুঝেছ? ধীরাবাবুর জন্যে তোমার গ্র্যাণ্ট গিয়েছে, সে গ্র্যাণ্ট এবার ডবল হয়ে ফিরবে। হাসতে লাগলেন তিনি।

সীতারাম আশান্বিত হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে সেই দিনের। সেইটাই হবে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আশান্বিত দৃষ্টিতে সে ভবিষ্যতের দিকে চায়।

কচি কচি মুখ নিয়ে বসে পড়বে তারা। আসুক সে দিন, ঘর তুলবে সে পাঠশালার জন্য। পাকা মেঝে। বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে ওদের জন্য। চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, ক্লক-ঘড়ি, ম্যাপ, গ্লোব, চক-পেন্সিল, ডাস্টার—কত আসবাব করতে হবে। সে বললে—তবে আমি আজ যাই।—দাঁড়াও। একটি দু'আনি দিয়ে সাব-ইন্‌স্পেক্টার বললেন—এটি নিয়ে যাও। ওলের দাম। উঁহুঁ, নিতেই হবে। না হলে ঘুষ নেওয়া হবে আমার।

বিচিত্র মানুষ।

বৈকালে সে ঝরনার ধারে গিয়ে অভ্যাসমত বসল। আজ সে কল্পনাকে খাঁচার দোর খুলে পাখির মত উড়িয়ে দিলে। এড্ পাবে সে এইবার। তার সাধ পূর্ণ হবে। সে যেন পণ্ডিত-দের সামনে এতদিন একঘরে হয়ে ছিল। এইবার সে জাতে উঠবে। ঘাট মেনে, অপরাধ স্বীকার করে জাতে ওঠা নয়। নিজের জেদ বজায় রেখে সে জাতে উঠবে। ভবিষ্যতের পাঠশালার জমজমাট চেহারা সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

"সন্দীপন পাঠশালা। রত্নহাটা। শিক্ষক—শ্রীসীতারাম পাল।" বর্ষায় রৌদ্রে লেখা ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে আসবে। বৎসর বৎসর তার উপর সে কালি দিয়ে নূতন করে লিখবে। তার চুল সাদা হয়ে আসবে, দৃষ্টি কমে আসবে, চশমা নিয়ে সে পড়াবে। ছেলেরা বসে পড়বে। কচি কচি মুখ। একদল যাবে আর একদল আসবে। তাদের পড়ানো শেষ করিয়ে আশীর্বাদ করবে, আমার তো দুঃখেরই জীবন, দুঃখকষ্টের ভাগ্য নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

তোমরা কিন্তু উন্নতি কর, সুখী হও। সেই দেখেই সব চেয়ে বড় সুখ পাব আমি।

সংসারের কষ্ট তার সত্যিই কিছু বেড়েছে। কিছু বেড়েই ক্ষান্ত নাই, দিন দিন বাড়ছে। বাপের শ্রাদ্ধের সময় কিছু ঋণ করেছিল, ভেবেছিল, পাঠশালার আয়টাই সে মাসে মাসে দিয়ে যাবে। তাতে অন্তত সুদটা মিটে থাকবে। কিন্তু তাও হয় নাই। পাঠশালার আয়ই বা কি ছিল তার এতদিন! অন্যদিকে ধানের দর নেমে যাচ্ছে দিন দিন। অল্পস্বল্প জমির আয় আরও কমছে। এড্‌টা পেলে এবার কিছু সুবিধা হবে। মাসে পাঁচ টাকা আয়বৃদ্ধি তো তার মত লোকের পক্ষে কম নয়!

পরক্ষণেই তার হাসি গেল। পাঁচ টাকা! হায় রে! দুনিয়া পাল্‌টাচ্ছে দিন দিন। বাজারের পথে যেতে গেলে নিত্য নতুন জিনিস চোখে পড়ে। মন যেন কাঙাল হয়ে ওঠে। পাঁচ টাকা আয় বাড়লে, তার একটা কণাও কি সে পেতে পারবে? মধ্যে মধ্যে কত জিনিস কিনতে সাধ হয়। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নিজের মনকে শাসন করে, তুমি পাঠশালার পণ্ডিত, তুমি ওদিকে তাকিও না। "ছোট ঘরে বড় মন নিয়ে" জীবন কাটাতে হবে তোমাকে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবনাটা তার সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। সে ভাবে ভবিষ্যতের কথা। কন্যার বিবাহ আছে। তার এবং মনোরমার জীবনে অসুখ-বিসুখ আছে। সে-ই যদি অসুখে কয়েক মাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে, তবে!

মনে পড়ে যায়, রজনীবাবুর আপিসে কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথাগুলো। বৃদ্ধ পণ্ডিত টাকার অভাবে বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁরই সমবয়সী এক বৃদ্ধের সঙ্গে। কন্যাটি বিধবা হয়েছে। তার সৎ-ছেলেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটি এখন কোথাও বাবুদের বাড়িতে ভাত রান্না করে। বুড়ো পণ্ডিতের নিজের অবস্থাও এখন শোচনীয়। তার পণ্ডিতি করার সামর্থ্য গিয়েছে; সে এখন ভিক্ষা করে। গ্রামে গ্রামে ফেরে, অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে দুদিন একদিন থাকে, স্তব-স্তুতি করে দু আনা চার আনা নিয়ে পনেরো বিশ দিন অন্তর বাড়ি যায়।

সে শিউরে ওঠে। তারও কি শেষ পর্যন্ত এমনই দশা হবে? একমাত্র সান্ত্বনা, তার কিছু জমি আছে। আর সান্ত্বনা, সন্তান ওই একটি কন্যা ছাড়া আর হল না। তার বড় সাধ ছিল একটি পুত্র-সন্তানের। তাকে সে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলত। কিন্তু সে থাক্। ভগবান আর যেন কোন শিশুকে তার ঘরে না পাঠান। দরিদ্র শিক্ষক সে, কোন্ সম্বল থেকে তাকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে!

কল্পনা-চিন্তার মধ্যে অকস্মাৎ তার মন সচেতন হয়ে ওঠে। কোনদিন মাথার উপর দিয়ে পেঁচা ডেকে যায়, কোনদিন মাথার উপর বাদুড়ের পাখার শব্দ বেজে ওঠে, কোনদিন কাছেই ডেকে ওঠে শেয়াল। সে সচেতন হয়ে উঠে আকাশের দিকে তাকায়। অন্ধকার আকাশ, কষ্টিপাথরের মত কালো আকাশে তারা ফুটে উঠেছে। চাঁদনী রাত্রে জ্যোৎস্নায়

ঝলমল করে চারিদিক; মাটির উপর তার ছায়া পড়েছে দেখা যায়। তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, আলোক-প্রতিবিম্বিত একটি পর্দাটাঙানো জানলা, পর্দার উপর কালো ছায়ায় জেগে রয়েছে—একখানি মুখ, টিকলো নাক, পিছনের দিকে আল্‌গা বাঁধা এলোখোঁপা। সে হাঁটতে আরম্ভ করে। এসে দাঁড়ায় বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে ফিরে আসে।

আজকাল সন্ধ্যায় তার অবসর হয়েছে। শ্যাম্ অনেক আগেই রাত্রে অন্য মাস্টারের কাছে ইংরেজী পড়া শুরু করেছে, কিছুদিন হল দেবুও সেখানে পড়তে যাচ্ছে। আজকাল সে বেশ অবসর করে এই ছবিখানি দেখতে পায়।

মনোরমা অনুযোগ করে, রাত্রে যখন পড়াতে হয় না, তখন ছুটির পর বাড়ি এলেই পার।

সীতারাম বলে, দিনে পাঠশালায় চাকরি, তার উপর বাড়ির চাকরি। এইটুকু ছুটি দেবে না আমাকে ?

কিষাণ-বউটা আপনার পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, বলি পণ্ডিত মুনিব।

—কি ?

—বলি এইবার তাহলে মেনে-টেনে নিলে তুমি ?

—কি মেনে নিলাম ? হাসে সীতারাম।

—এই, মুনিব্যানের মালিকি-টালিকি ? মুনিব্যান যা বলবে-টলবে তাই মানবে ? এইবার তবে পরিবারকে হুজুর বললে।

মনোরমা হাসে, মর্ তুই।

সীতারাম বলে, তোকে যে বললাম, তোর ছেলেটার ভারি বুদ্ধি, ওকে দে পাঠশালায়। তা কি হল ?

—ওই দেখ। বাউড়ীর ছেলে পড়ে-টড়ে তো আর হাকিম-টাকিম হবে না। মিছে সময়-টময় নষ্ট-মষ্ট করে কি হবে ?

সীতারাম এবার রসিকতা করে তাকে বলে—তবে তুই ভর্তি হ' আমার পাঠশালায়। তোর যে রকম বুদ্ধি-টুদ্ধি তুই বৃত্তি-মৃত্তি পাবি-টাবি। ওঃ, যা ধরেছিস-টরেছিস তুই আমাকে আজ! সে হাসতে লাগল।

চোদ্দ

আরও বৎসর দুয়েক পর।

সীতারামের মনে হল, পৃথিবীতে তার চেয়ে সুখী আর বোধ হয় কেউ নাই। মনে হল, এই দিনটির জন্য বোধ হয় সে আজন্ম তপস্যা করেছিল।

মণিলালবাবু এলেন তার পাঠশালায়। তার আগে বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। দুঃখের পর এল সুখের পালা। প্রথমেই জয়ধর পেলে বৃত্তি। জেলার মধ্যে হল প্রথম। সে রেকর্ড মার্ক পেয়েছে। তারপরই হল পাঠশালার জয়জয়কার। মণিবাবু এলেন সেই জয়জয়কারের পর।

পাঠশালা তখন মঞ্জুরী পেয়েছে, গ্র্যাণ্ট পেয়েছে। পাঠশালার বাড়িও হয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নিজে এলেন তার পাঠশালায়। ধীরাবাবু দীর্ঘজীবী হোন। ধীরাবাবুই নিয়ে এলেন।

এসবের আগে হঠাৎ একদিন এসেছিলেন ধীরাবাবু। একাই এসেছিলেন। মা চিঠি লিখেছিলেন, একবার দেখতে ইচ্ছা হয় তোকে ; তবে একাই আসবি।

ধীরাবাবু, সেই ধীরাবাবু!

সীতারামকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, পণ্ডিত, তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

ধীরাবাবু তাকে ভালবাসে শুনে সে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। কত কথা বলেছিল, তার নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা। তারপর সে ধীরাবাবুকে তাঁর বউয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।—বউদি। কেন আনলেন না তাঁকে ?

—তিনি তো চাকরি করেন। তিনি ঢাকায় গার্ল্‌স ইস্কুলের মাস্টার। আমি কলকাতায় থাকি। ছোট একটা মেসে থাকি এখন। আগে একটা টিনের ঘরে থাকতাম, পাইস-হোটেলে খেতাম।

—টিনের ঘরে থাকতেন ? পাইস-হোটেলে খেতেন ?

—হ্যাঁ। তখন যেমন উপার্জন তেমনই ছিলাম পণ্ডিত। জান তো, লিখে উপার্জন করা আমাদের দেশে কত কঠিন! হাসলেন তিনি।

ধীরাবাবু লেখক হবেন। বই লিখে তিনি জীবিকা অর্জন করতে চান। আশ্চর্য মানুষ। ধীরাবাবু তাঁর ক'খানা বই তাকে দিয়ে গিয়েছেন। সে পড়েছে। বেশ লিখেছেন, চমৎকার লিখেছেন ধীরাবাবু। বিয়ে করেছেন—স্ত্রী চাকরি করে। অথচ তাঁর বাড়িতে অন্নের অভাব নাই। বিচিত্র।

বই ক'খানা হাতে পেয়ে সেদিন তার লজ্জার অবধি ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল, ধীরাবাবুর সেই বই ক'খানা আজও তার বাড়িতে রয়েছে। একবার মনে হয়েছিল, ধীরাবাবুর দুটি হাতে ধরে সে সে-কথা প্রকাশ করে তাঁর কাছে। কিন্তু সেও সে পারে

নাই। সেই সমস্ত বইয়ের একখানার খোঁজও করেছিলেন ধীরাবাবু—বইখানা যেন কিনেছিলাম মনে হচ্ছে।

সীতারাম বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়েছিল, অনেক চেষ্টা করে বলতে চেয়েছিল, আমি একবার দেখব আমার বাড়িটা খুঁজে? কিন্তু সে দুবার শুধু বলেছিল, আমি, আমি—

ধীরাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, দেবা, না হয় শ্যামা কোনখানে দিয়ে থাকবে আর কি!

ধীরাবাবুই নিয়ে এলেন ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যানকে। কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করে বই আনলেন সন্দীপন পাঠশালায় প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের জন্য। নিজে গিয়ে চেয়ারম্যানকে নিয়ে এলেন।

সীতারাম পাঠশালার রিপোর্ট লিখেছিল। ধীরাবাবু দেখে দিলেন। কম্পিতকণ্ঠে সে রিপোর্ট পড়লে। সন্দীপন নামের ইতিহাস পৌরাণিক। সীতারাম লিখেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরু। ধীরাবাবু কেটে করেছিলেন—"মহামানব শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনির পাঠশালার নামে এই পাঠশালার নামকরণ হইয়াছে।"

গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেকেই সেদিন এসেছিলেন। বড় ইস্কুলের মাস্টারেরাও উপস্থিত ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীও এসেছিলেন। কালো লম্বা মেয়েটি, একটু যেন বেশী কালো দেখাচ্ছিল। মেয়েটির জীবনেও যেন কোথাও দুঃখ আছে। হয়তো কালো বলে খানিকটা লজ্জাও আছে। চমৎকার সম্ভ্রমের সঙ্গে বসে ছিলেন সারাক্ষণ।

চেয়ারম্যান বলেছিলেন, যে পাঠশালার ছাত্র, ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে অহিংসা ও সত্যের প্রতিমূর্তি মহাত্মা গান্ধীর নাম করতে পারে, সে পাঠশালাকে আমি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি।

চেয়ারম্যান মাসে ছ টাকা এড্ মঞ্জুর করে দিয়েছেন। পাঠশালার বাড়ির জন্য এককালীন একশো টাকা দান দিয়েছেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে। আসবাবের জন্য ত্রিশ টাকা।

ঘর হয়েছে। আসবাবও কিছু হয়েছে। কিন্তু আরও চাই। সেও বোধ হয় হবে। গ্রামের লোক প্রসন্ন হয়েছে। চেয়ারম্যানের প্রশংসা পেয়েছে সে, তার জয়ধর তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে।

এবারও একটি ভাল ছেলে আছে—নরেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে। সেও বৃত্তি পাবে। এটি বাবুদের ছেলে। কিন্তু সীতারামের এতেও খুব আনন্দ এই কারণে যে, এই ছেলেটিকে বড় ইস্কুলের পাঠশালা থেকে প্রায় বর্জন করেছিল অপদার্থ হিসেবে। অপদার্থই ছিল। দুর্দান্ত ছেলে। কিন্তু ভারি সুন্দর চেহারা। চেহারা দেখে মমতা হয়েছিল বলেই সে তাকে নিয়েছিল। তারপর সে আবিষ্কার করলে, মিষ্ট কথা বললে ছেলেটি বড় ভাল। আরও আবিষ্কার করলে, মাইনের তাগাদা করলেই সে ইস্কুল কামাই আরম্ভ করে দেয়, তার দুর্দান্তপনা বেড়ে যায়। সে তার

মাইনে চাওয়া বন্ধ করে দিলে। ছেলেটা দেখতে দেখতে পাল্‌টে গেল। সে বৃত্তি পাবে।

সীতারাম তাকেই পড়াচ্ছিল। এই তার জয়ের দ্বিতীয় সোপান।

হঠাৎ মণিলালবাবু এলেন পাঠশালায়। এই সীতারামের পাঠশালা! বাঃ! বেশ। বেশ। এ যে বেশ করেছ হে!

সীতারাম তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একখানি চেয়ার এগিয়ে দিলে, বসুন, আপনি বসুন।

মণিবাবু বসলেন। নামটি তোমার খুব ভাল হয়েছে পণ্ডিত—সন্দীপন পাঠশালা। সম্যকরূপে দীপন, জীবন বহ্নিময় করা!

সীতারাম বললে, ও নাম আমার দেওয়া নয়। ধীরাবাবু দিয়েছিলেন।

—ধীরানন্দ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মণিবাবু বললেন, ছোকরা অবশ্য নামডাক করেছে শুনতে পাই। কিন্তু—। তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, বংশে কালি দিলে। কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করলে শেষটা! বউ নাকি আবার চাকরি করে!

সীতারাম চুপ করে রইল। কঠোর উত্তর তার জিভের ডগায় এসে ঘুরছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সে সংযত করলে। হাজার হোক মানী ব্যক্তি, তিনি এসেছেন ওর পাঠশালায়, তিনি অতিথি।

মণিলালবাবু কাকে যেন বললেন, কই রে? অ্যাঁ?

তাঁর চাকর এসে ঢুকল একটি ছেলের হাত ধরে।

মণিবাবুর পৌত্র; ওঁর ছেলে ধীরাবাবুর বয়সী, তিনি নিজে ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়েছেন : এটি তাঁরই ছেলে।

মণিবাবু বললেন, আমার এই পচুকে, শ্রীমান পঞ্চাননকে তোমার পাঠশালায় ভর্তি করে দিতে এলাম। নাও, ভর্তি করে নাও। আর একটা কথা। একে তোমাকে প্রাইভেটেও পড়াতে হবে। মোট কথা, গোড়াপত্তন করে দিতে হবে।

সীতারামের মনে হল, এমন শুভদিন আর বুঝি আসে নাই তার জীবনে। মণিবাবুকে প্রণাম করে পঞ্চাননকে ভর্তি করে নিলে সে। বললে, বাবু, প্রাইভেট পড়ানো আমার পক্ষে আর হবে না। তবে লোক আমি দেখে দোব।

মণিবাবু একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন, বললেন, আচ্ছা, তবে লোকই দেখে দিও। ভাল লোকই দেবে তা জানি। তবে তুমি সৎ লোক। তুমি হলেই ভাল হত।

সীতারাম চুপ করে রইল।

মণিলালবাবু চলে গেলেন। সীতারাম নোট করে রাখলে দিন-তারিখটি তার একখানি খাতায়। এই খাতায় সে লিখে রাখে তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলি। ধীরাবাবু তাকে বলে গিয়েছেন, মাস্টার, তোমাকে নিয়ে আমি বই লিখব। তুমি বুড়ো হও। আমি তখন

একদিন আসব। এসে তোমার জীবন-কথা শুনে যাব।

সীতারাম তাই খাতা বেঁধেছে। সে লিখে রাখে জীবনের স্মরণীয় ঘটনা এবং তারিখগুলি। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান যেদিন এসেছিলেন, সেই তারিখটি সে প্রথম লিখেছে। তারপর লিখেছে জয়ধরের বৃত্তি পাওয়ার তারিখ। মাত্র দুটি তারিখ লেখা হয়েছে। তার আগে—গোড়ার দিকে কাহিনীগুলি গুছিয়ে নিয়ে রেখেছে। তারও মধ্যে আছে কয়েকটি তারিখ। যে তারিখগুলি বাবুদের ঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল সেই তারিখগুলি। সাদা খাতাটা উল্টে মধ্যে মধ্যে তার হাসি পায়। আপনার মনেই হাসে। কি লিখবে ধীরাবাবু? জীবনের রঙে জৌলুস নাই, সুরে বাহার নাই, এ নিয়ে ছবি হয়, না এ নিয়ে গান হয়!

তবু লিখে রাখে। আজও রাখবে—৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬।

*　　　*　　　*　　　*

আট মাস পর।

১৯২৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর খাতা খুলে তারিখটা লিখলে সে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করলে।

পূজোর ছুটি হবে পরশু। আশ্বিন মাস, নীল আকাশে শরতের রৌদ্র ঝলমল করছিল। মধ্যে মধ্যে সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বকের ঝাঁক। অপরূপ প্রসন্নতায় যেন দিগ্‌দিগন্ত ভরে উঠেছে। কিন্তু সীতারামের হঠাৎ মনে হল, সব ম্লান হয়ে গেছে।

সীতারাম সেদিন তখন ছেলেদের কাছে চাঁদার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল, পূর্ববঙ্গে বন্যা হয়েছে, বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছে, বহু প্রাণহানি ঘটেছে, শস্য নষ্ট হয়েছে। বড় বড় নেতারা—সুভাষ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহায্যের জন্য দেশের কাছে হাত পেতেছেন। চারিদিকে চাঁদা উঠছে। বড় ইস্কুলে চাঁদা তুলছে। তোমরাও কিছু করে দাও। যে যা পারবে—দু আনা, চার আনা, যা পারবে। এখন থেকেই তো শিখতে হবে এসব। বড় জায়গা থেকে চাঁদা যাবে, তার সঙ্গে সন্দীপন পাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সাহায্য বলে কিছু পাঠাতে হবে বইকি। অন্তত পাঁচটা টাকা। যা পার তোমরা দাও, বাকিটা আমি দোব।

হঠাৎ আকু এসে ঢুকল। আকু এখন বেশী বখেছে। বিড়ি খায়, তামাক খায়, রাত্রে ফিষ্টি করে। এখানে আর বেশী আসে না। আড্ডা এখন স্টেশনে; কুলিদের হয়ে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে দরদস্তুর করে, ঝগড়াও করে; কুলিরা বিড়ি খাওয়ায়, চায়ের দাম দেয়, আকু তাতেই খুশী। মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় সে আসে, মাস্টার মশায়ের খোঁজখবর করে যায়। গ্রামের খোঁজখবরও দিয়ে যায় সীতারামকে। গোবিন্দও সরে গিয়েছে আকুর সঙ্গে। সে এখন আকুর অনুচর। শুধু রাত্রে এসে শুয়ে থাকে এখানে

সীতারাম তাকে দেখে হেসে প্রশ্ন করলে, কি খবর আকু?

আকু বিড়ি খাচ্ছিল, সেটা সে ফেললে না; ফেলে না আজকাল, সুকৌশলে হাতের আলগা মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। বিড়িটা লুকিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আকু বললে, মুশকিল হয়ে গেল স্যার্। খানিকটা দড়ি চাই। বিছানার চামড়ার বাঁধনটা ছিঁড়ে গেল।

হাসলে সীতারাম। পরোপকার করছে আকু।

আকু বললে, বিছানার ভেতরে রাজ্যের জিনিস ভরেছে। বললাম তখন, তা শুনলে না। লেখাপড়া শিখলে কি হবে! হাজার হলেও মেয়েলোক তো! ওই বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণি স্যার!

সীতারাম ব্যস্ত হয়ে উঠল, দড়ি—এই যে, এই দড়িটা নিয়ে যা। সে বার করে দিলে ছেলেদের জন্যে কেনা স্কিপিং-রোপের একটা দড়ি।

বেশ হবে। ভাল হবে। আকু বললে, খুব মায়া লাগল স্যার্, দিদিমণি অনেকদিন ছিল এখানে। চলে যাচ্ছে, আর তো এখানে আসবে না। আমার বোন পড়ে কিনা। তাকে দিয়ে আমাকে ডেকে বললে, আকু, তুমি যদি আমার যাওয়ার সময় একটু সাহায্য কর, কুলি ডেকে ঠিক করে দাও তো ভাল হয়। ভারি মায়া লাগল স্যার্। অনেকদিন ছিল আমাদের এখানে; আর তো আসবে না। শুনে দুঃখ হল। তাই দিলাম সব ঠিক করে। তা—পথে বিছানার চামড়া ছিঁড়ে গেল। গোবিন্দকে পাহারায় রেখে এসেছি।

সীতারামের মনে হল, শরৎকালের এই প্রসন্ন অপরাহ্নটা অকস্মাৎ ম্লান হয়ে গেল। চলে যাচ্ছেন! চলে যাচ্ছেন! সীতারাম অভিভূতের মত আকুর সঙ্গে বেরিয়ে এল।

ভাল চাকরি পেয়েছেন, তাই চলে যাচ্ছেন। রাস্তার উপর ছিঁড়ে পড়েছে বিছানাটা। আকু বাঁধতে লাগল বিছানা কুলিটাকে নিয়ে। গোবিন্দ কুড়িয়ে দিলে জিনিসগুলি। সীতারামও দিলে কয়েকটা। বিছানার মধ্যে সেই পর্দাটা বাঁধা। আকু চলে গেল। কিন্তু তিনি কই?

তিনি বোধ হয় অন্য রাস্তায় চলে গিয়েছেন স্টেশনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আলোকিত পর্দার গায়ে আর এ মুখ ভেসে উঠবে না কোনদিন। সে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

ট্রেন আসছে, ঘণ্টা পড়ছে। ঘড়িতে বাজছে তিনটে পনেরো। সীতারাম হঠাৎ ছুটে ফিরে গেল পাঠশালায়, হাতুড়িটা নিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে।

—ওরে, ছুটি আজ—ছুটি। আমার মনে ছিল না। একবার জংসনে যেতে হবে আমাকে। আজ ছুটি। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সে ছুটল। তাকে জংসনে যেতে হবে। যেতেই হবে।

ট্রেন এসে গিয়েছে। একখানা ফাঁকা ইণ্টার ক্লাসে তিনি উঠে বসে আছেন।

ইস্কুলের মেয়েরা এসেছে; তাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন, কথা বলছেন। সে ছুটে গিয়ে একখানা টিকিট কিনলে, জংসন, ইণ্টার ক্লাস একখানা। জংসন এখান থেকে সাত মাইল।

ওখানে গিয়ে এই লাইন শেষ হয়েছে। গাড়ি বদল করতে হবে ওখানে। সে চেপে বসল সেই কামরাটারই অন্য প্রান্তে। ট্রেন ছাড়ল।

উদাস দৃষ্টিতে মেয়েটি চেয়ে রয়েছে গ্রামের দিকে। ক্রমশ সে উদাসীনতা মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল নিরাসক্তি।

কালো লম্বা মেয়েটি; বকের পালকের মত সাদা ধোয়া খদ্দরের নীলপাড় শাড়ি পরনে, গায়ে আজ ফিকে লাল রঙের ব্লাউজ, পায়ে স্যাণ্ডেল; মাথায় ঘোমটা নাই, পরিচ্ছন্ন নিপুণতার সঙ্গে চুলগুলি এলোখোঁপায় বাঁধা। কাঁধে একটা খদ্দরের ঝোলা।

কয়েকবারই সীতারামের ইচ্ছা হল, একটি কথা বলে, বলে—চলে যাচ্ছেন আপনি? কিন্তু কিছুতেই পারলে না সে। না-না, সে পাঠশালার পণ্ডিত।

জংসন স্টেশনে কুলি ডেকে সে তাকে সাহায্য করবে ভাবলে। কিন্তু পারলে না। তিনি নিজেই ডেকে নিলেন কুলি। জিনিস চড়াবার সময়ও সে একবার এগিয়ে গেল, গিয়েও আবার পিছিয়ে এল। গাড়ি চলে গেল।

সে নোট-বইটা আবার একবার খুললে। ভেবেছিল, তারিখটা কেটে দেবে। কিন্তু না, থাক্‌। বরং আরও খানিকটা লিখলে।

জীবনে ছিল এক ফোঁটা রঙ, রাত্রে অন্ধকারে আব্‌ছায়ায় ফুটে থাকত আকাশের নীহারিকার মত; সেও মুছে গেল ১৯২৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। উদাস মনে সে ফিরে এসে বসল রত্নহাটার ট্রেনে। অনেক সময় হাতে। হঠাৎ মনে হল, এখানকার বইয়ের দোকান থেকে খানকয়েক বই কিনে নিলে হয় না! আজকাল সে পাঠশালায় পাঠ্য বইয়ের ব্যবসা করেছে। সব পণ্ডিতই করে। বছরে একবার, পাঁচ-সাত টাকা লাভ। মাসে দশ-পনেরো টাকা যাদের আয় তাদের কাছে বছরে পাঁচ-সাত টাকাই যে অনেক। খানকয়েক মানে-বই চাই। মানে-বইয়ে লাভ বেশি। এগুলোর বিক্রি সারা বছর।

কিন্তু না, থাক্‌। আজকের দিনটি তার জীবনের মালা থেকে পৃথক করে রাখা থাক্‌। আজ আর ওই কালো মেয়েটিকে ছাড়া আর কিছু ভাববে না। জীবনের গোপন কথা গোপন থাক্‌। বলবে শুধু ধীরাবাবুকে, সে তাকে নিয়ে বই লিখবে। কিন্তু এই কথাটুকু ছাড়া ধীরাবাবুকে সে কি বলবে?

কি লিখবে ধীরাবাবু?

লিখবে বইকি তার রঙহীন জীবনের কথা, তার সন্দীপন পাঠশালার কথা লিখবে ধীরাবাবু।

পনেরো

লিখবে—কচি কচি মুখ নিয়ে বাল-গোপালেরা চিরকাল সন্দীপন পাঠশালা আলো করে সারি দিয়ে বসে অমৃত-মধুর কণ্ঠের কলরবে মুখরিত করে পড়ে, অ, আ, হ্রস্য ই, দীর্ঘ্য ঈ।

—হ্যাঁ। তারপর, এটা কি? বল বল। হ্রস্ব—। ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেয় সীতারাম। আধ-আধ ভাষায় ছেলেটি বলে, হ্রস্য উ, দীর্ঘ্য উ।

—বাঃ, বাঃ! বল।

উৎসাহে কচি মুখ ভোরবেলার সূর্যের ছটা পড়া কচি পাতার মত ঝলমল করে ওঠে, সাদা চোখ ঝিকমিক করে ওঠে সবুজ ঘাসের পাতায় জমে-থাকা শিশিরবিন্দুর মত। সে পড়ে যায়, ঋ। এতা? এতা কি মাছায়?

—লিকার কেমন ডিগবাজী খায় এতা মাছায়।

ওদিকে পড়ে; অ আর চ আর ল, অচ—ল। অ ধ আর ম, অধ—ম।

—হ্যাঁ। ও দুটি যেন হবে না তুমি, বুঝলে?

—বর্গীয় জ, ল, প, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, জল পড়ে—জল পড়ে।

সীতারাম নিজে বলে, পয়ে আকার, তয়ে আকার, দন্ত ন, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, পাতা নড়ে—পাতা নড়ে। জল পড়ে, পাতা নড়ে। বর্গীয় জ, ট, দন্ত ন, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, জট নড়ে—জট নড়ে। কই, তোমার জটটি নেড়ে দাও দেখি একবার। ছেলেটির মাথায় বড় বড় চুল, তার মধ্যে দুটি জট তৈরী হয়েছে, দেবতার কাছে মানসিক আছে। এখানকার প্রচলিত আদরের ছড়া বলে সীতারাম তাকে আদর করে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে।

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে থাকে। এর মধ্যেই সে মাথার জটের জন্য লজ্জা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। সীতারাম নিজেই জট নেড়ে দেয় তার। বড় ক্লাসের ছেলেরা পড়ছে—

"আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর।"

তারা দাঁড়িয়ে সুর করে আবৃত্তি করে—

"কোন্ দেশের তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল

সোনার কমল ফোটে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ—"

—সীতারাম-ভাই ! ভাল আছ তো ?

—কে ? সীতারাম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। সেই পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায়। আঃ, এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর ! লোল-মাংস ঝুলে পড়ে দেহের হাড়গুলি প্রকট হয়ে উঠেছে, কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছেন, লাঠি ধরে পাঠশালার উঠানে এসে দাঁড়ালেন। পরনে ময়লা কালো কাপড়, তার মধ্যে বড় বড় সেলাইয়ের দাগগুলি কালো মাটির ফাটলের মত দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে নেমে গেল সীতারাম। আসুন, আসুন। কি ভাগ্য আমার !

—তোমার ভাগ্য !—হা-হা করে হাসলেন পণ্ডিত।

—ভাগ্য বইকি ! নিশ্চয়, এ আমার সৌভাগ্য।

—মঙ্গল হোক তোমার। ভালো লোক তুমি। এখন কিছু খাওয়াও দেখি ভাই। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। খাইয়ে সৌভাগ্যটা বাড়িয়ে নাও।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সীতারাম, ওরে ! গোবিন্দপদ, শোন্ তো বাবা।

পণ্ডিত বলেই যায়, জান তো ভিক্ষা করি, হ্যাঁ, ভিক্ষাই এক রকম। গৃহিণী খালাস পেয়েছেন। তা শ্রাদ্ধ তো একটা করতে হবে। তাই গিয়েছিলাম পলাশবুনি। হোক সব চাষীভূষী, এককালের ছাত্র তো সব। কিছু ভিক্ষা-টিক্ষা করে বাড়ি যাব। দুপুর হয়েছে বিশ্রাম চাই, ক্ষিদে তেষ্টাও পেয়েছে। তা একবার ভাবলাম, যাই বাবুদের ঠাকুরবাড়ি, কি কোন বাবুর বাড়ি। কিন্তু ইচ্ছা হল না। তোমার কথাই মনে হল। শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত ভিখিরী-ব্রাহ্মণ তো এক নয়। মনে হল, পাঠশালার পণ্ডিতস্য পাঠশালার পণ্ডিতং গতি। তাই এখানেই এলাম। বলে আবার হা-হা করে হাসতে লাগলেন পণ্ডিত।

এ হাসিতে সীতারাম লজ্জা পেলে। মনে হল, পণ্ডিত তার তোশামোদ করছেন। সে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে নিজেই একখানা খাতার মলাট দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলে। বললে, বেশ করেছেন। আমার যে কি আনন্দ হয়েছে আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সে কি বলব ? তেল আনাই, স্নান করুন।'

—স্নান ? তা—। পণ্ডিত নিজের গামছাখানা মেলে ধরে একবার দেখালেন। কাপড়ের চেয়েও ময়লা গামছাখানা ; তার উপর শতছিন্ন। দেখিয়ে বললেন, কাপড় তো নাই সঙ্গে। একখানা পরে স্নান করা। আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন পণ্ডিত। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, জানলে ভায়া, পলাশবুনিতে মাঠের পুকুরে গিয়ে দিগম্বর হয়েই, বুঝলে ? পণ্ডিতের হাসি আর থামে না।

খাতার মলাটখানা তাঁর হাতে দিয়ে সীতারাম বললে, আপনি ছেলেগুলোকে একটু

দেখবেন। আমি আসছি।

সে ফিরে এল একখানি নূতন কাপড় এবং শিশিতে খানিকটা তেল নিয়ে। বললে, তেল মাখুন। স্নান করে এই কাপড়খানা পরুন।

বুড়োর ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল।

পণ্ডিতকে বিদায় করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। পণ্ডিত নিজেই বলে গেলেন কথাটা, স্নান করে খেয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন, ভায়া, ছেলেদের কাছে দু পয়সা, চার পয়সা চাঁদা যদি তুলে দিতে। বোঝ তো, পত্নীদায়। মাতৃদায়, পিতৃদায় নয়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পত্নীদায়। বলে আবার হা-হা করে হাসলেন। ছেলেদের কাছ থেকে এক টাকা সাত আনা উঠল, সে নিজে এক টাকা এক আনা দিয়ে আড়াই টাকা পূর্ণ করে তাঁর হাতে দিল।

যাবার সময় পণ্ডিত বলে গেলেন, একটি কথা বলে যাই ভায়া। জান তো, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য। বুড়োর কথাটা মনে রেখো। এই বড় বড় দালান-কোঠা হয়, দেখেছ তো? তা রাজমিস্ত্রীতে গাঁথে, নকশা কাটে, কারিগুরি দেখায়, মাইনে নিয়ে বিদেয় হয়; বড়লোক বাস করে, বাড়ি হয় তাদের। তবু রাজমিস্ত্রীদের নাম মিস্ত্রীরা লিখে রেখে যায়—ওমুক রাজ, এত শো এত সাল, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা তাদের নামটা থাকে। মজুরিও তারা মন্দ পায় না। আমাদের পণ্ডিতদের চেয়ে বেশি পায়। কিন্তু দেখ, গোড়াতেই প্রথম যারা কাজ করে, ভিত কাটে…মাটি-কাটা মজুর, তাদের কেউ মনেই রাখে না। তাদের মজুরিও সকাল থেকে তিন প্রহর পর্যন্ত মাটি কেটে—তিন-চার আনা। বুঝলে তো। পেটে খেতেই কুলোয় না। তারা শেষ বয়সে না খেয়ে মরে। যদি বাবুদের বাড়ি যায়, বলে, 'বাবু মহাশয়, আমি আপনার প্রাসাদের ভিত্তি খনন করিয়াছিলাম; আজ না খাইয়া মরিতে বসিয়াছি, অতএব আমাকে কিছু ভিক্ষা দিউন।' বাবু কি করিবেন? চিনিতে পারিবেন না। ভায়া, ভিক্ষা দেওয়া দূরের কথা, দরোয়ান ডেকে বার করে দেবে। ইস্কুল-কলেজের মাস্টাররা হল ছোট রাজমিস্ত্রী বড় রাজমিস্ত্রী। আর হতভাগ্য আমরা পাঠশালার পণ্ডিত, আমরা হলাম ভিত খোঁড়ার মাটি-কাটা মজুর। আমাদের কেউ মনেই রাখে না। গেলে চিনতেও পারে না। ভিক্ষা দিলে দু আনা, বড় জোর চার আনা। তাই বলি—। অনেকটা কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। একটু থেমে আবার বললেন, কিছু কিছু সঞ্চয় করো। বুঝলে? তোমার অবশ্য কিছু জমিজেরাত আছে, আমার মত অবস্থা তোমার হবার কথা নয়। তবুও বৃদ্ধের কথা মনে রেখো। এমন করে—এই আমাকে যেমন কাপড় দিলে, খাওয়ালে, টাকা দিলে—এমন করে খরচ করো না। কিছু কিছু সঞ্চয় করতে অভ্যাস করো।

দরজার কাছে গিয়ে বৃদ্ধ আবার বললেন, ভায়া। আর একটি কথা বলব?

—বলুন।

—আমাকে এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা ম্যাচিস কিনে দাও তুমি।

* * *

সীতারাম ফিরে এসে পাঠশালায় চেয়ারে বসে ভাবে। পণ্ডিত তাকে অবসন্ন করে দিয়ে গেলেন। ওই ভাবনাটা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পণ্ডিত তো মিথ্যা কথা বলেন নাই। আরও অনেক কথাই বলেছেন পণ্ডিত। সারা দুপুরই তিনি অনর্গল বকে গিয়েছেন। কাপড়খানি আর আড়াই টাকা সাহায্য পেয়ে তিনি হাসিতে কথায় সীতারামকে তাঁর জীবনের সকল কথা উজাড় করে বলে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

হঠাৎ সে নিজের খাতা, সেই নোট-বইটা বের করে লিখতে বসল। আজ বারোই জুলাই, উনিশ শো উনত্রিশ সাল।

ধীরাবাবু বলেছে, পণ্ডিত তোমার বুড়োবয়সে এসে তোমার কথা শুনব ; তোমার কথা শুনে বই লিখব আমি।

বুড়ো পণ্ডিতের কথা তার নিজের কথা নয়। তবু সে লিখে রাখলে পণ্ডিতের কথাগুলি। পণ্ডিতের কথায় আর তার নিজের কথায় তো কোন তফাৎ সে দেখতে পায় না। সে লিখে রাখছে, ধীরাবাবুকে বলবে, এমনই করে লিখো। তবেই ঠিক লেখা হবে। নইলে তুমি যা লিখবে, সে হয়তো ঠিক হবে না। পাঠশালার পণ্ডিত সীতারামের জীবনী হবে না। ঠিক এমনি করে লিখো।

এক ব্রাহ্মণের ছেলে। বাপ করতেন চাষীদের গাঁয়ে পুরুতের কাজ আর করতেন যজ্ঞি-বাড়িতে রান্নাবান্না ঠিকের কাজ। লোকে কেউ বলত—চাষা-পুরুত, পটোঝাড়া বামুন ; কেউ বলত—ভাত-রাঁধুনী। কিন্তু এতে অপমান তার যতই হোক, মোটামুটি খাওয়া-পরার অভাব বড় হত না ছেলে, সেকালের হাল আমলের ছেলে, পড়ল ছাত্রবৃত্তি সেকালের এম ভি— মিডল ভার্নাকুলার ইস্কুলে, সেখানে পাস করে সে বাপের বৃত্তি ছেড়ে হল পাঠশালার পণ্ডিত। পণ্ডিতের কাজ, পটোঝাড়া বামুনের কাজের চেয়ে অনেক সম্মানজনক, রাঁধুনী-বামুনের কাজের কথা তো ভাবতেই লজ্জা হয়। সে হল পাঠশালার পণ্ডিত। চামচিকা পক্ষী হল। একটি সদ্‌গোপ চাষীর গ্রামে, গ্রামের মণ্ডলদের সুপারিশে, জমিদারের অনুগ্রহে চাষীদের স্থান নিয়ে পাঠশালা খুললো।"

আঃ, এ কি হল ? চোখে জল এল নাকি ? ঝাপসা ঠেকছে লেখাগুলো, লিখতে গিয়ে লাইন বেঁকে যাচ্ছে। পেন্সিল রেখে সীতারাম হাত দিয়ে চোখ মুছলে। হ্যাঁ, চোখে জল পড়ছে। জল মুছে পরিষ্কার হল দৃষ্টি। সে আবার লিখলে।

"জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা করবার হুকুম পেলে। ওইখানেই সে থাকবে। মণ্ডলরা প্রত্যেক মাসে একদিন করে তাকে খাবার সিধে দেবে। গ্রামে আটাশ ঘর অবস্থাপন্ন

মণ্ডল আছে, তারা দেবে আটাশ দিনের সিধে। বাকি দু-দিন নিজেকেই তাকে চালাতে হবে তার জন্য সে ভাবলে না, আটাশ দিনের সিধে থেকে, দু-দিন কেন, আরও সাত দিনের খোরাক তার উদ্বৃত্ত হবে। দৈনিক পাঁচ পোয়া চালের আধ সের করে কাটলে, আটাশ অর্ধে চৌদ্দ সের চাল বাঁচবে; সে তার চব্বিশ-পঁচিশ দিনের খোরাক।"

আঃ, ছি ছি! আবার চোখের জল এসে গিয়েছে। কিছুদিন, এই মাসখানেক বোধ হয়, এই এক উপসর্গ জুটেছে। চোখে জল পড়ছে। বিশেষ করে এই বিকেলের দিকে, পাঠশালার শেষ দিকটায় জল বেশী পড়ে। মাথাও ধরে। ডাক্তারকে একবার দেখাতে হবে। যাক, পরে লিখলেই হবে। পণ্ডিতের কথাগুলো কানের কাছে এখনও যেন বাজছে। মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে; ও কথা কি ভুলবার?

পণ্ডিত বলেছেন, ভায়া, আজ মনে হয়, দুর্মতি হয়েছিল। নইলে ভেবে দেখ, হিসেব করে দেখ, পুরুতের রোজকার পণ্ডিতের রোজকারের চেয়ে অনেক বেশি। চাল, কাপড়, দক্ষিণে—হিসেব করে দেখ তুমি। আর ঠিকের ভাতরান্নার কাজে উপার্জন তো দিন দিন বেড়ে চলেছে। এক বেলা এক টাকা, দু বেলা দু টাকা। ভাত-রাঁধুনী বামুনের মাস-মাইনেই এখন খোরাক-পোশাক আট টাকা দশ টাকা। তা ছাড়া বাবুদের কুটুম্বস্বজন আউতি-যাউতি, মাসে দুটো টাকা বকশিশ। পাঠশালার পণ্ডিতি করে ভেরেণ্ডা ভাজলাম সারাজীবন।

বলেই হা-হা করে হাসি।

তারপর বলেছিলেন, কিছু মনে করো না ভায়া; সত্যি কথা বলব। তুমিও আমার মত ভুল করেছ। চাষী সদ্গোপের ছেলে। বাপ-পিতামহ চাষবাস করত; নিজের জমি আরও দু-চার জনের দু-দশ বিঘে জমি ভাগে করে দুধে-ভাতে খেয়েছে। গোলাতে ধান, ঘরে কলাই গম গুড় মজুত করে সুখে কাটিয়ে গিয়েছে। তুমিও আমারই মত দগ্ধ কচু ভক্ষণ করেছ ভায়া। পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হতে গিয়ে অন্যায় করেছ।

হঠাৎ তার হাতটা ধরে বলেছিলেন, কিছু মনে করছ না তো ভায়া?

—না, না। আপনি সত্য কথা বলেছেন। কিছু মনে করব কেন?

—হ্যাঁ। তোমাকে জানি বলেই বলতে সাহসী হলাম। নইলে এখন তো আমি ভিক্ষুক, আমি—

চুপ করে গিয়েছিলেম, কিছুক্ষণ, তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিলেন—ভায়া, বলি সাধে? আজ তোমার কাছে গোপন করব না কিছু। বিধবা যুবতী কন্যাটি ভাত রান্না করে, জান তো? কিন্তু কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। কেন জান? পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। মানে বুঝতে পারছ তো? সেখানে বাবুদের যুবক পুত্রটি তার পিছনে লেগেছিল। বল তো ভায়া, এখন না হয় আমি আছি, ভিক্ষা করে খাওয়াচ্ছি, কিন্তু আমার অন্তে তার কি হবে? সম্বল কিছু থাকলে তো আজ আমি ভাবতাম না। আমার অন্তে সেই সম্বল থেকে

নিজের ঘরে আত্মরক্ষা করে কোনরকমে সে থাকতে পারত।

সীতারাম ভাবে, তার জীবনে কি হবে কে জানে? আবার তার চোখে জল এল। এ জল আসা, সে জল আসা নয়। এ তার মন কাঁদছে, তাই জল এসেছে। চোখ মুছলে সে।

পাঠশালার দরজায় বাইসিক্‌লের ঘন্টা বেজে উঠল। এসে ঢুকলেন ইস্কুল সাব-ইন্‌স্পেক্টার-বাবু। নতুন লোক, অল্পদিন এসেছেন; অল্প বয়স, কড়া লোক। বাবুর আপিসে গিয়ে দেখেছে, মোটা মোটা ইংরেজী বই নিয়ে পড়েন। বইয়ে আর মুখে। একটা শেল্‌ফে ঝকমকে বাঁধানো বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বই। দু-তিনখানা মাসিকপত্র নিয়ে থাকেন। ইনি আবার অতি আধুনিক। ইনি বলেন—তোমার ধীরাবাবু বাজে লেখে হে। একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল। রিঅ্যাকশনারী।

সীতারাম দুটো কথারই মানে বুঝতে পারে না। চুপ করে থাকে।

গম্ভীরভাবে সাব-ইন্‌স্পেক্টার খাতাপত্র নিয়ে বসলেন। নোট নিলেন। ইন্‌স্পেক্‌শন-বুকে মন্তব্য লিখলেন।

তিনি চলে গেলে পাঠশালার ছুটি হল। ঢ-ঢং-নন-ন-ন-ন্।

আবার পরদিন সাড়ে দশটায় পাঠশালা বসে। ঢং-ঢং-ঢং।

বৎসরের পর বৎসর এই চলবে। সীতারামের চুলে পাক ধরবে। মুখে কপালে রেখা দেখা দেবে। হয়তো সব শেষে ওই বৃদ্ধ পণ্ডিতের মত অবস্থা হবে। লিখবে, ধীরাবাবু এই-ই লিখবে, এই তো তার জীবন।

জীবন যেন শ্রান্ত ক্লান্ত নীরস হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে।

এরই মধ্যে আসে এক-একটা ঢেউ। মজা নদীতে বান আসে।

সেদিন সাব-ইন্‌স্পেক্টার এসে বললেন, পণ্ডিত তোমাদের এখানে প্রাইমারী টিচার্স কনফারেন্স হবার কথা হচ্ছে। শুনেছ?

—আজ্ঞে না।

—আসবে খবর তোমার কাছে।

*　　*　　*　　*

খবর এল। বড় ইস্কুলের পাঠশালার হেডপণ্ডিত শ্রীশবাবুই এর উদ্যোক্তা। তিনি এলেন সদলবলে। শ্রীশবাবু লোকটি বহুদর্শী লোক, উপযুক্ত শিক্ষক, অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। দোষের মধ্যে নিপুণ ষড়যন্ত্রী। ওর অনেক ভাল ছেলে তিনি ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তা হোক, তিনি যখন এসেছেন, আর এই কনফারেন্স—জেলা প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মেলন যখন সকলের উপকারের জন্যে, তখন সে প্রাণ খুলে যোগ দেবে।

তাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা জানানো হবে দেশের কাছে, গভর্নমেন্টের কাছে দাবি জানানো হবে। বুকে যেন একটু বল আসছে।

অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হল। এই থানার পাঠশালায় পণ্ডিতদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সমস্ত খরচ চালাতে হবে। তাদের মধ্য থেকে পনেরো জনকে নেওয়া হল অভ্যর্থনা-সমিতিতে। গোপালপুরের হৃষিকেশ দাস, বৃদ্ধ পণ্ডিত; গোবিন্দপুরের সৌরীন মিত্র, বয়সে সে ছোক্‌রা; ব্যাপারীপাড়ার মক্তবের মৌলভী মহম্মদ হোসেন; রত্নহাটার সকলেই; বড় ইস্কুলের তিনজন; এবং সন্দীপন পাঠশালার সীতারাম—এমনই করে পনেরো জন। শ্রীশবাবু সভাপতি।

সীতারাম হল দুজন সহকারী সম্পাদকের অন্যতম।

এটা একটা উৎসাহজনক ব্যাপার। এমন ঘটনা জীবনে কম এসেছে। এসেছিল মাত্র আর একবার, সেই যেবার ধীরাবাবু ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের কংগ্রেসী চেয়ারম্যানকে নিয়ে এসে সভা করেছিলেন—সেইবার। আর হল না সে উৎসব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সে সভার মধ্যে বসে ছিল একটি কালো মেয়ে।

প্রতি সন্ধ্যায় আজও তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সন্ধ্যাগুলি বিরস হয়ে গিয়েছে। আর আলোকিত পর্দায় ছায়াছবিতে একখানি মুখ ভেসে ওঠে না। সীতারামের চোখে দোষ ঘটেছে। চশমা একটা না নিলেই নয়। জল পড়ছে, ঝাপসা দেখছে কিন্তু তবু আলোকিত পর্দায় ছায়ার ছবিতে ফুটে-ওঠা মুখ অমাবস্যার আকাশে শুকতারার মত সুস্পষ্ট। নোট-বইয়ে সে লিখলে, উনিশ শো তিরিশ সাল, ছাব্বিশে জানুয়ারী। ওই তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন।

তবে তারিখটার জন্য সে দুঃখিত হল। ওদিকে ওই তারিখটিই নির্দিষ্ট হয়েছে কংগ্রেসের স্বাধীনতা-দিবস পালনের জন্য। কিন্তু উপায় কি? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্বোধন করবেন, তিনিই দিয়েছেন তারিখ। ওই তারিখে দেবু এখানে কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করবে, সংকল্পবাণী পাঠ করবে। ধীরাবাবু দেবুকে লিখেছেন, আমি যেতে পারছি না, কিন্তু রত্নহাটার গ্রামে স্বাধীনতা-দিবস পালন করা হবে না, এ কথা ভাবতেও আমার মর্মান্তিক দুঃখ হচ্ছে। তুমি পালন করবে।

ধীরাবাবু ঢেউ পাঠিয়েছেন। জয়জয়কার হোক ধীরাবাবু। কিন্তু ধীরাবাবু, তুমি এলে না কেন? ঢেউ কি স্রোত? তোমার কাজ কি দেবুকে দিয়ে হয়?

মর্মান্তিক দুঃখ তার দেবু আর শ্যামুর জন্য। তারা ম্যাট্রিক পাস করে বসে আছে। শ্যামু আই. এস-সি ফেল করে বাড়ি এসেছে। দেবু তিনবারের বার কোনরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছে। দেবুকে দিয়ে কি ধীরাবাবুর কাজ হয়? তবে দেবুর ওদিকে একটা ঝোঁক আছে।

যাক ও কথা। সামান্য পাঠশালার পণ্ডিত সে। আদার ব্যাপারী সে, জাহাজের খোঁজ নিয়ে কি করবে? সম্মেলনের জন্য সে শ্যামু-দেবুর কাছে মাছ ভিক্ষা করলে, আধ মণ মাছ

দিতে হবে। আমি বলেছি, আমি আদায় করে দোব। আমার মান রাখতে হবে। সে তারা দিয়েছে।

ধীরাবাবুকেও সে চাঁদার জন্য লিখেছিল। ধীরাবাবু দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেদিন সকালে সব চেয়ে বড় আনন্দ পেলে সে। মনোরমা তার হাতে একটি টাকা দিলে, তোমাদের ইয়েতে, ওই যে কি হচ্ছে গো, তাতে আমার চাঁদা। বেচারী কনফারেন্স কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না।

—তোমার চাঁদা? আমি তো দিয়েছি, আবার?

—তোমাদের মাইনে বাড়বে, মান বাড়বে, আমি চাঁদা দোব না?

টাকা সে নিলে, কিন্তু মনোরমাকে বুকে নিয়ে চুমা দিয়ে আদর জানাবার সময় নাই। রত্নহাটায় ঢোল বাজছে, তার শব্দ এখান পর্যন্ত আসছে, শোনা যাচ্ছে। রায়-বেঁশে নাচ হচ্ছে। ছেলেরা নাচছে।

ওই এক বিড়ম্বনা!

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসবেন, উদ্বোধন করবেন। সাহেবের বাতিক পল্লী-নৃত্য। সাহেব এসে অবধি জেলায় এই নাচ নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছেন। শিব নাচেন, ব্রহ্মা নাচেন, আর নাচেন ইন্দ্র।—সহকারী হাকিমরা নাচছেন, রায়বাহাদুররা নাচছেন, উকিলরা নাচছেন, মোক্তাররা নাচছেন, বড় ইস্কুলের ছেলেরা নাচছেন, মাস্টাররা নাচছেন, এবার তাদের পালা। পাঠশালার ছেলেদের নাচতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হবে। মুখ বুজে নাচতে হবে। কিছু বললেই সর্বনাশ। রায়পুরের ব্যোমকেশ একটা কাগজ ছাপিয়েছিল—ওই নাচকে ঠাট্টা করে;—দেশে ছড়া প্রচলিত আছে—"আমার বিয়ের যেমন তেমন দাদার বিয়েয় রায়-বেঁশে, আয় ঢকাঢক মদ খেসে।"

তার ফলে ব্যোমকেশের জেল হয়ে গিয়েছে।

তবু রক্ষা যে, ডিভিশনাল ইন্স্পেক্টার-অব-স্কুল্স রায়বাহাদুর মিত্র সাহেবের কোন বাতিক নাই। তিনিই হবেন সভাপতি।

ত্রিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী।

সুসজ্জিত মণ্ডপে অধিবেশন হল। ভাগ্যক্রমে সীতারামকে দাঁড়াতে হল সভাপতির আসনের কাছেই।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হয়ে গেল আজ। নজরে পড়ল, সভার বাইরে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে শিবকিঙ্কর। সে ইশারা করে ওকেই ডাকছে। সীতারাম সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল।

শিবকিঙ্কর অনুগ্রহপ্রার্থীর মত সবিনয়ে বললে, আমাকে ভেতরে একটু বসিয়ে দিতে পার ভাই পণ্ডিত?

সীতারামের জিভের ডগায় এল, না। কিন্তু পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, আসুন।

সভাপতির অভিভাষণ তখন আরম্ভ হয়েছে। একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ তিনি জানালেন, "নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা হচ্ছে—তাতে দেশের সর্বত্র প্রতি গ্রাম না হোক, প্রত্যেক পাঁচ-সাতখানি গ্রামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। সমস্ত দেশের ছেলেরা যাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীকে দেখে ধন্য হতে পারে, তার ব্যবস্থা হবে। সেই সব কেন্দ্রে যাঁরা শিক্ষক থাকবেন, আপনারাই থাকবেন, তাঁদের বেতন যাতে উচ্চ হয়, যাতে তাঁদের অভাব-অভিযোগ দূর হয়, তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে। আপনারাই হচ্ছেন দেশের আদিগুরু। আপনারা তো সামান্য নন।"

আনন্দে চোখে জল এল সীতারামের। দৃষ্টি তার কমে এসেছে। আজকার চোখের জলে তার ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখটায় সব যেন সাদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সেদিন বাড়ি ফিরে তার নোট-বইয়ে সে এই তারিখটি লিখে রাখলে—

"আমার আজ মনে হল আকাশে নীল ঝলমল করছে, দীঘিতে সায়রে জল টলমল করছে। পাখির গানে আনন্দ ঝরে পড়ছে। বড় আনন্দ আজ। বড় আশা মনে জেগে উঠেছে।"

তারপর লিখেছে—

"বাড়ি ফিরবার পথে—দেবুর তোলা জাতীয় পতাকাকে লুকিয়ে প্রণাম করে এলাম। সংকল্পটি পকেটে আছে। বাড়ি এসে পাঠ করলাম। আজ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ সাল।"

সম্মেলন শেষে সে গিয়েছিল সেখানে, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ছিল। একা দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বলেছিল—মুখ ফুটে বলবার সাহস নাই, কিন্তু আমার অন্তরও বলে—তোমার জয় হোক। তোমার জয় হোক। তোমার জয় হোক।

ষোল

২৬শে জানুয়ারী—১৯৩০ সাল। প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মেলন।

তারপর আরও কতকগুলি তারিখ—তার নোটবইয়ে লেখা হয়েছে। তারিখের পাশে ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

"১৭ই আগষ্ট, ১৯৩০ সাল। দেবু, আমার হাতের গড়া দেবু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে কারাবরণ করলে। ধীরাবাবু কলিকাতায় রাজবন্দীরূপে আবার ধৃত হয়েছেন। দেবু তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। এ কথা জানি। আমিই তো তাকে বলেছিলাম—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।"

শেষে সে লিখেছে—"আজ গৌরবে বুকটা ফুলে উঠেছে। সে কথা কাকেও বলবার নয়। হায়! এ গৌরবের কথা মুখ ফুটে বলবার আমার সাহস নাই। আমি দুর্বল, আমি হতভাগ্য।" এ নিয়ে দুঃখও তার অনেক। যেদিন দেবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, সেদিন স্টেশনে সে কি ভিড়! গ্রামের নরনারী শিশু যুবা বৃদ্ধ ভেঙে এসেছিল তাকে অভিনন্দন জানাতে। ফুলের মালাতে দেবুর গলা ভরে গিয়েছিল। সেও নিয়ে গিয়েছিল মালা গেঁথে। কিন্তু দারোগাকে দেখে—দিতে সাহস তার হয় নাই। মনে পড়েছিল—অনেকদিন পূর্বের কথা। তার ক্ষীণদৃষ্টির চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছিল—ভাঙা সন্দীপন পাঠশালার ছবি। সভয়ে সে মালাগাছি চাদরের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল। তারপর ট্রেন চলে গেলে সে দীর্ঘদিন পরে দেবুদের বাড়িতে এসে প্রবেশ করেছিল। মায়ের সঙ্গে দেখা করবে! মাকে প্রণাম করে জীবন সার্থক করবে। তাঁর কাছে বসে একবার কাঁদবে। বলবে—আপনার দেবুর পণ্ডিত হয়েছিলাম—তাই জীবনটা আমার ধন্য হল। বাড়িতে ঢুকে চারিদিক চেয়ে দেখলে—কই, মা কই?

—মা! মা কই?

দাওয়ার উপর কে বসে ছিলেন—তাকেই প্রশ্ন করলে। তিনি উত্তর দিলেন—সীতারাম! এস বাবা। এই তো আমি।

একটু অপ্রস্তুত হল সীতারাম।—আমার চোখের দৃষ্টিটা—কমে গিয়েছে কিনা। আমি চিনতে পারি নি মা!

—বসো বাবা, বসো।

বসল সীতারাম। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেলে না। দুঃখ প্রকাশ করতে সে আসে নাই, দুঃখ প্রকাশ করলে এই মা-টি হাসবেন সে তা জানে। কিন্তু কোন্ ভাষায় তাঁকে অভিনন্দন জানাবে? সে ভাষা তো সে জানে না। তার মনের কথা এখানে এসে লজ্জা পাচ্ছে। সে বলতে এসেছিল—জানেন মা, দেবুকে শ্যামুকে আমি এসব ছেলেবেলা থেকে শিখিয়ে এসেছি। কিন্তু কথাগুলি বলতে লজ্জা পাচ্ছে। এই মা না হলে কি ওই ছেলে হয়। ধীরানন্দ কি কোন মাস্টারের তৈরী করা ধীরানন্দ? দেবানন্দকে কি সে তৈরী করেছে? হায় রে হায়! এই মায়ের তিনটি ছেলের একটি ধীরানন্দ একটি দেবানন্দ। আর সে বা ধীরাবাবুর শিক্ষকেরা কত ছেলেকেই না শিক্ষা দিয়েছেন জীবনভোর! কিন্তু কই ধীরানন্দ দেবানন্দ আর কই? এই মায়ের সামনে কি তার দাবি জানানো যায়?

মা বললেন—তুমি কাঁদছ কেন বাবা ?

সীতারাম কাঁদে নাই ; তার চোখ দিয়ে যেমন জল গড়ায়—তেমনি একটি ধারা গড়িয়ে এসেছিল—তাই মায়ের চোখে পড়েছে। চোখ মুছে সীতারাম বললে—না মা। কাঁদি নাই তো। চোখ দিয়ে আমার মধ্যে মধ্যে জল পড়ে। নইলে এ কি কাঁদবার কথা ? এ যে আমার বুক ফুলিয়ে বলবার কথা। দেবু আমার ছাত্র।

মা হাসলেন—সে হাসি দেখে সীতারাম ম্লান হয়ে গেল ; বড় ইমারতের ভিতে যে মজুর কাজ করেছে সে যদি কোন দিন এসে গৃহস্বামীকে বলে—এ বাড়ি আমার তৈরী, তখন গৃহস্বামী যে করুণার হাসি হাসেন—এ সেই হাসি। সে তাড়াতাড়ি বললে—আপনার সন্তান ছাড়া এ কাজ আর কে করবে এ গাঁয়ে ?

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ আর এমন কি করেছে বাবা ! দেশের জন্য বড় বড় লোক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন, নিজের জীবন ঢেলে দিয়েছেন। আন্দোলনের সময়—হাজারে হাজারে লোক চলেছে তীর্থযাত্রীর মত। কতক চলেছে হুজুগে।

হাসলেন মা, তারপরই কথাটা পাল্‌টে দিয়ে বললেন—কিন্তু তোমার চোখের এমন অবস্থা কতদিন হয়েছে বাবা ? এ তো ভাল নয়। চিকিৎসা করাও। চশমা নাও।

সীতারাম বলতে গেল—অর্থের কথা। বলতে গেল—চিকিৎসা করাতে টাকা চাই মা। সে আমি কোথায় পাব ? কিন্তু থেমে গেল। বললেই হয়তো মা মনে করবেন সে টাকা ভিক্ষে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, বিশ-পঁচিশ টাকা আমি দেব, বাকীটা তুমি সংগ্রহ কর। সে বললে—হ্যাঁ, এইবার করাব। ভেবেছিলাম মধু-টধু দিলেই ও দোষটা যাবে, তা গেল না। এইবার চিকিৎসা করাব। চশমা নোব।

উঠে চলে এল সে।

* * * *

টাকা তাকে দিলে মনোরমা। মধুমক্ষিকার মত সঞ্চয়ী মনোরমা পয়সা জমিয়ে টাকা করে, দশ টাকা হলেই নোটে পরিণত করে। সে রত্নার বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছে। সে বলে ওই কথা কিন্তু তা নয় ; ওই ওর স্বভাব ; ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পঞ্চাশ টাকা হাতে দিয়ে বললে, চোখ তুমি দেখিয়ে এস। আরও টাকা লাগে তাও দোব আমি।

দেখিয়ে এল সে। কলকাতায় নয়, মাইল চল্লিশেক দূরে সাঁওতালদের মধ্যে ক্রীশ্চান মিশনারীরা মিশন করেছে। সেখানে ভাল হাসপাতাল আছে। চোখের চিকিৎসা সেখানে ভালই হয়। তাদের ওখানে চিকিৎসা করিয়ে এল। সঙ্গে গেল আকু। সীতারাম ফিরল পুরু চশমা নিয়ে। দৃষ্টি অনেকটা ফিরেছে।

নোট বই খুলে সে প্রসন্ন মনে লিখলে—"বিদ্যা—জ্ঞান এ কি অপরূপ সামগ্রী। মৃতপ্রায়জনকে সঞ্জীবিত করে তোলে। অন্ধকে দৃষ্টি দেয়। আঃ, আজ নীল আকাশ দেখে বাঁচলাম। ওই

পাদরী সাহেবদের লক্ষ প্রণাম জানাচ্ছি। আর মনোরমাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছি। কিন্তু আমার এ দৃষ্টি কি টিকবে? আমি যে প্রতারক। আমি যে প্রতারক। আমি যে মনোরমাকে প্রতারণা করেছি। আজও যে ঝরনার ধারে বসে মনে মনে ভাবি আর মনের চোখে দেখি মেটে কোঠা ঘরের জানালার পর্দায় কালো ছায়ায় আঁকা ছবি।"

তারপর তারিখ, ১৯৩৫ সাল, ৩০শে মার্চ।

খবর এসেছে, ধীবরদের ছেলে শশীনাথ বৃত্তি পেয়েছে। দৃষ্টি ফিরে পাওয়া সার্থক হয়েছে। সার্থক হয়েছে। এইটিই বোধ হয় সর্বোত্তম সুখের দিন তার। ধীবর শশীনাথের অন্ধকার জীবন-পথে তার হাতে প্রদীপ দিতে পেরেছে। আজ বড় ইস্কুলের বৃদ্ধ হেডমাস্টার নাই। আকাশের দিকে মুখ তুলে সে মনে মনে বললে, আপনার আশীর্বাদ আমার সফল হয়েছে। পুরো পাঁচ টাকা খরচ করে সে দেবস্থানে পুজো দিয়ে এল।

সন্দীপন পাঠশালাকে সে সেদিন মনোরম করে সাজালে। ছেলেদের মিষ্টান্ন বিতরণ করলে। নিজে গিয়ে শশীনাথকে ভর্তি করে দিয়ে এল বড় ইস্কুলে।

অকাল-বৃদ্ধ সীতারাম যেন নতুন জীবন পেলে। সে আবার যৌবনের উৎসাহ নিয়ে পড়াতে শুরু করলে। লোকে তাকে সস্নেহে রসিকতা করে বলে, বলিহারি পণ্ডিত।

সে হাসে। এখনও বাকী আছে। জয়ধর গতবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়ে কলেজে পড়ছে। সে আই-এ-তে বৃত্তি পাবে, বি-এ-তে পাবে, এম-এ-তে পাবে। হাকিম হবে। চাকরিতে যাবার পথে সে তাকে প্রণাম করে যাবে। বলবে, আপনাকে কিন্তু একবার আমার বাসায় যেতে হবে। সে যাবে। সেখানে পৌঁছে তাকে আশীর্বাদ করে আসবে। সকলের কাছে জয়ধর পরিচয় দেবে, আমার গুরু। ইনিই আমাকে হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে নিজের পাঠশালায় ভর্তি করেছিলেন।

সে বলবে, বাবা মণির মূল্য মণির নিজস্ব। সেই মূল্যেই সে রাজমুকুটে শোভা পায়। যে মণিকার তাকে আবিষ্কার করে কেটে ঘষে উজ্জ্বল করে, তার নাম ওই মণির মূল্যের দৌলতেই অক্ষয় হয়। তার আসল মূল্য মণিকাটা মজুরের মজুরীর চেয়ে বেশি নয়।

—পড়—পড় সব। পড়ে যাও। মণিরা সব পড়ে যাও।

"ভগবান বুদ্ধ একদা রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তপস্যা করিয়াছিলেন মানুষের সর্ববিধ দুঃখমোচনের নিমিত্ত। দীনতম মূর্খতম মানুষের মধ্যে তিনি তাঁহার তপস্যালব্ধ ফল বিতরণ করিয়াছিলেন।" পড়—পড়।

—কি? তোমার কি? এবার তোমার পালা। এবার তোমাকে বৃত্তি নিতে হবে। কি বল?

—অঙ্ক মিলছে না স্যার।

—অঙ্ক মিলছে না। দেখি। হুঁ-হুঁ। এটা কি? জ্যোতিষ পাঁচকে লিখত শূন্যের মত। লিখে যোগ-বিয়োগের সময় নিজেই শূন্য ধরে অঙ্ক ভুল করত। ওই ভুলেই সে বৃত্তি পায় নি। তোর নয় আর এক নিয়ে গোলমাল। নয়কে লিখবি একের মত, একক লিখবি নয়ের মত। আমার সব পরিশ্রম জলে দিবি। কি বলব? কি বলব তোকে? এই! এই রমন, নিয়ে আয় ছড়ি। আজ তোকে আমি মেরে শেখাব। এক আর নয় যখন লিখতে যাবি তখনই মনে পড়বে এই মারের কথা। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আত্মসম্বরণ করে সে। কি হবে মেরে? তার অদৃষ্ট। সীতারাম হাজার চেষ্টাতেও তাকে বদলাতে পারবে না। সে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে বসে অদৃষ্ট রহস্যের কথাই ভাবে। ধীরাবাবু অদৃষ্ট মানেন না। হায় ধীরাবাবু! ভাবতে ভাবতে ঢুল আসে তার। মাথাটা চেয়ারের পিছনে হেলিয়ে দেয় ক্লান্তিভরে; কয়েক মুহূর্ত পরেই নাক ডাকতে শুরু করে। মুখটা হাঁ হয়ে যায়। ছেলেরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে, মাস্টারের অবস্থা দেখিয়ে হাসে।

গোবিন্দ এখনও আছে। সে আকুর সঙ্গ ছেড়েছে। সেও দেখে আর হাসে। ছেলেদের ইঙ্গিতে শেখায়—দে মাস্টারের মুখে মাছি পুরে দে।

বাড়ি থেকে কৃষাণ এসে ডাকলে—পণ্ডিত মাশায়।

গোবিন্দ গলা ঝেড়ে শব্দ করলে। সীতারামের ঘুম ভাঙল। চমকে উঠল সে।—কি রে তুই? বাড়ির সব—।

—ভাল গো, ভাল। রত্না-দিদির বিয়ের সম্বন্ধ আইছে। রত্নার মামা একেবারে নোক-জন নিয়ে হাজির। কন্যে দেখবে তারা।

—জয় ভগবান! রত্নাই একমাত্র সন্তান। তার বিয়ে হলেই সে মুক্ত। কাজ শেষ। আজ ৪টা আশ্বিন।

* * * *

তারপর রত্নার বিয়ের দিন।

নোট-বইয়ে সে লিখলে—"উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সাল। বাংলা তের শো একচল্লিশ সাল ৭ই অগ্রহায়ণ রত্নার বিবাহ। কি আনন্দ! ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস। আই-এ পড়ছে। ভগবান তোমার অপার করুণা।"

সতেরো

দীর্ঘদিন—বারো বৎসর পর। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল।

বারো বৎসর পর সীতারাম সেদিন খুললে তার নোট-বই। স্বাধীন হয়েছে দেশ। চোখে তার পুরু চশমা। নিজের বাড়ির দাওয়ার উপর বসে তার নোট-বই খুলে পড়তে চেষ্টা করলে। আবার তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর—নির্বাপিত-প্রায় প্রদীপের মত। আজ ধীরাবাবু আসবেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশের স্বনামধন্য লেখক ধীরানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন—"পণ্ডিত, স্বাধীন রত্নহাটাকে প্রণাম জানাতে যাব। তোমাকে দেখতে যাব। তুমি যেন এস না। আমি নিজে যাব তোমার বাড়ি। তোমার খাতা নিয়ে আসব।"

জয়জয়কার হোক—ধীরাবাবু আপনার জয়জয়কার হোক। কিন্তু কি দেখবে? বাজে-পোড়া শালগাছ নয়, শিশুগাছ নয়, দেবদারু নয়, বিশাল বট নয়, বিরাট অর্জুন নয়, শ্মশানে আকাশস্পর্শী শিমূলও নয়। অফলা-অপুষ্পা বামনের মতো খাটো—শ্যাওড়া গাছ। শুকিয়ে গেছে, মরবে এবার।

তবে তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে তোমার প্রার্থিত খাতাখানি দিতে হবে বৈকি। সে খাতা খুলে পেন্সিল নিয়ে বসল।

ঝুঁকে পড়ে অনেকটা আন্দাজেই লিখে গেল।—

"কি দেখতে আসছেন ধীরাবাবু। স্বাধীন হয়েছে দেশ। সেদিন অনেক ধ্বজা অনেক পতাকা—আলো—অনেক গান—অনেক আনন্দ কলরবে দেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রত্নহাটা যে ধ্বংসোন্মুখ। এই সীতারামের মতই যেন শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে রয়েছে সে।

পৃথিবীর ইতিহাস আপনি পড়েছেন ধীরাবাবু। আমি সীতারাম—চাষীর ঘরের ছেলে—ইংরিজী ইস্কুলে—নর্মাল ইস্কুলে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছিলাম। তারপর আজীবন পাঠশালার পণ্ডিত, পাঠশালার পাঠ্যের মধ্যে ইতিহাস নাই। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসটুকুও প্রায় ভুলে গিয়েছি। ভূগোল? ভূগোলও তাই। আমার ভূগোল রত্নহাটার মধ্যখানে দাঁড়ালে —চারিপাশে গোল হয়ে আকাশ নেমে আসে যে সীমানাটুকুকে ঘিরে—আমার ভূগোল ততটুকু। তবে দেখলাম এবার ইতিহাস। উনিশ শো একুশ সাল থেকে তুমি রত্নহাটার ছেলে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে মাতলে, সে আমার কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়, রত্নহাটার স্বাধীনতার যুদ্ধ। সাতচল্লিশ সালে শেষ হয় সে যুদ্ধ। এর মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে এসে রত্নহাটার ইতিহাসকে টেনে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। যুদ্ধ বড় বড় রাজ্যের ইতিহাসকেই শুধু পাল্টায় নি, রত্নহাটার ইতিহাসকেও পাল্টে দিয়ে গেল। যুদ্ধ এল।

রত্নহাটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভেঙে গেল বড় বড় সংসার। শ্রী গেল—সম্পদ গেল। যারা উঁচু মাথা করে ছিল—তারা মাথা হেঁট করলে। মণিবাবুকে একবার দেখে যেয়ো ধীরাবাবু। ঘরের ভিতর চুপ করে বসে থাকেন। চাকর রাখবারও সঙ্গতি নাই। নিজেই তামাক সেজে খান। দ্বৈপায়নে মহামানী দুর্যোধনের কথা পুরাণে পড়েছি। তোমার রত্নহাটার কাহিনীতে অন্ধকারে মণিবাবুর আত্মগোপনের কথা লিখো।

আমি জানি ধীরাবাবু, তুমি বলবে—পণ্ডিত, এখনও বাকী আছে। উরুভঙ্গ। তুমি মানুষের সঙ্গে মানুষ হয়ে মিশে গেছ। তুমি হাসবে। বলবে—যে জ্ঞাতি-মানুষদের ওরা বঞ্চনা করেছে—তুমি তাদের দিকে। তুমি হয়তো বলবে—আমিই গদাযুদ্ধের সময়—উরুতে চপেটাঘাত করে গদাঘাতের ইঙ্গিত দেবো। তা দিয়ো। আমি যদি থাকি—তবে কাঁদব। কাঁদব ধীরাবাবু।

আমার চোখ গিয়েছে ভালই হয়েছে। আমাকে ধ্বংসোন্মুখ রত্নহাটা আর দেখতে হয় না। তুমি হেসে বলবে—ভয় কি পণ্ডিত! আবার নতুন করে গড়ব।

গড়ো, তাই গড়ো ধীরাবাবু। অমৃতের তপস্যা তোমার—তুমি গড়ো। আমি পাঠশালার পণ্ডিত। আমার সন্দীপন পাঠশালাই ভেঙে গেছে, আমি অন্ধ হয়ে বসে আছি। আমার মনোরমা নাই। আমার রত্না বিধবা হয়েছে। আমি মৃত্যু-কবলিত। অজগর যেমন করে ধীরে ধীরে শশক ধরে গ্রাস করে—তেমনি করেই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে। তবে তফাৎ কি জান? তফাৎ—শশকের মত আমি আর্তনাদ করছি না।"

মনোরমা হাসতে হাসতে মরেছে, মৃত্যুকে সে চেয়েছিল।

তার কাছে শিখেছে। লেখা বন্ধ করে সে খাতার পাতা উল্টে যায়।

"১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর মনোরমা মুক্তি পেলে। হ্যাঁ, এ মৃত্যু তার মুক্তি। বড় নিষ্ঠুর আঘাত সে পেয়েছিল। রত্নার বৈধব্য নিদারুণ শেলের মত তার বুকে বেজেছিল।" রত্না বিধবা হয়েছে।

আবার ওল্টালে খাতা।

১৯৩৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রত্না বিধবা হয়েছে। লেখা রয়েছে—"পাঠশালায় বসেই টেলিগ্রাম পেলাম।" রত্না—তাদের একমাত্র কন্যা, রত্নাবলী নাম রেখেছিল সাধ করে। আই-এ পড়া ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ছে, পাদ্রীদের চিকিৎসায় তার চোখের দৃষ্টি মোটামুটি ভালই ছিল। আকাশে সেদিন মেঘ ছিল। ছেলেরা পড়ছিল। হঠাৎ এল টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম পড়ে পাথর হয়ে গেল সে। কানে শুনতে পাচ্ছিল না, চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, পৃথিবী যেন মুছে গিয়েছিল। গোবিন্দ শঙ্কিত হয়েছিল—সে এসে ডেকেছিল—পণ্ডিত। পণ্ডিত!

তার সম্বিৎ ফিরল, কানে শুনলে কিসের শব্দ হচ্ছে—ঝর, ঝর, ঝর, ঝর। কিন্তু বুঝতে

পারলে না কিসের শব্দ। ছেলেরা পড়ছে—অ-আ-ই-ঈ।

—ক্—র—কর। খ—ল—খল। জ—ল—জল।

জল পড়ে—পাতা নড়ে। জল পড়ে পাতা নড়ে।

সীতারামের চোখের জল দৃষ্টি অবরুদ্ধ করেছিল। ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে তখন—কানে শুনতে পেয়েছিল, চোখে দেখতে পায় নি। সেই আরম্ভ হল তার চোখ থেকে আবার জল পড়া। সে আজও থামে নি। চোখ আছে—দৃষ্টি নাই, দেখতে পায় না শুধু জল পড়ে; আপনিই পড়ে।

ওদিকে এই শোকে মনোরমা শয্যা পাতলে। আর উঠল না। নিঃশব্দে নিজের মন্দ অদৃষ্টের লজ্জায়—ঈশ্বরের উপর—সীতারামের উপর—অভিমান করেই চলে গেল একদিন।

মনোরমার শেষ কথাগুলিও লিখে রাখবার তার ইচ্ছা ছিল। কয়েকদিন চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারে নাই। যতবার চেষ্টা করেছিল—ততবারই তার চোখ থেকে অনর্গল ধারায় জল ঝরে পড়েছিল। রেখে দিতে হয়েছিল খাতা কলম। থাক লেখা। কি হবে? বুকে লেখা রইল। অক্ষরে অক্ষরে—অস্থি পঞ্জরে খোদিত হয়ে রইল।

সজ্ঞানেই মনোরমা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। যেন হাসতে হাসতে মরণ সায়রে ডুব দিলে, আর উঠল না; গলে গলে—চিনির পুতুলের মত। বার চারেক শুধু ব্যাকুল হয়ে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করেছিল। তার পরই মাথাটি হেলে যেন ঢলেই পড়েছিল।

মৃত্যুর পূর্বে সে বার বার তার হাত ধরে বলেছিল—তোমাকে আমি সুখী করতে পারি নাই। আশীর্বাদ কর, যেন পরজন্মে তোমাকে পাই, তোমার মনের মত হয়ে তোমাকে সুখী করতে পারি।

চমকে উঠেছিল সীতারাম।—কেন? কেন? এ কথা কেন বলছ মনো? তোমাকে আমি বহু ভাগ্যে পেয়েছিলাম। ও কথা বল না তুমি। না না। বলে চিৎকার করে উঠেছিল সে।

মনোরমাও বলেছিল—না। বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। বলেছিল, আমি জানি। আমি জানি তুমি সুখী হও নি। তোমার অসন্তোষ আমি বুঝতে পারতাম যে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সীতারাম। অনুতাপে ভরে উঠেছিল তার মন। ইচ্ছে হয়েছিল অপরাধ তার স্বীকার করে। কিন্তু পারে নি, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুশয্যায় মনোরমার শিয়রে দেওয়ালের গায়ে মুহূর্তের জন্য ফুটল একটি ছবি। রাত্রির অন্ধকারে একটি আলোকিত জানালার পর্দার গায়ে কালো ছায়ায় আঁকা একখানি মুখ।

অনেকক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করে সে তাকে বলেছিল—তা হলে তো তুমিও সুখী হতে পার নি মনো! তুমি আমাকে ক্ষমা করে যাও। মনো!

মনোরমা সুন্দর হাসি হেসেছিল। হেসে কিছু বলতেই যাচ্ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কি হল। ব্যাকুল অস্থির হয়ে উঠল সে, বার কয়েক হাঁ করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করলে, হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করলে—তার পরই সব স্থির হয়ে গেল ; ঢলে পড়ে গেল।

সীতারাম কাঁদে নাই। ফুল তুলে সাজিয়ে সে মনোরমাকে নিজে হাতে চিতায় তুলে দিয়েছিল। সে তার বাল্যকালে পুত্রশোকবিজয়ী মহর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছিল শান্তিনিকেতনে। মনে মনে সেই ছবি স্মরণ করেছিল। প্রশান্ত মুখে বসে রত্নাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। আজ থেকে তাকেই রত্নার বাপ-মা দুই-ই হতে হবে। বুকের দুঃখ বুকে রেখে হাসি মুখেই তাকে বাকী দিনগুলি কাটাতে হবে।

লোকে সান্ত্বনা দিতে এসে খানিকটা বিস্মিতই হয়েছিল। প্রৌঢ় বয়সে পত্নীবিয়োগে কেউ বুক চাপড়ে কাঁদে না, সেটা দেশে সমাজে লজ্জার কথা। কিন্তু এমন স্থির শান্ত দেখবে এও তারা প্রত্যাশা করে নাই। লোকে ভালও বলেছিল, মন্দও বলেছিল। সে অবশ্য আড়ালেই বলেছিল। মুখের উপর বলেছিল—কানাই রায়। কানাই-কাকা তাকে ভালবাসত। তবে বিচিত্র মানুষ। সে সেদিন তাকে বলেছিল—তুমি আচ্ছা পাষাণ বটে বাবা। তারপর আবার বলেছিল—উঁহু, তাই বা কি করে বলি! পাষাণের সুখও নাই দুঃখও নাই। তোমার বাবা সব উল্টো। সুখের সময় মুখে হাসি দেখলাম না কখনও। আবার এত দুঃখ—চোখে তোমার জল দেখছি না ; সুখের সময় মুখ দেখে মনে হয় আহা লোকটার কত দুঃখ। আজ দেখছি হেসেই বলছ, এস কাকা, এস।

হাতটা উল্টে দিয়ে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল—কে জানে! কিছুই বুঝলাম না তোমাকে। তারপর আবার বলেছিল—আচ্ছা—দুঃখেই তুমি সুখ পাও নাকি বল দেখি?

সীতারাম বলেছিল—সংসারে দুঃখই তো পরম বস্তু রায়-কাকা। সুখের সময় ভগবানকে লোকে ভুলে যায়, দুঃখ তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয়।

রায় বলেছিল—কে জানে বাবা, দুঃখ কাকে বলে তা তো বুঝলাম না।

—বুঝলে না? হেসেছিল সীতারাম।

—কে জানে? হাত দুটো উল্টে দিয়ে তাচ্ছিল্যভরেই সে বলেছিল—হাসলাম, খেললাম, নাচলাম, গাইলাম, দিন চলে গেল। কাবার করেও এনেছি। কই, দুঃখ কই? অবিশ্যি নাচতে গেলে পা পিছলায়, ছুটতে গেলে হুঁচোট লাগে, বাঁচতে গেলে অসুখ করে ; মদ খেলে খোঁয়াড়ির সময় মাথা ধরে ; যখন হয় চেঁচাই—কাঁদি, তাতেই সুখ। তুমি কাঁদ—দেখ সুখ পাবে।

যাবার সময় বলেছিল—আমি তো এসেইছি নিজে, রাণীমাও বার্তা পাঠিয়েছেন। বলেছেন—গাড়ি করে একদিন যাব। বড় দুঃখ পেয়েছে সীতারাম, তাকে ছেলের মতই স্নেহ করি—আমি বড় দুঃখ পেলাম। একদিন যাব।

—সে কি? চমকে উঠেছিল সীতারাম। মা আসবেন কি? না, না।—কাকা, মাকে বলো আমি নিজেই যাব। কালই যাব।

পরদিনই সে গিয়েছিল।

মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে—মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন—তোমার সিদ্ধি হবে বাবা। তোমার সঙ্কল্পশক্তি দেখে আমি বুঝতে পারছি—তুমি পাবে।

ওই এক বিচিত্র মানুষ। চিরটাকালের মধ্যে সীতারাম তাঁকে যত ভালবেসেছে—তত ভয় করেছে। সে ভয় তার এক তিল কমে নাই। তবে হ্যাঁ, রাণীমা সত্যকারের রাণীমা ছিলেন। হিমালয়ের মত সাদা বরফে ঢাকা। তেমনি উজ্জ্বল—তেমনি প্রদীপ্ত। তেমনি কঠিন। অথচ তাঁরই বুক থেকে ঝড়ে পড়ছে—গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র। করুণার ধারা।

ধীরাবাবুর কত নাম। কত গৌরব। দেশ-দেশান্তরে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। তবু ওই এক অপরাধের জন্য—তিনি কোন দিন ছেলের কাছে গেলেন না, ছেলেকে ডাকলেন না। বলেছেন, একা ধীরাকে কি করে ডাকব? বউমার ছোঁয়া-নাড়া খাব না, তার ছেলেদের বুকে নিয়ে মন খুঁত খুঁত করবে—তাদের ডাকতে পারব না; ধীরা কি খুশী হয়ে আসতে পারবে? মায়ের এই ভ্রান্তিতে সীতারামের দুঃখ হয়। তবে হোক ভ্রান্তি, তাঁর চরিত্র-মহিমায় অন্তর-বেদনায় ওই ভ্রান্তিও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বেদনা সীতারাম বুঝত।

দেবুকে নিয়েই তিনি প্রসন্ন মনে কাটিয়ে গেছেন জীবনটা। দেবু ক্রমে এ অঞ্চলের নামকরা দেশসেবক হয়েছে। তাতেই তিনি খুশী ছিলেন। তবে তিনি অন্যায় করে গিয়েছেন। দেবু-শ্যামুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই এ কথাটা উপলব্ধি করে সীতারাম। দিনকাল খারাপ হয়ে আসা সত্ত্বেও—মা বাড়ির ক্রিয়াকলাপের নিয়ম এবং বরাদ্দের একতিল কমাতে দেন নাই। ফলে দেবু-শ্যামুর অবস্থা খারাপ হয়েছে বেশী। বরাদ্দ কমাবার প্রস্তাব মুখে আনবারও উপায় ছিল না। আনলে প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব ফুটে উঠত তাঁর মুখে-ঠোঁটে; সে কি দৃষ্টিতে তাকাতেন তিনি! রত্নহাটার বাবুদের বাড়ির সে আমলটাই যেন তাঁর সঙ্গে চলে গেল। মা চলে গেছেন কিন্তু তাঁকে মনে করে সীতারাম আজও ভয়ে সম্ভ্রমে সজাগ হয়ে ওঠে। তাঁর মহিমা ও মাধুর্যের কথা ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে যায়।

মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর রোগশয্যায়। তখন পাঠশালা সে বন্ধ করেছে। চোখের দৃষ্টি একেবারে ক্ষীণ হয়েছে। লাঠি হাতে ইশারায় খুঁজে খুঁজে সে মাকে দেখতে গিয়েছিল।

—কেমন আছেন মা?

সে কথার উত্তর দেন নাই তিনি। প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার এমন দৃষ্টি হয়ে গেছে বাবা?

হেসেছিল সীতারাম। কপালে হাত দিয়েছিল।

মা বলেছিলেন—দীক্ষা নিয়েছ বাবা? দীক্ষা নাও তুমি। বাইরের আলো যখন কমতে শুরু করেছে তখন ভেতরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা কর।

*   *   *   *

দীক্ষা সে নিয়েছে।

গুরুকে প্রণাম, আর মা—আপনাকে প্রণাম। গুরু দিয়েছেন মন্ত্র—আপনি দিয়েছিলেন পরামর্শ। ধীরাবাবু মন্ত্রের কথা শুনে হেসেছিলেন। সীতারাম তাঁকে পত্রে লিখেছিল সংবাদটি। উত্তরে ধীরাবাবু লিখেছিলেন—"কোন্ মন্ত্র নিলে পণ্ডিত? সরস্বতী মন্ত্র হলে কিছু বলবার নাই আমার। কিন্তু সে দীক্ষাও তো তোমার অনেক দিন হয়েছে। নিজেই নিয়েছিলে। তার গুরু কে—সে তুমিই জান। পণ্ডিত, কপালে ফোঁটা তিলক কাটা তোমার চেহারা কল্পনা করেছি—আর হেসেছি। না না পণ্ডিত, এ আমার ভাল লাগল না।" সীতারাম লিখেছিল—"ধীরাবাবু—আপনার কর্ম উচ্চ, সাধনা বিপুল, হয়তো জন্মান্তরের পুণ্য—নয়তো যে কোন কারণেই হোক জন্ম থেকেই আপনার উপলব্ধির প্রতিভা বড়। আপনার মন্ত্রের প্রায়োজন নাই। আমার আছে।"

আছে বই কি! ধীরাবাবু, যারা আকাশে ওঠে—উঠতে পারে—তাদের কাছে আকাশের কথা, আকাশে উঠবার পথের উপদেশ বা মন্ত্র না নিয়ে মাটির মানুষের উপায় কি?

কানাই রায়ের কথা তবে বলি শোন।

ওই মানুষ কানাই রায়—নেচে-গেয়ে হেসে-খেলে চিরটাকাল যে একভাবে কাটিয়ে গেল তার শেষ কথা বলি শোন। উপপদ-তৎপুরুষ লোকে তাকে কেউ চাইলে না, সেও কাউকে কেয়ার করলে না। লোকে তার কথা শোনে নাই, তবু সে বলতে ছাড়ে নাই। বাবুদের বাড়িতে কাটালে চিরটাকাল। তাদের হিতকামনা করলে, বাবুদের পাওনার আগে নিয়মিত নিজের দস্তুরী আদায় করলে—মদ খেলে; উঁচু গলায় বললে—কে জানে বাবা দুঃখ কাকে বলে! সেই কানাই রায় মরবার সময় বললে—সীতারামকেই বললে—ভগবানকে কি বলে ডাকি বল দিকিনি সীতারাম? ডাকতে যাচ্ছি ডাকা হচ্ছে না। বড় ভয় হচ্ছে যে। ওরে বাবা। কি করি বল দিকিনি?

নিউমোনিয়া হয়েছিল কানাই রায়ের। বাবুদের বাড়িতেই মরেছে। মা তখন নাই, কাজেই সেবাও হয় নাই। অযত্নেই পড়েছিল; দেখতে গিয়ে সীতারামই শেষ তিনদিন তার কাছে ছিল। ফেলে আসতে পারে নাই। তখন তার ঘোর বিকার। আঁঃ! আঁঃ! শব্দ করে বুকের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল; মধ্যে মধ্যে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে আঙুল বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠছিল, মরল রে, মরল রে! গেল, গেল, গেল!

—কি হল? রায়-কাকা! রায়-কাকা!

—যাঃ। শালা খুব বেঁচে গিয়েছে।

শেষদিন জ্ঞান হয়েছিল। সীতারামকে দেখে হেসে বলেছিল—তুমি ? তা না হলে আর কে হবে।

সীতারাম বলেছিল—কেমন আছ ?

বুকে হাত দিয়ে রায় বলেছিল—বুকে বড় কষ্ট।

তারপর বলেছিল ওই কথা। বলেছিল—ওর চেয়ে কষ্ট মনে। বুঝেছ। ভগবানকে কি বলে ডাকব বুঝতে পারছি না। ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারছি না। তুমি বলতে পার ? মরতে ভয় লাগছে।

দীক্ষার কথায় তুমি হেসো না ধীরাবাবু। তোমার তো হাসা উচিত নয়। ধীরাবাবু, যারা ছোট মানুষ মাটিতে থাকে তারা, হাত বাড়িয়ে উঁচুতে যে মানুষ থাকে তাকে নাগাল পায় না। ওপরের মানুষকে তারা বুঝতে পারে না। আবার ছোট মানুষ যারা সুযোগ সুবিধা পেয়ে ওপরে ওঠে তারাও নিচের মানুষকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে না। কিন্তু যারা সত্যি বড় মানুষ, তারা মাটিতে দাঁড়িয়েও উঁচুতে যারা আছে তাদের নাগাল পায়, আবার উঁচুতে উঠেও—নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে মাটির মানুষের হাত ধরে। তাদের তো বুঝতে ভুল হবার কথা নয়।

দীক্ষা না নিলে কাল কাটত কি করে বলুন ?

চোখের সামনে সবই প্রায় মুছে গিয়েছে। সাদা কুয়াশায় ঢাকা পৃথিবী। দাওয়ায় বসে থাকি আর মনের মধ্যে ইষ্টকে ডাকি।

বেলা নটায় একবার পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক হয়।

ছেলেরা রাস্তা দিয়ে পাঠশালা যায়। সন্দীপন পাঠশালার ঘড়িটা ঘরে টাঙানো আছে। সেটাতে ঢং ঢং করে নটা বাজলেই কান তার সজাগ হয়ে ওঠে। ঝুঁকে দেখে সীতারাম। কুয়াশার মধ্যে আবছা মূর্তির মত ছেলেদের দেখে—নিতাই তাদের ডাকে,—প্রশ্ন করে—ইস্কুলে চললে সব ?

—হ্যাঁ।

—ইস্কুল কেমন লাগছে ?

—ভাল।

—ভাল ? সত্যি বলছ ?

—হ্যাঁ। সত্যি বলছি।

—মাস্টার মারে না ?

—মারে।

—তবে ? তবে কেন ভাল লাগছে ?

—লাগে। কত ছেলে আসে এ-গাঁ ও-গাঁ থেকে। কেমন সুন্দর বাড়ি। অনেক ছবি। কেমন চকচকে বেঞ্চি।

সীতারাম চুপ করে যায়। সে ভাবে কালের পরিবর্তনের কথা। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার সন্দীপন পাঠশালা উঠে গিয়েছে গত চল্লিশ সালে। তখন ফ্রি প্রাইমারী ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। আপসোস তার ছিল না। সে অক্ষম হয়েছে, অন্যদিকে বিনা বেতনে দেশের সবাই পড়তে পাবে, সুতরাং এতে তার আক্ষেপের কি আছে। আক্ষেপ শুধু নামটা যদি থাকত। সন্দীপন পাঠশালা। আর আক্ষেপ তার প্রথম জীবনে এমন সুযোগ কেন পায় নাই ? সে যদি এমনি একটি সুসজ্জিত ইস্কুলে শিক্ষকতা করতে পেত! উদাস হয়ে যায় সে। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হয়। সে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা—আচ্ছা! তোমাদের চেয়ার টেবিল ঘর বাড়ি তো ভাল হয়েছে—ফুলের বাগান করেছ তোমরা। ওহে ? কই! সব চলে গেলে নাকি ?

তারা তখন চলে গিয়েছে।

সীতারাম চুপ করে বসে থাকে। পথ দিয়ে কেউ গেলে ডাকে—কে যাচ্ছ ?

—আমি হে পণ্ডিত।

—কে ? চণ্ডীচরণ ?

—হ্যাঁ।

—শোন, শোন।

—মেলা কাজ পণ্ডিত, শুনবার এখন সময় নাই। গাই দুইতে হবে। কচি বাছুর। তার উপর গাইটা মাথা নাড়ে। মেয়েদের সাধ্যি নাই কাছে যায়।

—যাও। তবে যাও।

চণ্ডীচরণ অর্ধ মিথ্যা বলে গেল। গাই হয়তো দুইতে হবে কিন্তু তার জন্যই সে এত ব্যস্ত হয়ে চলে গেল না, সীতারামের কাছে বসতে চায় না বলেই চলে গেল। সে জানে, ওরা বলে—বাপ্, ওই মানুষের কাছে বসা চলে ? শুধুই নেকাপড়ার কথা—নয়তো বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথা। যদি দুটো রসের কথা বলব তো একেবারে ছি-ছি করে উঠবে। রামঃ!

কি করবে সে ? সে এসব পারে না। কেমন যেন রুচি হয়ে গিয়েছে তার ; পবিত্র হয়তো বটে কিন্তু একটু বেশী শুকনো-কঠিন তাতে সন্দেহ নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ডাকে—মা রত্না!

রত্না এ সময়টা রান্নার কাজে থাকে। সে ভিতর থেকে উত্তর দেয়—কি বাবা ?

—কি করছিস ?

—তরকারি চড়িয়েছি বাবা।

—ও, তবে থাক।

—কেন বাবা ? চা খাবে ?

এখন ওই অভ্যাসটা করেছে সে। চা খায়। দুবার তিনবার চারবারও খায়। চায়ের লোভে দু-চারজন আসে। কেউ না এলে রত্নাই কাছে বসে একটা বাটি নিয়ে।

আর কিছুই না হলে, চুপ করে বসে থাকে। ভাবে—সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে—চলছে সে, চলছে সে, চলছে সে। সেই শুধু বসে আছে। সে ভাবনাও দুঃসহ হয়ে উঠল—কি করবে সে? বলতে পার ধীরাবাবু? কি করবে?

তখন ওই ইষ্টমন্ত্র জপ। ধ্যান করতে চেষ্টা করে সেই ইষ্টদেবতার রূপ। মন্ত্র না হলে চলে ধীরাবাবু!

কাল কাটে। চমৎকার কাটে। কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতেই পারে না। রত্না এসে ডাকে—বাবা ওঠ, চান কর। বেলা যে অনেক হল।

সত্যিই বেলা অনেক; স্বাধীন রত্নহাটার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে—বড় ইস্কুলে—টিফিনের ঘণ্টা বাজে—ঢং ঢং ঢং—ঢংননননন।

* * *

ধপ্ ধপাস্, ধপ্ ধপাস্;—দুটো অসমান শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। সীতারাম শুনেই বুঝলে, শ্রীমান বাঁকাচাঁদ গোবিন্দ ছোট-বড় পায়ে একটা বেশী একটা কম শব্দ তুলে ছুটে আসছে। এস বাঁকাচাঁদ, বঙ্কুবিহারী।

ওই—ওই একজন আছে—তার এই নিঃসঙ্গ-জীবনের সঙ্গী। মধ্যে মধ্যে দু দিন তিন দিন অন্তর এক-এক দিন গোবিন্দ আসে। এক বেলা—কোন দিন দু বেলাই কাটিয়ে যায়। রাজ্যের সংবাদ নিয়ে আসে।

—বুয়েচ না পণ্ডিত, ভারী জবর খবর গো আজ।

—কি জবর খবর বাঁকা রায়?

—মানে, কলির শেষ। মা চণ্ডীর থানে সবাই পুজো করতে পাবে, মন্দিরে ঢুকবে আইন হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতরো বেপার, চাটুয্যে বাড়িতে এক কিম্ভূতকিমাকার সন্তান, মাথায় সিং। কলির শেষ।

এমনি বিচিত্র খবর আনে সে। কোন দিন খবর আনে—"মন্ত্রী আসছে রত্নহাটায়। বাবুতে বাবুতে মারামারি লেগে গিয়েছে। এ বলছে মন্ত্রীকে হামারা বাড়িমে উঠনে হোগা, ও বলছে কভি নেই, হামারা বাড়িমে উঠেঙ্গা।"

স্বাধীন দেশের মন্ত্রী আসছে। বিবাদ করবে বই কি বাবুরা। করুক। কিন্তু মন্ত্রীরা বাবুদের বাড়ি ওঠে কেন? মনটা কেমন অসন্তোষে ভরে ওঠে। গরীবের বাড়িতে ওঠে না কেন?

কোন দিন খবর আনে, কলকাতায় বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার। উড়োজাহাজ ভেঙে পড়েছে।

কোন দিন বাঁকাচাঁদ আসে, বলে—"পণ্ডিত হয়েছে। চল কালই চল। একেবারে চোখ ভাল করে নিয়ে বাড়ি আসবে। স্বপ্ন দিয়ে তীর্থ উঠেছে গো, যেমন রোগী হোক, সাতদিন চান

করে গড়াগড়ি দিলেই ভাল হয় যাচ্ছে। বুয়েচ না, কুষ্ঠ রোগী সেরে গিয়েছে। এই কাছেই হে। কোশ বিশেক হবে।"

সীতারাম হাসে। সে ইষ্টমন্ত্র জপ করে বটে, কিন্তু এ বিশ্বাস ওর নেই।

একদিন খবর এনেছিল, পণ্ডিত তোমার জয়ধরকে দেখলাম। অঃ! এই শরীর হয়েছে, রাজ্যের জিনিস সঙ্গে। ইষ্টিশানে নামলে। আমাকে চিনলে হে। বললে, খোঁড়া গোবিন্দ! আরদালীটা আমাকে ভাগো ভাগো করছিল কিন্তু জয়ধর চিনলে বলে সরে গেল। তোমার কথা শুধালে; আমি বলছিলাম তোমার বেবরণ, তা সব বলা হল না। তার আগেই তোমার ভাড়ার মটর এসে গেল। জিনিসপত্র নিয়ে ভোঁ করে চলে গেল। আমাকে আট আনা দিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম গোটা টাকাটাই দেবে। হাকিম একটা! তা তোমার আট আনা!

জয়ধর এখন মুন্সেফ।

সীতারামের নোট-বইয়ে জয়ধরের নাম বহুবার থাকবার কথা কিন্তু তা নাই; আছে তার ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাওয়ার খবর। আই-এ তে দ্বিতীয় হওয়ার খবর। তারপর আছে একটা খবর, সেটা লিখেও কেটে দিয়েছে সীতারাম। বি-এ যখন পড়ে জয়ধর, তখন একদিন আকু স্টেশন থেকে ছুটে এল। স্যার জয়ধর নেমেছে স্টেশনে।

জয়ধর! সীতারাম উচ্ছ্বসিত হয়ে আকুকে বলেছিল, আকু, তাকে গিয়ে বল্ আমি ডাকছি। শিগ্‌গির যা।

জয়ধর কলেজ থেকে আসে যায়, এ পথে নয়। অন্য স্টেশনে নেমে ঘুর-পথে যায়। তার মা তখন চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে বাড়িতে সীতারাম বুঝতে পারত জয়ধরের লজ্জার হেতু।

আকু গেল। সীতারাম অপেক্ষা করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইল। কিন্তু দুজনের একজনও এল না। অবশেষে জ্যোতিষ সাহার ভাইপোর কাছে খবর পেলে—আকুতে এবং জয়ধরে স্টেশনে একটা বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।

—কেন? কিসের ঝগড়া? তার অনুশোচনা হল—কেন এই চণ্ডাল আকুকে সে তাকে ডাকতে বলেছিল!

সীতেশ একটু চুপ করে থেকে যেন দ্বিধা করেই বললে—আকু বলেছিল—পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করে যা জয়ধর। তাতে জয়ধর বলেছিল—আমার দেরি হয়ে যাবে বাড়ি যেতে। তাতেই আকু বুঝি বলেছিল—হ্যাঁরে—দেরি হবে বলে পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করবি না? আচ্ছা নেমকহারাম তো তুই! এই ঝগড়া। জয়ধর সব কি বলেছে, আকুও বলেছে। আকুর মুখ তো!

জয়ধর বলেছিল—অনেক পণ্ডিত অনেক মাস্টারের কাছেই পড়লাম—সকলের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করতে হলে—পা ক্ষয়ে আধখানা হবে, মাথা ঠুকে ঠুকে আব হবে কপালে। তোর ওই একটা পণ্ডিত—তুই যা!

আকুও জয়ধরের ঝিয়ের সন্তানত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বলেছে অনেক কথা; রত্নহাটার বাবুদের ছেলে সে। কিন্তু জয়ধর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সে এমন তীক্ষ্ণ ভাষায় তাকে শরাঘাত করেছে যে, আকু হার মেনেছে। তারপর জয়ধর অন্য রাস্তা ধরে বাড়ি চলে গিয়েছে। দেখা করে নাই।

এ ঘটনাটি লিখেও সে কেটে দিয়েছে।

তবে তার বি-এ, এম-এ পাসের তারিখ আছে। মুন্সেফ হওয়া সংবাদ পাওয়ার তারিখ আছে। আর নাই। কল্যাণ হোক জয়ধরের; জয়ধরকে সে জীবন থেকে মুছে ফেলেছে। ওই মুন্সেফ হওয়ার সংবাদ পেয়ে—সে জয়ধরকে আশীর্বাদ করে চিঠি লিখেছিল; নিজের অবস্থার কথাও লিখেছিল—পার তো একবার হতভাগ্য পণ্ডিতকে দেখে যেয়ো। উত্তরে চিঠি আসে নাই, এসেছিল পাঁচ টাকার একটি মণি-অর্ডার। হায় জয়ধর! সীতারামকে তুই ভিক্ষুক ঠাওরালি। সে কি তোকে সাহায্যের জন্য তার দুঃখ জানিয়েছিল রে? টাকাটা সে ফেরত দিয়েছিল। সেই দিন থেকে সে তাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে।

তবু তার অমঙ্গল কামনা সে করে নাই। ধীরাবাবুরই একটা কথা সে স্মরণ করেছিল—ধীরাবাবু একদিন দেবুর প্রথম ভাগ উল্টে দেখতে দেখতে বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয় ত্রিকালদর্শীর মত প্রথম ভাগ রচনা করেছেন পণ্ডিত। দেখেছেন—আগে অচল তারপর অধম। সংসারে যে চলে না তাই অচল, আর যা অচল—তা-ই অধম। সেদিন সীতারাম বলেছিল, না ধীরাবাবু কথাটা উল্টো, যা বা যে অধম তা-ই বা সে-ই অচল। দেখুন না আমাদের দিকে তাকিয়ে, অধম ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি তাই অচল হয়েই রইলাম সংসারে। শিবকিঙ্করের দিকে তাকিয়ে দেখুন অধম কুলে অধম ভাগ্য নিয়ে জন্মায় নাই বলেই অচল হয়েও উত্তম বলে চলে যাচ্ছে।

এখন সে মনে মনে স্বীকার করলে, যে চলে না সে-ই অচল, যে অচল সে-ই অধম। জয়ধর চলেছে ছুটেছে। সে চলে নাই সে অচল অধম।

গোবিন্দ অসম পায়ে বিচিত্র শব্দ তুলে আজ ছুটে এল।—পণ্ডিত।

—কি সংবাদ বাঁকাচাঁদ? কি গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে আজ?

—এসে পড়ল পণ্ডিত!

—কে?

—তোমার ধীরাবাবু হে।

—সে কি? তিনি তো সন্ধ্যের পর আসবেন।

—না হে, মিটিং-ফিটিং বাদ দিয়ে বললে, আগে আমি পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করব।

অভিভূত হয়ে পড়ল সীতারাম। বিশ্বসংসার যে মধুময় হয়ে উঠল। এত মধু আছে পৃথিবীতে? ধীরাবাবু কে? এ তো সব পৃথিবীর মধু—এই পৃথিবীর দান। পৃথিবীর মধুতে ধীরাবাবু মধুর।

—পণ্ডিত! ধীরাবাবু সত্যই এসে দাঁড়াল।

সীতারাম জীর্ণ অবনত শরীর সোজা করে বসল। ধীরাবাবু! শরীর তার আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল।

সবলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ধীরানন্দ।—আমি এসেছি পণ্ডিত।

—আমি জানি আপনি আসবেন। রত্না, আসন দে, আসন দে মা।

রত্না আগে থেকেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, আসন এনেছি বাবা।

—দে, পেতে দে। আমার কাছে আয়। নিজেই রত্নার মাথায় হাত দিয়ে বললে, আমার রত্না ধীরাবাবু। আমার শক্তিশেল। প্রণাম কর্ মা।

ধীরানন্দ তাকে আশীর্বাদ করলে।

সীতারাম বললে, লক্ষ্মণের চেয়েও আমি বেশী বীর ধীরাবাবু। শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হয়েছিলেন, হনুমানকে বিশল্যকরণীর জন্যে গন্ধমাদন আনতে হয়েছিল। আমি শক্তিশেল বুকে গেঁথে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সে হাসলে, তারপর বললে, কই, আপনি একটু এগিয়ে আসুন, দেখি আপনাকে, কত বড় লোক আপনি।

—চোখে কি একেবারেই দেখতে পাও না মাস্টার?

—পাই। ভাল পাই না।

—তাই তো।

—আর তাই তো কেন?

—বয়স তো তোমার বেশি নয়।

—পাঠশালার পণ্ডিত, যাদের মাসে আয় পনেরো টাকা। তাদের এই বয়সই ঢের। তা ছাড়া—। হাসলে পণ্ডিত। হেসেই বললে, জানেন তো, সন্দীপন পাঠশালা উঠে গেল। শিক্ষা-কর বসল দেশের উপর। ফ্রী ইউ-পি স্কুল হল; আমার পাঠশালাও তারই মধ্যে চলে গেল। আর চোখ নিয়ে কি করব?

—না পণ্ডিত। তুমি বীর, তুমি সত্যকারের পণ্ডিত। আজ এই নতুন ইস্কুলে তোমাকে দরকার ছিল। নতুন কালে পুরনো কথা, সুখের দিনে দুঃখের কথা বলার মানুষ না হলে যে চলবে না।

—না, আর নয়। চোখও গিয়েছে। কালও নতুন ধীরাবাবু। নতুন ভাল লোক এসেছে। বেশ লোক, ভাল ছোকরা। আলাপ করে আনন্দ পেয়েছি। অনেক কথা হয়েছে তার সঙ্গে। বললে কি জানেন? বললে, সব মানুষকে লেখাপড়া শেখাতে হবে—চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত। ধীরাবাবু, শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। শেখাক। শেখাক। যদি বাঁচি, তবে সেদিন যেন একবারের জন্যেও দৃষ্টি ফিরে পাই। মানুষের সে মুখের চেহারা একবার দেখব।

ধীরানন্দ তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, ওসব কথা থাক পণ্ডিত।

—থাকবে?

—হ্যাঁ। আমি তোমার নিজের কথা শুনতে এসেছি।

—ওই তো আমাদের নিজের কথা গো। অ-আ-ক-খ, লেখাপড়া সবাই শিখুক—পাঠশালার পণ্ডিতদের এ ছাড়া আর কথা কি আছে বলুন? যে না পারবে শিখতে, তাকে বেকুব, বেহুদ্দা, গাধা বলে গাল দোব। হাসতে লাগল সীতারাম।

—সে আমি জানি। ও কথা আমি অনুমান করতে পারি। পণ্ডিত, তোমার মনোরমার কথা বল। তোমার রত্নার কথা বল।

—নেহাত আমার কথা নিয়ে বই লিখবেন আপনি?

—হ্যাঁ। বল তোমার কথা। শুধু তোমার কথা।

—ওরে রত্না! মা, কিষাণ-বউকে বল্ তো, টাটকা দুধ আনতে। ধীরাবাবুকে চা করে দে। নইলে তো গল্প জমবে না। হ্যাঁ—ধীরাবাবু, সেই ভাল। শুধু আমার কথা নিয়ে বই লিখবেন। শ্রীশবাবুও পাঠশালার পণ্ডিত—কিন্তু তিনি অনেক বড় মানুষ আমার চেয়ে। আবার পলাশবুনির পণ্ডিত—সে আমার থেকে অন্য রকম। শুধু আমার কথা নিয়েই বই লিখবেন। তবে যেন মিথ্যে রঙ-চঙ চড়াবেন না। একতারায় যেমন সুর ওঠে, তেমনই বাজাবেন। বাউলের গান যেমন হয়, তেমনই রাখবেন। একরঙা ছবি, যেমন লাগুক, দোসরা রঙের আঁচড় দেবেন না।—এই সন্দীপন পাঠশালার সীতারাম পণ্ডিত।

খাতাখানি তার হাতে দিয়ে বললে, এতেই সব লেখা। শুধু একটা কথা লেখা নাই। দেখুন তো রত্না কোথায়?

—এখানে তো নেই, বোধ হয় রান্নাঘরে।

মৃদু স্বরে সে বললে, ধীরাবাবু, বালিকা বিদ্যালয়ে এক শিক্ষয়িত্রী এসেছিল, তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। পাঠশালার পণ্ডিত হলেও তো মানুষ আমি। সেই কথাটা লেখা নাই। বলি, শুনুন সে কথা।

সে কথা শেষ করে পণ্ডিত চুপ করে বসে রইল।

ধীরানন্দ বললে, পণ্ডিত, আমি তা হলে উঠি?

পণ্ডিতও উঠে দাঁড়াল। ধীরানন্দ আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

সীতারাম হঠাৎ বললে, আর একটা কথা ধীরাবাবু। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—বল পণ্ডিত।

—আমার আরও একটা কথা আছে ধীরাবাবু।

—বল পণ্ডিত। বল।

—আমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে যাবেন? সেখানে বলব, সেখানে বলব।

ধীরানন্দ তাকে ধরে নিয়ে গেল উপরে।

পণ্ডিত ইশারায় ইশারায় তাকের কাছে গেল। ডাকলে, ধীরাবাবু!

—পণ্ডিত?

—আমার পাপ—এ পাপ থেকে আমাকে মুক্ত করুন আপনি। এই বইগুলি আপনার। আমি পড়তে নিয়ে এসে আর ফেরত দিই নাই। এইগুলি নিয়ে যান। রজনীবাবুর একখানা বই আছে। ধীরাবাবু!

ধীরানন্দ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে এসে পণ্ডিতকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলে। ভীরু দুর্বল হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে দারিদ্র্যশীর্ণ বক্ষপঞ্জরের অন্তরালে। আবেগ-প্রাবল্যে দেহ জ্বরোত্তপ্ত উষ্ণতায় প্রখর। ক্ষীণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রয়েছে মুক্ত দ্বারপথে অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মিতে ঝলমল পশ্চিম আকাশের দিকে। ঠোঁট কাঁপছে যেন এক অসহনীয় থরথর কম্পনে।

ধীরানন্দ গভীর স্বরে বললে, জয় হোক, জয় হোক—পণ্ডিত তোমার জয় হোক। ধীরানন্দের আলিঙ্গনের মধ্যে তার চশমাটা খসে পড়ে গেল।

সীতারাম ডাকলে, রত্না! একটা আলো দিয়ে যা মা। ঘর যে অন্ধকার হয়ে গেল।

—যাই বাবা। রত্না সাড়া দিলে।

ধীরানন্দ সবিস্ময়ে বললে, এ কি পণ্ডিত, তুমি কিছুই দেখতে পাও না? ঘরে তো আলো রয়েছে এখনও। এতক্ষণে সে পণ্ডিতের দৃষ্টিহীনতার পরিমাণ বুঝতে পারলে। শিউরে উঠল সে।

সীতারাম হেসে বললে, আলো রয়েছে? ও, চশমাটা খসে পড়ে গিয়েছে কিনা। দেখুন তো ধীরাবাবু, নইলে আমিই হয়তো পা দিয়ে ভেঙে ফেলব।

ধীরানন্দ চশমাটা কুড়িয়ে তার হাতে দিলে। চশমাটা চোখে দিয়ে সীতারাম বললে, এই বেশ।

ধীরানন্দ তার হাত ধরে বললে, পণ্ডিত, তুমি আমার সঙ্গে চল, চোখের চিকিৎসা করাবে।

সীতারাম ঘাড় নাড়লে, না। একটু চুপ করে থেকে বললে, কি দেখব চোখ নিয়ে? রত্নার বিধবা মূর্তি? থাক্।

স্তব্ধ হয়ে গেল ধীরানন্দ।

রত্না আলো দিয়ে গেল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সীতারাম বললে, অন্ধ চোখে আমি ভগবানকে দেখবার চেষ্টা করব। আপনার মা বলেছিলেন—আমি পাব দেখতে। দেখি পাই কিনা। উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সে।

ধীরানন্দ এই মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম করলে।

জনের মাথার উপর বসার ভারি আরাম—এই ভাবে সবাই।. ওরে বাবা, এ দশের মাথায় বসা নয়—এ হ'ল লোহার গজাল-বসানো গাজনের পাটায় গজালগুলোর সুচালো মাথায় ব'সে থাকা। হে ভগবান্! মতি ঠিক রেখো বাবা, মতিভ্রম হ'লেই ওই গজালে চেপে বিঁধে মারবে দশে। বুকের ভিতর রাগ অশান্তি হ'লেই বুঝতে হবে—গজাল বিঁধছে। করালীর ব্যাপারটা নিয়ে মনে যখন অশান্তি ছিল, তখন ওই গজালই বিঁধছিল। মিটে গেল—যাক। ভারি আনন্দ।

চন্দনপুরের বাবুদের ওখানেও সে সুফল পেয়েছে। জয় বাবাঠাকুর! বাবু শুনেছেন তার কথা—বাবুর সেরেস্তার কর্মচারী—কোপাইয়ের অপর পারের গোপের পাড়ার দাসজী মহাশয়ের ছেলে—বনওয়ারীর খুব সুখ্যাতি করলে বাবুর কাছে। পরমের নিন্দেই করলে। বললে—ওই তো আসল মাতব্বর কাহারপাড়ায়। পরম তো আটপৌরেপাড়ার। আটপৌরেরা মোটে ছ-সাত ঘর। তাও সকলে পরমকে মানে না। তা ছাড়া পরম লোকও ভাল নয়। ডাকাতিতে জেল খেটেছে এবং যত কুড়ে তত মাতাল। বনওয়ারীর স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল।

বাবু মন দিয়ে শুনলেন সব। বললেন—আচ্ছা, দেব তোমাকে জমি।

চন্দনপুরের বড়বাবুর চার মহলা বাড়ি, গাড়ি ঘোড়া লোকলস্কর, যাকে বলে—'চার চৌকস' কপাল। ওঁর বাড়ির মা-লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ 'আজলক্ষ্মী'। ওই মায়ের পায়ের 'পাঁজের' ধুলো যদি বনওয়ারী পায়, তবে কি আর দেখতে আছে? আর ওই রকম মনিব নইলে কি মনিব! ওই মনিবের চাকর হ'লে এক হাত ছাতি দশ হাত হয়ে ওঠে। লোকের কাছে ব'লে সুখ কত? তা ছাড়া কত দুর্লভ জিনিস তাঁর আশেপাশে? মেলাখেলায় ঝকমকে আলোর তলায় সারারাত ব'সে নয়ন ভ'রে দেখে যে সুখ, ওই রাজবাড়িতে চাকর হয়ে ঠিক সেই সুখ। বনওয়ারীর মন কল্পনায় পুলকিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ দাঁড়াল বনওয়ারী। ডাইনে জাঙল—সামনে বাঁশবাঁদি। বাঁয়ে পুবে মা-কোপাইয়ের 'পলেনের' অর্থাৎ পলি-পড়া মাঠে রাখাল ছোঁড়ারা গরু ছাগল ভেড়া ছেড়েছে। সকলে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে গাছতলায় কড়ি খেলছে। এদিকে ওই একটা আলোর পাশে একটা শেয়াল মুখ বাড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে; ছাগলগুলো চীৎকার ক'রে ছুটছে, দেখেছে তারা; কিন্তু ভেড়াগুলো এক জায়গায় জমাট হয়ে গায়ে গায়ে বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা জাত! চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। নিলে বোধ হয় একটা। বনওয়ারী হাঁকলে—লিলে রে—লিলে রে! এই ছোঁড়ারা!

রাখালেরা চকিত হয়ে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই শেয়ালটাকে দেখতে পেলে, সঙ্গে সঙ্গে তারা হৈ-হৈ ক'রে ছুটল।—লে—লে—লে—লে। বনওয়ারি ভারি বিরক্ত হ'ল। বেকুবের দল! সব একদিকে ছুটল। কাহারেরা ছেলে হয়ে ধুত্তু শেয়ালের ফন্দি জানে না হতভাগারা! হায় হায় হায়! করালীর আড্ডায় দিনরাত গিয়ে গিয়ে ওদের এই দশা, সেখানে দিনরাত দেশ-বিদেশের আজা-উজীরের গল্প। এসব কুলকর্মের কথা তো হয় না, শিখবে কি ক'রে? ওই একটা শেয়াল ছুটে পালাচ্ছে। তা হ'লে আসল শিকারী পিছন দিকে কোথাও আছে নিশ্চয়। এই ফাঁকে সে এসে একটা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে পালাবে। আচ্ছা ধূর্তের জাত! রাখাল থাকলে ধূর্তেরা এইভাবে একটা এক দিকে দেখা দেবে—উল্টো দিকে লুকিয়ে থাকবে আর একটা কি

ঢুটো। রাখালেরা যেমনই ছুটবে দেখা-দেওয়া ধূর্তটার দিকে, অমনিই পিছন দিক থেকে সেটা বার হয়ে ঝপ ক'রে ভেড়া ছাগল যা সামনে পাবে মেরে টেনে নিয়ে পালাবে। সাধে 'পণ্ডিত মহাশয়' বলে শেয়ালকে! কিন্তু এদিকের ধূর্ত পণ্ডিতটি কই? কোথায়? যেখানেই থাক্, বনওয়ারী ভেড়ার পালের দিকে ছুটতে লাগল।

সামনে একটা নালা। প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে সশব্দে পার হ'ল বনওয়ারী। সঙ্গে সঙ্গে একটা 'খ্যাক্' করে শব্দ হ'ল, তারপরই নালার কুল-ঝোপ থেকে সড়াৎ ক'রে বেরিয়ে পালাল একটা শেয়াল। ছুট—ছুট—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে শেয়ালটা। হরি হরি, পণ্ডিত মহাশয় এইখানেই নালাকে পেছনে রেখে কুলবনের ঝোপে ঝোপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভেড়াগুলোর দিকে। বনওয়ারী ঠিক হাত-পাঁচেক দূরে লাফিয়ে পড়েছে। ঘাড়ে পড়লে ঠিক হ'ত। ওঃ—ওঃ—এখন ছুটছে পণ্ডিত! ধর্—ধর্—ধর্, ধূর্তকে ধর্! পণ্ডিতকে ধর্!

খুব এক চোট হেসে ছোঁড়াগুলোকে পণ্ডিতদের ধূর্ত বুদ্ধির কৌশল বুঝিয়ে দিয়ে বললে—খবরদার, সবাই মিলে কখনও ছুটে যাবি না, একজনা থাকবি ছাগল-ভেড়ার কাছে—বড় দেখে একজনা থাকবি। তা লইলে পণ্ডিত দাঁত মেলে খ্যা-খ্যা ক'রে তেড়ে এসে ছেলেমানুষকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল ক'রে পালাবে। তারপর বললে—কল্‌কেটায় আগুন আছে? ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করলে সে। ধরিয়ে নিলে।

ওই কত্তার 'থান' দেখা যাচ্ছে। প্রণাম করলে বনওয়ারী। বাড়ি ফিরতে গিয়ে গাঁয়ের ধারে এসে মনে পড়ল—বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। বউ বলেছিল—চার পয়সার পোস্তদানা আনতে। ভুলে গিয়েছে। জাঙলে পানার মনিবের দোকান থেকে নিয়ে গেলে হ'ত। কিন্তু, না, থাক্। ধার সে নেবে না। চার আনা পয়সার দু'আনা নিজে খেয়েছে, দু আনা দিয়েছে সিধুকে। এতে তার মন খুশি হয়েছে—সিধুকে পয়সা দিয়েছে, এতে তার মন ভারি খুশি। আহা, 'দুভ্যাগা মেয়ে'! সিধু এখন আঁস্তাকুড়ের অন্নের সমান। আঁস্তাকুড়ে যে অন্ন পড়ে, সে অন্ন আর তুলে নেবার উপায় নাই। কিন্তু সে অন্নও তো লক্ষ্মী! তার জন্য মন না কেঁদে তো পারে না!

* * *

এর কয়েকদিন পরেই হাঁসুলী বাঁকে কাহারপাড়া বাঁশবাঁদিতে আবার একবার বাদ্যি বেজে উঠল। এবার বাজল ঢোল কাঁসি সানাই—কুরুতাক-কুরুতাক-কুরুম-কুরুম। বায়েন এসেছিল একদল, ঢোল কাঁসি সানাই। মেয়েরা এবার দিচ্ছে উলু—উলু—উলু—লু—লু—লু। তারই সঙ্গে ঢুলী বাজাচ্ছে—কুরুর—কুরুর—কুরুর—তাক—তাক—তাক। কাঁসিতে বাজল—কাঁই—কাঁই—কাঁই। সানায়ে সুর উঠল—আহা—মরি—মরি মরি রে মরি, শ্যামের পাশে রাইকিশোরী। বাঁশ-বাঁদির বাঁশবনে-বনে চঞ্চল হয়ে উঠল পাখীর ঝাঁক; তলায় আদ্যিকালের পচা এবং শুকনো পাতার মধ্যে থেকে দু-চারটা খরগোশ বার হয়ে ছুটে পালাল নদীর ধারের জঙ্গলের দিকে। শিয়ালগুলি এত ভীরু নয়, তারা প্রথমটা একবার চঞ্চল হয়েই স্থির হ'ল। সাহেবডাঙার দিকে বুনো-শুয়োর-গুলো নিজেদের আড্ডায় বার কয়েক গোঁ-গোঁ ক'র উঠল। শীতকালের আমেজ এখনও আছে, সাপেরা এখনও মাটির তলায় না-খেয়ে 'ছ-মেসে' দম নিয়ে অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে—তারা মাথা তুলতে

চেষ্টা করলে ; কিন্তু পারলে না। পাখী ও করালীর বিয়ে।

কাহারপাড়ায় মাতন লাগল। তেল হলুদ রঙ নিয়ে মাতামাতি। করালীর সঙ্গে পাখীর সাঙা, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ। নসুরাম—করালীর নসুদিদি—গাছকোমর বেঁধে তেল-হলুদ মেখে, কাপড়ে রঙ নিয়ে হা-হা ক'রে হাসছে আর গাইছে—"আমার বিয়ে যেমন তেমন—দাদার বিয়ের আয়বেঁশে —আয় ঢকাঢক্ মদ খেসে।"

প্রচুর মদ, বড় বাড়ি হাঁড়ি থেকে বাটি ভ'রে তুলে ঢেলে দিচ্ছে একজন, সকলে আকণ্ঠ পান করছে। করালী দরাজ হাতে খরচ করছে। তার সঙ্গে কাহারপাড়ার কার সঙ্গ ? সে হাট হাট ক'রে তাড়িয়ে লাঙল চ'ষে না, হিম্-প্লো হাঁক হেঁকে পাল্কি ব'য়ে খায় না, সে 'অ্যাল' কোম্পানিতে চাকরি করে, নগদ 'ওজকার।' সে সেটা দেখিয়ে দিতে চায়, বুঝিয়ে দিতে চায় এই সুযোগে। সে দেড় কুড়ি টাকা নগদ খরচ করেছে। খাসী কিনেছে, ছোলার ডাল কিনেছে—জ্ঞাতিভোজনে সে চুনোপুঁটির অম্বল আর কাঁচা কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত দেবে না। পাখীকে শাঁখা-শাড়ি-সিঁদুর-নোয়া ছাড়াও দেবে অনেক জিনিস, অনেক গয়না ; রূপদস্তার নয়, রূপোর গয়না। হাতে চারগাছা ক'রে আটগাছা চুড়ি, গলায় দড়ি-হার, কোমরে গোট। এ ছাড়া একপ্রস্থ গিল্‌টির গয়না —সুতহার, পার্শী মাকড়ি, হাতে বাজু অনন্ত বালা। পাড়ার ঝিউড়ী-বউড়ীরা ধন্য ধন্য করেছে করালীকে। ছেলে-ছোকরারাও বাহবা দিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করছে, রেল কোম্পানির ওই আজব কারখানায় চাকরির চেষ্টা ওরাও অতঃপর করবে। পরক্ষণেই দ'মে যাচ্ছে। যে মাতব্বর আছে, সে কি ও-মুখে কাউকে হাঁটতে দেবে ? করালীর মত বুকের পাটা তাদের নয়, তারা বনওয়ারী মাতব্বরকে অমান্য ক'রে রেল কোম্পানিতে খাটতে যেতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে ভেসে ওঠে বনওয়ারীর মূর্তি। চোখ বড় করে হাত তুলে বলছে, পিতিপুরুষের বারণ। সাবোধান!

কিন্তু বনওয়ারী মাতব্বর হয়তো করালীকেও এবার কায়দা করলে। তাকে বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, পঞ্চায়েতের হুকুম অমান্য করা চলবে না। দেবতা-গোঁসাইকে মানতে হবে, অনাচার অধর্ম করবে না। পাকাচুলের কথা না শোন না-ই শুনবে, কিন্তু প্রবীণ মুরুব্বির 'রপমান' কখনও করবে না। করালী সে প্রতিজ্ঞা করেছে।

এই বিয়ের খরচ নিয়েও বনওয়ারী তাকে বলেছিল—এত ভাল লয় করালী। যা রয় বয় তা করতে হয়। এত খরচ করতে তু পাবি কোথা ?

করালী অন্য সময় হ'লে বলত—আজারা মানিক কোথা পায় ? নিশ্চয় বলত এ কথা এবং মুখ টিপে হেসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত কথাটা। কিন্তু এবার সে হাত জোড় ক'রে বনওয়ারীকে বললে—হেই কাকা, তোমাকে জোড় হাত ক'রে এবার বলছি, এবার কিছু বলো না। বিয়ে আমার পাখীর সঙ্গে।

বনওয়ারী পরিতুষ্ট হয়ে হেসে বললে—আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে করালীকে একটু আড়ালে ডেকে প্রশ্ন করলে, কিন্তুক বাবা, একটি কথা বল্ দেখি নি, এত টাকা তু পেলি কোথা ? কোম্পানির কিছু চুরিচামারি করিস নাই তো ? দেখ্ ? ফেসাদ হবে না তো ইয়ের পরে ?

করালী তার গায়ে হাত দিয়ে বললে—এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি। সে সব ভেবো না তুমি। মাইরি বলছি।

বনওয়ারী চলে গেল বসনের বাড়ির দিকে। করালীর কাকা, পাখীর মামা সে, পাড়ার মাতব্বর, তার দায়িত্ব কত!

করালী হলুদ তেল মেখে স্নান ক'রে টেরি কাটতে বসল। নতুন আয়না-চিরুনি কিনেছে। গোলাপী রঙের বুকে-ফুল-কাটা গেঞ্জি গায়ে দেবে। নতুন একখানা মিহি ধুতি হলুদ রঙে রাঙিয়েছে; সেগুলো নসুদিদি সামনে রাখলে পাট ক'রে। আর রাখলে নতুন একখানা বাহারের 'থইলো' অর্থাৎ তোয়ালে; করালী বলে—তইলা, নসু বলে—থইলা। কাহারপাড়ার উপকথায় বরের সাজসজ্জায়—করালী কলিযুগ এনেছে, কলিযুগের ছেলেছোকরা ঝিউড়ি-বউড়ীরা এ সব দেখে মোহিত হ'লেও প্রবীণেরা এটা বরদাস্ত করতে পারছে না। তারা সবাই একটু ভুরু কুঁচকে এড়িয়ে চলছে। আপনাদের মধ্যে বলছে, এতটা ভাল নয়। মদের গন্ধেও তাদের মন খুব সরস হয়ে উঠছে না। অবশ্য দু-এক পাত্র ক'রে সবাই খেয়েছে; কিন্তু ছোকরা এবং মেয়েদের মত মাতনে মন মেতে উঠতে চাচ্ছে না তাদের। তবে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে করালীকে। যেমন জোয়ান, তেমনই সুন্দর, তেমনই পোশাক। কাহারপাড়ায় ও যেন মোহন সাজে এক নতুন নটবর এসেছে!

প্রহ্লাদ হ'ল বনওয়ারীর পরের মান্যের লোক। সে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত। সে বলেই মুখ খুলে—কাজটা ভাল করলে না বনওয়ারী ভাই। মাতব্বরের মতন কাজ হ'ল না। করালীকে শাসন না ক'রে তার দণ্ড না করে এই 'পেকার' 'আসকারা' দিলে, এর ফল ভাল হবে না। তাও একজনার ঘর ভেঙে—

গুপী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ভাই রে, ওই নয়ানের বাপের 'পেতাপ' কত ভেবে দেখ। 'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা।' মাতব্বরের এ বিচার ভাল হল না।

রতন—লটবরের বাপ; অবাধ্য ছেলে লটবর, করালীর অনুরক্ত ভক্ত। অবাধ্য ছেলের দায়ে রতনকে করালীর অর্থাৎ লটবরের দলের টান টানতে হয়, সে বললে—তা ছোকরা বাহাদুর বটে। করলে খুব।

নিমতেলে পানু অল্পবয়সী হ'লেও প্রবীণদের দলেই চলে ফেরে, সে ফুট কাটতে অদ্বিতীয়, সে বললে—লুট—লুট—লুটের পয়সা বুঝলে? আমাদের মত চাষে খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলায়ে এই ধুম করতে পারত, তবে বুঝতাম। বুল্লে কিনা, অ্যালের পুরানো 'সিলপাট' কাঠ চুরি ক'রে চন্নপুরে কতজনাকে বিক্কি করেছে—সে আমি জানি।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ভাবছে। মনে পড়েছে আগুনের আঁচে-ভরা বাঁশতলা, মনে পড়েছে বটতলায় কালোবউয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা।

করালী এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। তার বগলে দুটো পাকি মদের বোতল। নামিয়ে দিলে প্রহ্লাদ-রতনের সামনে।—নাও কাকা, আরম্ভ কর, আরও আছে।

ওদিকে গাল দিচ্ছে নয়ানের মা।

নয়ান চুপ ক'রে ব'সে আসে নিজের দাওয়ায়। বুকটা 'ধুঁপছে', পাঁজরাগুলো উঠছে, নামছে, কালো কঙ্কালসার তোবড়ানো মুখের মধ্যে সাদা চোখ দুটো হাঁসুলী বাঁকের মাথায় কত্তাবাবার থানের দিকে চেয়ে রয়েছে—স্থির নিষ্পলক হয়ে। সে মনে মনে বাবাকে ডাকছে। আর কল্পনা করেছে ভীষণ কল্পনা।

নয়ানের মা তারস্বরে গালাগাল দিচ্ছে, অভিসম্পাত দিচ্ছে করালীকে এবং পাখীকে। কত্তাবাবাকে, কালরুদ্রকে ডাকছে বিচার করবার জন্য। সমস্ত সমাজের প্রবীণদের উদ্দেশে বনওয়ারীর আচরণের প্রতিবাদ করবার জন্য বলছে—মঙ্গল নাই, মঙ্গল নাই, এমন মাতব্বর যেখানে। মধ্যে মধ্যে তাদের অর্থাৎ ঘরভাঙাদের পূর্বগৌরব স্মরণ ক'রে বিলাপ করছে।—বনওয়ারী মাতব্বর! মাতব্বরের এই কি বিচার? এমন মাতব্বর যেখানে, সেখানের মঙ্গল নাই। একজনের ঘর ভেঙে দিয়ে আর একজনের ঘর গড়ার নাম মাতব্বরি? শত্তুর, চিরকালের শত্তুর ওই কোশকেঁধেরা এই ঘরভাঙাদের বাড়ির। এই বাড়ি ছিল একদিন মাতব্বরের বাড়ি, এই বাড়ির উঠানে উবু হয়ে ব'সে লোকের বাপ-ঠাকুরের হাঁটুতে পাছায় কড়া পড়েছে। তারপর অনাথা ছেলের কালে উড়ে এসে জুড়ে বসল। হালে উঠতি ঘোষ বাবুদের দেমাকে বড়কে বড় মানলে না, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হয়ে পড়ল। বিধেতা এর বিচার করবেন।

নয়ান ব'সে বসে ওই ন্যাড়া-মাথা, গলায় রুদ্রাক্ষ, ধবধবে পৈতে, পরনে গেরুয়া, পায়ে খড়ম—কত্তাঠাকুরকে যেন মনশ্চক্ষে দেখছে। বেলগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন—একটি কুটিল চোখের তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে। চেয়ে আছেন তিনি করালীর ঘরের দিকে। পায়ের তলায় প'ড়ে আছে সেই বিরাট চন্দ্রাবোড়া—করালী যাকে মেরে বাহাদুরি নিয়েছে। সে কি মরে? বাবার সাপ সে! কত্তার বাহন। সে বেঁচে উঠেছে। লক লক ক'রে জিব নাড়ছে। বাসরঘরে ওই সাপ ঢুকবে।

বসনের বাড়িতেও অনেক মদ, অনেক নেশা, অনেক নাচ, অনেক গান। সুচাঁদ বলে—সিঁদুরের মত 'রঙ' লাগবে চোখে, তবে তো বিয়ের মাতন। চারিদিকে 'আতদিন' অক্তসন্ধ্যে নেগে থাকবে।

সুচাঁদের সে রঙ চোখে লেগেছে।

প্রথমটায় সে কিছুটা মদ্যপান ক'রে ব'সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে; তারপর একটা বাটিতে মদ আর আঁচলে মুড়ি লঙ্কা নিয়ে বাঁশবনের ধারে ব'সে কেঁদেছে। কেঁদেছে তার মরা বাপের জন্য, মরা জামাই অর্থাৎ পাখীর বাপের জন্য—আঃ, এমন দিনে তারা বেঁচে নাই। মধ্যে মধ্যে চোখ মুছে কান্না বন্ধ ক'রে মুখে মুড়ি চিবিয়ে লঙ্কার ঝাল জিভে ঠেকিয়ে, মদ খেয়ে নিচ্ছিল।

তাকে ডেকে নিয়ে গেল বসন। তখন সুচাঁদ কাঁদছিল মরা জামাইয়ের জন্য। বসনও কাঁদলে। সে কাঁদলে শুধু মৃত স্বামীর জন্য নয়, জাঙলের চৌধুরী-বাড়ির ছেলের জন্যও কাঁদলে। 'তিনি' যদি আজ বেঁচে থাকত। পাখীর মুখ অবিকল তার মত। তেমনিই তারই মত গোরা রঙ। রঙ-কালো বসনের কোলে ছেলেবেলার ফরসা-রঙ পাখীকে যা চমৎকার

মানাত। যেন সবুজ গাঁদা গাছে হলুদ রঙের গাঁদা ফুল ফুটেছে। এই কথাটি বলত চৌধুরীবাবুর ছেলে নিজে। তিনি থাকলে কত ধুম করত বসন।

সুচাঁদ উঠে আবার মন্ত পান ক'রে এবার উঠানে ব'সেই হঠাৎ কাঁদতে লাগল। মেয়েরা গান করছিল। রঙের গান। কান্না শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল; সুচাঁদ এবার ভয়ঙ্কর নাম ধরে কাঁদছে। বাবার নাম ধ'রে।

—ওগো কত্তাবাবা গো,ওগো কত্তাঠাকুর গো। মতিচ্ছন্ন ধরেছে। সবার মতিচ্ছন্ন ঘটেছে বাবা; তোমার বাহন মারার পিতিবিধেন হ'ল না বাবা। তোমার মহিমে তুমি পেচার কর বাবা। তোমার বাহনকে বাঁচাও তুমি বাবা।

বাবার বাহন! সেই চন্দ্রবোড়া সাপটি। বসন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। পাখী চমকে উঠল।

বনওয়ারী বসনদের বাড়ি থেকে ফিরে যাবার পথে একটা গাছতলায় থমকে দাঁড়িয়ে শুনছিল নয়ানের মায়ের গালিগালাজ। ওই সঙ্গে সুচাঁদের বিলাপ তার কানে যেতেই সে বিস্ফারিত চোখে ঘুরে দাঁড়াল। করালী সাপটিকে মেরেছে। এ বিরাট অজগর তার প্রথম অস্তিত্ব জানিয়েছিল ওই বাবার 'থান' থেকে। সে যে বাবার বাহন, তাতে তো তারও সন্দেহ নাই। সেও থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

হে বাবা! হে কত্তাঠাকুর! হে কাহারদের মা-বাপ! মাজ্জনা কর বাবা মাজ্জনা কর। অবোধ মুখ্যু করালীকে মাজ্জনা কর। বনওয়ারীকে মাজ্জনা কর। পূজো দোব বাবা, আবার পূজো দোব।

সন্ধ্যার আঁধার তখন ঘনিয়ে আসছে। বাঁশবনের তলায় জমেছে অপদেবতার ছোঁয়াচ-লাগা থমথমে ভর-সনজের মুখ-আধারি। সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি বনওয়ারী এসে উঠল বাবার থানে। বেলগাছতলায় হাঁটু গেড়ে ব'সে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে মনে মনে বাবাকে প্রার্থনা জানাতে লাগল। বনওয়ারী একজন অতিসাহসী। কতবার কত অপদেবতার অস্তিত্ব সে অনুভব করেছে, কিন্তু ভয় পায় নাই। একবার মনে আছে—সন্ধ্যার পর মাছ নিয়ে আসছিল ওপারের মহিষডহরির বিল থেকে। দু পাশে দুজন এল শেয়ালের রূপ ধ'রে। এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে কত ফাঁদই তারা পেতেছিল। বনওয়ারী কৌতুক অনুভব করেছিল। কত সন্ধ্যায় বাবার থানে এসে প্রণাম করেছে। রাতদুপুরেও এসেছে। গা কাঁপে নাই। আজ চোখ বুজতেই মনে হচ্ছে, বাবা যদি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন! করালী মেরেছে বাবার বাহনকে, সেই করালীকে সে ফিরিয়ে এনেছে স্নেহ-সমাদর ক'রে। বাবার ক্রুদ্ধ মূর্তি তার মুদিত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই চিত্র-বিচিত্র শিস-দেওয়া চন্দ্রবোড়া দেখতে দেখতে ফুলে ফুলে মাথা তুলে উঠতে থাকে—মাথা ওঠে তাল গাছের ডগায়, চোখের দৃষ্টিতে ধক-ধক করে আগুন, গায়ের চিত্রবিচিত্র দাগগুলি বাড়তে থাকে, জিভ ওঠে লকলকিয়ে—কামারের আগুনে তাতানো অগ্নি-'বন্ন' ইস্পাতের পাতের মত; সেই অজগরের মাথায় খড়ম পায়ে দিয়ে, গেরুয়া প'রে, ন্যাড়া-মাথা বাবাঠাকুর ভেসে ওঠেন। বাবার গলার রুদ্রাক্ষগুলি হয়ে ওঠে মড়ার মাথা, বুকের ধবধবে পৈতে হয়ে ওঠে দুধে-গোখরোর পৈতে।

বনওয়ারী থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

বহুক্ষণ পর সে কোনক্রমে শান্ত হয়ে মনে মনে বলে—বাবা, পুজো দোব, মার্জ্জনা কর তুমি। তারপর বলে—যদি মার্জ্জনা না কর বাবা, জানিয়ে দাও। পড়ুক, তোমার গাছ থেকে একটি বেল খ'সে পড়ুক। আমি মনে মনে পাঁচ কুড়ি গুনছি।

সে গুনতে থাকে। এক দুই তিন চার···এক কুড়ি। আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট—

পাঁচ কুড়ি শেষ হ'ল।

বেল পড়ল না। বনওয়ারী এবার উঠল সেখান থেকে।

পাড়ায় তখন পরিপূর্ণ মাতন। মুরুব্বিরা ভরপেটে পাকি খেয়েছে, টলছে। মেয়েরা নাচছে। আঁধার রাত্রিতেও চারিদিকে যেন রক্ত সন্ধ্যার রঙ লেগে রয়েছে। সুচাঁদের ঊর্দ্ধ অঙ্গে কাপড় নাই। সে নাচছে। কাপড় ধুলোয় লুটুচ্ছে। সেও নাচবে।

বসন করালীও ঠিক করেছে, পুজো দেবে। বনওয়ারী খুশি হ'ল। পুরো বোতল পাকি মদ নিয়ে সে বসল। খেতে খেতে হঠাৎ উঠল। বায়েনদের বাজনা ঠিক হচ্ছে না। হাতে তাল দিয়ে সে বললে—বাজাও বাবা, বাজাও—বর আসিলো বর আসিলো, ও বউ, তুমি অঙ্গ তোল। হঁ্যা হঁ্যা, বাবা, বর নামিলো বউ নামিলো, ও বর, বউয়ের সান্-টি খোল।

কাঁসি-বাজিয়ে ছোকরা নিজেই বলছিল—কাঁই-কাঁই-কাঁই—কিটি—কিটি—কাঁই-কাঁই।

বনওয়ারী তাকে বাহবা দিলে—আচ্ছা, আচ্ছা! সঙ্গে সঙ্গে কে চাপা হাসি হেসে উঠল। কে রে? কে? কোন্ মেয়ে? কার এত বাড়? বনওয়ারী ঘোর-লাগা চোখ তুলে চাইলে। চোখ তুলেই কিন্তু তার রাগ প'ড়ে গেল।—ওরে বাপ রে! তুমি কখন হে? কি ভাগ্যি আমাদের, কি ভাগ্যি! আটপৌরেপাড়ার মাতব্বরের গিন্নি—কালোবউ! কালোশশী! কালোবউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে, উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক কিছু বুঝতে পারা যায় না।

কালোবউ তাকাচ্ছে; কোন্ দিকে? বনওয়ারী চারিদিক চেয়ে দেখলে, চারিদিকে মাতন।

শেষ রাত্রে মাতন স্তব্ধ হ'ল। ভোরবেলা কাহারপাড়ায় সেদিন অগাধ ঘুম। বনওয়ারীকে কে ঠেলে জাগিয়ে দিলে। বনওয়ারী উঠে বসল। বটগাছতলায় ঘুম ভাঙল তার। সামনে রোদের চিকচিকে ছটা যেন হাসছে। বনওয়ারীও হাসলে। কালোবউ নাই।

চার

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় দিন গেলে যে-রাত্রি নেমে আসে, তার সঙ্গে জাঙল-চন্দনপুরের রাত্রির অনেক তফাত। বাঁশবন যোগান দেয় তার তলায় লুকিয়ে-থাকা আদ্যিকালের অন্ধকার রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে। তার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকে, হরেক রকম পোকা ডাকে, তক্ষক ডাকে টক্‌টক্‌ শব্দ ক'রে প্যাঁচা ডাকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে, আবার গভীর রাত্রে ডাকে হুম-হুম পাখী। বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে ধারে 'দপদপিয়ে' অর্থাৎ দপ-দপ ক'রে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির মত ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমুলের মাথা থেকে। বাঁশমনে ক্যাঁ-ক্যাক ক্যাঁ-ক্যাক ডাক ওঠে, কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায়—গেছো পেত্নী কি কোন ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে—সেটা উঠে যাচ্ছে সোজা উপরে। সেটা ওদের খেলা।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা তারই মধ্যে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে কত্তাঠাকুরের নাম নিয়ে কোনমতে জটলা পাকিয়ে ব'সে থাকে। ছেলেছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্র মাসে ভাদু-ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা-দশভুজার পুজোয় গায় পাঁচালী, কার্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত—তখন গানবাজনার আসর আসে ঢিমিয়ে, ধান-কাটা ফসল তোলার সময়। চৈত্রে আবার নতুন ক'রে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের, বোলানের গানের পালা।

মাঝে মাঝে এরই মধ্যে আসে দু-দশটা রাত্রি, যার সঙ্গে অন্য সকল রাত্রির কোন মিল নাই। বিয়ে-সাদীর রাত্রি, আর বারো মাসে বারোটা পূর্ণিমা কি 'চতুকদশী'র রাত্রি, তার মধ্যে আষাঢ়-শাওন-ভাদরের 'ডাউরী' অর্থাৎ বাদল-লাগা পূর্ণিমা 'চতুকদশী' বাদ। বাকি পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আলো ঝলমল করে। সেই কয়েকটা রাত্রে আমোদ লাগে, এক দিকে আলো অন্য দিক অন্ধকার—বাঁশবনের আদ্যিকালের অন্ধকার সেই কয়েকদিন ঘুমিয়ে থাকে বাঁশতলার জট-পাকানো শিকড়গুলোর মধ্যে, কত কালের ঝরা বাঁশপাতার বিছানায়।

করালী ও পাখীর বিয়েতে বাঁশবনের অন্ধকার ঘুঁটে-কেরোসিনের লালচে আলোর ছটায় ঘুমিয়ে থাকল কদিন। ঢোল কাঁসি সানাইয়ের বাজনা আর মেয়েলী মিহি গলার গানের কাছে হার মানলে—ঝিঁঝি, প্যাঁচা, তক্ষক, পোকা-মাকড়, এমন কি অপদেবতারা পর্যন্ত।

বিয়ে চুকে গেল। কেরোসিন-ভেজানো ঘুঁটের ছাইগুলি পর্যন্ত সাফ ক'রে সারকুড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল, হাঁড়িগুলির কতক ফেরত গেল আবগারি দোকানে, কতক খালি হয়ে প'ড়ে রইল উঠানের পাশে। কাহারপাড়ার লোকদের শরীর থেকে তেল হলুদ মিলিয়ে গেল—আবার অঙ্গে লাগল মাঠের ধুলো, মাথায় লাগল খড়ের কুটো। শুধু কাপড়ে এখনও ধুলো-ময়লার মালিন্যের মধ্যেও হলুদ ও লাল রঙের ছোপ লেগে আছে। বায়েনরা সঙ্গে সঙ্গেই বিদেয় হয়েছে; কাহারপাড়া প্রায় নিঝুম। শুধু নয়ানের মা আজও থামে নাই, সে গালিগালাজ দিয়েই চলেছে। তার আক্রোশ যেন বনওয়ারীর উপরেই বেশি। সে অভিসম্পাত

দেয়—যে 'ঘরভাঙাদের' মাতব্বরি ঘুচিয়ে তাদের বউ কেড়ে অন্য জনাকে দিলে, পাতা ঘর ভেঙে দিলে, তার ঘরও ভাঙবে—ভাঙবে—ভাঙবে। হে কত্তাঠাকুর। হে বাবা গোঁসাই। বিচার কর, তুমি এর বিচার কর।

মধ্যে মধ্যে বলে—মনে পড়ে না! সে সব দিন মনে পড়ে না। বলতে বলতে নয়ানের মা কেঁদেও ফেলে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জল মুছে সে আগুনের মত তপ্ত গলায় বলে—আমার সব্বনাশ করতে আজ সাধু সেজেছে!

তা দিক! কাহারেরা পুরনো গালাগালিতে কোন কালে কান দেয় না। তার উপর এসে পড়েছে কাজ। উদয়াস্ত কাজ। গম কাটা, সরষে কাটা আরম্ভ হ'ল। ওদিকে জাঙলে শাল আরম্ভ হয়েছে। আখ কেটে মাড়াই ক'রে গুড় তৈরি করার আয়োজন। জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের কৃষাণ কাহারেরা, তারাই লাগিয়েছে আখ।

এ কাজ আগে রতন কাহারদের ঘরের বাঁধা ছিল। দিন রাত্রি আখ কাটা চলেছে, খোসা ছাড়াচ্ছে, বোঝা বাঁধছে, মাথায় ব'য়ে এনে ফেলেছে মাড়াই-কলের সামনে। পেল্লাদ বসেছে কলের সামনে—সে-ই কলে যুগিয়ে দিচ্ছে আখ। হুঁশিয়ারির কাজ, একটু বেহুঁশ হ'লেই কল আঙুল টেনে নেবে; গরু থামাতে থামাতে গোড়া পর্যন্ত আঙুল চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে কেটে প'ড়ে যাবে। ওই রতনের বাবার নাম ছিল 'কলকাটা'; কলে তার চারটে আঙুল কেটে গিয়েছিল। শুধু বেঁচেছিল বুড়ো আঙুলটি। রসিক লোক ছিল রতনের বাপ। সে বলত—আঃ, বুড়ো আঙুলটা আমাকে লবডঙ্কা দেখাতে বেঁচে গেল! চার-চারটে আঙুল গেল, ডান হাতটি খোঁড়া হ'ল—বেঁচে রইল বুড়ো আঙুলটি। হে কত্তাঠাকুর। 'খ্যাষ-ম্যাষ' এই কল্ল্যা বাবা।

তবে কিনা মনিব মহাশয়েরা দয়ালু, ওই কত্তাঠাকুরের পরই যদি কেউ জগতে 'রাখলে রাখতে মারলে মারতে' পারেন, সে ওই মনিব মহাশয়েরা। দয়ালও বটেন আবার দণ্ডও দেন। রতনের বাপের মনিব দয়া করেছিলেন, ছেরজনম রতনের বাপকে মাসে পাঁচ শলি অর্থাৎ আড়াই মণ ধান আর এক টাকা 'ব্যাতনে' গরু-বাছুরের সেবার তদ্বির আর চাষবাসের দেখাশুনা করতে চাকর রেখেছিলেন। রতনের বাপ অবিশ্যি ক্রমে ডান হাতের ওই বুড়ো আঙুলের জোরেই কায়দা ক'রে কাস্তে ধ'রে খড়ও কাটত, অল্পস্বল্প সময়ের জন্য কোদালও চালাত; লাঙলের মুঠো বাঁ হাতেই ধরে, তবে ডান হাত দরকার গরু চালাবার জন্য, তাও সে সুকৌশলে ওই লবডঙ্কা দেখিয়েই চালিয়ে নিত। মনিব রতনকেও রেখেছিলেন রাখাল, ক্রমে রতন বড় হয়ে সেই বাড়িতেই কৃষাণি করেছে। রতনের বাপ রতনকে কলের মুখে যেতে 'নেষেধ' ক'রে দিয়েছে, কত্তাঠাকুর নাকি স্বপ্নে তার বংশকে কলের কাছে যেতে বারণ করেছেন; বিশ্বকর্মাঠাকুর লোহা-লক্কড়ের দেবতা—তার স্থানে অপরাধ করেছিল রতনের বাপ, সে পাপে তার এই শাস্তি; কবে কামারশালায় ফাল মেরামত করাতে গিয়ে মদের ঘোরে অশুদ্ধ করেছিল বিশ্বকর্মার আটন। তার শাস্তিতেই রেহাই নাই—বংশের উপরেও শাপমন্যি পড়ে আছে।

রতন আছে গুড় তৈরির কাজে। গুড় তৈরির ভিয়েনে সকলের উপরে বনওয়ারী; এক হেদো মণ্ডল মহাশয় ছাড়া—জাঙল, বাঁশবাদি, কোপাইয়ের ওপারে গোয়ালপাড়া, রাণীপাড়া,

ঘোষগ্রাম, নন্দীপুর, কর্মমাঠ এই সাতখানা গ্রামে গুড় তৈরির কাজে বনওয়ারীর জুড়ি কেউ নাই। বনওয়ারীর 'হাতে তোলা' গুড় ঠাণ্ডা হতে হতে জমতে থাকে—ঢেলা বেঁধে হয় মিছরির চাঁইয়ের মত, দানা হয় মোটা, স্বাদে এমন মিঠা যে চিনি ফেলে সে গুড় খেতে হয়; সব চেয়ে বড় গুণ—বছর ধ'রে রেখে দিলেও গন্ধ হয় না।

মস্ত বড় চুলোয় দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, মাথার উপর বাঁশের কাঠামো ক'রে তালপাতা দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়েছে একটা। চুলোর সামনে ঢিপির উপর বসেছে বনওয়ারী। চুলোর মুখে আখের খোসা দিয়ে জ্বাল দিচ্ছে রতনের ছেলে লটবর। প্রকাণ্ড কড়াইটার মধ্যে আখের রস জ্বাল খেয়ে উথলে উথলে উঠছে। বনওয়ারী ছাঁকনায় ভ'রে 'গাদ' অর্থাৎ ময়লা তুলে একটা টিনে জ'মা ক'রে রাখছে। ওগুলো খাবে গরুতে। রতন আছে বনওয়ারীর পাশে। মধ্যে মধ্যে বনওয়ারী উঠে স'রে দাঁড়ালে সে বসছে তার জায়গায়। মণ্ডল মহাশয়রা একপাশে ব'সে আছেন। হেদো মণ্ডল আছেন, আরও আছেন জনকয়েক। এবার মণ্ডল মহাশয়দের কড়া নজর গুড়ের উপর। পিথিমীতে যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধ চলছে—সায়েব মহাশয়দের মধ্যে। জিনিস পত্রের নাকি দর চড়বে। ধান চাল গুড় কলাই সমস্ত কিছুরই দর উঠবে। তাই মণ্ডলেরা 'সতর' হয়েছেন, একটি ভাঁড় গুড় যেন না সরে। সরাবে আর কে? সরাতে তো কাহাররাই। বনওয়ারী মনে মনে একটু 'বেথা' পেয়েছে এতে। অবিশ্যি কাহারেরা সাধু নয়, সবাই অবিশ্যি বনওয়ারী অতন পেল্লাদ নয়; চুরি 'খানিক আদেক' করে আর সকলে। কিন্তু যতক্ষণ বনওয়ারী হাজির আছে শালের চালায়, ততক্ষণ কারুর ক্ষমতা নাই এক হাতা গুড় চুরি করে। এ কথা সবাই জানে। তবু বনওয়ারী থাকতে এমন নজর রাখার মানে তো বনওয়ারীকে অবিশ্বাস করা। তা করুন। বনওয়ারী আপন মনেই গুড় তৈরির কাজ ক'রে যায়। সে ভাবে যুদ্ধের কথা।

এ দুনিয়া আজব কারখানা। বৈষ্ণব ফকির গান করতে আসে, তাদের গানে শুনেছে বনওয়ারী—এ দুনিয়া আজব কারখানা। ফকিররাও কাহারপাড়াতে আসে। তারা বলে—আল্লা-তালার আজব কারখানা। তাই বটে। বনওয়ারী মনে মনে স্বীকার করে সে কথা। বাউল আসে, বৈষ্ণব আসে, সন্ন্যেসী আসে, সবাই ওই এক কথাই শুনিয়ে যায়। কাহারেরা শোনে, ভাবে। আগে দেহের খাঁচায় অদেখা অচেনা পরান-পাখীর কথা ভেবে কথাটা স্বীকার করত। মায়ের 'গভ্যের' মধ্যে ব'সে কারিগর খাঁচা তৈরি করে—হাড়ের শলা দিয়ে খাঁচা তৈরি ক'রে পরিপাটি চামড়ার ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দেয়, তার মধ্যে সুড়ুৎ ক'রে এসে ঢোকে একটি পরান-পাখী। সে পাখী নাচে, বুলি বলে, কত রঙ্গ করে। তার পরে আবার একদিন ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে পালায়। ভেবে ভেবে কূলকিনারা মিলত না, কাহাররা 'পিতিপুরুষ'—ক্রমে নীলবর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে 'পরানপাখী'র আনাগোনার পথের দাগ আর সেই আজব কারিগরের আস্তানা খুঁজত; খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বাবা-ঠাকুরের বেলতলায়, এবং 'কালারুদ্দে'র দরবারে লুটিয়ে প'ড়ে বার বার বলত—অপরাধ মাজ্জনা কর বাবা। কোলের কাছে অন্ধকার, তুমি 'অইচ' পক্ষ দিয়ে ঢেকে, বক্ষ দিয়ে আগুলে,—আর তোমাকে আমরা খুঁজে মরছি কোথা কোন্ বেহ্মাণ্ডে বেহ্মাণ্ডে।

এখন কিন্তু কোম্পানির কলের গাড়িতে, 'অ্যালের' পুলে, তারে তারে টেলিগেরাপে, হাওয়া-গাড়িতে—দুনিয়ার আজব কারখানা তারা যেন চোখে দেখছে। তার উপরেও আজবকাণ্ড এই যুদ্ধ! অবাক রে বাবা! কোথা কোন্ 'ত্যাশে' সাত সমুদ্দুর তেরো 'লদী' পারে কে করছে কার সঙ্গে যুদ্ধ, এখানে চড়বে ধানের দর, চালের দর, আলু গুড় কলাই তরিতরকারির দর! জাঙলের সদ্গোপ মহাশয়রা কোমর বাঁধছে—টাকা জমাবে; বলাবলি করছে—কাপড়ের দর চড়বে। আবার নাকি কোম্পানিতে যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করবে।

তবে কাহারপাড়ায় হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের মধ্যে যারা ছায়ার ঘেরায় বাস করে তাদের ভাবনা নাই।

ধান চাল গুড়ের দাম বাড়লে তাদের কিছু লাভ নাই। তারা মনিবের ক্ষেতে খেটে খায়; ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পায়, তাও ছ-মাস খেতে-খেতেই ফুরিয়ে যায়—বাকি ছ-মাস মনিবের কাছে 'দেড়ী'তে ধান নেয়, বেচবার মত ধান চাল তাদের নাই। বেচেও না, কেনেও না। বাড়ির কানাচে শাকপাতা হয়, পুকুরে বিলে নালায় নদীতে শামুক গুগ্‌লি আছে—ধ'রে নিয়ে আসে। কয়লার দাম চড়ে; কাহারেরা জীবনে কখনও কয়লা পোড়ায় না, নদীর ধারে ঝোপজঙ্গল থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে; গরুর গোবর ঘেঁটে ঘুঁটে দেয়, তার দুচারখানা নিজেরা পোড়ায়—বাকি বিক্রি করে চন্দনপুরে জাঙলে। কাপড়ের দর চড়লে কষ্ট বটে। তাই বা কখানা কাপড় তাদের লাগে? পুরুষদের তো চাষের সময় ছ মাস অর্ধেক দিন গামছা পরেই কাটে। বাকি অর্ধেক দিন—ছ-হাত মোটা কাপড় পরে।

বছরে চারখানাতে 'ছচলবছল' অর্থাৎ স্বচ্ছল, তিনখানা হ'লেও চলে যায়। মেয়েরা 'একটুকুন' সাজতে গুজতে ভালবাসে, কোপাই নদীর 'আলবোডেমি' তাদের চিরকাল আছে, তাদের দু'একখানা মিহি ফুলপাড় শাড়ি চাই-ই। দুখানা হ'লেই খুব। বাইরে যাবার সময় পরে। ঘরে মোটা খাটো কাপড়েই চলে। তার জন্যেও খুব বেশী ভাবতে হয় না। ফুলপাড় মিহি শাড়ির দাম যোগাতে হয় না ঘরের কর্তাকে, মেয়েরা ও নিজেরাই রোজগার ক'রে নেয়—চন্দনপুর জাঙলে রেজা খেটে, ভদ্রজনের বাবুভাইয়ের কাছ থেকে। আর একটা যুদ্ধ দেখেছে বনওয়ারী। তেরশো বিশ একুশ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল—কয়েক বছরই ছিল; বেশ মনে আছে বনওয়ারীর। ছ টাকা জোড়া কাপড় হয়েছিল। .ধানের দর হয়েছিল চার টাকা। এই তখুনি চন্দনপুরের মুখুজ্জেবাবুরা কয়লার কারবারে ফেঁপে রাজা হয়ে উঠল। বনওয়ারীর মনিব মাইতো ঘোষ পাট কয়লা বেচে কম টাকা করে নাই। অনেক টাকা। আবার চন্দনপুরের চার পাঁচ ঘর জমিদার-বাড়ি ভেঙে গেল, মহাল বিক্রি করলে; জাঙলের চোধুরী-বাড়ি একেবারে 'নাজেহাল' হয়ে ফেল প'ড়ে গেল। জাঙলের সদ্গোপদের বৃদ্ধি ওই যুদ্ধের সময়। আগে সবাই ছিল খাঁটি চাষী, কাহার-কৃষাণদের সঙ্গে তারাও লাঙলের মুটো ধরত, কোদাল ধরত, খাটো কাপড় পড়ত; যুদ্ধের বাজারে ধান চাল কলাই গুড় বেচে সবাই ভদ্রলোক হয়ে গেল। এবার আবার সবাই কোমর বেঁধেছে, এ যুদ্ধে যে তারা কি হবে, কে জানে। তবে তাদের মঙ্গলই কামনা করে কাহারেরা। তাদের লক্ষ্মীর বার-বাড়ন্ত হ'লেই কাহারদের মঙ্গল, তাদের মা-লক্ষ্মীর 'পাঁজের'

অর্থাৎ পদচিহ্নের ধুলো কুড়িয়েই কাহারদের লক্ষী। যুদ্ধে কাহারদের কিছু যায়-আসে না।

সদ্গোপ মহাশয়রা চট বিছিয়ে ব'সে যুদ্ধের কথাই বলছেন। কথা হচ্ছে—মস্নের চাষে এবার জোর দিতে হবে। চন্দনপুরের বাবুদের 'গ্যাজেটে' অর্থাৎ খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে—মস্নের তেলের দরকার হবে যুদ্ধে, ওর দরটা খুব বেশি চড়বে।

বনওয়ারী আপন মনেই সবিস্ময়ে ঘাড় নাড়তে থাকে।

আজব কারখানাই বটে রে বাবা! ধান-চাল, কলাই-পাকড়, গুড়-আলু, এ সবের চেয়ে দর বাড়বে মস্নের। 'প্যাটের' খাদ্য নয়, গায়ে মাখবার 'ত্যাল' নয়, পরবার কাপড়ের তুলো নয়; মস্নের পুলটিস দিতে হয় এই জানে বনওয়ারী—তার ত্যাল, এ লাগবে কিসে?

ঝম্-ঝম্—গম্-গম্—ঝম্-ঝম্—গম্-গম্।

দশটার ট্রেন চলেছে কোপাইয়ের পুল পার হয়ে। মণ্ডল মহাশয়রা এইবার গা তুলবেন, বাড়ি যাবেন খেতে। খেয়ে-দেয়ে আসবেন হেঁদো মণ্ডল আর যাঁর গুড় হচ্ছে তিনি, আরও একজন। হেঁদো মণ্ডল পড়বেন চিত হয়ে—নাক ডাকবে কামারের হাপরের মত, হাঁ হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে ফর্র্ ফর্র্ শব্দ হবে।

এই মণ্ডলেরা যখন থাকবেন না, তখন একবার তাদের আরামের সময়। প্রাণ খুলে তারা দু-দশটা রসবিলাসের গালগল্প করবে।

মণ্ডলেরা চ'লে যেতেই বনওয়ারী উঠল। উঠে এসে আরাম ক'রে পা ছড়িয়ে ওই চটের উপর ব'সেই বললে, লটবর, একবার ভাল ক'রে তামাক সাজ্ তো। আর অতনা, 'রসির' ভাঁড়টা একবার দিস। জল আনিস খানিক, হাত মুখ ধুতে হবে।

কাহারপাড়ায় এইবার ঢোলের বাজনা থামবে। এ ঢোল বায়েনদের বাজনা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে আদ্যিকালের অন্ধকার মিশে যে অন্ধকার নামে কাহারপাড়ায়—তার প্রভাব থেকে বাঁচবার জন্য যে একঘেয়ে গান-বাজনার আসর বসে ওদের, সেই গানবাজনার আসরের ঢোল। চৈত্র মাসে আসছে ঘেঁটুগানের পালা। তারই উদ্যোগপর্ব চলেছে। একটা ঢোল থামল। এখনও দুটো ঢোল বাজছে। বাঁশবাঁদিতে তিনটে ঘেঁটুর দল। একটা কাহারপাড়ার পুরনো দল, একটা আটপৌরেপাড়ার, এর উপর বছর দুই হ'ল করালী একটা নতুন দল করেছে। করালীর দলে নসুদিদি আছে—সে নাচে কোমর ঘুরিয়ে ঝুমুর দলের মেয়ের মত। করালী একটা বাঁশের বাঁশি কিনেছে, সে সেটা বাজায়। ও দলের এখন চলতি খুব। গান বেঁধে নিয়ে আসে চন্দনপুরের মুকুন্দ ময়রার কাছ থাকে। নতুন রকমের গান। এবার নাকি যুদ্ধ নিয়ে গান বেঁধেছে ময়রা মহাশয়।

"সায়েব লোকের লেগেছে লড়াই।
ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উল্খাগোড়াই—
ও হায়, মরব মোরাই উল্খাগোড়াই।"

বনওয়ারীর আর মনে নাই। তবে শুনেছে একদিন সমস্তটা। ময়রা জানে অনেক। হাজার হ'লেও চন্নপুরের ময়রা। চন্নপুরে ডাকে 'গ্যাজেট' আসে, আবার ট্রেনে গ্যাজেট আসে। রোজ বেলা

ছুটোর সময় ছেলে-ছোকরারা ভিড় ক'রে ইষ্টিশানে আসে, গার্ড সাহেব কাগজের বাণ্ডিল নামিয়ে দিয়ে যায়, বনওয়ারী স্বচক্ষে দেখেছে। মুকুন্দকেও 'গ্যাজেট' পড়তে দেখেছে সে। গানের মধ্যে অনেক কথা দিয়েছে সে। গান্ধীরাজার কথা পর্যন্ত আছে। মন্দ লাগে নাই বনওয়ারীর; ভালই লেগেছে। করালী ছোকরার নতুন দলের বিরুদ্ধে বনওয়ারীর আপত্তি অনেক দিনের। ছোকরা রেলে চাকরি ক'রে সেখান থেকে অনেক খারাপ ব্যাপার নিয়ে আসে। এবার কিন্তু গানটি ভাল এনেছে। অনেক কথা শুনবে লোকে। ছোকরাও এবার বাগ মেনে এসেছে। ভাল করে বাগ মানাতে হবে ওকে। করালী যদি 'ধরম' তাকিয়ে ইজ্জত রেখে সোজা রাস্তায় চলে, তবে করালী হতে কাহারপাড়ার অনেক 'হিতমঙ্গল' হবে ব'লেই বনওয়ারীর বিশ্বাস। নইলে ও-ই উচ্ছন্ন দেবে কাহারপাড়াকে। টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওই কলকারখানার তেলকালি-ভরা আলক্ষ্মীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়। ছেলেগুলো চাষ ছাড়বে, পাল্কিবহন ছাড়বে, পিতিপুরুষের কুলকর্ম জলাঞ্জলি দেবে। মেয়েগুলোও যাবে পিছনে পিছনে। বনওয়ারী তা হ'তে দিতে পারবে না। কখনও না। তাই সে করালীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে আদর ক'রে তার আবদার রেখে কোলগত ক'রে নিতে চায়। তাই তার মন খুঁত খুঁত করলেও সে নয়ানের ঘর ভেঙেও পাখীর সঙ্গে করালীর বিয়ে দিয়েছে। অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সে কারণটা তার মনই জানে, আর কেউ জানে না। কালোশশীকে সে যে ভালবাসে। সে ভালবাসা তার মনের মধ্যে কুলকাঠের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছেই—জ্বলছেই। ওদেরও তো সেই ভালবাসাই।

রতন 'রসি' মদের ভাঁড়টা নিয়ে এসে কাছে বসল।

বনওয়ারী বললে, পেহ্লাদকে ডাক।

প্রহ্লাদও এসে বসল। বনওয়ারী প্রশ্ন করলে, রস ক পাতনা হ'ল রে?

প্রহ্লাদের হাতে ছটা আঙুল—সে বললে, এক হাত। তারপর হেসে আবার বলল, ছ পাতনায় পড়ল।

ওরে বাপ রে! আটপৌরেপাড়ায় এবার ঘেঁটুর ধুম দেখা যায় খুব। ঢোলের শব্দ এই রাত্রিতে জোরালো হয়ে উঠল। করালীর দলের ধুমের কথা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আটপৌরেপাড়ায় হঠাৎ এত ধুমের কারণ কি?

হবে। পরম এবার জমি নিয়েছে চন্দনপুরের বাবুদের কাছে, এবার ওর শরীরে বল বেঁধেছে, মনে মনে তেজ হয়েছে। হাসলে বনওয়ারী। জমি সেও নিয়েছে। পরমের চেয়ে বেশি জমিই নিয়েছে সে।

প্রহ্লাদ হেসে বললে—আটপৌরেপাড়ায় এবার ঘেঁটুর ধুম বটে। ওদের গান শুনেছ?

—না।—হাসলে বনওয়ারী।

—শুনো একদিন। প্রহ্লাদ উঠে গেল। কলের দাঁতওয়ালা চাকায় ক্যাঁ-কটো-কটো শব্দ উঠেছে, তেল দিতে হবে।

—আটপৌরেপাড়ার গান! বনওয়ারী আবার হেসে বললে, ওদের তো সেই পুরনো গান! ওদের চেয়ে আমাদের পুরনো গান অনেক ভাল। সে গান বনওয়ারীরই বাঁধা।

"তাই ঘুনাঘুন—বাজেলো নাগরী—
ননদিনীর শাসনে,—চরণের নূপুর থামিতে চায় না।
ঘরে থাকিতে মনো চায় না। ও—তাই—তাই ঘুনাঘুন।"

রতন চুপ করেই ছিল, সে এতক্ষণে বললে—এবার ওরা লতুন গান গাইছে।

—লতুন গান? বাঁধলে কে?

—তা জানি না। তবে—

—কি তবে?

—তবে, গানে করালীকে তোমাকে শাপ-শাপান্ত করেছে। মধ্যে মাঝে—

—কি মধ্যে মাঝে?

মৃদুস্বরে রতন বললে—বাপু, গজু-গজু ফুসু-ফুসু চলছে, ওই পানা হারামজাদা নাকি উ-পাড়ায় শুনেছে, কালোশশীকে নিয়ে—

চমকে উঠল বনওয়ারী।

একটু পরে সে বললে—এইটুকুন দেখিস তু। আমি একবার শুনে আসি কিং গাইছে শালোরা।

পাঁচ

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বাঁশবনের অন্ধকার রাজ্যময় ভিতরে বাইরে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—বাঁশবনের গোড়ায়, আদিমকাল থেকে ঝ'রে-পড়া পচা বাঁশপাতার নীচে, ঝোপঝাড়ের ঘন আবরণের মধ্যে, বটগাছের কাণ্ডের গহ্বরে, কাহারপাড়া-আটপৌরেপাড়ার ঘরের কোণ-কানাচে থেকে মানুষগুলির মনের কোণে পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

আটপৌরেদের ঘেঁটুগানের জোর সত্যিই এবার খুব বেশি। লহর ছুটিয়েছে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে শুনলে।

"হায় কলিকালে, কতই দেখালে—
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে, তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতি বাড় বাড়িল যারা তাদের ভে-ঙে পাড়ো।"

ছ্যাৎ ক'রে উঠল বনওয়ারীর বুকটা। সেই সাপ নিয়ে ঘেঁটুগান বেঁধেছে আটপৌরেরা। অভিসম্পাতটা অবশ্যই করালীকে, কিন্তু তবু তার খানিকটা অংশ বনওয়ারীর উপরেও এসে পড়েছে ব'লে তার নিজেরই মনে হ'ল। ছমছম ক'রে উঠল চারিদিক, মনটা কেঁপে উঠল।

"বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভারা
সাঁজের পিদীম বলো ফুঁ দিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের এ কি লীলা সন্‌জে বেলাতে।

মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় হায় কি গলাগলি
কত হাসিখুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি।
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সন্‌জে দেখালে
হায় কলিকালে—”

বনওয়ারীর হাত পা যেন অসাড় হয়ে গেল।

কালোশশীর সঙ্গে তার এই বটতলাতে দেখা হওয়ার কথা তা হ'লে কেউ নিশ্চয় দেখেছে। যে-ই দেখুক, কিন্তু সত্যই তো এটা তার অপরাধ। কাপড় সে ছেড়েছিল। বাড়ি ফিরে প্রদীপ জ্বেলে ধুপ নিয়ে আসবার সময় কথাটা তার মনে হয়েছিল, কিন্তু স্নান তো করে নাই। স্নান করা তার উচিত ছিল। তা ছাড়া আজ মনে হচ্ছে, বাবার বাহনকে মেরেছে যে করালী, তাকে শাস্তি না দিয়ে এমন ভাবে সমাদর করা তার অপরাধ হয়েছে—একশো বার অপরাধ হয়েছে। কিন্তু দেখলে কে? পরম নিশ্চয় নয়। পরম দেখলে কখনই চুপ ক'রে থাকত না। কালোশশীর মতিগতি সবাই জানে; মধ্যে মধ্যে ভূপ সিংহ মহাশয় এখনও আসেন, চন্নপুরে গেলে কালোশশী এখনও অনেক জনের সঙ্গে ঢ'লে প'ড়ে কথা বলে, সে সব কথার মানে দু রকম হয়। জাঙলেও সদ্‌গোপ মহাশয়দের মধ্যে আধাবয়সী যাঁরা, তাঁদের দিকেও বাঁকা চোখে তাকিয়ে কালোশশী মুচকে হাসে। সবই সত্যি, সবই জানা কথা, তার সঙ্গেও এককালে মনে মনে 'অঙ' ধরেছিল এও জানে লোকে; কিন্তু এমন ঘটনা পরম চোখে দেখে কখনও সহ্য করতে পারত না। তখনই 'হাঁকার' মেরে সে লাফিয়ে এসে পড়ত। বনওয়ারীর সঙ্গে এক হাত হয়ে যেত। হয়তো দুজনের একজন শেষ হয়ে যেত সেই দিনই—তখনই। কাহারপাড়া এবং আটপৌরেপাড়ায় রেষারেষি আছে একটা—চিরদিন 'পিতিপুরুষ' ধরে। আটপৌরেরা বলে, আমরা পাল্কি বহন করি না, আমাদের ঘোড়া 'গোত্ত' নয়। তাদের গোত্র ঘোড়া গোত্র নয়, 'বাহন গোত্র,' ওরা ঠাট্টা ক'রে বলে, ঘোড়া গোত্র। ঘোড়া গোত্র হোক আর বাহন গোত্রই হোক, সে করেছেন ভগবান —ওই বাবাঠাকুর। আটপৌরেরা কি? লাঠি কাঁধে দিয়ে ভগবান পাঠিয়েছেন, ঠেঙাড়ে ডাকাত গোত্র যে তোদের। দূত গোত্তও যা, ও ডাকাত-ঠেঙাড়ে গোত্তও তাই। এখনও পর্যন্ত বেটারা থানার খাতায় দাগী, হাজ্‌রে দিতে হয়, চৌকিদার রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে ডাকে। কোন বেটা আটপৌরের ঘরের চালে খড় নাই ভাল ক'রে, হাঁড়িতে অর্ধেকের বেশি চাল নাই। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে কাহারদের ঝগড়া চিরকালের। এককালে অবিশ্যি ওদেরই প্রতাপ ছিল বেশি। সে আমলটা হাঁসুলী বাঁকের চুরি-ডাকাতির আমল। এখন সকলে চুরি ছেড়ে চাষবাস করছে, এখন কাহারদের চলতির কাল। আগে আটপৌরেরা কাহারদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, আজ হিংসে করে। এ গান কোন বেটা হিংসুটে আটপৌরের বাঁধা। ব্যাপারটা জানতে হবে বনওয়ারীকে।

বলতে পারে একমাত্র কালোশশী। কালোশশীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে তাকে। কিন্তু ভয় হয়। কালোশশীর মধ্যে নেশা আছে, সে নেশার ঘোর কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। ক্ষিদের সময় মুখের অন্ন ছেড়ে উঠে আসা যায়, কিন্তু কালোশশীর কাছে গিয়ে মাতাল না হয়ে

ফিরে আসা যায় না। এ মদ তার খাওয়ার উপায় নাই। তার সে দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। কাহারপাড়ার সে মাতব্বর। মাতব্বরের নিন্দে হ'লে মাতব্বরী থাকে না, লোকে মুখ টিপে হাসে —শাসন মানে না। তার পাপে জাতজ্ঞাতের অকল্যাণ হয়। যে পাপ সে করেছে, তার প্রায়শ্চিত্তই তাকে করতে হবে।

গাছতলা থেকে আবার সে বেরিয়ে সন্তর্পণে চলল আখের শালের দিকে। শালে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত মণ্ডল মহাশয় এসে গিয়ে থাকবেন। বনওয়ারীকে গরহাজির দেখে হয়তো গাঁ-গাঁ শব্দে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছেন। বনওয়ারী একটু দ্রুতপদেই চলল। কতকগুলি গালিগালাজ শুনতে হবে আর কি! বনওয়ারী না হয়ে অন্য কেউ হ'লে তার অদেষ্টে নির্ঘাত 'পেহার' জুটত। বনওয়ারীর গায়ে হাত তুলতে কেউ সাহস করে না। সাহস ক'রে হাত তুললে বনওয়ারীও তার হাত ধ'রে ফেলবার সাহস রাখে। অবিশ্যি এক চন্দনপুরের মুখুজ্জেবাবুরা ছাড়া। বাপ রে, বাপ রে, কি ধনদৌলত চারিদিকে! যাকে বলে, মা-রাজলক্ষ্মী অষ্টাঙ্গে অলঙ্কার প'রে 'বানারসী' কাপড় প'রে বিয়ের কনেটির মত গয়নার ঝুম-ঝুম-ঝুম-ঝুম ঠিন-ঠিন শব্দ ক'রে বানারসী কাপড়ের খসখস শব্দ তুলে অহরহ বেড়াচ্ছেন। কাহার বনওয়ারী পাল্কি ব'য়ে বুড়ো হ'ল, এ অঞ্চলে কত বড় বড় বাড়ির বিয়ের কনেকে পাল্কি ব'য়ে শ্বশুরবাড়ি এনেছে, বনওয়ারী বলে—'নক্ষ্মীকে এনেছি নারায়ণের বৈকুণ্ঠে।' গয়না কাপড় সে অনেক দেখেছে, অনেক সুবাস শুঁকেছে, অনেক গয়নার বাজনা শুনেছে। কিন্তু চন্দনপুরের বাবুদের মতন বর্জরের গয়না কাপড়ের 'বন্ন' এ আর সে দেখে নি।

খুব 'ত্বরিত গমনে' চলতে চলতে হঠাৎ বনওয়ারী যেন আপনিই থেমে গেল। পা যেন আটকে গেল। পশ্চিম দিকে বাঁ পাশেই বাবাঠাকুরের থান। ডান দিকে দূরে দোয়েম জমির মাঠে আখ কাটছে কাহাররা, ঝুপঝাপ খসখস শব্দ উঠছে। কথাবার্তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সামনে জাঙলের আমবাগানে শাল চলছে, আলোর ছটা আসছে। কিন্তু সমস্ত কি ভুলে গেল বনওয়ারী? সে ধীরে ধীরে চলল বাবাঠাকুরের থানের দিকে। অপরাধ—অপরাধ হয়েছে বনওয়ারীর। হে বাবাঠাকুর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর। আঃ, কি মতিভ্রমই হ'ল করালীর! হায়, হায়, হায়! ধর্মনাশা করালী। বাবার বাহনটিকে হত্যা করলে পুড়িয়ে? কি 'বিচিত্ত বন্ন,' কি বাহার, কি শিস, কি 'পেকাণ্ড' বড়! তা ছাড়া কালোবউকে নিয়ে তার কি মতিভ্রম হ'ল এই 'পবীণ' বয়সে! হে বাবা, হে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তুমি এ দোষটি নিয়ো না বনওয়ারীর। করালীকেও ক্ষমা ক'রো বাবা। আর বনওয়ারীর একটি দোষ ক্ষমা ক'রো, ওই কালোশশীকে নিয়ে দোষটি তুমি ধ'রো না। কালোবউয়ের সঙ্গে তার ছেলেবয়সের 'অঙ।' এই বয়সে এতকাল পরে সে 'অঙ' মনের বারুদের সঙ্গে মিশে তুবড়িবাজির 'অঙিন' ফুলঝুরি হয়ে বেরিয়ে আসছে। আগুন লেগেছে, আর তাকে চাপা দেবার উপায় নেই। কালোবউ—কালোশশী যদি আটপৌরেপাড়ার মাতব্বর পরমের বউ না হ'ত, তবে হয়তো বনওয়ারীর 'হিয়ের' তাপ এতখানি হ'ত না, আগুন লাগত না মনের বারুদে।

বাবার থানের প্রান্তভাগে বনওয়ারী দাঁড়াল। ওখানটিতে এই 'সনসনে' 'আত্তিকালে' হঠাৎ

গিয়ে ঢুকতে নাই। বাবা খেলা করেন এখন, কখনও তপজপ করেন, কখনও খড়ম প'রে খটখট ক'রে বেড়ান, কখনও বেলগাছের ডালটি ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকেন 'কালারুদ্দু' বাবার দরবারের দিকে চেয়ে।

হাততালি দিয়ে বাবাকে নিজের আগমনের কথা জানিয়ে সে আরও খানিকটা অগ্রসর হ'ল। কিছুদিন আগেই বাবার থান পুজো দেবার জন্ম তারা পরিষ্কার করেছিল। হাঁসুলী বাঁকের পাষাণ মাটিতে এখন শীতের টান পড়েছে, আস্তে আস্তে তার উপর খরার অর্থাৎ গ্রীষ্মের রোদের আমেজ লাগছে। জল নাই; পরিষ্কার বাবার থানটি তাই এখনও পরিষ্কারই আছে। বনওয়ারী সেইখানে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। মনে মনে মানসিক করলে—বাবা, ক্ষমা কর তুমি, তোমার বেলতলাটি আমি বাঁধিয়ে দেব।

ঠিক সেই ক্ষণটিতেই একটা গোলমাল উঠল কাহারপাড়ায়।

ছয়

হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায় সনসনে রাত্রিতে গোলমাল চিরকাল ওঠে। এই সময়ে পুরনো ঝগড়া নতুন ক'রে বাধে। সকলে ঘুমোয়, সেই সময়ে কেউ ঘুম ভেঙে বাইরে এসে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সাধ মিটিয়ে গাল দিতে আরম্ভ করে। যদি প্রতিপক্ষটিও সেই সময়ে জেগে ওঠে দৈবক্রমে, তবে লেগে যায় চুলোচুলি। তা ছাড়া হঠাৎ লোকের সাড়ায় গোলমাল ওঠে কাহারপাড়ায়। জাঙলের চন্দনপুরের ছোকরারা সেই সময়ে শিস দেয়, সিটি দেয়, উঠানে টুপটাপ ক'রে ঢেলা ছুঁড়ে ইসারা জানায় কাহার-বাউড়ীর আলাপী মেয়েদের। মায়েরা পিসীরা মাসীরা শাশুড়ীরা শুনতে পেলে গোল হয় না, বাপেরাও বড় কিছু বলে না, কিন্তু ননদ কি স্বামী কি ভাই শুনলে গোলযোগ বাধবেই। চোর কাহারপাড়াতে আসে না; এসে নেবে কি? তা ছাড়া কাকের মাংস কাকে খায় না, কাহারেরা একদিন নিজেরাই চোর ছিল; আজ চুরি ছাড়লেও চোর নাম আছে, চুরির হদিসও ভুলে যায় নাই। বনওয়ারী কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলে গোলমালের মধ্যে কার কার গলার 'রজ' অর্থাৎ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাঁসুলী বাঁকের এই একটি মজা আছে। কোপাইয়ের ধারের বাঁশবনে ধাক্কা খেয়ে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার চেঁচামেচি স্পষ্ট হয়ে ফিরে আসে।

গলা শোনা যাচ্ছে নসুবালার। ওঃ, পুরুষের মেয়েলী ঢঙ হ'লে সে পুরুষ ঝগড়ায় মেয়ের বাড়া হয়ে উঠে। নসুকে নিয়ে আর পারা গেল না। হুঙ্কার দিচ্ছে করালী। তারস্বরে মেয়ের গলায় চীৎকার করছে কে?—ওগো, 'অক্ষে' কর গো, বাঁচাও গো।

নিশ্চয় মারপিট করছে করালী। কাকে? সুচাঁদ পিসীকে? পাখীর সঙ্গে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সুচাঁদ করালীকে ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু সুচাঁদের গলা হেঁড়ে গলা; হাঁড়ির ভেতর মুখ ভ'রে মেয়েতে কথা বললে যেমন আওয়াজ বের হয় তেমনিই,—এ তো সে গলা নয়! তবে

পাখীকে ঠ্যাঙাচ্ছে নাকি ? কিছু বিশ্বাস নেই করালীকে।

আর্তনাদ কিন্তু ক্রমশই বাড়ছে।

হাঁসুলী বাঁকের চারিদিকে বাঁশবন—'অরুণ্যের' অর্থাৎ অরণ্যের মত, সেখানে ডাল পড়লে ঢেঁকি না হোক, পাতা পড়লে কুলো না হোক, লড়াই লাগলে টুঁটি-ছেঁড়াছেঁড়ি হয়। 'অরুণ্যে' বাঘ-ভাল্লুকে আপন এলাকায় থেকে চেঁচায়, কাহারপাড়ায় আপন আপন আগুন থেকে গাল পাড়ে। তারপর এক সময় লাগে হাতাহাতি। তখন এ ওর টুঁটি টিপে ধরে, ও এর টুঁটি ধরতে চেষ্টা করে। এদের যে মাতব্বর, মরণ তারই। মরণ বনওয়ারীর। ছুটল বনওয়ারী।

করালীই বটে! করালী নির্মমভাবে প্রহার করছে রুগ্ন নয়ানকে। চারিপাশে মেয়েরা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নসুবালা হাতে তালি দিয়ে বলছে—নাক ছিঁড়ে দে, নাক ছিঁড়ে দে ছুঁচো কুকুরের।

সুচাঁদের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিতেই কাহারদের মেয়েরা পুরুষদের লড়াই দেখে চিরকাল। সুচাঁদের দৃষ্টির মধ্যে খানিকটা ভয়ের আভাস দেখা দিয়েছে।

সুচাঁদ এ গল্প চিরদিন করবে। ঠিক এমনই দৃষ্টি তখন ফুটে উঠবে চোখে। বললে—বাবা রে, সে কি 'লড়ন'। সে যেন মহামারণ। করালীর সে কী 'মূত্তি'! সম্ভবত মনে মনে সে ভয় পায়, করালী যদি তাকে এমনি ক'রে মারে!

বসন চেষ্টা করছে করালীকে ছাড়াতে।—উঠে এস করালী ; ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওগো মানুষ নয়ান। করালী—করালী!

পাখী ফোঁসফোঁস ক'রে কাঁদছে।

আর্ত চীৎকার করছে নয়ানের মা। সে প'ড়ে আছে উঠানের ওপর। মাথার চুল খুলে 'রঙ্গে'র কাপড় খসে গিয়েছে ; বুকে পিঠে ধুলোর চিহ্ন ; কেরোসিনের ডিবের লালচে আলোয় তাকে মনে হচ্ছে রাস্তার পাগলিনীর মত। হারামজাদা নিশ্চয় তাকেও মেরেছে ; ঠেলে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, এতে আর সন্দেহ নাই। কী নিষ্ঠুর, কী দুর্দান্ত।

বনওয়ারী গিয়ে করালীর ঘাড়ে হাত দিয়ে ধ'রে দাঁতে দাঁত টিপে বললে—ছেড়ে দে।

বনওয়ারীর গলার আওয়াজের মধ্যেও বনওয়ারী আছে। চমকে মুখ তুলে তাকালে করালী।

—ছেড়ে দে।

ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েও করালী বললে—ছেড়ে দোব ? ওকে আমি মেরে ফেলাব।

—মেরে ফেলাবি ?

নসু হাত-পা নেড়ে অঙ্গ দুলিয়ে ব'লে উঠল—ফেলাবে না ? মেরে ফেলাবে না কেনে, শুনি ? তোমার পরিজনের লোক যদি কামুড়ে ধ'রে নাক কেটে দিতে যায়, তবে তুমি তাকে মেরে ফেলাবে না ? ছেড়ে দেবা ? গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সন্দেশ খেতে দেবা ?

নয়ানের মা ছেলের কাছে এসে ছেলেকে তুলতে চেষ্টা করছিল, সে ব'লে উঠল—কার পরিবার ? নয়ানের বিয়েলো বউ লয় উ ? যে পারবার স্বামীর ওগ দেখে ফেলে চ'লে যায়, সাঙা করে, তার নাক কেটে দেবে না ?

বনওয়ারী বুঝে নিলে ব্যাপারটা। পাখী এসে সামনে দাঁড়িয়ে আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা। সে নিজের নাকটা দেখিয়ে বললে—দেখ।

নসুবালা একজনের হাত থেকে কেরোসিনের ডিবেটা প্রায় কেড়ে নিয়ে পাখীর নাকের সামনে ধ'রে বললে—ব'ল, চোখ তো আছে, মাতব্বর মানুষ, বিচেরও আছে, বলি একবার দেখ। নাকে কামুড়ে কি করেছে, দেখ। 'সব পুত থাকতে নাতির মাথায় হাত!' হাত গেল, আঙুল গেল, পিঠ গেল, কাঁধ গেল, গিয়ে নাকে কামড়?

সত্যিই নাকে দাঁতের দাগের ঘের জুড়ে লালচে রক্তাভ দাগ হয়ে গিয়েছে। নয়ানের দিকে তাকালে বনওয়ারী। হাঁপানীর রুগী বেচারা, নির্জীবের মত প'ড়ে আছে, যে শাসন তার হয়েছে তার উপর শাসনের আর উপায় নাই। তা ছাড়া নয়ানের উপর যে আঘাত দিয়েছে, তার জন্য বনওয়ারীর মনে যে অন্যায়বোধটুকু খচখচ করছিল, সেটাও এই সুযোগে বড় হয়ে উঠল। সে কিছুতেই মানতে পারলে না, শাসনটা ন্যায্য শাসন হয়েছে। বনওয়ারী বললে—বোঝলাম, সব বোঝলাম। কিন্তু তবু অন্যায় হয়েছে! নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে। ওগা মানুষটা যদি ম'রে যেত? মুখ এখে বাক্যি আর ঠাঁই একে মার—পিতিপুরুষে ব'লে যেয়েছেনই কথা।

করালী ব'লে উঠল—কোম্পানীর আইনে মেয়েমানুষকে এমন ক'রে কামুড়ে দেওয়ার জন্যে জ্যাল হয়।

বনওয়ারী গর্জে উঠল—করালী!

—কি! আমি অন্যায় কি বললাম!

—এই দেখ্! চন্নপুরে পালাতে হয়েছিল তোকে গাঁ ছেড়ে। আমি তোকে সব ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে আবার এনেছি গেরামে। যখন আনি, তখন কি কি বলেছিলাম মনে কর্। আমার কথা শুনে চলতে হবে, পবীণদের অমান্য করবি না, অধম্ম অনাচার করবি না। তু স্বীকার করেছিলি কি না?

করালী জবাব দিলে না কথার। পাখীকে টেনে বললে—চ'লে আয়।

চ'লে গেল তারা। নসুবালা কোমর ঘুরিয়ে হঠাৎ ব'লে উঠল—আঃ ম'রে যাই! চল্ গো চল্। ঘর চল্ সব। সেই যে বলে—

"চোখের জলে নরম হ'ল মাটি—
সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিত।"

ব'লেই সে ঠোঁটে পিচ কেটে সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেল।

হয়তো সেই মুহূর্তে বনওয়ারী একটা কাণ্ড ক'রে বসত। কিন্তু তখন নয়ানের মা তার পায়ের কাছে মাথা রেখে পায়ে হাত দিয়ে কেঁদে বলছিল—বিচার কর, তুমি বিচার কর, মাতব্বর তুমি, বিচার কর।

বনওয়ারী মাথা হেঁট করলে, অবিচার সে করেছে। পরক্ষণেই সে নয়ানকে দুই হাতে তুলে নিয়ে দাওয়ার উপর এনে সেখানে পাতা তালপাতার চ্যাটাইয়ের উপর শুইয়ে দিয়ে বললে—জল' আন দেখি। মুখে কপালে জল দাও। ছেলেকে সোস্থ কর আগে।

সকলেই প্রায় চ'লে গিয়েছিল। নয়ানের মা এককালে ছিল মাতব্বরের পরিবার, ঘরভাঙাদের ঘরের গিন্নী, তার অহঙ্কার ছিল বেশি, সে অহঙ্কার তার ভেঙে গেল যখন থেকে, তখন থেকে সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। তাই তার প্রতি কারু সহানুভূতি নাই। কাহারপাড়ার লোকে শুধু ঠোঁটে হাসতে জানে না; ওদের সহজ কথা; ওরা বলে—আকাশের তারা জলে ফোটে, আকাশে ম্যাঘ থাকলে কি পুকুরে পানা থাকলে সে হবার জো নাই। 'তোর সঙ্গে ভাব নাই তো হাসলে হবে কি?'

ব'সে ছিল কেবল সুচাঁদ।

সে আক্ষেপ করছিল—আঃ 'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা', সেই ঘরভাঙাদের আজ এই অ্যাবস্থা।

সে ব'সে ব'সে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ব'লে যায় অভ্যাস মত। 'ঘরভাঙাদের পবল পেতাপ', জাঙলের চৌধুরীরা বাবাঠাকুরের 'কিপায়' যখের ডিভির ধনে বড়লোক, সায়েবডাঙার নীলকুঠীর সায়েবদের বাগ-বাগিচা ক্ষেতখামার জমিদারির মালিক। সেই চৌধুরীদের জোতদার—'পেধান' জোতদার ঘরভাঙারা। নয়ানের কত্তাবাবার গলার হাঁকার কি! 'মোচের' 'বেক্কম' কি। আঙা চোখের তারার ঘুরণ কি! বাবা, আজ নয়ানের বউকে কেড়ে নিয়ে তোমরা দিলে করালীকে। সেকালে চৌধুরীবাবুর ছেলের কামরায় নয়ানের বাবা দিয়ে আসত কাহারপাড়ার বউ বিটী। বসনকে আমার সেই তো ধরেছিল বাবুর লজরে? নয়ানের বাপ বাবুর মদের পেসাদ পেত, মাসের পেসাদ পেত, সকল ভোগের পেসাদ পেত।

নয়ান এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে। চোখ মেলে চাইলে সে। বনওয়ারীকে দেখে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বনওয়ারী তার কপালে হাত বুলিয়ে বললে—ঘুমো। তু টুকচে সেরে ওঠ্, তোরও সাঙা দিয়ে দোব আমি। করালী তোর বউকে সাঙা করেছে, বলিস তো—করালী যে বউকে ছেড়েছে সেই বউকে সাঙা দিয়ে দোব তোর।

সুচাঁদ বললে—কি বলছিস ব্যানো? অ্যাঁ! কি অল্যায় আমি করলাম রে? আজ মাতব্বর হয়েছিস। তোর গায়ে লাগছে ঘরভাঙাদের মাতব্বরির কাহিনী, সে আমি জানি। কিন্তুক লয়ানের বাবার পাশে পাশে তোর ঘোরা তো আমার মনে আছে। লয়ানের বাপ চৌধুরীবাবুর কামরাতে থাকত, আমোদ করত। তু ঘরভাঙাদের পাঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতিস, সে কথা তু ভুলতে পারিস আমি তো ভুলতে পারি না। তু আজ হারামজাদা করালীর পক্ষ নিয়েছিস! লয়ানের মা আজ না হয়—

বনওয়ারী বেশ উঁচু গলায় ধমক দিয়ে উঠল—পিসী!

সুচাঁদ শুনতে পেলে এবং তিরস্কারের সুর বুঝতেও পারলে। সেও চীৎকার ক'রে উঠল—কেন রে? তোকে ভয় ক'রে বলতে হবে নাকি কথা? লয়ানের মায়ের সঙ্গে তোর গুজু গুজু আর কেউ না-জানুক আমি জানি। লদীর ধারে একদিন উয়োর পায়ে ধরেছিলি, আমি দেখেছিলাম।

বনওয়ারী এসে দাঁড়াল সুচাঁদের সামনে।

সুচাঁদও উঠে দাঁড়াল। সে ভয় পেয়েছে। কাহারদের মাতব্বর বড় ভয়ঙ্কর। সে সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারীর কথা ছেড়ে করালীকে গাল পাড়তে লাগল।—করালীকে গাঁয়ে আনলি, ও থেকে গাঁয়ের সব্বনাশ হবে। বাবার বাহন মেরেছে ও। চন্নপুরে মেলেচ্ছ কারখানায় কাজ ক'রে মেলেচ্ছ হয়েছে ও। আমার গায়ে ব্যাঙ দিয়ে দেয়। ওর সঙ্গে পাখীর বিয়ে ?

বলতে বলতেই সুচাঁদ চ'লে গেল।

বনওয়ারী উঠানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে যাচ্ছিল শালের দিকে। মৃদু কণ্ঠে কে ডাকলে—শোন।

নয়ানের মা দাঁড়িয়েছে এক দাওয়ার ধারে খুঁটিটি ধ'রে।

বনওয়ারী একটু বিব্রত হ'ল।

নসুবালার ছড়ার ইঙ্গিত সত্য, সুচাঁদের কাহিনীও সত্য। নয়ানের মায়ের কাছে আজ মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। অন্যায়—অনেক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। বনওয়ারীর এ অন্যায় ইচ্ছাকৃত অন্যায়। সে-আমলের কথা সে-সব। নয়ানের বাপ দাঁতাল কুঞ্জ তখন মাতব্বর, বনওয়ারী ছিল কুঞ্জর বন্ধু, কিন্তু তাকে ঈর্ষা না ক'রে পারত না। মাতব্বরির উপর দৃষ্টি পড়েছিল। বনওয়ারীর বাপ তখনও বেঁচে। কুঞ্জ তখন চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে ঘোরে। সেই সময় বনওয়ারী প্রতারণা করেছিল নয়ানের মার সঙ্গে।

নয়ানের মা কাছে এসে দাঁড়াল। বনওয়ারী বললে—লয়ানের আমি সাঙা দিয়ে দোব বাসিনীবউ, পিতিজ্ঞে করেছি আমি।

নয়ানের মা কাঁদছিল।

বনওয়ারী বললে—লয়ান সেরে উঠুক, আনন্দে ঘরসংসার কর। আর—আর যদি লয়ান ভাল ক'রে না সারে, তবে কাউকে নিয়ে খেটে-খুটে খাবে। আর—। সে চুপ ক'রে গেল, কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে না। মাতব্বর হয়ে কথাটা উচ্চারণ করা উচিত নয়।

বউরের রোজকার, বিটীর রোজকার কাহারপাড়ায় 'শাক-ঢাকা মাছ'। জানে সবাই। বনওয়ারী বলতে চেয়েছিল সেই কথা।

বনওয়ারী বললে—আমি তবে যাই। শালে গুড় ফুটবে।

পিছন থেকে টান পড়ল তার কাপড়ে। চকিত হয়ে বনওয়ারী ফিরল। অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি প্রখর। তা ছাড়া কাহারদের বুকের কথাও জানে কাহার মাতব্বর। কোপাই নদীর পাগলামির ছোঁয়াচ কাহার মেয়েদের জীবনে ঘোচে না।

বিশ বছরের সন্তানের জননী নয়ানের মা। তার চোখের দিকে বনওয়ারী চেয়ে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। নয়ানের মা বললে—মনে আছে ? পায়ে ধরেছিল নদীর ধারে সুচাঁদ পিসি বলে গেল।

—লয়ান রয়েছে ঘরে, বাসিনীবউ।

—সে ঘুমিয়েছে। জান, তখনও মাতব্বরি ঘরভাঙাদের। আমি তখন ঘরভাঙাদের বউ।

—বাসিনীবউ, আমি তো তোমার অসম্মান করি নাই ভাই।

বাসিনীবউ তার হাত চেপে ধরেছে। চোখ জ্বলছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। বাসিনীবউ ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে।

বনওয়ারী মনে মনে বাবা-ঠাকুরকে স্মরণ করলে। সে দাঁড়াল বাবার থানের দিকে মুখ ক'রে। বাঁশবনে অন্ধকারে ভয়-ডর লাগলে বাবার থানের দিকে তাকালে সে ভয় কেটে যায়। বাবার থানে গভীর রাত্রে আলো জ্বলে।

সুচাঁদ পিসী বলে—আমার বাবার বাবা দেখেছেন, ঘরভাঙাদের কত্তা দেখেন, অমাবস্যার 'এতে' বাবার থানে আলোয় আলোয় 'আলোকীন্নি'। সেই জন্যই কাহারপাড়ার প্রতি ঘর ওই বাবার থানে প্রতি অমাবস্যায় একটি ক'রে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে।

বাবার থানে অমাবস্যায় পিদীম দিলে, বাবা তার মঙ্গল করেন; তার ঘরে নিত্যি 'সনজেতে' আলো জ্বলবে, গভীর 'অরুণ্যে' তেপান্তরে পথ হারালে পথ খুঁজে পাবে—ওই আলো কাহারদের চোখে ফুটে উঠবে। যমপুরীতে 'অন্ধকারে' থাকতে হবে না, বাবার থানে যতগুলি পিদীম দেবে; সেখানে ততগুলি পাবে। তবে 'এড়া' কাপড়ে, পাপের কথা মনে ভাবতে ভাবতে পিদীম দিলে তার ফল—'আগড়া ধানের মত', খোসার মধ্যে শাঁস থাকে না, তুষের মধ্যে চাল থাকে না,—তেলকালির দাগ-ধরা মাটির 'ডেলুই' অর্থাৎ প্রদীপ শুকনো আধ-পোড়া শলতে নিয়ে প'ড়ে থাকে, পিদীমে শীষ জ্বলে না।

বনওয়ারী এই একটু আগে বাবার থানে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। মানত ক'রে এসেছে। ব'লে এসেছে, যে পাপ সে করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে মাতব্বর;—রাজার পাপে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের পাপে 'গেরাম' নাশ, কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার, 'পিতের' অর্থাৎ পিতার পাপে 'পুত্তে'র দণ্ড। সে মাতব্বর হয়ে গেরামের সব্বনাশ ডেকে আনবে না। বাবার কাছে তবু সে বলেছে কালোশশীর কথা, আর তার সঙ্গে রঙের খেলার 'রনুমতি' অর্থাৎ অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আর না। তা ছাড়া 'নোকসমাজে' নিন্দে হয়, 'চিলোকেঁরা' অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা করে হাসাহাসি, পুরুষে করে কানাকানি, উঁচু মাথা হেঁট হয়, মাতব্বরির আসন করে টলমল, শেষ পর্যন্ত মা-বসুন্ধরা ফেটে গিয়ে সে আসন 'গেরাস' করেন। সে বাবার থানের দিকে চেয়ে বাবাকে মনে মনে ডাকলে।

সত্যিই আলো চমকে উঠল। বাবার থানে নয়, আকাশে। চমকে উঠল দু'জনেই। কখন আকাশ ঘিরে মেঘ জমে উঠেছে। বিদ্যুৎ দিলে এই প্রথম। মেঘ ডেকে উঠল গুর-গুর ক'রে।

বনওয়ারী এবার ভয়ে চমকে উঠল।

বাবার থানের আলো আকাশে বিদ্যুৎ হয়ে 'ললপাচ্ছে' অর্থাৎ চমকাচ্ছে। বাবার হাঁক আকাশে আকাশে বেজে উঠেছে। কিন্তু পর-মুহূর্তে সামলে নিলে নিজেকে। ওদিক থেকে কে হাঁকছে—মুরুব্বি, মুরুব্বি! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, শালে কড়াইয়ে গুড় ফুটছে। জল পড়লে সব খারাপ হবে। সে ছুটল। নয়ানের মা সেই দুর্যোগ-ভরা আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল হঠাৎ—বাহনের মাথায় চেপে নাচ বাবা। নকনক করুক তোমার বাহনের জিভ। হে বাবা! হে বাবা!

বনওয়ারীও মনে মনে বলছিল, হে বাবা, হে দয়াময়, খুব রক্ষে করেছ বাবা। খুব রক্ষে করেছ।

শালে তখন হুড়োহুড়ি প'ড়ে গিয়েছে। উপরের ছাউনিতে খড় দিতে হবে। হেদো মণ্ডল খুব হাঁকডাক করছেন। অতনার বেটা লটবর উঠেছে ছাউনির উপর। মধ্যে মাঝে বাবা কালারুদ্রের নাম নিচ্ছে।

—শিবো হে! জয় বাবা কালারুদ্দু! ত্রিশূলের খোঁচায় 'ম্যাঘ' উড়িয়ে দাও বাবা। জল হলে গুড় মাটি হবে বাবা। আমের মুকুল যাবে বাবা। 'ফাগুনের জল আগুন'। ম্যাঘ উড়িয়ে দাও, এবার গাজনে আধ মণ গুড়ের শরবৎ মানত রইল। জয় বাবা কালারুদ্দু, গাজনে এবার পাঁচ পো তিলত্যালের পিদীম দোব বাবা। শিবো হে, খাস আমের গুটি তোমার ভোগে দোব বাবা।

বনওয়ারী আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিল স্থির দৃষ্টিতে।

বিদ্যুতের আলোয় সে দেখছিল, মেঘ যেন কড়াইয়ের ফুটন্ত গুড়ের মতই উথলাচ্ছে। সাদায় কালোয় ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ দিকে দিকে। জল 'অনিবার্য্য'। সকালের মেঘ ডাকলে নামে না, কিন্তু অকালের মেঘ নামবেই। বর্ষণের কাল আষাঢ় শাওন ভাদ্দ আশ্বিন। বাকি সকল মাস অকাল। বর্ষার সময় মেঘ ডাকলেও অনেক সময় বৃষ্টি নামে না। এ মেঘ অকাল মেঘ, বিশেষ মাঘ-ফাল্গুনের মেঘ, সাড়া দিলে অঙ্গ নাড়া দিয়ে ঝরবেই। ফাল্গুনের জল আগুন, আমের পক্ষে তো নির্ঘাৎ আগুন। সমস্ত মুকুলে ঝাঁই লেগে যাবে। আম হবে না। আঃ—'আমে দেখে ধান'। আম না হ'লে ধান হবে না। তবে বৃষ্টি হ'লে সায়েবডাঙায় কাজ লাগবে। কাঁকর মাটি ভিজে নরম হবে। জমি তৈরির একটা 'বাত' অর্থাৎ সময় পাবে। সায়েবডাঙায় জমি অনেকটা পেয়েছি বনওয়ারী।

নামল বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ ক'রে। বাবা কালারুদ্দু কান দিলেন না ওদের প্রার্থনায়। রতন তার মুনিব হেদো মণ্ডল মহাশয়কে বললে—মুনিব মশায়, আধ মণ গুড়ের মানতে বাবার মন উঠল না। এক মণ মানত করেন।

হেদো মণ্ডল পুরানো কালের লোক, তিনি কাহার নন। জলের ছিটে থেকে বাঁচবার জন্য বুড়ো বটগাছটার কাণ্ডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানতে টানতে বললেন—ভাগ্ বেটা কাহার কোথাকার, মানত করলে জল থামে!

—তবে গুড়টা মাটি হবেন মাশায়!

গাছের কাণ্ড বেয়ে কয়েকটা মোটা ফোঁটার জল মণ্ডল মহাশয়ের কল্কের উপর প'ড়ে ফ্যাঁস শব্দ করে ক'ল্কেটা নিবিয়ে দিলে, মণ্ডল মশায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকালেন, বললেন—অ-হ-হ!

রতন বললে—মুনিব মাশায়!

—নিকুচি করেছে বেটা কাহারের—মুনিব মাশায়, মুনিব মাশায়। হুঁকোটা ফেলে দিয়ে হেদো মণ্ডল খপ করে ধরলেন রতনের মাথার চুল, দমাদম কষিয়ে দিলেন কয়েকটা কিল। ছাড়া পেয়েই রতন বললে—ত্থান, কল্কেটা খসিয়ে ত্থান, আগুন ক'রে দিই।

ওদিকে শালের কড়াইয়ের পাশে বনওয়ারী অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। কড়াইয়ের ফুটন্ত

রসে খড় ও তালপাতার ছাউনি ভেদ ক'রে জল পড়ছে। আঃ, এমন যত্ন ক'রে গুড় তুলেছিল সে, সব মাটি হয়ে গেল। গন্ধ হবে, স্বাদ নষ্ট হবে। হায়! হায়! হায়!

পানু দূরে গাছের তলায় জল বাঁচিয়ে ব'সে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে এরই মধ্যে সরস রসিকতায় মজলিস জমিয়ে তুলেছে। রসটা জমিয়ে তুলেছে সে হেদো মণ্ডলের গুড় নষ্ট হওয়ার আনন্দ অনুভব ক'রে।—বেশ হচ্ছে, আচ্ছা হচ্ছে, লাগাও বাবা লাগ্‌ ঝমাঝম। যাক বেটার গুড় খারাপ হয়ে। ভারি বজ্জাত বেটা। মা-দুগ্‌গার অসুর!

হঠাৎ সেখানে এসে বসল মাথলা। তার সঙ্গে এল প্রহ্লাদ। জলে তাদের সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। প্রহ্লাদ ব'সেই বিনা ভূমিকায় বললে, পানা, তু কিন্তুক সাবধান!

—কেনে?

—কেনে? বনওয়ারী এতক্ষণ কোথা যেয়েছিল জানিস?

—কোথা?

—আটপৌরেপাড়ায় ঘেঁটুর গান শুনতে।

মুখ শুকিয়ে গেল প্রাণকৃষ্ণের। বনওয়ারীর প্রতিহিংসা বড় ভীষণ। মাতব্বর রাগে না তো রাগে না, রাগলে কিন্তু রক্ষা নাই।

প্রহ্লাদ বললে—ওদের ঘেঁটুগান এবার তু করেছিলি আমি জানি।

পানু এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, এবার সে তার স্বভাবগত চাতুর্যের সঙ্গে ব'লে উঠল —মাইরি না; মাইরি বলছি, ছেলের দিব্যি ক'রে বলতে পারি, কিছুই জানি না আমি। তারপর সে বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলে—আটপৌরেওলারা এবার লতুন গান বেঁধেছে নাকি ঘেঁটুতে? কি গান? মজার গান না কি? ব'লে সে অকারণে হি-হি ক'রে হাসতে লাগল।

প্রহ্লাদ বললে—বুঝবি মজা, এইবার বুঝবি। মুরুব্বির সঙ্গে কালোশশীকে জড়িয়ে গান! ঠেলা বুঝবি এইবার!

পানু বললে—মুরুব্বির সঙ্গে কালোশশীকে জড়িয়ে? তা হ'লে নিশ্চয় ওই করালীদের কাণ্ড। ওই নসুবালা-হারামজাদী—

—কে রে? কে? কি কাণ্ড করালীর?—বলতে বলতে পিছন থেকে এসে দাঁড়াল কে একজন। লোকটার গায়ে একটা আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড একটা বোঝা। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু গলার আওয়াজে বোঝা গেল, সে করালী। মাথায় ওটা কি?

প্রহ্লাদ প্রশ্ন করলে—করালী? মাথায় কি রে?

—তেরপল গো কাকা।

—তেরপল?

—হ্যাঁ। ইষ্টিশান থেকে এনেছিলাম একটা। তা জল দেখে মনে হ'ল, তোমাদের গুড় লষ্ট হবে। তাই নিয়ে এলাম, দাও চাপিয়ে চালের ওপর। এক ফোঁটা জল পড়বে না; একটা তেরপলের জামা গায়ে দিয়ে সে তেরপলটা মাথায় ব'য়ে এনেছে। অদ্ভুত লাগছে ওকে। ঠিক সায়েবের মত। প্রহ্লাদ লাফিয়ে উঠল।—বনওয়ারী! ব্যানো!

করালীকে প্রায় টানতে টানতেই সে নিয়ে গেল শালের উনোনের কাছে। হতাশভাবে সকলে উপরের চালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জন দুয়েক ছোকরা মুনিষ কোদাল ধরেছে, উনোনের মুখটার চারিদিক ঘিরে বাঁধ তৈরি করছে, জল যেন গড়িয়ে এসে উনোনের ভিতরে না ঢোকে, উনোন যেন নিবে না যায়। হেদো মণ্ডল হাউ হাউ ক'রে চীৎকার করছেন—ছাতা নিয়ে আয়, ছাতা এনে কড়াইয়ের ওপরে ধর। মণ্ডল মশায়ের বুদ্ধি 'হ'রে' যেয়েছে, অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ জলে ছাতা ধ'রে মাথাই বাঁচে না, তা শালের কড়াই?

প্রহ্লাদ কলরব ক'রে ব'লে উঠল—হইছে বনওয়ারী, হইছে। করালী রুপায় করেছে, ত্যারপল নিয়ে আইচে। দাও চাপিয়ে চালে।

—তেরপল! রেল-ইষ্টিশানের তেরপল! চাল-ধানের বস্তার উপর বর্ষার সময় চাপিয়ে দেয়, একটি ফোঁটা জল পড়ে না—সেই তেরপল!

হেদো মণ্ডল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর আর তর সইছে না।

—দে দে, চাপিয়ে দে। ওঠ্। উঠে পড়্।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—তা ভালই হইছে—হ্যাঁ, ভালই হইছে। দে, তা চাপিয়ে দে।

করালী বললে—তোমার জিম্মা রইল কিন্তু মুরুব্বি। তুমি অইচ ব'লেই আনলাম আমি, লইলে লাখ টাকা দিলে দিতাম না আমি—তা সে আজাই হোক আর রুজাই হোক, হ্যাঁ।

হেদো মণ্ডল কথাটা শুনে একটু হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—বলিহারি রে বলিহারি! খুব বলছিস যে! অ্যাঁ? আবার একটু হেসে বনওয়ারীর দিকে তাকিয়ে মণ্ডল বললেন—তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে—হাঁ, বেটা খুব বাহাদুর!

করালীর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হ'লে হয়তো ভুরু কুঁচকেই মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যেত, কিন্তু হেদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিয়ে উঠল—কি? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দনোকের উ কি কথা!

এক মুহূর্তে শালের সমস্ত কাহারেরা হতভম্ব হয়ে গেল। বনওয়ারী শঙ্কিত হয়ে উঠল। হেদো মণ্ডল সাক্ষাৎ দুর্গা মায়ের অসুর, এইবার হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়বেন করালীর উপর। কিন্তু আশ্চর্য, হেদো মণ্ডল কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন তেরপলের জামা-পরা করালীর দিকে চেয়ে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হেদো মণ্ডল শুধু বললেন—ক্যানে, অন্যায় কি বললাম আমি? কি রে বনওয়ারী, কি অন্যায়টা বলেছি, তুই বল্ দেখি?

বনওয়ারী উত্তর দেবার পূর্বেই করালী বললে—মুরুব্বির কাছে উ সব তো অন্যায় লাগবে না, উ সব ওদের গা-সওয়া হয়ে যেয়েছে। বলি—বেটা কিসের মশায়, বেটা? ব'লেই সে হনহন ক'রে চ'লে গেল। বললে বলতে গেল—বেটা শালা হারামজাদা গুখোরবেটা লেগেই আছে—ভদ্দনোকের মুখে লেগেই আছে। ভদ্দনোক! মাথা কিনেছে। অঃ—

সে এসে দাঁড়াল সেই গাছতলায়। কই, পানা কই? সে 'যেল' অর্থাৎ গেল কোথায়?

যারা ব'সে ছিল তারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে করালীর কাণ্ড দেখে। ভাবছে, করালী করলে

কি ? এও কি সম্ভব হয় ? অবাক ক'রে দিয়েছে করালী। ছোকরার বুকের পাটা বটে। সঙ্গে সঙ্গে এও তাদের মনে হচ্ছে যে, করালী কথাটা কিন্তু ঠিক বলেছে। ওই বাক্যগুলি মণ্ডল মশায় বাবু মশায়দের মুখে লেগেই আছে। রাগ হ'লে কথাই নাই, আদর করবেন, তাও বলবেন—বলিহারি রে শালো ! আদর ক'রে 'কেমন আছিস' শুধাবেন, তা বলবেন—কিরে হারামজাদা, রইছিস কেমন ? কথাটি করালী বলেছে ঠিক। তবে—। তবে এমন চ'ড়ে উঠে না বললেই হ'ত। —লঘু-গুরু তো মানতে হয়। ভগবান, বাবা কালারুদ্দের বিধানে তো এ সব লেখাই আছে, পায়ে মাথায় সমান নয়।

করালী আবার প্রশ্ন করলে—বলি, সে শালো গেল কোথা রে ? আ কাড়িস না যে ? অ্যাঁ !

মাথলা বললে—সে পালালছে কোথা।

—পালালছে ! শালো খ্যাঁকশ্যাল। পেলে হয় শালোকে।—করালী আর দাঁড়াল না। তেরপলের জামাটা পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চ'লে গেল যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে !

তেরপলের তলায় একটি ফোঁটা জল পড়ে না। নির্বিঘ্নে চলছে গুড় তৈরির কাজ। উনোনের পাশে লম্বা বাঁখারিতে নারকেলের মালা-গাঁথা হাতা নিয়ে গাদ অর্থাৎ ময়লা তুলতে তুলতে বনওয়ারী ভাবছিল ওই করালীর কথা। ছোকরা অসম্ভব কাণ্ড ক'রে তুলেছে। যা-খুশি তাই করছে। কোন বিধিবিধান মানছে না, শাসনের বাইরে গিয়েছে, কথায় কথায় ঝগড়া, পদে পদে বিপদ বাধিয়ে তুলছে।

আজই যদি তেরপলটার নেহাত দরকার না থাকত, তবে হেদো মণ্ডল ছাড়তেন না। কাণ্ড একটা ঘ'টে যেতই। নাঃ, বনওয়ারীর এ বড় খারাপ লাগছে। কাঁটাগাছ—করালী সেই কাঁটাগাছের চারা, তুমি আদর ক'রে কোল দিতে যাও, বুকে তোমার বিঁধে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেবে। তবে বেটা-ফেটা কথাগুলি খারাপ বটে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বনওয়ারী। আঃ, ছোকরাটি যদি ভাল হয়ে চলত, 'শলা-সুলুক' নিত মানত। ওই চন্নপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ ক'রে দিলে।

বৃষ্টি আরও জোরে এল। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস। বৃষ্টির জলের ঢল নামছে, গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে চলেছে। ওঃ, তেরপলটা না হ'লে আজ সব মাটি হ'ত। সব বরবাদ যেত। ওঃ, ঝম-ঝম ক'রে জল! কাহারপাড়ায় মেয়েছেলেগুলো কলকল করছে। ফাগুন মাস, চালে এখনও নতুন খড় পড়ে নাই, পুরানো খড় পচেছে, উড়ে গিয়েছে, দেবতার জল সবটুকুই ঘরে পড়ছে আজ। আহা-হা, সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারে না।

ছেড়ে দাও বাবা, দেবতা হে কালারুদ্দ, ক্ষান্ত দাও বাবা। কাহারদিগে আর মেরো না। মাইতো ঘোষ বলেন—এল ডাউরী ম'ল বাউরী। বাদলা বর্ষা হ'লে কাহারদেরই মরণ।

বাতাসে গাছপালার মাথা দুলছে। বাঁশবাঁদির বাঁশবনে মাতন লেগেছে। ঝরঝর শব্দে বৃষ্টি পড়ছে বাঁশের পাতায়, ক্যাঁ-কট-কট-কট শব্দ উঠছে দোলনলাগা বাঁশে বাঁশে ঘষা খেয়ে। মাঠ থেকে ভিজে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে।

হঠাৎ প্রহ্লাদ কোদালখানা হাতে নিয়ে উঠল।

—কোথা যাবি ?

—ওই দেখ।—প্রহ্লাদ দেখাল, গ্রাম-গড়ানি জলের ধারার মধ্যে এক পাশে কষের কালির মত একটা জলের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। কার সার-ডোবা ভেসেছে। সার-ধোয়া জলের ওই রঙ, ওই ধারা। কিছুতেই জলের সঙ্গে গুলে এক হয়ে যাবে না, এক পাশ ধ'রে চলবে। আর ওতে পা দাও, দেখবে ফুটন্ত জলের মত গরম। পাশে মাটি-রঙের জলে পা দাও, দেখবে ঠাণ্ডা।

প্রহ্লাদ বললে—আমার আউশের ভুঁইখানা ছামনেই, দিই কেটে ঢুকিয়ে, ই একবারে জমির সালসা।

—দে, ঘুরিয়ে দে। বনওয়ারীর জমি দূরে। আর সায়েবডাঙায় কোদাল চলবে এইবার।

ওঃ, বুনো শুয়োরগুলো চীৎকার করছে সায়েবডাঙায়। বেটারা ভিজে মাটি খুঁড়ে কন্দ খেতে বেরিয়েছে। সায়েবডাঙার মাটি নরম হয়েছে।

সাত

সায়েবডাঙা, কেউ বলে—কুঠিডাঙা।

পাথুরে মাটির ঢলন একটা—খানিকটা উঁচু খানিকটা নীচু, আবার খানিকটা উঁচু—লাল কাঁকরে ভরা—ঢেউ খেলানোর ভঙ্গিতে একটা ঢলন যেন নেমে এসেছে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের দেশ থেকে। পশ্চিম থেকে পুবে চ'লে এসেছে একটা ব-দ্বীপের চেহারা নিয়ে। এই ঢলনের আশেপাশে বাংলা দেশের মাটি। সেখানেই দেশের চাষের মাঠ, সে সব মাঠে নানা ফসল ফলে। হাঁসুলীর বাঁকে—এই লাল মাটির একটা ফালি এসে শেষ হয়েছে হাঁসুলী বাঁকের উত্তর-পশ্চিম মাথায়। এইখানে নীলকর সায়েবেরা তাদের কুঠি তুলেছিল। এই মাটিতে আট মাস ঘাস জন্মায় না, আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত কঠিন রোগে চুল-উঠে-যাওয়া মানুষের মাথায় সদ্য-গজানো রোগা চুলের মত পাঙাশ-সবুজ রঙের ঘাস গজায়। উঁচু সায়েবডাঙায় ঢলন ক্রমশ নীচু হয়ে কোপাইয়ের চরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। কোপাইয়ের বন্যার ভয়েও বটে, এবং বন-জঙ্গলে কাদা নাই—ঝকঝকে তকতকে ব'লেও বটে, সাহেবেরা এইখানে কুঠি তুলেছিল। সাহেবদের আমলে এই ডাঙা ছিল রাজপুরী।

সুচাঁদ বলে—বাবারা বলত, অ্যাই বড় বড় ঘোড়া, এই ঝালর দেওয়া সওয়ারী অর্থাৎ পালকি। এই সব বাংলা-ঘর, ফুল বাগিচা, বাঁধানো খেলার জায়গা, কাঠ-কাঠরার আসবাব; সে ঐশ্বর্যের কথা এক মুখে বলা যায় না। এক দিকে কাছারি গমগম করত, বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত পাইক আটপৌরেরা—মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি নিয়ে ব'সে পাহারা দিত। জোড়হাত ক'রে ব'সে থাকত চাষী সজ্জনেরা—ভয়ে মুখ চুন। দু-দশজনাকে বেঁধে রাখত। কারুর শুধু হাতে দড়ি, কারুর বা হাত-পা দুইই বাঁধা। সায়েব লোক, রাঙা রাঙা মুখ, কটা কটা চোখ, গিরিমাটির মত চুল, পায়ে অ্যাই বুট জুতো—খট মট ক'রে বেড়াত, পিঠে 'প্যাটে' জুতো সুদ্ধ লাথি বসিয়ে দিত,

মুখে কটমটে হিন্দী বাত—মারডালো, লাগাও চাবুক, দেখলাও শালোলোগকো সায়েব লোকের প্যাচ। কখনও হুকুম হ'ত—কয়েদ করো। কখনও হুকুম হ'ত—ভাঙ দেও শালো-লোকের ধানকো জমি। নয়তো, কাটকে লেও শালোকে জমির ধান। সে তোমার বামুন নাই, কায়েত নাই, সদ্গোপ নাই—সব এক হাল। 'আতে' সারি সারি বাতি জ্বলত—টুং-টাং—ক্যাঁ-কোঁ—ভ্যাঁ-পো ভ্যাঁ-পো বাজনা বাজত, সায়েব মেম বিলিতি মদ খেত, হাত ধরাধরি ক'রে নাচত, কয়েদখানায় মানুষ চেঁচালে হাঁকিড়ে উঠত বাঘের মত—মৎ চিল্লাও। বেশি 'আত' হ'লে সেপাইরা বন্দুকের রজ করত—দুম-দুম-দুম-দুম। হাঁক দিত—ও—হো—ই। তফাৎ যাও—তফাৎ যাও—চোর বদমাস হুঁশিয়ার! চোরই হোক আর সাধুই হোক এতে ওদিকে হাঁটলে অক্ষে থাকত না; দুম ক'রে গুলি ক'রে দিত।

সেই ডাঙা এখন ধু-ধু করছে। নীলকুঠির চিহ্নের মধ্যে আছে কেবল সাহেবদের লাগানো আমবাগান। তারই মধ্যে ভাঙা নীলের হ্রদগুলো, আর বাংলোর কিছু কিছু ভিত। সেগুলোর চারিপাশে ঘন ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। কাঁকুরে পাথুরে ডাঙার এই ঠাঁইটুকুতে সাহেবরা সার মাটি দিয়ে খুঁড়ে-খুসে জল ঢেলে অদ্ভুত উর্বর ক'রে তুলেছিল। তখন ছিল বাগান, এখন জঙ্গল। বাকিটা চিরকালের সেই লাল মাটি ধু-ধু করছে।

সুচাঁদ ডাঙাটার ধারে দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে আক্ষেপ করে। চোখ দিয়ে তার সত্যই জল পড়ে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ায় মানুষদের প্রকৃতি আছে, চরিত্র নাই। অল্পেই ওরা হাসে, অল্পেই ওরা কাঁদে; নিজের দুঃখেও কাঁদে, পরের দুঃখেও কাঁদে। মহাবনে মহাগজ পতনের সংবাদ পেলে কৌতূহলবশত দেখতে যায় এবং এত বড় দেহটি অসাড় হয়ে প'ড়ে থাকতে দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে। তবে ওদের পুণ্য নাই, ওদের চোখের জলের স্পর্শে মৃত জীবন্ত হয়ে উঠে না। সুচাঁদের মুখে সাহেবডাঙার গল্প শুনে সবাই চোখ মোছে, তবে সুচাঁদের মত এত কাঁদতে কেউ পারে না। সুচাঁদ সেই উপকথার শেষের যুগের মানুষ যে!

সুচাঁদ চোখ মুছে বলে—আঃ আঃ, রোপোকথায় সেই যে বলে, রাক্ষুসীর খাওয়া পুরী, এ তাই। খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁ করছে।

সত্যই খাঁ-খাঁ করে। মানুষজন ওদিকে বড় কেউ আসে না। দাঁতালের আড্ডা, জঙ্গলে-ভরা ভাঙা নীলকুঠি। রাত্রে ওরাই দল বেঁধে বার হয়, ছুটে গিয়ে পড়ে নদীর ধারে, দাঁতে মাটি চিরে নানান গাছের মূল তুলে খায়। ধানের সময় মাঠে গিয়ে পড়ে। মাঠে মাচান বেঁধে টিন বাজিয়ে কাহারেরা তাদের তাড়ায়। ছোট ছোট বাখারিতে শক্ত দড়ি-গাঁথা বঁড়শি বেঁধে মদের মেয়া ও কলার টোপ গেঁথে ছড়িয়ে দেয় মাঠময়, ধান খেতে এসে মুখে বঁড়শী গেঁথে পায়ে দড়ি আটকে দাঁড়িয়ে থাকে, সকালে কাহাররা ধরে মারে। বেশি উপদ্রব হলে দল বেঁধে গিয়ে মেরে আসে ওদের।

সেই কুঠিডাঙায় কোদালের কোপ পড়ছে।

জল ঝড় হয়ে গিয়েছে দু'দিন আগে। বৃষ্টি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই হয়েছে। চন্দনপুরের বড়বাবুরা সাঁওতাল মজুর লাগিয়েছেন প্রায় দেড়শো। এই লাল কাঁকুরে মাটির একটি বিশেষত্ব আছে। যে মাটি পাথরের মত শক্ত, কোদালে কাটে না, কোপ মারলে খানিকটা লাল ধুলো ওড়ে, চোখে মুখে মিহি বালি ছিটকে লাগে, সেই মাটি বৃষ্টিতে ভিজলে কয়েকদিন ধরে ভুরোর মত নরম হয়ে থাকে। মাটির এই অবস্থার নাম 'বতর'। এখানকার মাটিকাটার সুযোগ এই বতরে। এ সুযোগ চলে গেলে মাটি-কাটা আবার কঠিন হয়ে পড়বে। সাহেবডাঙার যে ঢালটা নেমেছে কোপাইয়ের দিকে, সেই ঢালে চাষের জমি তৈরি হচ্ছে। ঢালের শেষ অংশটায় চন্ননপুরের বড়বাবুদের নিজের জমি তৈরি করছে সাঁওতালরা।

কাছাকাছি জাঙলের সদ্গোপ মহাশয়দের কয়েকজন সেলামী দিয়ে খাজনা-বন্দোবস্তিতে জায়গা নিয়েছে। তারা নিজেরা ব'সে আছে, খাটছে কিষাণ মাহিন্দার সঙ্গে দু'চারজন মজুর। বনওয়ারী সবচেয়ে খারাপ পাঁচ বিঘা জায়গা নিয়েছে। বিনা সেলামীতে জমি, নীরস তো হবেই। তা ছাড়া কাহারদের অদৃষ্টে এর চেয়ে ভাল জমি হবেই বা কেন? সে নিজেই কোপাবে মাটি, সেই মাটি ঝুড়িতে তুলে মাথায় ব'য়ে আলবন্দী করে ফেলবে বনওয়ারীর বউ আর সুচাঁদ পিসী। সুচাঁদ পিসীকে বনওয়ারী মজুর দেবে অবশ্য। তিনপহর খাটবে, চোদ্দ পয়সা নগদ পাবে আর পাবে জলখাবার মুড়ি। আর কথা আছে—বিকেলবেলা ঠাণ্ডার সময় ছুটির পর প্রহ্লাদ রতন পানু আরও জনকয়েক কোদাল নিয়ে এসে মাটি কেটে রেখে যাবে। পরের দিন সেই মাটি তুলে ফেলবার জন্য পাড়ার কয়েকজন মেয়েকে লাগাবে বনওয়ারী। বনওয়ারী হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রণাম করলে—'আচোটা মাটিকে' অর্থাৎ ভূমিকে। মনে মনে বললে—তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মাজ্জনা করছি। সেবা করছি তোমার। তুমি ফসল দিয়ো। আমার ঘরে অচনা হয়ে থেকো। তারপর সে কোঁচড় থেকে খুলে সেখানে নামিয়ে দিলে—বাবাঠাকুরের পুজোর ফুল। জয় বাবা, তুমি অক্ষে কর। যেন পাথর না বার হয়। কোন জন্তু-জানোয়ার না বার হয়। হাতে তালি দিয়ে বললে—কীটপতঙ্গ, সাপ-খোপ সাবধান, তোমরা স'রে যাও। আমি আজার কাছে জমি নিয়েছি, দেবতার কাছে আদেশ নিয়েছি—এ জমি আমি কাটব। সে কোপাতে লাগল। সদ্গোপ মহাশয়েরা নিজে হুঁকোয় তামাক খেয়ে মধ্যে মধ্যে কৃষাণ মাহিন্দারদের দিচ্ছেন। সাঁওতালেরা 'চুটা' খাচ্ছে। বনওয়ারী দু পয়সার বিড়ি কিনে এনেছে, নিজে খানিকটা খেয়ে এঁটো বিড়ি বউকে দিচ্ছে, সুচাঁদকে দিচ্ছে গোটা বিড়িই। পিসীও বটে, তা ছাড়া পুরো একটা বিড়ি না খেলে সুচাঁদের নেশা হবে না। কিন্তু সুচাঁদও বিড়ি খেতে চায় না, তামাকই তার সবচেয়ে প্রিয়। হঠাৎ সুচাঁদ হেদো মণ্ডলের কাছে গিয়ে বললে—কল্কেটা একবার দাও কেনে গো!

মণ্ডল বিনা বাক্যব্যয়েই কল্কেটা নামিয়ে দিলেন। সুচাঁদ মণ্ডলের সামনেই উবু হয়ে, অবশ্য লজ্জা ক'রে পিছন ফিরে বসে নারীত্বের ভূষণ বজায় রেখে তামাক খেতে লাগল। হঠাৎ একসময় লজ্জা ভুলে সামনে ফিরে বললে—তুমি তো তবু কল্কে দিলে মোড়ল, পানার মুনিব হ'লে মারতে আসত আমাকে। অথচ আমার মেয়ের তরে যখন অণ্ড ধরেছিল, তখন আমার পায়ে ধরতে এসেছিল।

হেদো মণ্ডল ধমক দিয়ে চীৎকার করে বললেন—থাম্, এখানে বকবক করিস না। হেদো মণ্ডলের গলার আওয়াজ একেই খুব জোর, তার উপর সুচাঁদকে কালা জেনে চীৎকার করেই কথা বলায় সুচাঁদ স্পষ্ট শুনতে পেলো কথাগুলি। এর জন্যে সে হেদো মণ্ডলের উপর বরাবরই খুব সন্তুষ্ট।

—বকবক করব না?

—না।

কিছুক্ষণ হেদো মণ্ডলের মুখের দিকে চেয়ে রইল সুচাঁদ, তারপর বললে—সব শেয়ালের এক রা। তা বেশ। আবার সে তামাক খেতে লাগল। আবার বললে—তোমরা আর কোদাল ধরবা না, লয়?

হেদো মণ্ডল বলে উঠলেন—এ-হে-হে! এ মাগী তো বড় জ্বালালে দেখছি।

—কেনে? জ্বালালাম কি ক'রে? বলি জ্বালালাম কি ক'রে? তোমার বাবাকে দেখেছি নিজে হাতে কোদাল ধরে ওই লম্বা বাকুড়ি কাটতে। হাঁস্ হাঁস্ ক'রে সে কী কোদালের কোপ। তোমরাও তো কাটতে গো মাটি নিজে হাতে। আমি তো ভূশণ্ডী কাক—আমার তো দেখতে বাকি নেই কিছু।

কথাটা সত্য, কিছুকাল অর্থাৎ বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেও এই সব মণ্ডল মহাশয়েরা পুরাপুরি চাষী ছিলেন। জমি কাটাইয়ের কাজ থেকে আরম্ভ ক'রে চাষের কাজ পর্যন্ত কিষাণ মাহিন্দার এবং মজুরদের সঙ্গে নিজেরাও প্রত্যেক কাজটি ক'রে যেতেন, তাতে অপমান বোধ করতেন না। এই বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এমন ওলটপালট হ'ল যে, সদ্গোপ মহাশয়েরা এখন আধাবাবু হয়ে উঠেছেন। হেদো মণ্ডল নিজেও এ কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে পারেন, তাঁর শরীরে প্রচুর ক্ষমতা এখনও এবং চাষে-কর্মে তাঁর গভীর অনুরাগ। সকল কাজ পূর্বের মত করতে তাঁর ইচ্ছাও হয়, কিন্তু পারেন না। পারেন না, নিজেদের জ্ঞাতি-জ্ঞাতির কাছে লজ্জা পেতে হবে বলে; আঃ, হায় রে! কি যে ইংরিজি বাবুগিরির ঢেউ এল দেশে! এই বলে মনে মনে আক্ষেপ করেন তিনি। বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে তবুও তিনি অনেক কাজ করেন। কিন্তু সুচাঁদের কাছে স্বীকার করতে পারেন না সে কথাটা। তিনি বিরক্ত হয়েই বললেন—বকিস না মেলা। তোরা যে মরা কুকুর বিড়েল ফেলা ছেড়েছিস, আবার রব তুলছিস মরা গরু কাঁধে করে ফেলব না, বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করবি না বলছিস। বলি, তোরা এত বাবু হলি কি করে। তোরাও বাবু হচ্ছিস, আমরাও বাবু হচ্ছি। না হ'লে আমাদের মর্যাদা থাকে কি ক'রে?

সুচাঁদ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বনওয়ারীকে। বললে—ওই—ওই মুচ্ছুদ্দি, বুঝলে মণ্ডল—ওই বনওয়ারীর মাতব্বরি এসব। ওই ধুয়ো তুলেছিল মরা কুকুর বেড়াল ফেলব না। তা'পরেতে সবাই মিলে গুজুর গুজুর ক'রে ধুয়া ধরেছে—গরু ফেলতে হ'লে কাঁধে ক'রে ফেলাব না, গাড়ি চাই; জলনিকেশী লালা ছাড়াব, কিন্তু এঁটো-কাটা-ময়লা মাটির পচা নদ্দমাতে হাত দোব না। আমি বলি, বাপ পিতামোর আমল থেকে ক'রে আসছিস, করবি না কেনে? তা বনওয়ারী ঘাড় লেড়ে বলে—উ-হুঁ; মুদ্দোফরাস মেথরের কাজ করবে কেনে?

হেদো মণ্ডল এবার ক্ষেপে উঠলেন—বনওয়ারীর দোষ? বলি, হ্যাঁ রে মাগী, তোর নাতজামাই করালী যে সেদিন আমাকে বললে—বেটা-ফেটা ব'লো না মশাই, সেও কি বনওয়ারীর দোষ নাকি?

সুচাঁদ গালে হাত দিলে—সেই মারে! তারপর বললে—ওকে আমি দু-চক্ষে দেখতে লারি। পাড়ার সব্বনাশ করবে—দেখো তুমি, সব্বনাশ করবে।

বনওয়ারীর কানে কথাগুলি সবই যাচ্ছিল। সুচাঁদ পিসী কালা, হেদো মণ্ডল চীৎকার ক'রে কথা বলছে। সুতরাং সে কেন, এখানকার সকলেই শুনতে পাচ্ছে। সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ডাকলে—বলি, তামুক খাবা আর কতক্ষণ?

সুচাঁদ ব্যস্তভাবে উঠল। বনওয়ারীকে খাতির সে করে না, কিন্তু আজ বনওয়ারী সুচাঁদের প্রায় মনিব-স্থানীয়, নগদ চোদ্দ পয়সা এবং জলখাবারের মুড়ি দেবে সে। উঠেও সে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ দুঃখের আবেগে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলে, তারপর হেদো মণ্ডলকে বললে—আমার ললাট দেখ কেনে মণ্ডল মশায়। এই বুড়ো বয়সে মজুরী খাটছি। ওই করালীকে বিয়ে করেছে ব'লেই লাতিনের সাথে বসনের সাথে ভিন্ন হয়েছি আমি।

আবার সে বসল। গলা ফাটিয়ে মণ্ডলকে বললে—আমি বলেছিলাম বসনকে, ওই হারামজাদী পাখীকে—নয়ানের হাঁপানি ধরেছে, ভাল হয়েছে, নামের মরদ নামে থাকুক। পাখীর এমন উঠতি বয়স, কিছু ওজগার-টোজগার ক'রে লে। তা'পরেতে খানিক-আদেক বয়েস হোক—এক কুড়ি, ড্যাড় কুড়ি হোক, তখন 'ছাড়াবড়' ক'রে সাঙা দিবি। না কি বল মণ্ডল? সুচাঁদ আবার কাঁদতে লাগল—আমার প্যাটের বিটি বসন, বসনের প্যাটের বিটী পাখী—

এবার বনওয়ারী কাছে এসে দাঁড়াল। সুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চল্ বাবা, চল্। এই দুটো পরানের বেথার কথা মণ্ডল মশায়কে বললাম। খুঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলে সে নিজের কাজের জায়গার দিকে। বনওয়ারী মাটি-বোঝাই ঝুড়িটা তার মাথার উপর তুলে দিতেই সুচাঁদ বনওয়ারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাতর অনুনয় ক'রে বললে—আগ করেছিস, হা? বনওয়ারী?

বনওয়ারী উত্তর না দিয়ে ঘুরে কোদালটা ধ'রে মাটিতে কোপ মারতে আরম্ভ করলে। মোটা বলিষ্ঠ হাতে রাগের মাথায় সে কুপিয়েই চলল। কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে কোমর ...ড়িয়ে নিলে, ধুলো-মাখা হাতের আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম টেনে চেঁছে ফেললে। দেড়শো সাঁওতালের টামনার কোপে বাবুদের কাজ এগিয়ে চলেছে কোপাইয়ের বানের মত। আর তার কাজ চলেছে রিমিঝিমি বর্ষার ধানের জমিতে গরুর খালে জল জমার মত। তা হোক। এমনি ক'রেই চিরদিন কাজ চ'লে আসছে। বাবুদের কাজ চলবে দিনকয়েক—যতদিন 'বতর' থাকবে ততদিন, তার কাজ চলবে বারো মাস। রোজ বিকালে এসে সে খানিকটা ক'রে কেটে যাবে। এবার মাত্র একখানা জমি তৈরি করবে সে। বাকি জমিটায় চাষ দিয়ে ভাদ্র মাসে কতকটা 'তেপেখে' অর্থাৎ তিন পক্ষীয় কলাই, কতকটা ঘেসোমুগ, কতকটা বরবটি ছিটিয়ে দেবে। তারপর আসছে মাঘে যে জলটা হবে, সেটা হ'লেই লাঙল চালিয়ে মই দিয়ে ঠেলে মাটি সরিয়ে আলবন্ধনের চেষ্টা করবে;

তারপর কিছু মাটি কেটে সমান করবে ; সঙ্গে সঙ্গে আল-বন্ধনও শক্ত হবে। এভাবে জমি করায় সুবিধাও আছে, ধীরে ধীরে ঠেলে ঠেলে পাশের পতিতের মধ্যে চল না কেন এগিয়ে। নজর পড়বে না কারও। পাঁচ বিঘা জমি নিয়েছে বনওয়ারী—ওটাকে সাড়ে পাঁচ বিঘা তো করতেই হবে।

প্রথম ফসল উঠলে সে ফসলের ভোগ দিতে হবে বাবাঠাকুরের থানে, মুগসিদ্ধ বরবটি-সিদ্ধ আর এক বোতল পাকি মদ। কালারুদ্দুর পুরুত মশায়কে দিয়ে আসবে গোটা কলাই। বেরাস্তন পুরুতের মুখেই বাবা খেয়ে থাকেন। তারপর দিয়ে আসবে চন্ননপুরে বড়বাড়ি, নতুন মালিকবাড়ি। মুখুজ্জে বাড়িতে 'আজলক্ষ্মী'র ভোগে লাগবে, 'আজা' মহাশয়ের বদনে উঠবে। আর দিতে হবে জাঙলের দু-পুরুষে মনিব ঘোষ-বাড়িতে। তা না দিলে হয় ? এই সব দিয়ে-থুয়ে যদি থাকে, তখন পাড়াতে একমুঠো ক'রে দিতে হবে। তার পরে থাকে থাকবে, না থাকে—তাতেও বন-ওয়ারীর 'দুস্কু' থাকবে না। চাষের দ্রব্য—'মা-পিথিমির দান', এ পাঁচজনকে দিয়েই খেতে হয়। বিশেষ ক'রে প্রথম বছরের ফসল। দেবতা-ব্রাহ্মণ-রাজা মনিব-জ্ঞাত-গোষ্ঠী সবাইকে দিয়ে যদি থাকে তো নিজে খাবে,—না থাকে হাত-পা ধুয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকবে। যা দেবে তা তোলা থাকবে—আসছে বছর দুনো হয়ে ঘরে আসবে ; যমপুরীর খাতাতেও জমা হয়ে থাকল তোমার নামে।

মনের আনন্দে হুম-হাম ক'রে কুপিয়ে চলল বনওয়ারী। বনওয়ারীর বউ ছুটে ছুটে বইছে ঝুড়ি-ভর্ত্তি মাটি। সুচাঁদ পিসী খুঁড়িয়ে চ'লে এক ঝুড়ি ফেলে ফিরতে ফিরতে সে দু-তিন ঝুড়ি ফেলে আসছে। তার গরজের তুলনা কার সঙ্গে! এ জমি যে তার নিজের হবে।

ওঃ! সেরেছে রে! পাথর লেগেছে। কোদালের তলায় খং-খং ক'রে শব্দ উঠছে। মাটি সরিয়ে দেখলে বনওয়ারী। হাতখানেক মাটির নিচেই রয়েছে—নুড়িপাথর।

মাথায় হাত দিয়ে বসল বনওয়ারী। নুড়িপাথর এমন-তেমন নয়, একটা মেঝের পাড়নের মত ; ইয়া বড় বড় নুড়ি, আধ হাত তিন পো পুরু স্তরে জ'মে আছে। কোদাল দিয়ে টামনা দিয়ে কোপ মারলে ধার ভেঙে যাবে, ভোঁতা হয়ে যাবে অস্ত্র, কিন্তু তাতে তো পাথর উঠবে না। সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। টামনার বাঁটের উপর হাত রেখে ভাবতে লাগল—উপায় ?

বাবুদের সাঁওতাল মজুরেরাও পেয়েছে পাথরের স্তর। টামনা রেখে গাঁইতি ধরেছে। বাবু মহাশয়দের কারবারই আলাদা, আগে থেকেই 'রনুমান' অর্থাৎ অনুমান ক'রে গাড়ি বোঝাই ক'রে গাঁইতি এনেছে। হেদো মণ্ডল বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। সেও ভাবছে, পাথর লাগলে মুশকিল হবে। হেদো মণ্ডল বললেন—লাগল তো ? অর্থাৎ পাথর।

বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, লেগেছে।

—আমি জানতাম। হেদো মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন, চ'লে গেলেন বাবু মহাশয়দের চাষ-বাবুর কাছে। গুজু-গুজু ফুসু-ফুসু লাগিয়ে দিলেন। বনওয়ারী হেসে ঘাড় নাড়লে অর্থাৎ 'ঢাকে ঢোলে বিয়ে তাতে কাশতে মানা।' চাষবাবুকে কিছু দিয়ে গাঁইতি ভাড়া নেবেন। তার আর চুপিসাড়ে কথা কিসের বাবা!

বনওয়ারীর স্ত্রী হতাশ হয়ে পাশে উবু হয়ে ব'সে পড়ল। সে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি হবে ?

সুচাঁদ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—ছেড়ে দে, বুন্নি, বাবা—ছেড়ে দে। পাথরের মধ্যে কোথা কোন্ দেবতা আছে, অসুরের কাঁড়ি আছে, তাতে চোট মেরে কাজ নাই—ছেড়ে দে।

সে তুলে নিলে একটা গোল নুড়ি। নুড়িটার কালো গায়ের মাঝখানে গোল সাদা দাগ—ঠিক পৈতের মত। বললে—দেখ্। তারপর তুলে দেখালে একটা টুকরো অসুরের কাঁড়ি। ঠিক গাছের গুঁড়ির মত চেহারা, এগুলিকে সুচাঁদ বলে—অসুরের কাঁড়ি। অর্থাৎ অসুরের হাড় জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। দেবতারা অসুর মেরেছিলেন, তাদেরই হাড়। এ সব কাহারদের পিতি-পুরুষদের কথা। কিন্তু বনওয়ারীদের আমলে ও সব বিশ্বাস চ'লে গিয়েছে। সুচাঁদ পিসীর মিথ্যে ভয়। জমি কাটছে বনওয়ারী জীবন-ভোর; পাথরের গায়ে পৈতের মত দাগ হাজারে হাজারে দেখেছে। দেবতা কি হাজারে হাজারে ছড়িয়ে থাকে! পাথরে ও-রকম দাগ থাকে। অসুরের কাঁড়িও তাই। তবে ভাবনা একমাত্র এ পাথর কাটবে কি ক'রে? গাঁইতি না হলে 'রসম্ভব' অর্থাৎ অসম্ভব। কিন্তু গাঁইতি কাহারেরা ধরে না। ঐ ছুঁচালো অস্ত্রটি কখনও তো ধরা হয় নাই, সাহেব লোকের 'রামদানি' অর্থাৎ আমদানি করা অস্ত্রটি যে শূলের মত! ওতে মা-বসুন্ধরার বুকে আঘাত করা কি উচিত! তার উপর পাবেই বা কোথা! বাবু মহাশয়ের চাষবাবুকে ঘুষ দেবার মত টাকা তার কোথা?

হঠাৎ মনে পড়ল করালীর কথা। করালী পারে। চন্নপুরের রেল-কারখানায় গুদাম বোঝাই গাঁইতি। সে দিতে পারে। কিন্তু—

হেদো মণ্ডল এসে বললেন—কি রে, হতভম্ব হয়ে গেলি যে! চোট মেরেই দেখ্।

তা বটে। চোট মেরে দেখাটা দরকার, কতখানি পাথর আছে। মনে মনে প্রণাম ক'রে সে চোট মারতে আরম্ভ করলে। খং—খং—খং। লোহা এবং পাথরে আঘাত লেগে শব্দ উঠতে লাগল। পাথরের স্তরটা আধ হাতের মত পুরু, নিচে মোলাম কালো মাটি। বাহবা, বাহবা! একেবারে উৎকৃষ্ট ধরনের মাটি। গাঁইতি ধরতেই হবে। না ধ'রে উপায় নাই। কুঁদোর মুখে বাঁকা কাঠ সোজা, নেয়াইয়ের উপর হাতুড়ীর নিচে লোহা জব্দ, গাঁইতির মুখে মাটি-পাথর জব্দ। সে দেখেছে চন্নপুরের লাইনে—দূর থেকে দেখেছে অবশ্য—পশ্চিমা মজুরের হাতে গাঁইতির ঘায়ে পাথর খান খান হয়ে যায়। তাদের চেয়ে কম জোরে কোপ মারে না কাহারেরা।

—আঃ! আরে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে!

টামনা ছেড়ে দিয়ে বনওয়ারী কপালখানা চেপে ধরলে। হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে তার কুচি ছিটকে এসে তার কপালে লেগেছে। ওঃ, বাঁটুলের মত বেগে, কিন্তু তার চেয়ে ভীষণ। বাঁটুল গোল, তার ধার নাই, এটা ধারালো ভাঙা পাথর।

হাতের তালুতে আগুনের মত 'তাই' অর্থাৎ তাপ ঠেকছে কিসের? হুঁ, তা হ'লে নিয়েছে। 'অক্ত' নিয়েছেন মা-বসুমতী।

ছুটে এল বনওয়ারীর পরিবার।—দেখি, দেখি! অক্ত পড়ছে যে গো! হেই মা! কি হবে! পিসী—অ পিসী!

হেদো মণ্ডলের হাতের কল্কে দেখে সুচাঁদ আবার একদফা তৃষিত হয়ে উঠেছিল। সে শুনতেই পেলে না বনওয়ারীর পরিবারের কথা।

হেদো মণ্ডল দেখেছিলেন, তিনি উঠলেন না, শুধু বললেন—নিয়েছে নাকি?

বনওয়ারী হেসে বললে—হ্যাঁ।

হেদো বললেন—ও তো জানা কথাই। নেবেই। না নিয়ে ছাড়বে না। লাগিয়ে লে, মাটি লাগিয়ে লে।

বনওয়ারী একমুঠো মাটি তুলে চেপে ধরলে কপালের ক্ষতস্থানে। এতক্ষণে সুচাঁদ দেখতে পেয়ে সামনে উবু হয়ে বসল।

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা। মা-বসুমতী।

মা-বসুমতী যেমন দেন, তেমনিই নেন। আমন ধানে চালে ফসলে তোমাকে খাওয়াবেন, কিন্তু শেষকালে 'দ্যাহখানি' নেবেন, পুড়িয়ে দিলেও নিদেনপক্ষে ছাইমুঠোটি তাঁকে দিতে হবে। বেঁচে যতদিন আছ, নখ চুল এ দিতে হবে। মধ্যে মাঝে দু-চার ফোঁটা 'অক্ত'।' 'যে প্যাটে ছেলে ধরে সে প্যাট কি অল্পে ভরে?' এত মানুষ এত পশু পাখী পেসব করেছেন মা, বুক চিরে ফসল দিচ্ছেন, তার তেষ্টা কি শুধু মেঘের জলে মেটে? মায়ের বুকে চোটাতে গেলে 'অক্ত' দিয়ে মায়ের পুজো দিতে হয়। না দাও, মা ঠিক তোমার দু-চার ফোঁটা রক্ত বার ক'রে নেবেনই। নিয়েছেন মা তাঁর পাওনাগণ্ডা। বনওয়ারী রক্তমাখা মাটি মুঠো ক'রে জমির এক কোণে পুঁতে দিলে।

তবে এ লক্ষণ ভাল; রক্ত যখন নিয়েছেন মা, তখন দেবেন—তাকে দু হাত ভ'রে দেবেন।

ঝম্‌-ঝম্‌-গম্‌-গম্‌! গম্‌-গম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌! পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে, হাঁসুলী বাঁকের বাঁকে বাঁকে পঞ্চশব্দের বাজনার মত ধ্বনি তুলে দশটার গাড়ি চলেছে কোপাই পাগলীর বুকের ওপরের লোহার মালার পুল পার হয়ে।

মুখুজ্জেবাবুদের সাঁওতাল মজুরেরা গাইতি টামনা ঝুড়ি ফেলছে ঝপাঝপ। দশটায় এ বেলার মত ছুটি।

হাঁসুলীর বাঁকে বোশেখ মাসে দ্বাদশ সূর্যের উদয়।

এখানে গ্রীষ্মের দিনে খাটুনীর সময় সকাল ছটা থেকে দশটা। আবার ও-বেলায় তিনটে থেকে ছটা।

বনওয়ারীও কোদাল ঝুড়ি তুললে। ও-বেলায় খাটুনী বনওয়ারী খাটবে না। বনওয়ারীর ও-বেলার পালা আরম্ভ হবে সন্ধ্যেবেলা থেকে। চাঁদনী রাত্রি আছে, ফুর ফুর ক'রে 'বাওর' অর্থাৎ বাতাস বইবে, মদের নেশার আমেজটি লাগবে, পাড়াপ্রতিবেশী পাঁচজনকেও পাওয়া যাবে, তখন আবার কাজ আরম্ভ করবে বনওয়ারী। বাবুদের পয়সার খেলা, জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দেরও কতকটা তাই,—কতকটা দাপটের খেলাও বটে, জবরদস্তি কাজ আদায় ক'রে নেয় তারা। বনওয়ারীর নিজের গতরের খাটুনি, আর পাড়া-প্রতিবেশীর ভালবাসা 'ছেদ্দার' অর্থাৎ শ্রদ্ধায় কেটে দেওয়ার কাজ। বনওয়ারীর জমি রাত্রে কাটা হবে, জাঙলের মনিবেরা সকালে এসে দেখে বলবেন—এ শালোদের সঙ্গে পারবার জো নেই।

জাঙলের কাছাকাছি এসে সুচাঁদ বললে—বনওয়ারী, তা পয়সা কটা দিবি এখন ?

বনওয়ারী কোমরের গেঁজেল থেকে একটি দুয়ানি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—এই এক বেলা খাটুনির দামই দিলাম তোমাকে। উ-বেলা আর আসতে হবে না।

—আসতে হবে না ? কেনে ?—বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল সুচাঁদের। সে বুঝতে পেরেছে, বনওয়ারী তাকে শুধু আজ ও-বেলার জন্যই নয়, বরাবরের জন্যই আর কাজে নেবে না।

বনওয়ারী বললে—তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে নিয়ে কি খেটে পোষায় ? না, তোমারই আর খাটা পোষায় ?

সুচাঁদ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে—তা বেশ্। দে, তাই দে। তোর ধর্ম তোর ঠাঁই। প্যাটের বিটাই যে কালে বৈমুখ, সে কালে আর পরের ভরসা কিসের ? লইলে আমি এখনও যা খাটতে পারি, তা তোর পরিবারে পারে না।

বনওয়ারী আর কথা বললে না। সে স্ত্রীকে সঙ্গে করে চ'লে গেল গ্রামের দিকে। জল-খাবারের সময় হয়েছে, জল খাব। তার আগে গরুগুলিকে দুইতে হবে; তাদের মাঠে ছেড়ে দিতে হবে। অনেক কাজ। একটু দেরিই হয়ে গিয়েছে আজ। বনওয়ারীর গড়নটা খুব মোটা, তার উপর জোয়ান বয়সের প্রথম থেকেই বাঁক ব'য়ে পালকি ব'য়ে বাঁ কাঁধটা ডান কাঁধের চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে। চলেও সে বেঁকে। ডান পা-টা পড়ে জোরে জোরে। হন হন ক'রে সে চলল। ভিজে আলপথের ডান দিকের কিনারায় তার পায়ের ছাপ ব'সে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা জায়গা ভস করে ব'সে গেল। বনওয়ারী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে। বললে—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়লে সে।

বউ বললে—কি ?

—পিঁপড়ে।

অসংখ্য পিঁপড়ে গর্তটার ভিতরে বিজবিজ করছে। অধিকাংশের মুখে ডিম।

বউ বললে—আহা, দেখে চলতে হয়। ডিম নিয়ে কেমন আকুলি-বিকুলি করছে দেখ দি-নি।

—তোর মাথা। বনওয়ারী এদিক ওদিক চেয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে একটা পিঁপড়ের সারি দেখিয়ে দিয়ে বললে—ওই দেখ্। অনেকক্ষণ থেকে ওরা পালাতে লেগেছে এখান থেকে। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললে—জল ঝড় পেচণ্ড একটা হবে লাগছে।

—জলঝড় হবে ?

—পেচণ্ড।

—পেচণ্ড ?

—হ্যাঁ। পিঁপড়েতে জানতে পারে। বর্ষায় দেখিস না মেঝে থেকে চালে বাসা করে ? দাঁড়া।

ব'লে সে এগিয়ে গেল কর্তার থানের দিকে। ওখানে বেলগাছের গোড়াগুলিতে বারো মাস মানুষের হাত পড়ে না, পড়ে কালেকস্মিনে। এই নিরুপদ্রবতার জন্য বেলগাছ শ্যাওড়া গাছের গোড়াগুলি পিঁপড়ের বাসায় ভর্তি। প্রচুর পরিমাণে বালিমাটির কণা তুলে ছোট স্তূপের

আকারে উঁচু ক'রে সাজিয়ে চমৎকার বাসা করে। কিন্তু বর্ষার আভাস মাত্র পিঁপড়েগুলি ডিম নিয়ে উঠে যায় গাছের উপরে; পুরানো গাছগুলির জীর্ণ গাঁঠে ছিদ্র করাই আছে, সেই ছিদ্রগুলি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বাস করে। বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির লক্ষণ জানতে হ'লে বনওয়ারী ওই গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখে, পিঁপড়েগুলি নিচে নেমে এসেছে, কি উপরে উঠেছে।

বেশি দূর যেতে হ'ল না, কর্তার থানের মুখে এসেই তার নজরে পড়ল, কতকগুলো কাক নেমেছে। বেলগাছের ডালে ব'সে আছে সড়ক-ফিঙের ঝাঁক। তারাও মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কাকদের আশেপাশে লাফাতে লাফাতে ঠুকরে কিছু খেয়ে চলেছে। পিঁপড়ে খাচ্ছে, তাতে আর ভুল নাই। পিঁপড়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে উপরে চলেছে। পক্ষীর ঝাঁক নেমেছে, ওদের ভোজ লেগেছে। প্রচণ্ড জলঝড় একটা হবে, তাতে সন্দেহ নাই। পাড়ার লোককে সাবধান করতে হবে। এ সব হুঁশ যদি কারু থাকে! বনওয়ারীর আক্ষেপ হ'ল, ব'লেও কাহারদের সে জ্ঞান দিতে পারলে না।

বনওয়ারী বাড়ি ফিরল। বউ আগেই এসেছে। সে বললে—আচ্ছা বাজে করণে তোমার মতি বটে বাপু! সাবি বেনোদা ব'সে আছে। ওদ উঠেছে—ওরা আর যাবে কখন?

বনওয়ারী বললে—চেঁচাস না, চেঁচাস না, বুল্লি মাগী, একদণ্ড দেরিতে সাবি বেনোদা ওদে ননীর পুতুলের মতন গ'লে যাবে না। আমার কর্ম আমি বুঝি। দে, বাছুর ছেড়ে দে কেঁড়েটা দে।

গাইগুলি চীৎকার করছিল বাছুরের জন্য, বনওয়ারী গিয়ে কপালে গলায় হাত বুলিয়ে বললে—হচ্ছে, হচ্ছে। মা সকল, ধয্য ধর একটুকুন। হাসতে লাগল সে।

গাই দুয়ে শেষ ক'রে কেঁড়েটি নামিয়ে দিতেই সাবি বললে—গেরস্তরা বলছে বেজায় জল দিছিস দুধে। জল একটুকুন কমিয়ো কাকা।

সাবি বেনোদা দুজনে চন্ননপুরে যায় দুপুরবেলা, সুকৌশলে স্তূপীকৃত ঘুঁটে বড় বড় ঝুড়িতে সাজিয়ে নেয়, তার উপর রাখে দুধের ঘটি। চন্ননপুরের ভদ্রলোকের বাড়িতে দুধ রোজ দিয়ে আসে। চার পয়সা সের দুধ। বনওয়ারীর বাড়িতে দুধ হয় চার সের। সেই দুধে কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া পরিষ্কার জল মিশিয়ে বনওয়ারীর বউ পাঁচ সের ক'রে দেয়। দিন গেলে পাঁচ আনা পয়সা। তার মধ্যে দৈনিক পাঁচ পয়সা হিসেবে পায় সাবি আর বেনোদা।

বনওয়ারীর বউ বড় ভাল মানুষ। সে ঘাড় নেড়ে বললে—জল তো সেই এক মাপেই দিই মা। বেশী তো দিই না।

বনওয়ারী সাবির দিকে তাকিয়ে বললে—পথে ঝরনার জল মিশিয়ে তোরা আরও কতটা বাড়াস বল্ দিনি?

বেনোদা বললে—হেই মা গো। আমরা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা। তোমরা বড় ন্যায়না হে।—হাসতে লাগল বনওয়ারী।

বেনোদা এবং সাবিও হাসতে লাগল; এ কথার পর আর অস্বীকার করলে না তারা অভিযোগ। বনওয়ারী আবার বললে—একটুকুন কম বাড়িয়ে দিস, মানে মানে—আগে যতটা

বাড়াতিস, তার চেয়ে বাড়াস না। তা হ'লে বাবুরা রা কাড়বে না।

কথাটা সত্য, সাবি এবং বেনোদা—শুধু তারাই বা কেন—কাহারপাড়ার যে সব মেয়ে পরের দুধ নিয়ে চন্নপুরে যোগান দিয়ে আসে, তারা সকলেই ওই কাজ করে। পথে দুধে খানিকটা জল ঢেলে দুধ বাড়িয়ে দৈনিক দুটো চারটে পয়সা উপরি উপার্জন করে।

বনওয়ারী স্ত্রীকে বললে—ডিমগুলান দিয়ে দে।

স্ত্রী বললে—মনিব-বাড়িতে দেবে বলছিলে যে?

—দে দে। এখন পয়সার টানা, জমি কাটতে নোকজনকে পয়সা লাগবে।

মনিব! মনে মনেই জল্পনা-কল্পনা করে বনওয়ারী, মনিব যে এখন কে হবেন কে জানছেন! চন্নপুরে বড়বাবুর চরণ যদি পায়, তবে—

মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সেই হাসিমুখেই চলল সে করালীর বাড়ির দিকে। করালী নাই নিশ্চয়ই। পাখীকে ব'লে আসবে—করালীকে বলিস আমার গোটা কয়েক গাঁইতি চাই। একটু পাড়া ঘুরেই বলল সে, কার ঘরের চালের কেমন অবস্থা দেখে নিচ্ছিল। দু-চার দিনের মধ্যে জল একটু বেশি পরিমাণেই হবে; সামনে বৈশাখ মাস—জল হ'লে ঝড় হতেই হবে।

'পাথর' অর্থাৎ শিলাবৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। সকলকে সতর্ক ক'রে দিতে হবে।

কাহারপাড়ার ঘর। বানে ডোবে, ঝড়ে ওড়ে। দালান নয়, কোঠা নয়, ইট নাই, কাঠ নাই; মাটির দেওয়াল, বাঁশবাঁদির বাঁশ, হাঁসুলী বাঁকের নদীর ধারের সাবুইয়ের দড়ি আর মাঠের ধানের খড়—এই নিয়ে ঘর। কোঠাঘর করতে নাই—বাবাঠাকুরের বারণ আছে। তা ছাড়া কোঠায় শোবে বাবুরা, সদ্‌গোপ মহাশয়েরা। কাহারদের কি তাদের সঙ্গে সঙ্গ করতে হয়? না, সাজে?

বনওয়ারীর ভুরু কুঁচকে উঠল। নাঃ, আর পারলে না সে। কাহারদের শিক্ষা হবে না এ জীবনে। তার হাড়ে আর কুলাবে না। সকলের চালই ফুরফুর করছে। কারুব চাল তেমন ভাল নয়। এখন কারুর হুঁশ নাই। এখন বেশ লাগছে। 'আত্তিরে' ঘরে শুয়ে চালের ফুটো দিয়ে চাঁদের আলো আসে, 'দেবসে' 'ওদ' আসে, বেশ লাগছে। গ্রাহ্য নাই। গ্রাহ্য হবে বর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এলে সেই ঘোর লগনে। চালের অবস্থা একমাত্র তার ঘরেরই ভাল। এরই মধ্যে চালে সে নতুন খড় দিয়েছে। আচ্ছা বাহার খুলেছে! ওই আর একখানা ঘরের চালেও নতুন খড়। ওখানা তো করালীর ঘর! হ্যাঁ, করালীব ঘরই তো। বাহাদুর ছোকরা! সে এগিয়ে গেল এর ঘর ওর ঘর দেখতে দেখতে। করালীর ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল সবিস্ময়ে। এ দিক দিয়ে তার পথ নয়। এ পথে সে বড় হাঁটে না। পাড়ার মাতব্বর সে, দরকার না হলে সে কারও বাড়ি যায় না। করালীর বাড়ি সে ওদের বিয়ের পরে আর আসে নাই।

হরি হরি হরি! বলিহারি বলিহারি! ঘরখানাকে নিকিয়ে চুকিয়ে রঙ-চঙ দিয়ে করেছে কি? মনের মানুষ নিয়ে ঘর বেঁধেছে কিনা ছোকরা! ঘরের সামনেটার উপরের দিকে ঘন লাল গিরিমাটি দিয়ে রাঙিয়েছে, নিচের দিকটায় দিয়েছে আলকাতরা। দরজায় দিয়েছে আলকাতরা। দরজার দুপাশে আবার লাল নীল সবুজ হরেক রকম রঙ দিয়ে এঁকেছে দুটো পদ্ম! বাঃ বাঃ!

বাড়িতে কেউ নেই। পাখী বোধ হয় ঘাস কাটতে গিয়েছে। করালী তো সকালেই গিয়েছে চন্নপুর লাইনে খাটতে। নসুও গিয়েছে চন্নপুরে মজুরদের সঙ্গে খাটতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দেখলে। মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল তার।

—ক্যা গো? ক্যা দাঁড়িয়ে? এক বোঝা ঘাস মাথায় ক'রে পাখী এসে বাড়ি ঢুকল। বোঝার ঘাসগুলি তার চোখের সামনে ঝুলে রয়েছে ব'লে মানুষটাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে না সে।

—আমি রে পাখী। তোদের ঘর দেখতে এসেছি মা। বা-বা-বা। এ যে রিন্দভোবন ক'রে ফেলালছে করালী!

বোঝা উঠানে ধপ ক'রে ফেলে পাখী তাড়াতাড়ি ঘর খুলে একটা নতুন কাঠের চৌকো টুল বার ক'রে দিলে—ব'স মামা।

বা-বা-বা! এ যে টুল রে! বলিহারি বলিহারি! ভদ্দরজনের কারবার ক'রে ফেলালছে করালী!

পাখী ঘর থেকে একটা নতুন হারিকেন, একখানা নতুন সস্তা দামের শতরঞ্চি, একটা রঙচঙে তালপাতার পাখা এনে সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—এই দেখ, মানা করলে শোনে না; আজে-বাজে জিনিস কিনে টাকা-পয়সা ছেরাদ্দ করছে।

হা-হা ক'রে হেসে বনওয়ারী বললে—ওরে বাবা, নতুন বিয়ের এই বটে! তার ওপরে বউ যদি মনে ধরে, তবে তো আর কথাই নাই। তা তোকে মনে ধরা তো ধরা—দুজনাতে মনের মানুষ।

পাখী মুখে আঁচলটা দিয়ে হাসতে লাগল মামার কথা শুনে।

বনওয়ারী উঠল, বললে—আসছিলাম তো বাড়িতেই। পথে পাড়াটাও ঘুরলাম, সব চাল দেখে এলাম। একটা পেচণ্ড ঝড়জল হবে লাগছে কিনা! তা তোদের ঘরে এসে দাঁড়ালাম, এমন ঝকমকে ঘরদোর দেখে দাঁড়াতে হ'ল। যাই, এখন দেখি—কার চালে খড় আছে কার চালে নাই। মাতব্বর হওয়ার অনেক ঝক্কি মা।

পাখী বললে—ঝক্কি নিলেই ঝক্কি, না নিলে ক্যা কি করবে? ওই তো আটপৌরেপাড়ার মাতব্বর অয়েছে পরম—সে ঝক্কি নেয়? এত সব খোঁজ করে? কার চালে খড় নাই, কার ঘরে খেতে নাই—দেখে বেড়ায়? কারও দোষ-গুণ বিচার করে? তুমি এই যে আমার ঘর ক'রে দিলে, লইলে আমি চলে যেয়েছিলাম চন্নপুরে ওর সঙ্গে। তা'পরেতে নিকনে কি ঘটত কে জানে! হয়তো আবারও কারুর সঙ্গে চ'লে যেতাম বিশ্বাশ বিভুঁয়ে। তোমার দয়াতেই আমার সব। তুমি ধার্মিক লোক, মা-লক্ষ্মীর দয়া অয়েছেন তোমার 'পরে। কত্তাঠাকুরতলায় ধূপ দাও, পিদীম দাও, তোমার ধরমবুদ্ধি হবে না তো হবে কার? পাখী হঠাৎ হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে।

বনওয়ারীর বড় ভাল লাগল পাখীকে আজ। বড় ভাল মেয়ে পাখী। বসনের কন্যে, 'অক্তে' চৌধুরী মশায়দের 'অক্তের' মিশাল আছে, হবে না ভাল কথা! আনন্দে তৃপ্তিতে তার মন জুড়িয়ে গেল, হিয়েখানি যেন ভ'রে উঠল গরমকালে মা-কোপাইয়ের 'শেতল' জলে-ভরা 'আঙা'

মাটির কলসের মত। মনে মনে সে কত্তাঠাকুরকে প্রণাম করলে, বললে—বাবাঠাকুর এ সব তোমার দয়া। তুমি মাতব্বর করেছ, তুমিই দিয়েছ এমন মন, মতি। তুমি অক্ষে করবে কাহারদের ঘরবাড়ি ঝড়ঝাপটা থেকে। বনওয়ারী তোমার অনুগত দাস, তোমার হুকুমেই সে কাহারপাড়ার চাল দেখছে। লাঙল টানে গরু, তার কি বুদ্ধি আছে, না সে জানে কোন্ দিকে ঘুরতে হবে, ফিরতে হবে? পিছনে থাকে লাঙলের মুঠো ধ'রে চাষী, তাকে গরু দেখতে পায় না; কিন্তু হালের মুটোর চাপের ইশারায় গরু ঠিক চলে। বনওয়ারী সেই গরু। বাবাঠাকুর, কত্তাবাবা, তুমি হ'লে সেই চাষী।

তা নইলে করালীর মতিগতি ফেরে! চন্নপুরের কারখানায় পাকা-মেঝের কোয়ার্টার ছেড়ে কাহারপাড়ার বাড়িতে রঙ ধরিয়ে ফিরে আসে। কথাবার্তা মিষ্টি হয়। না, করালী অনেকটা সোজা হয়েছে। এই তো সেদিন নিজে থেকে তেরপল দিয়ে এল গুড়ের শালে। কোনও রকমে ওকে ঘরবশ ক'রে চন্নপুর ছাড়িয়ে কাহারদের কুলকর্মের কাজে লাগাতে হবে; ধরমের পথ ধরিয়ে দিতে হবে। সে একদিনে হবে না। 'কেমে-কেমে' 'ধেয়ো-ধেয়ো' বাঁকা বাঁশকে যেমন তাতিয়ে চাপ দিয়ে সোজা করতে হয় তেমনই ভাবে। পাড়ার লোকে ক্ষেপে উঠেছিল করালীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার তো দশের মত হুট ক'রে মাথা গরম করলে চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে তাকে।

ছোঁড়ার একটা দোষ হ'ল 'লবাবী' করা। অ্যাই টেরি, অ্যাই জামা, অ্যাই কাপড়, অ্যাই একটা 'টরচ' আলো, একটা বাঁশী, যেন বাবুর বেটা বাবু বেড়াচ্ছে, কে বলবে কাহারদের ছেলে! মুখে লম্বা লম্বা কথা। লোকে এ সব সহ্য করতে পারে না। তাও অনেক করেছে—অনেক। তবে নাকি শোনা যাচ্ছে, ছোঁড়া আজকাল বে-আইনী চোলাই মদের কারবার করছে চন্নপুরে। কাহারপাড়াতেও আনছে। রাত্রে মজলিস ক'রে এই মদ খায়। সাবধান করতে হবে। শাসন করতে হবে।

বনওয়ারীর মনের মধ্যে একটি সাধ হয়। করালীকে নিয়ে সাধ। সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে, এই ছোঁড়া থেকে হয় সর্বনাশ হবে কাহারপাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে। সর্বনাশের পথে যদি ঝোঁকে তবে কাহারপাড়ার অন্য সবাই থাকবে পেছনে—লাগতে লাগবে তার সঙ্গে। সে পথে করালী গেলে বনওয়ারী তাকে ক্ষমা করবে না। তাই তার ইচ্ছা তাকে কোলগত ক'রে নেয়; তার 'পুত্ত'সন্তান নাই। ডান হাত থেকে বঞ্চিত করেছেন ভগবান। বনওয়ারীর ইচ্ছে, বিধাতা যা তাকে দেন নাই—নিজের কর্মফলের জন্যে—সে তা এই পিথিমীতে অর্জন করে।

পুণ্য তার আছে। বাবার চরণে মতি রেখেছে, নিত্য দু বেলা প্রণাম করে, বাবার থান আগলে রাখে। আঁধার পক্ষের পনরো দিন সনজেতে পিদীম দেয়। জ্ঞানমত বুদ্ধিমত ন্যায্য বিচারই করে সে। নয়ানের বউ পাখীকে করালীকে দিয়ে অন্যায় একটু করেছে, নয়ানের মা চোখের জল ফেলেছে—তাকে শাপ-শাপান্ত করেছে। তা করুক, বনওয়ারী নিজের কর্তব্য করবে। নয়ানের একটি সাঙা দেবে সে, কনে এর মধ্যেই ঠিক ক'রে ফেলেছে। মেয়েটির রীতকরণ একটুকুন চনমনে, কালামুখী বদনাম একটু আছে তার বাপের গাঁয়ের সমাজে। তা থাক, নয়ানের মায়ের ভবিষ্যৎ

ভেবেই এমন মেয়ে সে ঠিক করেছে। নয়ান যদি সেরে না ওঠে, তবে ওই মেয়েই রোজকার ক'রে নয়ানের মাকে খাওয়াবে।

লোকে না ভেবে কথা বলে। ভদ্রলোকে বেশি বলে। তারা বলে—ছোটলোকের জাতের ওই করণ। তাঁরা হলেন টাকার মানুষ, জমির মালিক, রাজার জাত। তাঁদের কথাই আলাদা। কথাতেই আছে, 'আজার মায়ের সাজার কথা'। নয়ান যদি তাঁদের জাতের হ'ত, তবে নয়ান ম'রে গেলেও থাকত তার টাকা জমি, তাই থেকে নয়ানের মা একদিকে কাঁদত, একদিকে খেত। আর কাহারের জাত? না জমি, না টাকা, নয়ান ম'রে গেলে নয়ানের মায়ের সম্বল হবে গতর, গতর গেলে ভিক্ষে। তার চেয়ে এ মন্দের ভাল। পাপ পুণ্যি বনওয়ারী বুঝতে পারে না এমন নয়, সে বুঝতে পারে মেয়েলোকের সতীত্বের মূল্য। কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎজাতেরা তাঁদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎজাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চবণসেবা করে হাড়ি ডোম বাউরী কাহার। শ্মশানে থ'কে চণ্ডাল। বিধির বিধান এসব। কাহারদের মেয়েরা সতী হ'লে ভদ্র-জনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা? কাজেই কাহার-জন্মের এ কর্ম স্বীকার যে করতেই হবে।

পাখী কিন্তু পাখীর মতই কলকল ক'রে চলেছিল ভোরবেলার পাখীর মত। কত প্রশংসাই সে ক'রে গেল। বাবার চরণে পেনাম জানিয়ে কাহারজনমের কথা ভাবছিল বনওয়ারী। হঠাৎ পাখীর কণ্ঠস্বর পরিবর্তনে সে একটু চমকে উঠল।

গলা খাটো ক'রে পাখী বললে—জান মামা, ঐ মিচকেপোড়া চিপেষষ্টী নিমতেলে পানা সেদিন বলছিল—দেখ কেনে মাতব্বরের ধরম, এই বছর না ফিরতে বেরিয়ে যাবে। ফেটে যাবে। পাপ ক'রে বাবাঠাকুরের ঠাঁই ছোঁয় কেউ তবে বাবা তাকে ক্ষমা করে না। তুমি নাকি—? পাখী চুপ করলে।

—কি? আমি নাকি—? কি করেছি আমি?

—ক্যা জানে বাপু। আমার আগেকার শাউড়ী, আটেপৌরেপাড়ার কালোবউ—এইসব পাঁচ জনকে নিয়ে নানান কথা নানান কেচ্ছা করছিল বলে, সে নাকিনি দেখেছে।

বনওয়ারীর বুকটা হঠাৎ ফুলে উঠল রাগে। কানে শোনা কথা, মিথ্যে নয় তা হ'লে।

পাখী বলল—আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুগান্ কে বেঁধেছে জান? ওই পানা।

—পানা?

—হ্যাঁ। নসুদিদির তো ভাবীসাবীর অভাব নাই। ওই আটপৌরেপাড়ার দলের কোন্ ছোঁড়া বলেছে।

—হুঁ। বনওয়ারী মাটির দিকে চেয়ে একটু ভেবে নিলে—আচ্ছা।

পাখী আবার বললে—সে তো এগে একেবারে কাঁই। বলে—মারব শালোকে। পানা নাকিনি থানায় কি সব লাগান-ভাজান ক'রে এয়েছে ওর নামে। ও নাকি চন্নপুরে চোলাই মদ বিক্কি করে, লুকিয়ে অ্যালের সিলিপাট বিক্কি করে। আমাদের বাড়িতে নাকি সনজে-বেলায় ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা বসে, নাচগানের ছাউনি দিয়ে ভেতরে ভেতরে নাকি চুরি-ডাকাতির

শলাপরামর্শ হয়। চোরের দল গড়ে।

সর্বনাশ! বনওয়ারী চমকে উঠল। পানা, হারামজাদা পানা, ঘরভেদী পানা, কাহারপাড়ার পাপ পানা! পানাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসা অতি সহজ কাজ। কাঠির মত চেহারা, পাখীর মত নাক, ছুঁচোর মত লম্বাটে সরু মুখ পানার, কিন্তু হারামজাদা নিজের চোখে কিছু যেন দেখেছে বলেছে। কি দেখেছে?

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল বনওয়ারীর, পানার মনিব পাকু মণ্ডল মহাশয়ের কথা। পাকু মণ্ডল বলছিলেন—পানা তাঁকে বাঁশঝাড় বিক্রি ক'রেছে। পাকু মণ্ডলের সন্দেহ নাকি পানা এর মধ্যে কিছু গোলযোগ করেছে। বাঁশঝাড় দেখে তার মনে হয়েছে, ঝাড় একটা নয়, ঝাড় দুটো। চৌহদ্দীটা শুনতে বলেছেন একদিন বনওয়ারীকে। পাকু মণ্ডলের কাছে যেতে হবে তাকে। এক্ষুনি যাবে সে।

উঠে পড়ল বনওয়ারী। করালীর বাড়ি থেকে হনহন ক'রে বেরিয়ে সেই দুপুর রৌদ্রেই চলল সে পাকু মণ্ডলের কাছে।

পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। যাঃ, পাখীকে আসল কথাটাই বলা হ'ল না; গাঁইতির জন্যে বলতে এসে পানার চতুরালির কথা শুনে মাথা ঘুরে গেল তার। ভুলে গেল আসল কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে। মাতব্বরির যত সুখ তত দুঃখ। চড়কের পাটা থাকে মানুষের মাথায়, সেই পাটায় গজাল পোঁতা থাকে, তার উপর শুতে হয় গাজনের প্রধান ভক্তকে। মাতব্বরিও তাই। মানুষের মাথার উপরে কাঁটাভরা পাটায় শোয়া। হে ভগবান! পানা তার সর্বনাশ করবে। এটা অবশ্য তার পাপ, তার অন্যায়। কিন্তু সে তো মানুষ! কালো বউ—

হঠাৎ মাথায় যেন তার বিদ্যুতের মত খেলে গেল—চড়কের পাটা! সামনে গাজন! বাবা কালারুদ্দের চড়কের পাটায় শুয়ে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে, লোকের সামনে প্রমাণ করবে তার কত পুণ্য।

আট

শিবো হে! সকল বুড়ার আদি বুড়া, সকল দেবতার বড় দেবতা—বাবা বুড়া শিব, বাবা কালারুদ্দু! বেলতলার বাবাঠাকুর, কাহারদের দেবতা। তাঁরও দেবতা বাবা কালারুদ্দু। ধম্ম রাজ—যে ধম্মরাজ—তারও বড় বাবা কালরুদ্র।

এবার বাবা কালরুদ্রের গাজনে চড়কের গজাল পেটা ঘুরনচাকির গজালের মাথায় শোবার পুণ্য সে অর্জন করবে। করতেই হবে তাকে।

বাবা কালারুদ্দু—কর্তাঠাকুরের উপরওয়ালা—বাবাঠাকুরের বাবা। 'নারায়ণে'র যেমন 'নারদ', বাবা কালারুদ্দুরের তেমনি ন্যাড়া-মাথা গেরুয়া-পরা খড়ম-পায়ে দণ্ড-হাতে কর্তাঠাকুর। কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম, কালরুদ্রের হুকুমের মরণ-বাঁচন। গতবারে গাজনের ঠিক পনেরো দিন পরেই

বাবা কালারুদ্দের প্রধান ভক্ত মারা গিয়েছে। প্রধান ভক্তই চড়কের পাটার গজালের ডগায় শোয়, সে-ই দু'হাতে আগুন ফুলের 'আঁজলা' অর্থাৎ অঞ্জলি নিয়ে চাপিয়ে আসে বাবার মাথায়, সে-ই নাচে আগুনের ফুলের উপর। মড়ার মাথা নিয়ে তাকেই খেলতে হয়। নিজের অনেক পুণ্য—আর অনেক বেশি দেবতার দয়া না থাকলে কালরুদ্রের প্রধান ভক্ত কেউ হতে পারে না। এবার সেই প্রধান ভক্তের খালি ঠাঁইয়ে বনওয়ারী গিয়ে শোবে। সংকল্প দৃঢ় ক'রে ফেললে সে। বাবা কালারুদ্দের প্রধান ভক্ত চিরকাল হয় নীচ জাতের লোক। সেই আত্তিকালের বাণ-গোঁসাইয়ের কাল থেকে। সুচাঁদ পিসী বাণ-গোঁসাইয়ের কাহিনী বলে। বাণ-গোঁসাই ছিল ছোটজাতের রাজা, কিন্তু ভোলা মহেশ্বর কালারুদ্দের ভক্ত। মদ খেত, 'মাস' খেত, কিন্তু বাবার চরণে ফুল দিত, গাজনে সন্ন্যেস করতে কখনও ভুলত না। সন্ন্যেস ক'রে আগুনের আঙারের ওপর ব'সে বাবাকে ডাকত, লোহার কাঁটার শয্যেতে 'শয়েন' করত, সোনা রূপো হীরে মানিকের গয়না ছেড়ে মড়ার হাড়ের মালা গলায় পরত। কিবা 'আত্তি' কিবা দিন গাল বাজিয়ে বম্-বম্ করত, বাবার নামগান করত। 'শিবো হে—শিবো হে—শিবো—হে!' বাবার দয়াও তাঁর ওপর খুব। পিথিমীর 'আজা-আজড়া' থেকে দেবতারা পর্যন্ত বাণ-গোঁসাইয়ের সঙ্গে এঁটে উঠত না। গোঁসাইয়ের একশো পরিবার। একটি মাত্র সন্তান—তাও কন্যে; কন্যের নাম 'রুষা' অর্থাৎ ঊষা। সেই রুষাকে দেখে লারায়ণের লাতির মন টলল। লারায়ণের লাতি একদিন লুকিয়ে ঢুকল বাণ গোঁসাইয়ের বাড়িতে রুষাবতীর ঘরে। বাণ-গোঁসাই জানতে পেরে বলে—কাটব লারায়ণের লাতিকে। লারায়ণের আসন টলল, মুকুট লড়ল। লারায়ণ বললেন, লারদ, আসন কেনে টলে, মুকুট কেনে লড়ে, গুনে দেখ তো? লারদ খড়ি পেতে গুনে বললেন বিবরণ। লারায়ণ ছুটে এলেন, গোঁসাইয়ের বাড়িতে হানা দিলেন। অ্যাই লেগে গেল লড়াই। পিথিমী টলমল করতে লাগল। জলে আগুন লাগল, মাটির বুক ফেটে জল উঠতে লাগল, আকাশের তারা খ'সে পড়ল, 'ছিষ্টি গেল গেল' রব উঠল। লারায়ণ 'চক্ক' নিয়ে কেটে ফেললেন বাণ-গোঁসাইয়ের হাত পা। তবু গোঁসাই হারে না, মরে না, মরে—আবার বাঁচে। তখন এলেন বাবা কালারুদ্দু। কালারুদ্দু আর লারায়ণ—হরি আর হর; হরি-হরের মিলন হল। বাবা কালারুদ্দু মাঝে প'ড়ে রুষাবতীর সঙ্গে লারায়ণের লাতির বিয়ে দিলেন। হরি বললেন বাণ-গোঁসাইকে—তোমাকে আমি বর দোব। বর লাও। তোমার কাটা হাত-পা জোড়া লাগবে, তোমাকে পিথিমীর আজা ক'রে দোব। বাণ-গোঁসাই বললেন—না। কাটা হাত পা আমি চাই না। আজাও আমি হব না। বর যদি দেবে তো বর দাও কালারুদ্দুর সাথে আমারও যেন পুজো হয়। আমার জাত-জ্ঞাত পেজা সজ্জন ছাড়া বাবার গাজনে ভক্ত যেন কেউ না হয়। হরি-হর দুজনেই বললেন—তথাস্তু। সেই জন্যেই তো গোঁসাইয়ের হাত পা নাই, কেবল আছে ধড় অর্থাৎ শরীরটা আর মুণ্ডু। অর্থাৎ সেই কারণে বাণ-গোঁসাই আজ কালারুদ্দুর ভক্ত দেবতা। আগে বাণ-গোঁসাইয়ের পুজো হবে, তবে বাবা পুজো নেবেন। এই কালারুদ্দ বাবার দয়াই তাদের সম্বল। সেই ভরসাতেই কালারুদ্দুর পুজোয় তারা নির্ভয়ে দেবকাজে এগুতে পারে, নইলে তাদের পুণ্য কতটুকু?

সেই বাবা কালারুদ্দু লারায়ণের আশীর্বাদ আর কাহারদের জেবন-মরণের মালিক বাবা কত্তা-ঠাকুরের স্নেহ তাকে পেতেই হবে। এইবার বনওয়ারী বাবার প্রধান ভক্ত হয়ে চড়কের পাটায় চাপবেই। বনওয়ারী ঠিক করলে, যা হয় হবে। সে চাপবেই চড়কের পাটায়। পাপ যা আছে, সে খণ্ডিয়ে যাবে এই 'বেরুতোর' অর্থাৎ ব্রতের পুণ্যে। কর্তাঠাকুরের দয়ার বাবা কালারুদ্দুর পেসাদে গাজনের পাটায় শোওয়া সহ্য হলে নিন্দুকের মুখ বন্ধ হবে। যদি সহ্য না হয়, সে যদি পাপের তাপে ওই চড়কের পাটার উপরেই ফেটে ম'রে যায়, তাতেও তার 'দুস্কু' কি? 'যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি?' সে আবার দশের মধ্যে গণ্য নয়, সে এ পাড়ার পেথম এবং প্রধান, সে মাতব্বর।

কিন্তু পানার শাস্তির প্রয়োজন। শাস্তি অবশ্য দিলেই হ'ল। যে কোন ছুতোয় একদিন ঘাড় ধ'রে অঙ্গখানি ছেঁচে দিতে বনওয়ারী এখনি পারে। ঘাড়ে ধরলেই টিকটিকির মত পরাণকেষ্টর পরাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে যাবেন। তবে তা সে করবে না। সত্যকার অন্যায় খুঁজে বার করতে হবে। সত্যিই কেষ্ট পেয়ে চলল সে পাকু মণ্ডলের কাছে।

কীর্তিটি জটিল ;—'ছিমান প্রাণকেষ্টোর একটি জটপাকানো কীর্ত্তি।'

পানুর মুনিব পাকু মণ্ডল অতি বিচক্ষণ হিসাবী লোক। তার হিসাবের পাক অত্যন্ত জটিল—খুলতে গেলেও জট পাকায়, সেই জন্যই তার আসল নামের পরিবর্তে পাকু নাম দিয়েছে লোকে। রতনের মনিবের স্থুল চেহারার জন্য নাম হয়েছে 'হেদো মণ্ডল'। এ নামগুলি দেয় কিন্তু কাহারেরাই। এ বিষয়ে তাদের একটা প্রাক্‌পৌরাণিক মৌলিকত্ব আছে। বস্তু বা মানুষের আকৃতি বা প্রকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে নিজেদের ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী বেশ সুসমঞ্জস নামকরণ করে। যাক সে কথা। পাকু মণ্ডলের কৃষাণ প্রাণকৃষ্ণ। সাত বছর ধরে কৃষাণি করছে। প্রতি বৎসরই কৃষাণেরা বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত মনিবের কাছে খোরাকির ধান ঋণ নিয়ে থাকে। বৎসরান্তে পৌষ মাসে ধান তুলে মাড়াই ক'রে হিসাব-নিকাশ হয়। শত-করা পঞ্চাশ হারে সুদ অর্থাৎ এক মণ ধান ঋণ নিয়ে দেড় মণ দিতে হয়। বৎসরের মধ্যে শোধ না হ'লে সুদ ও আসল দেড় মণই পর-বৎসর আসলে দাঁড়ায় এবং তার সুদ আসে তিরিশ সের এই চিরকালের নিয়ম। এ ছাড়াও অবশ্য আপদে বিপদে মনিবের কাছে সারের দাদন নিয়ে থাকে। কেউ কেউ মনিবদের বেচে দেয় সে সার। মনিবকে বলে—চন্ননপুরের বাবুরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছে। সেটা ধার দাঁড়ায়। তার সুদ চলে টাকায় দু পয়সা। যাই হোক, এবার পাকু মণ্ডল তিন বৎসর পর হিসাবনিকাশ ক'রে পানুর কাছে নিজের পাওনা ধার্য ক'রে শোধের জন্য চেপে ধরেছিল। পানু তাই এ কীর্তি করেছে। নয়ান কাশীর রোগী—হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই মারা পড়বে। বউ পাখী পালিয়েছে। নয়ন নয়ান মুদলে কে তার হয়ে দাবি-দাওয়া করবে? ওই বাঁশঝাড়টা তাই চক্ষু বুজে বেচে দিয়েছে। নয়ানের আবার বিয়ে-সাঙার চেষ্টা করেছে বটে বনওয়ারী, কিন্তু হবে ব'লে মনে হয় না। ওদের বেচাকেনার দলিল-দস্তাবেজ নাই, পাড়ার দু-চারজনকে ডেকে মুখে বলাকওয়া হয়—'আমি বেচলাম। এই পঞ্চজন সাক্ষী রইল।' পাকু মণ্ডল কিন্তু হুঁশিয়ার লোক। তিনি ডেমিতে লিখিয়ে পানুর আঙুলের টিপছাপ নিয়েছেন। চৌহদ্দী ক'রে নিয়েছেন; নিজের পাড়ার পঞ্চজন সাক্ষীরও সই নিয়েছেন। তিনি

পানাকে মুখে মুখে বলেছেন—তুমি বেটা সহজ পাত্তর নও হে। বেটার চেহারা যেখন লিকলিকে চরিত্তিরও তেমনি এঁকাবেঁকা। পাকু মণ্ডলের কাছে চৌহদ্দী সমেত সব বুঝে নিলে বনওয়ারী। কিন্তু মণ্ডলের কাছে বনওয়ারী ব্যাপারটা ফাঁস ক'রে দিলে না। তার মত মাতব্বরের সে কাজ নয়। পাড়ার লোককে বাঁচাতে হবে আগে। পানুকে জব্দ করবার অস্ত্রটি সে নিজের হাতে রাখবে শুধু। পানুকে বধ করবার অস্ত্র তার চাই।

এই সব কারণেই পাকু মণ্ডলের কাছে সত্য কথা না ব'লে বললে—হ্যাঁ, একটা বাঁশঝাড় আছে ওখানে পানার। তা আপনাকে দেখে বলব পরে। একটুকু গোলমাল যেন অইচে আগছেন।

পাকু মণ্ডল শুনে হাসলে গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে। চতুর লোক। বনওয়ারীর মনে হ'ল পানার দোষ তো বটেই। কিন্তু মণ্ডল মহাশয়ও জেনেই করেছেন ব্যাপারটা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মণ্ডল মহাশয়রা এমন অনেক কাজই তাদের দিয়ে করান। তাদের বলেন না।

পাকু মণ্ডল কথাটা বলে নাই বনওয়ারীকে। দলিলে টিপছাপ দেবার সময় পানুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, সে তখন সত্য কথা স্বীকার করেছিল। ব'লেও ছিল—না, ওটা থাকুক মুনিব মশায়। পাকু মণ্ডল শোনেন নাই, শুধু দশ টাকা দামের পাঁচ টাকা কমিয়ে ওই দলিলেই পানুর টিপছাপ নিয়ে বলেছেন—দখলের ভার আমার। তোকে ভাবতে হবে না। আমি প্রকাশও করব না। তু নিশ্চিন্ত থাক্। কিন্তু পানাকে আবারও তাঁর জব্দ করবার প্রয়োজন হয়েছে, তাই বনওয়ারীর কাছে প্রকাশ ক'রে দিলেন।

পথে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল বনওয়ারী। আটপৌরেপাড়ায় কিসের জটলা? জটলা কি—? বুকটা কেমন ক'রে উঠল তার। পানা আটপৌরেদের নিয়ে সেই ব্যাপারটকে উপলক্ষ্য ক'রে তুলতামাল ক'রে তুলেছে নাকি?

পরমের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—এই! এই! এই!

হা-হা ক'রে কে হেসে উঠল। এমন দরাজ জোরালো হাসি কে হাসে? তার বুকের হাপরটা তো কম জোরালো নয়! কে? এইবার তার কথার আওয়াজ পেলে বনওয়ারী—এই—এই—এই!

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠছে—ঠক-ঠক-ঠক। দুটো কঠিন বস্তুতে ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না বনওয়ারীর, আটপৌরেপাড়ায় খেলা চলছে। পরম সাকরেদদের নিয়ে আখড়া বসিয়েছে। কিন্তু এমন জোরালো সাকরেদ—জবর মরদ কে আটপৌরেপাড়ায়? পরমের সঙ্গে লাঠি ধ'রে এমন করে হাসে!

পরম হাসছে হা-হা ক'রে।

হঠাৎ একটা ঢেলা এসে তার গায়ে পড়ল। চমকে উঠল বনওয়ারী। কে? বুকখানা আবার চমকে উঠল তার। এ ঢেলা কথা বলে—সে কথা বুঝেছে বনওয়ারী। হ্যাঁ, ঠিক। ওই যে কালোশশী বাঁশবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আঙুল নেড়ে ডাকছে তাকে। আঃ, এ কি বিপদ! ছাড়ালে ছাড়ে না? হে বাবা-ঠাকুর, তুমি রক্ষা কর। সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে কালোশশীকে জানালে—না। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—লাঠি-খেলার আখড়া।

কালোশশী হেসে উঠল। অদ্ভুত মেয়ে। সাক্ষাৎ ডাকিনী। কামরূপের ডাকিনীর মত যেমন সাহস তেমনি মোহিনী। বনওয়ারী গেল না ব'লে কালোশশীই বেরিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। চোখ দুটি টলটল করছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। সম্ভবত কালোশশী মদ খেয়েছে। এখন তাকে কোন বিশ্বাস নাই। অগত্যা সে ইঙ্গিতে আসতে নিষেধ ক'রে নিজেই এগিয়ে গেল।—কি বলছ ?

কালোশশী তার হাত ধ'রে বললে—দেখা নাই যে।

বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুগান শোন নাই ?

—শুনেছি।—কালোশশী পিচ কাটলে। বললে—ওকে তা হ'লে ভয় কর ? অর্থাৎ পরমকে ?

—ভয় ?—হাসলে বনওয়ারী—ভয় একজনাকে করি। বাবাঠাকুরকে। এবার আমি বাবাঠাকুরের আদেশ পেয়েছি ভাই, কালারুদ্দু বাবার চড়কে চাপতে হবে।

শিউরে উঠে কালোশশী তার হাত ছেড়ে দিলে।—না ভাই, তবে তোমাকে ছোঁব না। কপালে হাত ঠেকিয়ে সে প্রণাম জানালে দেবতাকে।

জয় বাবাঠাকুর, জয় কালারুদ্দ! তোমার দয়ায় পাপীর পাপ খণ্ডায়, যমদূতের হাত থেকে পাপীর পরাণপুরুষকে ছিনিয়ে শিবদূতেরা কৈলাসে নিয়ে যায়। কানায় চোখ পায়, খোঁড়ায় হাঁটে, মানুষের মতি পালটায়। কালোশশীর মতি ফিরেছে।

কালোশশী হেসে বললে—পুণ্যির ভাগ দিতে হবে কিন্তুক।

তারপর আবার বললে—গাজন হয়ে যাক তা'পরে মাতব কিন্তু একদিন। সে তর্জনী তুলে যেন শাসিয়ে দাবী করলে তার পাওনা। হ্যাঁ, পাওনা বইকি!

বনওয়ারী মনে মনে প্রণাম করলে দেবতাকে। কালোশশী বললে—চুপ ক'রে রইলে যে ? সে বোধ হয় বুঝেছে বনওয়ারীর মনের কথা। ওর ভুরু কুঁচকে উঠেছে। বনওয়ারী এবার হেসে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যেই বললে—হাসছি পরমার কাণ্ড দেখে। বুড়ো বয়সে লাঠি নিয়ে মাতন দেখে হাসছি। কিন্তু এমন মরদ আটপৌড়েপাড়ায় কে হে, পরমের লাঠি ধ'রে হা-হা ক'রে হাসে ?

কালোশশী বললে—তোমার পাড়ার করালী।

চমকে উঠল বনওয়ারী।—করালী ?

—হ্যাঁ, করালী। কদিন ধ'রেই পরামশ্য চলছে আটপৌরেদের,করালীকে হাত করবে। জংশনে সেদিন নাকি দাঙ্গা লেগেছিল দু দলের খালাসীতে, করালী তাতে খুব জোর লাঠি ধরেছিল।

করালী। বিস্মিত হ'ল বনওয়ারী। সে তো শোনে নাই কথাটা।

—হ্যাঁ। তাই ওকে হাত করবে। তা ছাড়া ওকে পেলে অ্যাল-লাইনে ডাকাতি করবার খুব সুবিধে হবে ; তাই ডেকেছে ওকে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বনওয়ারী বললে—তাই মতলব হচ্ছে নাকি ? পরমের পাখা গজালছে তা হলে ?

—পাখা যার ওঠে হে, তার আর ঘোচে না। পালক উঠে যায় আবার গজায়।—হাসলে কালোশশী।

বনওয়ারী ঘুরে বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে দূরের আখড়ার দিকে তাকালে। খটখট শব্দ এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। কিন্তু করালী শেষ পর্যন্ত—? হে ভগবান!

চললাম। লোক।—মৃদুস্বরের দুটি কথার সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারী ফিরে তাকিয়ে দেখলে, কালোশশী আত্মগোপন ক'রে চলে যাচ্ছে নিবিড়তর বনের মধ্যে। বনওয়ারী ডেকে বললে—একটা কথা। করালী কি দলে মিশেছে? জান?

একবার দাঁড়াল কালোশশী। একটু ভেবে বললে—তা জানি না। এখনও মনে লাগছে দলে মেশে নাই। তবে চারে ভিড়েছে। তা'পরেতে টোপে ধরলে ঘাই মারবে। মনের মতলব আমি বুঝি তো।

কালোবউ চ'লে গেল। বনওয়ারী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সাপের হাঁচি বেদেতে চেনে। পরমকে কালোবউ ঠিক চেনে। হে ভগবান, আবার কাহার-পাড়ায় দারোগা আসবে, হাঁকবে—এই! করালী কাহার! জমাদার হাঁকবে—করালীয়া! আরে সারোয়া!

নয়

না না না। সে হতে দিতে পারবে না বনওয়ারী। সে যতকাল বেঁচে আছে, তার মাতব্বরির আমলে কাহারপাড়ার কারও 'রঙ্গে' অর্থাৎ অঙ্গে ওই দাগ লাগতে সে দেবে না। যত ঘেন্নার দাগ, তত দুঃখের কষ্টের দাগ। চোরকে সাধে বলে দাগী! ভাবলেও শিউরে ওঠে বনওয়ারী। একা বনওয়ারী নয়। এ পাড়ার প্রবীণেরা সকলেই শিউরে উঠবে।

কাহারপাড়ার উপকথায় ওই দাগের কথা মনে হ'লেই শিউরে ওঠে বনওয়ারী। স্মরণ হয় বর্ষার উপকথায় কালো অমাবস্তের 'আত্তিকাল', ঝমঝমিয়ে আকাশ ভেঙে মাটিতে নামছে, কোপাইয়ের হাঁসুলী বাঁকে বাঁকে জল ছুটছে, তাতে 'অণ্ড' ধরেছে লালচে; কাহারদের চোখে তার ছটা জাগত সেকালে। দূর মাঠ থেকে একটি শেয়াল ডাকত। সুটসাট ক'রে বেরিয়ে পড়ত কাহারেরা। মাথায় ফেটা বেঁধে মুখে চুন-কালি মেখে, হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।

হে বাবাঠাকুর, তুমি 'অক্ষে' কর।

বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতন গুপী—এরা সকলেই ছেলেবেলায় সে সব কিছু কিছু দেখেছে। সুচাঁদ চোখে দেখেছে, সে আজও সেই গল্প করে, চোখ বড় হয়ে ওঠে, ভারী গলায় বলে—"কোপাইয়ের সে 'মনন্তরার' বানে ডুবে দেশ 'শোশান' হয়ে গেল! কুঠি উঠে গেল। সায়েব মশাইরা গেলেন। কাহারপাড়া অনাথা হ'ল। মুনিব গেল, না বাপ গেল। পেটের তরে ভাবতে হ'ত না; সকালবেলাতেই ষোলজনা কাহার কুঠির কাছারিতে গিয়ে হাজির হ'লেই খালাস। পালাপালি ক'রে ষোলজনা ক'রে যেত কাহারেরা। কাহারপাড়ায় তখন দু কুড়ি আড়াই কুড়ি মুনিষ। মোষের কাঁধের মত ইয়া-ইয়া কাঁধ। কুঠি উঠে গেল, বানে ঘরবাড়ি ভেঙে গেল, মড়ক লাগল, তখন যে 'যেমনে' পেলে—এ-গাঁ সে-গাঁ পালাল। কেউ গেরামে মরল, কেউ ভিন গেরামে মল,

কেউ পথে মরল, প'চে ফুলে ঢোল হয়ে গ'লে গেল—গতি পর্যন্ত হ'ল না। তা'পর আবার সব গেরামে ফিরল। ফিরল তো দেখলে, পথের ফকির! চৌধুরীরা চাকরাণ জমি কেড়ে নিলে। দয়া ক'রে দিলে শুধু ভিটেটুকুন। কাহারেরা সকালে উঠে চৌধুরী বাড়ীর মা-দুগ্‌গাকে আর ওই কত্তাকে 'পেনাম' করত। 'তেনারা' স্বপন না দিলে ওটুকুও দিত না চৌধুরী মাশায়। তখন হ'ল 'প্যাটের'। চৌধুরী মাশায় বললে, চাষে বাসে খাটতে, কৃষেণ মান্দেরী করতে। তা সদগোপ মাশায়রা কেউ রাখবে না কাহারদিগে। কাহারেরা সায়েব মাশায়দের আমলে সদগোপ মাশায়দের জমিতে জোর ক'রে 'নীল' অর্থাৎ নীল বুনেছে, ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে, ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কাহারেরা চাষেরই বা জানে কি? সত্যিই কাহারেরা 'চাষকর্ম' ভাল ক'রে জানত না। তবু চৌধুরী মাশায়ের কথায় ছেলেছোকরাকে 'বাগাল মান্দের' অর্থাৎ রাখাল মাহিন্দার রাখলে। বড় বড় জোয়ানেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। তখন আটপৌরেপাড়ায় হ'ল চোরের দল। 'এতে' 'দুপুরের শ্যাল' ডাকলে স্বটসাট ক'রে বেরিয়ে ই-গাঁ সি-গাঁ থেকে চুরিচামারি ক'রে আনত। ক্রমে পেটের দায়েও বটে, মতিভ্রমের কারণেও বটে—কাহারেরা ধরলে ওই পথ।

রাত্রের অন্ধকারে কালো কাহারদের দেখতে হ'ত আরো কালো, গলার 'রজ' হত জন্তু-জানোয়ারের মত, চোখ দুটো জ্বলত আঙরার মত। তারা চুপি চুপি গিয়ে গেরস্থ-বাড়িতে সিঁদ দিত, দরজার কুলুপ ভাঙত; সোনাদানা চালধান বাসনকোসন কাপড়চোপড় যা পেত নিয়ে আসত। সকালে উঠে বুক ধড়ফড় করত, ওপারে যমরাজার ধর্মের খাতায় নাম লেখা যেত; এপারে পুলিস এসে ঘর খানাতল্লাস করত। মেয়েদের পর্যন্ত কাপড় ঝাড়া নিত। পুরুষদের মা-বোন তুলে গাল দিত, থানার হাজতে পুরে চালাত কিল চড় লাথি।

আজও আটপৌড়েপাড়ায় সেই বৃত্তান্ত চলছে। তবু ওদের হায়া নাই। বেহায়ার দল ওই আটপৌরেরা! অনেক কষ্টে কাহারেরা নিষ্কৃতি পেয়েছে। সুচাঁদ বলে—

এক পুরুষ গেল, দু পুরুষে সবাই দাগী হ'ল। কাহারেরা তখন চাষেবাসে মন দিলে; চুরি-চামারিও করত কিন্তুক আগের মতন লয়। তবু দাগীর বিপদ যাবে কোথায়? চুরি হ'লে কাহারপাড়ায় পুলিস আসত, ধ'রে বেঁধে নিয়ে যেত—দোষেও নিয়ে যেত, বিনি-দোষেও নিয়ে যেত। মধ্যে মধ্যে বদমাইসী মকদ্দমায় গুষ্টিসমেত নিয়ে টানাটানি। এই তখন আমার দাদা—ওই বনওয়ারীর বাপ—গেরামের মধ্যে পবীন সৎলোক ঘোষবাড়ির আশ্চয় পেয়েছে—ঘোষ মাশায়রা অনেক তদ্বির ক'রে থানার খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দিলেন। দাদাই তখন বললে—পিতিজ্ঞে কর সব, চুরি কেউ করবে না। নয়ানের বাবা—ছোকরা বয়স, চৌধুরী মাশায়দের বাড়ির লোক সে, সে তো গেরাহ্যিই করলে না। চৌধুরী মহাশয়দের দয়াতে ঘরভাঙারা পুলিসের হাত থেকে অক্ষে পেলে। তখন গেরামের দুটো দল হয়ে গেল। একদল দাদার কথা শুনলে। -একদল হেসেই উড়িয়ে দিলে। তা'পরেতে নয়ানের বাবা কাঁচা বয়সে মরলে পর দাদা হ'ল মাতব্বর। দাদা অ্যানেক কষ্টে কাহারপাড়ার চোর নাম ঘুচালে। তাও দু-একজনা মানত না, শুনত না; এই গুপের দাদা কেলো 'ছেরোটা কাল চুরি ক'রে এল। গাঁয়ে দল

নাই, তো ডোমেদের সাথে চুরি করত। বনওয়ারী কত মারধোর করত, কালাচাঁদ তাও শুনত না। পুলিসে ধ'রে নিয়ে যেত। হাসতে হাসতে যেত, বলত—শরীল সেরে আসিগা দিন-কতক। তা জ্যাল থেকে ফিরত এই 'ভাকুম-কুমো' অর্থাৎ মোটাসোটা হয়ে। শেষ কথাটি ব'লে হাসে সুচাঁদ।

মধ্যে মধ্যে আফসোসও করে সুচাঁদ। আঁচলের খুঁটে চোখ মোছে আর বলে—আঃ, কি সব কাল ছিল, আর কি হল! সে সব ছিল মরদ। এই বুকের ছাতি, এই সাহস—মেয়েকে সোনার গয়না পরিয়েছে, আতে এই ঝকঝকে কাপড় পরিয়েছে। হোক কেনে আতের আঁধারে, পরিয়েছে তো। এখনকার মরদ, না, শ্যাল কুকুর।

বলুক, সুচাঁদ যা বলে বলুক। আড়ালে আবডালে কাহারদের যারা মতিভ্রষ্ট তারা যা বলে বলুক। বনওয়ারী আর সে পাপ পাড়ায় ঢুকতে দেবে না। আজ করালীকে নিয়ে সে ভয় দেখা দিয়েছে। করালী ছোকরাটির গায়ে 'তাগদ' আছে, ছাতিতে সাহস আছে, মাথাও খেলে বেশ। ভয় যে সেইখানে। কাঁচা বয়সের দশজনা মদ-মাতালি করতে গিয়ে শেষে একটা কুকর্ম না ক'রে বসে। 'ধর্মপথে অধিক রাতে ভাত।' যে ধর্মপথে থাকে তার যদি উপবাসেই দিন যায় তবে ধর্ম নিজে অর্ধেক রাত্রে তাকে অন্ন যুগিয়ে দেন। বনওয়ারী করালীকে বলবে, সৎ পরামর্শ দেবে।

বাড়িতে ফিরেই মেজাজ তার আরও বিষিয়ে উঠল। হি-হি-হি-হি ক'রে পাখী হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছে। এ কি হাসি? এত হাসি কি মেয়েছেলের ভাল? বনওয়ারীকে দেখেও পাখীর হাসি কম হ'ল না। অন্য কেউ হলে কাপড়ের আঁচল দিয়ে অন্তত মুখটা ঢাকত। পুরুষমানুষকে কি দাঁত দেখিয়ে হাসে মেয়েছেলেতে? পুরুষ ব'লে পুরুষ নয়—বনওয়ারীর মত পুরুষ, সম্মানের মানুষ। পাখী ব'লেই পেরেছে এটা। করালীবাবুর 'অঙ' ক'রে বিয়ে করা বউ যে! কলালীর দেমাকে পাখীর দেমাক বেড়েছে। কাহারপাড়ার কন্যেরা বউয়েরা ক্ষেপলে অবশ্য বানভাসা কোপাই; কিন্তু সহজে তারা নীলবাঁধের জল, শান্ত স্থির।

গম্ভীর ভাবে বনওয়ারী বললে—কি? বেপার কি? এত গোঁ-গোল-করা হাসিটা কিসের?

গোপালীবালা ঘোমটাকে কপাল পর্যন্ত তুলে দিয়ে অল্প হেসে বললে—পাখী যা 'ভিকনেস' করতে পারে।

'ভিকনেস' অর্থাৎ ব্যঙ্গভরে মানুষকে নকল-করা; পাখী ভিকনেস করছিল রেল-কোম্পানীর সাহেবের মেমের। সরু গলা ক'রে ইংরিজী বাক্য নাকি সে অবিকল তুলে নিয়েছে—গুড্-মুনিং-বুড-টিংটং; অনুস্বার লাগিয়ে অনর্গল ব্যঞ্জন বর্ণগুলি উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে সে। ইষ্টিশান-মাস্টারের ভুঁড়ি দুলিয়ে চলা নকল ক'রে দেখিয়েছে। এবং গোপালীবালার চেয়ে নিজেই হেসেছে বেশি। কঠিন বাক্য উচ্চারণ করতে গেল বনওয়ারী। হঠাৎ তার নজরে পড়ল—তার দাওয়ার উপর চারখানা নতুন গাঁইতি, টকটকে লাল রঙ মাখানো, যেন 'ত্যাল'-সিঁদুর দিয়েছে যন্ত্রটায়। এ গাঁইতি রেল-কোম্পানির এবং আনকোরা নতুন। এত গাঁইতি করালী এনেছে জংশন থেকে, এবং পাখী যখন এমন অসময়ে এসে হাসছে তখন পাখীই নিয়ে এসেছে করালীর বাড়ি থেকে

তার বাড়ি। রূঢ় শাসনবাক্য বনওয়ারীর গলায় এসে আটকে রইল। সে নীরবে এসে দাওয়ায় উঠে গাঁইতিগুলি নেড়ে দেখলে। খাসা জিনিস। সাহেব কোম্পানির যন্ত্র। সায়েবরা তো যে সে নন, সাদা রঙ, কটা চোখ, ওঁরা না পারেন কি? কল চলে গড়গড়িয়ে লাইনের উপর। আকাশ ফেঁড়ে ভরভরিয়ে চলে উড়োজাহাজ। যুদ্ধ লেগেছে। অনেক উড়োজাহাজ এ দেশ পর্যন্ত এসেছে। বনওয়ারী তিনখানা উড়োজাহাজ দেখেছে।

পাখী বললে—কার কাছে শুনেছে, তোমার গাঁইতি চাই। তা আমাকে বললে, যা, এখুনি দিয়ে আয়। তাই নিয়ে এলাম।

বনওয়ারীর মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এল আশীর্বাদ।—বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। আঃ, কি 'রোপকার' যে হল! সে একখানা গাঁইতি তুলে নেড়ে পরীকা ক'রে দেখলে। তারপর বললে—তা করালী দেখালে অ্যানেক রকম। বাহাদুর বটে!

—আজ্যের জিনিস মামা—আজ্যের জিনিস! আখবার ঠাঁই নাই—ওই ভাঁই ক'রে এখেছে। বারণ করলে শোনে না।

—পরমকে গাঁইতি দিয়েছে না কি?

—কাকে? পরম মামাকে? না। ওকে আমি দু চক্ষে দেখতে নারি। দেখ কেনে, এসে অবেলায় ধ'রে নিয়ে যেল—লাঠি খেলবি। নাচতে নাচতে ধেই ধেই ক'রে চ'লে গেল। বলে—চল। আমি থাকতে কাহারপাড়ার মান যেতে দোব না আটপৌরেদের কাছে।

বনওয়ারী খুশি হ'ল একটু, এ কথা যে বলেছে করালী—একটা কথার মত কথা বলেছে বটে! কিন্তু ছেলেমানুষ, ঘোরফেরটা বুঝতে পারে নাই। ওরে বাবা, খাবার দিয়ে ফাঁদ পাতাই হ'ল সংসারের নিয়ম। সাবধান করতে হবে করালীকে। বললে—তা বেশ। তা আজ যেয়েছে বেশ করেছে—আর যেতে দিস না। হাজার হ'লেও পরম দাগী। ওর সাথে লাঠি খেলা ভাল লয় বাছা। বুঝলি?

চোখ বড় ক'রে পাখী বললে—তা তো ভাবি নাই মামা। ঠিক বলেছে তো তুমি। যাব, আমি আখুনি যাব।

—না। আসবে, আখুনি আসবে খানিক বাদে, তখন বারণ করিস। আর। একটু থেমে গম্ভীরভাবে বললে—সনজেতে পাঠিয়ে দিস মজলিসে। সমঝিয়ে দোব আমি।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল জংশনে দাঙ্গার কথা। বনওয়ারী ঘুরে বেশ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বললে—করালী নাকি জংশনে দাঙ্গা-টাঙ্গা কি করেছে পাখী?

—ও বাবা! তা জান না? হিঁদু খালাসীরা এক দিক, মোছলমানেরা এক দিক। একজন মোছলমান খালাসী হিঁদু কামিনের হাত ধ'রে টেনেছিল। তাই নিয়ে ঝগড়া। তা'পরেতে লাঠা-লাঠি। বানের এগুতে হাদি—চ'লে গেল এক লাঠি নিয়ে। খুব ঠুঁকে দিয়ে আইছে।

বিস্মিত নয়, স্তম্ভিত হয়ে গেল বনওয়ারী। কাহারেরা মুসলমানদের চেয়ে কম শক্তিমান নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত মুসলমানদের সম্মানই ক'রে এসেছে ওরা। মুসলমানেরা কাহার-মেয়েদের দু-চার জনকে নিয়েও গিয়েছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কলহ কেউ করতে সাহস করে নাই। ওরা

'শ্বাথ', 'পাঠান'। ছোকরাটা যদি বনওয়ারীর 'পুত্তু' হ'ত। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী।

সন্ধ্যাবেলার মজলিসে করালী এল।

বনওয়ারী তাকে বুঝিয়ে বললে। ছেলেছোকরারা সকলেই হাজির ছিল আজ, করালী যখন এসেছে তখন তারা থাকবে কোথায়? সকলে চুপচাপ ব'সে শুনলে বনওয়ারীর কথা।

হাঁসুলী বাঁকের সাধারণ মন্থর জীবনের ঠাণ্ডা মজলিস। মদ সকলেই খেয়েছে কিন্তু সে পরিমিত পরিমাণে। সারা দিনের খাটুনির পর যেটুকু খেলে রাত্রে সুনিদ্রা হবে, সকালে গা-গতরে ব্যথা থাকবে না—সেইটুকু। মজলিস বসে নীল বাঁধের ঘাটের উপরে যে ষষ্ঠীতলার বটগাছটি আছে তারই তলায়। সাধারণের জায়গা এটি। সেই প্রথম আমল থেকে এখানে মজলিস ব'সে আসছে। নীলকুঠি ভাঙতে থাকে, তখন নীলকুঠির ভাঙা গাঁথনির চাঙড় কতকগুলি এনেছিল কাহারেরা, সেইগুলি সুদীর্ঘকাল ধ'রে আসনের কাজ ক'রে আসছে। প্রবীণেরা সেই সব চাঙড়ের উপর বসে। গাছের তলায় ঠিক মাঝখানটিতে যে চাঙড়টি সেইটিতে বসে মাতব্বর। বনওয়ারী সেই চাঙড়টির উপর ব'সে হাত নেড়ে বেশ বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বলে—বাপধন, করালীচরণ, বুয়েছ কি না তোমাকে বলছি আমি।

—আমাকে?—করালী বিস্মিত হ'ল। সে তো আজকাল বনওয়ারীকে মান্য ক'রেই চলেছে! তার সঙ্গে একটা সদ্ভাব স্থাপন করতে অন্তরে অন্তরে ব্যগ্র হয়েই উঠেছে। বনওয়ারী তাকে স্বীকার করেছে, তাকে খানিকটা খাতির করেছে—এটা সে বুঝতে পারে। পানাই হোক, পেহ্লাদই হোক, আর রতনই হোক, সকলের চেয়ে তার খাতির বেশি—এটা বনওয়ারীর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। সেও বনওয়ারীকে মনে মনে খানিকটা যেন বাপখুড়োর মত ভালবেসেছে। সেই কারণেই সে সেদিন ওই তেরপলটি ঘাড়ে ব'য়ে নিজে থেকে দিয়ে এসেছে গুড়ের শালে। আজ খবর পাবা মাত্র সে চারখানা গাঁইতি পাখীর ঘাড়ে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এত করার পরেও তাকেই বলবে কথা! সে ভুরু কুঁচকে বললে—বল। সে সামনে চেপে বসল। মনে মনে সংকল্প করলে—বনওয়ারী অন্যায় কথা বললেই কড়া জবাব দিয়ে দেবে।

বনওয়ারী ও বেলার মনে-করা কথাগুলি বললে। বললে—বাবাধন, ধরমের পথে থাকলে বাবাঠাকুর আদেক এতে—মানে ধরগা যেয়ে—দোপর-তিনপোর এতে নিজে ভাত এনে ছামনে ধ'রে আমাকে বলবেন—লে বেটা, ধরমের পথে থেকে আজ ভাত জোটে নাই, লে, খা।

কথাগুলি ভাল। গোটা কাহারপাড়ার প্রবীণদেরই আধ্যাত্মিক মনোভাব গদগদ হয়ে উঠল; কেউ বললে—হরি বল মন, হরি বল। কেউ বললে—শিবো হে। কেউ বললে—এ সংসারে মরণই সত্যি। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে তারা দেবতাকে। করালীর কিন্তু হাসি পেল। কথাগুলির বিপরীত কোন সত্যে সে বিশ্বাসী ব'লে নয়, ওই কথা বলার ভঙ্গি দেখে তার হাসি পায়। চন্ননপুরে মিটিং শুনেছে সে। কি ক'রে যে বাবুরা বক্তৃতা করে! ওঃ, সে শুনে চনচন ক'রে ওঠে 'শরীল'। তবু হাসি গোপন করলে, শুধু একটু হাসিমুখেই বললে—তা বলছ ভালই, কথাও ভাল।

বনওয়ারী প্রবীণদের দিকে চেয়ে বললে—কি হে মাতব্বরেরা, ল্যায় বললাম, কি অল্যায়

বললাম? বল কেনে হে? ছোকরাদের এমন আলাদা আড্ডা ভাল লয়।

রতনের ছেলে মাথলা করালীর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, রতনের কথা শোনে না, কিন্তু রতন তার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ছাড়তে পারে না, রতন সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—এর আর কথা আছে বনওয়ারী? আর তুমি কি অন্যায্য বলবার লোক?

তামাক খাচ্ছিল প্রহ্লাদ, সে অনেকটা নিরাসক্তভাবেই বললে—লাও, খাও। হুঁকোটি বনওয়ারীর হাতে দিয়ে সে মূল প্রশ্নের উত্তর দিলে—হ্যাঁ, কথা তুমি ঠিক বলেছ। বলুক কেনে ছোকরারা কি বলছে।

—কি হে সব, তোমরা কি বলছ? ও সব ছাড়। একত্ত হয়ে আড্ডা কর। না-কি?

অপর সকল প্রবীণও ওই প্রহ্লাদের দলে। এতখানি উৎকণ্ঠার প্রয়োজন তারা বুঝতেই পারছে না। ছোকরাদের দল যদি আলাদা আসর ক'রে গান-বাজন ক'রে 'অণ্ডচণ্ডে'র কথাই কয়, একটু-আধটু মদই খায়—তাতে এত সব কথা কেন? তিলকে তাল ক'রে তুলেছে বনওয়ারী। তবুও তারা বললে—কথা তো ভালই। অন্যায্য আর কে বলবে?

বনওয়ারী এইবার উঠে বললে—তুমি তা হ'লে শোন দিকিনি করালী। গোপনে একটি বাক্যি বলব তোমাকে।

—গোপনে? বেশ, চল। শুনি।

একটু স'রে এসে বনওয়ারী বললে—আটপৌরেপাড়ায় পরমের আখড়ায় লাঠি খেলতে যাওয়া তো ভাল কথা লয় বাবা!

—কেনে?

—সে দাগী ডাকাত বাবা। সাধুজনের সঙ্গে সাধু থাকে, চোরের সঙ্গে চোর, ছেনালের সঙ্গে ছেনাল। কাহারপাড়ার সঙ্গে ওই কারণে আটপৌরেদের মিল হ'ল না। বুয়েচ?

করালী বললে—পরম যি ঠাট্টা করলে। তাতেই তো যেলাম—বলি কাহারপাড়ার মরদ দেখ একবার।

বনওয়ারী বললে—ওই বাবা, ওই অকম ক'রেই বুড়ো-ডাকাত ছেলেছোকরাকে দলে টানে। বুয়েচ? পেথম পেথম লাঠি খেলা, হাসি-ঠাট্টা, মদ-মাংস খাওয়া, তা'পরেতে কানে মন্তর। একবার সঙ্গে যেয়েছ তো আর ছাড়ান নাই। ধম্মের পাক সাতটা, পাপের পাক সাতান্নটা। বুয়েচ? আর খোলা যায় না, ছেঁড়া যায় না। দলে যাব না বললেই তখন ধরিয়ে দেবে।

করালী বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইল। সত্যই সে এ কথাটা ভাবে নাই। তবে কথা বনওয়ারীমামা ঠিকঠাক বলেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে অকুণ্ঠিতভাবে ব'লেও ফেললে—ই সব কথা আমি ভাবি নাই মামা।

—অ্যাই! ভাব নাই তো! এস; আর যেয়ো না। ছেঁয়া মাড়িয়ো না। করালীর হাত ধ'রেই সে মজলিসে ফিরে এল।

মজলিসে তখন নসুবালা হাত-পা নেড়ে, অঙ্গ দুলিয়ে সে এক কাণ্ড 'সেজ্জন' অর্থাৎ সৃজন ক'রে তুলেছে। ব্যাপারটার মূল হ'ল নিমতেলে প্যাকাটি প্রাণকৃষ্ণ। বনওয়ারী করালীকে নিয়ে উঠে

যেতেই অভ্যাসমত সে বনওয়ারীর ভূমিকায় মাতব্বরি শুরু ক'রে দিয়েছিল। বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে ভঙ্গিতে বলেছিল—বনওয়ারীকাকা যা বলেছে তার চেয়ে ভাল কথা আর হয় না। ছেলেছোকরার এ সব মতিগতি ভাল লয়। ধর যেয়ে, কেউ ছাড়ছে কুলকর্ম, অক্তের ত্যাজে ধরাকে সরাখানটা দেখছে। না, কি গো?

প্রতিটি কথা তার করালীর দিকে নিক্ষিপ্ত গুপ্তবাণ। বুঝতে বাকি কারও রইল না।

নসুবালা ব'সে ছিল পুরুষদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। সে এবার উঠে এসে পানুর মুখের সামনে হাত নেড়ে শরীর দুলিয়ে ব'লে উঠেছিল—আ ম'রে যাই, গুড় দিয়ে তোমার গাল চেটে খাই। 'কিরে আস্তিকালের বস্তিবুড়ো' আমার। উনি বলছেন—আমরা ছেলেছোকরা। বলি তোর মতিগতি তো ভাল। বলি হা রে মুখপোড়া চিমড়ে শুকুনি, কি করেছি আমরা? বল শুনি? মাতব্বরের দোসর আমার। বাঘের পেছুতে ফেউ—সানাইয়ের পোঁ!

করালী এসেই নসুর হাত ধ'রে টেনে সরিয়ে এনে বললে—চুপ কর্ তু। ব'স। তারপর সে এগিয়ে এসে ওই মজলিসের মধ্যে সর্বসমক্ষে বনওয়ারীর পায়ে হাত দিয়ে বলল—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, এমন কাজ কখনও করব না।

বনওয়ারী এতটা কল্পনাও করে নাই, এবং এর পরের কি উত্তর তাও সে ভেবে পেলে না। করালীর উপর স্নেহে সে আর্দ্র হয়ে উঠল।

পাঁচজনে তারিফ ক'রে উঠল করালীর—বা-বা-বা।

—হ্যাঁ রে বাবা। পথ চলবি, আপথ কুপথ খাল ডিঙ বাঁচিয়ে চলিস।

পানু কিন্তু উঠে দাঁড়াল, বললে—পা ছুঁয়ে তো বললে। কিন্তু চোলাই মদের কথাটা? সেটা অল্যায় লয়?

এবার করালী ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে তার গালে। দুর্বল চেহারার লোক সে, করালীর হাতের চড় খেয়ে সে 'বাপ' ব'লে বসে পড়ল। করালী বললে—দেখাতে পার তুমি শালো? পেমাণ করতে পার?

বনওয়ারী খুশি হ'ল। খুব খুশি হ'ল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হেঁকে উঠল—করালী, অল্যায় করলে তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ। ব'স তুমি।

—তা বসছি আমি। হোক, এর বিচার হোক। তুমি আমার ঘর পেতে দিয়েছ, তোমাকে আমি মানি। একশো বার হাজার বার আমি মানি। ধাম্মিক লোক তুমি, মাতব্বর তুমি, তোমার কথা শুনতে পারি। তা ব'লে ওই লিক্‌লিকে সড়িঙ্গের কথা শুনব আমি!

—ব'স ব'স।

সকলেই বসল। কেবল প্রাণকেষ্ট বসল না। সে গট গট ক'রে মজলিস থেকে বেরিয়ে গেল। বনওয়ারী করালীকে শাসন করলেও সে বেশ অনুভব করতে পারছে—করালীর প্রতি তার স্নেহাধিক্যের পরিমাণ। শুধু তাই নয়, সে বেশ বুঝতে পারছে বনওয়ারী এইবার তাকে নিয়ে

পড়বে। কয়েকবারই সে লক্ষ্য করেছে তার প্রতি বনওয়ারীর বক্র ক্রূর দৃষ্টি। বুঝতে ঠিক পারছে না, কিন্তু—। তার উপর তার অভিমানও হ'ল। সে বেরিয়ে চ'লে গেল।

—চ'লে যেছিস যে পানা?—জিজ্ঞাসা করলে মাথলা।

উত্তর দিলে না পানা।

—কি রে, আ কাড়িস না যে?

পানা এবার বললে—ছুঁচোর সাকরেদ চামচিকের কথার জবাব পানকেষ্ট দেয় না।

করালীর লাফিয়ে ওঠার কথা, উঠতও সে লাফিয়ে এবং কাণ্ডও একটা ঘ'টে যেত; কিন্তু তার আগেই বনওয়ারী ডাকলে—পানকেষ্ট। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলে।

প্রাণকৃষ্ণের গলার সাড়া পাওয়া গেল তার নিজের উঠানের নিমতলা থেকে। চীৎকার ক'রে সে বললে—সাধু নোক, আটপৌরেপাড়ার বটতলাতে সনজেবেলা সাধন-ভজন করেন। মনে করলাম—থাক্, বলব না, মানী নোক—। কিন্তু সে কথা সে শেষ করতে পারলে না। আতঙ্কে সে চমকে উঠল; বনওয়ারী এসে তার হাতখানা সজোরে চেপে ধরেছে।

পানু শুয়ে পড়ল মাটিতে। যাব না আমি। জাত-জ্ঞাত কেউ আপনার লয় আমার। লরমকে ধরম দেখায়। আমি মানি না কারুকে।

বনওয়ারী তার ঘাড়ে ধ'রে খাড়া ক'রে তুলে দিলে। তারপর ধাক্কা দিয়ে নিয়ে এল মজলিসে। পানু আর উপুড় হয়ে পড়বার অবকাশ পেলে না। পানুকে ঠেলে মজলিসের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বললে—লয়ানের বাঁশঝাড় নিজের ব'লে পাকু মোড়লকে বেচে দিয়েছিস কেনে?

পানুর চীৎকার ঝংকার এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

—বল্। মজলিসে বল্।

এবার পানু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বনওয়ারীর দিকে চেয়ে বললে—ক্যা বললে? অর্থাৎ কে বললে?

—তোর মুনিব খোদ পাকু মোড়ল আমাকে বলেছে। চৌহদ্দী পড়ে শুনিয়েছে—অতনের দরুন কেনা, হেদো মণ্ডলের বাঁশঝাড়ের পূব্ব, বনওয়ারীর মানে—আমার বাঁশঝাড়ের দক্ষিণ, কোপাইয়ের বাঁধের উত্তর, গুপীর দরুণ কেনা ঘোষ মাশায়দের বাঁশঝাড় আর শিরীষগাছের পচ্চিম। এর মধ্যে আমি—নিমতেলে পানকেষ্ট কাহার নিজহাতে লাগানো বড় বাঁশঝাড় একটি—বাঁশ সাড়ে আট গণ্ডা—আট টাকার বিক্রয় করিলাম।

পানু উঠে ব'সে বললে—হ্যাঁ, তা বিক্রয় করেছি আমি। সে তো আমার নিজের বাঁশঝাড়। আমি নিজের হাতে লাগালছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—লাগালছ। 'না' বলি নাই আমি। আমার বাঁশঝাড়ের পূবে—লয়ানের বাবার লাগানো বাঁশঝাড়, তার পূবে ঘোষ মাশায়দের বাঁশঝাড়ের মধ্যিখানে খালি জায়গায় তুমি লাগালছ একঝাড় বাঁশ ও-বছর আগে, তাতে দুগণ্ডা বাঁশও জমে নাই এখনও। লয়ানের ঝাড়ের সাথে লাগালাগি হয়েছে, এই সুবিধেতে তুমি গোটা সাড়ে আট গণ্ডা বাঁশসমেতবাঁশঝাড় মুনিবকে বেচে

দিয়ে এসেছ। বল, কেনে বিক্কি করেছ পরের ধন নিজের ব'লে?

মজলিসে কলরব উঠে গেল।

—অন্যায়, মহা অন্যায়, হে ভগবান। সমস্বরে সকলে চীৎকার ক'রে উঠল।

নসুবালা গালে হাত দিয়ে ব'লে উঠল—হেই মা রে! ব'লে কিছুক্ষণ স্থির বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তার পর ঘাড় নেড়ে বললে—ঘোর কলি মা! আমের ধন শ্যামে বিক্রয় করছে।

পানু কাতরভাবে বললে—আমি কি করব? মুনিবই আমাকে নিকে দিতে বললে?

—বললে?—করালী ব'লে উঠল—চন্নপুরের বাবুদের পাকা বাড়িটা নিকে দিতে বললে দিবি?

বনওয়ারী বললে—করালী, চুপ কর তুমি।

পানু কাঁদতে লাগল। বনওয়ারী করালীকে চুপ করতে বলতেই সে কেঁদে ফেললে।

বনওয়ারী বললে—ফোঁপাস না, বুল্লি, ফোঁপাস না। ওতে কেউ ভুলবে না।

পানু বললে—আমার বেবরণটা পঞ্চজনে দয়া ক'রে শোনেন—না কি আমি বানের জলে ভেসে আইছি? অপরাধ তো হয়েছে আমার, সাজা নিতে তো আমি পস্তুত।

বনওয়ারী নিজের পাথরটায় ব'সে বললে—বল্, কি বলছিস?

পানুর বিবরণ অন্য কিছু নয়, নিজের অন্যায়ের স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন যুক্তিতর্ক নয়, নিতান্তই নিজের মন্দভাগ্য এবং মনিবের কঠিন আচরণের করুণরসসিক্ত ইতিবৃত্ত। এইটুকু পানুর কাপুরুষ এবং কুটিল মনের উপস্থিতবুদ্ধি। পানু বললে—মুনিবে যে মেরে ফেলাইছে তার পিতিবিধেন কর পাঁচজনায়। 'ধরে মারে সয় বড়।' আমাকে মুনিব ধ'রে নিকে লিলে—আমি কি করব? মাশায়, তিন বছর হিসেব করলে না, ই বছর হিসেব ক'রে বললে—পঁচিশ টাকা পাওনা তোর কাছে। দে, ফ্যাল্। তা বললাম—বছর বছর হিসেব করলেন না—না ক'রে একবারে এবনি মোটা পাওনা কি ক'রে দোব আমি? তা বললে—তা, আমি কি জানি? তু শালোদের ওজগারই কি কম? তুমি শালোরা মাঠ থেকে ধান সরাচ্ছ। ঘর থেকে এনে শোধ দাও। কি করব মাশায়, বললাম—আপনকার জমির পাশে সরকারী গোপথ ভেঙে যে জমিটুকুন বেড়েছে, সেইটুকুন তো আপনকারই হয়েছে—তারই দরুন বলেছিলেন দশ টাকা দেবেন, সেই ল্যান আর বাঁশঝাড় একটা আছে ল্যান, লিয়ে আমাকে রেহাই দ্যান। তা সে কী গালাগাল করলে!—ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগলে পানু।

পানু চতুর, নিঃসংশয়ে বুদ্ধিমান। মুহূর্তে ঘুরে গেল মজলিসের মনোভাবের মোড়। পানু যে কথাটা বলেছে, সেটার সঙ্গে সকলেরই অন্তরের কথার অল্পবিস্তর মিল আছে। বনওয়ারীর মত মাতব্বর, সচ্ছল ব্যক্তির পর্যন্ত মিল আছে। সদ্গোপ মহাশয়েদের সঙ্গে নিয়মিত হিসাব হয় না। ঘোষবাড়িতে বনওয়ারীও এবার হিসাব করিয়ে উঠতে পারে নাই। দু'বছর তিন বছর পর হিসাব হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষাণদের ঋণ দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য মনিব অন্যায় হিসেব করেন না। সে অন্যায় কথা বলা চলে না, বললে পাপ হবে। ঋণ দাঁড়াবারই কথা, সম্বৎসরের ছ'মাস—বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত মনিবের কাছে ধার করে খাওয়া হয়, বাকি ছ'মাস তাও এরকম মনিবের কাছ

থেকেই নেওয়া। মনিবের পাওনা শোধ না ক'রে ফসলের কৃষাণী পাওনা তিন ভাগের এক ভাগ থেকে কিছু কিছু নিয়েই চলে; এটার সুদ লাগে না—সেও মালিক দয়া ক'রেই নেন না বলতে হবে। তারপর গম, ছোলা, গুড়, আলু, সরষে, তিসি—এ সবের ভাগ মনিব কাটেন না। সুতরাং ঋণ যে শোধ হয় না, তাতে কোন সংশয় নাই। তবে বছর বছর হিসেব করলে, এগুলো শোধ করা সহজ হয়। দু'বছর তিন বছর অন্তর মনিব হিসেব নিয়ে বসলে ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। ভর সার মধ্যে মা কোপাইয়ের চরে অনেক পতিত আর বাঁশবাঁদিতে বাঁশের 'মুড়ো'র অর্থাৎ শিকড়সুদ্ধ বাঁশের অভাব নাই, প্রতি বৎসর কাহারেরা দুটো চারটে বাঁশঝাড় লাগায়, দু-চারটে বট-পাকুড়ের চারা বা ডাল পোঁতে। সেই বাঁশঝাড় আর গাছগুলি মনিবেরা নিয়ে রেহাই দেন। প্রতিজনেই মনিবের জমির পাশে যেখানে যতটুকু সরকারী পতিত জমি থাক্—সে পতিত ডাঙাই হোক বা জলাই হোক বা জলনিকাশী নালাই হোক কিংবা গোপথ হোক—সেইটুকুকে কেটেকুটে বা ভরাট ক'রে আলবন্ধন দিয়ে মনিবের জমির সঙ্গে চাষ করে। সেগুলি নিয়েও রেহাই দেন মনিবেরা।

পানুর কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে সকলে চুপ ক'রেই রইল। কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললে। বনওয়ারীও ফেললে দীর্ঘনিশ্বাস। বনওয়ারীও এমনি খানিকটা নালা ভেঙে জমি করেছে। ঘোষেরাও বছর কয়েক হিসেব করেন নাই তার সঙ্গে।

শুধু করালী ব'সে পা নাচাতে লাগল। সে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত মানুষ, চন্দনপুরে খাটে, নগদানগদ মাইনে; সে ব'লেও ফেললে—মারো ঝাড়ু চাষের মুখে।

বনওয়ারী বললে—আই করালী!

করালী বললে—তবে পিতিবিধেন কর। পানা যা বলেছে, তা তো মিথ্যে লয়!

—বল ভাই করালী, বল।

কাউকে কিছু বলতে হল না। ওদিকে তখন মেয়েরা কথা বলতে শুরু করেছে। মজলিসের ঢেউ ঘরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। একেবারে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ফুটে উঠেছে ঝগড়াটার মধ্যে।

পরস্পরের শত্রু নয়ানের মা এবং করালীর নসুদিদি একত্রিত হয়ে প্রাণকেষ্টর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। নয়ানের মা অগ্নি-বর্ষণ করছে।

পানুর বউ দুলে দুলে নসুকে গাল দিয়ে চলেছে—ওলো বেটাখাকী লো, ওলো ভাতারখাকী লো, নিব্বংশের বেটী লো—তোর মুখে আগুন দি লো—। ভুলেই গিয়েছে যে নসুবালা কারও কন্যা নয়, সে পুরুষ, তার স্বামীও নাই, পুত্রও নাই।

নসুবালা আবার নেচে নেচে গালাগাল দিচ্ছে—নোকের জোড়া বেটাকে আমি এমনি ক'রে নেচে নেচে খালে পুঁতব। নোকের ভাতার মরবে—ওগ নাই, বালাই নাই, ধরফড়িয়ে মরবে, আমি ধেই ধেই ক'রে নাচব।

বনওয়ারী বিরক্ত হয়ে প্রহ্লাদ এবং রতনকে বললে—যা তো রে বাপু একজনা, মেয়েগুলোকে গলায় ধ'রে আপন আপন ঘরে দিয়ে আয়।

মেয়েদের ঝগড়া অসহ্য হ'লে কাহারদের ঝগড়া বন্ধ করার এই ব্যবস্থা। এতেও না মানলে

তখন প্রহার।

পানু গোটা মজলিসের মন আরও বেশি ক'রে পাবার জন্য বললে—ঘাকতক শুমাগুম্ দিয়ো, বুল্লে প্রেল্লাদকাকা, আমি বলছি—আমার ওই পরিবারটাকেও দিয়ো ঘাকতক।

সঙ্গে সঙ্গে করালী উঠে গেল, নসুবালাকে সে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে দেবে।

মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হ'ল। সকলে মজলিসে ফিরে এসে আবার বসল। বনওয়ারী স্থির দৃষ্টিতে পানার দিকে তাকিয়ে আছে। পানা দৃষ্টি তুলছে আর নামাচ্ছে। একবারও সে দেখলে না যে বনওয়ারীর দৃষ্টি তার দিক থেকে ফিরেছে। সে চতুর, বুঝছে সব। মধ্যে মধ্যে কান ম'লে বলছে—এই—এই, আর যদি করি—। তারপরই ফেলছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল। বনওয়ারীর ঠোঁটের কোনে মধ্যে মধ্যে হাসিও খেলে যাচ্ছে।

—মাতব্বর!—হাত জোড় ক'রে আবেদন করলে পানা।

—আর করবি এমন কাজ?—বনওয়ারী জানে পানু বুঝতে পারছে কাজের সত্যকার অর্থ।

—কান মলেছি দশবার। আবার মলছি।

—আচ্ছা যা। ব্যবস্থা করছি আমি। ধরব গিয়ে মণ্ডলকে। বলব, ভুল হয়ে যেয়েছে—আর তা আপুনি জেনেশুনেই পানাকে দিয়ে করিয়েছেন। না হয়, লয়ানকে দিয়ে আমার মুনিবের নামে লিখিয়ে দোব লয়ানের ঝাড়। লেগে যাবে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

প্রহ্লাদ বললে—এটা আচ্ছা হবে, বুল্লে কিনা ব্যানো ভাই, আচ্ছা। পাকু মণ্ডলের পাক টান মেরে ছিঁড়ে দেবে ঘোষ। হুঁ হুঁ বাবা, ঘোষ হল ভাগলপুরের ষাঁড়।

খুব হেসে উঠল সকলে।

—কিন্তুক হিসাবের কথা?—জিজ্ঞাসা করলে রতন। সে হেদো মণ্ডলের কাছে এমনি একটা বকেয়া হিসাবের বন্ধনে পড়েছে। হেদো শুধু কথা ব'লে ক্ষান্ত হন না, গদাগদ কিল মারেন।

—হবে, হিসেবও হবে। চল, সবাই মিলে যাই একদিন।

—কালই চল সকলে। রতন বললে।

—কাল হবে না ভাই। কাল গাজনের উতুরী পরবার দিন।

—সি তো যে গাজনের পাটায় চাপবে।

—এবার আমি চাপব। বনওয়ারী বললে।

—তুমি?

—হ্যাঁ।

—না, না। কাজ নাই বনওয়ারী। কিসে থ্যানত হয়। কাজ নাই।

—উ-হুঁ। বাবাঠাকুর পেত্যাদেশ করেছেন, কৃপায় নাই।

—বাবাঠাকুর!—মজলিস স্তব্ধ হয়ে শিউরে উঠল।

বনওয়ারী বললে—কাল এলে অ্যাই ভোরবেলাতে, ঠিক স্বপনটিও ভাঙল, কাককোকিলও কলকল ক'রে উঠল।

ভোরের স্বপ্ন একেবারে প্রত্যক্ষ অব্যর্থ। সকলে হাতজোড় ক'রে প্রণাম করলে দেবতাকে।

—তা ছাড়া—বনওয়ারী বললে—বাবাঠাকুরের রক্তগরটি আমাদেরই ভুলচুকে পুড়ে মরেছে তো। পাপটা খালন করতে হবে, চড়কে চাপার মানত তখুনি করেছিলাম আমি। হঠাৎ হেসে বললে—বয়েসও তো হ'ল। না হয় ফেটেই মরব।

ভোরবেলায় বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে গিয়ে নামল। গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা। কালই সে কাটোয়ায় যাবে গঙ্গাস্নান করতে, গঙ্গাস্নান ক'রে, কালরুদ্রের মাথায় ঢালবার জন্যে ভার ব'য়ে নিয়ে আসবে গঙ্গাজল। যাবার সময়টা ট্রেনেই যাবে। আসবার সময় কাঁধে ভার নিয়ে দুলতে দুলতে দশ কোষ রাস্তা চ'লে আসবে মনের আনন্দে 'শিবো হে, শিবো হে' হাঁকতে হাঁকতে। কোশ-কেঁধে বনওয়ারীর কাছে দশ কোশ কতটুকু!

কালারুদ্দুতলায় ঢাক বাজছে, আজ থেকে সকাল-সন্ধ্যে ধুমুল শুরু হ'ল।

ড্যাডাং ড্যাডাং—ড্যাং—ড্যারা ড্যাং—ড্যাডাং—
এ-র্—র্-র্—র্-র্—ড্যাডাং।

লোহার কাঁটা-ভরা চড়কের পাটার উপর শুয়ে বনওয়ারী ঘুরবে। আকাশের দিকে চেয়ে ডাকবে—শিবো হে, শিবো হে, শিবো হে!

তাতে মরতে হয় মরবে, খেদ নাই।

গোটা কাহারপাড়ায় আজ সে দেবতা হয়ে উঠেছে। সকলে তার পথে গোবরজল ছিটিয়ে পবিত্র ক'রে দিচ্ছে।

পাখী এসে বললে—গঙ্গাজল চাইতো? শুধিয়ে গিয়েছে।

—কে? করালী?

পাখী হাসলে।

—আমি নিজেই যাব কাটোয়া। যাবার সময় ট্যানে যাব। আসবার সময় হাঁটব।

—ট্যানে কিন্তুক টিকিট কেটো না। সে ঠিক ক'রে দেবে।

তৃতীয় পর্ব

এক

ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডাং; ড্রার্র্র্র্র্—ড্যাডা-ড্যাং। ড্রার্র্—ড্যাডাং—ড্রার্র্ ড্যাডাং।

বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বক পক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুল্কো-ডাঁটির মাথায় চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁসি বাজে, শিঙা বাজে, ধুপের ধোঁয়ায় মৌ-মৌ করে বাবা কালারুদ্দুর থান; 'পাটাগনে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের

দণ্ড, গলায় 'উতুরী' অর্থাৎ উত্তরীয়, পরনে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'তিপুণ্ডক', রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই-ধেই ক'রে নাচে। হাড়ি-ডোম-বাউড়ী-কাহার যার ইচ্ছে বাবার ভক্ত হতে পারে। এবার শিরভক্ত বনওয়ারী। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই গোটা কাহারপাড়াটাই গাজনে 'উতুরী' পরেছে। শিবো হে, শিবো হে! জয় শিবো—কালারুদ্দু—! বম্ বম্ বম্! বম্ বম্ বম্! ঢাকে বাজে—ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডা-ড্যাং-ড্যাং!

গজাল-পেটা চড়কপাটার উপর শুয়ে আছে শিরভক্ত বনওয়ারী। ষোলজন ভক্তের কাঁধের 'সাঙ' অর্থাৎ বাঁশের ডাণ্ডার উপর চড়ক চলেছে—ঘুরছে বন্-বন্ বন্-বন্—বন্-বন্!

চৈত্র-সংক্রান্তি শেষ হয়ে গেল। বছরের শেষ রাতটি 'পেভাত' অর্থাৎ প্রভাত হ'ল, গোটা রাতটি নাচলে কালারুদ্দের ভক্তরা। শিবো হে, কালারুদ্দু হে, বম্ বম্ বম্—বম্-ববম্ বম্-ববম্ বম্। চড়কের পাটা পাক দিয়ে 'চক্কর' অর্থাৎ চক্রের মত ঘুরল বন-বন ক'রে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-বনে আদ্যিকালের অন্ধকার 'চ'কে চ'কে' অর্থাৎ চমকে চমকে উঠল। কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীরা কলকল ক'রে উঠল। সাপেরা গর্তের মধ্যে পাক ঘুরে ফণা তুললে। জন্তু-জানোয়ার গা-ঝাড়া দিলে। তারাও জানলে—বছর শেষ হ'ল। তারাও প্রণাম জানালো—শিবো হে, কালারুদ্দু হে!

বছরের প্রথম দিন, গাজন শেষ হ'ল। শিব চললেন জল-শয়নে কালীদহের তলায়; গোটা বছরটি থাকবেন সেথায়, আবার উঠবেন বছরের শেষে গাজনে, এক মাস আগে আগামী চৈত্রের শুভদিন অর্থাৎ পয়লা। বলবেন—সূর্য হে, চন্দ্র হে, আমি উঠলাম—বছর শেষ কর। শিব জলশয়নে যাচ্ছেন;—সেই মিছিল চলেছে—জঙ্গলের কালারুদ্দুতলা থেকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়া হয়ে হাঁসুলী বাঁকের কালীদহে। প্রথম চলেছে ঢাক, কাঁসি, শিঙে, বাদ্যভাণ্ড; তারপর চলেছে সঙ। সঙ হ'ল—বাবার ভূতপ্রেত দানা-দৈত্যের দল। মানুষেই সেজেছে, নন্দী ভৃঙ্গী 'তিজট' 'দন্তবক্ক'—আরও কত ভূত তার নাম কে জানে! যারা সেজেছে তারাও জানে না। এবার সঙেও কাহারপাড়ার লোক বেশি। হবে না কেন, এবার বনওয়ারী কাহারপাড়ার মাতব্বর যে শিরভক্ত। সঙের দলের পিছনে চলেছে ভক্তের দল। সারিবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে চলেছে—মাথার উপরে তালে তালে নাচাচ্ছে বেতের দণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে পায়ের সারি। তাদের পিছনে চড়কপাটা। ঘুরছে বন্-বন্। চড়কপাটায় গজালের কাঁটার উপর শুয়ে আছে বনওয়ারী আকাশের দিকে মুখ ক'রে। তার পিছনে বাণ-গোঁসাই, তার পিছনে 'বাবার দোলা' অর্থাৎ চতুর্দোল—আসলে একটি ডুলি। ডুলির আশেপাশে ধূপ গুগগুল জ্বলছে। আর খবরদারি ক'রে চলেছেন জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়েরা। চৌধুরী-বুড়োকে পর্যন্ত আজ বের হ'তে হয়েছে। হেদো মণ্ডল, পাকু মণ্ডল, নাকু পাল, এমন কি মাইতো ঘোষও চলেছেন।

না চ'লে উপায় আছে। সকল দেবতার আদি দেবতা—কালারুদ্দু! দিন বল, রাত বল, মাস বল, বছর বল, আদি বল, অন্ত বল—সব কিছুর মালিক হলেন উনি। শিবো হে! শিবো হে! চড়কের পাটার উপর শুয়ে বনওয়ারী মনে করে কথাগুলো, আর প্রণাম জানায় বাবাকে। প্রাণ নাও বাবা, মান রাখ; আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু কাহারদের মঙ্গল কর—শিবো হে, আসছে জন্মে

উচ্চকুলে জন্ম দিয়ো। বাবাঠাকুর তোমারই শিষ্য বাবা, তাঁরও পুজো দিয়েছি, তোমার চড়কের পাটায় লোহার কণ্টকে শুয়ে তোমার চরণে মিনতি করি বাবা, তুমি তাকে প্রসন্ন হতে বল, তোমার শিষ্যকে বল—তাঁর বাহন-'হত্যে'র অর্থাৎ সেই অজগরটিকে পুড়িয়ে মারার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন, যেন হাঁসুলী বাঁকের অমঙ্গল না হয়। ক্ষেত ভ'রে ধান দাও, ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা কর, কোপাই বেটীকে ক্ষ্যাপা বানে ভাসতে বারণ কর।

কাহারপাড়ায় আজ মহাধুম।

বনওয়ারী এবার শিবভক্ত, চড়কের পাটায় চেপেছে—এবার কালীদহে যাবার পথে ডুলি, চড়কের পাটা নামবে কাহারপাড়ায়। এই দুবার নামছে। একবার নেমেছিল অনেক কাল আগে, তখন নীলকুঠির আমল—কাহারপাড়ার মাতব্বর তখন গণ্ডার কাহার। এই দশাশয়ী 'পেরকাণ্ড' চেহারা ছিল ব'লে নীলকুঠির দেওয়ান জাঙলের চৌধুরী নাম দিয়েছিলেন—গণ্ডার কাহার। গণ্ডার কাহারের বংশ নাই। গণ্ডার সেবার চেপেছিল চড়কের পাটায়। মদ খেয়ে পাটায় চড়েছিল ব'লে বংশটাই শেষ ক'রে দিয়েছেন বাবাঠাকুর। সেই সেবার কালারুদ্দুর ডুলি নেমেছিল কাহারপাড়ায়। সেও নাকি খুব ধুম হয়েছিল। সাহেবান মহাশয়রা 'বশকিস' করেছিলেন অনেক। এবারও খুব ধুম। এবার দ্বিতীয়বার বাবার ডুলি নামবে কাহারপাড়ায়।

ডুলি নামবে ওই মজলিস যেখানে বসে, সেইখানে। গোবরজল দিয়ে জায়গাটি পরিপাটি ক'রে নিকানো হয়েছে, বেদী বাঁধা হয়েছে, গোটা কাহারপাড়াই আজ ঝকঝক তকতক করছে। এঁটো কালো হাঁড়ি সরানো হয়েছে, মুরগী হাঁস আজ ঘরে বন্ধ, ছেলেপিলে সাবধান, বউ-বেটী গিন্নী-বান্নি সব কাচা কাপড় প'রে, চান সেরে, চুল এলিয়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা আসবেন।

হাঁকডাক ক'রে বেড়াচ্ছে করালী।

বনওয়ারী চেপেছে চড়কে। করালীপাড়ায় ঘুরছে চরকির মত। গোটা পাড়াটাকে সে-ই সাজিয়েছে। সাজিয়েছে, আচ্ছা সাজিয়েছে, বাহা-বাহা সাজিয়েছে। এই কথা ছাড়া, প্রশংসা প্রকাশের ভাষা কাহারদের নাই। সকলে একবাক্যে বলছে—আচ্ছা ছোকরা, বাহাদুর ছোকরা। বাঁশবাঁদিতে বাঁশের অভাব নাই, গাছপালার অভাব নাই; করালী তার দলবল নিয়ে বাঁশে-পাতায় ফটকই করেছে চারটে। মজলিসের 'থানটি'তে চার কোণে খুঁটি পুঁতে পাতা দিয়ে মুড়ে মাথার উপর টাঙিয়েছে সেই তেরপলখানি; রঙিন কাগজ কিনে এনেছে নিজের পয়সায়, তাই দিয়ে শেকলের মত মালা তৈরি করেছে একরাশ। তাই জড়িয়ে দিয়েছে খুঁটিতে খুঁটিতে, লম্বালম্বি কোণাকুণি; লালে নীলে সবুজে সাদায় রঙ লাগিয়ে দিয়েছে। জাঙলের সদ্‌গোপ মাশায়দের খাতির করবার জন্যে সিগারেট কিনে এনেছে চন্নপুর থেকে। ও ছাড়া আর কি দিয়ে খাতির করবে! কাহারদের ছোঁয়া আর তো কিছু খাবেন না—পান পর্যন্ত না। নিজেও সিগারেট টানছে আর ঘুরছে। পাখী ঘুরছে ঘুরঘুর ক'রে, তার পরনে চমৎকার বাহারে ডুরে শাড়ি। বউবিটীরা তার দিকে আর করালীর দিকে তাকাচ্ছে। পাখী বুঝছে সব। হাসছে।

বনওয়ারীর স্ত্রী গোপালীবালা জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মজলিসের বেদীর সামনে।

ধুনুচিতে মধ্যে মধ্যে ধুনো দিচ্ছে। শান্ত ভাল মানুষ, চুপ ক'রে রয়েছে। তার পাশে বসেছে সুচাঁদ। চোখ বড় বড় ক'রে মোটা গলায় গল্প বলছে—বলছে গাজনের গল্প। প্রতিবার গাজনেই বলে, এবারও বলছে। গল্প না ব'লে চুপচাপ ব'সে থাকতে হলে সুচাঁদের মনে হয়, সে যেন কত কাঙাল দুঃখী হয়ে গিয়েছে, লোকে তাকে হেনস্তা করছে। তাই লোকে শুনুক না-শুনুক গল্প সে ব'লে যায়। বলে—তোরা শুনে আখ্, বুড়ী হ'লে বলবি। গাজন ছেরকাল আছে, গল্প ছিল না। হয়েছে, বলি তাই আছে, না বললে থাকবে না।

পাখী বলে—তবে যে বললে, ছিষ্টি ছিল না তখন। চন্দ না, সুয্যি না, পিথিমী না, মানুষ না, পশু না, পক্ষী না—

—হ্যাঁ লো, হ্যাঁ। ছিলই না তো, কিছুই ছিল না। কিছু—কিছু না, তারপর কিছু না-থাকার ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব বুঝাবার জন্য শেষ দীর্ঘ ক'রে টেনে বলে—কি-ছু—ই না—। ব'লে দু-হাত নেড়ে দিলে।

—কি-ছু—ই না?

—কি-ছু—ই না। অন্ধ—কা—র, আঁ-ধা-র, থমথম করছে। চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। শরীরে রোম খাড়া হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর হ'ল গম্ভীর থমথমে, বললে—আঁধারের মধ্যে শুধু কালারুদ্দের চড়ক ঘুরছিল বন্-বন্, বন্-বন্, বন্-বন্। ব'লে সে হাতখানি তুলে ধরলে। ইঙ্গিতে সেই আদিকালকে যেন দেখিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। সৃষ্টির আদিকাল পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দিলে তার আঙুলের ইঙ্গিতকে।

আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত কতকাল, তার সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ণয়ের শক্তি ওদের নাই, হয়তো প্রয়োজনও নাই; কিন্তু শক্তিহীন মনের বিস্মিত উদাসীনতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অনুমানের আভাস ওদের বুকে জেগে উঠেছে। তাই সম্বল ক'রে বাবা কালারুদ্দুকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে করজোড় ক'রে।

করালী ছুটতে ছুটতে এল। এসে পড়েছে, এসে পড়েছে।

বাবা এসে নামলেন কাহারপাড়ার নীলবাঁধের পাড়ে মাতব্বরদের মজলিসে পবিত্র ক'রে বাঁধানো নতুন মাটির বেদীতে।

সুচাঁদ পাখীকে এবং করালীকে টেনে এনে বললে—পেনাম কর্। পেনাম কর্।

বনওয়ারী একটু হাসলে পাটার উপর শুয়েই। পিসী ঠিক আছে। গোদালড়ি ছাঁদনদড়ি যখন যার কাছে থাকে তখন তারই। পিসীর সঙ্গে করালী-পাখীর মিটমাট হয়েছে, এখন আর পিসী ওদের ছাড়া আর কাউকে জানে না।

করালী-পাখীর সঙ্গে সুচাঁদের মিটমাট হয়েছে এই সেদিন, গাজনের প্রথমেই। চড়কপাটার উপর শুয়েই বনওয়ারী কথাগুলি মনে করলে।

সেদিন সুচাঁদের কান্না শুরু হয়েছিল সকালেই। কাঁদছিল বাবার বাহনের জন্য। গাজন আসছে, বাবার বাহনকে মনে প'ড়ে গিয়েছে। বনওয়ারী বিরক্ত হ'লেও কিছু বলতে পারে নাই।

উপোস ক'রে শুয়ে ছিল—ভালও লাগে নাই বুড়ীকে নিয়ে বকাবকি করতে ; কাঁদুক। দুঃখ এই যে কেঁদে মানুষ ম'রে যায় না।

আদ্যিকালের বুড়ী ও। উপকথার বুড়ীর মত ওর 'কাঁদি-কাঁদি মন করে, কেঁদে না আত্যি মেটে' অর্থাৎ আত্মার তৃপ্তি হয় না। ওরা কারণেও কাঁদে, অকারণেও কাঁদে।

হঠাৎ বাহনের জন্য কান্না বন্ধ ক'রে বুড়ী কাঁদতে লাগল ওর বাপের জন্য। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল—ওরে বাবা, আমাকে সঙ্গে কর রে! তুমি কোথা গেলে রে! আমি কোথা যাব রে! ওরে, আমার কি হবে রে! একেবারে মড়াকান্না।

আর সহ্য হ'ল না বনওয়ারীর। সে উঠল। নীলবাঁধের ঘাটে বুড়ী কাঁদছিল, তার মুখের কাছে হাত নেড়ে চীৎকার ক'রে বললে—বলি, সকালবেলা থেকে এমন ক'রে কাঁদছ কেনে?

সুচাঁদ চোখ মুছে মুখের দিকে চেয়ে অভ্যাসমত তার প্রশ্নটার পুনরুক্তি করলে—কাঁদছি কেনে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাঁদছ কেনে?

—আমার মন।

—তা বললে হবে না।

—আমি কাঁদতে পাব না?

—না।

—তবে আমি কোথায় যাব?

—যাবার কথা কে বলেছে?

—তবে?

—বিনি কারণে কাঁদতে পাবা না।

—বিনি কারণে কাঁদতে পাব না?

—হ্যাঁ।

—পাব না?

—না না না।

সুচাঁদ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। উঠে কোমরে কাপড় বেঁধে চন্নপুরের বাবুদের বাড়ির রাসের উৎসবে বারুদের কারখানার বোম ফাটার মত ফেটে পড়ল।

—বিনি কারণে? বিনি কারণে? বিনি কারণে?

চীৎকার করতে করতে সে এসে মজলিসের মাঝখানে পা ছড়িয়ে ব'সে মাটিতে একরাশ ধুলো উড়িয়ে বললে—মাতব্বর! পঞ্চায়েৎ। কই, বিচার করুক পঞ্চায়েৎ! আমি থাকব কার কাছে? আমাকে খেতে দেবে কে?

উপবাসী বনওয়ারী ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। তা ছাড়া কালারুদ্দের শিরভক্ত হয়েছে সে, সন্ন্যাসের সময় সংসারের ধুলো-মাটি ঝগড়া-ঝাঁটি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে তাকে বারণ। তার অভাবে প্রহ্লাদ সকলকে নিয়ে মজলিস কর্'ছিল। প্রহ্লাদ সুচাঁদের আস্ফালনে বিস্মিত হ'ল না, কারণ পিসীর ধরনই ওই। পিসী হ'ল 'অরণ্য' অর্থাৎ অরণ্যের মত, অরণ্যে যেমন ডাল পড়লে

ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, অরণ্য যেমন মাতলে ঝড় ওঠে, কাঁদলে বর্ষা নামে, তেমনি পিসী তিলকে করে তাল, উইঢিপিকে করে পাহাড়, কাঁদলে গগন ফাটিয়ে চেঁচায়, হা-হা ক'রে হেসে ধেই ধেই ক'রে নাচে। প্রহ্লাদ হেসে ফেললে।

সুচাঁদ ক্ষেপে গিয়ে কপাল চাপড়াতে আরম্ভ করলে।—আমাকে খেতে দেবে কে? আমাকে খেতে দেবে কে? হাসছিস? তু হাসছিস?

প্রহ্লাদ এবার গম্ভীর স্বরে বললে—কেনে, তোমার কন্যে রয়েছে।

—খাব না, আমি কন্যের ভাত খাব না।

—তবে নিজেই খেটে খাবা।

—খেটে খাব?

—হ্যাঁ, তুমি তো এখনও খাটতে পার।

—নিশ্চয় পারি। খুব পারি, তোদের পরিবারদের চেয়ে বেশি পারি। বনওয়ারীর ওই মুখে-ময়দা-নেপা পরিবারের চেয়ে বেশি পারি। হেই পারি। হেই পারি।

সে অঙ্গভঙ্গি ক'রে কত খাটতে পারে বুঝিয়ে দিলে, দেখিয়ে দিলে।

প্রহ্লাদ হেসে বললে—তাই তো আমরাও বলছি গো।

—তবে? সেদিন বনওয়ারীর কাছে খাটতে গেলাম, তা বনওয়ারী এক দো-এর খাটিয়ে ল'টা পয়সা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিলে। সারা দোপর পুকুর-ডোবার চারিপাশ ঘুরে একটি পাতগুগলি তুলে আনলাম, তা কে আমাকে এঁধে দেয়?

এবার বনওয়ারী বললে—চেঁচিয়ো না, থাম। বনওয়ারী ফিরে এসেছে বাড়ির পথ থেকে।

—অ্যাঁ! বনওয়ারীকে দেখে একটু থমকাল সে।

—থাম। আগে থাম।

—থামব?

—হ্যাঁ, থাম।

—থামব, কই, জবাব দে আমার কথার।

বনওয়ারী বললে—তুমি খাটতে গিয়ে হেদো মণ্ডলের সঙ্গে ব'সে তামুক খাবে, গল্প করবে—

সুচাঁদ তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই যথাসাধ্য সবিনয়ে ব'লে উঠল—আর করব না, আর তামুক খাব না।

বনওয়ারী গম্ভীরভাবে বললে—তা ছাড়া তুমি ওই মণ্ডলকে কি সব বলছিলে?

—কি বললাম? কিছুই না।

—কিছুই না? বল নাই তুমি? মরা কুকুর বিড়েল ফেলা, নদ্দমা পরিষ্কারের কথা নিয়ে বল নাই যে, এ ওই বনওয়ারীর মাতব্বরি?

নির্বাক হয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল সুচাঁদ বনওয়ারীর মুখের দিকে।

বনওয়ারী বললে—বল কেনে, বল নাই তুমি হেদো মণ্ডলকে?

শান্ত কণ্ঠে এবার সুচাঁদ বললে—হ্যাঁ, তা বলেছি বাবা। তা এসব তো পিতিপুরুষে করত,

তাই বলেছি। আর সিটি তো তোমারই কীর্ত্তি বাবা।

—হ্যাঁ গো। আমারই কীর্ত্তি বটে। তা অল্যায়টা কোনখানে? আমরা মেথর, না মুদ্দফরাস?

সুচাঁদ চুপ করে রইল। কিন্তু মরা কুকুর বিড়াল ফেলা, মরা গরু কাঁধে ব'য়ে ফেলার যে অন্যায়টা কোন্‌খানে, সে তাও বুঝতে পারলে না।

প্রহ্লাদ এবার বললে—জাঙলের সদ্‌গোপ মাশায়রা পিরান গায়ে দিতে শিখলে, বামুনদের মড়া কাঁধে ক'রে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেত, তা ছাড়লে। আমরাই বা এ-সকল কম্ম করব কেনে?

ওসব ছেড়ে দিয়ে সুচাঁদ এবার নিজের কথা বললে—তা আমি যাব কোথা তা বল। বসন আমার প্যাটের বিটী, সে খেতে দেবে না। দুটো পাতগুগলি খেতে সাধ, তা—

এবার বসন্ত এগিয়ে এল নিজের উঠান থেকে। সে শান্ত মানুষ, শান্ত কণ্ঠেই প্রতিবাদ ক'রে বললে—ছা—'টে'! বলি, কবে বলেছি তোকে খেতে দোব না? ভাত বেড়ে তোর ছামনে দিয়েছি—তু ফেলে দিয়েছিস।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুচাঁদ বললে—ফেলে দিয়েছি?

—দিয়েছিস কিনা, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌?

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে উঠল—বেশ করেছি, খুব করেছি। দোব না? করালীর সঙ্গে পাখীর সাঙা দিলি কেনে? ওর এত বড় বাড়—আমার গায়ে ব্যাঙ দেয়—

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে বললে—তার জন্য করালী তোমার পায়ে ধরবে।

—পায়ে ধরবে?

—হ্যাঁ। ওই করালী? ডাক করালীকে। সে নিশ্চয় এতক্ষণ চন্ননপুর থেকে ফিরেছে।

সুচাঁদ ঘাড় নেড়ে বললে—না। শুধু পায়ে-ধরা লোব কেনে আমি? আমার লাতিনকে সাঙা করলে,একখানা ভাল কাপড় দিয়েছে আমাকে? বোতল বোতল পাকী মদ খায়,আমাকে দিয়েছে?

করালী এল, বললে—দোব, আমি দোব।

—দে, এখুনি দে। আমি মদ খেয়ে লতুন কাপড় প'রে লাচব।

এগিয়ে এল পাখী। সুচাঁদের হাত ধ'রে টেনে বললে—আয়, এখুনি আয়। এখুনি।

সুচাঁদ অন্য হাতে নিজের পা দেখিয়ে বলল—ধরুক, করালী আমার পায়ে ধরুক, তবে যাব।

করালী শুধু পায়েই ধরলে না, সুচাঁদকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে বললে—চল্‌, তোকে কোলে ক'রে নিয়ে যাব। চল্‌।

ছোকরার দল সব ছুটল করালীর বাড়ির দিকে।

সেই দিন থেকে সুচাঁদ প্রায় পাখীর বাড়িতেই আড্ডা গেড়েছে। ওইখানেই থাকে, পাকী মদ খায়, সিগারেট খায়, নসুবালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচে, শুধু ভাত খাবার সময় বসনের কাছে আসে। ভাত সে করালীর ঘরে খেতে পারে না। এক, পেটের বেটীর ভাত খায়, তারই লজ্জায় বলে—আমার মরণ নাই, প্যাটের হায়া নাই, বেটীর ভাত খাই সেই লজ্জা। আবার লাত-জামাইয়ের ভাত! চড়কের পাটায় শুয়ে সব কথা মনে পড়ল বনওয়ারীর, হাসলে একটু।

কালারুদ্দু কাহারপাড়ায় বসলেন—ধূপে-ধুনোয়, প্রদীপের আলোয়, তেলে সিঁদুরে পূজা নিলেন কাহারপাড়ায়। আবালবৃদ্ধবনিতা মাটির উপর উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ল, প্রণাম জানালে। এল না শুধু নয়ান এবং নয়ানের মা। নয়ান বললে—আমি পেনাম ক'রে কি করব ? মরার বাড়া গাল নাই। মরবার লেগে ব'সে আছি। করালীকে পেনাম করতে বল্ গা। কুৎসিত ভাষায় পৃথিবীকে গাল দিতে শুরু করলে, তারপর হাঁপাতে লাগল।

নয়ানের মা ছেলের বুকে হাত বুলাতে লাগল। কথার জবাবই দিলে না। সন্ধ্যার সময় তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কালীদহে স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে এলোচুলে চিলের মত তীক্ষ্ণস্বরে গাল দিতে দিতে পাড়ায় ফিরল—চড়কের পাটায় পাপ ক'রে চেপে যে তোমার মহিমে নষ্ট করলে, তাকে তুমি ফাটিয়ে মার বাবা। যে বাবাঠাকুরের বহিনকে পুড়িয়ে মারলে তাকে তুমি ধ্বংস কর বাবা। কোপাইয়ের বানে ভাসিয়ে দাও বাবা পাপ আজন্মি, ঝড়ে উড়িয়ে দাও বাবা। হে বাবাঠাকুরের মরা বাহন, আকাশে মাথা তুলে ফোঁসফুঁসিয়ে হেলে দুলে তুমি রে-রে ক'রে এস বাবা।

গোটা পাড়াটা শুভদিনে সচকিত শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

নয়ানের মা যে অভিসম্পাতই দিক, বনওয়ারী তার উপর রূঢ় হ'তে পারলে না। সে মাতব্বর, তার সে কর্তব্য নয়। বরং নয়ানের প্রতি যে অবিচার সে করেছে তার প্রতিকারের জন্যই সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নয়ানের সাঙা দেবার জন্য কন্যে খুঁজতে লাগল। তবে অবসর যে কম। কাজ যে অনেক। বৈশাখ মাস, দিন যাচ্ছে জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের ঘর ছাওয়াতে। কাহারেরা পাকা বারুই, বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতন—এ অঞ্চলের ডাকসাইটে বারুই। ঘর ছাওয়াবার মজুরিও বেশি। এটা একটা রোজগারের মরসুম তাদের। চন্নপুর পর্যন্ত যেতে হয় তাদের। এখন যে দিন-রাত্রির মধ্যে বিশ্রাম মিলছে না। দিনে ঘর ছাওয়ানো, রাত্রে রয়েছে জমি কাটার কাজ। শুক্লপক্ষ চলছে, এই পক্ষে চাঁদের আলোয় কাহারদের নিয়ে বনওয়ারী জমিটা কাটছে। গাঁইতি চলছে। পাথরেরা জব্দ হয়েছে। ভাগ্য ভাল, পাথরের 'থাক্' অর্থাৎ স্তরটা খুব পুরু নয়, পাথরের নীচে মাটিও ভাল। বনওয়ারীর কাছে কাহারেরা মজুরি নেয় না, নেয় দৈনিক মদের মূল্যটা। রোজই চন্নপুরের পচাইয়ের দোকান থেকে দু'টি জালা মদ ওরা ঘাড়ে ব'য়ে নিয়ে আসে, খায়, তারপর সন্ধ্যে পার হ'লেই ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বললেই তারা যে যার 'হাতিয়ার' অর্থাৎ কোদাল-টামনা-গাঁইতি-ঝুড়ি নিয়ে দল বেঁধে চলে সায়েবডাঙার দিকে। পথে বাবাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে নেয়। ধুলো মাথায় নিলেই নির্ভয়—বাস্, চল এইবার।

মধ্যে মধ্যে ওদের সঙ্গে করালীও এসে মাটি কেটে দেয়। করালী অনেকটা বশ মেনেছে। ক'দিন আগেই তাক বুঝে বনওয়ারী বলেছে—এইবার তোর মঙ্গল হবে করালী। সুমতি ফিরছে তোর।

করালী হেসে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে সামনে ঝুলে-পড়া চুলগুলি পিছনে ফেলে বললে—তা মতিভ্রম তো হয় মানুষের।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাজ ক'রে যায় বনওয়ারী। সবাই নীরব। শুধু শব্দ করে লোহার হাতিয়ার আর মাটি পাথর—ঠং-খং-খস্-ঘং ; সঙ্গে সঙ্গে চারি বেড়ে ঝুড়ির মাটি পড়ে—ঝপ—ঝুপ—ঝাপ। বনওয়ারীর জমি দেখতে দেখতে বেড়ে যায়।

পাশে পরমের জমিটা পড়েই আছে। যে ডাঙা, সেই ডাঙা। কোন একটা চুরি বা ডাকাতি ক'রে পয়সা হাতে না পেলে পরমের জমি কাটানো হবে না।

কিছুক্ষণ পরে বনওয়ারী আবার কথা বললে। আপসোসের সুরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আঃ, তু যদি ওই খ্যানতটি না করতিস করালী!

—কি? করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কি করলে সে? ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

ওই বাবাঠাকুরের বাহনটিকে।—আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না এই ভয়টিকে। ভুলতে তাকে দিচ্ছে না নয়ানের মা। নিত্য সে গালাগালি করছে। যখনই শোনে বনওয়ারী তখনই সে চমকে উঠে। মন তার খারাপ হয়ে যায়।

করালীর মনে কিন্তু এজন্য কোন শঙ্কা বা সংশয় নাই। রেল-লাইনে সে কাজ করে, মাটি কাটতে গিয়ে কত সাপ বেরিয়ে পড়ে। সাপ দেখলেই মারে। তা ছাড়া ওই সাপটা মারবার কিছুদিন আগে ঠিক এমনি একটা চন্দ্রবোড়াকে তাদের সায়েব গুলি ক'রে মেরেছে তার চোখের সামনে। সাপটা তার কাছে সেই জন্যেই সাপ ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গীসাথীদের কেউ এ কথা বললেই সে বলে—ভাগ্। বনওয়ারীর কথার উত্তরে সে এই কথাটা বলতে পারলে না, তবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ওই তোমার এক কথা। সাপ আবার—

—ও কথা ব'লো না বাবা, ও কথা ব'লো না।

করালী চুপ করে গেল। বনওয়ারীর কণ্ঠস্বরে গুরুগম্ভীর সুর গমগম ক'রে উঠেছে। সে কোদাল ছেড়ে দুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম করেছে।

কিছুক্ষণ পর বনওয়ারী আবার বললে—চন্নমপুর ছাড়্ তু করালী। ওখানে গিয়েই তোর এই সব মতিগতি। কিছু জমি কেন্—

—জমি?

—হ্যাঁ। জমি কেন্, বলদ কেন্, চাষ কর্।

—সে বুড়ো বয়সে করব।—হাসতে লাগল করালী। তারপর বললে—ওরে বাপ রে! এখন রেলের কাজ ছাড়তে পারি? যুদ্ধু আবার জোর ধরল। রেলের কাজ যুদ্ধের সামিল হবে। বুয়েচ? মজুরি বেড়ে ডবল হবে। এখন লোক-লোক শব্দ উঠেছে।

যুদ্ধের ব্যাপার। কালারুদ্দের মন, মহিমা। তিনিই লাগান যুদ্ধ। তাঁর চড়কের পাকে ঘটে বড় বড় ব্যাপার। আকাল আসে, মহামারণ আসে। যুদ্ধও এসেছে।

যুদ্ধ নাকি ঘোর 'যুদ্ধ' লেগেছে। সেই যুদ্ধের জন্যই নাকি এদিকেও অনেক ব্যাপার হবে।

লাইন বাড়বে। কোথা নাকি উড়োজাহাজের আড্ডা হবে। গোটা রেল-লাইনই নাকি যুদ্ধ-কোম্পানী নিয়েছে কেড়ে। অনেক নতুন লোক নেবে। অনেক খাটুনি, অনেক মজুরি। দেশ-বিদেশ, রেঙুন, না কোথা বোমা পড়েছে। 'জাপুনি' না কারা আসছে। কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে। চন্নপুরেও নাকি আসছে কলকাতার লোক। চন্নপুরে হৈ-হৈ প'ড়ে গিয়েছে।

বাঁশবাঁদির হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়েও উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। পক্ষীগুলা কলরব ক'রে ওঠে, দূর আকাশে বিন্দুর মত উড়ন্ত চিলগুলো জাহাজ দেখে ভয় খেয়ে পাখা গুটিয়ে সন্‌সন্‌ ক'রে নেমে পড়ে। কাহারপাড়ার মেয়েপুরুষ অবাক হয়ে দেখে। ছেলেগুলো অবোধ, মাঠে মাঠে ছুটতে থাকে উড়োজাহাজের সঙ্গ নিয়ে। আকাশে মেঘ উড়ে চলে থাকলে মধ্যে মধ্যে মেঘের ভিতর ঢাকা পড়ে, আবার মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ে; গোঁ-গোঁ শব্দে যায় কোন্‌ মুল্লুক থেকে কোন্‌ মুল্লুকে।

প্রথম যেদিন উড়োজাহাজে উড়ে যায়, সেদিনের কথা বনওয়ারীর আজও মনে আছে। রাত্রিকাল, নয়ানের মা গাল পাড়ছে, বনওয়ারী ব'সে আছে একা। হঠাৎ বাঁশবাঁদির অন্ধকার কাঁপিয়ে আকাশের কোণে সে এক মহাশব্দ।

গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে দুই আকাশের দূর কোণ থেকে। শব্দ ক্রমশ এগিয়ে এল।

বনওয়ারীর হাত-পা কাঁপতে লাগল।

বাবার বাহন ফণা তুলে আবার কোন নতুন রূপ ধ'রে আসছে নাকি! সমস্ত কাহারপাড়া অন্ধকারে আকাশপানে উদ্‌গ্রীব শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

লাল-নীল দু'টো তারা যেন ছুটে আসছে। তার সঙ্গে ওই শব্দ।

করালীর সাকরেদ মাথলা ও নটবর বললে—উড়োজাহাজের শব্দ। উড়োজাহাজ। ওরই আড্ডা হবে চন্নপুরের পাশে কোন্‌খানে।

হে ভগবান! হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল অলুক্ষণে উড়োজাহাজ।

এখন আর ভয় হয় না। কিন্তু এ যে অলক্ষণ, তাতে সন্দেহ নাই। ধানের দর চড়তে লেগেছে। কাপড়ও চড়ছে। অন্য 'দব্য' অর্থাৎ দ্রব্যের দরও চড়েছে, কিন্তু কাহারদের আছে শুধু খাওয়া আর পরা—অন্য দ্রব্যের দর চড়লে বেশী কিছু যায়-আসে না।

রাত্রি ন'টার গাড়ি ঝমঝমিয়ে বাম্বি বাজিয়ে কোপাইয়ের পুল পার হ'লেই জমি কাটার কাজ শেষ ক'রে কাহারেরা বাড়ি ফেরে।

খেটেখুটে আর মজলিস জমে না। যে যার শুয়ে পড়ে। শুধু করালীর ঘরে আরও কিছুক্ষণ মজলিস চলে। ছোকরার দল, খেটে ওদের ক্লান্তিও হয় না, আর বয়সের কারণে খানিকটা আমোদ না ক'রে ঘুমও আসে না। ওদের মজলিসে আজকাল মাঝখানে বসে হাঁসুলী বাঁকের আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী সুচাঁদ। ওর এক পাশে গা ঘেঁষে বসে নসুবালা, অন্য দিকে পাখী। চারিপাশে বসে ছোকরারা। ছোকরারা মাতব্বরের জমি কেটে না ফেরা পর্যন্ত যত অল্পবয়সী মেয়েরা বসে। পুরুষেরা ফিরলেই ঘরে ফেরে তারা। মধ্যখানে জ্বলে একটা নতুন লণ্ঠন।

হাঁসুলী বাঁকে সেকালে জলত পিদীম। তাও নিম এবং রেড়ীর তেলের। নিমফল কুড়িয়ে, রেড়ীর ফল সংগ্রহ ক'রে গড়াঞী-বাড়ি থেকে পেষাই ক'রে আনত। 'কেরাচিনি' অর্থাৎ 'কেরোসিন' উঠে 'লম্প' অর্থাৎ ডিবে হয়েছে। লণ্ঠন আজও কাহারদের কেউ কেনে নাই। বনওয়ারীর বাড়িতে আছে একটা, তাও ঘোষ-বাড়ির দেওয়া পুরনো। পানার ঘরেও একটা আছে, সেটাও পুরনো—সেই মনিব-বাড়ি থেকে চুরি করা। পুরনো রঙ ঢাকতে প্রাণকেষ্ট তাতে আলকাতরা মাখিয়েছে। নয়ানদের বাড়ি সে আমলের চৌধুরীবাড়ির একটা ভাঙা লণ্ঠন প'ড়ে আছে। তলাটা ফুটে গিয়েছে; মাথাটা নাই, কাচটা ভাঙা; সেটার আবার চারিপাশে তারের বেড় দেওয়া আছে। এসব আলোর কোনটাই ওরা বড় একটা জ্বালে না। পালে-পার্বণে দায়ে-দৈবে জ্বালে। একটা লণ্ঠনের তেলে চারটে লম্প জ্বলে। সুতরাং কেন জ্বালবে কাহারেরা? চন্নপুরের কারখানার চাকরে করালীর কিন্তু লণ্ঠন জ্বালা চাইই—। সুচাঁদের আবার সেটি চাই ঠিক মুখের সামনে। একেবারে উজ্জ্বল ক'রে জ্বলা চাই। তাকিয়ে দেখে আর হাসে। মধ্যে মধ্যে আরও একটু দম বাড়িয়ে দেয়, একটু বাড়াতে গিয়ে বেশি বেড়ে গেলে হাউ-মাউ ক'রে ওঠে—গেল রে—গেল রে—হেই মারে! ও পাখী—ও নসু—! ওরা কমিয়ে দিলে শান্ত হয়ে বলে—হু—হু, সায়েবী কল!

পাখী বলে—মরণ, লণ্ঠনেই মজেছে বুড়ী!

সুচাঁদ চুলের গোড়া থেকে দু আঙুলে টিপে টেনে কিছু বার ক'রে নসুকে বলে—দেখ তো ভাই, ডেঙুর না, নিকি?

নসু বলে—ও মাগো, এ যে ডেঙুর! অ্যাই একেবারে বলদের মতন! ব'লে সেটা নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের উপর রেখে ডান হাতের নখ দিয়ে টিপে মারে—পট ক'রে শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে নসুও মুখে শব্দ ক'রে—হুঁ। ওই শব্দটি না করলে উকুনের স্বর্গ হয় না।

পাখী বলে—ওই শোনের নুড়িগুলান কেটে ফেলাস। উকুনের রাজ্যি হয়েছে।

—কি বললি? কেটে ফেলাব?

—হ্যাঁ।

—চুলগুলান?

—হ্যাঁ।

—আমার চুল শোনের নুড়ি?

—লয়? আয়না নিয়ে দেখবি?

চীৎকার ক'রে ওঠে বুড়ী—আতে আয়না? না। দেখে কাজ নাই আমার।

—কেনে?

—এই বুড়ো বয়সে কলঙ্ক হবে।

সমস্ত মেয়েরা এবার হেসে ভেঙে পড়ে। নসুবালা গান ধ'রে দেয়—

"লষ্টচাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে—
কলঙ্কিনী রাইমানিনী—নাম রটেছে দ্যাশে-দ্যাশে।"

হঠাৎ ওই সুরে সুর মিশিয়ে অতি সুন্দর পুরুষালি গলায় কে বাড়ির বেড়ার ধার থেকে গেয়ে উঠল—

"শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে—
ঝাঁপ দিব সই কালীদহে,
কালীনাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যাষে।"

সকলেই চমকে উঠল।—কে লো?

সুচাঁদ এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, বললে—রবশ্যাষে এল!

নসু লাফ দিয়ে স'রে এসে বললে—উ মুখপোড়া কোথা থেকে এল লো? মড়া মরে নাই তা হ'লে?

পাখী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

এইবার গায়ক এসে বাড়ি ঢুকে লণ্ঠনের আলোয় দাঁড়াল। অদ্ভুত বেশ। মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল—কিন্তু মহাদেব নয়, গাজনের সঙের নন্দীর বেশ।

পাখী হাততালি দিয়ে উঠল।—পাগলদাদা!

পাগল কাহার—পাগল-পাগল ভাব, কারুর ভালতে নাই, কারুর মন্দতে নাই। ঘর নাই, সংসার নাই, 'স্তী' নাই, 'পুত্ত' নাই, বিচিত্র মানুষ পাগল। একটি মাত্র কন্যে, তার বিয়ে দিয়েছে ভিন গাঁয়ে। এখানে যদি দশ দিন থাকে তো পাগল সেখানে থাকে পনেরো দিন, বাকি পাঁচদিন এখানে ওখানে সেখানে। নেহাত অভাব হ'লে কিছুদিনের জন্য কাজকর্মে মন দেয়, নগদ মজুরিতে রোজ খাটে, খায়। খাটুনির অভাব নাই, লোকটার বিদ্যে অনেক। ঘর ছাওয়ার কাজে ওস্তাদ, মাটির দেওয়ালের কাজে পাকা কারিগর, ঘর লেপনের কাজে সুন্দর হাত, বাঁশ কেটে ফেলে দাও, ঝুড়ি তৈরি ক'রে দেবে পাকা ডোম কারিগরের মত, খাঁচা তৈরী করবে। লোকটার সবেই পাকা হাত। সবচেয়ে সেরা বিদ্যে গান, নিজেই গান বেঁধে গায়, গানও অতি চমৎকার। এখানকার ঘেঁটুগান একালে বরাবর পাগল বেঁধে আসছে। বনওয়ারীর পরম বন্ধু। কার নয়? সবারই বন্ধু পাগল। গলাগলি ঢলাঢলি নিয়েই থাকে। হবে না কেন! সুচাঁদ পিসী বলে—পাগলের মা অণ্ড খেলেছিল বোষ্টম আজমিস্ত্রী আখাল আজা দাস বোষ্টমের সঙ্গে। চন্নপুরে নয়, জাঙলে বাবা কালারুদ্দুর থানটিতে যখন 'পাকা ইমারতের কাজ হয়, তখন জাঙলের চৌধুরীরা খুঁজে খুঁজে বোষ্টম আজমিস্ত্রীকে এনেছিলেন কাটোয়া থেকে। পাগলের গায়ে আছে সেই বোষ্টমের অক্ত। এককালে পাগলই আনত চন্নপুরের সকল খবর। সে তখন নিত্য যেত চন্নপুর। চন্নপুরের বামুন-বউ লালঠাকরুণের সঙ্গে সে 'দিদি' পাতিয়েছিল। ছেলে ছিল না, বিধবা মানুষ, কি যে ভক্তি হয়েছিল পাগলের, 'দিদি' বলতে অজ্ঞান হ'ত, রোজ যেত দিদির বাড়ি একটি ঘটিতে দুধ নিয়ে। ঘরের গাই নিজে হাতে দুয়ে কাপড় ছেড়ে নির্জলা দুধ দিয়ে আসত; পাগলের দিদি লালঠাকরুণ 'আত্তিকালে' সেবা করতেন, একাদশীর পরদিন লালঠাকরুণ পারণ ক'রে পাগলকে পেসাদ দিতেন। চন্নপুরে কারুর বাড়িতে ভোজ-কাজ হ'লে লালঠাকরুণ থালা নিয়ে যেতেন, বলতেন—আমার বাড়িতে পুরুষ, নাই আমার ছাঁদা দাও, আমি নিয়ে যাব,

কাহার-ভাইকে খাওয়াব। খাওয়াতেন তিনি। লালঠাকুরণের স্বগ্‌গ হয়েছে। পাগলও চন্নপুর ছেড়েছে, হেথা-হোথা যাওয়াও বেড়েছে। এখন নেশা পড়েছে কন্যের কন্যে পাঁচ বছরের কন্যে, নাতনীর ওপর। তাকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছে—গান বেঁধেছে—"এ বুড়ো বয়সে তুমি আমার নতুন নেশা হে।"

ওই নেশায় ম'জে সে দেশ ছাড়ায় হাঁসুলী বাঁকের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছে। এবার ঘেঁটু ভাল হয় নাই। বনওয়ারী মনে মনে আফসোস করেছে, পাগল থাকলে আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুর জবাব দিত সে। গাজনের সময় পাগল থাকলে গাজন আরও জমত। সকলেই পাগলের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। হঠাৎ আজ সে এসে উপস্থিত হ'ল বছরখানেক পর। উপস্থিত হ'ল বিচিত্র বেশে।

সুচাঁদ বললে—এলে তা হ'লে? ব'স ব'স। তা ই ব্যাশ কেনে? গাজন তো ফুরিয়েছে।

পাগল বললে—এই ব্যাশেই বেরিয়েছিলাম, বলি—গাজনের সঙে একেবারে গিয়ে নাচতে লেগে যাব। তা পথে কাটোয়ার ধুম দেখে সেইখানেই থেমে গেলাম। গাজন গেল। ব্যাশ আর খুললাম না, এই ব্যাশে গান ক'রে ভিখ মাগতে মাগতে চলে এলাম। কথায় বলে—ভ্যাক নইলে ভিখ মেলে না, জান তো! তা তোমার দেখলাম, বুয়েচ, পাওনা তোমার ভালই হয়েছে।

নিজের ঝোলাটা দেখালে সে। বললে—অ্যানেক আছে। চাল পেলাম, বেচে টাকা করলাম। হাসতে লাগল সে।

সুচাঁদ বললে—এখানেও এবারে খুব ধুম।

—শোনলাম। ব্যানো চড়কে চেপেছিল।

—হ্যাঁ! বাবা নেমেছিল এবার কাহারপাড়ায়।

—হ্যাঁ। তাও শোনলাম। করালীর খুব নাম শোনলাম। পাখীর সঙ্গে অঙের কথা শোনলাম, সাপ-মারার কথা শোনলাম। তা বেশ, তা বেশ। ব'লেই সে হঠাৎ সুচাঁদের গা টিপে এবং ইঙ্গিত দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে—তা এই বারেতে আমার বেবস্থা কর। না, কি?

নসু চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল দিয়ে উঠল—মর্, মর্ খালভরা।

কথাটা কৌতুকের। পাগল নসুবালাকে ওই স্ত্রী-বেশের জন্য ক্ষ্যাপায়, বলে—বিয়ে করব। নসু একেবারে ক্ষেপে যায়। ছুটে পালায়।

এই হাসি-কৌতুকের মধ্যেই কোপাইয়ের পুল পার হয়ে নটার ট্রেন চ'লে গেল। মেয়েরা যে যার উঠল। করালীর দল ফিরল। পাগল তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—বলিহারি, বলিহারি।

—পাগল-দাদা?

পাগল গান ধ'রে দিলে—

"পেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না—
হায় সখি গো—সনজে হ'ল ঝিঙের ফুল কই ফুটল না!"

করালী গানে বাহবা দিলে না, ঢোল পেড়ে বসল না। বরং উল্টে পাগলের হাত ধ'রে টেনে বললে—ঠিক নোক পেয়েছি।

—আই দেখ, নোক কিসের?

—ঠিক কথা বলবার। বল তুমি, বল।

—কি ?

—ব'স নসুদিদি, বার কর বোতল।

নসু ঝংকার দিলে—পারব না। উ মুনযে ভারি বদ। মুনষে অর্থাৎ মানুষটি—মানে এই পাগল।

এতক্ষণে করালী হাসলে। বললে—মর্ মুখপুড়ী মর্। বুড়ো বয়সে ঢঙ দেখ।

সুচাঁদ একদৃষ্টে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল, মুখের দিকে তাকিয়ে শুনলে কথা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না ওর। সুচাঁদ এবার বললে—দেখ কেনে, আমাকে আবার বলে—বুড়ো বয়সে ঢঙ!

নসু গজগজ করতে করতে বোতল এনে দূর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলে করালীর হাতে।

করালী বললে—অল্যায় কোনখানটা বল ?

কথাটা হ'ল—বনওয়ারী বাড়ি ফিরবার পথে করালীকে এবং করালীর অন্য অন্তরঙ্গদের সাবধান করেছে, শাসিয়েছে। যুদ্ধ লেগেছে—চন্নপুরের কারখানায় অনেক লোক চাই, মজুরি ডবল হয়ে গিয়েছে। অনেকে গোপনে করালীকে বলেছে, তারা যেতে চায়। কিন্তু বনওয়ারী বলেছে—খবরদার! খবরদার! হাঁসুলী বাঁকের গণ্ডি পেরিয়ো না বাবারা। চন্নপুর হাঁসুলী বাঁকের উত্তর দিকে। কিন্তু আসলে ওই হ'ল দক্ষিণপুরী। উপকথায় আছে—সব দিক পানে চেয়ে দেখো, মন চায় তো হাঁটতেও পার, কিন্তু দক্ষিণ দিক পানে চেয়ে দেখো না ; ও দিকে, ও পথে হেঁটো না।

শেষে গম্ভীর গলায় বলেছে—সাবোধান! সাবোধান!

করালী বলতে চায়—কিসের সাবোধান ? বল তুমি পাগলদাদা, তুমি হ'লে গুণী নোক, তুমি বল, কিসের সাবোধান ?

পাগল বললে—হুঁ, তুইও মন্দ বলছিস না ভাই, বনওয়ারীও মন্দ বলছে না।

নসুবালা সুযোগ পেয়ে ব'লে উঠল হাত নেড়ে—তুমিও মন্দ বলছ না ভাই। তুমিও ভালি, আমিও ভালি—ন্যাজ বাঁধা দিয়ে চরতে গেলি। তুইও মন্দ বলছিস না—বনওয়ারীও মন্দ বলছে না। খুব বলা হ'ল।

সকলে হেসে উঠল। পাগল কিন্তু চটল না, অপ্রস্তুতও হ'ল না। সেও হাসতে লাগল।

করালী বললে—এখন যে কামিয়ে লেবে, সেই কামিয়ে লেবে। তা ছাড়া ছেরকাল চাষই করবে না কি ? আমি চাষ করলে, এমুনি হ'ত আমার। ওই জাঙলের সদ্গোপদের কিল খেয়ে জান যেত। জান, মাথলা এবার চাষ ক'রে কি পেয়েছে ? পাঁচ আড়ি ধান। ধুর্! মার্ চাষের মাথায় ঝাড়ু।

সকলেই সমর্থন করে, কিন্তু নীরবে। কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল মজলিসটা। হঠাৎ সুচাঁদ বললে—যুদ্ধু যুদ্ধু! কিসের যুদ্ধু বাবা! ক্যা জানে ?

করালী বললে—মরণ! সায়েব নোকের যুদ্ধু। ইংরাজ, জারমুনি, জাপুনী—

সুচাঁদ বললে—তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু। যুদ্ধু হয়েছিল সেকালে। বর্গী এয়েছিল।

ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে। সে বাবা শুনেছি বাপ-পিতেমর আমলে। অ্যাই বর্গীরা এল। ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগ টগবগ ক'রে তরোয়াল ঘুরিয়ে—কেটে-কুটে ঘর-দোর জ্বালিয়ে ভেঙে—মানুষের নাক কেটে কান কেটে হাত কেটে মুণ্ডু কেটে—খচাখচ—খচাখচ, চলে গেল। লোকে তাদের ভয়ে পোড়া মালসা মাথায় দিয়ে জলে গলা ডুবিয়ে ব'সে থাকত।

পাগল বলে—হ্যাঁ দিদি, সাঁওতাল হাঙ্গামা—সেটা বল ?

বুড়ীর চোখ বড় হয়ে ওঠে। এই সিঁদুরে মুখ আঙিয়ে, কালো যমের মত সব—হেই বাবা। গাঁ কেঁপে ওঠে মা।

বুড়ী ব'লে যায় সে গল্প। পাখী বিরক্ত হয়ে বলে—গান কর পাগলদাদা।

—গান ?

—হ্যাঁ। যুদ্ধু আর যুদ্ধু; ই কোথা যুদ্ধু হচে—আর উ কোন্ কালে হয়েছে। তার চেয়ে তুমি রাম-রাবণের পাঁচালী বল।

পাগল শুরু করলে। করালী উঠল মজলিস থেকে। মাথলাদের নিয়ে বাইরে গিয়ে পরামর্শ শুরু ক'রে দিলে। করালী বনওয়ারীর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। তা ছাড়া, এ কি রে বাপু ? সাবোধান আর সাবোধান! বেটাছেলের আবার সাবোধান আছে ? সে বললে—চল্, তোরা চল্—চল্, তা'পরেতে যা হয় হবে।

মাথলা বললে—এই দেখ, কাউকে বলি নাই, দেখাই নাই, এই দেখ। সে করালীর হাতখানা নিয়ে নিজের মাথায় চুলের মধ্যে গুঁজে একটা স্থান দেখিয়ে দিলে।

করালী শিউরে উঠল—কাটল কি ক'রে ?

—মুনিব মেরেছে পাঁচন দিয়ে।

—কেনে ?

—আমি বললাম, কৃষাণি করতে লারব। তা বলে—পাঁচ টাকা পাব দে, দিয়ে যেখানে খুশি যা। আমি বললাম, মাশায়, আপুনি যদি টাকাই পাবেন, তবে আমি পাঁচ আড়ি ধান ফেরত পেলাম কেনে ? হিসেব ক'রে আপুনিই তো দিয়েছ। তা আমার হাতের পাঁচনটা ফরাম্ ক'রে টেনে নিয়ে মেরে দিলে এক বাড়ি। কেটে গেল মাথা। তা আবার দয়া ক'রে খানিক ন্যাকড়া পুড়িয়ে লাগিয়ে দিয়ে এক আঁচল মুড়ি দিয়ে বললে—ফের চালাকি করবি তো আবার ঠ্যাঙাব।

করালী বললে—দাঁড়া। ব'লে হনহন ক'রে ঘরে ঢুকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে এল। মাথলার হাতে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললে—কালই ফেলে দিয়ে আসবি, বুঝলি ? তারপর সটান চ'লে যাবি চন্নপুরে। মাথলা আমার সঙ্গেই যাবে। আমি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকব ইস্টিশানের সিগনালের ধারটিতে, বুঝলি ?

পাগলের তখনও চলেছে পাঁচালী। রাম-রাবণের যুদ্ধ।—সীতাকে নিয়ে বনে গেলেন রাম। দেশসুদ্ধ লোকে কাঁদল। রাম চলেন, সীতা চলেন, লক্ষ্মণ চলেন পিছনে পিছনে। পথে গুহক চণ্ডালের সঙ্গে পাতালেন মিতালি। এ-বন সে-বন ঘুরতে ঘুরতে শেষে 'সুপ্যনখার' সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মণ তার নাক কাটলেন। রেগে এলেন রাবণ। সোনার হরিণের মায়া দেখিয়ে সীতাকে

হরণ করলেন। রাম-লক্ষ্মণ খুঁজতে খুঁজতে কাঁদতে কাঁদতে বনের বানরকে দিলেন কোল, মিতালি করলেন। জয়রাম ধ্বনি দিলে বানরেরা। সাগর বাঁধলেন, লঙ্কায় এলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অগ্নিবাণ নিবে যায় বরুণবাণে। বরুণবাণ ওড়ে বায়ুবাণে। সর্পবাণ কাটে অর্ধচন্দ্রবাণে। ব্রহ্মবাণে জ্ব'লে ওঠে দাউ দাউ ক'রে আগুন। মহাপাপী রাক্ষসের বুক কাঁপতে থাকে। পৃথিবী কাঁপে থরথর ক'রে। পশুপক্ষী কলরব করে। নদীর জল স্তম্ভিত হয়। গাছপালা ঝলসে যায়।

পাখী এবং শ্রোতারা নির্বাক হয়ে শোনে। হাঁসুলী বাঁকে কাহারদের পূর্বপুরুষেরা কেঁপেছিল সেকালে। হাঁসুলী বাঁকের পশুপক্ষী কলরব করেছিল, কোপাইয়ের জল স্তম্ভিত হয়েছিল। বাঁশঝাড়গুলির পাতা ঝলসেছিল। যত কালই হোক, হাঁসুলী বাঁক তো ছিল সেকালে। সেই রাম-রাবণের যুদ্ধের কালে।

হঠাৎ পাখী চকিত হয়ে আকাশের দিকে তাকালে। গুর-গুর-গুর-গুর-গুর-গুর শব্দ উঠেছে আকাশের দুই কোণে।

তিন

"ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত।"

করালী হ'ল নিম, আর ঘি হ'ল বনওয়ারীর উদার স্নেহ। কথাটা বললে নিমতেলে পানু। সকালেই আজ যাবার কথা জাঙলে ঘোষ-বাড়ি—বনওয়ারীর মনিব-বাড়ির ঘর ছাওয়াতে। ঘোষেদের বাইরের বাড়িটার নাম বাংলাকুঠি; একতলা লম্বা ঘরখানি সাহেবদের ডাকবাংলার 'ফেশানে' তৈরি করেছেন মাইতো ঘোষ মহাশয়; চুনকাম করিয়েছেন, মেঝে বাঁধিয়েছেন, দরজায় জানালায় সবুজ বিলাতী রঙ দিয়েছেন, ভিতরে ঘরজোড়া চাঁদোয়া খাটিয়েছেন—যাতে না চাল-কাঠামো দেখা যায়, মায় টানা-পাঙ্খাও খাটিয়েছেন। বাহারের ঘর। জাঙলে লোকের কুটুম-সজ্জন এলে ওইখানেই বাসা দেওয়া হয়। যাদের বাড়ির কুটুম, তাদেরই রাখাল অথবা মান্দের অথবা কৃষাণের ছেলে এই কাহারনন্দনই কেউ বারান্দায় ব'সে টানাপাঙ্খা টানে। কাজেই ঘর-খানার সব কিছু কাহারপাড়ার নখ-দর্পণে। সেই ঘরখানা এবার ছাওয়াবার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ সেদিন হনুমানের সন্ন্যেসীর দলে যুদ্ধ লেগে ধমাধম লাফিয়ে ঘরখানার চাল একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছে।

হনুমানের সন্ন্যেসীর দল ক্ষেপলে ভীষণ ব্যাপার। সাধারণত হনুমানের দলে থাকে বিশ-পঞ্চাশটা হনুমতী, তাদের দলপতি থাকে এক বিরাট হনুমান, কাহারেরা বলে গাদা-হনুমান, এই লম্বা এই সাদা দাঁতে দাঁতে অনবরত শব্দ করছে কট-কট-কট-কট, খ্যাঁকাচ্ছে খ্যাঁকোর-খ্যাঁক। মধ্যে মধ্যে গম্ভীর গলায় উ-প শব্দ ক'রে লাফ দিয়ে চলছে এ ডাল থেকে ও ডাল; এ গাছ থেকে ও গাছ, গাছ থেকে পাশের ঘরের চালে ধম ক'রে লাফিয়ে পড়ছে। দলের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষ হনুমান নাই। দলের প্রতিটি হনুমতী প্রসব করে তার সন্তান। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। প্রসব

হ'লেই সর্বাগ্রে সে খবর নেবে—বাচ্চাটা হনুমান, না হনুমতী, হনুমতী হ'লে থাকবে, হনুমান হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ নখে বাচ্চাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেঁড়ে ফেলবে।

পুরুষ-সন্তান হ'লে হনুমতীই পালায়—এখানে ওখানে লুকিয়ে থেকে সন্তানকে খানিকটা বড় ক'রে ওই সন্ন্যেসীর দলে সমর্পণ ক'রে আবার ফিরে আসে নিজের দলে। সন্ন্যেসীর দলের দলপতির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এই দলের দলপতির যুদ্ধ বাধে। ভীষণ যুদ্ধ। আঁচড়-কামড় চড়-চাপড় —সে রক্তারক্তি ব্যাপার! এ ওর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দিতে চায়, ও এর বুকে নখ বসিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিতে চায় তার হৃৎপিণ্ড। উ-প উ-প শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে, গোটা গ্রামের চাল তছনছ হয়ে যায়, দুপ-দাপ শব্দে এ চাল থেকে ও চালে লাফ দিয়ে এ ওকে ও একে অনুসরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশে সন্ন্যেসীর দল উৎসাহভরে আক্রোশভরে লাফ মারে। হনুমতীর দলও লাফ দিয়ে এ চাল ও চাল ক'রে ফেরে, তারা লাফ দেয় উৎসাহে এবং আশঙ্কায়। একজন হার না-মানা পর্যন্ত যুদ্ধ থামে না। একনাগাড়ে তিন দিন চার দিন যুদ্ধ চলে।

এর উপায় নাই, প্রতিবিধান নাই। মাইতো ঘোষের বন্দুক আছে, তিনি আক্রোশে গুলি করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বাড়ির লোক, গ্রামের লোকে দেয় নাই। হনুমান—বীর হনুমান—রামচন্দ্রের বাহন, তিনি তাদের দিয়ে গিয়েছেন গাছের ডাল এবং ঘরের চালের রাজত্ব; মানুষের ফসলের একটা ভাগও দিয়ে গিয়েছেন। 'উনি'রা হলেন পবন-নন্দন, ওঁদের মারলে পবনঠাকুর মেঘ আনবেন না সে অঞ্চলে, অনাবৃষ্টি হবেই। বনওয়ারীও হাত জোড় করেছে মাইতো ঘোষকে। জল না হ'লে জাঙলের সদ্‌গোপেরা তবু বাঁচবেন, ঘরে ধান আছে, টাকা আছে। কিন্তু কাহারদের যে সর্বনাশ! তারা খাবে কি? সবংশে সগোষ্ঠী অনাহারে শুকাবে যে! সে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, গোটা কাহারপাড়া একত্র ক'রে তিন দিনে ঘরখানাকে ছাইয়ে দেবে। ঘোষ জোর তাগিদ দিয়েছেন পরশু। কলকাতা থেকে তাঁর এক বন্ধু আসবেন মেয়েছেলে নিয়ে, বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে আসবেন, যুদ্ধ যতদিন না মেটে বাস করবেন; সুতরাং ঘরে লাগতেই হবে। গতকাল থেকেই তিনি লাগবার জন্য বলেছিলেন; কিন্তু আর এক মণ্ডলের ঘরে লেগেছিল—ঘর আধ-ছাওয়া হয়ে রয়েছে; তাই কালকের দিনটি ছুটি ক'রে নিয়েছিল বনওয়ারী। আজ লাগবে —শপথ ক'রে এ কথা বলে এসেছে। সকালেই সকল কাহার—বুড়ো যুবা এসে জুটল, এল না মাথলা নটবর ফড়িং হেবো। করালীর কথা আলাদা। সে চন্নপুরে খাটে, কাহারপাড়ার কাহার হয়েও কাহার নয়—এক গাছের ফল বটে, কিন্তু নিজেই বোঁটা ছিঁড়েছে। কিন্তু চার-চারটে জোয়ান ছোকরা এল না কেন?

আর কেন? তারা চারজনে করালীর সঙ্গে চন্নপুরে গিয়েছে। রেলে কাজ নেবে। নিয়ে গিয়েছে করালী। দলের সকলে ঘাড় নাড়লে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বনওয়ারী গুম হয়ে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। নিমতেলে পানা সুযোগ বুঝে বললে—ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত!

বনওয়ারী উত্তর দিতে পারলে না কথাটার। ঘোষ মহাশয়ের ঘর ছাওয়া অবশ্য আটকাবে না, কিন্তু এ কি হ'ল? এত ক'রে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে করালীর মতি ফিরল না, তার নিষেধ

লঙ্ঘন ক'রে ছোকরাদের নিয়ে গেল? কাহারপাড়ায় ভাঙন ধরিয়ে ছোকরাদের হাঁটাচ্ছে চন্নপুর—ওই দক্ষিণপুরীর পথে।

পাগল এল এতক্ষণে। সে রাত্রিটা ছিল করালীর উঠানে শুয়ে। গরমের দিন, খোলা উঠানে নিজের ঝুলিটা মাথায় দিয়ে একখানা মাদুরের উপরে শুয়েছিল। কাহারদের বাড়িতে মাদুর বড় একটা নাই, খেজুরপাতা তালপাতার চ্যাটাই ওরা নিজেই বুনে নেয়, ওই ওদের সম্বল, কিন্তু করালী তাকে মাদুর দিয়েছিল—নতুন মাদুর। সকালে উঠে সে এল বনওয়ারীর ওখানে। বৈশাখ মাস —ঘর ছাওনের সময়, ওইখানেই সকলের সঙ্গে দেখা হবেই। হাসিমুখে গান ধ'রে সে এসে দাঁড়াল—

"মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে—
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমাকে ফিরে হে।"

কিন্তু মজলিসের লোকেরা শুধু একবার মুখ তুলে একটু শুকনো হাসি হেসে আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতনের তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা, তারাও চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বনওয়ারী বললে—এলি কখন?

—কাল এতে। কিন্তু বেপারটা কি?

—অ্যানেক। তা এয়েছিস ভালই হয়েছে। চল্।

—কোথা?

—ঘোষ মাশায়ের বাংলাকুঠি তিনদিনে শ্যাষ ক'রে দিতে হবে।

—অ্যাই ছ্যাখ্, আমাকে কেনে? আমাকে ছেড়ে দে।

—কেনে?

—আমার ভাই—। হাসলে পাগল, বললে—গান গেয়ে ভিখ ক'রে রস পেয়েছি। উ সব খাটুনি-খুটুনিতে নাই।

—না, তা হবে না। ওঠ্। ভিখ করবি? লাজ লাগবে না?

হা-হা ক'রে হেসে উঠল পাগল—পরিবার না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো, চাল না চুলো, দিন না আত, মাস না বছর; বাঁচা না মরা—আমার আবার লাজ-শরম কিসের?

বনওয়ারী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে—তোর শরম থাকলে কাল এতে এসে তু আমার বাড়ি না এসে করালীর বাড়িতে উঠিস্। তা তোকেই বলি, করালীকেও বলি, বলিস্ ছোকরাকে—বলি, কিছু না থাক, জাতধরম তো আছে? না, তাও নাই?

পাগল একটু ক্ষুন্ন হ'ল, বললে—ই কথা বলছ কেনে ভাই?

—বলছি সাধে! বলছি অনেক দুঃখে। সে ছোকরা কজনাকে নিয়ে চন্নপুরে গেল। বেজাত বেধম্মের আড়ৎ—। বনওয়ারী চুপ ক'রে গেল, আর ভাষা খুঁজে পেলে না সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে—তু বলছিস ভিখ মাগবি। গতর থাকতে ভিখ মাগবি? বলি—ওরে, একটা কথা শুধাই তোকে। যদি তোকে খেতে দিয়ে জাতটি কেউ মারতে চায়, মারতে দিবি?

পাগল বললে—চল, কথার দরকার নাই। চল, আমি যেছি।

যেতে যেতে বনওয়ারী বললে—তা' পরেতে সাঙাত।

—বল সাঙাত।

—তোর কনে কত বড় হ'ল? ভাল আছে?

—এই তোমার পাঁচে পড়ল। তা বেশ ডাগর হয়ে উঠছে দিনে দিনে। এইবার বিয়ে হলেই হ'ল। হাসতে লাগল পাগল। গান ধ'রে দিলে—এ বুড়ো বয়সে সে আমার লতুন নেশা হে।

—সেই গানটি গা দিকিনি।

—কোন্‌টি?

—সেই 'সায়েব আস্তা বাঁধালে'।

পাগলের বাঁধা রেল-লাইনের ঘেঁটুগান। চন্নপুরে যখন প্রথম রেল-লাইন বসে তখন এই ঘেঁটুগান বেঁধেছিল পাগল,এ গান গেয়ে খুব নাম হয়েছিল। আজও কাহারেরা কখনও কখনও গায়।

ঘোষ মহাশয়ের চালে চেপে পাগল গান ধরলে—

ও সায়েব আস্তা বাঁধালে।
হায় কলিকালে!
কালে কালে সায়েব এসে আস্তা বাঁধালে—

ছোকরারা ধুয়ো গাইলে—

ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।
ও সায়েব আস্তা—

ঝপাঝপ খড় উঠছে, ছুঁড়ছে নীচ থেকে। বিচিত্র কৌশলে—উপরে চালে ব'সে বারুইরা বাঁ হাতে ধরছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। পাশে গাদা ক'রে রাখছে। বাঁখারিতে বাঁখারিতে বাবুই দড়ির বাঁধন দিচ্ছে, ঠুকছে, তারপর কোমর থেকে কাটারি বা কাস্তে খুলে দড়ি কেটে আবার সেটা কোমরে গুঁজছে।

বনওয়ারী ঘোষের চালের 'টুই'য়ে অর্থাৎ মাথায় দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে তাগিদ মারছে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে একবার দেখছে উত্তরে চন্নপুরকে, একবার হাঁসুলী বাঁকের ঘেরার মধ্যে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে।

•

হাঁসুলি বাঁকের মানুষগুলি বাঁশবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এতকাল ওই চন্নপুরকে দেখে আসছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার উত্তরে জাঙল, তার উত্তরে পোয়া তিনেক অর্থাৎ দেড় মাইল দূরে চন্নপুর। কাহারেরা বলে—তা খানিক আদেক বেশি হতে পারেন,কমও হতে পারেন। চন্নপুর চিরকাল ভয়ের জায়গা। কাহারেরা সাহেববানদের গোলামি করেছে, তাদের 'আঙামুখ' 'হাঁসাচোখ' লালচুলকে যত ভয় করেছে, ঠিক ততখানিই ভয় করেছে চন্নপুরকে। চন্নপুরের ঠাকুরমহাশয়দের, দোকানদার বণিক মহাশয়দের গেরাম—'ভগবান-ভগবতী' অর্থাৎ দেবদেবীর গেরাম। ঠাকুরদের ছিল সূর্যের মত তেজ,এক রাস্তায় হাঁটতে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপত কাহারেরা; কে জানে বাবা, কোন্ খড়কুটোয় যোগসাজসে ছোঁয়া পড়বে। বণিক মহাশয়দিকে ভয় হিসেবের। বড় বড় মোটা মোটা খাতার গুটি গুটি কালির আখরের লেখন, এক খাতা থেকে এক খাতায়

যায়, সুদে সুদে পাওনা বাড়ে, ওদের দোকানে ধার করলে সে পাওনা পাথরের মত বুকে চেপে বসে। ভগবান-ভগবতীকে আরও ভয়। তাঁরা কত্তাঠাকুর নয়, তাঁরা কালরুদ্র নয়, তাঁদের পূজোর ঘটা কত, মহিমা কত। তাঁদের দরবারে পূজোর থান দূরের কথা—কাহারেরা নাটমন্দিরেও উঠতে পায় না, দূর থেকে দেখতে হয়, তাঁদের ভোগের সামগ্রীতে কাহারদের দৃষ্টি পড়লে ভোগ নষ্ট হয়ে যায়। নানা ভয়ে কাহারেরা সাধ্যমতে ওপথে হাঁটত না।

নীচে থেকে এক আঁটি বাবুই দড়ি হুস ক'রে তার সামনে এসে পড়ল। মুহূর্তে বনওয়ারী সেটাকে ধ'রে ফেললে। ব'সে পড়ল, বাঁধন দিতে লাগল। কাজ জোর চলেছে। পাগল মাতিয়েছে ভাল। যেমন গলা, তেমনি গাইয়ে। সব চেয়ে সুখ ওকে নিয়ে পাল্কী বহনে। এমন ছড়ার বোল ধরবে।

পাগল গেয়ে চলেছে ঘেঁটুর গান—

লালমুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ—
ঘ্যাশ-বিঘ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক—
—ও সায়েব আস্তা—
ও সাহেব আস্তা বাঁধালে—কাহার-কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক।
—ও সায়েব আস্তা—

মধ্যে মধ্যে সেকালে তাদের ডাক পড়ত ওখানকার 'বিয়েসাদী'তে পাল্কীবহনের জন্য। লক্ষ্মীনারায়ণকে বহন করে গরুড় পক্ষী, শিবদুর্গাকে বহন করে দুধবরণ ষাঁড় প্রভু, 'পিথমী'তে বর-কনে—সে ঠাকুর মহাশয়রাই হোন আর বণিকেরাই হোন আর মণ্ডলেরাই হোন আর সেখ সৈয়দই হোন, সকল জাতের বর-কনে—বহন করতে আছে এই 'অশ্বগোত্ত' কাহারেরা। কাহারেরা পাল্কী কাঁধে করলেই পবিত্র। পাল্কী চেপে ঠাকুরেরা চান করেন না। ওই পুণ্যেই তাদের বাড়বাড়ন্ত। সে কর্ম ঘুচিয়ে দিয়েছে ওই চন্নপুরের কারখানা।

কালে কালে কাল পালটায়। কালারুদ্দুর চড়কপাটায় ঘুরে কত বছর এল, কত গেল, কে তার হিসেব করে! আঁধার রাত্রে সুচাঁদ গল্প বলে গাজনের। বনওয়ারীর মত কাহার মাতব্বর যারা, তারা উদাস হয়ে গভীর অন্ধকার-ভরা বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে ভাবে, দিশেহারা হয়ে যায়; কালে কালে কাল কেমন করে পাল্টায়, সে জানে কোপাই-বেটী। দাঁড়াও গিয়ে কোপাইয়ের কূলে। দেখবে, আজ যেখানে দহ, কাল সেখানে চর দেখা দেয়, শক্ত পাথুরে নদীর পাড় ধ্বসে সেখানে দহ হয়।

কিছুটা জানে কালীদহের মাথার বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়' অর্থাৎ এই শিমুল বৃক্ষটি। কত কোটরে ভরা, কত ডাল ভেঙে পড়েছে, কত ডাল নতুন হয়েছে, কত পাতা ঝরেছে, কত ফুলও ফুটেছে, কত ফল ফেটেছে, কত বীজ এখানে ওখানে পড়েছে, কত বংশ বেড়েছে, কত বীজ নষ্ট হয়েছে, ওই উনি কিছু কিছু জানেন। তবে উনি তো কথা যাকে-তাকে বলেন না, বলেন সাধুকে সন্ন্যেসীকে, আর নেহাত যে বাবাঠাকুরের সুনজরে পড়ে তাকে তাকে বলেন—দেখলাম অনেক

কাল বাবা! রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখলাম, কেষ্টঠাকুর কংসকে মারলেন দেখলাম, বর্গীর হাঙ্গামা দেখলাম, সায়েবদের কুঠি দেখলাম, চৌধুরীদের আমল দেখলাম; চন্নপুরের ঠাকুর মহাশয়দের বাবুমশায় হতে দেখলাম, কাহারদের ডাক পড়ল চন্নপুরে—সে তো এই সেদিনের কথা রে বাবা! চন্নপুরের ঠাকুরেরা বাবু হয়ে পিরান পরলেন, মসমসিয়ে জুতো পায়ে দিলেন, ছুত-পত্তিত খানিকটা কম করলেন। না করে উপায় কি বল?

তাঁরা জমি-জেরাদ কিনলেন, টাকা দাদন করতে লাগলেন, ইংরিজী শিখলেন। জমিদারিও কিনলেন কতজনে। চাকরি-বাকরিতে দেশদেশান্তর যেতে লাগলেন। কীর্তনের দল ছিল চন্নপুরে, সে দল ভেঙে হ'ল যাত্রার দল। সে যাত্রাদলের গান বনওয়ারীও শুনেছে অল্পবয়সে। তারপর হয়েছে থিয়েটার। এই কালে কাহারদের ডাক বেশি ক'রে পড়ল চন্নপুরে। বাবু মশায়দের চাষে খাটতে, বাসে খাটতে, মানে—দালান-কোঠার ইট বইতে, সুরকি ভাঙতে কাহার নইলে চলত না। মেয়েদের ডাক পড়ল মজুরনী হতে। একালে তখন সাহেবানদের কুঠি উঠে গিয়েছে, কত্তাঠাকুরের 'কোষে' সাহেব মেম ডুবে মরেছে, কাহারেরা চুরি-ডাকাতিও করে, আবার চাষও করে।

কিন্তু চন্নপুর হাঁসুলী বাঁকের উত্তর দিক হ'লেও আসলে হ'ল দক্ষিণপুরী, ওখানে গেলে ওদের মঙ্গল হয় না। সেকালে ছিল শাপশাপান্তের ভয়, একালে হ'ল অন্য ভয়। মেয়ে হারাতে লাগল। রাজমিস্ত্রী সকলেই প্রায় শেখ ভাই সাহেব, তারা মেয়েদের সঙ্গে 'অঙ' ধরিয়ে কলমা পড়িয়ে বিবি ক'রে ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। বাবুদের চাপরাসীও মেয়েদের নষ্ট করতে লাগল। বাবু ভাইয়েরাও কাহার-মেয়েদের আঁচল ধ'রে টান দিলেন। 'বাস্তনে'র ছেলে তাঁদের পরশ কাহার-মেয়েরা সইতে পারবে কেন, তারাই ফেটে গেল পাপে। মাতব্বরে মুরুব্বিতে বারণ করলে, দু হাত বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়াল—যাস না। যতটুকু না হ'লে নয়, যে যাওয়াটা না গেলে চলবে না তার বেশি ও-পথ হাঁটিস না।

আবার কাল পাল্টাল। চন্নপুরে এল কলের গাড়ি। লোহার লাইন পাতলে, মাটির সড়ক বেঁধে কোথাও বা মাটিতে 'পুল বন্ধন' হ'ল। চন্নপুর হ'ল 'লদী'র ঘাট। পিথিমীর কালের ভাঙনের সকল ঢেউ এসে আগে আছড়ে পড়ে ওই চন্নপুরে। বাবু মহাশয়েরা সে ঢেউ বুক পেতে নিতে পারেন। তাঁরা 'বাস্তন', তাঁরা 'নেকনপঠন' জানেন, ভগবান তাঁদের ঘরে দিয়েছেন রাজলক্ষ্মী, তাঁর কৃপাতে ওই ঢেউয়ের মুখে ঘরে এসে ঢোকে ভালটুকু—যেমন কোপাইয়ের বানে ভাগ্যমন্তের জমিতে পড়ে সোনা-ফলানো পলেন মাটি। কাহারদের বুকে ও ঢেউ লাগলে সর্বনাশ হয়, যেমন কোপাইয়ের বান ভাগ্যহীনের জমিতে চাপায় শুধু বালি, বালি আর বালি। চন্নপুরে রেল-লাইন পড়ল, তাতে বাবুদের জমির দাম বাড়ল, ব্যবসা-বাজার ফলাও হ'ল, আর কাহারদের হ'ল সর্বনাশ। একসঙ্গে এক দল মেয়ে চ'লে গেল। করালীর মা গিয়েছে ওই দলে। হায় রে নিলাজ বেহায়া করালী! আবার এসেছে নতুন ঢেউ—যুদ্ধের ঢেউ। যুদ্ধের ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে চন্নপুরের ঘাটে। চন্নপুরে লাইন বাড়বে। হাতছানির ইশারা দিচ্ছে করালীর হাত দিয়ে কাহারপাড়ায় অবুঝ অবোধদের কাছে। ভুলিস না, ভুলিস না তোরা।

পাগলও এই সময় তার গান শেষ করে—তারও গানে এই সুর। ইচ্ছে ক'রেই বনওয়ারী তাকে এই গানটা গাইতে বলেছে। শুনুক, যে সব ছোকরা মনে মনে উশখুশ করছে অথচ যেতে পারছে না, দুঃসাহস হচ্ছে না—তারা শুনুক, জ্ঞান হোক। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। পাগল গেয়ে নিক আগে—

জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।

গা, তুই গেয়ে যা পাগল—

মেয়েরা ও-পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে—
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে।

করালীর মা গিয়েছে। কে জানে পাখীর দশায় কি আছে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী।

পাগল গান শেষ করে, গায়—

লক্ষ্মীরে চঞ্চল করে অলক্ষ্মীর কারগানা
ও-পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।

বনওয়ারী বললে—তবে? পাগল, সাঙাত আমার, তবে?

—কি তবে?

—করালীর খুব পিঠ চাপুড়েছিস শুনলাম কাল এতে। করালীকে গানটি শোনাস।

পাগল চুপ ক'রে গেল। সে ঠ'কে গিয়েছে। একটু পরে হেসে বলল—তু খুব ফিচেল বনওয়ারী।

বনওয়ারী বললে—পাখীর কথা বলব না, বলতে নাই আমাকে, আমি মামা। তবে তাকে শুধাস, টাকার জন্যে জাত মরবে, সেটা কি ভাল হবে?

•

বৈশাখ মাস। দারুণ রোদ। তার উপর আজ বাতাস নাই। দরদর ক'রে ঘেমে সারা হ'ল কাহারেরা। তবু মনের আনন্দে গান গেয়ে কাজ ক'রে চলেছে। হঠাৎ পাগল বললে—ব্যানো, যা হয়েছে, তা হয়েছে। বাকিটা কোন রকমে আলগা খড় দিয়ে ঢাকো ভাই, গতিক খারাপ।

আকাশের দিকে চাইলে বনওয়ারী। হ্যাঁ, গতিক খারাপই বটে। আকাশ একেবারে ইস্পাতের 'বন্ন' অর্থাৎ বর্ণ ধারণ করেছে। ছায়া ঠিক পড়ে নাই, তবে রোদ যেন 'আমলে' অর্থাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। ঠিক পশ্চিম দিকটা দেখা যাচ্ছে না। একতলা ঘর, নীচু চাল, চারিদিকের গাছপালায় ঢেকে রয়েছে দিকগুলির শেষ সীমানা। তবু ঝড় আসবে ব'লে মনে হচ্ছে। বনওয়ারী মনে মনে ডাকলে বাবাঠাকুরকে।—দুটো দিন ঝড় সামলে দাও বাবা, দুটো দিন। মুখে সে তাগিদ দিলে—কতক লোক কাজ কর, হাত চালিয়ে কাজ কর। কতক ওপরে থেকে আলগা খড়ের আঁটি চাপিয়ে দাও। ছোঁড়, খড় ছোঁড়্। এই ছোঁড়ারা। এই!

হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল—হো—!

ওরে বাপ্‌রে! আচ্ছা গলা! কে? আকাশে আকাশে ছড়াচ্ছে গলার আওয়াজ।

পাগল আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠল।—ব্যানো!

—কি?

—দেখ দেখ!

—কি রে?

—করালী।

—করালী?

—করালী বাবাঠাকুরের শিমূলগাছের ডালে চেপে চেঁচাচ্ছে।

চালে দাঁড়িয়ে উঠল বনওয়ারী। সর্বনাশ! আদ্যিকালের শিমূলবৃক্ষ বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়', সেখানে চেপেছে করালী! পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছে—হো—! ডাকছে। কাকে ডাকছে?

—হো—ব্যানোকাকা—! হো—! হো—!

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বনওয়ারী। ওই উঁচু শিমূলগাছ—কাঁটায় ভরা গদি ডাল। ওর উপর উঠেছে! বাবাঠাকুর যদি ঠেলে দেন! করালীকে লাগছে যেন পুতুলের মত।

—হো—ঝড়—ঝড়! ব্যানোকাকা! পেলয় ঝড়! চাল থেকে নাম। চন্ননপুরে খবর এসেছে তারে। হো—ব্যানো-কা-কা!

নামছে, এইবার করালী নামছে।

পানা বললে—পড়বে। এই—

—পড়ল?

—না, সামলেছে। এই—এই! ওঃ, সামলেছে। আর দেখা যাচ্ছে না।

পাখীর কান্না শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল সকলে। কিন্তু বনওয়ারী কাজ ভোলে না। —খড়, খড়। না ঢেকে কেউ নামতে পাবা না। ঢাক। ঢাক।

পাগল বললে—ব্যানো, এইবার দেখ। কত্তাঠাকুরের বেলগাছ আর শিমূলগাছ এক ক'রে, দেখ।

কত্তাঠাকুরের বেলগাছের পিছনে সাহেবডাঙার ওই 'টেকরের' অর্থাৎ চড়াইয়ের গায়ে আকাশে ও কি? কালচে মেঘের কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে না? হঁ্যা, হাঁ। ওই যে বিদ্যুৎ 'লল্‌পে' অর্থাৎ চমকে উঠেছে ফুঁ-দেওয়া আগুনের আঁচের মত। এই আবার। এই আবার। আসছে তা হ'লে, আজই আসছে। আসছে। নির্ঘাত।

আকাশের 'হেঁড়ে' অর্থাৎ বায়ুকোণে মেঘের তুলোর উপর কোন ধুনুরী যেন তার আঁতের ছিলের আঘাতে আঘাতে পিঁজে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

—আর দু আঁটি খড়, জলদি দাও। মাথাটায় আর দু আঁটি চাপিয়ে দি।—আকাশের দিকে আর একবার চেয়ে দেখে বনওয়ারী চালের উপর শক্ত হয়ে ব'সে মাথায় বাঁধন দিতে লাগল।

—বাস্, নাম, নাম্। নিজে সে মইয়ের ভরসা ছেড়ে চাল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল নীচের খড়ের গাদায়।

—লে—এইবার দে ছুট। ঘর—ঘর চল্।

কাহারপাড়ার নীলবাঁধের মাথায় দাঁড়িয়ে ডাকিনীর মত হাঁক ছেড়ে শাপান্ত করছে নয়ানের মা। ওঃ, একেবারে দু হাত তুলে ডাকছে, নাচছে যেন।

—এস, বাবা এস। ক্ষ্যাপা বাবা আমার! এস।

এল। হাঁসুলী বাঁকের দেশের কালবৈশাখীর ঝড়। কালো মেঘের গায়ে রাঙা মাটির ধুলোয় লালচে 'দোলাই' অর্থাৎ চাদর উড়ছে। কালো কষ্টিপাথরের গড়া বাবা কালারুদ্রের পরনের রক্তরাঙা পাটের কাপড় যেন ফুলে ফুলে উঠছে। হাঁ-হাঁ ক'রে হাঁকতে হাঁকতে আসছে। দু হাত দোলাতে দোলাতে, বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, সামনে যা পারে সাপটে জাপটে ধ'রে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে ফেলতে ছুটে চলে পাগলা হাতীর মত, শিঙ-বাঁকানো বুনো মোষের মত, গাছ ভাঙে মাঝখান থেকে, ডালও ভাঙে, মূলসুদ্ধ উপড়েও পড়ে, পাতা ফুল ছিঁড়েকুটে সারি সারি। চালের খড় উড়ে ভাসতে ভাসতে চ'লে যায় বানভাসি কুটোর মত। তালগাছগুলো যুদ্ধ করে। মাটিতে মাথা আছড়ে পড়তে পড়তে আবার খাড়া হয়ে ওঠে, আবার নামে। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ খেলে, কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকে, সে আলোতে চোখে মানুষ আঁধার দেখে, সে শব্দে কানে তালা ধ'রে যায়, মন শুকিয়ে ভয়ে এতটুকু হয়ে ভাবে, 'পিথিমী' আর থাকবে না। তবু ওরই মধ্যে সাহস ক'রে বনওয়ারীর বউ গোপালীবালা ঝড়ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দেয়, ঘটিতে ভ'রে জল দেয় পা ধুতে; বলে—ঠাকুর, শান্ত হয়ে ব'স। বনওয়ারী ঘরের মধ্যে ব'সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। উঃ, অনেকদিন এমন ঝড় হয় নি! ওরে বাপ্‌রে! কি 'পেচণ্ড' ব্যাপার, 'পলয়' হয়ে যাবে হয়তো!

আলোতে ধেঁধে গেল সমস্ত। কড় কড় শব্দে থরথর ক'রে কেঁপে উঠল পৃথিবী। বাজ পড়ল। কোথায়? ওরে বাপ রে, মাঠের সেই তালগাছটার মাথা জ্বলতে লেগেছে!

ও কি! ও কার ঘর! কার ঘরের চালখানা দেওয়াল ছেড়ে ঝড়ের বেগে উঠছে আর নামছে! নতুন খড়ে ছাওয়া চাল! করালীর ঘর নয়! হ্যাঁ, করালীর ঘরই তো। ঝড় বইছে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে, ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণটা উঠছে আর নামছে। বুনো মোষ যেন শিঙ লাগিয়ে ঠেলে ঠেলে তুলছে চালাখানাকে। গেল, আর বুঝি থাকবে না। ক্রমশ যেন দেওয়াল ছেড়ে বেশি ফাঁক হয়ে উঠছে। এই—এই সর্বনাশ! দেওয়াল ছেড়ে গোটা চালাখানাই ভেসে উঠল আকাশে; চলল, তীর বেগে ভেসে চলল—মাঠের দিকে, ঝড়ের হাওয়ার মুখে। হঠাৎ একটু কাত হ'ল, তারপর হ'ল পুরো কাত—ঘুরপাক খেলে কয়েকবার, নীচে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। হাঁসুলী বাঁকের মাঝ-মাঠে পড়ল।

বনওয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল পাগল।—কার ঘর, ব্যানো?

—করালীর মনে হচ্ছে।

—করালীর?

—হ্যাঁ।

আর তার সন্দেহ নাই। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে এই ঝড়ের মধ্যেও।

করালীর ঘর উড়েছে, তাতে আক্রোশ মেটার আনন্দে নয়ানের মা তারস্বরে এই ঝড়ের মধ্যেই যেন সুরে সুর মিলিয়ে গাল দিচ্ছে। শিউরে উঠল বনওয়ারী নয়ানের মায়ের গালাগাল শুনে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গালাগাল শাপ-শাপান্ত কোন কিছুতে রেয়াত করে না,—ক্ষমা নাই, ঘেন্নাও নাই তার মধ্যে। চোখের মাথা খায়, গতরের মাথা খায়, স্বামী-পুত্রকে যমের মুখে দেয়, ঘর-সংসার জ্বালিয়ে ছারখারে দেবার জন্য ভগবানকে ডাকে। চুল যায় এলিয়ে, অঙ্গের বসন পড়ে খুলে, সেদিকে দৃক্‌পাত করে না ; আক্রোশে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কাহার মেয়ে গাল দিতে দিতে নাচতে থাকে, হাতে তালি দেয়, কখনও কখনও ঢুলতে থাকে। সে সবই বনওয়ারী জানে। শুনতে কটু লাগে, নইলে ওতে কিছু হয় না—এত অভিজ্ঞতাও তার আছে। গত জনমের 'করমদোষে' ছোট জাত হয়ে জন্মেছে, এ জন্মেতে এমন পুণ্যি কিছু নাই যে যা বলবে তাই ফলবে। ভয় 'বাম্ভন'-বৈদ্য বড় জাত মহাশয়দের জিভকে—ও জিভের বাক্যিতে আর শিবের বাক্যিতে তফাত নাই। নয়ানের মায়ের গালিগালাজ শুনে শিউরে উঠে নাই বনওয়ারী। শিউরে উঠেছে নয়ানের মা ঝড়ের মধ্যে যা দেখেছে তাই শুনে। নয়ানের মা হা-হা ক'রে হাসছে আর হাতে তালি দিয়ে বলছে—ম্যাঘের কোণে বাবার বাহন ফণা তুলে উঠেছে। লকলকিয়ে জিভ 'কাড়ছে' অর্থাৎ বার করছে। ফোঁস-ফুঁসিয়ে গজরাচ্ছে। আগুনের আঁচে ঝলসানো অঙ্গের 'ডাহতে' ক্ষেপে উঠে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে ঝড় তুলেছে। আমি চোখে দেখলাম, চোখে দেখলাম। যে মেরেছে পুড়িয়ে, তার ঘর দিলে উড়িয়ে। হে কত্তাবাবা, হে বাবাঠাকুর, তুমি ক্ষেপে ওঠ বাবা। বাহনের মাথায় উঠে দাঁড়াও এইবার। আকাশের বাজ নিয়ে নষ্টদুষ্টু বদজাতের মাথায় ফেলো বাবা। কড় কড় ক'রে ডাক মেরে হাঁক মেরে ফেলে দাও বাজ। পুড়ে ফেটে ম'রে যাক ছটফটিয়ে। হে বাবা! হে বাবা! হে বাবা!

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বনওয়ারী। সেই 'বিচিত্ত' বরণ ভয়ঙ্কর সাপটির পুড়ে মরবার দৃশ্যটি তার মনে প'ড়ে গেল। সুচাঁদ পিসীই কথা প্রথম বলেছিল। তারও মনে কথাটির উপর বিশ্বাস হয়েছিল কিছু কিছু। আজ নয়ানের মা এ কি বলছে! চোখে দেখেছে সে ওই মেঘের মধ্যে তার ফণা, তার জিভ?

পাগল বিস্মিত হয়ে গেল তার ভীতার্ত দৃষ্টি দেখে। সে ঘটনার কিছুই জানে না। শুধু খানিকটা আভাস পেয়েছে মাত্র। তবুও সে বাঁশবাদির কাহার। খানিকটা অনুমান করতে পারছে বনওয়ারীর ভয়। সঙ্গে তারও ভয় লাগছে। সে ভীত কণ্ঠেই ডাকলে—ব্যানো!

—হুঁ।

—কি হ'ল?

বনওয়ারী আঙুল দেখালে আকাশের দিকে।—ওই দেখ।

বনওয়ারী আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। মোটা মোটা জলের ফোঁটা এসে চোখে পড়ছে, তবু সে চেয়ে আছে আকাশের বায়ুকোণের দিকে। বৃষ্টির ধারায় আকাশের ধুলো ধুয়ে নেমে গিয়েছে মাটিতে। বাতাসের বেগে মেঘপুঞ্জের দ্রুত আবর্তন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাদা-কালো মেঘের বিচিত্র বর্ণসংস্থান হয়েছে সেখানে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মানুষের দৃষ্টিতে কত

অপদেবতা দেখা দেয়, বর্ষার আকাশে 'হাতী-নামা' ধরা পড়ে, কোপাইয়ের বন্যায় বড় মশাল জ্বালিয়ে যক্ষের নৌকা আসা দেখতে পাওয়া যায়। আজও নয়ানের মা দেখেছে মেঘের মধ্যে ঝড়ের মধ্যে কত্তাঠাকুরের বাহনকে। বনওয়ারীও যেন দেখতে পাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মেঘের চেহারার মধ্যে সেই মা-মনসার বেটী—কত্তাঠাকুরের বাহন চন্দ্রবোড়া সাপটির দেহের বর্ণবৈচিত্র্যের সঙ্গে মেঘের সাদা-কালো রঙের বর্ণসংস্থানের স্পষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছে।

পাগল বুঝতে চেষ্টা ক'রেও ঠিক বুঝতে পারলে না, বনওয়ারী কি দেখতে পেয়েছে। তবে সেও কাহার, সে আর একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলে মেঘ এবং প্রকৃতির গতিকের মধ্য থেকে। সে ডাকলে শঙ্কিতভাবে গায়ে হাত দিয়ে বনওয়ারীকে সচেতন ক'রে ডাকলে—ব্যানো—ব্যানো! পাথর, পাথর পড়বে! ব্যানো!

—পাথর?

—হ্যাঁ। পাথর।

বৃষ্টি অত্যন্ত মৃদু হয়ে এসেছে। দুটি চারটি কুচি শিল পড়তেও শুরু করেছে।

—ঘরকে চল্।—পাগল বনওয়ারীর হাত ধ'রে টানছে। বনওয়ারী হাত ছাড়িয়ে নিলে। —পাপ করালী! ছাড় পাগল, হাত ছাড়। আগে হে বাবাঠাকুর—ক্ষমা কর তুমি। মাজ্জনা কর।

পাগল টেনে বনওয়ারীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। দেখতে দেখতে শিলাবৃষ্টি প্রবল হয়ে উঠল। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে উঠানে নেমে শিলের টুকরো কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করলে, প্রবীণেরা তাদের ধমক দিয়ে উপরে তুললে। মেয়েরা ছুটে গেল নীলবাঁধের ঘাটে। নীলের বাঁধের জলে আছে হাঁসগুলো। মরবে। ওগুলো হয়তো মরবে। জলে ডুবে অবশ্য ওরা থাকতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?

—আয়—আয়—কোর্—কোর্—কোর্! আয়—কোর্ কোর্ কোর্! তি—তি—তি! চমকে উঠল বনওয়ারী একটি কণ্ঠস্বরে। কালোবউ! কালোবউ দুটো হাঁস বগলে নিয়ে বক্রকটাক্ষ হেনে চ'লে গেল। যাক। ও ভাবনার সময় নাই বনওয়ারীর।

পাগল বললে—ভাগ্য ভাল, ছাগলগুলো ঘরে ঢুকেছে। পাগলের পাশেই ব্যানোর ছাগল চারটে দাঁড়িয়ে জল ঝাড়ছে মধ্যে মধ্যে। রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে রোমন্থন করছে।

শিল পড়ছে অজস্রধারে, ক্রমশ মোটা হচ্ছে আকারে। ঝরঝর শব্দে পড়ছে। চালে ধুপ-ধুপ শব্দ হচ্ছে। জলে চড়-চড় শব্দ উঠছে। নীলবাঁধের পদ্মপাতাগুলো ফুটে-ফেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কাহারেরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখছে শিলাবৃষ্টি। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত থেমে এসেছে। মাঠঘাট ঘরের চাল সব শিলার খণ্ডে ছেয়ে সাদা হয়ে গেল।

* * * *

ঝড়বৃষ্টি শিলাবর্ষণে লণ্ডভণ্ড ক'রে ঘণ্টা দুয়েক পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কাল-বৈশাখী থেমে গেল। অস্ত যাবার মুখে সূর্যও দেখা দিলে। লাল হয়ে গেল আকাশটা।

ঝড়বৃষ্টির পরে কাহারপাড়ার মেয়েরা ছেলেরা ছুটল বন-বাদাড় খুঁজতে। কোথায় ডাল ভেঙেছে, পালা ভেঙে তালগাছের শুকনো পাতা খসেছে। কুড়িয়ে আনতে হবে। প্রবীণ-প্রবীণারা ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লাগল। খড়-কুটোতে ঝড়ে শিলে ছিঁড়ে খ'সে-পড়া গাছের কাঁচা পাতায় উঠোন ছেয়ে গিয়েছে।

নসুবালা সুচাঁদ কাঁদছে তারস্বরে। হাঁসুলী বাঁকের নিয়ম। বসন মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে।

ওদিকে নয়ানের মা এখনও ধেই ধেই ক'রে নাচছে। ওর ঘরের চালও আধখানা উড়েছে। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

পাখী করালীকে বলছে—শোন্ শোন্ কি বলছে হারামজাদী! অর্থাৎ নয়ানের মা।

করালী একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে চালশূন্য ঘরখানার দিকে। মধ্যে মধ্যে বলছে—শালো!—শালো! শালো, নিলি নিলি, আমার ঘরটাই নিলি?

পাগল এসে দাঁড়াল।

করালী বললে—দেখ।

—দেখলাম।

—শালো, আমার উপর দিয়েই গেল হে ঝড়টা!

—পাথর-টাথর বাজে নাই তো?

বেশ হেসে উঠল করালী। বললে—সে এক কাণ্ড। ঘরের মধ্যে খাটিয়ার তলায় গরুর মত—। হো-হো ক'রে হেসে উঠল করালী। বললে—পাখী কিছুতে ঢুকবে না। টেনে, বুয়েচ কি না ছেঁচড়ে ঢোকালাম। তা'পরেতে খট-খট পট-পট—ওঃ।

মাথলা নটবর এল। মাথলা বললে—আঃ, এমন সুন্দর ক'রে ঘরখানা সাজালে—

—দূর শালো। আবার করব। শালোর চালকে এবার লোহার তার দিয়ে বাঁধেঙ্গা। দেখ্ না।

তারপর বসল ওদের মজলিস। করালীর মজলিস।

পাগল ধীরে ধীরে অনেক বুঝালে করালীকে। বনওয়ারীর কথা তার মনে লেগেছে।

শেষে বললে—বনওয়ারী একটা কথা দামী বলছে। বললে, টাকা দিয়ে যদি কেউ বলে—জাতটি দাও, দেবে তুমি?

হো-হো ক'রে হেসে উঠল করালী। বললে—জাত? জাত লেয় কে? তার ঘর কোন্-খানে? বলি, জাত মারে কে?

—জাত মারে কে!—অবাক হয়ে গেল পাগল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। জাত মারে কে? জাত! জাত যায় পরের এঁটো খেলে, কুড়োলে। ছোঁয়া খেলে যায় না। জাত ওদের গিয়েছে, আমার যায় নাই। বুয়েচ? আমার জাত মারে কে?

পাগল ঘাড় নেড়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল কথাটা। কথাটার মানে নাই, কিন্তু কথাটা কথার মত কথা বটে। ডাকাবুকোর কথা, জবরদস্তের কথা। বেশ কথা।

একজন এসে ডাকলে বাইরে থেকে।—পাগলদাদা, মাতব্বর ডাকছে।

—কেনে রে? এই তো এলাম!

—মিত্তি-গোপালপুরের মিত্তি মশায়ের ঘরের নোক এসেছে। বিয়ে। দুখানা পাল্কীর কাহার চাই। আইবিশের দল চাই।

চার

'ঘোড়াগোত্ত' কাহারদের ডাক এসেছে। বর-কনের পাল্কী বহন করতে হবে। ইলাম বকশিশ—কাপড়, পুরানো জামা, মদ, পেট ভ'রে লুচিমণ্ডা। যেতে হবে বইকি। তারা যাবে। আট-পৌরেদের 'রাইবেঁশে'র দল আছে, ওদের ও নিয়ে যাবে। আলাদা হ'লে ওরাও কাহার, তারাও কাহার। পরমকে বলা যাক। পরমের ঘরে কালোশশীকেও একবার দেখে আসা হবে।

এই খানিক আগে, শিলাবর্ষণের সময়ে কালোশশী এসেছিল নীলবাঁধ থেকে হাঁস তুলে নিতে। যাবার সময়ে বক্র-কটাক্ষ ক'রে গিয়েছে। সম্ভবত রাগ করেছে সে। রাগ হবারই কথা। বনওয়ারীরই মধ্যে মধ্যে রাগ ধরে নিজের উপর। মাতব্বরির পদ মনে হয় যেন আগুনে তপ্ত শালের উনোনের খবরদারির আসন। মাতব্বর যদি সে না হ'ত কালোশশীকে নিয়ে এই বয়সেই সে চ'লে যেত দেশান্তরের কাহার-সমাজে। তাকে সাঙা ক'রে ঘর বাঁধত শুধু মাতব্বরির জন্য—। ভাবতে ভাবতে নিজেই শিউরে ওঠে বনওয়ারী। বহু ভাগ্যের মনুষ্যজন্ম পেয়েও পূর্বজন্মের হীন কর্মের জন্য নীচকুলে জন্ম হয়েছে, ঘোড়াগত্ত কাহার, মানুষ হয়েও ঘোড়ার মত উচ্চকুলের মানুষদের বহন করতে হয়, পাল্কীর ডাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে, খাঁটা পড়ে সেখানে। বাঁকা বইতে হয়। মনিব-বাড়ির মরা গরু মোষ কুকুর বিড়াল ফেলতে হয়েছে এককালে—কালের গুণে বহু কষ্টে বনওয়ারীর মাতব্বরির আমলেই তা থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু চরণের তলে তো থাকতেই হবে চিরকাল। এসব পূর্বজন্মের ফল। আবার এজন্মে মন্দ কাজ ক'রে কাহার থেকেও নীচকুলে জন্মাবে? কালারুদ্দের চড়কের পাটায় সে চেপেছে এবার। চড়ক-পাটার লোহার কাঁটায় শুয়ে আকাশপানে চেয়ে ডেকেছে বাবাকে। বাবা দয়া করেছেন, আবার সে পাপ করবে? আবার? না। না। ক্ষমা কর, প্রভু, ক্ষমা কর।

কিন্তু দেখতে, দেখা করতে দোষ কি? তাতে তো পাপ নাই? কালোশশীকে দেখবে। বুঝিয়ে বলবে তাকে—এ জনমে হ'ল না ভাই, আসছে জনমে যাতে তুমি পাও আমাকে, আমি পাই তোমাকে—তার লেগে বাবার থানে দু বেলা পেনাম ক'রো। কালারুদ্দের থানে বটগাছের নামালে ঢেলা বেঁধো। আমিও তাই করব। আর মনের আগুনে পোড়ো, আমিও পুড়ি, পুড়ে পুড়ে খাঁটি হই, জ্বলুক। দিবানিশি কুলকাঠের 'আঙোরা'র মত ভালবাসার আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলুক। ওই পুণ্যেই পাব আমরা দুজন দুজনকে।

রতন প্রহ্লাদ এবং ছোকরারাও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠছে। অনেক দিন পর মোটা পাওনার ভাল বায়না এসেছে। উৎসাহে সদ্য এতবড় ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির কথা ভুলে গিয়েছে। 'বাত' অর্থাৎ আবহাওয়া হয়েছে ভাল। এই জল এবং শিলাবৃষ্টির পরদিন হবে ঠাণ্ডা। ওদিকে মাঠে

হয়েছে কাদা, সেখানে কাজ নাই। মুনিবদের চাল ভিজে ডব-ডব করছে, ও চালে এখন কদিন চাপা যাবে না, 'নিশ্চিন্দি' অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে চল সব।

মিত্র-গোপালপুরে কায়স্থ মহাশয়দের উন্নতির অবস্থা। জাঙলের ঘোষ মহাশয়ের চেয়েও বাড়বাড়ন্ত। তাদের ছেলের বিয়ে। ধুমধামের বিয়ে। 'বেলাতী বাজনা, 'গড়ের বাদ্যি' ঢোল সানাই রসুনচৌকি, খ্যামটা নাচ, রায়বেঁশে—সে অনেক কাণ্ড। কাহারদের কপাল ভাল—বিয়ে রেলরাস্তায় নয়, গাঁয়ের পথে। আট আট যোল বেহারার দুখানা পাল্কী যাবে। লুচি মিষ্টি পোলাও মাছ মাংস, পেট পুরে খাওয়া—থমথমে অথচ চরণ ঠিক রাখা। তারপর সঙ্গে বিড়ি সিগারেট, ভাল কাষ্টগড়ার তামাক—মধুর মধুর গন্ধ, এ তো কাহারেরা ম'রে স্বর্গে গেলেও পাবে না। তার উপর প্রতিজনের এক-একখানা লাল গামছা কনের বাড়ির বকশিশ।

বরের বাড়ির বিদায়। এ কি ছাড়া চলে? আর কাহারেরা ছাড়লেই বা মিত্র মহাশয়েরা শুনবেন কেন? আর তো কলের গাড়ি—মোটর গাড়ির আমদানি হয়ে কাহারদের রেহাইই দিয়েছেন ওঁরা, নেহাত কাঁচাপথ হ'লেই ডাকেন। এ না করলে চলবে কেন? এই পথের জন্যেই পাল্কীকাহার চাই, নইলে মিত্র মহাশয়রা ভাড়ার মোটর, বাস-মোটর আনতেন।

আট ক্রোশ ক'রে যোল ক্রোশ পথ। খানিকটা পাকা, তারপর ক্রোশ ছয়েক কাঁচা গরুর গাড়ির পথ—মাঝখানে খানিকটা আলপথ।

পাল্কী নইলে উপায় নাই। কাহারদের সৌভাগ্য।

পাগল আসতেই তার পিঠ চাপড়ে বনওয়ারী বললে—যেতে হবে সেঙাত। শুনেছ তো?

পাগলের খুব ইচ্ছে নাই, তবুও সে বললে—চল। আজই সকালে কুলকম্ম নিয়ে বনওয়ারী তাকে যে সব কথা বলেছে, তাতে 'না' বললে বিচ্ছেদ হবে হয়তো।

—নাচ খানিক, নাচ।

পাগল নাচলে না। ব'সে পড়ল দাওয়ার উপর। তার মনে এখনও ঘুরছে করালীর কথা। তা ছোকরা খুব জবরদস্ত কথা বলছে—জাত মারে কে? তার ঘর কোথা? বটে, কথা ঠিক বটে। তুমি যদি ঠিক থাকো তো জাত মারে কে? আবার বনওয়ারীর কথাও ফেলনা নয়, পিতিপুরুষের কথা। সে ভাবছে।

বনওয়ারী পাগলের ভাবগতিক দেখে বিস্মিত হ'ল। বললে—তোর হ'ল কি বল দিনি?

—বলব। গোপনে বলব। কঠিন কথা। বুয়েচ? মাথা ঘুরে যাবে।

বনওয়ারীর প্রাণে আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে। পাগলের কথায় সে খুব চিন্তিত হ'ল না; সেই পাগল তো! তার উপর করালীর ঘর উড়ে যাওয়ার পর, করালীর দম্ভের কথা সে ভাবতেই পারে না। করালীর ঘরখানা উড়ে যাওয়ায় দুঃখ হ'লেও সে খুশি হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখও হয়েছে, খুশিও হয়েছে। দুঃখ—ঘরখানা, এমন ঘরখানা গেল। খুশি—ফাঁড়া কেটেছে, পাপের অপরাধের দণ্ড ওই ঘরখানার চালের উপর দিয়ে গিয়েছে। সে তো চোখে দেখেছে মেঘের মধ্যে বাবার বাহনের রূপ। যাক, ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। এবং মনে মনে ধারণাও হয়েছে যে, করালীচরণ নিশ্চয় মনে মনে বুঝছেন। বাবাধন আজই উঠেছিলেন বাবাঠাকুরের আদ্যিকালের শিমুলবৃক্ষে।

অনেক উঁচুতে উঠে খুব উঁচু হয়েছেন ভেবেছিলেন। তা এক ঝাপটে শাসনের নমুনা খানকটা দেখিয়ে দিলেন বাবা ; এবং এটাও নিশ্চয় যে, এই বনওয়ারী যদি বাবাঠাকুরকে না সন্তুষ্ট করত, তবে করালী এত অল্পে রেহাই পেত না। হয়ত বজ্রাঘাতই হয়ে যেত আজ।

সে চ'লে গেল আটপৌরেপাড়ার দিকে। পরমের উঠানে গলার সাড়া দিয়ে ডাকল—পরম! পরম রইছিস ?

বেরিয়ে এল কালোশশী। পিচ কেটে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ও বাবা। পুণ্যিবান মাতব্বর! কি হে ?

ভুরু নাচিয়ে ইশারা ক'রে বনওয়ারী প্রশ্ন করলে—কই ? সে কোথায় ? অর্থাৎ পরম।

বিচিত্র হাসি হেসে কালোবউ বললে—কে জানে ? হয়তো পেনয়িণীর বাড়িতে। তা তুমি ? তুমি কি মনে ক'রে ? পথ ভুলে ?

কিছুদিন আগের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল বনওয়ারীর, সে বলল—পুণ্যির ভাগ দেবার কথা ছিল ভাই, তাই ভাগ এনেছি।

উত্তরে রসিকতা না ক'রে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে কালোশশী চাপা গলায় বললে—আসছে।

—পরম ?—ঘুরে তাকাল বনওয়ারী। পরম বেশ মদ খেয়েছে। টলতে টলতে আসছে।

—ক্যা ? ক্যা রে ? কোন্ শালো ?

গম্ভীর স্বরে বনওয়ারী বললে—আমি রে পরম।

—তুমি ক্যা রে ? আমিও তো আমি রে।

—আমি বনওয়ারী।

—বনওয়ারী ?

—হ্যাঁ। মিত্তি-গোপালপুরের বিয়ের বায়না এয়েচে। কাহার, আইবিশে চাই। তাই খবর দিতে এয়েচি।

—হুঁ। মিত্তি-গোপালপুর ? খুব ধুম! লয় ?

—হ্যাঁ। তা যাবি তো ?

—তা যাব। কিন্তুক—

—কি ?

—তোর সঙ্গে আমার—বুল্লি কিনা, আমার একটা কাজ আছে।

—কি কাজ ?

—আছে। আছে। বুল্লি কিনা, খুব দরকারী কাজ। তা—।

—বল্ কেনে।

—উঁ-হুঁ। বলব, সে একদিন বলব। বুয়েছিস ? বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলব। তা, আজ লয়। বিয়েটা সেরে আসি, বুল্লি ? কি বল্ ?

—বেশ, তাই বলিস।

বনওয়ারী ফিরল। এই সব পেঁচি মাতালের সঙ্গে তার বনে না। মদ খাবে—মদ কাহারদের

পোষ্টাই, তা খাও, কিন্তু টললে চলবে কেনে? পেঁচি মাতাল। কিন্তু এদিকে আবার সামনে কে?

সে হাঁকলে—কে?

—আমি?

—কে তু?

—আমি পানু—পানকেষ্ট।

—পানা? পা থেকে মাথায় রক্ত উঠতে লাগল বনওয়ারীর।—তু এখানে?

—মুনিব-বাড়ি যেয়েছিলাম। বাড়ি যেছি।

—হুঁ। বুঝেছে বনওয়ারী। পানা এখনও পাক দিচ্ছে সুতোয়। দে, তা দে। বনওয়ারী ভয় করে না।

পানু বললে—তুমি? পরমের ঘর আইছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। বায়না আছে আইবেশের। মিত্তিবাড়িতে।

—তুমি সিরগাটটি খাও। আমার মুনিবের ছেলে স্কুলে পড়ে তো, সিরগাট খায়। আজ পকেট থেকে বার ক'রে একেছিল কুলুঙ্গীতে, আমি এক ফাঁকে বুল্লে কিনা—। হাসতে লাগল পানা। আবার বললে—তা চুরি করাই সার হ'ল। দুটির বেশী ছিল না বাক্সতে। আমি একটি খাব, তুমি একটি খাও।

নিমতেলে পানু ভেতরে তেতো, বাইরে মিষ্টি। বিলাতী নিমের কথা শুনেছে বনওয়ারী, ও সেই বিলাতী নিম। পানু হেসে বললে—ধর্মের কল বাতাসে ল'ড়ে গেল। পিতিফল হয়ে গেল।

বনওয়ারী কোন উত্তর দিলে না।

পানু ব'লেই গেল—ঘর উড়ল করালীর। এত বড় সহ্য হবে কেনে? লতুন ছাওয়ানো ঘর। বাবাঠাকুরের কোধ। একটু চুপ করে থেকে বললে—বাবাঠাকুর ওকে লেবেন, বুয়েচ? এ আমি নিশ্চয় বললাম। তার পমাণ আমি পেয়েছি।

অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা দূর থেকে কে উত্তর দিয়ে উঠল—তা আবার পাবি না? তু ব'লে কত পুণ্যাত্মা, কত তোর সাধন ভজন, তু আবার পমাণ পাবি না? বলে, সেই পুণ্যির ছটায় আনারে আলো হয়। নখে তোর তিন কাল, চোখের দিষ্টিতে বক মরে, ঝুলিতে তোর সিঁদকাঠি —তু আবার পমাণ পাবি না?

নসুবালা। কণ্ঠস্বর আর কথার ভঙ্গিতে চিনতে দেরি হ'ল না নসুবালাকে। পানু চুপ ক'রে গেল। বনওয়ারী বললে—নসু?

—হ্যাঁ। নসুবালাই বটি আমি।

—কোথা যাবি?

—মিত্তিবাড়ি চললাম। ওদের লোক পেয়েছি, চ'লে যেছি।

মিত্র-বাড়ির যে লোক বায়না দিতে এসেছে, তারই সঙ্গে নসুবালা চলেছে। মিত্র-বাড়ি। এ অঞ্চলে বিয়ে-বাড়িতে নসুবালার বাঁধা নিমন্ত্রণ। ও নিজেই নেয় নিমন্ত্রণ। গিয়ে হাজির হয়। পরনে মেয়ের সাজ, নাকে নথ, মাথায় খোঁপা, গায়ে গয়না, কাঁধে ঝুড়ি। গিয়ে, ঝুড়িটি রেখে

প্রণাম ক'রে বলে—এয়োদের মঙ্গল হোক। এলাম মাঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণরা। এঁটোকাঁটা ফেলব, পাট-কাম করব, গান শোনাব, নাচব। যাবার সময় একখানি শাড়ি লোব, খাবার লোব, গুণগান ক'রে নাচতে নাচতে বাড়ি যাব।

নসু তাই চলেছে। বনওয়ারী হাসলে। পানা পালাচ্ছে হন হন ক'রে। নসুবালার তা চোখ এড়াল না। সে তার সিগারেটের আগুনটাকে চলতে দেখে বুঝতে পারছে। সে বললে—আজ ঘর উড়েছে, কাল হবে। বলেছে, এবার লোহার তার দিয়ে বাঁধেঙ্গা। বুঝলি রে সিড়িঙ্গি!

পরের দিনই করালী ঘর মেরামতের আয়োজনে লেগে গেল। ভোরে উঠেই চ'লে গেল চন্নপুর, সেখান থেকে দু দিনের ছুটি নিয়ে ট্রেনে কাটোয়া গিয়ে ফিরল বিকেলে। ফিরল একেবারে ছুতোর মিস্ত্রি সঙ্গে নিয়ে। শুধু আপসোস হ'ল, বনওয়ারীর বাড়িতে নাই। থাকলে দেখিয়ে দিত চন্নপুরের কারখানার কাজ করার মুরদটা। ওরাও সব আজ খেয়ে দেয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে মিত্তির-গোপালপুর বিয়ের পাল্কী বইতে। সুচাঁদ বললে—উ কি আমার যে-সে নাক! মোটা চাকরি করে। সায়েব হ'ল মুনিব। সেকালে কুঠীর সায়েবেরা মুনির ছিল, তখনকার কাহারদের মত ভাগ্যি আমার করালীর।

করালী এ কথাতে চ'টে গেল।—বেশি বকিস না। সায়েবদের পাল্কী বহন করি না আমি।

সুচাঁদ বুঝতে পারে না, করালীর এতে রাগ করার কি আছে! এ নিয়ে ঝগড়াও একটা বাধতে পারত, কিন্তু করালীই ক্ষান্ত হ'ল। নিজের যুক্তির মধ্যেই জোর পায় না করালী। পাল্কী না বইলেও এই সেদিন ছোট একটা খালের ঘাটে তাকে দশজন সাহেবকে কাঁধে তুলে পার করতে হয়েছে। যুদ্ধের জন্য সায়েব এসেছে অনেক।

উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক হয়ে গেল। পরের দিন কিনে-কেটে নিয়েও এল সব। কিন্তু করালীর সবই আশ্চর্য! নতুন বাঁশ কেটে দড়ি কিনে খড় কিনে পুনরায় চাল তৈরি করবার ঠিকঠাক ক'রে সে হঠাৎ ঘোষণা ক'রে দিল—উঁহু, থাক্।

থাকবে কি? এবং কেন? পাখী বললে—মর্ মর্ মর্, ঢঙ দেখে বাঁচি না।

—ঢঙ লয়, ঘরের চাল উড়েছে—ভালই হয়েছে, এবারে 'নেপাট' ক'রে ভেঙে নতুন কোঠাঘর করব।

—কোঠা?

—হ্যাঁ, ওপরে শোব। নামোতে আন্না হবে, হাঁড়িকুঁড়ি থাকবে।

পাখী আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল করালীর মুখের দিকে। লোকজন বিদায় হতেই সে ছুটে এসে দুই হাতে করালীর গলা জড়িয়ে ধ'রে পা গুটিয়ে ঝুলতে লাগল মহানন্দে।

করালী অনেক ভাবলে, গবেষণা করলে, বললে—ঘর করব পুবদুয়ারী, পচি বাগে থাকবে সিঁড়ি। দখিন দিকে আর পুব দিকে দুটো 'বারজালা' হবে। ইস্টিশান থেকে নোয়ার তার আনব, ইস্টিশানের টিনের ঘরে কোণে কোণে যেমন তার দিয়ে বেঁধে মাটিতে খুঁটো পুঁতে বাঁধন দিয়ে টান

দেয়, তেমনি টান দোব। দেখি, বেটার ঝড় এবার কি ক'রে ঘর ওড়ায়?

পাখীর নাচবার কথাই। পাখী সত্যই নাচল। নসুবালা নাই, সে গিয়েছে বিয়ে-বাড়ি নাচতে, এঁটো পরিষ্কার করতে। সে থাকলে ছড়া কেটে কোমর ঘুরিয়ে নাচত। বসন ভালমানুষ লোক, উচ্ছ্বসিত হওয়া তার স্বভাব নয়, সে শুধু হাসলে। সুচাঁদ প্রথমটা হাসলে, ছড়া কাটলে, তারপর কাঁদলে পাখীর বাপের নাম ক'রে—তুই কোথা গেলি বাবা, দেখে যা রে, পাখীর কোঠা হবে রে।

লোকে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হাঁসুলী বাঁকের ঘর ঝড়ে উড়লে বা আগুনে পুড়লে লোক ঘরের দেওয়াল অবশ্য আধ হাত এক হাত উঁচু ক'রে চাল তোলে, কেউ কেউ উপরের নতুন দেওয়ালে হাঁড়ির মুখ বসিয়ে একটু-আধটু বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা ক'রে নেয়। বানে ঘর পড়ে গেলে নতুন ক'রে পছন্দমত ঘর তৈরি ক'রে ছোটখাটো জানলাও রাখে; ঘরদোর হয়ে গেলে বলে—মা-কোপাইয়ের দয়াতে এ এক রকম ভালই হয়েছে।

যাদের ভাঙে নাই, তারা আপসোস ক'রে বলে - আমার ঘরখানা পড়লে বাঁচতাম। শুধু একপাট ছ্যাল প'ড়েই ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অইল যি

সেই সায়েবডোবা চৌধুরী-বাড়িতে মা-লক্ষ্মী এসেছিলেন বানে, সেই বানে গোটা কাহার-পাড়া ভেঙেছিল। সেবার নতুন ক'রে হয়েছিল কাহারপাড়া। তার আগে নাকি কাহার-পাড়ার ঘরগুলিতে কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সেবার নতুন ক'রে কাহারপাড়া তৈরি হ'ল, ঘরগুলি বর্তমানের আয়তন পেয়েছিল। এখন মাঝখানে মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু চার কোণে এখনও মাথা ঠুকে যায়। এখন কাহারপাড়ায় যে বড় ঘরগুলি দেখা যায়, সেগুলি সবই বানে ভেঙে যাওয়ায়, ওই মা-কোপাইয়ের দয়ায় হয়েছে। সেগুলির কোণেও আর মাথা ঠুকে যায় না, দেওয়ালে উপর দিকে ছোট জানলাও আছে। কিন্তু করালীর এ যে বিষম কাণ্ড! ঝড়ে ঘরের চাল উড়ল, দেওয়াল খাড়া আছে, সেই দেওয়াল খরচ ক'রে ভেঙে নতুন ঘর! তাও আবার কোঠাঘর! যা কখনও কাহারপাড়ায় হয় নাই।

বসন করালীকে ডেকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলে—বাবা, কোঠাঘরে খরচা অ্যানেক। তা—

করালী তাকে অভয় দিলে—তার লেগে তুমি ভেবো না।

বসন পাখীকে জিজ্ঞাসা করলে—হাঁ লো, টাকা কতগুলি আছে বল্ দিনি?

—লবডঙ্কা।

—তবে?

—ধার করবে। ইস্টিশানে একজনা টাকা ধার দেয়।

—ও মা গো! বসন শিউরে উঠল।—ধার করবে কি লো?

—হ্যাঁ। হপ্তা হপ্তা সুদ মিটিয়ে দেবে। আর কিছু কিছু আসল দিয়ে শোধ করবে।

অবাক হয়ে গেল বসন। আবার সে গেল করালীর কাছে! করালী তাকে জলের মত বুঝিয়ে দিলে। চন্নপুর ইস্টিশানে একজন মাড়োয়ারী আছে, সে গোটা ছোট লাইন বরাবর লাইনের বাবু থেকে আরম্ভ ক'রে কুলীদের পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। টাকায় নেয় এক আনা হিসাবে সুদ, সপ্তাহে

সপ্তাহে এক পয়সা হিসেবে টাকায় সুদ সে আদায় নেয়। মাসের শেষে কিছু ক'রে আসলে উসুল চায়। দিতে পার ভাল, না পার তম্বি নাই। আর তিন মাসের মাসে আসলে উসুল কিছু চাই-ই। করালী তার কাছেই এক শো টাকা নেবে। সপ্তাহে তার রোজ এখন আট টাকা চার আনা—ইষ্টিশানে দুটো-চারটে মাল বয়, তাতেও টাকা দুয়েক হয়। এই দশ টাকা চার আনা থেকে সপ্তাহে সুদ তাকে দিতে হবে এক টাকা 'ল' আনা। থাকবে আট টাকা এগারো আনা। মহাজন মাড়োয়ারী বলেছে, ও থেকে যদি করালী সপ্তাহে আড়াই টাকা হিসেবে আসলে উসুল দিয়ে যায় তো মোটা হিসেবে দশ মাসে এক শো টাকা শোধ হয়—সূক্ষ্ম হিসেব সে পরে ক'রে দেবে। এবং সে হিসেব সে মাস্টারবাবুকে দিয়ে যাচাই ক'রেও নেবে। বিশ্বাস না হ'লে শাশুড়ী মাথলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারে, সেও চাল তৈরী করবার জন্য তার কাছে তিরিশ টাকা ধার নিচ্ছে। নটবরকেও জিজ্ঞাসা করতে পারে। মাথলা নটবর এরা যখন চাষ ছেড়ে লাইনের কাজে ঢুকেছে।

বসন আরও অবাক হয়ে গেল। এমন ধারার লেন-দেনের কথা সে কখনও শোনে নাই। হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় এ হিসেব—এ কারবার নতুন। জাঙলের মণ্ডল মহাশয়দের সঙ্গে কারবার তাদের অন্যরকম। ধান নেয়। এক মণ নিলে দেড় মণ দিতে হয়, শোধ না গেলে সুদে আসলে এক হয়ে আবার সুদ টানে। টাকা নেয়, ধার নয়—দাদন। সারের উপর দাদন, দুধের উপর দাদন। নগদ সার বেচাকেনা হয় টাকায় তিন গাড়ি, চার গাড়ি, চার গাড়ি দরের সারের দাদনের দর—সাড়ে পাঁচ গাড়ি। টাকায় ষোল সের দুধ, দাদন নিলে দুধের দর দিতে হয় টাকায় বাইশ সের। পাঁচ টাকার উপর দাদন হ'লে দর দিতে হয় চব্বিশ সের। দশ টাকার বেশি দাদনই নাই। ঘটি, বাটি, রূপোর গয়নাও দু-এক পদ বাঁধা দিতে হয় কঠিন বিপদে। তার হিসেব অত্যন্ত জটিল, সে ওরা বুঝতে পারে না, বুঝতেও চায় না, কারণ সে আর কখনও ফেরে না। সুতরাং এমন লেনদেনের কারবার বসনের কাছে পরমাশ্চর্যের কথা।

পৃথিবীতে যা আশ্চর্য, তাই হাঁসুলী বাঁকে ভয়ের বস্তু। আশ্চর্যকে ঘেঁটে দেখে তার স্বরূপ নির্ণয় করার মত বুদ্ধির তাগিদ ওদের নাই। যদি বা আদিকালে কখনও ছিল, বার বার ঘা খেয়ে খেয়ে তা ম'রে গেছে। সাহেব সদ্গোপ বাবুদের শাসন ঠেলে কখনও তা কঠিন এবং ধারালো হয়ে আশ্চর্যকে ভেদ ক'রে ছেদ ক'রে দেখবার মত নির্ভয় বিক্রম লাভ করতে পারে নাই। বসন তাই শঙ্কিত হয়ে উঠল এ প্রস্তাবে। সারাদিন চিন্তা ক'রে সে কোন উপায় দেখতে পেলে না করালীকে নিরস্ত করবার। অবশেষে মনে পড়ল বনওয়ারীকে। সন্ধ্যায় করালীকে ডেকে সে বললে—আমি বলি কি বাবা, আজ কাল দুটো দিন সবুর কর।

করালী আজই কাজ শুরু করতে বদ্ধপরিকর। পুরানো ঘরখানাকে সে তার বন্ধু দুজনকে নিয়ে ভেঙে ফেলতে চায়। সে বললে—সবুর কেনে? কিসের সবুর?

—এই বনওয়ারীদাদা, অতনদাদা, পেল্লাদদাদা—এরা ফিরে আসুক। এদের সব শুদিয়ে-আবিয়ে যা বলবে সবাই, তাই করবে।

করালী হেসেই খুন—আমি ঘর করব তা শুধাব কাকে?

—শুধাতে হয়। মাতব্বরকে তো শুধাতে হবে। একটা রনুমতি নিতে হয়। বিয়েসাদীর মতন এটাও তো শুভকাজ।

—উঁহু, রনুমতি আমার লেখা আছে, হঠাৎ হেসে সে বললে—রনুমতি? কার রনুমতি, কিসের রনুমতি? আমি করব ঘর, আর রনুমতি দেবে মাতব্বর! উঁহু। লে, লে, চালা গাঁইতি। সে নিজেই দেওয়ালে উঠে কোপাতে লাগল।

আশ্চর্যের কথা, ঠিক সময় ছুটতে ছুটতে সুচাঁদ এল, হাঁপাচ্ছিল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—না না না। কোঠাবাড়ি করতে পাবি না—পাবি না—পাবি না।

—যা ম'ল। তু আবার সঙ্‌ করতে এলি কেনে?

—ওরে কেউ কখনও করে নাই। কাহারপাড়ায় কোঠাঘর করলে তু ম'রে যাবি। সইবে না।—সুচাঁদ গিয়েছিল গুগলি তুলতে, সেই পুকুরের জলে গুগলি খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়েছে কথাটা, যা পিতিপুরুষে করে না, তা করতে নাই। সয় না। সহ্য হয় না। মানুষ ম'রে যায়।

সুচাঁদ কাঁদতে লাগল। কথাটা বসন্তের মনে হ'ল। সেও শিউরে উঠল।

সুচাঁদের কথার কোন জবাবই দিলে না করালী। সে ভাঙতে লাগল ঘর। আঃ, বনওয়ারী কবে ফিরবে!

* * *

মাথলা নটবর এরাও মুখ ফুটে ব'লে ফেললে—হ্যাঁ ভাই, মাতব্বরকে একবার শুধাবি না? সে এসে যদি আগ-টাগ করে?

করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলোকে পিছনে ফেলে দিয়ে বললে—আগ করে ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাবে। মাতব্বর কে রে? আমার মাতব্বর আমি। তারপর হঠাৎ বললে—চল্‌।

—কোথা?

—চল্‌। আজ আবার শিমুলগাছে উঠব। সেদিন গাছে উঠেছিলাম ব'লে নাকি ঝড়ে আমার ঘর উড়েছে। আজ আবার গাছে উঠব। আজ কি হবে হোক।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলল। মাথলারা সভয়ে অনুসরণ করলে। না ক'রে উপায় নাই। করালী এখন ওদের সর্দার যে। চন্ননপুরে ওর তাঁবেই বেচারাদের খাটতে হয়।

করালী বললে—ভাল করলে মন্দ হয় কিনা! চন্ননপুরে তারে খবর এল—পেচণ্ড ঝড় আসছে। তুদিকে পেলাম না, ছুটে গাঁয়ে এলাম—গেরাম সাবধান করতে। এসে দেখি, গাঁয়ের মরদরা সব জাঙল গিয়েছে ঘোষেদের ঘর ছাওয়াতে। কি করি? আকাশ দেখি কালচে হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, চারদিকে ঝোপের আড়ালে চালে ব'সে ঠাওর পায় নাই। উঠে পড়লাম শিরীষ গাছে। উঠে দেখি, পচি দিকে—অঃ, সে কি ঘটা, কি বলব মাইরি! তা শিরীষ গাছটা তো খুব উঁচু লয়, দেখে সুখ হ'ল না। তখন উঠে পড়লাম ওই গাছটাতে। বলিহারি! বলিহারি! সে আচ্ছা বাহার হয়েছিল!

নটবর বললে—হয়েছিল, দেখেছিলি, বেশ করেছিলি। আজ আর থাক্। কাজ কি দেবতার গাছে উঠে?

শিমূলগাছটার কাণ্ডটা বিশাল, ওটাকে আঁকড়ে ধ'রে ওঠা অসম্ভব। করালী কাণ্ডটার গায়ের কোটর ধ'রে উঠতে শুরু ক'রে দিলে। উপরে প্রথম ডালটায় উঠে নটবরের দিকে থুথু ফেলে বললে—ভাগ্ শালা।

তারপর বললে—বাঃ, এখান থেকে দয়ে ঝাঁপ দিতে ভারি সুবিধে মাইরি।

—এই, এই, দয়ে কুমীর আছে, বাবাঠাকুর আছে।

—তা বটে! কুমীর থাকতে পারে।

দয়ে ঝাঁপ খাওয়া মুলতুবী রেখে উপরের দিকে উঠতে লাগল সে। উঠে সে আজ আবার হাঁক মারলে—হো—

অর্থাৎ দেখ, তোমরা দেখ, আবার আমি উঠেছি শিমুলগাছে—

গোটা কাহারপাড়া সে হাঁক শুনে গাছের দিকে সভয়-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

পাঁচ

বিয়ের পাল্কীবহন দু দিনের আমোদ। কোন কোন বিয়েতে তিন দিনও লাগে—সে খুব দূর পথ হ'লে। গায়ে-হলুদের দিনই বর রওনা হয়, কনে-বাড়িতে হয় নান্দীমুখ। নইলে রওনা বিয়ের দিন। বিয়ের দিবসে বর নিয়ে কন্যের বাড়িতে সন্ধ্যে নাগাদ পেঁছে—খাওয়া-দাওয়া আমোদ! তার পরের দিন বর নিয়ে বউ নিয়ে আবার সন্জে নাগাদ বরের বাড়ি ফেরত-গোষ্ঠ। তার পরেতে বিদেয়, ঘরে ফেরে কাহারেরা এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে দুপুর রাত্রিও হয়ে যায়। গা-গতরে ব্যথা একটু আধটু হয় বইকি, তবু প্রচুর মদের নেশায় হৈ-হৈ ক'রে ফেরে। বিয়ের দু দিন মদ খায় বটে, কিন্তু বেশি খাওয়া বারণ। পাল্কী কাঁধে পা ঠিক রেখে যেতে হবে—পরস্পরের পায়ে পায়ে পা ফেলে যেতে হবে। এর পায়ে ওর পায়ে ঠোক্কর খেলে পাল্কী নড়বে। পা টললে পাল্কী টলবে। বর-কনের মাথায় ঠোক্কর লাগবে পাল্কীর কাঠে, সে একটা খ্যানত। তারপরেতে রাস্তা, আলপথ, খানা, মেটেপথে চলতে হয়—বেশি নেশা করলে চলবে কেন? তাই ফেরত-গোষ্ঠের পর পেট ভ'রে মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে কাহারেরা। পাওনাগণ্ডা ভাগ মদের দোকানে হয়। ঢুকবার আগেই যে যার বুঝে নেয়, নয়তো মাতব্বরের কাছে জমা থাকে, বাড়ি ফিরে পরের দিন নেশা ছুটলে আপন আপন ভাগ নিয়ে আসে। বনওয়ারীর দলের নিয়ম—পরের দিন বুঝে নেওয়া। রতন প্রহ্লাদ প্রভৃতিরা বলে—মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নই মাথা। অর্থাৎ মাথা নোওয়াই। বনওয়ারীর কাছে টাকা থাকা আর লক্ষ্মীর হাঁড়িতে সিঁদুর মাখিয়ে তুলে রাখায় কোন তফাৎ নাই। বনওয়ারী বলে—পরের ধন কালাকুন্দের কণ্ঠের বিষ; নিজের লোকের জিনিস ফেলে দেবার উপায় নাই, রেখে সোয়াস্তি নাই, পেটে দিলে ইহকাল তো ইহকাল—পরকাল পর্যন্ত জ্বালিয়ে খাক ক'রে দেবে।

পাওনাগণ্ডা মন্দ হ'ল না—ষোলো কাহারে দুখানা পাল্কী, পাল্কী পিছু ষোলো টাকা—অর্থাৎ প্রত্যেকে দু টাকা হিসাবে বিদায়, ষোলো জনে ষোলোখানা গামছা, কনের বাড়িতে বিদায়-বকশিশ

পাঁচ টাকা অর্থাৎ পাল্কী পিছু আড়াই টাকা, মদের ইনাম দুখানা পাল্কীতে দু গোলা অর্থাৎ দু জালা মদের মূল্য। পরমের দলও বেশ পেয়েছে—রায়বেশে গিয়েছিল ছ জন, বকশিশ-বিদায় নিয়ে পেয়েছে বারো টাকা। এ ছাড়া এক গোলা মদ। মদের দিক দিয়ে পরমেরা বেশি পেয়েছে। তাতে বনওয়ারী কাউকে আপত্তি করতে দেয় নাই; ছি, ও সব হ'ল ছোট নজরের কাণ্ড। পরমেরা খেলা দেখিয়েছে ভাল। হ্যাঁ, লাঠিতে পরম ওস্তাদ বটে, যাকে বলে—একখানা খেল দেখিয়ে দিয়েছে। পাঁচ-পাঁচটা সাকরেদ লাঠি নিয়ে ঘিরলে, পরম পাঁচটাকেই হটিয়ে লাফ মেরে বেরিয়ে এল। দুজনের মাথা ফেটেছে, একজনের আঙুল এমন ছেঁচেছে যে, ভুগবে ছোকরা কয়েক দিন। দু-পক্ষের কর্তারা ধরেছিলেন—বনওয়ারীকে ধরতে হবে লাঠি পরমের সঙ্গে। পরমই বলেছে—লাঠি খেলা দেখবেন তো বনওয়ারীকে বলেন। হ্যাঁ, একহাত খেলে সুখ পাই, আপনারাও দেখে সুখ পান। বনওয়ারী হাতজোড় করেছে। লাঠি খেলা সে দেখিয়েছে, কিন্তু একা একা; রতন প্রহ্লাদের সঙ্গেও দু হাত খেলেছে। কিন্তু পরমের সঙ্গে খেলে নাই। কাজ কি? দু পাড়ায় রেষারেষি চিরকাল। তা ছাড়া, পরম ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, ওকে বিশ্বাস করে না বনওয়ারী। আর কালোশশী আছে মাঝখানে। মনে পড়েছে আটপৌরেপাড়ায় ঘেঁটুগানের কথা। পরমের হাসিটাও ভাল লাগে নাই। যাক, বাবার কৃপায় বিয়েসাদীর কাজ হৈ-হৈ ক'রে ভালয় ভালয় মিটে গেল। আমোদও হ'ল খুব। অনেকদিন এমন আমোদ হয় নাই। পাল্কীতে পাল্কীতে জবর পাল্লা হয়েছে।

যাবার সময় খুব জমে নাই। দুখানা পাল্কীর একখানাতে ছিল বর, একখানিতে ছিল 'গুরু-ঠাকুর'। জমেছিল আসবার সময়। এক পাল্কীতে বর, এক পাল্কীতে কনে। দুই পাল্কীতে পাল্লা—কে আগে যাবে? এ পাল্লার আমোদ হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সেই প্রথম কালের আমোদের কথা মনে করিয়ে দেয়। যে কালে তারা ছিল কুঠির দরবারের গোলাম, যে কালে দেশে বড় বড় বাড়িতে ছিল মতির ঝালর-দেওয়া কিংখাবে মোড়া পাল্কী, পাল্কীর ডাঁটে থাকত রূপোর মকর মুখ, কি বাঘের মুখ, কি সিংহের মুখ। কর্ত্তা-গিন্নীর পাল্কী কাঁধে নিয়ে পাল্লা চলত। হাঁসুলী বাঁকের চাকরাণভোগী কাহারদের গায়ে তেজ জাগত, পায়ে দৌড় জাগত—সোয়ারী পিঠে ঘোড়ার মত। সায়েব-মেমকে, কর্ত্তা-গিন্নীকে কাঁধে নিয়ে পাল্লা দিয়ে তালে তালে 'প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ' শব্দে হাঁক মেরে চারিদিকে 'সোর' জাগিয়ে ছুটত তারা। সে কাল চলে গিয়েছে। এখন ভাঙা পাল্কীর আমল। কাহারদেরও আর চাকরাণ নাই, দেশেও আর সে সব পাল্কী নাই। সে আমলের সে সব পাল্কী-চড়িয়ে কর্তা-গিন্নীও নাই। এ-ই কর্তার চেহারা, পাকি আড়াই মণ ওজন। তেমনি চেহারা গিন্নীর, দু মণের তো কম নয়, তার উপর গিন্নীর গায়ে গয়না, সেও কোন্ না আধ মণ ওজন হবে; পাল্কী কাঁধে উঠল তো মনে হ'ল, কাঁধ কেটে বসে গেল। এক-এক জন আবার এর চেয়েও জবরদস্ত হতেন। তাঁকে নিয়ে পাল্কী তুললে মাথা ঝনঝন ক'রে উঠত, বুকের কলিজায় চাপ পড়ত। রসিক বেহারারা নানা বোলের মধ্যে-মাঝে বলত—বাবু বড় ভা—রী। লোকে আজও বেহারার বোলের ঐ লাইনটাই ব'লে থাকে, তারা রসিকতা করে বলে—বেহারারা বলে, শালা বড় ভা—রী। হরি হরি রাধাকৃষ্ণ! তাই পারে বলতে কাহারেরা? এই বিয়েতে অনেক

কাল পরে দুখানা পাল্কীতে পাল্লা চলেছে। সচরাচর এক পাল্কীতেই বর-কনে আসে আজকাল, তাই পাল্লার সুযোগ মেলে না। মিত্র মহাশয়রা দুখানা পাল্কী করে ছিলেন।

আট ক্রোশ পথ মাতিয়ে, পথের ধুলো উড়িয়ে চ'লে এসেছে। চার-চারজনে কাঁধ দিয়ে চলেছে এক-এক পাল্কীতে, বাকি চার-চার জন ছুটে এসেছে সঙ্গে। সে প্রায় চৌঘুড়ির মত জোরে এসেছে। বর যাবে আগে, কি কনে যাবে আগে? কত্তা আগে, না গিন্নী আগে? 'নক্ষী' আগে, না 'লারায়ণ' আগে? প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। বনওয়ারীর পাল্কীতে বনওয়ারী আছে আর আছে সেই পাগল কাহার, পাল্কীর আগের ডাণ্ডায় প্রথমেই আছে পাগল। সে হাঁসুলীর বাঁকের কাহারপাড়ার আদ্যিকালের গান গাইতে গাইতে এসেছে। গান গাইতে পাগলের জুড়ি কেউ নাই। পাগল গেয়েছে—

—সরাসরি ভাল পথে—

পিছনওয়ালারা হেঁকেছে—প্লো-হিঁ।

—জোর পায়ে চলিব।

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

—আরও জোর কদমে—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

পাগল হাসতে হাসতে সুর ক'রে এবার বলে—বরেরো পাল্কী।—প্লো-হি—প্লো-হিঁ।—পড়িল পিছনে—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ।

—আগে চলে লক্ষ্মী—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

—পিছে এস লারায়ণ।

বরের পাল্কীর সামনে আছে রতন, সেও হাঁকলে—জোরে ভাই, জোরে ভাই—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। কনের পাল্কীতে কনে বরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে, বরও হাসছে পাল্কীতে ব'সে—এ কথা তারা জানে।

হঠাৎ বনওয়ারী জোরে হাঁকে—বেহারা সাবোধান!—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ।—আলপথে নামিলাম। পায়ে পায়ে—পায়ে পায়ে। অর্থাৎ পা যেন ডাইনে বাঁয়ে না পড়ে, একটি পায়ের দাগে আর একটি পা, একজনের পায়ের ছাপের উপর আর একজনের পায়ের ছাপ ফেলে সাবধানে এস বেহারারা। এসব জায়গায় বনওয়ারী নিজে সুর ধরে, পাগলকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে যে-রকম আলাভোলা লোক, হয়তো গানের ঝোঁকে পথের কথা না বলে বর-কনের কথাই ব'লে যাবে। পিছনে বেহারারা পড়বে বিপদে। বনওয়ারী হাঁকলে—ফেলে ফেলে সাবোধানে, এস রে বেহারা। ডা-ই-নে বেঁ-কি-ব। হুঁশ ক'রে—হুঁশ ক'রে। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। সামনে উঠতি—আলকাটা নালা ভাই। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। পিছে টান পড়িছে। পিছন হতে প্লো-হিঁর বদলে শব্দ হ'ল—কাঁধ—কাঁধ। থামল পাল্কী। একজন পাল্কী ছাড়বে, একজন কাঁধ বদলাবে,

অর্থাৎ ডান থেকে বাঁ কাঁধে নেবে।

দেখতে দেখতে ডান পাশ দিয়ে বরের পাল্কী নিয়ে রতন হাঁকতে হাঁকতে চ'লে গেল হুম্-হুম্ শব্দে। শুনে বোল ব'লে জোরে ছুটেছে।

—হেঁইয়ো—হুঁশিয়ার—

—প্লো-হিঁ।

—পাশ কর পাল্কী—

—প্লো-হিঁ।

—কর্তার হুকুমত—

—প্লো-হিঁ।

—গিন্নীর পাল্কী—পিছনে পড়িল—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

পার হয়ে চ'লে গেল ওরা।

বনওয়ারী পাগল আবার ছুটল—বরের পাল্কী এগিয়ে গেল, চল চল। জোর কদমে আবার চলল কনের পাল্কী।—কদমে-কদমে বেহারা চল রে। পাগল আবার সুরে হাঁক ধরে—কত্তা আগে গেল। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। ছুটে চল বেচারা, ধর ওই পাল্কী। জোরসে জোরসে। আগে যাবে লক্ষ্মী। তবে তো লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফুটবে। লক্ষ্মীর কাছে হেরে 'নারায়ণ'ও হাসবে। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। বর এবং কনে যে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসেছে, এ ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে। পাল্কীর ডাণ্ডা বেয়ে সে হাসি এসে ওদের পরশ দিয়ে যায় যে!

অনেক কাল পর এবার ভারি আমোদ গিয়েছে। পান সুপারি চিঁড়ে মুড়কি লুচি মিষ্টি প্রচুর বেঁধে নিয়ে ফিরল কাহারেরা।

মিত্রকর্তা বনওয়ারী এবং পরমের পিঠ চাপড়ালে—বাহবা! খুব খুশি হয়েছি।

পরমেরা ঘাঘরা, বডিজ, পায়ের নূপুর, কানের মাকড়ি খুলে ফেললে। পুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে রওনা হ'ল। বনওয়ারীকে ডাকলে—আয়।

হাসলে বনওয়ারী, বললে—চল, মাতালশালায় আসর পাত গিয়ে; আমরা যাচ্ছি—আমাদের কম্ম এখনও বাকী আছে।

পরম ব্যঙ্গভরে বললে—হ। বটে বটে। ঘোড়াদিগে গাড়ি তুলে দিতে হবে আস্তাবলে।

কাহারদের অশ্বগোত্র। তাই ঠাট্টা করলে। বনওয়ারীকে এখন পাল্কী দুখানি নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়ি। পাল্কী দুখানা তাঁদের। মিত্রেরা চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের জন্য। পাল্কী দুখানির জন্য দুটি বড় মাছ বাবুদের সম্মানী দিতে হবে। বিয়েসাদীতে পাল্কী নিলে মাছ দিতে হয়। জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী নিলে সিধে দিতে হয়—ঘি-ময়দার সিধে। এগুলি বহন ক'রে নিয়ে যায় কাহারেরাই। এই কাজ সেরে তবে বনওয়ারীদের ছুটি। তবে এ কাজটা ছেলে-ছোকরাদের। তারাই বরাবর করে। খালি পাল্কী দুই কাহারে ব'য়ে নিয়ে যায়, এক কাহার নেয় মাছ, কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুজনের একজনই হাতে ঝুলিয়ে নেয় মাছটা।

সাধারণ গেরস্তে মাছ দেয় দু সের ন পো, বড় জোর আড়াই সের ওজনের। এর বেশি ওজনের দিতে পাবে কোথায় তারা ? যার থাকে, সেও নজরের জন্যে দিতে পারে না। মিত্র মহাশয় মানী লোক, দুটো মাছ দিয়েছেন দশ সের ওজনের। বড়বাবুদের বাড়ি যাবে, ছোট কি দেওয়া যায় ? বনওয়ারীও ঠিক ওই জন্যেই ছেলে-ছোকরাকে ভারটা না দিয়ে নিজেই যাবে। বড়বাবু রাজলক্ষ্মীর আশ্রিত, তাঁকে দর্শন হবে, প্রণাম হবে। বাবু মাছ দেখে খুশি হবেন। বলবেন—তুই ? কে বল্ তো তুই ?

বনওয়ারী বলবে—আজ্ঞে হুজুর আমি বনওয়ারী। আপনার চাকর, পেজা হয়েছি নতুন। সায়েবডাঙায় জমি নিয়েছি।

এ ছাড়া আরও একটু কারণ আছে। নসুবালা এক ফাঁকে এসে ব'লে গিয়েছে—ব্যানোকাকা, বর বলেছে তোমাকে দেখা করতে। দেখা না-ক'রে যেয়ো না যেন। লুকিয়ে বললে আমাকে। কনে হাসছিল।

বনওয়ারী পাগ্‌ল রতন প্রহ্লাদ পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকে হেসেছে। পাল্লা দিয়ে পাল্কী নিয়ে আসার জন্যে বর কনে দুজনেই খুব—খুব খুশি হয়েছেন। গোপনে রাঙাহাতের 'বশকিশ' আসবে। সেটা আর পরমকে সে জানাতে চায় না। ওরা মনে মনে হিংসে করবে। হয়তো ওরাও গিয়ে বরের কাছে দাবি করবে। কথাটা লোক-জানাজানি হবে। বর কনে হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ, বিয়ে-ব্যাপারে দশের কাছে আশীর্বাদী দু-দশ টাকা ওঁরা পেয়েছেন, তা থেকেই দেবেন, দেশসুদ্ধ লোককে দু'হাতে বিলুতে পাবেন কোথায় ? পরমকে দিলে বাজনদার আসবে, বাজনদারের পিছনে রোশনাইদার আসবে, তার পিছনে এ-ও-সে কতজন আসবে তার ঠিক আছে !

ওই যে ! নসুবালা হাতছানি দিয়ে ডাকছে খিড়কীর দোরে। নসুবালার কাপড়খানা একেবারে 'অঙে-অঙে' 'অক্তসনজে' হয়ে গিয়েছে। খুব রঙ মেখেছে নসু। গলা ভেঙে গিয়েছে। গান গেয়েছে দিনরাত। হাতে দু হাত ভ'রে কাচের রেশমী চুড়ি পরেছে।

বনওয়ারী পাগল এগিয়ে গেল। পাগল মুচকি হেসে বললে—তা হ'লে গাঁয়ে ফিরে আমার সাঙাটাও হয়ে যাক ব্যানো-ভাই। কনে তো তৈরি।

নসুবালা গাল দিয়ে উঠল—মর্, মর্, মুখপোড়া ! ভদ্দনোকের ঘর মান না ! নিলেজ্জো, গলায় দড়ি দেগা !

পাগল হঠাৎ চোখ বড় বড় ক'রে ব'ললে—ও বাবা, যাব কোথা ? কনের নাকে ঝিকমিক করে ? ও তো পেতল লয় ! ওটি তো দেখি নাই যখন এলি সেদিনে !

গা দুলিয়ে পরম পুলকে নসু এবার বললে—আদায় করেছি হে, আদায় করেছি। কনের কাছে। সোনার 'সামিগ্যি' এই—এই এত ! নাকছাবি চার পাঁচ গণ্ডা। কানের ফুল মাকড়ি আট-দশটা। কাপড় এক মোট। কনে নাকছাবিটি দিলে। গিন্নীমা পাছাপেড়ে শাড়ি দেবে। বরকে বলেছি—দাদাবাবু, কাহার ব'লে আমি ননদপেটারি পাব না কি ? তা হবে না, সে ছাড়ব না আমি—হ্যাঁ। নতুন ডুরে কাপড়—। হঠাৎ লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। বর মহাশয় বেরিয়ে এসেছেন। বর পাঁচ টাকার একখানি নোট বনওয়ারীর হাতে দিয়ে বললেন—

কনের পাল্কীর বেহারারা তিন টাকা নিয়ো, আমার বেহারাদের দু টাকা।

বনওয়ারী খুশিই হয়েছিল, কিন্তু নসুবালা ব'লে উঠল—হেই মা রে, তিন টাকা? তিনে দোশমন। না দাদাবাবু, শুভকাজে দোশমন করতে নাই। আর এক টাকা দাও তুমি।

বর হেসে বললেন—তোকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। ব'লেও কিন্তু এক টাকা না দিয়ে পারলেন না।

বনওয়ারী বললে—জয়-জয়কার হোক বাবু মাশায়।

পাগল বললে—একটি পাওনা রইল কিন্তুক।

বর বললেন—কি, বল?

—খোকাবাবু হ'লে আমরা কিন্তু বউদিদি আর খোকনকে বহন করে আনব; বায়না আমাদের হয়ে রইল।

বর লজ্জা পেয়ে হাসলেন। নসু হাতে তালি দিয়ে নিচে উঠল।

তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন।

মাতালশালায় এসে বসল বনওয়ারী। জ'মে উঠেছে মাতালশালা। ব'সে গিয়েছে দলে দলে মাতালেরা। জেলেরা এক জায়গায়, সাঁওতালেরা এক জায়গায়, ডোমদের দল বসেছে আমগাছের তলায়, হাড়ীরা বসেছে ওপাশে, চন্নপুরের বাউরীরা বসেছে আলাদা, বাগদীরা ওখানে ব'সে বড় মদ খায় না, বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাড়ায় বসে খায়। পরম দলবল নিয়ে বসেছে ডোমেদের দলের কাছাকাছি। বনওয়ারী আশা করেছিল, আজ অন্তত এই একসঙ্গে বিয়ের কার্য সেরে ফেরার পথে সকলে একসঙ্গেই বসবে। ক্ষুণ্ণ হ'ল সে। বললে—পরম হোথা গিয়ে বসল?

গুপী বললে—যাক বাপু, যার যেথা মন সেথাই বিন্দাবন; বেশ বসেছে।

বনওয়ারী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলে, পথে কিছু ঘটেছে। পরমকে তো সে জানে। হেসে বসল সে। ব'সে বললে—হ'ল কি? ল্যাই করেছে বুঝি পাওনা নিয়ে? অর্থাৎ ঝগড়া।

—পাওনা নিয়ে ল্যাই হ'লে বুঝতাম—মনের ঝাল। জাত নিয়ে, গোত্ত নিয়ে ল্যাই।

—জাত নিয়ে, গোত্ত নিয়ে?—বনওয়ারীর কপালের শিরা ফুলে উঠল।

পাগল বললে—ছাড়ান দাও। লাও, ঢাল ঢাল।

—ছাড়ান কিসের? তোর ঘেন্নাপিত্তি সব গিয়েছে পাগল।

—তু খেপেছিস ব্যানো। জাত নিয়ে ঝগড়া কিসের? যে বড় সে বড়, যে ছোট সে ছোট। ভগবান যা ক'রে পাঠালছেন, তাতে কার কি হাত? আসল জাত নিজের নিজের আচার-আচরণে, কাম-কম্মে।

বনওয়ারী বুঝে গেল। এইটি ওর গুণ।—ঠিক ঠিক, এ তু ঠিক বলেছিস, বাস্। লাও, ঢাল। ছোট বললে ছোট হয় না, খুঁড়িয়ে দাঁড়ালে বড় হয় না। বাস্।

পাগল গান ধরলে। মুড়ি বেগনি ফুলুরির সঙ্গে চলতে লাগল মদ। বনওয়ারী হঠাৎ পাগলকে ডেকে দেখালে—দেখ্, শ্যালো জাত দেখায়, শালোর করণ দেখ্।

সকলেই দেখলে, পরম ডোমেদের আসরের মাঝখানে গিয়ে বসেছে। মদও খাচ্ছে।

পাগল বললে—ছাড়ান দাও।

—ছাড়ান দোব কেনে? এ তো পরমের ডোমে জাত দেওয়া হ'ল।

—নিশ্চয়।—সকলেই একবাক্যে সায় দিলে।

শুধু পাগল বললে—ওহে, ওতে জাত যায় না। জাত যার যায় তার যায়—এমনিতেই যায়। যার যায় না, তার যায় না। জাত না দিলে, লেয় কে? তার নাম কি, ঘর কোথা?

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

পাগল বললে—লাখ কথার এক কথা বলেছে করালী। ঠিক বলেছে। সেদিন থেকে ভেবে আমি দেখলাম। সার কথা বলেছে ছোকরা।

—করালী? করালী বলেছে?

—হ্যাঁ। সেদিনে বললাম তো তোমার কথা। তুমি বলেছিলে, শুধাস করালীকে। তা করালী বললে—আমার জাত আমি না দিলে লেয় কে? তার ঘর কোথা? তা ছাড়া আর একটি কথা বললে—ভীষণ কথা। বললে ছোঁয়া খেলে জাত যায় না, জাত যায় এঁটো খেলে। জাত আমার যায় নাই, আমি কারুর এঁটো খাই না। কাহারেরা সদ্‌গোপদের এঁটো কুড়িয়ে স্বগগে যায়।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বনওয়ারী মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

শুধু পানা বললে—আমি কিছু বলব না বাবা। সবেই দোষ আমার হয়। বুয়েচ!

বনওয়ারী তার হাতখানা ধ'রে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—তু বেটার ওই সরিঙ্গে মুখ দেখলে আমার সব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। স'রে যা, ছামু থেকে তু স'রে যা।

রতন বললে—ওঠ, ওঠ, ঘর চল। আর লয়।

বনওয়ারী বললে—এক গোলা গোটা নিয়ে লে। মেয়েছেলে—। এক গোলা লইলে হবে না।

পাড়ার জন্যে মদ নিতে হবে। তারা মদ খেলে, আমোদ করলে—পাড়ার লোকে খাবে না, এ কি হয়? পাড়ার জন্য মদ নেওয়ার নিয়ম বরাবর আছে।

পরম শুধালে—উঠলি না কি?

গম্ভীরভাবে বনওয়ারী বললে—হ্যাঁ।

পরম বললে তার দলকে—ওঠ্। আমাদেরও ওঠ্।

চন্নপুর আর বাঁশবাঁদির মধ্যে মস্ত একটা মাঠ—ক্রোশখানেক লম্বা। পোয়া-তিনেক গিয়ে প্রথম পড়বে বাঁ হাতের দিকে জাঙল গ্রাম, তারপর বাঁশবাঁদি। রাস্তার মাঝামাঝি এসে পরম ডাকলে—বনওয়ারী!

বনওয়ারী আগে চলছিল, সাড়া দিলে—কে? কে ডাকলি?

—আমি পরম। হ্যাঁ। তোর সাথে একটা কথা আছে।

—আমার সাথে? কি?

—বলি দাঁড়া।

পরম দু দলকেই বললে—চ, চ, তোরা এগিয়ে চ। আমরা কথা বলতে বলতে যাই। একটা গোপন কথা আছে আমাদের।

পাগল সকলকে ডেকে নিয়ে গেল—চল্—চল্। সঙ্গে সঙ্গে সে গান ধ'রে দিলে—

গোপনে, মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়,
ও হায় ঠাণ্ডা শেতল সাঁজবেলায়।

খপ করে বনওয়ারীর হাত চেপে ধরলে পরম। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল বনওয়ারীর মুখের দিকে। বনওয়ারী বুঝে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস নিয়ে ছাতিটা ফুলিয়ে দাঁড়াল। বললে—মার করবি? অর্থাৎ মারামারি করবি?

পরম বললে—করালীকে কি বলেছিস? আমি ডাকাত, আমি দাগী?

বনওয়ারী হেসেই বললে—নোস তু উ সব? তু নিজেই বল্ কেনে?

এবার পরম দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে—শালো সাধু নোক, আমাদের পাড়ার বটতলাতে তোমার কিসের ভজন?

পরমের লজ্জা নাই। 'ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয়' কিসে? যে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে থাকে, উপর মুখে থুথু ছুঁড়ে যে নিজের গায়েই মাখে, এ জ্ঞান তার থাকবে কি ক'রে? নিজের ঘরের মেয়ের কেলেঙ্কারি নিয়ে ঝগড়া করা আর উপর দিকে থুথু ছোঁড়া একই কথা। জ্ঞানও নাই, ঘেন্নাও নাই; যার ঘেন্না নাই, তার লজ্জাও নাই। কিন্তু বনওয়ারীর লজ্জা আছে, কেলেঙ্কারিকে ভয় তাকে করতেই হয়,গোটা কাহারপাড়ার মাতব্বর সে। আগেকার কাল ছিল আলাদা। এ কাল আলাদা। আর এ কালের এই হালচাল—বনওয়ারীরাই বাপ-বেটা দু পুরুষে প্রতিষ্ঠা করেছে কাহারপাড়ায় 'মেয়েদের পানে তাকিও না'। মানে না সবাই, তবুও অনেক হাল ফিরেছে। সুতরাং নেশার মধ্যেও বনওয়ারী মাথা ঠিক রেখে বললে—হাত ছাড়্ পরম। উ সব মিছে বাজে কথা।

—ও শালো, পানা আমাকে বলেছে। সে নিজের চোখে দেখেছে তোমার কীত্তি। চাপা গলায় অকুণ্ঠভাবেই ব'লে গেল পরম, একবার বাধল না মুখে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে রইল। না, উত্তর দেবে না সে। পাপ তার বটে, তবুও উত্তর তার আছে। সে উত্তর দিতে গেলে কালোশশীকে দোষ দিতে হয়। পরমের অবহেলার জন্য সে-ই বনওয়ারীকে টেনেছে পাপের পথে। বনওয়ারী তাকে ডাকে নাই। কিন্তু সে কথা সে বলবে না, বলতে পারবে না।

পরম হঠাৎ তার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে, বললে—কি শালো, চুপ ক'রে অয়েচ যে। ধাম্মিক। মাতব্বর।

আর আত্মসম্বরণ করা সম্ভবপর হ'ল না বনওয়ারীর পক্ষে। সে হুঙ্কার দিলে—পরম!

মত্ত পরম দু হাতে শূন্যলোকে অনুসন্ধান ক'রে বললে—লাঠি? আমার লাঠি?

মনের উত্তেজনায় পরম লাঠি ফেলে দিয়ে দু হাতে বনওয়ারীর হাত চেপে ধরেছিল। খেয়াল নাই। মুহূর্তে বনওয়ারী পরমের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তার হাতে লাঠি নাই। পরম লাঠি পেলে মানুষ-খেকো বাঘ। লাঠি পরমকে আর কুড়িয়ে নিতে দেবে না সে।

এর পর আরম্ভ হল যুদ্ধ। নিঃশব্দে—সেই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে তারা দুজনে বন্যপশুর মত পরস্পরকে আক্রমণ করলে। জড়াজড়ি ক'রে দুজনে এ অঞ্চলের পাষাণের মত মাটির উপরে প'ড়ে গড়াতে লাগল। কখনও এ উপরে, কখনও ও উপরে। পরম ডাকাত,পরম খুনে,—সে উপরে উঠে নিষ্ঠুর নৃশংসভাবে বনওয়ারীকে আঘাত করবার চেষ্টা করছিল। কোশকেঁধের ঘরের ছেলে বনওয়ারীর গায়ের শক্তি বেশি, সে তাকে প্রতিহত করলে কিন্তু মারাত্মক আঘাত করতে চাইল না। না, তা সে করবে না।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথার রাত্রে দাঁতালে দাঁতালে লড়াই হয়। গাছের মাথায় হনুমানের দলে বীরে বীরে যুদ্ধ হয়। সুচাঁদ বলে—হাঁসুলী বাঁকে মাঝে মাঝে মরদে-মরদেও খুনোখুনি 'অক্ত-গঙ্গা' হ'ত সেকালে। কাহারপাড়ার মরদে-মরদে সে খুনোখুনি এখন নাই। সেকালে হামেশাই হ'ত। দুই 'দানোতে' অর্থাৎ দানবে যেন যুদ্ধ লাগত। দুই বুনো দাঁতালে গুঁতোগুঁতির মত লড়াই। একালে সে লড়াই লজ্জার কথা। কিন্তু উপায় কি? পরম আক্রমণ করলে ঠেকাতেই হবে। ঠেকাতে গিয়ে মার খেয়ে রাগও জাগছে। এইবার সেও মারবে—! হুঁশিয়ার পরম! আবার সে নিজেকে সামলে তাকালে রাস্তার দিকে। পরম এবং বনওয়ারীর সঙ্গীরা তাদের পিছনে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। বনওয়ারীর ইচ্ছা হ'ল, ওদের চীৎকার করে ডাকে। কিন্তু, না। সে বড় লজ্জার কথা। সে হ'ল হার মানার সামিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। প্রাণপণে টেনে পরমকে নিয়েই উঠে দাঁড়াল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগে তাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেললে। এই আছাড়েই পরম প্রায় অসাড় হয়ে পড়ল। বনওয়ারীরও খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তবু সে চেপে বসল পরমের বুকে। মারলে আরও কয়েকটা নিষ্ঠুর কিল। তারপর ছেড়ে দিলে। সে পাশে বসে হাঁপাতে লাগল। সর্বাঙ্গ যেন থেঁতলে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর কোনরকমে সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। পরমও তখন উঠে বসেছে। বনওয়ারী গিয়ে তার হাত ধ'রে টেনে বললে—উঠতে পারবি?

পরম গর্জন ক'রে উঠল—ছাড়্।

বনওয়ারী তাকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে চলল। পরম বারকয়েক ওঠবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে পড়ল সেই মাঠের উপরেই।

* * * *

গ্রামে তখন মদ নিয়ে আনন্দ চলেছে, তার সঙ্গে নানা উপাদেয় খাদ্য। বনওয়ারী গ্রামের প্রান্তে থমকে দাঁড়াল। কি ভেবে, গ্রামে না ঢুকে পাশের পুরানো কালের ঘন গাছপালার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে উঠল আটপৌরে পাড়ায়। আজ যেন কালোবউ শতগুণ লোভনীয় হয়ে তাকে আকর্ষণ করছে। শরীরের মধ্যে যেন এখনও রক্ত গরম আগুন হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আজ কালোবউকে নিয়ে এখুনি সে চ'লে যায় নিজের ঘরে। কোন পাপ হবে না। পরম নিজেই সে পাপ হওয়ার পথে কাঁটা দিয়েছে। সে কম্পিত হাতে গোটা কয়েক ছোট ঢেলা তুলে নিয়ে পরমের উঠান লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ল।—টুপ, টুপ, টুপ্। সুচতুর মেয়ে কালোশশী ঠিক বুঝতে পেরেছে। আব্ছা অন্ধকারে সাদা মূর্তি উঠানে এসে দাঁড়াল।

সে এবার মৃদু গলাঝাড়ার শব্দ করলে। চতুরা কালোবউয়ের কান এদিক দিয়ে বেহালার তারের মত; খুট করলেই তারে সাড়া জাগে। চকিত দৃষ্টি হেনে বনওয়ারীকে দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে। মুখ ভ'রে হেসে বললে—তুমি! ঠিক বুঝেছি আমি, সে-ই বটে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ কি, হাঁপাইছ কেন?

—পরমের সাথে হয়ে গেল এক হাত।

গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল কালোবউ—এ কি! অক্ত?

—হ্যাঁ। সি প'ড়ে আছে মাঠে।

কালোবউ বিন্দুমাত্র ব্যস্ত কি উৎকণ্ঠিত হ'ল না। সে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে, তারপর বললে—দাঁড়াও, অক্ত-টক্ত ধুয়ে ফেল আগে।

—ঘটির জলে যাবে না। হাসলে বনওয়ারী। অক্ত-ধুলো—চান করতে হবে।

বনওয়ারীর হাত ধ'রে সে বললে—চল তবে নদীতে। কাচের পারা জল,ধুয়ে মুছে চান করবা।

—চল। বনওয়ারী খুশি হয়ে উঠল। আজ কালোবউকে সব চেয়ে বেশি মনোরমা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কালোবউ ধুয়ে মুছে দিলে সকল ক্ষত এবং আঘাতের যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে। কালোবউয়ের কাঁধে হাত রেখে সে বললে—চল।

পাড়া আনন্দে তখন মাতোয়ারা। ঢোল বাজছে। মদে খাবারে মেতে উঠেছে সকলে আটপৌরেপাড়াতেও চলছে। বনওয়ারী টলতে টলতে কালোবউকে নিয়ে কোপাইয়ের গর্ভে এসে নামল। আকাশে সবে চাঁদ উঠছে। একপাশ-খাওয়া লাল-বরণ মস্ত চাঁদ। হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে, গাছের মাথায় মাথায় আকাশ ফরসা হয়ে উঠেছে, গাছের ডালগুলির পাতায় চিক্ চিক্ ক'রে নাচছে উঠতি চাঁদের লালচে আলোর ছটা। আলো নাচছে না, পাতাগুলিই নাচছে বাতাসে, কিন্তু মনে হচ্ছে—চাঁদের আলোই নেচে খেলে বেড়াচ্ছে উড়ন্ত প্রজাপতির হিলহিলে পাখনার মত। বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে গলা ডুবিয়ে বসল। জল পেয়ে ক্ষতগুলি জ্বলছে; কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে, শরীর জুড়িয়ে গেল। কালোবউ বসেছে নদীর বালিতে পা ছড়িয়ে। দেখতে দেখতে চাঁদের আলো দুধবরণ হয়ে গাছপালা বাঁশবন ঝলমল ক'রে তুলে নদীর বুকে নামল। কোপাইয়ের জলে গলানো রুপোর ছটা জেগে উঠল। কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন খিলখিল ক'রে হেসে ঢ'লে গড়িয়ে পড়ছে। ওই ছটায় কালোবউকে বড় সুন্দর লাগছে। তার উপর মনে ধরেছে রঙ, সে রঙের ছটাও গিয়ে পড়েছে কালোশশীর মুখে। বনওয়ারী বললে—মিহি সুরে এক পদ গায়েন কর কেনে?

হাসলে কালোবউ। কালোবউয়ের দাঁতগুলি ঝিকমিক ক'রে উঠল, সে বললে—গায়েন?

—হ্যাঁ। বেশ অঙের গায়েন।

—আজ যে দেখি নেশা খুব।

হাসলে বনওয়ারী। কালোবউ গান ধরলে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় গান। সে যে কে রচনা করেছে, কেউ তা জানে না। কালোবউ গাইলে—

আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে—
সে জল পাতা নিলে না—
টলোমলো—টলোমলো—
হায় বঁধু হে প'ড়ে গেল—
ও হায়, চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে ঝলে না।

হঠাৎ কোপাইয়ের পাড়ের উত্তর পারে দুটো 'টিটে' অর্থাৎ টিট্টিভ পাখী চীৎকার ক'রে উঠল, মাথার উপরে তালগাছটা থেকে একটা প্যাঁচা কর্কশ শব্দ ক'রে পাখা ঝটপট ক'রে উঠল। কালো-বউ চমকে উঠল, বললে—মা গো! মর্ মর্ মুখপোড়ারা। বলতে বলতে সে পিছন ফিরে দেখতে চাইলে ওই অশুভক্ষণে পাখীটাকে। ফিরে তাকিয়েই সে ভয়ার্ত কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল।—ও কে? সে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে পরম। চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত। অন্ধকারে পরমের·হাসা চোখ বুনো বিড়ালের চোখের মত জ্বলে। কিন্তু এমন জ্বলতে কেউ কখনও দেখে নি। সে টলছে। মুহূর্তে কালোশশী উঠে দাঁড়াল; বনওয়ারীকে ডাকলে। কিন্তু কই বনওয়ারী? কই? সমস্ত কোপাইয়ের জলস্রোতটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে। কিন্তু বনওয়ারী কই? ওদিকে পাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পরম। কালোবউ পরমকে জানে। তারই মুখে গল্প শুনেছে—মানুষের গলায় পা দিয়ে কেমন ক'রে অনায়াসে মানুষকে মারা যায় এবং কতজনকে সে মেরেছে। কালোবউ শিউরে উঠল, তার পরই সে ছুটল—কোপাইয়ের গর্ভে গর্ভে বালির উপর দিয়ে। পরমও ছুটল তার পিছনে। গোঙাচ্ছে পরম।

জলের তলে তলে বেশ খানিকটা দূরে ভেসে গিয়ে মাথা তুললে বনওয়ারী। জলে ডুবে নদীর স্রোতে সে ভেসে চলেছিল। মাথা তুলে সে ব্যাপার দেখে চমকে উঠল। উপরের দিকে অর্থাৎ স্রোতের উল্টো দিকে ছুটছে কালোবউ। পিছনে টলতে টলতে ছুটছে পরম। সে এবার জল থেকে উঠল তাড়াতাড়ি। ছুটতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেও টলছে। তার উপর বালি।

ওই কালোবউ ছুটছে! ওই!

ওই পরম!

সর্বনাশ। সামনে যে 'সায়েবডুবির দহ'; কেউ বলে—'যখের দহ'; কাহারপাড়ার লোক বলে—কত্তার দহ। কত্তা ওই দহে চান করেন। কালারুদ্র ওই দহে জলশয়ানে আছেন। কাহারেরা বছরে চারবার নামে ওইখানে। গাজনে কালারুদ্দের শিলারূপকে তুলে নিয়ে যায়, আবার জলশয়ানে রেখে আসে; আর ওখানে থাকেন কালারুদ্রের বেটী মা-মনসার 'বারি'। একবার নেমে সেই বারি নিয়ে যায়—একবার নেমে সেই বারি ডুবিয়ে দেয়। তা ছাড়া কেউ ওদিকে ঘেঁষে না। ওখানে পাহারা দেয় আদ্যিকালের এক বুড়া কুম্ভীর। মধ্যে মধ্যে বেড়াতে এদিকে ওদিকে যায় বটে, কিন্তু দহের বিঘ্ন হ'লে নিশ্চয় সে কোপাইয়ের জল কেটে তীরের মত

ছুটে আসবে। রক্ষা কর হে বাবাঠাকুর, রক্ষা কর।

ওই দহের কিনারা ধ'রে উপরে উঠছে কালোশশী। উঠতে পারলে নিশ্চিন্ত; শিমুলবৃক্ষটি পার হ'লেই কোপাইয়ের জঙ্গল, জঙ্গলে ঢুকলে কালোশশীকে খুঁজে বার করা পরমের সাধ্যে কুলাবে না। কালোশশী শিমুলবৃক্ষটির শিকড় ধ'রে উঠে যাচ্ছে বুনো বিড়ালীর মত। দহের দিকের মাটি খুলে গিয়ে শিমুলবৃক্ষের শিকড় বেরিয়ে আছে—ঝুলে আছে, তাই ধ'রে আর তাতেই পা দিয়ে উঠছে। বাহা—বাহা! বাহারে কালোশশী!

হঠাৎ কালোবউয়ের ভয়ার্ত চীৎকারে কোপাইয়ের স্তব্ধ গর্ভভূমি যেন বুকের উপর খুনীর ছুরির ঝকমকানি দেখে চমকে উঠল। ওটা কি? শিকড়ের তলা থেকে আকাশের বিদ্যুতের মত এঁকে-বেঁকে মাথা তুলে দাঁড়াল, ওটা কি? চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে কোপাইয়ের জল বালি। তীরের জঙ্গলের কোল পর্যন্ত ঘাস নড়ছে দেখা যাচ্ছে, বালির মধ্যে ঝিকমিক করছে বালুর কণা, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কালোবউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? সে কই? কালোবউ কোথায় গেল? বনওয়ারী চারিদিকে চেয়ে দেখে চাপা চীৎকারে ডাকলে—কালোশশী!

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল পরম। পরম দহের কিনারা ধ'রে ফিরে এসে কোপাইয়ের জলে নামছে। কই কালোবউ? এ কি হ'ল? শুধু দহের জলটা দুলছে। সে ছুটে গেল দহের দিকে। দুলছে জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। বিদ্যুতের মত আঁকাবাঁকা যেটা শিমুলবৃক্ষের তলা থেকে বেরিয়ে কালোবউয়ের বুকের উপর মাথার উপর দুলে উঠেছিল, সেটা এখনও মুখ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে। সেও দেখছে দহের জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বনওয়ারী সভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর করজোড়ে প্রণাম ক'রে পিছু হঠতে লাগল। সাদা গোখুরো একটা।

পিছন থেকে পরম আবার হেসে উঠল। বনওয়ারী ফিরল। বুঝা-পড়ার শেষ হয়ে যাক। পরম কোপাইয়ের ও-তীরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বনওয়ারী কঠিন স্বরে ডাকলে—পরম!

পরম উত্তর দিলে না। তার আক্রোশ মিটে গিয়েছে। সে পালাচ্ছে।

বনওয়ারী বললে—মরদ হোস তো ফিরে আয়।

পরম দাঁত মেলে হাসলে। তারপর মিশিয়ে গেল কোপাইয়ের ওপারের তীরের জঙ্গলের মধ্যে। বনওয়ারীর কিন্তু কত্তার দহে নামতে সাহস হ'ল না।

বনওয়ারী থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। কত্তাবাবার ক্রোধ কি তার উপরেও পড়ল? কালোবউকে জলের তলা থেকে কেউ কি টেনে নিলে? মাথার উপর, বুকের উপর কালদণ্ড তুলে দাঁড়িয়ে উঠল কে? বাবার বাহন। বাবার বাহন! সে চোখে অন্ধকার দেখলে, হয়তো প'ড়েও যেত। কিন্তু তাকে কে পিছন থেকে ধ'রে ফেললে। ধরেছে পাগল, সে ডাকলে—বনওয়ারী। বনওয়ারী! বনওয়ারী!

চতুর্থ পর্ব

এক

পাগল বনওয়ারীকে এনে বাড়িতে শুইয়ে দিলে। বনওয়ারী বিহ্বল। পাড়ার লোক ভিড় ক'রে এল। কি হ'ল? কি ক'রে হ'ল?

পাগল বললে—জাঙলের ধারে প'ড়ে হাঁপাইছিল।

—জাঙলের ধারে?

—হ্যাঁ।—কথাটা ভেবেচিন্তেই বলেছে পাগল। শেষের প্রায় সবটাই সে দেখেছে। কোপাইয়ের ধারে সে গিয়েছিল চাঁদের আলো দেখে মনের খেয়ালে। কালোবউ তখন গান গাইছিল। অপার কৌতুকে বনওয়ারীর প্রেমলীলা দেখবার জন্য একটা গাছে উঠে বসেছিল। তারপর এল পরম, সমস্তটা ঘ'টে গেল চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে। গাছ থেকে সে যখন নামল, তখন পরম ও-পারে; কালীদহের জল দু'লছে, তীরে দাঁড়িয়ে বনওয়ারী কাঁপছে টলছে। সে ধ'রে ফেললে বনওয়ারীকে। দহে নামতে তারও সাহস হয় নাই। সে জানে, কালোবউয়ের দেহ কাল ভেসে উঠবে। পুলিস আসবে। বনওয়ারী ওখানে ছিল বললে, বনওয়ারীকে টানবে, তাকে ছাড়বে না। সেই বা ওখানে গিয়েছিল কেন? চাঁদের আলোয় সবাই ভোলে, দারোগাবাবু ভোলে না। তাই সে ভেবেচিন্তেই বনওয়ারীকে এবং নিজেকে রক্ষা করবার জন্য বললে—জাঙলের ধারে ব'সে হাঁপাচ্ছিল বনওয়ারী। সে জানে পরম ফেরার হয়েছে। সন্দেহ যদি পরমের উপর পড়ে, তবে সে অন্যায় হবে না। কালোবউকে পরমই মেরেছে। যদি দহে ডুবে না মরত কালোশশী, তবে পরম তাকে নিশ্চয় মারত। মুহূর্তে গলা টিপে মেরে ফেলত এবং দহেই ফেলে দিত। জাঙলের ধার কোপাইয়ের দহ থেকে অনেক দূর। জাঙল গ্রাম, তারপর মাঠ, তারপর কাহারপাড়া, তারপর বাঁশবেড়ে, তারপর জঙ্গল—সেই জঙ্গলের বুক চিরে চ'লে গিয়েছে কোপাই-বেটী—কোপাইয়ের দহে ভাসবে কালোবউ। দারোগাবাবু হাত বাড়িয়ে ধরতে পারবেন না বনওয়ারীকে।

পাগল বললে পরমের কাণ্ড। বনওয়ারী মাতালশালায় বলেছিল—পরমের জাত নাই, জাত গেল, ডোমেদের সাথে মদ খেলে। পরম শুনেছিল। পথে ডাকলে বনওয়ারীকে। আমরা বুঝতে পারলাম না। তারপর এই কাণ্ড।

সকলেই বিশ্বাস করলে।

করালী উঠল।—কাঁহা সে পরম? কাঁহা?

অচেতনের মত বনওয়ারী তখন কাঁপছে। কম্প এসেছে। তার মধ্যেও সে বললে—না। পাগল, বারণ কর। আটপৌরেদের সঙ্গে দাঙ্গা ক'রে ফেলাবে ছোঁড়া। আর—

দাঁতে দাঁতে কসকস ক'রে উঠল সে। ওই—ওই ছোকরাই সব অনিষ্টের মূল। বাবাঠাকুরের বাহন মেরেছে। বাবাঠাকুরের শিমুলবৃক্ষে চড়েছে। করালীর দিকে সে তাকালে—বিস্ময়ে সে

অভিভূত হয়ে গেল। করালীর পরনে কোট পেন্ট্‌লেন। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

গোপালীবালা তার হাত দিয়ে বনওয়ারীর চোখ ঢেকে বললে পাগলকে—ও দেওর, কি ক'রে তাকাইছে দেখ, এ যে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে গো! কি হচে গো!

পাগল নাড়ী দেখতে জানে। হাত ধ'রে সে বললে—জ্বর আসছে, জ্বর। কাঁথা দাও, কাঁথা দাও।

বনওয়ারী বললে—দূর কর্, ছামনে থেকে দূর কর্—

বলতে বলতে প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে কালোশশীর দেহ ভেসে উঠল কালীদহের মাঝখানে। এলোচুল ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচছে, কালোবউয়ের দেহটা ডুবছে আর উঠছে।

পরম নিরুদ্দেশ।

দুঃখ সবাই করলে। দুঃখ করলে না কেবল নয়ানের মা। বনওয়ারীর দুর্দশায় সে খুশি হয়েছে। কালোবউয়ের মৃত্যুতেও সে পুলকিত হয়েছে। কালোবউ যে বনওয়ারীর 'অঙের' মানুষ। সে স্নান ক'রে এলোচুলে বাবাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে এল। বাবাঠাকুরের মহিমাকীর্তন করতে লাগল।

বিস্মিত কিন্তু কেউ হ'ল না।

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে ঘেরা বাঁশবাদির ইতিহাসে এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু যে বরাবরই ঘ'টে আসছে। সাপে কাটা, দাঁতালের দাঁতের আঘাতে মৃত্যু—এর তদন্ত নামমাত্র, তা ছাড়া জলে ডোবা, গাছ থেকে পড়াও প্রায় তাই, এর পর গলায় দড়ি আছে, বিষ খাওয়া আছে, নিজের গলায় বঁটি দিয়ে কাটার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় মেয়েদেরই বেশি। থানার খাতায় আছে—মেয়েরা চরিত্রহীনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতৃপ্ত বাসনা থেকে আত্মহত্যা করে। কখনও কখনও সন্দেহ ক'রে থাকে যে, আত্মহত্যা নয়—হত্যা, পুরুষেরাই হত্যা ক'রে থাকে। দু-চারজন চালানও গিয়েছে। সে সব আগের কালের কথা, একালে এসব বড় ঘটে না।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথা সব চেয়ে বেশি জানে সুচাঁদ। সে বলে—বনওয়ারীর বাবার বাবার বাবা আর আমার বাবার বাবা এক নোক তো। তা আমার কত্তাবাবা আমার পেথম কত্তামাকে শিলনোড়ার নোড়ায় মাথা ছেঁচে মেরেছেল বুকে ব'সে, নোড়া দিয়ে। বলতে বলতে সুচাঁদের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে! চুপি চুপি বলে—আটপৌরেদের একজনাকে আমার কত্তাবাবা এতের বেলায় ঘর থেকে বেরুতে দেখেছেল কি না। বাস্, মাথায় অক্ত উঠে গেল। ঘরের সামনে শিলনোড়া, সেই নোড়া দিয়ে মাথা ছেঁচে মেরেছেল পরিবারকে। তারপরে টেনে ফেলে দিল কোপাইয়ের গভ্যে; বললে—প'ড়ে পাথরে মাথা ভেঙ্গে গিয়েছে। তখন সায়েব মশায়দের আমল। সায়েবরা পুলিস ফিরিয়ে দিলে। কিন্তুক কত্তাবাবাকে চাবুক দিয়ে সপাসপ মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছেল। তাদের বুদ্ধির কাছে তো ফাঁকি নাই বাবা!

রতনের পূর্বপুরুষ চড় মেরে মেরে ফেলেছিল তার বোনকে। তখন ওই দহতে ছিল বড় বড় কুমীর, সেই দহে ফেলে দিয়েছিল লাশ।

গুপীর পূর্বপুরুষ বিষ খাইয়েছিল তার স্ত্রীকে।

পরমের পূর্বপুরুষের বাহাদুরি সব চেয়ে বেশি। সে তার বৌয়ের হাতে পায়ে বেঁধে মুখে কাপড় বেঁধে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর হাত-পায়ের দড়ি, মুখের কাপড় বার ক'রে নিয়ে হৈ-চৈ করেছিল। কেউ সন্দেহ করতে পারে নাই।

একমাত্র ছেলে মারা যেতে ঘরভাঙাদের নয়ানের প্রথম ঠাকুরমা ওই দহে ঝাঁপ দিয়ে মরেছিল। তারপর নয়ানের ঠাকুরমাকে বিয়ে করে নয়ানের ঠাকুরদাদা।

অম্লশূলের বেদনা অসহ্য হওয়ায় পানুর কাকা গলায় দড়ি দিয়েছিল।

উপকথায় অনেক কাহিনী আছে। তারই সঙ্গে কালোবউয়ের কাহিনী যোগ হ'ল। পরম নিজে যেত জাঙলের এক পাড়ায়। সেখানে নফর দাসের বোনের বাড়িতে সন্ধ্যে কাটাত। কালোবউয়ের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। পরম ডাকাতির দায়ে জেলে থাকতে সে চন্দনপুরে বড়বাবুদের বাড়িতে ছোটজাতের ঝিয়ের 'পাট' করত। বাবুদের দরোয়ান ভূপসিং মহাশয়ের সঙ্গে লোক-জানাজানি ক'রেই ভালবাসা করেছিল। তা করে। কাহারপাড়ায় অনেকে করে এমন ভালবাসা—জাঙলে সদ্‌গোপ মহাশয়ের সঙ্গে করে, চন্নপুরে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে দু-চারদিনের ভালবাসার খেলাধুলো—সে তো কেউ ধরেই না। পরম মধ্যে মধ্যে মারধোর করত, তা সে আর এমন কি। কিন্তু এই বিয়েতে যাবার কদিন আগে থেকে সে কালোবউয়ের উপর খুব তর্জন-গর্জন করতে আরম্ভ করেছিল। আটপৌরেপাড়ার লোকেই বললে—কালোবউকে উঁচু গলায় বলতে শুনেছে—বেশ করেছি, তোর খুশি তু সন্‌জে বেলা জাঙলে যেথা খুশি যাস, আমারও যা খুশি তাই আমি করি। চ'লে যাব আমি তোর বাড়ি থেকে। আমার ভাতের অভাব? লোকে বলেছে, কালোবউ সিংজীর কাছে যাবে ব'লেই শাসিয়েছিল। কাল রাত্রে পরম আর বনওয়ারী মিত্তির-বাড়ির বিয়ে থেকে ফেরার পথে কথা বলবার জন্য পিছিয়ে আসছিল। আটপৌরেরা বলে, তারা পাড়ায় এসে মদ খাচ্ছে, রাত্রি কত তা খেয়াল ছিল না, তবে চাঁদ উঠেছিল তখন, সেই সময় পরমের উঠানে পরমের ক্রুদ্ধ হিংস্র কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। কালোবউকে সে ডাকছিল—কোথা গেলি? কই? যাবি কোথা? যম আমি তোর।—বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল। দু-একজন এসেও ছিল, তখন কিন্তু পরম কি কালোবউ কেউ ছিল না, পরমের গলা শোনা যাচ্ছিল জাঙলের বাঁশবন থেকে। তারা তার গলা শুনে বুঝেছিল সে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছে। তারপর আর কিছু তারা জানে না। পরম আর ফেরে নাই। সকালে যারা নদীর ধারে গিয়েছিল, তারাই দেখতে পায় কালোবউ দহের জলে ভাসছে। তাদের অনুমান তারা ফিসফিস ক'রে বলে—পায়ে কাপড় জড়িয়ে দিয়ে পরমই তাকে দহের জলে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। কালোবউয়ের কাপড় পায়ের সঙ্গে জড়ানো ছিল। কিন্তু আসল কথা জানত পাগল কাহার। সে কিন্তু একটি কথাও বললে না। বনওয়ারীর জ্বর হয়েছে গেল রাত্রি থেকে। জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছে জাঙলের ধারে। কোপাইয়ের কালীদহ ওখান থেকে অনেক দূর।

সুচাঁদ আক্ষেপ ক'রে বলে—আঃ আঃ, কি যে দলমলে মেয়ে ছিল,—অ্যাই চুল, অ্যাই বুক,

যেমন চোখ তেমন দাঁতগুলি—কে বলবে যে যোবতি মেয়ে লয়—বয়েস হয়েছে! আঃ—আঃ! পাগল শুধু ছড়া কেটে গান গাইলে—"অঙের খেলায় যাই বলিহারি! জেবন দিলেও দিতে পারি, তবু তো ছাড়তে লারি মনের মানুষে," তারপর খেদ ক'রে বললে—আঃ—আঃ! হে ভগবান! তারপর ঝোলা-ঝম্প নিয়ে উঠল—চললাম, ঘুরে আসি দু-দিন। আশ-বিশ্বাশে নতুন গান শুনিয়ে আসি।

চ'লে গেল সে।

দিন পনেরো পর। অপরাহ্নবেলা।

রোগ থেকে সদ্য সেরে উঠে দু হাতে মাথা ধ'রে ব'সে কালোবউয়ের বিবরণ শুনছিল বনওয়ারী। তাকে শোনাচ্ছিল সুচাঁদ। বনওয়ারী চুপ করে ব'সে ছিল মাটির দিকে চেয়ে। ফোঁটা ফোঁটা জল চোখ থেকে ঝ'রে পড়ছিল। বনওয়ারীর ইচ্ছে হচ্ছিল, চীৎকার ক'রে কাঁদে। সকলের কাছে চীৎকার ক'রে বলে—জান না, তোমরা জান না, দোষ আমার। আঃ! সে যদি পরমকে দেখে ভয়ে জলে না ডুবে জল থেকে উঠে পরমকে আটকাত, তা হ'লে কালোবউ ছুটত না এমন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে। দহের কিনারায় বাবাঠাকুরের শিমুলবৃক্ষের ওই শিকড় ধ'রে উঠতে যেত না। পরমের তাড়ায় সে ছুটেছিল, করালীর পাপে বাবাঠাকুরের বাহনের দংশনে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল দহের জলে। দোষ তারই। করালীকে সে শাসন করে নাই। দোষ তারই, সে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নাই। নিজের পরাণের ভয়ে, দুর্নামের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এসেছে। সে মরলেও তো পারত। দোষ তার নিজের।

মনে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে তার। এ পাপের তার আর খণ্ডন নাই। হে ভগবান, হে হরি, হে কালারুদ্দ, হে ধরম, হে বাবা কত্তাঠাকুর, তোমরা বনওয়ারীকে মার্জনা কর, রক্ষা কর।

তাকে ঘিরে পাড়ার প্রবীণ মেয়েরা সব বসেছে। সকালবেলা মরদেরা সকলেই কাজে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠে জল পড়েছে, ধানের ক্ষেতে চাযের সময় হয়েছে। বীজ পাড়তে, জমিতে চাষ দিতে হবে। বাতের চাষ। অর্থাৎ সময়ের চাষ। এ সময় একটা 'বাতের চাষ' বিঘেভুঁই দু-গাড়ি সারের সমান। এ কামাইয়ের সময় নয়। 'খানিক আদেক' শরীরের 'বেজুত' অর্থাৎ অসুস্থতা চাষের মুনিষে এ সময় গ্রাহ্যও করে না। তা ছাড়া মনিব আছে, মনিবে বলে—এত যারা 'সুকুমোরী' তাদের আবার চাষ করা কেন? কথা ঠিকই বলেন তাঁরা। 'ঘি নইলে মাড়ন হয় না', পাঁচন নইলে গরু হাঁটে না, সওয়ার নইলে ঘোড়া ছোটে না, তেমনি মনিব—ওই সদ্‌গোপ মহাশয়দের মত চাষী মনিব ছাড়া কৃষাণ-কাহার মুনিষ ঠিক ঠিক কাজ করে না। বাবুদের হ'ল অন্য কথা। তাঁদের ঠিক চাষে মন নাই। সদ্‌গোপ মনিবদের কাহার কৃষাণেরা কেউ বাড়ি নাই। বনওয়ারীকে ঘিরে আছে পাড়ার প্রবীণ মেয়েরা। শুধু নয়ানের মা বাদে।

মেয়েদের দলের মধ্যে বসনও এসে সেই সকাল থেকেই ব'সে আছে।

তার সমস্যা মেয়ে-জামাই নিয়ে। করালী পাখী কোঠাঘর তুলল। এই নিয়ে পাড়ার মেয়েরা যে গবেষণা করছে, তাতে তাকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে। সে নিজেও ভেবে দেখেছে, কেউ কখনও

করে নাই। করালী করছে—অনিষ্ট ঘটা বিচিত্র কি ? কিন্তু করালী মানবে না। অন্য কোন মেয়ে হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াই হয়ে যেত। সুচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে করালী পাখীর। করালী সুচাঁদকে প্রায় দূর ক'রেই দিয়েছে। সুচাঁদ কাঁদছে, বাবাঠাকুরকে ডাকছে, করালী-পাখীকে এবার আর অভিসম্পাত দিচ্ছে না, তিরস্কার করছে এবং বাবাঠাকুরকে বলছে—মতি ফিরিয়ে দাও, সুমতি দাও। প্রথম দিন সে আনন্দে গৌরবে পাখীর বাপের জন্য, নিজের বাপের জন্য কেঁদেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছে বিপদ। সর্বাগ্রে সে-ই বুঝেছে। বারণ করতে গিয়েছিল। করালী তাকে দরজা দেখিয়ে বলেছে—নিকালো অর্থাৎ বেরিয়ে যাও।

ও-পাশ থেকে নয়ানের মা ফোড়ন দিয়েই চলেছে।—হে বাবা, একবার যেমন নিয়েছ, আবার তেমনি ক'রে নিয়ো। তোমার বাহনের বিষ নিঃশ্বাসে 'ফুস্ ধা' ক'রে দিয়ো। সঙ্গে সঙ্গে এবার ত্থাল চাপা বাবা। কোঠাঘরের ত্থাল—হুড়মুড় ক'রে।

নসু গাল দিচ্ছে ইঙ্গিতে—হাঁপাতে হাঁপাতে 'ফুস্-ধা' হয়ে যাবে লো! অর্থাৎ নয়ান। যে মুখে পরের মন্দ চায় লোকে, সে মুখে লোকের পোকা পড়বে লো!

দু হাতের বুড়ো আঙুল নাড়ছে আর ঢেউয়ের মত দুলছে।

বাকি গোটা পাড়াটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কালবৈশাখীর অপরাহ্ণের মত। বনওয়ারী ভাল হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছে। করালী ভীষণ হাঙ্গামা বাধিয়েছে। সে বাবাঠাকুরের শিমূলবৃক্ষের চেয়ে মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে। সত্যিই উঠেছে। আবার সেদিন শিমূলগাছের উপরে উঠেছিল। এবার আর ডালে উঠেই ক্ষান্ত হয় নাই, একেবারে ডগায় উঠে কাহারপাড়াকে হেঁকে বলেছিল—দেখ্।

করালীর অপরাধেই যত অঘটন ঘটছে, এই অপবাদের প্রতিবাদেই সে গাছটায় আবার উঠেছিল। এবার সে চমৎকার একটা টিয়াপাখীর ছানা পেড়ে এনেছে শিমূলবৃক্ষের কোটর থেকে। আগের থেকে অনেক গুণ তার বাড় বেড়েছে। কোট পেন্টুলেন প'রে বেড়াচ্ছে। বলে—যুদ্ধের পোশাক। যুদ্ধের চাকরি নিয়েছে করালী। হঠাৎ সেদিন ওই পোশাক প'রে এসে বললে—যুদ্ধের চাকরি নিলাম। এবার আর দিন-মজুরি নয়। মাসমাইনে। পায়ে জুতো। ফোস্কা পড়েছে, খুঁড়িয়ে চলছে, তবু জুতো ছাড়বে না। ছোঁড়ারা সব চুলবুলিয়ে উঠেছে। প্রবীণদের আশঙ্কার অবধি নাই। কিন্তু বসনের সমস্যা কোঠাঘর। সেই কোঠাঘরের কল্পনা যে কাজে পরিণত করতে শুরু করেছে। ঘর আরম্ভ করে দিয়েছে।

বিয়েবাড়ি থেকে ফিরেই হ'ল বনওয়ারীর অসুখ। বসন বিব্রত হয়ে ধরেছিল রতনকে, প্রহ্লাদকে। পাগল থাকলে ভাল হ'ত কিন্তু সে সেই দিনই সকালে চ'লে গিয়েছে, ব'লে গিয়েছে—দুদিন ঘুরে মন ভাল ক'রে আসি। পনেরো দিন হয়ে গেল, আজও ফেরে নাই।

রতন প্রহ্লাদ অবাক হয়ে বলেছিল—কোঠাঘর।

—হ্যাঁ। তোমরা বারণ কর। যা পিতিপুরুষে করে নাই, তা করতে নাই।

রতন এসে বললে—করালী ?

—কি ?—করালী বুঝতে পেরেছিল।

—কোঠাঘর করছিস তু ?

—হ্যাঁ।

—পিতিপুরুষে কখনও করে নাই—

—তা না করুক। আমার বাবা যুদ্ধের কাজও করে নাই।

রতন এগিয়ে এল এবার।—দেখ্ করালী। কথা শোন্। ভাল। আমাদের কথা না শুনিস, বনওয়ারীর কথা শুনবি তো?

—যদি না শুনি?

প্রহ্লাদ এবার ধমক দিয়ে বললে—শুনতে হবে। সবাই শোনে, তুমি শুনবে না কি রকম? সে সেরে উঠুক, তার সাথে শলা পরামশ্য ক'রে যা বলে করবি।

করালী বলেছিল—যাঃ কচু খেলে। এর আবার শলাই বা কিসের, পরামশ্যই বা কেনে? যাও যাও। তোমাদের শলা পরামশ্য যদি লাগে তো মাতব্বরের জর ছাড়ার লেগে ব'সে থাকো গা। আমার শলা পরামশ্য চাই না।

প্রহ্লাদ বলেছিল—ঘর করতে হ'লে নেয়ম হ'ল মাতব্বর এসে দড়ি ধরে।

—আমি নেয়ম মানি না।

—তোর বুঝি গায়ে জোর হল্‌ছে বেজায়? ধরাকে সরা দেখছিস?

—সরা নয়, খুরি। যাও যাও, মেলা ফ্যাঁচফ্যাঁচ ক'রো না।

রতন মাথলার বাবা, মাথলা করালীর সাকরেদ, রতন তাকে বলেছিল—দুদিন সবুরই কর্ না কেনে বাবা।

—উঁহু! বর্ষার আগে ঘর সারতে হবে অতনকাকা। সবুর করবার টায়েম কোথা? আমার আবার যুদ্ধের চাকরি। যেখানে হুকুম করবে, যখন বলবে, তখুনি যেতে হবে।

রতন বলেছিল—কিন্তু ভাল কাজ হচ্ছে না করালী। কেউ কখনও করে নাই কোঠাঘর।

—না করুক। আমি করবই।

গুপী বলেছিল—যা কেউ করে নাই, তা করতে গেলে খ্যানত হয়। চৌধুরী মাশায়রা দালান করতে ইট পোড়ালে, লোকে বারণ করেছিল, সে আমলে চৌধুরী শোনে নাই, ইটের ভাঁটা পুড়ল —উদিকে চৌধুরী মাশায়ের ছোট বেটা ধড়ফড়িয়ে ম'রে গেল।

—আমার তো বেটা হয় নাই এখনও।—হেসে জবাব দিয়েছিল করালী।

আপসোস হচ্ছে বসনের। এ জামাই নিয়ে কখনও সুখ পাবে না সে। এই সব কি কথা-বার্তার ধরন, না, ছিরি! এই সব মাথার মাথার লোকের সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা যখন করালী বলে, তখন বসন ভয়ে লজ্জায় সারা হয়ে যায়। নিমতেলে পানুকে তো সে মারতে বাকী রেখেছে। নিমতেলে পানু করালীর সামনেও আসে নাই। মুখোমুখি তাকে কোন কথা বলে নাই; নিজের বাড়িতে ব'সে সে নয়ানের মাকে বলেছিল—এ কাল তাকাৎ তিন তিনটে মোড়ল-মাতব্বরের গুষ্টি গুজুরে গেল—আটপৌরেদের পরমদের ঘর, ঘরভাঙাদের বাড়ি, কোশকেঁধেদের গুষ্টি, তারা কেউ কোঠাঘরে পরিবার নিয়ে শোয় নাই বাবা।

কথাটা করালীর কানে উঠতেই সে পানুর বাড়ি ব'য়ে গিয়ে তার সামনে উপু হয়ে ব'সে বলেছে

—হা শালো, মাতব্বরেরা কোঠায় শোয় নাই ব'লে আমি শুতে পাব না?

নিমতেলে পানু সেদিন সেই চড় খাওয়া অবধি করালীকে দুর্দান্ত ভয় করে। সে কোন জবাব দেয় নাই। করালী তবু ছাড়ে নাই, নিরুত্তর পানার মুখের সামনে ঠিক পানার মত ভঙ্গিতে ব'সে ভেঙিয়ে মৃদুস্বরে শ্লেষের সঙ্গে বলেছে—হা শালো, বনওয়ারী মাতব্বরের পরিবারের যে রঙ কালো, দেখতে সে যে কুচ্ছিৎ—তা ব'লে আমি ফরসা সোন্দর মেয়ে বিয়ে করতে পাব না? তোমার পরিবারের তো অঙ ফরসা, তা—তাকে তুমি ছাড়। শালো। বলি ওরে শালো!—ব'সে ব'সেই খানিকটা এগিয়ে গেল পানুর দিকে।

পানু বেচারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সভয়ে সেও ব'সে ব'সেই পিছিয়ে স'রে যেতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল—ওই—ওই, উ সব কি কথা?

করালীও ব'সে ব'সে পানুর দিকে আরও এগিয়ে গিয়েছে আর বলেছে—ইটের বদলে পাটকেল রে ছুঁচো।

—তোর যা মন তাই কর্‌গা কেনে? আমার কি?

আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে ব'সে করালী প্রশ্ন করেছে—তাই তো শুধাইছি রে ছুঁচো, তোর কি? আমি কোঠাঘর করব, তাতে তু কথা বলবি কেনে? শালো ছুঁচো!

বসন্ত বার বার অনুরোধ ক'রেও করালীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নাই। মহিষের মত তার গোঁ। অবশেষে পাখী এসে তাকে ক্ষান্ত ক'রে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যেমন করালী, তেমনি পাখী। মেয়ের রঙ যেমন গোরো, তেমনি তেজ—

যেন আগুনের হল্‌কা। ভয়-ডর নাই। করালীকে বললে—উঠে আয়।

করালী গ্রাহ্য করলে না।

—শুনছিস?

—না।

মেয়ে এসে ধরলে তার হাত, ছাড়িয়ে নিলে করালী। পাখী ধরলে তার চুলের মুঠো, করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুল ছাড়িয়ে রেগে উঠল, হাঁক দিয়ে উঠল—অ্যা-ই। সঙ্গে সঙ্গে পাখী নিজের কপালে পাগলের মত কিল চড় মারতে আরম্ভ করলে—এই লে—এই লে—এই লে।

করালী হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর গিয়ে তার হাত ধ'রে মিষ্টি কথায় আনুগত্য স্বীকার ক'রে বললে—চ চ বাপু, চ। ঘর যেছি আমি। থাম্ বাপু, থাম্। আসবার সময় নয়ানের মাকে ব'লে এসেছি, মরাকে আমি কোন কথা বলি না। মরার গালেও আমার কিছু হবে না। দে তুই, গাল, দে যত পারিস।

পাখী তাকে নিবৃত্ত করতে পারে কোঠাঘর তোলার সঙ্কল্প থেকে। কিন্তু পাখীও ক্ষেপেছে কোঠাঘরের জন্যে। যেমন এ কালের ছেলে, তেমনি এ কালের মেয়ে। পাখী বলে—চন্নপুরের বাউরীরা কোঠাঘর করেছে—হারু বাউরী, শম্ভু বাউরী, কানাই বাউরী।

—সে তো চন্নপুরে। আর তারা তো কাহার লয়।

—তা হোক কেনে।

তাই বসন্ত এসে ব'সে আছে বনওয়ারীর কাছে। সুযোগ পেলেই বনওয়ারীকে বলবে। করালীকে এক সে-ই নিবৃত্ত করতে পারে। তা ছাড়া আর একটা আশঙ্কা আছে তার। করালী যাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে,তারা নিশ্চয় সাতখানা ক'রে বনওয়ারীর কাছে করালীর বিরুদ্ধে লাগাবে। বনওয়ারীকে বুঝিয়ে সে আগে থেকেই ঠাণ্ডা ক'রে রাখতে চায়। বনওয়ারী মাতব্বর বিরূপ হ'লে করালীর কি হবে, সে কথা ভেবে বসন্তের অনেক আশঙ্কা। কিন্তু এ মজলিসের মধ্যে বলবার সুযোগ পাচ্ছে না সে। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সুযোগ মিলল। হঠাৎ বনওয়ারী উঠল। গোপালীবালা বললে—এই, কোথা যাবা?

—বাবাঠাকুরের থানে। তার মুখ দেখে কেউ 'না' বলতে পারলে না।

বনওয়ারী উঠতেই বসন্ত বললে—চল, আমি যাই সাথে।

স্নেহভরে বনওয়ারী বললে—আসবি? আয়। লইলে বনওয়ারী একটা জ্বরে কাবু হয় না, এখনও তোর এক কোশ পথ গিয়ে ফিরে আসতে পারি, দুপুরের মধ্যে। একটু হাসলে সে।

যাবার পথে হেসে বলদ দুটি এবং গাই কয়টির কাছে দাঁড়িয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে। ডাইনের আটকেলে অর্থাৎ সাদার উপরে আটটি কালো দাগবিশিষ্ট বলদটা বনওয়ারীর বড় ন্যাওটা। ওটা তার ঘরেরই বাছুর—বলদটা তার হাত চেটে মাথা নেড়ে নানা ভঙ্গিতে আনন্দ প্রকাশ করলে। বনওয়ারী একটু প্রসন্নতার স্পর্শ পেলে ওদের কাছ থেকে। মনে মনে বললে—মা ভগবতী, তোমাদের সেবার তো কখনও ত্রুটি করি না মা, তোমাদের আশীর্বাদে আমার এই পাপটি খ'ণ্ডে দাও।

পথে সেই আটপৌরেপাড়ার বটগাছের তলায় কালোবউয়ের সঙ্গে তার দেখা হ'ত। বনওয়ারী বললে—একটুকুন দাঁড়া বসন।

বসন ভাবলে, ক্লান্তি। বললে—না এলেই হ'ত। বললে—পরে আমি এসে কত্তার থানের মিস্তিকে নিয়ে যেতাম।

বনওয়ারী উত্তর দিলে না। সে ভাবছে। কালোবউয়ের কথা, তার অপরাধের কথা।

—বনওয়ারী হা? অর্থাৎ বনওয়ারী নাকি?

বনওয়ারী ফিরে তাকালে। আটপৌরেপাড়ার বুড়ো রমণ আটপৌরে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে। রমণ পরমের আত্মীয়—ভায়রাভাই, কালোশশীর বড় বোনকে সে বিয়ে করেছে। বনওয়ারী তার বাঁকা ভেঙে-পড়া মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। রমণ প্রবীণ লোক, সুচাঁদের বয়সী। তবে সুচাঁদ শক্ত আছে, রমণ ভেঙে যেন দুমড়ে গিয়েছে। এক সময় রমণ শাহী লম্বা ছিল। লোকটাকে রোগেও ধরেছে। বনওয়ারী শঙ্কিত হ'ল। পরম-কালোশশীর আত্মীয় রমণ তাকে দায়ী করতে এল নাকি? বনওয়ারী জোর ক'রে হেসে বললে—হ্যাঁ গো। যাব একবার কত্তার থানে। তা যে বিকেলের ওদ, বারো-চোদ্দটা রোপবাস হ'ল, শরীরে বল নাই, তাই বসলাম একবার গাছতলায়!

বসন বিরক্ত হ'ল। কথাগুলি বলবার বড় সুন্দর সুযোগটি তার মিলে ছিল।

রমণ বনওয়ারীর কাছে বসল। বললে—পরমদের বেপার তো সব শুনেছ? আঃ, কালোশশীর লেগে দুঃখ হয় আমার।

আবার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। কে জানে বুড়ো কি বলবে? আটপৌরেপাড়ার কেউ কি জানে না, কেউ কি শোনে নাই, পরম যে কথা জেনেছিল পানার কাছে? পানা কি—

রমণ বললে—যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ মানেন না আপন বাপ। বুঝলে কিনা—পরমের পাপের ফল। কালোশশীরও বটে; নইলে অপঘাতে মিত্যু! অনেক মানা করেছি তাকে। ভূপসিং ব্রাহ্মণ, তার পরশে পাপ হয়—কতবার বলেছি।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

রমণ বললে—আচ্ছা, সেদিন এতে আসবার পথে কি কথা বলবার লেগে ডেকেছিল পরম? কি বলেছিল তোমাকে?

বনওয়ারীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

—বনওয়ারী!

বনওয়ারীর একটা কল্পিত কাহিনী চকিতে মাথার মধ্যে এসে গেল। সে বললে—বলেছিল চন্নপুরের সিং মশায়ের কথা। বলে—ভাই, তু যদি আমার সাথে থাকিস, তবে এই শালাকে একদিন ঠেঙাই। বলে—সাবাড় ক'রে শালোকে দহে ফেলে দোব গলায় কলসীতে বালি ভ'রে। তা আমি অনেক বুঝালাম। শেষ চটাচটি হ'ল আমার সাথে। আমাকে বললে—আমার জাত গিয়েছে বললি কেনে মাতালশালায়? ব'লে আচমকা লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে। তা'পরে মারামারি। আমি কাবু হয়ে গেলাম। আমাকে ফেলে তখন হনহনিয়ে চ'লে এল। কি করব আমি, সব্বাঙ্গে বেথা, ধুলো বালি—পথে পুকুরে নামলাম। তখন শুনলাম, কালোবউকে গাল দিতে দিতে যেছে পরম। আমার তখন জ্বর এয়েছে—কাঁপছি। তা'পরেতে তো পাগল গেল—। সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে।

রমণ বললে—যাক্, তোমারও যে জ্বর। ডরিয়েছিল সকলে। বেঁচেছ এই কাহারপাড়ার ভাগ্যি। না মাথা, না ছাতা। এক তুমিই আছ। আমরা এ পাড়ায় তাই বলি, অমনি মাতব্বর যদি আমাদের হ'ত। তা সে দিনে আমি বললাম পাড়াতে যে, আর আমাদের আলাদা হয়ে থেকে কাজ কি? এক হ'লেই হয়। করণ-কারণ কর, বিয়ে-সাদী হোক। আমাদের আটপৌরে আর ক ঘর? বাঁশবাঁদি ছাড়া তুই হোথা—হেথাকার নীলকুঠি যেথা ছিল, সেথাকে দু'ঘর চার ঘর আছে। তাও আবার সব জাগায় নাই। তুমি বাবা, মাতব্বর হয়ে এইটি কর। নইলে আট-পৌরেপাড়ার পিতুল নাই। আমি বিদ্ধ হলাম, এখনও আমার দাগী নাম ঘুচল্ না বাবা।

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

এ কি ভগবান হরি কালারুদ্দু কত্তা ঠাকুরের লীলা! মনে মনে সে প্রণাম করলে দেবতাদের। এ কি দুঃখের মধ্যে সুখ, ভাঙনের মাঝে গড়ন!

সে বললে—একটুখানি সারি অমনদাদা। তা পরতে হবে সব কথা।

রমণ বললে—তোমার শরীলে বল হোক, একদিন নিয়ে যাবা আমাদিগে চন্নপুরে বড়বাবুর কাছারি। পরম তো ফেরার। সে আর ফিরবেও না। তা সাহেবডাঙায় পরম যে জমি পাঁচ বিঘে নিয়েছিল, আমাদের আটপৌরেরা ভাগ ক'রে লোব। বাবুর একটা 'রনুমতি' তো চাই। তা

আমাদের হয়ে সে কথা বলবার নোক নাই।

বনওয়ারী উঠল। রমণের কথাটা সে বুঝেছে।

*　　　*　　　*

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে 'কত্তার থানে'র শোভাটি হয় মনোরম। বেলগাছগুলি অজস্র কচি পাতায় ভ'রে উঠেছে, কুলঝোপগুলিতেও কচি পাতার সমারোহ, বেলগাছের পাতায় সমৃদ্ধির মধ্যে পাকা বেল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গন্ধ উঠছে। কিন্তু কর্তা স্বয়ং যে গাছটিতে থাকেন, সে গাছটির আশ্চর্য মহিমা। সকল গাছে পুরনো পাতা ঝরতেই চৈত্রমাসের বিশ-পঁচিশ দিন চলে যায়, তারপর বেলগাছ কয়েকদিন ন্যাড়া হয়ে থাকে—শুধু বেলগুলো ঝুলতে থাকে, বৈশাখের আট-দশ দিন গেলে তবে কচি পাতা দেখা দেয়। কিন্তু কর্তার বাস যে গাছটিতে, সেটির পাতা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে ঝরে যাবেই, গাজনের আগে তাতে পাতা দেখা দেবেই। না দিলে চলবে না যে! জাঙলের বাবা কালারুদ্রের মাথায় গাজনের পুজোয় ঐ গাছের নতুন বেলপাতা প্রথমেই চড়াতে হয় যে! এমন চৈত্র মাসে পাতা-ধরা গাছ এ চাকলায় আর নাই। বাবার মহিমায় গাছটির আশেপাশে এই বিল্ব-বৃক্ষের দু-চারটি চারাপল্লবও হয়েছে। হবেই যে, যুগে যুগে এ মাহাত্ম্য বজায় থাকতে হবে তো। শ্যাওড়াগাছগুলিতেও নতুন পাতা ধরেছে। সোয়াকুলের ঝোপগুলিতেও নতুন পাতা। গাছগুলির মাথায় চারিপাশের কুলঝোপগুলির মাথা ছেয়ে আলোকলতা ছড়িয়ে পড়েছে ছাতার মত। মধ্যে মধ্যে ফুলে-ভরা ধুতরা ও আকন্দের গাছ; সবচেয়ে বাহার দিয়েছে একটা বাঁদরলাঠির গাছ। গাছটা ভ'রে অজস্র হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে—লম্বা ডাঁটায় অসংখ্য ফুল। ফুলের ভারে নুয়ে প'ড়ে দুলছে। ফুলঝুরি না বললে সে ফুল ফোটার সঠিক বর্ণনা হয় না। চারপাশে তালগাছের বেড়া। তাল ধরে হয়েছে কাঁদি কাঁদি। কর্তার থানটির আর একটি মহিমা—চারপাশে নজর চলে। পুবে ওই দূরে—পলেনের মাঠের কিনারায় দেখা যাচ্ছে বাঁশবাঁদি, তার পাশে সেই দহ, যে দহে ডুবেছে কালোবউ। উত্তরে তাকাও, দেখবে, দেখা যাচ্ছে জাঙল গ্রাম। উত্তর-পূর্বে চন্ননপুর ইষ্টিশান একেবারে পরিষ্কার দেখতে পাবে। পশ্চিমে তাকালে সায়েবডাঙা নজরে পড়বে। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে তাকাও, নজরে পড়বে—কোপাইয়ের হাঁসুলী বাঁকের প্রথম খোঁচ। মোটা কথা, কর্তা এই বেলগাছটিতে ব'সে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করেন, আর গোটা হাঁসুলী বাঁকে তাঁর দৃষ্টি দেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে মানুষের ঘরে সুখ শান্তি উছলে প'ড়ে, মাঠে ফসল লুটিয়ে পড়ে, পশ্চিম আকাশের ঝড় সসম্মানে হাঁসুলীর বাঁকের পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়, কোপাইয়ের বান দুকূল ভাসিয়ে আসতে আসতে এ কূল ছেড়ে ও কূল ভাসিয়ে চ'লে যায়। আবার কোপদৃষ্টি হানলে এর উল্টো হয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, ঝগড়াঝাঁটি, লাঠালাঠি, মনে মনে অসুখ, গাঁয়ে গাঁয়ে বিবাদ, আকাশে অনাবৃষ্টি, মাঠে অজন্মা, মাথার উপর ঝড়, কোপাইয়ের বান সেবার হাঁসুলীর বাঁকের ওই প্রথম খোঁচই বল আর খাঁজই বল—ওইখানে যে বাঁধ আছে, সেই বাঁধ ভেঙে হাঁসুলীর বাঁক ভাসিয়ে চ'লে যায়।

উপুড় হয়ে পড়ল বনওয়ারী বেলগাছের সামনে। হে দয়াময়, হে প্রভু, হে হাঁসুলী বাঁকের মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক, হে বাবা ইহলোকের রক্ষাকর্তা, পরলোকের ত্রাণকর্তা, তুমি বনওয়ারীকে রক্ষা কর, ত্রাণ করবার ভরসা দাও। সকল পাপ তুমি ক্ষমা কর। পাপ সে করেছে—একশো বার

হাজার বার সে স্বীকার করছে তোমার চরণতলে। চোখ থেকে তার জল পড়ল। অনেক প্রার্থনা ক'রে সে উঠে বসল।

বসন অবাক হয়ে গেল তার চোখের জল দেখে। বনওয়ারীদাদা ভাল লোক, ধর্মিষ্ঠ তা সে জানে; কিন্তু এত বড় ধর্মাত্মা তা সে জানত না। মাথার উপর রোদ চড়ছে, বনওয়ারীর দুর্বল শরীর, তাড়াতাড়ি ফেরাই উচিত,কিন্তু এর পর আর সে-কথা বলতে তার সাহস হ'ল না। গাছের ছায়া দেখে সেইখানেই বনওয়ারী বসল উবু হয়ে। এতক্ষণে তার মন খানিকটা শান্তি পেলে। বুকের ভিতরের উদ্বেগ অনেকটা উপশম হ'ল। কর্তাবাবার কৃপায় পাপের অবশ্যই খণ্ডন হবে। মনে মনে সে মানতও করেছে। তারপর রমণের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেও ভাল হয়েছে; পরমের সঙ্গে পথের বৃত্তান্তটাও খুব চমৎকার হয়েছে; এর পর আর কোন দোষ তার ঘাড়ে আসবে না। অপরাধ অবশ্য তার অল্পই। সে পরমকে ইচ্ছা করলে মেরেই ফেলতে পারত, কিন্তু মারে নাই। কালোবউকে নিজেও সে ডাকে নাই। সে তাকে দেখতে গিয়েছিল। বলতে গিয়েছিল, পরমের আসবার কথা। কালোবউই নিজে থেকে তার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে। পরমই কালোবউকে খুন করতে গিয়েছিল। কালোবউ নিয়তির টানে গিয়ে পড়ল কর্তার দহে। বলতে গেলে কর্তাই তাকে সাজা দিয়েছেন। তার অপরাধ—সে জলে ডুব মেরেছিল পরমকে দেখে, উঠে বাধা দেয় নাই, আর কালোবউকে তুলবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাই। ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠল সে। ভাগ্যও ভাল যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নাই; নইলে সেও আর উঠত না। বাবার বাহন—বাবার বাহনই তাকে দহের বুকে ডুবিয়েছে। সে চোখে দেখেছে। করালীর পাপেই মরল কালোবউ।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পাপ আছে—পুণ্য আছে। পাপপুণ্যের চেয়ে, বিষয়বুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি বলাই ভাল। সংসারের বাঁশবন এবং জৈব কামনার আদিমকালের আপনি-জন্মানো, বট-অশত্থ-শিমুল-শিরীষ গাছের ঘন বনের ছায়ার তলায় জন্মানো পাপপুণ্যবুদ্ধির গাছগুলির চেহারা বিচিত্র—হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে এবং বটবনে সযত্নে পোঁতা আম-কাঁঠালের চারার মত বিবর্ণ এবং হিলহিলে তাদের চেহারা, বট অশ্বত্থ এবং বাঁশবনের ওই ঘন ছায়ার মধ্যেও এরা আলোক ও উত্তাপের কিছু কিছু আস্বাদ পায় এবং আরও বেশি পেতেও গভীর কামনা তাদের আছে। কিন্তু কোন মতেই যেন পেরে উঠছে না—হাঁসুলী বাঁকের মাঠ যেন বটগাছ বাঁশগাছকেই বেশি রস দিচ্ছে। কাহারেরা সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকে এই আম কাঁঠালের গাছগুলির দিকে। কবে বড় হয়ে ছাড়িয়ে উঠবে বাঁশবনের অন্ধকার! বটের পাশে ওরা মেলবে পল্লব! কবে দেবে ফল! কিন্তু কোন ভরসাই পায় না। এই গাছগুলি মরছে অথবা বাঁচবার পথে বাড়ছে—সে কথায় কাহারপাড়ায় দ্বিমত রয়েছে। সুচাঁদের মত হ'ল, মরছে—নিশ্চয় মরছে। অধিকাংশ প্রবীণের মতই তাই। সুচাঁদ বলে—সেকালে লোকের ভক্তি কত ছিল। ঘর ঘর দিত মানসিকের পাঁটা। অ্যাই বড় বড় পাঁটা, অ্যাই তার ভাড়ি। ড্যার বছর এক বয়েস না হ'লে বলিদানই দিত না। আতে চুরি করতে যেত মরদেরা—কত্তার ঠাঁইটিতে পেনাম ক'রে যেত। মেয়েরা কারুর সাথে অঙ করতে—আগে কত্তার গাছতলায় একখান সিঁদুর দিয়ে তবে অঙ করতে নামত। কত্তা লোককে স্বপনে আদেশ দিত। গুপীর

কর্তাবাবা মাথা ঠুকলে কত্তাবাবার গাছের শেকড়ে—ই পরিবার নিয়ে আমি কি করি, তা বল বাবা তুমি। গুপীর কত্তামায়ের অঙ হয়েছিল ওই পাড়ার একজনার সাথে। বাবা স্বপন দিলে—মেরে ফেলাও বিষ দিয়ে। স্বপনে বাবা ইয়েদের গরুমারা বিষ হাতে দিয়ে বললে—এই লে। সেই বিষে মরল গুপীর কত্তামা। তারপর সে বলে—সে আমও নাই, সে অযুধ্যেও নাই। মানুষের সে বেক্কম নাই—ভক্তি নাই, বাবাও নিজের মহিমে গুটিয়ে নিয়েছেন। যেমন কলি তেমনি চলি। কলিকালে ধম্মই নাই। তাই মানুষের হালচাল এমুনি। জাঙলের চৌধুরী মাশায় বলতেন—কলি-কালে ধম্মের এক ঠ্যাঙ। তাও ক্ষ'য়ে আসছে।

ক্ষ'য়ে এলেও খানিকটা আছে, তাই এখনও কিছু কিছু আছে। বনওয়ারী তার উল্টো মত অবশ্য পোষণ করে না, কিন্তু তবু সে প্রত্যাশা করে—হাঁসুলী বাঁকের মধ্যে সে ধর্মের ওই একটি ঠ্যাঙকে আর ক্ষ'য়ে যেতে দেবে না। বনওয়ারী এসে গড়িয়ে পড়ল বাবার থানে। সান্ত্বনাও সে পেলে। মনে মনে বললে—ক্ষমা কর, বাবা, ক্ষমা কর। আমি তার জন্যে দায়ী নই। তবে করালীকে আমি সাজা দিই নাই, সে অপরাধ আমার বটে। কিন্তুক হে বাবাঠাকুর, তার জন্যে তো আমার বুক খালি ক'রে কালোবউকে কেড়ে নিয়েছ। এইবার তোমার কোধ শান্ত কর।

যে যতই বলুক, বনওয়ারী জানে, কালোবউয়ের সঙ্গে তার 'অঙে'র খেলার অপরাধ বাবা-ঠাকুরের কাছে বড় পাপ নয়। অজ্ঞান কাহারদের এ অপরাধ ধরেন না বাবা। বাবাঠাকুর কাহারদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক—তিনি বোঝেন যে কাহারদের 'অঙের' খেলা ছাড়া আর কোন মন-ভুলানো খেলা নাই। বাবাঠাকুরের কাছে প্রধান অপরাধ করেছে করালী। সেই বাহনটিকে পুড়িয়ে মেরেছে। তাঁর শিমূলবৃক্ষে বার বার উঠে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত করেছে। করালীই আবার কাহারপাড়াকে যুদ্ধে যেতে বলেছে। অসুখের মধ্যে এই সব ভাবনা ভাবতে গিয়ে বনওয়ারী একটি নূতন সত্য পেয়েছে। বাহনের শিসের মানে বুঝেছে। শিস দিয়ে দিয়ে সাবোধান ক'রে দিচ্ছিলেন হাঁসুলী বাঁকের কাহারকুলকে—সাবোধান! হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে নিত্যি উড়বে—উড়োজাহাজ। চন্ননপুরের জাতনাশা কারখানা বেড়ে এগিয়ে আসবে এই দিকে। পিথিমীতে যুদ্ধ লেগেছে—সাবোধান! করালীকে আড়াল করতে গিয়ে বাবাঠাকুরের হাতে মার খেলে বনওয়ারী, বনওয়ারীর বুকে আঘাত দেবার জন্যেই বাহন ছোবল দিলে কালোবউয়ের বুকে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে রইল বেলগাছটির তলায়। সামনেই পশ্চিমে সায়েবডাঙা; সেখানে কালো কালো মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে গরম বৈশাখী দমকা বইছে। আটপৌরে-পাড়ার সেই বটগাছটায় সাড়া জাগছে নতুন কচি পাতায় পাতায়।

সায়েবডাঙায় কালো কালো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে—বাবুরা জমি কাটাচ্ছে। ওরা সাঁওতাল। বনওয়ারীর জমি আর এবার কাটানো হ'ল না। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়লে।

বসন পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বনওয়ারীর মুখের চেহারা দেখে তার কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। আর একবার যদি বনওয়ারীদাদা হাসে!

হঠাৎ বনওয়ারী উঠল। সুযোগ পেয়ে বসন্ত কথা বললে—চল, বেলা অনেক হয়েছে।

পথে সে সাহস ক'রে বললে—বনওয়ারীদাদা!

—হুঁ।

—তুমি বাবু করালীকে একবার বারণ করবে।

—কাকে? করালীকে?—চোখ দুটো তার জ্ব'লে উঠল। বসন ভয় পেলে।

বনওয়ারী বললে—শুনেছি কোঠাঘর করছে সে? হবে তার বোঝাপড়া। একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে আবার বললে—আমি কি কোঠাঘর একখানা করতে পারি না বসন?

শিউরে উঠল বসন্ত। মনে পড়ল—করালী বসন্তকে এই কথার উত্তর কি দিয়েছে। বসন্ত বনওয়ারীর মনও ঠিক বুঝতে পারছে না। করালী তো কম নয়। শেষে কি দুজনে—? কত কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ বনওয়ারী থমকে দাঁড়াল। বনওয়ারীর কিন্তু সবই অদ্ভুত! বসন বললে—কি হ'ল? বলতে বলতে পিছন থেকে ঘূর্ণি হাওয়া এসে দুজনকেই আবৃত ক'রে দিলে। ধুলোয় পাতায় সর্বাঙ্গ ভ'রে গেল—মুখে ধুলোবালি ঢুকল। বসন্ত এবার এটাকেই তামাশার ভূমিকা ক'রে নিয়ে অপরিমিত হাসতে লাগল—থু-থু, মা গো! পরক্ষণেই সে বিস্মিত হয়ে বনওয়ারীকে বললে—কি হ'ল বনওয়ারীদাদা? দাঁড়ালে?

বনওয়ারী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ঘূর্ণিটা তাদের অতিক্রম ক'রে সামনে এগিয়ে চলেছে। অদূরেই আটপৌরেপাড়ার বটগাছটা। ঘূর্ণিটা এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডের গায়ে খুব ঘুরপাক খেয়ে থেমে গেল। গাছের পল্লবে পল্লবে চঞ্চলতা জেগে উঠল।

বনওয়ারী কাঁপতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝেছে বসন। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—বা-বাওড়? অর্থাৎ ভূত?

বনওয়ারী তার হাতটা ধ'রে বললে—পাশে পাশে আয়। বসন্ত তার হাতটা ধ'রে দেখলে, বনওয়ারীর হাতটা ঘামছে, থরথর ক'রে কাঁপছে। বনওয়ারী তাকে সাহস দিতে চায়, না, তার কাছ থেকে সাহস পেতে চায়—বুঝতে পারলে না।

সে ডাকলে—ব্যানোদাদা!

বনওয়ারী উত্তর দিলে না। হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী মাতব্বর ঠিক চিনেছে,বসন চিনতে পারে নাই। কালোবউ!—কালোশশী! আর কেউ নয়। কালোশশী—হাসিখুশি! ঠিক তেমনি নেচে চ'লে গেল! সে ইশারা দিয়ে গেল—বঁধু, এই গাছেই আমি বাসা বেঁধেছি।

হয়তো তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েও গেল।' বনওয়ারী সাহস সঞ্চয় ক'রে আবার চলতে আরম্ভ করলে। বাড়ি এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। বসন নিরুপায় হয়ে ফিরে গেল।

দুই

ওদিকে কোপাইয়ের ধারে খুব গোলমাল।

সুচাঁদ বাড়িতে বসে কাঁদছে—ওরে বাবা রে—কোথা গেলে রে—দেখে যাও করালী মরল রো

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বসন।—কি হ'ল? ওটে, সোরমার ক'রে চেঁচাস না, আগে বল কি হ'ল?

—ওরে আমার মাথা হ'ল রে। করালী মরল রে।

—তোর পায়ে পড়ি, বল্, কি হ'ল ?

—অ্যাই আগাসায়েব লো বসন, অ্যাই লাঠি—ব'লেই কপালে চাপড় মেরে সে আবার চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে।

পাড়ায় একটি লোক নাই যে সে জিজ্ঞাসা করে। সবাই ছুটে গিয়েছে ওইখানে। ওখানে যেতে তার পা উঠছে না। পাড়ায় রয়েছে শুধু নয়ান। ব'সে হাঁপাচ্চে, সাদা চোখগুলো যেন জ্বলছে। তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে বসনের জিভ যেন আটকে যাচ্ছে।

সে নিজেই ছুটে গেল। কোপাইয়ের ঘাটে গোটা কাহারপাড়া জ'মে গিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে করালীকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আগাসায়েবের পাগড়ি দেখতে পেলে বসন। আগাসায়েব, মানে—কাবুলীওয়ালা। ভিড় ঠেলে ঢুকে বসন অবাক হয়ে গেল। করালী মরে নাই। আগাসায়েবের হাত ধ'রে বীরবিক্রমে তাকে শাসাচ্ছে—উ সমস্ত চলে গা নাই আর। হাঁ। ঠেঙিয়ে দোরস্ত ক'রে দেগা। মেরে ফেলে দেগা দহমে—কুমীরে খেয়ে লেগা। সে আমল আর নেহি হ্যায়।

আগাসায়েব সবিস্ময়ে বললে—আরে, তুম চন্নুনপুরসে হিঁয়া আয়া হ্যায় ?

—হাঁ। হিঁয়া হামারা, ঘর হ্যায়, বাড়ি হ্যায়। মনে পড়তা হ্যায় চন্নুনপুরকে ঠেঙানি ? হিঁয়া ওই হোগা।

আগা বললে—হামারা রূপেয়া তো দে দেও ভাই।

—কাহে ? কাহে তুম হাত ধরা হ্যায় ? কাহে ? কাহে তুম মেয়েলোককে খারাপ বাত বোলা হ্যায় ? কাহে ? হামলোক সবাই মিলকে তুমকে মারকে ছাতু বানায় দেগা তো কেয়া করেগা তুম ?

ব্যাপারটা ঘটেছে পাগলকে নিয়ে। দু বছর আগে পাগল একখানা র‍্যাপার কিনেছিল আগাসায়েবের কাছে। টাকা দেবার কথা পরের বছর। কিন্তু পাগল দেশ ছেড়েছে। টাকা আদায়ের সময় আগা এসে ওকে পায় নাই। ফিরে গিয়েছিল। এবার হঠাৎ নদীর ওপারে আজ আগার সঙ্গে পাগলের দেখা হয়ে গিয়েছে। পাগলের টাকা দেবার ইচ্ছা নাই এমন নয়, কিন্তু গতবারে যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই ব'লেই ভয়ে সে ছুটে নদী পার হয়ে পালিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, আগাও ছুটেছে—এসে তাকে ধরেছে।—রূপিয়া ফেকো! দু-চার ঘা দিয়েছেও। পাগল চীৎকার করেছে। ঠিক সেই সময়েই কাজ সেরে চন্নুনপুর থেকে করালী ফিরছিল। চীৎকার শুনে দল নিয়ে করালী ছুটে গিয়েছে এবং আগার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে।—খবরদার! মারে গা তো, মাথা ভাঙ দেগা তুমারা।

আশ্চর্যের কথা, আগা থমকে গিয়েছে।

আগাসায়েব ভীষণ লোক—ভয়ঙ্কর লোক। আগারা এ দেশে ব্যবসা করেছে এতদিন লাঠির জোরে। এই জোয়ান, এই লাঠি। একজন আগা গাঁয়ে ঢুকলে গোটা গ্রাম ত্রস্ত হয়েছে। আগারা টাকার জন্য গালাগাল দিয়েছে, মেরেছে, এমন কি পুরুষদের না দেখে মেয়েদের অপমান করেছে। সেই আগার সামনে—হেই মা!

পাগল বললে—করালী, টাকা আমি দিচ্ছি ভাই, ছাড়ান দে।

—দাঁড়াও না কেনে। ছাড়ান দোব। ওর ভিরকুটি ভাঙব আমি।—ব'লেই সে বললে—যাও, ভাগো। টাকা কাল দেগা—কাল, যাও—যাও—

আশ্চর্য, আগা আস্তে আস্তে চ'লে গেল—জরুর দেও, কাল রূপিয়া জরুর দেও। আচ্ছা।

—আচ্ছা, আচ্ছা। থোড়া হিং নিয়ে এস। আর এইসা জবরদস্তি মৎ করো। নেহি তো হামলোক মারে গা, হাঁ।

আগা সত্যিই চ'লে গেল। সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল।

কাহারপাড়ায় করালী যেন ভিনদেশী মানুষ। জাত এক হ'লে কি হয়, রীতকরণ আলাদা—বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে।

নিজ্ চন্নপুরের মুখুজ্জেবাবুদের এক ছেলে বিলাত থেকে সায়েব হয়ে এসেছেন। চন্নপুরের মানুষদের মধ্যে তিনি আলাদা। চন্নপুরের কারখানা কাহারপাড়ার কাছে বিলাত ; সেখান থেকে করালীও হয়েছে কাহারপাড়ার বিলাত-ফেরত। এবার আবার গিয়েছিল কাটোয়া, সেখান থেকে ফিরেছে করালী আর-এক মূর্তি নিয়ে।

করালী বাড়ি ফিরল পাগলকে নিয়ে। পাগল বললে—তোর এত সাহস ভাল নয় করালী, ওরা খুনের জাত।

—আমরাও খুন ক'রে খুনের জাত হব। সেদিন চন্নপুরে ওকে ঠেলা বুঝিয়ে দিয়েছি। এ তো একা ছিল। সেথা ছিল তিনজনা, জন দশেকে মিলে এস্তা মার দিয়েছি—লাঠি-ফাঠি ফেলে দে দৌড়। শেষে এসে লাইনমিস্ত্রীকে ধ'রে মিটমাট করে। পঁয়ত্রিশ টাকা পেত, পঁচিশ নিয়ে ফারখৎ। ও আমাকে চেনে। বুয়েচ ?

পাগল বললে—না ভাই, ন্যায্য টাকা আমি দিয়ে দোব। পরকালে গিয়ে যে—না ভাই সে হবে না।

করালী অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়লে—সে তুমি দাও গা। কিন্তু ও এসে খপ ক'রে হাত ধ'রে অপমান করবে, আমি থাকতে তা হবে না। টাকা তুমি দাও, আমি ঠিক কাটব পাঁচ টাকা—দেখো তুমি। ও তোমার পরিবার তুলে গাল দিয়েছে কেন ?

—আমার তো পরিবার নাই, তা নিয়ে হাঙ্গামা কেনে ?

—আজ নাই, একদিন তো ছিল। ও তুমি যাই বল, আমি শুনব না।—ব'লেই সে একটা গাছের গুঁড়িতে ব'সে পড়ল। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বার ক'রে একটা দিলে পাগলকে, একটা নিলে নিজে, অন্য সকলকে দিলে বিড়ি। তারপর মজুরদের বললে—জোরসে ভাই, কাম চালাও।

করালীর ঘর তৈরি হচ্ছে। আজ মাটি তৈরির দিন। কাল দেওয়ালে নতুন পাট চড়বে। প্রায় দু'হাত উঁচু দেওয়াল উঠে পড়েছে।

গোটা পাড়াটা তার চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটা ক্ষুব্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে

তাকিয়ে রয়েছে। এতখানি দম্ভ, এতখানি আস্ফালন তারা সহ্য করতে পারছে না। পানা আসেই নাই। সে আপন ঘরে বসে বিস্ফারিত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরব হয়ে ব'সে আছে। নয়ান হাঁপাচ্ছে, আর নখ দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছে। নয়ানের মা আপন মনেই গালাগাল দিচ্ছে: গালাগাল দিচ্ছে পানার উঠানের নিমগাছটাকে।—গাছটা অত্যন্ত উঁচু এবং বিস্তৃতপল্লব হয়েছে, কাক বসছে, হাড় ফেলছে, ময়লা ফেলছে, হনুমানের বসত হয়েছে; গোদা হনুমানটা ওই গাছের মাথাতে এসে ব'সে খ্যাঁকোর-খ্যাঁক্ খ্যাঁকের-খ্যাঁক্ শব্দে শাসায় কোপাইয়ের জঙ্গলবাসী সন্ন্যাসীর দলকে, এবং মধ্যে মধ্যে কাহারপাড়ার ঘরগুলিতে নজর চালিয়ে দেখে—কার উঠানে, কার চালে, কোন্ গাছে ধরেছে বেগুন কি কলা কি কুমড়ো বা লাউ বা ঝিঙে। দেখতে পেলেই উ-প্ শব্দে লাফ মেরে নয়ানের মায়ের চালে পড়ে। সেখান থেকে দেবে লাফ—তারপর চালে গিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে নিয়ে আবার লাফ মেরে এসে বসবে এই গাছে। নয়ানের মা তাই গাছটাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

*　　*　　*　　*

কালোবউ—বনওয়ারী বুঝেছে—কালোবউ ইশারা দিয়ে গেল—ওই গাছে সে বাসা বেঁধেছে। হয়তো নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়েও বনওয়ারী নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল। আশ্চর্যের কথা। কোশকেঁধে বনওয়ারী জ্বর ছাড়লে কখনও শুয়ে থাকে না। কাল জ্বর ছেড়েছে, কালই উঠে বসেছে, আজ সকালে কত্তার থান ঘুরে এসেছে। সেই মানুষ অন্নপথ্য ক'রেও শুয়ে রইল।

কালোবউয়ের কথা সে ভাবছে। আটপৌরেপাড়ার বটগাছটার তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ডালে দোল দিচ্ছে, হয়তো দোল খাচ্ছে। গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নার মধ্যে সে নিশ্চয় এগিয়ে আসবে—বনওয়ারীর ঘরের দিকে। বাঁশবাঁদির বাশবন এবং গাছপালার ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার সাদা গুলছাপ গায়ে মেখে ঝরাপাতার উপর পা ফেলে শব্দ তুলে এসে দাঁড়াবে তার ঘরের পিছনে। টুপটাপ ক'রে ঢেলা ফেলে দেবে ইশারা। আরও গভীর রাত্রে বনওয়ারী উঠছে না দেখে গুনগুন ক'রে গান গাইবে, তারপর ভোরের আকাশে শুকতারা উঠলে সে ফিরে যাবে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে, কোপাইয়ের ধারে ধারে—কত্তার দহে গিয়ে নামবে; সেখান থেকে উঠে আবার আসবে বটতলায়। বটতলা দিয়ে বনওয়ারী গেলে বটফল ছুঁড়ে মারবে কৌতুকভরে; কোপাইয়ের ধারে গেলে নদীর জল অথবা বালি ছিটিয়ে দেবে গায়ে। কোনদিন হয়তো দেখা দেবে মনোহারিণী সাজে সেজে, কোপাইয়ের ধারের শিরীষ কাঞ্চন তুলে খোঁপায় প'রে, অথবা দহের জলে ভেজা চিকন চুলগুলি এলিয়ে, তাতে অজস্র জোনাকিপোকা প'রে, কালো মুখে সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিকিয়ে হাসবে। কোনদিন হয়তো বা দেখা দেবে ভয়ঙ্করীরূপে, মাথা ঠেকবে শিমুলগাছের মাথায়, চোখ দুটো জ্বলবে আগুনের আঙারের মত, লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দেবে—হিমের মত ঠাণ্ডা হাত, বনওয়ারীর ঘরের দিকে। রুদ্ধ রোষে বাঁশবাঁদির অন্ধকার-চেরা চীৎকার করবে অথবা অতৃপ্ত বাসনায় কাঁদবে, অন্ধকার উঠবে গুমরে।

শিউরে উঠল বনওয়ারী। কোশকেঁধে বনওয়ারী, দুপুর রাত্রে চন্ননপুর যায় ঘোষেদের জন্য

ডাক্তার ডাকতে। অনাবৃষ্টির বৎসরে কোপাই নদী পেরিয়ে ঘোষগোপপাড়ার বিলের ধারে ধারে নিঃশব্দে নির্ভয়ে হাঁটে বনওয়ারী—কোপাইয়ের জল কোথায় কারা বাঁধ দিয়ে আটকেছে তাই দেখতে। জাঙলে কোন গোলমাল হ'লে বনওয়ারীই ছোটে সর্বাগ্রে লাঠি নিয়ে; তা সে যত রাত্রিই হোক। জাঙলে একবার ডাকাত পড়েছিল, বনওয়ারী গিয়েছিল পাড়ার লোক নিয়ে ছুটে, সে-ই দাঁড়িয়েছিল সকলের আগে ডাকাতদের মহড়া নিয়ে। সেই বনওয়ারী আজ এইভাবে শুয়ে আছে? কোন কিছুতে তার রাগ করবার মত মনের অবস্থা কোথায়? করালীর কোঠাঘর নিয়েই বা সে মাথা ঘামাবে কি ক'রে?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কালোবউয়ের প্রেতযোনি তো অলীক নয়। পিতিপুরুষের কথার মধ্যে ওরা আছে, তারা চোখে দেখেছে। ঘরের কোণে, বাঁশবনের তলায়, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে, জলার পাশে—কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে ব'সে পা ঝুলিয়ে দেয়, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়। এ ছাড়া আছে 'ভুলো', সে দিক-ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে—অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে। আরও আছে 'নিশি'—রাত্রে কেউ কাউকে ডাকবার কথা থাকলে, নিশি এসে তার রূপ ধ'রে অবিকল তারই কণ্ঠস্বরে ডাকে। সেও নিয়ে যায় ওই অপঘাত মৃত্যুর পথে। এক এক পুরুষ শেষ হ'লে তবে তাদের সঙ্গে মায়ায় অথবা হিংসায় বাঁধা প্রেতাত্মাগুলি মুক্তি পায়; আবার নতুন পুরুষে নতুন মৃতদের আত্মা—মায়া বা হিংসা যে-কোন কিছুর বশে ঘুরে বেড়ায় বাঁশবাঁদির ছায়ায় ছায়ায়—কোপাইয়ের কূলে কূলে, ঘনপল্লব গাছের আড়ালে আড়ালে, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে মাঠে। হাঁসুলী বাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহুবিস্তৃত—আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, প্রেতলোক থেকে নরলোক পর্যন্ত।

সুচাঁদ আজও বলে—ঘরভাঙাদের পূব্বপুরুষ নয়ানের বাবার বাবার বাবা মরেছিল চুরি করতে গিয়ে গেরস্তের ছুঁড়ে-দেওয়া থালা কপালে গেঁথে। গেরস্তরা থালা ভেঙে সাঁই সাঁই ক'রে ছোঁড়ে—কানাভাঙা থালা; সে থালা ঘুরতে ঘুরতে আসে সুদর্শনচক্রের মত। নাগলে আর অক্ষে থাকে না। তাই নেগেছেল কপালে। তাইতে মরল বাড়ি এসে। তা'পরেতে তিনি তাই হলেন। মা, দিন-আত ঘরের সাঙায়, না হয়তো বাড়ির পাঁদাড়ে, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকতেন। লোকে ভয়ে টটরস্ত! ভয় করত না কেবল তার পরিবার—নয়ানের কত্তাবাবার মা। ঘরে ছেলে শুয়ে থাকত—নয়ানের কত্তাবাবা। কচি ছেলে তখন। কাঁদত তো পরিবার বলত—পোড়ামুখো মানুষ, মরেও সুখ দিলি না, জালাতে এলি? শুধু সাঙায় পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকলে হবে না, ছেলে কাঁদছে—চুপ করা। আশ্চয্যি মা, ছেলে উঠে যেত সাঙার ওপরে। দিব্যি ছেলে দোল খেত বাতাসে। তারপর চুপি চুপি বলে—একটি ছেলে নিয়ে মেয়েটি বিধবা হল—বয়স কম, তা বলে—সাঙা করিস না, তা হ'লে ঘাড় মুমড়ে দোব। তবে ভদ্রনোকের আশ্চয়ে থাক্, কিছু বলব না। তা তাই সে ছিল। এ অঞ্চলে একজন পশ্চিমে সাউ তামুকের কারবার করত। তার নজরে প'ড়ে তার আশ্চয়ে ছিল। সে আসত, যেত। তাতে কিছু বলত না। একদিন ঘরে জল নাই, এতে তেষ্টা পেয়েছে। বললে—এত এতে আমি জল আনব কি ক'রে? বলতে বলতে মা, এক

কলসী জল—কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া জল এনে নামিয়ে দিলে। একবার হয়েছিল কি—সুচাঁদ মুখখানা গম্ভীর ক'রে বলে—তখন কাত্তিক মাস, ঠাকুরের আসপুন্নিমে, কাঁদির আজবাড়িতে খুব ধুম ; ছেলেমেয়েদের সাধ হ'ল কাঁদির সন্দেশ খেতে, তারা বললে—ভাই কাঁদির আজবাড়িতে ভোজের মেঠাই-মণ্ডা খেতে সাধ হচ্ছে। সেই নয়ানের বাবার বাবার বাবা—তার নাম ছিল অমাই, তার নাম ক'রে বললে—তা অমাই যদি খাওয়াতে পারে, তবেই বুঝি অমাইয়ের ক্ষ্যামতা। খোনা খোনা গলায় বাঁশ-আদাড় থেকে তখুনি অমাই বললে—কাঁল সঁকালে আঁসিস। বললে না পেতাম যাবে মা—সকালে নোকে গিয়ে দেখে বাঁশ-আদাড়ের মধ্যে অ্যাই এক চ্যাঙাড়ি অয়েছে, তাতে লুচি-পুরি-মিষ্টি-মণ্ডা-মেঠাই—নানান দব্য। নয়ানের কত্তাবাবার গলার রক্ত পর্যন্ত খোনা হয়েছিল সেই তার ছোঁয়া লেগে। তার লেগে লোকের কাছে নাম হয়—খোনা কাহার। ভূত বশে থাকার তরেই তো চৌধুরীরা কাজে নিলে ওকে।

এই হ'ল হাঁসুলী বাঁকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা। তবে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মত এতেও যেন পরিবর্তন ঘটেছে। ওই সুচাঁদই বলে সে কথা। দেবভক্তি ক'মে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ ক'রে বলে—এখন ভূত হ'লে চন্ননপুরের ছোকরাবাবুরা বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়ে পরীক্ষে করে দেখতে আসবে। জাঙলে মোড়ল মহাশয়দের ছোকরারা ঠেঙা লাঠি নিয়ে আসবে। তাঁদের কি গরজ ? কেনে, তাঁরা এই সব ঝামেলায় থাকবেন ? তার চেয়ে দূরে দুরান্তরে নদীর ধারে হাঁসুলীর মাঠে দিব্যি থাকেন, শোশানের হাড়গোড় নিয়ে বাদ্যি বাজান, সাধ গেলে নদীতে বিলে মাছ ধরেন, চিতের আগুন লুফে খেলা করেন, ই গাছের মাথা থেকে হুপ ক'রে ভেসে চলে যান উ গাছে।

ভয়ার্ত বনওয়ারী ঘরের দরজা, এমন কি দেওয়ালের মাথার দিকে যে দুটো ছোট গোল ঘুলঘুলি ছিল সে দুটোও বন্ধ ক'রে শুয়ে থাকল।

বউ বললে—জষ্টি মাসের গরম, ভেপে যাবা যি।

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে ওঠে—ঠাণ্ডা লাগবে—ঠাণ্ডা লাগবে।

বউ বললে—তবে তুমি ঘরে শোও, আমি বাইরে শোব।

—না।

গভীর রাত্রে সে উঠে স্ত্রীর কাপড়ের সঙ্গে নিজের কাপড় বেঁধে তবে নিশ্চিন্ত হ'ল। ঘুম খানিকটা এল শেষরাত্রে। একটু ঘুমের পরই সে ভয় দেখে বু-বু শব্দ ক'রে উঠল। স্বপ্নে দেখলে —কালোবউ গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাতরাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে বাবার সেই বাহন, করালীর ঘর উড়িয়েছেন বাবার যে বাহন, বনওয়ারীর কালোবউকে ডুবিয়ে মারলেন যিনি—তিনি।

দিনের আলো ফুটল। বনওয়ারী আশ্বস্ত হ'ল। শুধু আশ্বস্ত নয়—একটা রাত্রি অতীত হতেই সে খানিকটা সুস্থও হ'ল। রাত্রেই সে ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে—বাকুলের জাগ্রত মা-শ্মশানকালীর রক্ষাকবচ ধারণ করবে, কত্তাবাবার পুষ্পও মাদুলীতে পুরে ধারণ করবে। তা হ'লেই নিশ্চিন্ত। ভূত প্রেত যত নিষ্ঠুর—দেবতা তত দয়াল। এই সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই চলে হাঁসুলীর বাঁকের দিন রাত্রি। নিজেই যাবে সে। এ কথা তার প্রকাশের উপায় নাই। প্রকাশ হ'লে হয়তো ডাক

আসবে থানা থেকে। আর পাড়াময় গ্রামময় চাকলাময় কেলেঙ্কারির একশেষ। মাতব্বর সে। লোকে তাকে দেখে হাসবে। আড়ালে নানান কথা বলবে। হয়তো লোকে আর তেমন মান্ত করবে না ; সে এক কাল গিয়েছে, যে কালে মাতব্বর যা করেছে তাই সেজেছে। এবার সেকাল নয়।

বউ এনে নামিয়ে দিলে মুড়ি।

বনওয়ারী বললে—না। মা-কালীর থানে যাব।

উঠে পড়ল সে। পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল করালীর নতুন ঘরের কাছে। করালী নাই, দেওয়াল দিচ্ছে চন্নপুরের পাকা 'দেওয়াল-বারুইয়ে', অর্থাৎ মাটির দেওয়ালের কারিগর ; মাটি কাটছে এখানকার কয়েকজন ছোকরা। তারাও মজুর খাটছে।

বনওয়ারীর কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। মনে প'ড়ে গেল, অসুখের মধ্যেই সে শুনেছে করালীর কোঠাঘরের কথা ; হারামজাদা শয়তান অশুভক্ষণে করালী। গায়ে জোর হয়েছে, রেলের জাতনাশা কারখানায় যুদ্ধের চাকরিতে টাকা হয়েছে, তাই ধরাকে সে সরা দেখছে। বাবার বাহনকে পুড়িয়ে মেরেছে। বাবার শিমুলবৃক্ষে চেপেছে। তাঁর কোপে নতুন চাল উড়ে গেল, তবু হুঁশ নাই। অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে—পিতিপুরুষের কথা। যে গাছ অতি বাড়ে ঝড়ে ভেঙেও সে গাছের হুঁশ হয় না। পিতিপুরুষের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে কোঠাঘর করবে। ঘরকে আরও উঁচু করবে। কাহারপাড়ার সকলকে ছাড়িয়ে উঠবার বাসনা। কাল আগাসাহেবের বৃত্তান্তও শুনেছে। খুব বাড় বেড়েছে। রাগে তার দুর্বল শরীর মস্তিষ্ক অধীর হয়ে উঠল। কোঠাঘরে পরিবার নিয়ে শয়ন করবে। 'হ' অর্থাৎ হাওয়া খাবে। বড়লোকপনা দেখাবে। লোকে পথ দিয়ে যাবে, করালী কোঠার 'বারজালা' অর্থাৎ জানালা থেকে হেসে বলবে—কোথা যাবে গো বনওয়ারী কাকা ?

বনওয়ারীকে দেখে 'দেওয়াল-বারুই' মজুর সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে তার দিকে তাকিয়েছিল। বনওয়ারী খাতিরের পাত্র। সে যখন দাঁড়িয়ে দেখছে মন দিয়ে, তখন মন্তব্য করবেই ; লোকও সে পাকা; তার মন্তব্য শুনবার জন্যই তারা কাজ বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছিল। বারুই অর্থাৎ কারিগর একটু অপেক্ষা ক'রে প্রশ্ন করলে—দেওয়ালের ধরনডা কেমন হয়েছে মাতব্বর ? মাপ ক'রে করেছি তবু তোমার চোখে দেখ দি নি—এঁকাবেঁকা ছোটবড় হয়েছে কিনা ?

তার উত্তরে বনওয়ারী প্রশ্ন করলে—করালীবাবু মহাশয় কই ?

সকলে চমকে উঠল।

বনওয়ারী নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে—চন্নপুরে বুঝি ?

তারপর গভীরভাবে বললে—কাজ বন্ধ রাখ। তোমরা ঘর যাও।

সকলের হাত মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

বনওয়ারী বললে—করালী ফিরে আসুক, কথাবার্তা আছে। কোঠাঘর করা হবে না। সে ধমক দিয়ে উঠল গাঁয়ের যারা মজুর খাটছিল তাদের—অ্যাই, কথা কানে যায় না, না কি ? যা, উঠে যা। ফেল্ কোদাল। নামা জলের টিন। যা—যা—

কোঠাঘর, কোঠাঘর। গাঁয়ে টেক্কা দেবে ছোকরা। আরে টেক্কা দেওয়া কি সোজা কথা? 'অণ্ডের' খেলায় টেক্কার চেয়ে গোলাম বড়, নহলা বড়। কাহারপাড়ার মাতব্বরি—অণ্ডের খেলা নয়—এখানে টেক্কা বড়। তারপরে সায়েব। টেক্কা হলেন বাবাঠাকুর, সায়েব হ'ল মাতব্বর। এখানে গোলাম করালীর খেলা চলবে না। এই হ'ল বিধাতার নিয়ম; বনওয়ারীকে মাতব্বর করেছে বাবাঠাকুরের দয়া। আরে বাবা, বনওয়ারীর ঘরের দিকে চেয়ে দেখ। সে কি করতে পারত না একখানা কোঠা? পিঁপড়ের পালক উঠেছে। পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। মঙ্গল অমঙ্গল বুঝতে পারে না, ঝকমকে কিছু দেখলেই ফরফর ক'রে উড়ে যায়; পুড়ে মরে, ধাক্কা খেয়ে মরে, দিশেহারা দেশহারা হয়ে মরে। হাঁসুলীর বাঁকের সোনার মাঠ। এ মাঠ গ্রীষ্মে যত কঠিন, বর্ষায় চাষ খোঁড়ের পর তত নরম, তত মোলাম। এই মাঠের ধানে পানে, কলাইয়ে পাকড়ে, তরিতে তরকারীতে যার পেট ভরল না তার পেট দুনিয়ার কোথায় ভরবে? এ মাটি চ'ষে খুড়ে যার পেট ভরে না, বুঝতে হবে তার অদৃষ্টের দোষ, পূর্বজন্মের কর্মফল, এ জন্মের কুটিল মনের, কুড়ে গতরের সাজা। এককাল গিয়েছে, সেকালে কাঁধে ঘাঁটা ফেলে বেহারাগিরি ক'রে বাঁচত কাহারেরা, তারপরে কত্তাঠাকুরের দয়া হ'ল, তিনি মন্বন্তরের মাঝে কাহারদের দিকে ফিরে তাকালেন। চৌধুরী মহাশয়কে স্বপন দিয়ে ভিটে দেওয়ালেন, ভাগে কৃষাণিতে কাহারদের জমি দিতে বললেন। চৌধুরী মহাশয় মারফতে কর্তার সে আদেশ কাহারদের উপরে। তাঁর দয়াতেই তো গোটা হাঁসুলী মাঠের অর্ধেকের উপর তাদের করতলগত। জাঙলে ঘর কয়েক হাড়ী ডোম আছে, মুচি আছে, আগে তারাই করত জাঙলের সদ্গোপ মহাশয়দের জমি। আজ তারা হ'টে গিয়েছে। এককালে যে কাহারেরা চাষকর্ম জানত না, আজ তাদের চেয়ে ভাল চাষী 'মুনিষ' এ চাকলায় নাই।

করালী হতভাগা—করালী বদমাশ। শুধু তাই বা কেন? করালী অশুভক্ষণে; অশুভক্ষণটিতে ওর জন্ম। ওই চন্নপুর রেল-লাইনে ওর মায়ের কেলেঙ্কারি টেলিগেরাপের খুঁটিতে খুঁটিতে কান পাতলে আজও শুনতে পাওয়া যায়। গাড়ি চ'লে যায় লাইনের উপর দিয়ে, তারে যে শব্দ হয় তাতে শুনতে পাওয়া যায়। এখন ছেলেরা মেয়েরা বলে—গাড়িটা বলছে, কাঁচা তেঁতুল—পাকা তেঁতুল—কাঁচা তেঁতুল—পাকা তেঁতুল। আগে লোকে বলত—সিদু-জগা-পেবাতী, গেল কুল গেল জাতি—সিদু-জগা-পেবাতী। প্রভাতী ছিল করালীর মায়ের নাম। হতভাগা শুনতে পায় না সে ছড়া ওই শব্দের মধ্যে? সেই চন্নপুরের রেল-লাইনে চাকরি ক'রে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়? 'নিলেজো' অর্থাৎ নির্লজ্জ হতভাগা। আবার যুদ্ধ দেখায় সকলকে, যুদ্ধের পোশাক প'রে যুদ্ধের কাজের লোভ দেখায় কাহারপাড়াকে।

যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ তো হাঁসুলী বাঁকের কি? যুদ্ধ কি বনওয়ারী জানে না? না, শোনে নাই? কটা যুদ্ধের কথা তুই জানিস? রাম-রাবণের যুদ্ধ গিয়েছে, কুরুক্ষেত্র গিয়েছে, বাণ-রাজার সঙ্গে ভগবান হরির যুদ্ধ গিয়েছে, রাবণ নির্বংশ হয়েছে, ধর্মপুত্তু রাজা হয়েছেন, রাজা দুর্যোধন মরেছে, বাণ-রাজার বেটির সঙ্গে হরির নাতির বিয়ে হয়েছে। কাহারদের কি হয়েছে? কাহারেরা বাবা কালারুদ্দুর আর বাবাঠাকুরকে ভ'জে বেঁচে আছে। বর্গী হাঙ্গামা গিয়েছে, সাঁওতালেরা

খেপেছিল, যুদ্ধ হয়েছিল, জানিস তুই ? কি হয়েছে কাহারদের ? এই তো বিশ বছর আগেও আর একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাতে হাঁসুলী বাঁকের কি হয়েছে ? ভাল হয় নাই। মন্দ হয়েছে। মন্দ হয়েছে। অভাব এসেছে, রোগ এসেছে, দুঃখ এসেছে, সুখের কাল ঘুচিয়ে দিয়েছে। আবার লেগেছে যুদ্ধ। লাগুক। আরও খানিকটা মন্দ হবে। তার বেশি কিছু হবে না। হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপরে উড়ো-জাহাজ উড়ছে, উড়ুক। কিন্তু যুদ্ধের ঢেউ বাঁশবাঁদির বুকে আছাড় খাবে না। বাবাঠাকুর আছেন। পৃথিবীর ভালমন্দতে হাঁসুলী বাকের কি যায় আসে ?

ঘর বন্ধ ক'রে দিয়ে সে কালীর থানে রওনা হ'ল।

* * * *

কালীর থান থেকে মাদুলী নিয়ে সে ফিরল।

মা-কালী ও কত্তাঠাকুরের পুষ্প নিয়ে স্যাকরা-বাড়ি থেকে কিনে আনা দুটি রুপোর মাদুলীতে পুরে স্নান ক'রে শুদ্ধ কাচা কাপড় প'রে লাল সুতোয় বেঁধে ধারণ ক'রে সে নির্ভয় হ'ল। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে মনে এবং দেহে বেশ সুস্থ হয়ে করালী সম্পর্কে সংকল্প স্থির করলে সে। মনটা এখন শান্ত হয়েছে, মনে হ'ল, ভাগ্য ভাল যে তখন রাগের মাথায় কিছু ক'রে বসে নাই। করালীকে সামনে পেলে তখন হয়তো তাই হ'ত। সে হ'লে বড়ই লজ্জার কথা—বড়ই কেলেঙ্কারির ঘটনা হ'ত সেটা। কত্তা রক্ষা করেছেন তাকে, পিতি-পুরুষের আশীর্বাদে রক্ষা পেয়েছে বনওয়ারী। সে প্রবীণ মাতব্বর লোক, তার পক্ষে এমন রাগ—বিশেষ ক'রে ওই ছেলেছোকরার উপর রাগ কি শোভা পায় ? না, উচিত হয় সেটা ? পাড়ার মঙ্গল, প্রতিটি লোকের মঙ্গল তাকে দেখতে হবে—প্রতিটি লোককে 'স্তেঁহ' অর্থাৎ স্নেহ ক'রে 'কোলগত' ক'রে রাখতে হবে—নইলে কি সে মাতব্বর। তা ছাড়া ছোকরার 'এলেম' অর্থাৎ কৃতিত্ব আছে। কাল আগাসায়েবকে শিক্ষা দিয়েছে, এটাকে সে ভালই বলবে। গায়ে ক্ষমতা ধরে, বুকের পাটা আছে। ভবিষ্যতে মরদের মত মরদ হবে। বনওয়ারীর ছেলেপুলে নাই, করালী যদি অনুগত হয়ে থাকে তবে তাকেই শেষ পর্যন্ত সে মাতব্বর ক'রে যাবে পাড়ার। তার জন্য ছোকরার মাথায় 'হিতবুদ্ধি' দিতে হবে। একদিন গোপনে ডেকে বলতে হবে ছোকরাকে খুলে, 'হিয়া-খানিকে খোলসা' ক'রে বলতে হবে।

আরাম ক'রে তামাক খেয়ে সে বাইরের দাওয়ায় গড়াল একটু। আটপৌরেপাড়ার বটগাছের মাথাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুলছে মাথাটা। যতই দুলিয়ে ইশারা দাও সখি, বনওয়ারী আর ভুলছে না ; তোমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এখন বনওয়ারী। মা-কালীর কবচ, বাবা-কত্তাঠাকুরের কবচ বনওয়ারীর হাতে। তবে দুঃখ তোমার জন্যে হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে গেল সায়েবডাঙায়। দিন যাচ্ছে, না জল যাচ্ছে। যে জল কোপাইয়ে বয়ে চ'লে যায়—সে জল আর ফেরে না। যে দিনটি গেল, সেটি আর ফিরবে না। সায়েবডাঙার জমিটা এবার আর তার হাসিল হ'ল না। তবু মনের টানে সে সায়েবডাঙায় গিয়ে উঠল।

সায়েবডাঙা থেকে বনওয়ারী গেল জাঙল গাঁয়ে। মনিববাড়িতে আজ পনেরো-বিশ দিন

যাওয়া হয় নাই। মনিববাড়ি থেকে লোক এসে খোঁজ ক'রে গিয়েছে। ব'লে গিয়েছে, ঘোষ-বাড়িতে কাজ আসছে। মাইতো ঘোষ আজ রাত্রে আসবেন, মাইতো ঘোষের ছেলের অন্নপ্রাশন হবে। ঘোষবাড়ির কাজে বনওয়ারীর কর্তব্য অনেক। কাঠ কাটা, বাড়ি পরিষ্কার করা, উনোন পাতা, হাট তরিতরকারি আনা-নেওয়া অর্থাৎ মজুরদের কাজের সব ভারই বনওয়ারীকে নিতে হবে। পাড়াতে আবার সে কথাটাও বলতে হবে। মজুরি পাবে—সে কাজ বাইরের লোক পায় কেন? তা ছাড়া পাত পেড়ে প্রসাদের সঙ্গে বালতি ভরতি বাড়তি ভাত-তরকারী-ডাল ছাঁদা সেও মিলবে। এ'টোপাতা পরিষ্কার করবে, সকড়ি বাসনগুলো মাজবে মেয়েরা—তার জন্য জনাহি এক পাই অর্থাৎ আধ সের চাল, আর আঁচলে মুড়ি পাবে। অবিশ্যি কাজের এখনও দেরি আছে, মাস তিনেক। তবু করতে হবে তো। হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে প'ড়ে গেল করালীর কথা। করালী বলেছে—জাত যায় এঁটো খেলে। কাহারেরা সদ্‌গোপদের এঁটো খায়।

ঘোষবাড়ি ঢুকতেই বড় ঘোষ বললেন—কি রে! শরীর আবার অসুখ করছে নাকি?

বনওয়ারী মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে—মাথার ভেতর দপ দপ করছে। তা সেরে যাবে।

মাইতো-বউ বললেন—কি গো কাহার দেওর, এই সময় অসুখ করলে? ঘরে কাজ!

বনওয়ারী বড় ঘোষের চেয়ে অনেক বড়, তবু 'জাতে ছোট' ব'লে বউয়েরা ওকে 'কাহার-দেওর' বলে। বনওয়ারী হেসে বললে—সেরে উঠেছি বউঠাকরুণ, আর ভাবনা কি? আর দু-চার দিনে যে-কে সেই হয়ে যাব। হুকুম করেন কি করতে হবে।

বড় বউ বললেন—তোমাকে আজ কিছু করতে হবে না। তুমি মান্দের ছোঁড়াকে ব'লে যাও, কাটা কাঠের উপর যেন তালপাতা ঢেকে দেয়। মেঘ চমকাচ্ছে, আকাশে ছটাও বাজছে। জল হ'লে শুকনো কাঠ ভিজবে।

বড়গিন্নী খুব হুঁশিয়ার গিন্নী। বটে, আকাশ থেকে থেকে যেন চমকে উঠছে। সূর্য ঢাকা পড়ছে পশ্চিমে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে থেকে কাঠ ঢাকা দেওয়ালে। শেষে নিজেও এক-আধবার হাত লাগালে।

ফিরবার সময়ে আঁচলে মুড়ি নাড়ু নিয়ে ফিরল সে। আরও কয়েকটি জিনিস সংগ্রহ করেছে সে—খাটের এক টুকরো ছত্রির ভাঙা ডাণ্ডা, চমৎকার টামনার বাঁট হবে। আর পেয়েছে একটা হাত-পা-ভাঙা কাচের পুতুল—মাটির মধ্যে চাপা পড়ে ছিল সেটা। ঘরের তাকে দিব্যি সাজানো থাকবে। আরও পেয়েছে খানিকটা সুতো আর একফালি প্যাকিং পেপার। সুতোটায় কাজ হবে, কিন্তু কাগজটায় কি হবে তার কিছু ঠিক নাই। দুটি ঝকমকে ধাতুর বোতামও পেয়েছিল, সে দুটি বউঠাকরুণকে দিয়ে এসেছে; কে জানে সোনাদানা কি বটে!

ফেরবার পথে কালারুদ্রতলায় 'কর্তার-থানে' সে আবার প্রণাম করলে। বিপদে রক্ষা ক'রো প্রভু, মাঠে ফসল দিয়ো, আর যেন কুমতি না ঘটে, কাহারপাড়ার মঙ্গল ক'রো। কর্তার থানে প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ তার একটা কথা মনে হ'ল। মনে পড়ল, আটপৌরেপাড়ার 'অমনে'র কথাগুলি। সে মানত করলে কর্তার কাছে—যদি আটপৌরেপাড়ায় কাজটি হয়, কাহারেরা যদি

আটপৌরেদের সঙ্গে এক 'থাকে' অর্থাৎ স্তরে ওঠে, তা হলে সে বাবার বেল-'বিল্ব'তলাটি বাঁধিয়ে দেবে, যেমন ঘোষেরা দিয়েছে ষষ্টিতলা বাঁধিয়ে। কালারুদ্রতলা এখন ফেটেছে, এককালে চৌধুরীরা ওই কালারুদ্র তলা বাঁধিয়েছিল।

প্রণাম সেরে উঠেই বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে তার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চ'লে যাচ্ছে—মেয়েটি চলছে যেন হেলেদুলে।

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল—কে মেয়েটি? মেয়েটির মধ্যে যেন কালোশশীর ঢঙ আছে। অবিকল কালোশশীর মতই দেখতে।

মেয়েটি গিয়ে দাঁড়াল সেই বটগাছতলায়। বনওয়ারী একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। তার বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। কালোবউ কি মোহিনী রূপ ধ'রে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে? সে মাদুলীটি ঠেকালে কপালে।

—কে? বনওয়ারী?

—কে?—বনওয়ারী চমকে ফিরে তাকালে। বুড়ো রমণ আটপৌরে আসছে জাঙল থেকে।

রমণ বললে—কথাটা ভেবে দেখেছ? আজ যাব 'এতে' তোমার পাড়ায়।

—বেশ। এসো।—বনওয়ারী অন্যমনস্ক ভাবেই বললে। সে আবার তাকিয়ে দেখলে গাছতলার দিকে। না, কালোবউ মোহিনী সেজে আসে নাই। তা হ'লে রমণকে দেখে সে নিশ্চয় অদৃশ্য হয়ে যেত। তবে ও কে?

মেয়েটি এবার কথা কইলে। চেঁচিয়ে ডাকলে—এস কেনে গো মেসো। দাঁড়িয়ে থাকব কত?

ও! রমণকে 'মেসো' বলছে। তবে কালোবউয়ের বোনঝি। তাই তার মত দেখতে। সে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার প্রণাম করলে বাবাঠাকুরকে।

সবে প্রণামটি সেরে উঠেছে বনওয়ারী, অমনি কোথায় একটা গোল উঠল। দিকনির্ণয়ের জন্য অন্য কোন দিকে তাকালে না, তাকালে কাহারপাড়ার দিকে।

করালী—করালী—করালী। আর কে? একা করালীই কাহারপাড়ার হাজার গোলমাল তৈরি করছে। বনওয়ারী এসে দাঁড়াল করালীর উঠানে। চারিদিকে লোক জ'মে রয়েছে, মাঝখানে করালী অন্য একজনের হাত চেপে ধ'রে ছাতি ফুলিয়ে বুনো জানোয়ারের মত চীৎকার করছে, ফুলছে। লোকটা কে? চৌধুরী-বাড়ির মাহিন্দার, আটপৌরেপাড়ার নবীন। ব্যাপার কি? হ'ল কি? কেউ বলে না। লোকের দুঃখে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে। বসন্ত বিবর্ণ-মুখে দাঁড়িয়ে আছে। করালী চীৎকার করছে—মানি না আমি। কারু হুকুমে যাই না আমি। আইন আছে, আদালত আছে, পারে তো আমাকে উঠিয়ে দিতে বলিস। জোর করতে এলে আমারও জোর আছে।

সুচাঁদ তারস্বরে কাঁদছে।

কিন্তু হ'ল কি? নীলের বাঁধ সম্পর্কে কাহারেরা চৌধুরী-বাড়ির বাঁধের পাড়ের চাকরাণ প্রজা।

বরাবর নিয়ম, ঘর ভেঙে ঘর করতে হ'লে চৌধুরীদের হুকুম নিতে হয়। মুখে বললেই হুকুম হয়ে যায়—এক টাকা নজর দিতে হয়। নজর এক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে করালী বসন্তকে দিয়ে। কিন্তু আজ চৌধুরী-বাড়ির লোক এসেছে করালীকে নিয়ে যাবার জন্য—এক টাকা নজর দিয়ে কোঠাঘর করার কথা নয়। আর কোঠাঘরের শর্তও নাই কাহারদের সঙ্গে। আগেকার বিক্রম থাকলে চৌধুরীদের পাইক এসে গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। একালে সর্বস্ব গিয়ে চৌধুরীরা বিষহীন সাপ, তাঁরা পাইকের বদলে আটপৌরেপাড়ার নবীন মাহিন্দারকে পাঠিয়েছে করালীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। নবীন করালীকে ঠিক ওজন ক'রতে পারে নাই। চৌধুরী-বাড়ির ভাঙা দালানের নোনা-ধরা ইঁটের দাওয়া থেকে হুকুম নিয়ে আটপৌরে পূর্বপুরুষদের ঘুণ-ধরা বাঁশের লাঠি-হাতে এসে করালীর হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে বলেছিল—এই চল্। হুকুম আছে ধ'রে নিয়ে যেতে।

—হুকুম ? কার হুকুম ?

—চৌধুরী মাশায়ের।

করালীর মেজাজ খারাপ হয়েই ছিল। লাইনের কাজ থেকে ফিরেই সে বনওয়ারীর দেওয়াল বন্ধ করার খবর শুনেছিল। এক কথাতেই মাথা গরম হয়ে গেল তার। আটপৌরে ছোঁড়ার লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে এবং নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছোঁড়াটার হাতটা খপ করে চেপে ধরল। রীতিমত হাতখানা মুচড়ে ধরে চীৎকার করতে লাগল। অসম্বদ্ধ প্রলাপ নয়—রীতিমত আইনের কথা। শিখেছে ওই চন্নপুরের ইষ্টিশানে। সেটেলমেণ্ট হয়ে গিয়েছে—পরচা আছে তার। তাতে লেখা আছে, বাস্তুভিটা তার। সেখানে যে যেমন ইচ্ছা ঘর করতে পারে ; এমন কি, যে এক টাকা ভালমানুষের মত দিয়েছে তা দেওয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল না, খাজনার দরুণ একটি বেগার তাকে দিতে হবে—সেও সে ইচ্ছে করলে গতরে খেটে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে একজন মজুরের মাইনে ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিয়েই খালাস।

চৌধুরীরা সেটেলমেণ্টের সময়—পাল্কী-বহনের দাবির বদলে মজুর বেগারই চেয়েছিলেন। বারান্দার ছাদ ধ্বংসে প'ড়ে পাল্কী তাঁদের ভেঙে গিয়েছে। বেহারার চেয়ে বেগারই তাঁদের বেশি উপকারে লাগবে—এই হিসাবই তাঁরা করেছিলেন। সে কথা যাক, পাড়ার লোকেরা—করালীর ঔদ্ধত্য দেখে নয়, তার এই আইনের ব্যাখ্যার অভিনবত্ব এবং দখলের জোর দেখে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেল।

বনওয়ারী এগিয়ে এসে নবীন এবং করালীর মাঝখানে প'ড়ে বললে—ছাড়।

করালী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যে! তাই বলি, মাতব্বর কই ? তোমার সাথেও আছে যে একচোট! বলি, তুমিই বা আমার ঘর বন্ধ করেছ কেনে ?

বনওয়ারীর মাথায় আগুন জ্বলে গেল। সে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে অকস্মাৎ একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—বাজ ডেকে উঠল যেন!

তারপর যে কাণ্ড ঘটল, সে কাণ্ড উপকথায় খাপ খায়, একালের কথায় শোভন হয় না। কিন্তু তবু হাঁসুলীর বাঁকে ঘটে।

করালীও সেটা কল্পনা করতে পারে নাই। প্রহ্লাদ রতন গুপী পানা প্রভৃতি প্রবীণেরা এল কোদাল নিয়ে। জন কয়েক চেপে ধরলে করালীকে। বাকি কয়জন চালাতে লাগল কোদাল। তার কোঠাঘরের বনিয়াদ তছনছ ক'রে দিলে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে রইল স্থিরভাবে। মধ্যে মধ্যে আঙুল দেখিয়ে হুকুম দিলে—ওইখানটা 'অইল', ফেল্ কেটে।

হেঁই-য়ো, হেঁই-হো; হুম-হুহ; হাঃ-হাঁ—বিভিন্ন মুনিষে বিভিন্ন শব্দ ক'রে কোদালে কোপ মারছে। পানার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি। সে কাটছে—হেঁই হেঁই। হঠাৎ কে চীৎকার ক'রে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়—স'রে যাও, স'রে যাও। অবাক হয়ে গেল সকলে। টলতে টলতে আসছে একটা কঙ্কালসার মানুষ। তারও হাতে কোদাল। সে হেঁপো-রোগী নয়ান।

—স'রে যাও, স'রে যাও। আমি কাটব। তার পাঁজরার নীচে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে, যেন জ্বলছে।

করালী আর চঞ্চল নয়, তার সর্বাঙ্গে ধুলো, সেও অদূরে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে দেখছে। পাখীও স্থির হয়ে দেখছে, তার দৃষ্টি একটি লোকের উপর নিবদ্ধ—সে ওই হেঁপো-রোগী নয়ান। সে দৃষ্টি যেন বিষদৃষ্টি।

করালী হঠাৎ পাখীর হাত ধ'রে বললে—আয়, চ'লে আয় চন্নপুর।

গটগট ক'রে সে চ'লে গেল। নয়ানের তাতেও আনন্দ।

তারপর বসল মজলিস।

বনওয়ারী বসল থমথমে মুখ নিয়ে। বনওয়ারীর এমন চেহারা অনেকদিন কেউ দেখে নাই। বনওয়ারী কথা বলতে লাগল আস্তে আস্তে। বনওয়ারীর এমন কণ্ঠস্বরও অনেকদিন কেউ শোনে নাই। শুধু তাই নয়, গোটা পাড়াটার ভাবভঙ্গি যেন আর একরকম হয়ে গিয়েছে। এমন থমথমে অন্ধকারও যেন অনেকদিন নামে নাই। সেই সেকালের হাঁসুলী বাঁকের রাত্রি যেন ফিরে এল।

বনওয়ারী বললে—চন্নপুরের লাইনে যে খাটতে যাবে, তার ঠাঁই কাহারপাড়ায় হবে না। পিতিপুরুষে যা করে নাই, তা করতে নাই। ছত্তিশ জাতের কাণ্ড। পয়সা বেশির দিকে তাকালে হবে না। সে পয়সা থাকবে না। স্বভাব মন্দ হবে। এত বড় হাঁসুলীর মাঠে যার পেট ভরবে না, তার পেট অভর। পিথিমীর কোথাও সে পেট ভরবে না। এই মাঠে বুক দিয়ে খাট—দু হাতে খাও। মনে কর—ভগবান এই কম্ম করতেই হাঁসুলীর বাঁকে জনম দিয়েছেন। ওই অ্যাল-লাইনের ধারে তো কেউ জন্মায় নাই। যে যাবে তার সব্বনাশ হবে। এ আমার কথা নয়। কত্তাঠাকুরের কথা। আজই সন্‌জেতে এই করালীর ঘরে গোল ওঠবার আগে—আমি পেনাম করছি, কথাটি আমার মনে হ'ল। কত্তা আমায় মনে পড়িয়ে দিলেন।

ঠিক এই সময় আটপৌরেপাড়ার রমণ এসে দাঁড়াল। সঙ্গে আটপৌরেরা।

—বনওয়ারী!

—কে?

—আমি অমন, সেই কথাটার তরে এলাম।

—এস, এস, এস। ব'স, সব ব'স।

মজলিসে কথা পাড়লে।

এক অদ্ভুত রাত্রি। কাহারপাড়ার সায়েব মশায়দের আমলে দু ভাগ হয়েছিল তারা। পরমেরা লাঠি নিয়ে আটপৌরে হয়েছিল, বনওয়ারীরা পাল্কী কাঁধে নিয়ে কাহার হয়েছিল, অনেকদিন দু পাড়ারই সে আমল ঘুচে গিয়েছে; চাষই ক'রে আসছে দু দলে, কালেকস্মিনে এরা পাল্কী বয়, ওরা রায়বেশে নাচে। তবু এতদিন ওরা সেই ভিন্নই ছিল। আজ সেই ভেদ ঘুচল। পরমের জমিটা ব'লে ক'য়ে আটপৌরেদের ক'রে দেবে বনওয়ারী। আর যাবে থানায়, বলবে—হলফ ক'রে বলবে—আটপৌরেরা আর চুরিতে নাই, ডাকাতিতে নাই, পাপের ছায়া মাড়ায় না। তা ছাড়া পরম বিদেয় হয়েছে, পাপের জড় মরেছে, খালাস দেন হুজুর। তাতে হুজুরদের সম্মান আটপৌরেরা করবে। মুরগী, খাসি, দুধ—তা ছাড়া পান খেতে কিছু, তাও দেবে। অবিশ্যি একদিনে এ কাজ হয় না, এক বছর দু বছর লাগবে। লাগুক। বনওয়ারী নিজে জামিন থাকবে। তবে আটপৌরেপাড়াকে তার 'রূপদেশ' মেনে চলতে হবে।

বনওয়ারী বললে—আজী থাক তো দেখ।

রাজী না হয়ে আটপৌরেদের আর উপায় নাই। আটপৌরেদের অবস্থা যে মারাত্মক রকমে খারাপ হয়ে পড়েছে। সংখ্যায় তারা চিরদিনই কাহারদের চেয়ে কম তার উপর লাঠি ধরার কাজ ক'রে কুলীন হওয়ার অহঙ্কারে আজও পর্যন্ত তারা গোঁফে তা দিয়ে আর মুখে হুঙ্কার দিয়ে কাল কাটিয়ে এসেছে। চাষ করলেও আটপৌরেরা কোন কালেই চাষের কাজ ভাল ক'রে না। ওতে তাদের মনই নাই। চুরি-ডাকাতিতে তাদের নাম আগে হয়। আগে এ নাম ছিল গৌরবের, এখনও অবশ্য তারা খুব অগৌরবের মনে করে না; কিন্তু এখন ও নামটা আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে পুলিসের চাপে পৃষ্ঠপোষকের অভাবে, মার খেয়ে সহ্য করার ক্ষমতা ক'মে যাওয়ায়। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। সেকালে ডাকাতদের রক্ষাকর্তা মাল-সামালদার বড় বড় বাড়ির মোটা মোটা কর্তারা যে আজ আর নাই; মাতব্বর পর্যন্ত নাই। নামে মাতব্বর পরম, সেও পালিয়েছে, কোনও সন্ধান নাই তার। সন্ধান পেলেও তার রক্ষা নাই, এবার পুলিস তাকে কালোবউকে খুন করার অপরাধে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে। এ দিকে দিন দিন অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। বিলাতে যুদ্ধ লেগেছে। ধান-চালের দর বাড়ছে, নুন তেল কাপড়ের দরে আগুন লেগেছে। অনেক দ্রব্য বাজারেই নাই। আটপৌরেদের বাঁচতে হবে। এ কাজ বনওয়ারী পারে—এ ভরসা তাদের আছে। সে জামিন হ'লে আটপৌরেরা জাঙলে সদ্গোপ মহাশয়দের বাড়িতে কৃষাণি পাবে। বনওয়ারী থানায় গেলে দারোগা তার কথা বিশ্বাস করুক আর না করুক, অন্তত কানে শুনবে। কানে দু-দশ বার যেতে যেতেই বিশ্বাস জন্মাবে। হরি বলতে বলতে চোর সাধু হয়, সাধুকে দশে চোর বললে সে চোরই হয় দশের কাছে। তা ছাড়া একটা সন্থ প্রলোভনের সামগ্রী ওই সায়েবডাঙার জমি। পরম যে জমিটা নিয়েছিল সেই জমিটা। পরম ফেরার, কালোবউ মরেছে, ওয়রিশ কেউ নাই। এখন ওই জমিটার উপর দৃষ্টি পড়েছে আটপৌরেদের। মালিক চন্ননপুরের বড়বাবু। তাঁর হুকুম চাই। আটপৌরেদের চাষী হিসেবে সুনাম নাই আর বড়বাবুর

'ছামুতে' গিয়ে দাঁড়াতে তাদের সাহসও নাই। সাহস ক'রে দাঁড়াতে পারত পরম, আর পারে বনওয়ারী। আজ সেই কারণে বনওয়ারীকে তাদের মাথায় নিতেই হবে।

আটপৌরেপাড়ার সকলেই বললে—'আজ্ঞী'। হ্যাঁ, আজ্ঞী।

রমণ জোর গলায় সায় দিলে—নিশ্চয় আজ্ঞী।

নিমতেলে পানা-শয়তানের বুদ্ধি মন্দ, কিন্তু ভারি হিসেব তার। পানা বললে—আপনার গরজে ধান ভানে মরদে। বনওয়ারীকাকাকে মাতব্বর তো করলে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে চলবে তো? আর ঘোড়াগোত্ত ব'লে পেথক হয়ে থাকবে না তো? তা বল। লইলে বনওয়ারীকাকার মাতব্বরির লোভ থাকলেও আমরা হতে দোব না। হুঁ-হুঁ।

কথাটায় আটপৌরেরা চুপ ক'রে গেল। এদিকে কাহারদের সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে উঠল—ঠিক বলেছে, পানা ঠিক বলেছে। কিসের দায় আমাদের?

পানা বললে—ব্যানোকাকা নিজেই লিতে পারে পরমের জমি। আমাদিগে ক'রে দিতে পারে।

রমণ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'পেটে ভাত নাই ধরমের উপোস।' জাত বেজাতের কম্ম ক'রে যাওয়ার চেয়ে কাহারদের সঙ্গে চলা ঢের ভাল। আটপৌরেরা কাহারেরা—এক হাতের দুটো আঙুল, এক বংশের দুই গোত্ত। তোমরাও যা, আমরাও তাই। খেতে-দেতে মানা নাই। করণ-কারণ বিয়ে-সাদীটাই হয় না। তা তোমরাও পাল্কী বহনটি ছাড়, আমরাও তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে যাই। কি বল সব?

আটপৌরেরা সায় দিলে এবার। ছাড়, পাল্কী বহন ছাড়।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়লে—উঁহু। সে হয় না। বেবাহ আর জ্ঞানগঙ্গা এ দুটিতে ডাকলে যেতেই হবে। লক্ষ্মী আর লারায়ণের দুই হাত এক হয়, তাদের বহন করতেই হবে। জ্ঞান-গঙ্গা যায় পুণ্যাত্মা—লক্ষ্মীমান। পুণ্যবলে সশরীরে স্বগ্‌গোযাত্তা। তাকে কাঁধে বহন করলে পরলোক গতি হয়। ও দুটিতে ডাকলে যেতেই হবে। সে 'না' বলতে পারব না। তাতে, তোমরা আলাদা থাকতে চাও, থাক। খুশি তোমাদের।

রমণ একটু ভেবে বললে—তাই—তাই।

পানা বললে—হরি হরি বল ভাই! বল—জয় বাবা কত্তাঠাকুর!

সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠল কাহার এবং আটপৌরেদের দুই দলেই।

ধ্বনি থামতে পানা বললে—বেশ, তবে আজই মজলিসে একটা করণের কথা ক'য়ে ফেল। হয়ে যাক্—সব কথার স্যাষ ব্যাশ।

—করণ?—ঢোক গিলতে হ'ল আটপৌরেদের।

পানু বললে—হ্যাঁ, করণ। আমি বলছি। এগিয়ে এসে মজলিসের মাঝখানে সে চেপে বসল। পানু আজ ভারি খুশী—করালী দূর হয়েছে গ্রাম থেকে। সে আবার বনওয়ারীর কাছ ঘেঁষে বসবার সুবিধে পেয়েছে। সে বললে—তোমার যে শালীর বিধবা কন্যেটি এসেছে অমনকাকা, তার সঙ্গে বনওয়ারীকাকার সাঙা হোক। কাকার ছেলেপিলি হ'ল না, পাড়ার মাতব্বর বংশ লোপ পাবে—তা হবে না। কি বল গো সব? পানা চতুর, সে ঠিক লক্ষ্য করেছে যে মেয়েটির মধ্যে কালোশশীর

ঢঙ রয়েছে। বনওয়ারী আজ করালীকে তাড়িয়েছে, সে বনওয়ারীকে আজ খুশী করতে চায়।

রমণের স্ত্রীর বোনঝি—কালোবউয়ের বোনঝি—বনওয়ারী তাকে আজই দেখেছে বিকালবেলায়। কালোবউয়ের ঢঙ তার সর্বাঙ্গে। মেয়েটি যুবতী। কালোশশীর রঙ ছিল কালো—এ মেয়েটির রঙ মাজা। মেয়েটি বিধবা হয়েছিল একটি সন্তান নিয়ে। সন্তানটিও মারা গিয়েছে। মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। মায়ের ইচ্ছা ছিল, সাঙা দেবে। কিন্তু তার আগেই মা গেল ম'রে। মেয়েটি এসে রমণের ঘাড়ে পড়েছে।

রমণ ভাবছিল। জালের বন্ধনে তাকেই প্রথম পড়তে হবে—একথা সে ভাবে নাই। তবে ভরসার মধ্যে, সুবাসী—তার শালীর কন্যে, নিজের বোনও নয়, বেটিও নয়, ভাইঝিও না, বোনঝিও না, ওর দায়ে তার জাত যাবে না।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে ছিল। সে ভাবছিল, কালোবউয়ের কথা। ভাবছিল, মেয়েটিতে তার কালোশশীর অভাব মিটবে। ভাবছিল, এমন ভাবে যেচে উঁচু কুলের মেয়ে যখন আসছে, তখন তাকে ঠেলা আর উচিত নয়। আর এমন ক্ষেত্রে আটপৌরে-ঘরের মেয়ে সর্বপ্রথম তারই ঘরে আসা উচিত। তা ছাড়া পানা এ কথাও খুব ঠিক বলেছে—তার মত মাতব্বরের বংশটা লোপ পেতে দেওয়া কখনও ঠিক নয়। বাবা সদয় তার উপর। আজ দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখ দিলেন তিনি, গোটা আটপৌরেপাড়াকে এনে দিলেন তার অধীনে। যা আজ এতদিন ধ'রে হয় নাই, তাই হ'ল বনওয়ারীর ভাগ্যে। জয় কর্তাঠাকুর! জয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! সূক্ষ্ম বিচার তোমার! ওই করালী তোমার বাহনকে মেরেছিল, তাকে সে সাজা দেয় নাই, তাই তুমি বনওয়ারীকে সাজা দিয়েছিলে, কালোশশীকে কেড়ে নিয়েছিলে। আজ করালীকে সে সাজা দিয়েছে, তুমি খুশী হয়েছ—বনওয়ারীকে পুরস্কার দিলে আটপৌরেপাড়ার মাতব্বরী; ফিরে দিলে তার কালোশশীকে—তোমার আদ্যিকালের বেলগাছটাকে যেমন বোশেখ মাসে নতুন পাতায় সাজিয়ে নতুন ক'রে তোলে,তেমনি মোহিনী যুবতী ক'রে কালোশশীকে ফিরে দিলে। কত্তাঠাকুরের কোপদৃষ্টিতে কাঁচা জীবন পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মুখের গ্রাস যায় উড়ে, ভরা নৌকা যায় ডুবে; আবার কত্তাঠাকুর তুষ্ট হয়ে মিষ্টি হাসি হেসে 'পেসন্ন দৃষ্টিতে' চাইলে—মরলে 'জীয়োয়', হারালে পায়, নিরুদ্দেশ ঘরে ফেরে, একগুণ হয় দশগুণ। উপকথায় বনওয়ারী যা শুনেছিল, তাই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

রমণ রাজী হ'ল। পানা তাকে বুঝিয়ে দিলে গোপনে ডেকে—করণও হবে, তোমারও কুল-ভাঙার পাপ অর্শাবে না। শালীর কন্যে আর পালতে-দেওয়া গাইয়ের বাছুর—ও দু-ই সমান। ভদ্রলোকে গাই-গরু কিনে কাহারদের পালন করতে দেয়, কাহারেরা গাইটিকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে, গাই বাচ্চা প্রসব করে, কাহারেরা দুধ পায় আর পায় ওই বাছুরটির অর্ধেক স্বত্ব। ভদ্রলোকে দু টাকা চার টাকা কাহারদের দিয়ে বাছুরটাকে কিনে নেয়। না নিলে পাইকার ডেকে বাছুরটিকে বেচে টাকাটা ভাগ ক'রে নেয় ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্ত্রীর বোনের কন্যে ঘাড়ে এসে পড়েছে, বনওয়ারীর হাতে দিয়ে দাও, ঘাড় থেকে বোঝাও নামবে, আটপৌরে-কাহারদের মিলনে করণও হবে। পরমের জমিটা যখন বনওয়ারী বাবুর হুকুম নিয়ে আটপৌরেদের মধ্যে বেঁটে দেবে, তখন কি আর ভাগের বাছুরের আধাদামের পাওনার মত কিছু বেশি পাবে না তুমি? ছোকরা পানু

কথাটা ব'লে একেবারে ইয়ার বন্ধুর মত রমণকে কাতুকুতু দিয়ে দিলে। রমণও হাসলে এবং সানন্দেই রাজী হয়ে গেল।

কথাটা স্থির হয়ে গেল।

রতন, গুপী সবাই খুব খুশী হ'ল ব'লেই মনে হ'ল। সবাই বললে—খুশী, আমরা খুব খুশী।

অল্পবয়সী মেয়েরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। সুচাঁদের ইচ্ছা হচ্ছিল, ছুটে এসে বলে—খুব ভাল হ'ল বাবা, খুব ভাল হ'ল। কিন্তু আজই বনওয়ারী করালী এবং পাখীর ঘর ভেঙে দিয়েছে, তাদের কাহারপাড়া থেকে দূর ক'রে দিয়েছে। কোন্ মনে যাবে সে ? কেমন ক'রে বলবে ভাল কথা ?

পাগল এই সময়টিতে মজলিসে এসে হাজির হ'ল। কোথায় গিয়েছিল সে আজ সারাদিন, সে-ই জানে। এসে ব'সে বললে—কি বেপার ?

পানা মদ ঢেলে পাগলকে দিয়ে বললে—খাও। জমিয়ে ব'স, শোন।

শুনতে শুনতে পাগল গুনগুন ক'রে গান ভাঁজতে লাগল। সুচাঁদ বলে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পাগল বাঁধে হাঁসুলী বাঁকের ছড়া পাঁচালী।

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—যাই ব'লিহারি,
বাঁধিল নতুন ঘর দখিনদুয়ারী।
সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরি রে মরি !

বনওয়ারী হেসে ধমক দিয়ে বললে—থাম্ বলছি।

পাগল ঘাড় নেড়ে গানের নতুন কলি গাইবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় বুক চাপড়ে কেঁদে ছুটে এল নয়ানের মা।

—ওগো, আমার নয়ান কি করছে—দেখে যাও গো ! ও গো ! ও গো ! ও গো !

সে কি ? এই যে সন্ধ্যার মুখে কঙ্কালসার দেহে হাতীর বলের মাতন নিয়ে করালীর ঘর ভেঙে এল নয়ান।

অন্ধকার দাওয়ায় প'ড়ে ছিল নয়ান। সর্বাঙ্গে ঘাম। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পাগল হাত দেখতে বসল। সে নাড়ী দেখতে জানে। বনওয়ারী চেহারা দেখে বুঝতে পারে অনেকটা। সে চেঁচিয়ে বললে—আলো কই ? আলো ?

আলো নাই। কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না। যুদ্ধের বাজার। পানা তার বাড়ি থেকে নিয়ে এল নিজের ডিবেটা। সেটা সে নিভিয়েই রাখে। একটু তেল এখনও আছে তার মধ্যে। বনওয়ারী দেখলে। হরি—হরি—হরি !

নয়ান সেজেছে। ওই কোদাল চালিয়ে এসে শুয়েছিল, তারপর ক্রমশ এই অবস্থা। নয়ান কিন্তু এর মধ্যেও হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে—শালোর ঘর ভেঙে মরছি, এতেও আমার সুখ। সেই সুখ নিয়ে সে চলবার পথে সেজেছে।

কাহারপাড়া নয়ানকে ঘিরে ব'সে রইল। এ-ই নিয়ম। বনওয়ারী দূরে দাঁড়িয়ে ব্যবস্থা করলে কাঠের বাঁশের। নয়ানের মা কাঁদলে, নয়ানের আপনার জনেরা কাঁদলে। সকলের শেষে এল

সুচাঁদ এবং বসন্ত। তারাও কাঁদতে বসল। অল্পবয়সী মেয়েরা নীরবে চোখের জল মার্জনা করছে; করালীর বাড়ি থেকে এল কেবল নসুবালা। করালী পাখী নাই, তারা চন্ননপুরে। নসু-বালাও কাঁদলে। তার আক্ষেপের কথাগুলির মধ্যে অকৃত্রিম আক্ষেপ—কত কথা সে বলছে। নয়ানের বাল্য কৈশোর যৌবনের কথা; তারই সমবয়সী ছিল, একসঙ্গে খেলেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে, তারই স্মৃতির কথা; তার মধ্যে নয়ানের দোষের কথা একটিও নাই, সব গুণের কথা।

হঠাৎ আলোটা নিবে গেল। তেল নাই আর। অন্ধকারের মধ্যেই সকলে ব'সে রইল। নয়ানের বুকে হাত দিয়ে তার মা ব'সে কাঁদছে। তাতেই বুঝতে পারবে। বুক থামলেই জানাবে চীৎকার ক'রে। আলো হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু আর সে কথা মনে হচ্ছে না তাদের। আলোর প্রাচুর্য কাহারদের চিরদিনই কম। অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়। পাগল ছড়া কেটে বলে—কি হবে আলো?

অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে!
অন্ধকারেই পরাণপাখী সেই শ্মশেতে যায় রে।
চন্দ সুয্য লম্ফ পিদীম তাই রে নাই রে নাই রে।
না থাক, আছে একজনা ভাই,
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়
দুই চোখে তার দুইটি পিদীম আঁধারে রোশনাই রে
আলোর তরে ভাবনা কেনে হায় রে!

বনওয়ারী সৎকারের লোক ঠিক করেছিল। লোকের আজ অভাব নাই। আজ আট-পৌরেরাও যাবে।

হাঁসুলী বাঁকে এমন রাত্রে কেউ একা নয়। আটপৌরেপাড়াতেও এমন ক্ষেত্রে কাহারপাড়ার সকলে যায়। কাহারপাড়ায় আসে আটপৌরেরা। আজ আবার তার উপর নতুন বাঁধন পড়েছে দুই পাড়ায়। আজ আটপৌরেরা শ্মশানেও যাবে। বনওয়ারীর মাতব্বরির আমলে দুই পাড়ায় চলনের ক্ষণে নয়ান প্রথম যাত্রী। সে-ই প্রথম যাবে দুই পাড়ার কাঁধে চেপে। আজ পুরনো মাতব্বর বংশ নির্বংশ হ'ল।

কত মাতব্বর কাহারদের নির্বংশ হয়েছে কে জানে তা, কে তার হিসেব রাখে? কাহার-পাড়ার উপকথার কি আদি আছে, না অন্ত আছে? পিথিমী 'ছিষ্টি' হ'ল, কাহার ছিষ্টি করলেন বিধেতা, কাহারদের মাতব্বরও ছিষ্টি হয়েছে সেই সঙ্গে। বাবা কালারুদ্দের গাজনের পাটা ঘুরছে বনবন শব্দে, সেই পাটায় ঘুরে দিন রাত্রি মাস বছর এক এক ক'রে চলে যাচ্ছে। বছর যাচ্ছে, যুগ যাচ্ছে। তার সঙ্গে কত যাচ্ছে—মাতব্বর যাচ্ছে, মাতব্বরের ঘর যাচ্ছে, ঘরভাঙাদেরও ঘরের শেষ হল এতদিনে নয়ানের সঙ্গে। বাবার পাটা ঘুরছে, সেই পাটায় বছর ঘুরছে। সেই ঘুরনের পাকে এবার প্রথম গেল নয়ান। আর কে যাবে, কে জানে? নতুন বছরের কাছে কালোশশীও মরেছে, কিন্তু সে আটপৌরেপাড়ার। তখনও দুই পাড়ায় এক হয় নাই।

কথাগুলি শ্মশানযাত্রীদের মধ্যেই আলোচনা হচ্ছিল। বনওয়ারীও চলেছে সঙ্গে। হাজার

হোক পুরনো মাতব্বর বংশ। তার খাতির করতে হবে বইকি! আর নয়ান বলতে গেলে নিঃস্ব। তার সব খরচও দেবে বনওয়ারী। নিয়ম। পাগল ধ'রে নিয়ে গেল নয়ানের মাকে। নয়ানের মায়ের সব অভিসম্পাত আজ নীরব হয়ে গিয়েছে। নিভে গিয়েছে তার সব তেজের আগুন।

বনওয়ারী অন্ধকারের মধ্যে ভারী পা ফেলে চলছে আর ভাবছে—বছরটি ভালয় ভালয় গেলে হয়। বাবাঠাকুরের রোষ যে ভয়ানক। ভাবতেও শিউরে ওঠে বনওয়ারী। আঃ, কবে বাজবে আবার গাজনের ঢাক, কালারুদ্দের চড়ক চক্রপাক খেয়ে এক পলক থামবে! বলবে—চন্দ্র থাম, সূর্য থাম, এক লহমার জন্যে আমার সঙ্গে থাম। বছর শেষ হোক। কতজনে সেদিন কাঁদবে হারানো পরাণধনের জন্যে, কে জানে! বাবাঠাকুরের কাছে অপরাধ হয়েছে—এ বছরটা গোটা বনওয়ারীর ভাবতে ভাবতেই যাবে। সৌভাগ্য সত্ত্বেও ভাবনা তার যাচ্ছে না।

পঞ্চম পর্ব

এক

ড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যার‍্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—

আবার বাজল গাজনের ঢাক। চড়কের পাটায় শুয়ে আকাশপানে চেয়ে বনওয়ারী কালারুদ্দকে প্রণাম করলে। যাক। বছর শেষ, বছর শেষ, পরমদয়াল ক্ষ্যাপা বাবার দৌলতে ভালয় ভালয় কেটে গিয়েছে কাহারদের বছর। বনওয়ারী যা আশঙ্কা করেছিল, তা ঘটে নাই। কাহারপাড়ায় যুবা প্রবীণ মাতব্বরেরা সকলেই বেঁচে রয়েছে। 'মিত্যু' অর্থাৎ মৃত্যু আর হয় নাই। হয়েছে, যেমন হয় যেমন নিয়ম, তেমনি হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। অঘটন ঘটেছে একটি, তাও আটপৌরেপাড়ায়—ওই কালোবউ মরেছে। আর নয়ানও মরেছে হঠাৎ। তা ছাড়া, দু-চারটে ছেলে মরেছে 'ম্যালিরিয়া' জ্বরে, বুড়ো-বুড়ী মরেছে চারজন—গুপীর মাসী, রতনের মা, প্রাণকেষ্টর কাকা গোবর্ধন—সে লোকটাই ছিল হাবা, আর মরেছে গোপালের পিসে। গোপালের পিসে বাইরের গেরামের লোক, এসে গোপালের ঘাড়ে ভর করেছিল, তাকে ঠিক ধরা যায় না হিসেবের মধ্যে। 'কচিকাঁচা' অর্থাৎ আঁতুড়ের ছেলের মরার হিসেব কেউ কখনও কোন কালে করে না, শুধু চৌকিদারে জন্মমৃত্যুর খাতায় লিখে নিয়ে যায়, থানায় দাখিল করে, থানায় তার হিসেব থাকে। সে হিসেবও বাজে হিসেব—কাহারপাড়ায় চৌকিদার কালে-কস্মিনে আসে, তাও দিনের বেলা, ওই হিসেবের জন্যই আসে। ছেলে মরার হিসেব কেউ মনেও রাখে না, বলতেও ভুল করে। চৌকিদারও সেই ভুল হিসেব মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে জাঙলে গিয়ে সদ্‌গোপ মহাশয়দের কোন ছেলেকে ধ'রে লিখিয়ে থানায় ইউনিয়ন-বোর্ডে দাখিল করে।

এবার গাজনে পাগল হাজির আছে। সে ভাল সঙ দিয়েছে। নিজে সেজেছে মহাদেব, দু-পাশে দুটো ছেলেকে সাজিয়েছে দুর্গা আর গঙ্গা। একজন বয়সালো মেয়ে আর একজন যোবতী।

বড়কী আর ছুটকী। বনওয়ারীকে ঠাট্টা করেছে। তা কর ভাই পাগল, তা কর। বনওয়ারীরও বেশ ভালই লাগছে।

বনওয়ারী সেদিনের সেই মজলিসের কথামত কালোশশীর বোনঝিকে সাঙা করেছে। তার ঘরেও এখন দু-বউ। বড়কী আর ছুটকী—গোপালীবালা আর সুবাসী। বছর ফিরে গেল, বিয়ের বছর পুরতেও দেরি নাই, তবুও মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের কথা। পাগল মিতের গান যেন কানে বাজছে। মনে হচ্ছে, এই তো করলে গান। আঃ, পাগল মিতে 'উদোমাদা' মানুষ, গুণী লোক, যেমন গলা তেমন গান। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে সুচাঁদ পিসী। হাঁসুলী বাঁকের কথা নিয়ে পাঁচালী তৈরী করে পাগল মিতে। বিয়েতে সাদিতে গান বাঁধে, ভাঁজোতে গান বাঁধে, ঘেঁটুতে গান বাঁধে, গাজনে গান গেয়ে সঙ সেজে নাচে। এবারে দুর্গা আর গঙ্গায় কোন্দল, অর্থাৎ সুবাসী আর গোপালীবালার ঝগড়া, মাঝখানে বুড়োশিব অর্থাৎ বনওয়ারী—খায় এর হাতে ঠোনা, ওর হাতে ঝাঁটা।

*   *   *

হাঁসুলী বাঁকের পাঁচালীকার পাগল কাহার মজার মানুষ। মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মত। আকাশের রঙেই তার রঙ। আকাশে সুয্যি উঠলে কালো জল ঝকমক করে, তার সঙ্গে বাতাস উঠলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে গলানো রুপোর মত 'টলমলিয়ে' ওঠে, রাত্রে চাঁদ থাকলে নীলের বাঁধের ছায়ামাখানো কালো জলে চাঁদ ওঠে, চাঁদের সঙ্গে তারাও ফুটে ওঠে, আকাশে মেঘ নামলে নীলের বাঁধের জল হয় 'গহিন' কালো, মনে হয়—আকাশ কাঁদছে, তারই দুঃখে নীলের বাঁধের জলও কাঁদছে। তা হবে না কেন? আকাশ থেকেই ঝ'রে পড়ছে নীলের বাঁধের জল—ও তো ওরই এক কন্যে। পাগল কাহারই বলে কথাটা। নইলে এমন সাজিয়ে কে বলতে পারে 'অমৃতির' মত বাক্যি! বনওয়ারী হেসে বলে—পাগল মিতের মনটিও নীলের বাঁকের জলের মত। কাহারপাড়া তার কাছে আকাশ। কাহারপাড়া হাসলে সে হাসে, কাঁদলে সে কাঁদে। হাসিও না, কান্নাও না—এমন অবস্থায় কাহারপাড়া ঝিমিয়ে থাকলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসের কুয়াশায় ঢাকা নীল বাঁধের জলের মত চেহারা নেয়, পাগলের মনের চেহারাও ঠিক তাই হয়; সে উদাস হয়ে থাকে।

নয়ানের 'মরণশয্যের' পাশে ব'সে পাগল ছড়া কেটেছিল—

ভাই রে! অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে!
অন্ধকারেই পরাণ-পাখী সেই দ্যাশেতে যায় রে!

তার মাস খানেক পরে বনওয়ারীর সাঙা হ'ল আটপৌরে-কন্যে সুবাসীর সঙ্গে। পাগল তখন রসের গানে ছড়ায় পাঁচালীতে মাতিয়ে তুললে কাহারপাড়া। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত এক নসুবালা; কিন্তু নসুবালা বললে—শরীর খারাপ। শরীর খারাপ নয়, আসল কথা সবাই বুঝেছে। যে বনওয়ারী তার করালী-দাদা পাখী-বউকে গাঁ-ছাড়া করেছে, তার বিয়েতে নাচতে গাইতে মন তার উঠবে না। নসু বলে—কাহারকুলে জন্মেছি, কাহারপাড়ায় বাস করি, বনওয়ারী কাহার-পাড়ার মাতব্বর, দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তার হুকুম যেন মানতে হবে বাইরে; কিন্তু মন তো কারুর

দাসী বাঁদী নয়, সে কাহারও নয়, আটপৌরেও নয়, সে-ই হ'ল শুধু মানুষ—সে রাজারও প্রজা নয়, মহাজনেরও খাতক নয়, সে মানবে কেনে বুন? তা না-নাচুক নসুবালা, পাগল একাই একশো। সে যত্ন ক'রে মদ তৈরি করলে। সে মদের 'তার' কি! তার 'ঘোর' অর্থাৎ নেশা কত! নাম-করা মদ-খাইয়েরা টলতে লাগল। পাগল কিন্তু ঠিক রইল। সে-ই করলে রান্না। ঘুরলে ফিরলে 'ঢুকঢাক' মদ ঢেলে খেলে, হাঁড়ি নামালে, কড়ায় হাতা দিলে, উনোনে কাঠ দিলে আর সারাক্ষণ গাইলে গান—

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী, যাই বলিহারি—
বাঁধিল নতুন ঘর দখিন-দুয়ারী।
সে ঘর বাঁধিতে এল (যত সব) অষ্টপহরী।
অষ্টপহরী পাড়ার সুবাসী-লতা
কাহারপাড়ায় আজ হ'ল পোঁতা।
বুড়া মালী বনওয়ারী (যতনে) সাজায় কেয়ারী।

প্রহ্লাদ রতন গুপী এরা খুব বাহবা দিলে। এ বিয়েতে বুড়োদেরই হয়েছিল বেশি মাতন। পাগল গেয়েই চলেছিল—

সুবাসী-লতার ফুল পরিবে কানে
সুবাস জাগিবে রস বুড়ানো প্রাণে
ও পথে যাস না তোরা বারণ করি—
(বুড়া আসবে তেড়ে,
খেঁটে হাতে বুড়া আসবে তেড়ে)

এই সময় বনওয়ারী তার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল—শোন-পাগল।

—কি? মুখ এমন কেনে?

—বলব ব'লেই ডাকছি। পেল্লাদ অতন গুপীকে ডাক।

বনওয়ারীর প্রথম স্ত্রী গোপালীবালা কেঁদেছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বনওয়ারী তাই এসেছিল—কি করি এখন বল দি-নি?

গোপালীবালা কাঁদছে? চমকে উঠেছিল পাগল। এ কথাটা তো সে ভাবে নাই! কাহার-পাড়ায় এ কথা কেউ কোন কালে ভাবে না। কাহারপাড়ার স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে, তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা আর নোয়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিতে দিতে চ'লে যায়—অন্য কোন কাহার-মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার-মেয়েরা করে না। স্বামী যদি তেমন পয়সাওয়ালা হয়, তেমন 'বেকমশালী' অর্থাৎ বিক্রমশীল মোড়ল মাতব্বর হয়, সে যদি কোন মেয়েলোককে ঘরে আনে, বিয়ে না ক'রে এমনি রাখে তাতে বরং কাহার-মেয়েরা আপত্তি করে না; কিন্তু বিয়ে করলে সহ্য করে না। কাহারপাড়ার মেয়েরা ফেলনা নয়, স্বামীকে তাদের ভাত দিতে হয় না, নিজেরাই তারা খেটে খায়, রূপযৌবন ছাড়া 'গতরের' অর্থাৎ পরিশ্রমের

ক্ষমতার একটা কদর আছে; সেই দরে কানা খোঁড়া বুড়ো কতজনের ঘরে ষোল আনা গিন্নীর 'পিঁড়ি' তাদের আদর ক'রে ডাকে, তারাও গিয়ে সে পিঁড়ে দখল করে বসে। ঘরের পাটকাম করে, অক্ষম পুরুষকে রাঁধা ভাত দেয়, খেটেখুটে রোজকারও করে। গোপালীবালা যদি চ'লে যায়, তবে সে হবে তার অপমান। তা ছাড়া গোপালীবালা লোকটি বড় ভাল। গোপালী-বালার মধ্যে কোপাইয়ের ঢেউ নাই, মনে সে দোলা লাগাতে পারে না, সে হ'ল নীলের বাঁধের জল—না আছে সাড়া, না আছে ধারা, চুপচাপ ঠাণ্ডা 'শেতল'; বুক ডুবিয়ে ব'সে থাকলে নড়বে না, জড়িয়ে ঘিরে নিথর হয়ে থাকবে তোমার চারিপাশে। নীলের বাঁধের মতই বনওয়ারী ওকে ভালবাসে; কিন্তু কোপাইয়ের মতন মাতন নাই ব'লে ওর উপর নেশা কোন কালে জমে নাই। সেইজন্যই বিবেচনা ক'রেও বনওয়ারী নিজের মনকে মানাতে পারে নাই। কোপাইয়ের মত ছিল কালোবউ, সুবাসী ঠিক কালোবউয়ের মতই। সে যেন কোপাইয়ের বুকে নতুন বছরের বান হয়ে ফিরে এসেছে। তা ছাড়া সুবাসী হ'ল আটপৌরে-ঘরের মেয়ে। আটপৌরেরা কাহারদের সঙ্গে চলতে রাজী হয়েছে বনওয়ারীর মাতব্বরির গুণে, সেই চলনের প্রথম করণ আটপৌরের কন্যে ঘরে আনবার 'গৈরব' সে আর কাউকে দিতে পারবে না। তাই সে গোপালীবালার কথা ভেবেও সাঙা করতে সম্মত হয়েছে। গোপালীবালাকে একদিন সে বুঝিয়ে বলেছিল, প্রহ্লাদ রতন এরাও বলেছিল, তখন গোপালীবালা নিজেই বলেছিল—তা কর, সাঙা কর, আমি যাব না। তবে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তোমার বেটা-ছেলে হোক আমি মানুষ করব। তোমরা দু'জনায় 'রামোদ-রাল্লাদ' করবা। আমি দেখব, হাসব। বিয়ের দিন কিন্তু গোপালীবালা কাঁদতে লেগেছে।

পাগল বনওয়ারীর মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বনওয়ারী বলেছিল—কি করি বল এখন?

অনেকক্ষণ ভেবে পাগল উত্তর দিয়েছিল—গোপালী যদি আজী থাকে, তবে আমিও ওকে মাথায় ক'রে আখব। বুল্লি—বলগা তাকে।

বনওয়ারীর মুখটা থমথমে হয়ে উঠেছিল।

পাগল বুঝে বলেছিল—আগ করিস না। লতুন করণ আটপৌরেদের সাথে, সেটাও হবে—তোরও ছেলেপুলে ঘর-সংসার হবে, সাধ মিটবে, গোপালী-বউকেও সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে না।

গোপালী-বউ কিন্তু আশ্চর্য। সে তাতেও বলেছিল—না।

প্রাণকেষ্ট উপকার করেছিল, সে বনওয়ারীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে হদিস বাতলে দিয়েছিল—এক কাজ কর কাকা। দশটা টাকা কাকীর হাতে দাও। বল—ঘর কর, সংসার কর, পাড়ায় ধার দাও মহাজনী কর। তুমিই ঘরের আসল গিন্নি; যেমন ছিলে তেমনি রইলে, আটপৌরের মেয়ে ঘরে আসছে, ছেলেপুলে হবে, খাটবে-খুটবে খাবে। বুঝলে?

বনওয়ারীর কথাটা মনে ধরে। পানার বুদ্ধির সে তারিফ না ক'রে পারে নাই। টাকা তার আছে, কিন্তু কথাটা তার মনে হয় নাই। টাকাতে মন ভোলে বই কি। কতজন কাহার-মরদ

পরিবারের দাবি ছাড়তে দাঙ্গা করে, হাঙ্গামা করে, শেষে টাকাতে রক্ষা হয়। টাকাতে আরও কত হয়, সে বনওয়ারীর অজানা নয়। ছেলের হাতে 'অঙচঙে' খেলনা, মিষ্টি নাড়ু দিলে তার কান্না থামে; বড় মানুষের হাতে টাকা দাও আঁজলা ভ'রে, বড় মানুষ ভুলে যাবে সব দুঃখ।

পানা বলেছিল—টাকাতে বলে পুত্তুশোক ভোলে, তা এ তো—। ব'লে সে একটা পিচ কেটেছিল।

বনওয়ারী দশটার বদলে এক কুড়ি টাকা নিয়ে গোপালীবালার দুই হাতের আঁজলা টেনে তার উপর ভ'রে ঢেলে দিয়েছিল।

গোপালীবালা চমকে উঠে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল। সে দৃষ্টি বনওয়ারী গাজনের পাটায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েও যেন দেখতে পাচ্ছে।

বনওয়ারী হেসে বলেছিল—সব তোমাকে দিলাম। গয়না গড়িয়ো তুমি। না হয় যা-খুশি ক'রো।

গোপালীবালার মন ভুলেছিল। আঁজলা-ভরা ঝকঝকে টাকা! স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে হেসে বলেছিল—আর দুটি সোনার কানফুল গড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।

বনওয়ারী বলেছিল—দোব, নিচ্চয় দোব। সোনা একটুকু সস্তা হোক, যুদ্ধুতে দর চড়েছে বিষম, একটুকুন নামুক দর, দোব।

পানা বলেছিল—একটি ঢোক মাল খাও খুড়ী এইবার। নাচতে হবে তোমাকে।

সত্যিই পানা গোপালীবালাকে মদ খাইয়েছিল। পানার উপর এর পর বনওয়ারী খুশি না হয়ে পারে নাই।

—চল, এইবার আটপৌরেপাড়ায় যাবার আয়োজন কর।

কাহারদের আজ আটপৌরেপাড়ায় যাওয়া যেমন-তেমন যাওয়া নয়, এমন যাওয়া কখনো যায় নাই আজ পর্যন্ত। প্রহ্লাদ রতন গুপী পানু—সকল কাহার মাথায় বেঁধেছিল ক্ষারে-কাচা গামছা, গায়ে দিয়েছিল বহুকালের সযত্ন-রক্ষিত ফতুয়া, হাতে নিয়েছিল লাঠি; গোঁফে চাড়া দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে সকলে গিয়েছিল। ঢোল বেজেছিল, সানাই বেজেছিল, কাঁসি বেজেছিল। বনওয়ারী গায়ে দিয়েছিল একখানা নতুন চাদর। যুদ্ধের বাজারে অগ্নিমূল্য দিতে হয়েছিল। সেই চাদরখানি গায়ে দিয়ে সে খুঁজেছিল পাগলকে।

—পাগল! পাগল!

সকলকে সামলে নিয়ে যেতে হবে। শুভকর্মে ব্যাঘাত না ঘটে। কাহারেরা মদ খেয়েছে, আটপৌরেপাড়ায় মেয়ে আনতে চলেছে—সেই গরম নেশার সঙ্গে মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরছে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যা কখনও ঘটে নাই, আজ রাত্রে তাই ঘটবে। তার মধ্যে অঘটন ঘটিয়ে না বসে কাহারেরা! পাগল হুঁশিয়ার মানুষ। তাকে ভার দিতে হবে।

—পাগল! পাগল!

পাগলকে পাওয়া যায় নাই। গোটা গাঁয়ের মধ্যে না।

পানা হাসতে হাসতে বলেছিল, আঁ, কত সাধ ক'রে কথাটা বললে! শেষে লাজে হয়তো পালাল্ছে।

ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল।

কে যেন বলেছিল—মেঘ চিকুরছে, চল চল।

ওঃ সে কি মেঘ! বর্ষার মেঘ। বিয়ের রাত্রে নেমেছিল বর্ষা, কাড়ান।

কাড়ানের মেঘ; ঘন কালো। বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ডাকে হাঁসুলী বাঁকের বাঁকে বাঁকে, বাঁশবাঁদির বাঁশের বনে যেন ডঙ্কা বাজিয়ে দেয়। ঝির ঝির ক'রে মৃদুমন্দ বাতাস বয়। নীলের বাঁধের স্থির জলে কাঁপন লাগে। বাঁশবনের কোন পাতাঢাকা গর্ত থেকে মোটা গম্ভীর গলায় 'গ্যাঙোর গ্যাঙ, গ্যাঙোর গ্যাঙ, গ্যাও—গ্যাও' শব্দ ক'রে ওঠে হেঁড়ে-ব্যাঙ মহাশয়। ছোটখাটো হাঁড়ির মত চেহারা—এমনি বড় আকারের ব্যাঙ, তাই ওদের নাম হেঁড়েব্যাঙ। গাছের ডাল থেকে অপেক্ষাকৃত মিহি গলায় সাড়া দেয় গেছোব্যাঙ—অ্যা—ও! অ্যা—ও! পুকুর ডোবার কোণ থেকে সোনাব্যাঙগুলো কলরব জুড়ে দেয়। কর্‌র্‌—কর্‌র্‌—কর্‌র্‌—শব্দে হাঁসুলী বাঁকে যেন হাজার ব্যাঙ-টুনটুনির বাজনা বেজে ওঠে। মাথার উপরে কিচির-কিচ-কিচির শব্দ ওঠে। ফটিকজল পাখীগুলো রাত্রেও ডাকতে শুরু করে মেঘরাজার হাঁক শুনে। তেমনি মেঘ উঠেছিল সেদিন।

বরযাত্রী কাহারেরাও হাঁক দিয়ে উঠেছিল সে মেঘের ডাক শুনে। এ কি ডাক! অ্যাঁ! জয় জয় বাবাঠাকুর! আষাঢ়ের প্রথম—অম্বুবাচীর দু দিন বাকি, এরই মধ্যে মেঘের হাঁকে বর্ষার থমথমে আওয়াজ বেজে উঠল যে! হাঁসুলী বাঁকের চষা-খোঁড়া মাটি 'শির-শির করছে' অর্থাৎ শিউরে উঠছে বোধ হয়।

রতন গুপী আহ্লাদে লাফ দিয়ে চুনীকে বলেছিল—বাজা রে ভাই, বাজা, গুরগুরিয়ে বাজা। গুর-গুর-গুর-গুর, তাক-তাক-তাক-তাক—

পানু বলেছিল—বনওয়ারীকাকার নতুন বউয়ের পয়।

—নিচ্চয়। মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে, আটপৌরের সাথে কাহারদের চলনে দু পাড়ারই মঙ্গল হবে। 'আষিড়ে কাড়ান' পায় কে? অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত পর্যাপ্ত বর্ষণ পায় কে?

বনওয়ারী প্রথমটা ভয় পেয়েছিল; আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিল—হে বাবা! তোমার বাহন যেন সেদিনের মত কোড়ল পাকিয়ে লকলকিয়ে জিভ মেলে ফুঁসিয়ে না ওঠে! বনওয়ারীর মন আশ্বস্ত হয়েও হচ্ছিল না। জষ্ঠি মাসের শেষে তো বর্ষা দেখা দেয় না, আষাঢ় মাসেই বর্ষা দুর্লভ। তবে? এই অকালে ঠিক তার বিয়ের লগ্নে মাথার উপরে অকাল বর্ষা হাঁক মেরে উঠল কেনে? বাবার বাহন সেদিন কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে ফুঁসিয়ে উঠেছিল। সেই বিচিত্র বরণ ফুটে উঠেছিল সাদা-কালো মেঘে মেঘে। আজও আবার—?

বনওয়ারী! ব্যানো! ব্যানো!

বনওয়ারী সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল রতনের ডাকে। আর আশ্বাস পেয়েছিল মেঘ দেখে চিনে, বাবার বাহনকে সে মেঘের মধ্যে দেখতে পায় নি। একটানা ঘনশ্যাম মেঘ উঠছে আকাশ ভ'রে। ইনি বর্ষার মেঘ। বনওয়ারী বলেছিল—চল।

* * *

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ওই রাত্রি থেকেই বেজে উঠেছিল চাষের বাজনা; এবারের বর্ষা—ভাগ্যের বর্ষা গিয়েছে। "আষাঢ়ের বর্ষা। আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে? শাওনে কাড়ান ধানকে। ভাদুরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিসকে?" আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত ভাসান জল কোন্ ভাগ্যবান পায়? কালেকস্মিনে কখনও-সখনও হয়। এবার পেয়েছে কাহারেরা।

গুরু গুরু শব্দে গম্ভীর গলায় মেঘের সে ধ্বনি কি! কোপাইয়ের জল হয় ঘোলা; তার কূলে কূলে মেঘের ডাক যেন ডঙ্কার মত শোনায়! বাঁশবনের নতুন বাঁশগুলির 'খুঙি' অর্থাৎ আবরণ খসে পড়ে, ফিকে সবুজ রঙের পাতা দেখা দেয়, পুরানো বাঁশের পাতার সবুজে কালচে আমেজ ধরে। শিমুল-শিরীষ-বট-অশ্বত্থ-পাতাগুলিতেও কালো রঙের ঘোর ধরে, পাতাগুলি পুরু হয়। বাঁশবনের তলায় ভিজে পাতা চাপ বেঁধে সপ সপ করছে, পা দিলে 'বুড়বুড়' কেটে লালচে রঙের জল ওঠে। কত নতুন নতুন চারা গজায়। কোপাইয়ের কূলে শরবন, কাশবন, বেনাবনে লম্বা কচি পাতা গাজিয়ে উঠে ঝাড়বন্দী হয়ে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে নাচতে থাকে। সবচেয়ে বাহার হয় কোপাইয়ের ঘাটের উপরের ছাতিম গাছটির। চোখ জুড়ানো সবুজ বরণ টোপরটির মত চেহারা হয়। গাছের মধ্যে ও হয় নটবর। ঘাসে ঘাসে ভ'রে যায় চারিদিক। কাহারপাড়ার উঠানগুলির চারি পাশে, ঘরগুলির 'পোতায়' অর্থাৎ ভিত পর্যন্ত কেউ যেন সবুজ রঙের পাড় বুনে দেয়। মাঠ জলে থৈ-থৈ করে, আলে আলে ঘাস। কাহারেরা তারই মধ্যে কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কেউ চালায় হাল, মাটির উপর হালের মুঠো ধ'রে চলে পিঠ বেঁকিয়ে ঘাড় নামিয়ে অসুরের মত। কেউ জমির কাদায় জলে হাঁটু গেড়ে বীজচারা তোলে, কাদানো জমিতে ঘাস আগাছা তুলে দুমড়ে মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়। রাত্রি এক প্রহর থাকতে মাঠে ছোটে, বাড়ি ফেরে রাত্রি এক প্রহর পার হলে তবে।

'আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে?' এবার পাওয়া গিয়েছিল, কাহারেরা তার চরম সদ্ব্যবহার করেছে। চাষ এবার তাদের ভাল গিয়েছে। ক্ষেতভরা ধান হয়েছিল, মুনিবেরা পেয়েছেন প্রচুর, তারাও যে যেমন সে তেমন পেয়েছে। পিথিমীতে যুদ্ধ লেগেছে—আক্রা-গণ্ডার সীমা-পরিসীমা নাই। কাহারদের সম্বল এক ধান। ধানের দর ছিল আঠারো আনা—এখন বেড়ে হয়েছে পাঁচ টাকা। আষাঢ়ে কাড়ানে ফসল বেশি ফলেছে, এবার বেঁচেছে কাহারেরা।

বনওয়ারী এবার অনেক ধান পেয়েছে। ভাগের চাষে বেশি ফলেছে, তাতে আর কত বেশি পেয়েছে! এবার সায়েবডাঙার জমির ধান যে তার ঘরে উঠেছে। পাঁচ বিঘে ডাঙার কাটানো হয়েছে দু বিঘে, তার থেকে ধান পেয়েছে চার বিশ দু আড়ি অর্থাৎ সাড়ে দশ মণ, কাউকে ভাগ দিতে হয় নাই, খাজনা লাগে নাই। এই সাড়ে দশ মণ তার কাছে হাজার মণের সমান। আজ বিক্রি করলেই পঞ্চাশ টাকার করকরে নতুন 'লোট' গুনে দেবে মহাজনেরা। দেশে টাকা নাই, সব 'লোট' সব 'লোট'; নইলে কিছুখানি বিক্রি করত বনওয়ারী, কিন্তু লোট তো মাটিতে পুঁতে রাখা যায় না! আরও একটা কথা আছে, ছুটকী অর্থাৎ নতুন বউ সুবাসীর মতিগতি না বুঝে টাকাকড়ি পুঁতে রাখা ঠিক নয়।

বাবু মহাশয়দের সায়েবডাঙার জমিতেও প্রচুর ধান হয়েছে। ওঁরা জমি কাটিয়ে জমিতে পুকুরের

পাক দিয়েছিলেন, সার দিয়েছিলেন, বনওয়ারী তো তা পারে নাই। তবে সে এবং গোপালীবালা পথেঘাটে যেখানে যত গোবর দেখেছে, কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জমির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। গোপালী আর এক কাজ করেছে, সে কথা বনওয়ারী ছাড়া কেউ জানে না; মাঠে লোকজন না থাকলে, সে বাবুদের জমিতে নেমে পাঁকের ঢেলা তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে বনওয়ারীর জমিতে। গোপালীবালা তার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সুবাসীর রূপ যৌবন বনওয়ারীকে নেশায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে বটে, কিন্তু সে এই নেশার মধ্যেও বুঝতে পারে,এ নেশায় সংসারের কল্যাণ নাই। মেয়েটা অবিকল কালোশশী —তেমনি বিলাসিনী, তেমনি ঢঙ, তেমনি হাসি, তেমনি ঢ'লে-পড়া, মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর মন খাপ্পা হয়ে ওঠে।

আবার নবান্নর সময় একটা কাণ্ড ঘটেছিল। সেই কাণ্ডেই বুঝতে পেরেছে এ মেয়ের হাতে লক্ষ্মী নেই। নবান্নে এবার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদিতে খুব ধুম গিয়েছে। নবান্নে তাদের ধুম চিরকালের। সদ্‌জাতের অনেক ধুমধাম, এক পুজোর পর আর এক পুজো, তাতে কাহারেরা আনন্দ করে, পূজাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তাদের নিজের ঘরে সে ধুমে দেবতার চরণের ছাপ পড়ে না। ওদের ধুম গাজন, ধরম পুজো, আমুতি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা-বিষহরির পুজো,ভাদ্র মাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। মোটামুটি সাতটা পরব। এছাড়া ষষ্ঠী আছে, মঙ্গলচণ্ডী আছে,—সে শুধু মেয়েদের 'বেরতো', তাও তাদের করতে হয় ওই সদ্‌জাতদের মা-লক্ষ্মীদের বেরতো-স্থানের 'পাট আঙনে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনের এক প্রান্তে ব'সে। নবান্নই ওদের বড় পরব। নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পূজা করে, কালারুদ্দু বাবা ঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের 'পাঁচ দব্য পক্কত' ক'রে আনন্দ ক'রে খাওয়ায়। আর কালারুদ্দুর কাছে বলা—বাবা!—

'ল' লড়লাম—'ল' চাড়লাম
'ল'-পুরনোয় ঘর বাঁধলাম
লতুনে বাখার বাঁধি পুরানো খাই—
এই খেতে যেন জনম যায়—
লতুন বস্ত্র পুরোনো অন্ন—
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।

'ল' অর্থাৎ 'ন'; 'ন'-কে ওরা 'ল' হিসাবে উচ্চারণ করে, 'ন' অর্থাৎ নতুন। খাওয়া-দাওয়ার খুব ধুম। সবার বাড়িতে সবার নিমন্ত্রণ। খেয়েদেয়ে বিকেলবেলা হয় ড্যাং-গুলি অর্থাৎ ডাণ্ডা-গুলির পাল্লা। জোয়ান ছেলেরা সায়েব-ডাঙায় গিয়ে দেড় হাত লম্বা ডাং এবং বিঘৎ প্রমাণ মোটা গুলি নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে, সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলে খাদ্য হজম ক'রে বাড়ি ফেরে। এক এক ডাণ্ডা মেরে গুলিকে পাঠিয়ে দেয় হুই—লঙ্কাপার, দেখিয়ে দেয় সাত ভুবন। বারি ঢুরি তেরি চাল চম্পা ঢেক লঙ্কা—মাপতে মাপতে সাত মাপে গজ দিয়ে পিটিয়ে দেয় 'গজা' অর্থাৎ এক দানের হার। আবার যারা খাটুনি দেয়, তারাও কম যায় না, ওই বোঁ-বোঁ শব্দে ছুটন্ত গুলি দুই হাতে খপ ক'রে লুফে নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বলে—খেয়ে নিয়েছি অর্থাৎ গেল খেলনদারের হাত। সে এক মাতন। বুড়োরাও মধ্যে মধ্যে লোভ সামলাতে পারে না, তারাও দু-এক দান খেলে নেয়। ছেলেরা বার

হয় তীর ধনুক নিয়ে—বাঁখারির ধনুক, নতুন শরকাঠির তীর তৈরি ক'রে তারা হৈ-হৈ ক'রে বেড়ায় মাঠময়, তাড়িয়ে বেড়ায় ধান খেতে নামে যে সব পাখীর ঝাঁক—কাক, শালিক, চড়াই, টিয়া তাদের।

সন্ধ্যেবেলা মদের পর্ব। ঢোলক বাঁশি, গান, নাচ। এবার বনওয়ারী গোটা আটপৌরে-পাড়াকে নিমন্ত্রণ করেছিল। নতুন মিলন হয়েছে ওদের সঙ্গে, কুটুম্বিতাও হয়েছে। বনওয়ারীরও এবার বাড়-বাড়ন্তের বছর, এ তার কর্তব্য। দিনের বেলা চুকে গেল সব, সন্ধ্যেতে মদের আসর বসল—জমলও খুব, পাগল বাহারের গান ধরলে—

ও লবানের লতুন ধানের পিঠে—
আজ কাজ কি মাছের ঝোলে!

অমনি নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল। পাগলের গান চলল—

লতুন কাপড় খসখসিয়ে বউরা এসেছে—
আঙা লতুন ছাওয়াল লিয়ে কোলে!

সঙ্গে সঙ্গে সকলে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। হিসেব কর, কার কার ছাওয়াল হবে। লতুন ছাওয়াল কোলে কে কে লবান্ন করলে। বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। বাবাঠাকুর কবে তাকে বংশ দেবেন তিনিই জানেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজরে পড়ল, সুবাসী যেন নাই মনে হচ্ছে। ভাল ক'রে দেখতে দেখলে, হাঁ বটে। সে নাই, কোথায় গেল? অজুহাত তুলে বাড়ি এসে সেখানেও পেল না তাকে। কোথায় গেল? বেরিয়ে পড়ল মাঠে। চারিদিক খুঁজতে লাগল। করালীকে মনে পড়ে গেল হঠাৎ। কারণ মনে হ'ল, যেন সে বাতাসে সিগারেটের ক্ষীণ গন্ধ পাচ্ছে। সে পাগল হয়ে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল, কে যাচ্ছে দূরে দূরে—আটপৌরে-পাড়ার কোলটাতে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—কে? ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কেউ মানুষ নয়, একটা মরা শ্যাওড়াগাছের বাকল-উঠে-যাওয়া গুঁড়ি, একটা ঝোপের সামনে খাড়া হয়ে রয়েছে, সেটাকে ঠিক মনে হচ্ছে মানুষ। সেখান থেকে ফিরবার পথে হঠাৎ সে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে দাঁড়াল। কালোশশীর ভাঙা ঘরের উঠানে এসে পড়েছে সে, এবং ভাঙা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কার সাদা মূর্তি! বাক্যহারা হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তার মনে নাই। চেতনা হ'ল তার সাদা মূর্তিটির কথা শুনে। অতি মৃদু খোনা সুরে বললে—পালাও—তুমি পালাও—আমার লোঁভ লাঁগছে তোমার ওঁপর—

মুহূর্তে বনওয়ারীর ভয় ভেঙে গেল। চেতনা ফিরে এল। লাফ দিয়ে সে ধরলে তাকে। সে সুবাসী।

—হারামজাদী—

আশ্চর্য সুবাসী, সে খিলখিল করে হেসে উঠল। উন্মত্ত ক্রোধে বনওয়ারী তার গলা টিপে ধরে বললে—বল্ কি করছিলি এখানে? বল্, আর কে ছিল?

সুবাসী বহু কষ্টেই বললে—সন্দেশ!

—সন্দেশ?

—সন্দেশ খেছিলাম লুকিয়ে। এই দেখ। সে কাপড়ের ভিতর থেকে বার করলে সন্দেশের বাটি।

গলা ছেড়ে দিলে বনওয়ারী। সন্দেশ খেছিলি লুকিয়ে?

— হ্যাঁ। নতমুখে সে বললে—দিদি মোটে দুটি দিয়েছিল, তাই—

এবার হেসে ফেললে বনওয়ারী।—তাই লুকিয়ে এখানে খেতে আইছিলি। তা ঘরে খেলেই তো পারতিস?

—কেউ যদি দেখে ফেলত!

—তাই ব'লে এই ভাঙা ঘরে—সাপ, না, খোপ—

— ভালই হ'ত মরতাম। তুমি আজলক্ষ্মী গোপালী বুড়ীকে নিয়ে ঘর করতা।

হাসলে বনওয়ারী। বললে—চল্, কত সন্দেশ তু খেতে পারিস দেখব? এখুনি সন্দেশ আনাব।

—না। এবার কাঁদতে লাগল সুবাসী।

—কাঁদিস না, চল্।

অনেক কষ্টেই সুবাসীর মান ভাঙিয়েছিল সে। কিন্তু এমন যে মেয়ে—যে লোভের বশে, দেবতার কথা না ভেবে, স্বামীকে বঞ্চিত ক'রে, চুরি ক'রে ভূতুড়ে ঘরে ব'সে পেটপুরণ করে, সে তো ভাল মেয়ে নয়। ওই মিষ্টি পরের দিন দেবতাকে দেওয়ার কথা ছিল। বনওয়ারী মুখে তোলে নাই তখনও পর্যন্ত।

দ্বিতীয় বছর চড়কের পাটায় শুয়ে বনওয়ারী ওই সব কথাই ভাবছিল। গত বছরের কথা। ও বছরের কথা বছর পার হয়ে এ বছরে কাহিনী হয়ে গেল। বাজনা থামল, পাটা নামছে, উপরে শিমুলবৃক্ষের ডগার ডালটি দুলছে; বাবাঠাকুরের দহের ধারে পাটা নামছে। বাবা জলশয়ানে যাবেন বছরের মত। এক বছর গেল, নতুন বছর শুরু হ'ল।

পাটা নামতেই বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

এক লালমুখ সায়েব আর তার পাশে করালী। দুজন সিগারেট খাচ্ছে। জাঙলের সদ্গোপ মহাশয়েরা মায় মাইতো ঘোষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। করালীর ভ্রূক্ষেপও নাই। সায়েবটা কড়োমড়ো ক'রে কি বলছে। মাইতো ঘোষ ইংরেজীতে জবাব দিচ্ছেন। বনওয়ারীর ইচ্ছে হল, লাফিয়ে উঠে ছোঁড়ার বুকে প্রচণ্ড এক কিল মারে। ভেঙে দেয় ওর বুকের পাটা, চুরমার ক'রে দেয়। কিন্তু সে শুয়ে আছে চড়কপাটায়, এবং সায়েবটা রয়েছে করালীর পাশে।

অবাক। করালী বলছে—হ্যালো ম্যান? ব'লেই ঘাড়টা উল্টে দিল। এ ইশারার মানে—চল। তাই বটে। সায়েবটা চলে গেল করালীর সঙ্গে।

*　　*　　*　　*

করালী পাপ, করালী সাক্ষাৎ 'দানো' অর্থাৎ দানব। কাহারকুলের অনেক পাপে হাঁসুলী বাঁকে ওর আবির্ভাব হয়েছে। বনওয়ারীর বয়স প্রায় তিন কুড়ি হ'ল, সুচাঁদ পিসীর চার কুড়ি হবে, চোখে তো দুজনের একজনও দেখে নাই এমন 'দানোর' আবির্ভাব।

সুচাঁদ পিসীর জানা হাঁসুলী বাঁকের যে-উপকথা, সে-উপকথার মধ্যেও নাই। বজ্জাত দুষ্ট চিরকাল আছে, থাকবেও চিরকাল, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়, কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ দানো। আদ্যিকালের কথায় দত্যি-দানোর কথা শোনা যায়, পৃথিবীতে তারা জন্ম নিত মনুষ্য হয়ে, পাড়া-গেরামদেশ লণ্ডভণ্ড ক'রে দিত, নিজে পাপ করত, পরকে দিত পাপমতি, মানুষ পরিত্রাহি ডাক ছাড়ত মনে মনে। মা ধরণীর বুক উঠত টাটিয়ে, তিনিও কাঁদতেন। তখন দেবতা আসতেন, এসে বধ করতেন মনুষ্যবেশী দানোকে। মানুষের সাধ্য নাই দানোকে বধ করতে। বনওয়ারী অত্যন্ত সাবধান হয়েছে। মনে মনে বেশ বুঝেছে। একটি ব্যাপারেই চোখ খুলে গিয়েছে।

করালীর সেই কোঠাঘর করা নিয়েই ব্যাপার। গোটা কাহারপাড়ার বারণ মানলে না, মাতব্বরের শাসন নিলে না। বসনের মত শাশুড়ী, তার কথা রাখলে না। সুচাঁদের মত আদ্যি-কালের প্রবীণ মানুষের হিতবাক্য কানে তুললে না। সেই কোঠাঘর বানালে সে। গোটা কাহারপাড়ার ক্ষমতা তাকে আটক করতেও পারলে না।

আজ কাহারপাড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখ, করালীর কোঠাঘর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোঠাখানা কাহারপাড়ায় জোর ক'রে পোঁতা করালীর জিদের ধ্বজার মত উঠে রয়েছে —সন্ধ্যাবেলা এসে ওরা আলো জ্বেলে ঢোল বাজিয়ে 'জানান' দিয়ে যায়। জিদের ধ্বজাই নয় শুধু, অধর্মের—কলিকালের ধ্বজা। হতভাগা জানে না, উঁচু মাথায় বিপদ কত! তালগাছে বজ্রাঘাত হয়, লাঠি পড়লে উঁচু মাথাতেই পড়ে, ঝড়ে উঁচু ঘর ওড়ে, উঁচু ঘরে আগুন লাগলে সে আর নিবানো যায় না। চোর ডাকাতের নজর উঁচু ঘরের মাথা দেখে ফেরে, হিংসুটে লোক উঁচু ঘর দেখেই বিষমন্তর আওড়ায়। ভূত বল, প্রেত বল—আকাশে আকাশে যাঁরা ফেরেন, তাঁদের পথে যে ঘরের মাথা উঁচু সেই ঘরের মাথাতেই তাঁরা বসে পড়েন, বাধা পড়লে সে ঘরে মন্দ দৃষ্টি দিয়ে যান। পিতৃপুরুষে যা করে নাই, তাই করলে অশুভক্ষণে, তার ফল ওকে পেতেই হবে।

চড়কপাটায় শুয়ে বনওয়ারী স্মরণ করলে ওই ঘর করার বৃত্তান্ত।

যে দিন করালীর ঘরের তৈরী বনিয়াদ কাহারপাড়ার সবাই জুটে হৈ-হৈ ক'রে কেটে সমান ক'রে দিলে মাটির সঙ্গে, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় করালী চ'লে গেল পাখীকে নিয়ে চন্ননপুর। রাত্রে নয়ান মারা গেল, ভোরে শ্মশান থেকে বনওয়ারীরা ফিরতেই গোপালী বললে—বেপদ হইছে। করালী পুলিস নিয়ে আইছিল। জমাদার ব'লে যেয়েছে—তোমাকে থানাতে যেতে।

—থানায় যেতে! বুকটা গুর-গুর ক'রে উঠল বনওয়ারীর।

অনেক ভেবে সে সাহস সঞ্চয় করলে। চুরিও করে নাই সে, ডাকাতিও না, খুনও না, কিসের ভয় তবে? সরকারের একটা আইন আছে, পাড়াঘরে জাতধর্মের একটা নিয়ম আছে। সে মাতব্বর হয়ে অনিয়ম করতে দেবে কি ক'রে—থানাওয়ালা আইন দিয়ে তাই হিসাব করুক, বিচার হোক। সে সঙ্গে নিলে প্রহ্লাদ এবং রতনকে, আরও নিলে চৌধুরী মহাশয়ের পাইক নবীনকে। জমিটা চৌধুরী মহাশয়ের, ঘর ক'রে আছে ব'লে জায়গা করালীর বাপের নয়, সুতরাং তাদের বিনা হুকুমে করালী ঘর করে কি ক'রে? আর নবীনকে করালী গাল দিয়েছে,মেরেছে। এ বুদ্ধিটা দিলেন ঘোষেরা। মাইতো ঘোষ ব'লে দিলেন— বলবি, চৌধুরী মহাশয়ের হুকুমে কেটে দিয়েছি বনেদ।

কিন্তু দারোগাবাবু বললেন—উঁহু, ও সব কথা চলবে না। বুঝলে! ঘর ওর ছিল ওখানে, সেই ঘর ভেঙে নতুন করছে, জমি চৌধুরীদের হোক আর যারই হোক, তারা খাজনার মালিক, খাজনা পাবে ; ঘর করতে বাধা দিতে কেউ পারবে না। আর পাড়া-নিয়মের কথাও চলবে না। কোঠাই করুক আর গম্বুজই করুক, ওকে করতে দিতে হবে।

বনওয়ারী হাত জোড় ক'রে শেষ চেষ্টা ক'রে বলেছিল—আজ্ঞে, খ্যানত হয়, কিছু হয়—

করালীই ওপাশ থেকে জবাব দিয়েছিল—হয়, আমার হবে।

দারোগা হেসেছিলেন। বনওয়ারী ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে করালীর দিকে তাকিয়েছিল, কথা বলতে পারে নাই। অবশেষে তাই স্বীকার ক'রে ফিরে এসেছিল। দারোগাবাবুকে একটা খাসিও দিতে হয়েছে। অন্যথায় করালীকে ক্ষতিপূরণ দেবার হুকুম দিতেন দারোগাবাবু। করালী উঠে গেলে জমাদার বনওয়ারীকে ডেকে বলেছিলেন—ক্ষতিপূরণের কি করবি ?

ক্ষতিপূরণ! লজ্জায় ক্ষোভে বনওয়ারীর চোখে জল এসেছিল। করালীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'লে তার মাথাটা যে কাটা যাবে! তার চেয়ে তার 'মিত্যু' ভাল।

শেষ জমাদারবাবুই মান রক্ষে করেছিলেন, বলেছিলেন—যাক, সে অপমান তোর হতে দোব না। আমি তো তোকে জানি। দারোগাবাবু না-হয় নতুন লোক। ব'লে দোব ওঁকে আমি। তা নতুন বাবুকে একটা খাসি দিস। উনিও খাবেন, আমরাও খাব।

সেই দিনই বিকেলবেলা করালী এসে করেছিল ওর ঘরের পত্তন। সেই মরা গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে হুকুম দিয়েছিল—লাগাও।

সঙ্গে সঙ্গে হো-হো ক'রে হাসি।

লোকজন সব এনেছিল চন্ননপুর থেকে। তারা কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে। কাহারপাড়ার লোক দূরে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে দেখলে। সুচাঁদ যে সুচাঁদ, সেও নির্বাক হয়ে রইল। তার বাবাকে স্মরণ ক'রে আনন্দেও কাঁদতে পারলে না, ভবিষ্যতের অমঙ্গল কল্পনা ক'রে আশঙ্কাতেও কাঁদতে পারলে না দারোগার ভয়ে।

শুধু মাথলা নটবর এরা এসেছিল। ওরা দু-তিনজন প্রকাশ্যেই করালীর দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। খাসির কথা ওরাই বললে করালীকে। খুব কৌতুকের সঙ্গেই বললে। বললে—আচ্ছা দাঁড় হইছে! খুব হাসলে।

করালী কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে—দিলে কেনে ?

—না দিলে ?

—না দিলে কি ?

—তোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ত। তাতে যে অপমান হ'ত।

—আমি তো ক্ষতিপূরণ চাই নাই।

—তু না চাইলে কি হবে ? আইন—

করালী মুখ ভেঙিয়ে ব'লে উঠল—আইন! ভাগ শালো বেকুব কোথাকার! ঠকিয়ে নিয়েছে। মাতব্বরকে ঠকিয়ে নিয়েছে। বলিস—রাজী থাকে তো আমি নিয়ে যাব স্বদেশীবাবুদের কাছে।

খাসি পেট থেকে বার করব দারোগার।

কথাটা বনওয়ারী শুনেছিল। কিন্তু সে করালীকেও বলে নাই, কারও কাছেই যায় নাই। ছি! শুধু তাই নয়, করালীর ঘরের দিকেই আর সে তাকায় না। ওদিক দিয়ে সাধ্যমত হাঁটে না, ওদিকে যেতে হ'লে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ঘর যখন পাড়া ছাড়িয়ে মাথা তুলে উঠেছে, তখন অবশ্য না দেখে উপায় নাই, তবে সাধ্যমত তাকায় না। কিন্তু করালী আশ্চর্য—ঘর তৈরী ক'রে ঘরখানার ভিতর মেরামত আর করলে না। করবে কেন? ঘর করাটা তো তার জেদ। কাহারপাড়ায় কোঠাঘর তোলা হ'ল, চিরকালের নিয়ম-আচারে লাথি মারা হ'ল, হয়ে গেল কাজ। সে বাস করছে চন্নপুরের সেই পাকা খুপরি কোয়ার্টারে। যুদ্ধের কাজ, তাকে থাকতেই হবে। আরও একটা কারণ আছে। সেটা বনওয়ারী বুঝতে পারে। তারও বয়স অনেক হ'ল। করালী এখানে বাস করতে ভয় করে। করালীর ঘরে এখন বাস করছে নসু। সে থাকে, সাঁজ-পিদীম জ্বলে মাড়ুলী দেয়, সকালবেলায় চ'লে যায় চন্নপুর, ফেরে সন্ধ্যায়। বিকেলে যেদিন ফেরে, সেদিন করালী-পাখীও আসে। সন্ধ্যের আগেই আবার চ'লে যায়।

ড্যারাড্যাং—ড্যাং—ড্যারাডাং—ড্যাং।

* * *

ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডাং।

কালারুদ্দের শিলারূপ জলশয়ানে গেলেন। গত বছরের কথাগুলি স্মরণ করা বন্ধ ক'রে বনওয়ারী চড়কচক্রের পাটা থেকে নামল। ভয়ের বছর শেষ হ'ল। নির্ভয়ে কেটে গেল। জয় বাবা কালারুদ্র! আটচল্লিশ সাল শেষ হলেন, উনপঞ্চাশ সাল এলেন। সুচাঁদ বলে—ক'কুড়ি ক'বছর তাই বল্। তারপর ঘস ঘস ক'রে মাথা চুলকে বাঁ হাতের আঙুলে টিপে উকুন বার করবার চেষ্টা করতে করতে আবার বলে—বিধেতার তো চুলও পাকে না, দাঁতও ভাঙে না। তার কি? বছর পার করলেই খালাস। সেই আদ্যিকাল থেকে—। ব'লে সে পিছনের দিকে ডান হাতের তর্জনীটি বাড়িয়ে দেয়, চোখে ফুটে ওঠে এক বিচিত্র বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি; কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রে থাকে, গোটা কাহারপাড়াও তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে। সুচাঁদ আবার বলে—কত বছর হ'ল কে জানে! মাথার চুলের সংখ্যে হয়—তার আর সংখ্যে নাই। ব'লে সে ঘাড় নাড়তে থাকে।

দুই

উনপঞ্চাশ সাল এলেন ঝড় বাতাস নিয়ে। পয়লা বোশেখ শুভদিনের একটা কালবৈশাখী হয়ে গেল। দোসরাও একটা ঝাপটা দিলে। তেসরা চৌঠা বাদ দিয়ে পাঁচুই আবার ঝড় এল বেশ সেজেগুজে হাঁকডাক ক'রে। দু'দিন চারদিন অন্তর একটা ক'রে ঝাপটা প্রায় নিত্যই চলতে লাগল। উনপঞ্চাশ সালে পাগলও ফিরেছে।

সায়েবডাঙার জমির বাকিটা এবার আবার কাটতে আরম্ভ করলে বনওয়ারী। সন্ধ্যের পর

চাঁদ যতক্ষণ ততক্ষণ কোদাল চলতে লাগল কাহারদের, এবার কাহারদের সঙ্গে আটপৌরেরাও যোগ দিয়েছে। পরমের জমি আট ঘর আটপৌরে ভাগ ক'রে নিয়েছে, কেবল রমণ নেয় নি, সে বুড়োমানুষ, সন্তান নাই; সে-ই এখন আটপৌরেদের মাতব্বর হয়েছে; বনওয়ারীর নীচে অবশ্য। রমণ এখন একরকম ব'সেই খাচ্ছে। যোগাচ্ছে বনওয়ারী। সুবাসীর মেসো, বনওয়ারীর মেসো। রমণ বনওয়ারীর গরু-বাছুর চাষবাস দেখে— এটা ওটা যা হয় করে। বনওয়ারী কাহারদের জন্যও জমির চেষ্টা করছে, চন্নপুরের বাবু মহাশয়ের কাছেও গিয়েছিল। বাবু আশা দিয়েছেন।

সায়েবডাঙার জমি কাটতে কাটতেই ওই সত্যটা আবিষ্কার করলে বনওয়ারীরা। উনপঞ্চাশ সাল বাতাস নিয়ে 'আইছেন লাগছেন' অর্থাৎ এসেছে মনে হচ্ছে।

পাগল জমির ধারে ব'সে ব'সে তামাক খায়, আর সকলকে খাওয়ায়। ও কোদাল ধরে না। মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে পড়ে বাউল-ফকিরের মত বেশ ক'রে। দুদিন পাঁচদিন ঘুরে ঝোলার পেটটি মোটা ক'রে ফেরে, ব'সে পাঁচ-সাতদিন খায়। বলে— এতেই চ'লে যাবে দিন কটা। ও কোদাল ধরবে কেন? বনওয়ারীও বলে না কোদাল ধরতে। পাগল গুণী মানুষ। গবেষণাটা শুনে পাগল বললে—তা আসবে না কেনে হে! উনপঞ্চাশ যে পবনের বছর। বুয়েচ! তারপর বললে—এবার হনুমানেরও উপদ্রব হবে, দেখো! উনিই তো পবননন্দন। পাগলের কথাটা সত্য। পবনের নন্দন ব'লে নয়, ঝড় হ'লে গাছের ডালে বসে ভিজে হনুমানগুলির যত শীত ধরে, তত বেশি লাফালাফি ক'রে ফেরে। ঝড়জল থামলেই উন্মত্তের মত লাফ দিয়ে বেড়াতে শুরু ক'রে দেয়।

উনপঞ্চাশের পবনে আর পবননন্দনদের 'বিক্যমে' অর্থাৎ বিক্রমে কাহারপাড়ার এবার আর দুর্দশার সীমা রইল না। চালের খড় তছনছ হয়ে গেল। ঝড়ের সময় শেষ হ'লে তালপাতা কেটে চালে চাপালেও আর হবে না। চালে খড়ই আর নাই। থাকবার মধ্যে আছে বনওয়ারী। কাহারপাড়ার সকলেই করে কৃষাণি। কৃষানদের ভাগে খড় প্রাপ্য নয়, তিন ভাগের এক ভাগ ধান পাওয়াই সেই আদ্যিকালের নির্দিষ্ট নিয়ম। খড় দু-চার গণ্ডা মনিবের কাছে চেয়ে নেয়। আর মাঠ থেকে সরানো ধানগুলি থেকে কিছু খড় হয়। খড় এবার কেনাও দুঃসাধ্য। খড়ের দরে আগুন লেগেছে। কাহন বিশ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ! কাল যুদ্ধ রে!

চন্নপুরে যাও, বুঝতে পারবে কি রকম যুদ্ধ লেগেছে পৃথিবীতে। কারখানাটা বেড়ে যেন ভীমের বেটা ঘটোৎকচ হয়ে উঠেছে। আর সে কি গর্জন! লোহার যন্ত্রপাতিগুলো ঘড়-ঘড় ঘং-ঘং, ঘটাং-ঘং, ঘটা-ঘটা ঘং—ধড়াম-ধুম—শব্দ ক'রে যেন মহামারণ লাগিয়ে দিয়েছে। মধ্যে মধ্যে আবার উ—উ—উ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে। শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিরসির করে। সেখানে দাঁড়ালে কানে তালা ধ'রে যায় শব্দে। ভিতরে ঢুকলে নাকি গরমে সিদ্ধ হয়ে যায় মানুষ। দুটো চারটে লোক প্রতিদিনই জখম হচ্ছে। দু দশ দিন অন্তর মরছেও একটা দুটো। কাউকে টেনে নিচ্ছে কলের চাকায়, কারও মাথায় খসে পড়ছে লোহার টুকরো, কেউ মরছে উপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে। মরলে পরে নাকি ক্ষতিপূরণ দেয়। সে নাকি অনেক টাকা। হোক অনেক টাকা। জীবনের চেয়ে তার দাম বেশি?

করালী সেই কারখানার ভিতর কুলি-সর্দার হয়েছে। কোট পরেছে, পেণ্টুল পরেছে, জুতো পায়ে টুপি মাথায় দিয়ে হুকুম চালায়। বনওয়ারী আশ্চর্য হয়ে যায়, করালী আজও শাস্তি পেলে না কেন? বাবাঠাকুরের বিচার ন্যায়বিচার, যমদণ্ডের আঘাতে সাজা! সে সাজা কি করালীর আজও পাওনা হয় নাই? হবে হয়তো। আজও হয়তো সময় হয় নাই, হতভাগার পাপের ভারা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এবারে ঝড়ে সকলের ঘর উড়ল, কিন্তু করালীর ঘর প্রায় ঠিকই আছে। অবশ্য লোহার তার দিয়ে চালকে বেঁধেছে মাটির সঙ্গে, চালের উপরে আবার দড়ির জাল দিয়ে খড়ের ছাউনিকে ঢেকে বেঁধেছে, কিন্তু বাবাঠাকুরের কোপ তালগাছের মাথা ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে দেয়, পাকা রেলের পুলকে ভাসিয়ে দেয়, তার কাছে ও বাঁধন কি? ওই পাপের ভারা পূর্ণ হয় নাই—এই কথাই ঠিক।

করালীর দঙ্গলে কতকগুলো ছোঁড়াও ভিড়েছে। ভিড়ুক। ওদেরও সাজা হবে। বাবা-ঠাকুর আছেন।

হঠাৎ এসে দাঁড়াল ঘোষ-বাড়ির চাকর।—বড়কর্তা ডেকেছেন বনওয়ারীকে।

—বড়কত্তা! এত এতে? কাল সকালে—

—না না। আজই রাত্রে যেতে হবে। তা নইলে এই সাঁয়েবডাঙায় আসব কেনে?

—কি, বেপার কি?

—বাড়িতে খাওনদাওন, জান তো?

—হ্যাঁ। তার তো সব যোগাড় হয়েই যেয়েছে।

—তুমি যেয়ো, সেখানেই শুনবে সব।

চাকরটা চ'লে গেল।

ঘোষ-বাড়িতে প্রতি বৈশাখী-সংক্রান্তিতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আছে। পুণ্য কর্মটির রেওয়াজ ক'রে গিয়েছেন স্বয়ং ঘোষ মহাশয়দের মা-ঠাকরুন। ব'লে গিয়েছেন—নেহাত মন্দ অবস্থা না হ'লে এটি বন্ধ ক'রো না।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদ্‌গোপ মহাশয়েরা ভোজন করেন। কাহারেরা প্রসাদ পায়, এঁটোকাঁটা সাফ করে, পাতায় প'ড়ে থাকা খাবার গামছায় বেঁধে বাড়ি আনে, আনন্দ ক'রে খায় পরের দিন।

পাগল বললে—তা হ'লে ওঠো আজকের মত। উদিকে আকাশের গতিকও মন্দ হে। পচিমে চিকুরছে, বাতাস থম ধরেছে। আজ চার-পাঁচ দিন দেবতা হাঁকাড় দেন নাই। আজ বোধ হয় এতে আসবেন বা!

পাগল ব'সে ব'সে ঠিক দেখেছে। পশ্চিমে মেঘ উঠেছে। মাঝ-আকাশে চাঁদ আছে ব'লে এখনও আলো রয়েছে।

বড় ঘোষ মহাশয় থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয় পেলে বনওয়ারী। চন্নপুরের বাবুদের কাছে জমি নিয়ে ঘোষ মহাশয়দের জমির কাজে কিছু অবহেলা তার হচ্ছে, এজন্য বড়কর্তা একদিন রোষ করবেন—এ অনুমান বনওয়ারী কিছুদিন ধ'রেই ক'রে আসছে। আজ বুঝলে, খাওয়ান-

দাওয়ানের কোন কর্মের খুঁত ধ'রে সেইটা আজ মাথায় পড়ছে। সে সভয়ে সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে ?

বড়কর্তা ফেটে পড়লেন—তোমাদের কাহারদের আমি সোজা ক'রে দোব।

—আজ্ঞে ?

—কেরোসিনের জন্য খবরদার আসবে না তুমি। চিনির জন্যে না। কাপড়ের জন্যে না। কুইনিনের জন্যে না। খবরদার। দোব না আমি।

বড়কর্তা ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর। কাহারপাড়া জাঙলের হুকুমচিঠির ভার ওঁর উপরে। যুদ্ধের জন্য 'কেরাচিনি', চিনি, কাপড়, 'কণ্টোল' না কি হয়েছে। বাজারে গিয়ে পয়সা দিয়ে মেলে না। হুকুমচিঠি পেলে, সেইটি দেখালে, তবে পাওয়া যায়। কাহারেরা 'কেরাচিনি' পায়, চিনি বড় একটা পায় না। সাত দিনে এক ছটাক দু ছটাক বরাদ্দ। তাও বন্ধ ক'রে দেবেন বলছেন। চিনি গেলে ক্ষতি নাই। চিনি ওরা খায় না, ওদের চিনিটা নিয়ে থাকেন ওদের মনিব মহাশয়েরা। কিন্তু 'কেরাচিনি' খানিক আধেক না হ'লে চলবে কি ক'রে ? 'কুনিয়াল পিল' ইউনিয়ন-বোর্ড দেন মেম্বরের হাতে, ম্যালেরিয়ার সময় ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক—তখন কুনিয়াল না হ'লে মরণ! কিন্তু অপরাধটা কি হ'ল ?

বড়কর্তা বললেন—গলায় তোরা পৈতে নে। বুঝলি ? তোদের মেয়েরা চন্নপুরে গিয়ে—

বড়কর্তা একেবারে কাহার মেয়েদের যত কেলেঙ্কারি প্রকাশ ক'রে দিলেন। বড়কর্তা রেগে গিয়ে কাহারদের কথা প্রকাশ ক'রে বললেন— কাহারেরা আর কাহার নাই, বামুন। তা পৈতে নিক কাহারেরা। শেষে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বললেন—এঁটো ভাত খাবে না, নেমন্তন্ন চাই! জুতো না খেয়ে সব মাথায় উঠেছে!

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল—সে কি ? এ সব কথা কে বললে আপনকাকে ?

বড়কর্তা উঠে এলেন। বললেন—তোদের ওই করালী বলেছে। হারামজাদাকে আমি একদিন জুতোব। শালার ভয়ানক বাড় হয়েছে। চন্নপুর ইষ্টিশানে ছোটকা অর্থাৎ ছোট ভাই আজ বাজার ক'রে নেমেছিল। তোদের সিধু ছিল সেখানে। সিধু জিজ্ঞেস করেছে অন্নপ্রাশনের কথা। বলেছে—আমাদিকে পেসাদ দেবেন তো ? ছোটকা বলেছে—নিশ্চয়ই পাবি। যাবি তোরা। তুই করালী পাখী যাবি, কাহারপাড়ার সবাই আসবে। করালী দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। সে বেটা বলেছে—করালী কারও এঁটোকাঁটার পেসাদ খায় না। কাহারপাড়ার ছেলেছোকরারাও বলছে—তারাও যাবে না। সিধুকে বলেছে—তু যদি যাস তো তোর সঙ্গেও আমরা খাব না।

অবাক হয়ে গেল বনওয়ারী। এমন স্পর্ধা সে কল্পনাও করতে পারে না।

বড়কর্তা বললেন—যে শালা কাহার না আসবে, তাকে দেখব আমি। আবার পাড়াতে মজলিস জুড়েছে!

* * * *

কথাটা সত্য। সেই রাত্রেই করালীর বাড়িতে কাহারছোকরাদের মজলিস চলছিল। করালী

তাদের সেই কথা বলছে।—ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। এঁটো খেলে জাত যায়। যে কাহার পরের এঁটো খাবে, সে পতিত। তার জাত নাই।

করালীর আপসোস—বুড়ো কাহারেরা এই সহজ কথাটা বুঝছে না। আপসোস—তারা চন্দনপুরেব কারখানায় গিয়ে একবার পরখ ক'রে দেখছে না, সেখানে সুখ কি দুখ! সেখানে মানুষের ভাল হয় কি মন্দ হয়!

মজলিসটা জ'মেই উঠেছিল। বনওয়ারী এসে হাজিরও হ'ত। কিন্তু জাঙল থেকে পথে ফিরতে ফিরতেই এল ঝড়। হাঁকডাক ক'রে এল। গোঁ-গোঁ—সোঁ-সোঁ! এ বছর এমন জোরে আসেন নাই ঠাকুর, আজ নিশ্চয় আসছেন করালীর তালগাছটার মাথা ভাঙতে। নিশ্চয়। সে আকাশের দিকে চাইলে। মেঘের নীচে চাঁদ এখনও দেখা যাচ্ছে। মেঘ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, সাদা কালো। চমকে উঠল বনওয়ারী। সেই বরণ, সেই চিত্রবিচিত্র! তেমনি এঁকেবেঁকে পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরছে। জিভের মত লকলকিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। হে বাবাঠাকুর, রক্ষা কর। হে বাবা-ঠাকুর! গাছ ভাঙছে, বাঁশে বাঁশে কট কট শব্দ উঠছে, কড় কড় ক'রে মেঘ ডাকছে; সঙ্গে সঙ্গে নয়ানের মায়ের গলায় আজ আবার অনেকদিন পরে সাড়া জেগেছে।

ওদিকে নয়ানের মা তীব্র স্বরে ব'লে যাচ্ছে, সুচাঁদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলছে—হে বাবাঠাকুর, তুমি ধ্বংস কর বাবা, যে তোমার বাহনকে মারলে, যে পরের ঘর ভাঙলে, গাঁয়ের বিধান না মেনে যে উঁচু ঘর বাঁধলে, একবার ফুঁসিয়ে তার ঘর উড়িয়েছ, আবার ভেঙে দাও। মড়মড় ক'রে ভেঙে দাও। মাথায় তাদের দংশন কর। হে বাবা! যে-যে লোক তোমার বাহনকে মারার অপরাধকে ক্ষমা করেছে, তাদের কামুড়ে মেরে ফেল। চোখ ফেটে যাক অক্তের ডেলা হয়ে; গায়ে অক্তমুখী চাগড়া চাগড়া দাগ ফুঠে উঠুক। কাহারপাড়ায় যার যত অপরাধ, বিচার কর। শ্যাষ ক'রে দাও, শ্যাষ ক'রে দাও, শ্যাষ ক'রে দাও। আমার নয়ানের সঙ্গী কর সবাইকে। আমাকে যেন বাঁচিয়ে একো। আমি নি-মনিষ্যি কাহারপাড়ার ঘরে ঘরে নেচে বেড়াব—কেঁদে বেড়াব পেত্নীর মত।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে রইল মেঘের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে শব্দ উঠল। পড়ল? করালীর ঘর পড়ল? উঠে দাঁড়াল বনওয়ারী। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর নীরব হয়েছে। ঝড় থামতেই সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়।—কার ঘর পড়ল?

—নয়ানের ঘর গো।

—নয়ানের ঘর? স্তম্ভিত হয়ে গেল বনওয়ারী।

—বনওয়ারী? ব্যানো!

—কে? বিরক্ত হ'ল বনওয়ারী;—পিছনে ডাকে কে?

—আমি, পাগল।

—কি?

—খ্যানত হয়ে গেল ভাই। সর্বনাশ হয়েছে।

—কি তাই বল?

—করালী চন্নপুর যাবার পথে হেঁকে ব'লে গেল—বাবাঠাকুরের মুড়ো বিল্ববিক্ষটি প'ড়ে গিয়েছেন।

হে ভগবান! বাবা গো! তুমি কি করলে গো! শেষে কি তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে? কলিকাল। অধর্মের পুরী! কাহারপাড়ায় পাপ পরিপূর্ণ ক'রে তুললে করালী। সেই পাপ সইতে না পেরে চ'লে গেলে তুমি!

জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গোটা কাহারপাড়া দেখলে। মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ আবার উঠেছে আকাশে। ফুটফুট করছে চাঁদের আলো। বনওয়ারীর হাতে লণ্ঠনও ছিল একটা। বাবাঠাকুরের বৃক্ষটি কাত হয়ে গিয়েছে।

বনওয়ারী বললে—চান কর সব।

—চান?

—হ্যাঁ, চান কর। চল, ঠেলে বিক্ষটি তুলব। ছোট বিক্ষ, গোটা কাহারপাড়ার কাঁধ, দিবি উঠে যাবে। তা'পরেতে ওকে বাঁধিয়ে দোব। ভয় নাই, পাশের বিক্ষটি ঠিক আছে।

গোটা কাহারপাড়া কাঁধ দিলে।

জয় বাবাঠাকুর! জয় কালারুদ্দু! বলো—শিবো—ধম্মরাজো—! উঠেছে, উঠেছে। আবার বলো ভাই। আবার। হয়েছে। হয়েছে। দাও মাটি চারিদিকে—বেঁধে দাও। শক্ত ক'রে বেঁধে দাও।

হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠল কেউ। শিশুকণ্ঠ। চমকে উঠল সবাই। বুক ধড়ফড় ক'রে উঠল। বাবাঠাকুরের থানে কার কি হ'ল?

—কি? কি হ'ল?

—সাপ! ও বাবা, সাপ!

—সাপ? কার ছেলে রে? কে? কি সাপ? বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল পানা—নিমতেলে পানা।—ওগো—সেই গো, সেই। ঠিক সেই তিনি গো!

একটা ঝোপের মধ্যে একটা চন্দ্রবোড়া ঢুকছিল তাদের স্বভাবমন্থর গতিতে।

কাহারপাড়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। পানার ছেলেটা ম'রে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই, ঠিক যেমন ভাবে মরেছিল করালীর কুকুরটা, তেমনি ভাবেই চোখ ফেটে রক্ত পড়ল, শরীরে চাকা চাকা রক্তমুখী দাগ বার হ'ল। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়াল। সুচাঁদ চীৎকার করে উঠল—ওরে, আমি তখুনি বলেছিলাম রে। বছর পেরুলে কি হবে রে? বাবাঠাকুরের কাছে বছর নাই রে! ওরে বাবা!

নয়ানের মা ভাঙা ঘরের দাওয়া থেকে উত্তর দিল—আঃ, কে করলে বেম্মহত্যে, কার পরাণ গেল রে? পানা তো খুঁতো পাঁটার বদলে ভাল পাঁটা দিয়েছিল রে! যে ডাকাবুকো বাবার বাহনকে মেলে রে, তার কিছু হলো না কেনে রে? অর্থাৎ করালীর কিছু হ'ল না কেন? তার নিজের ঘর ভাঙায় কোন দুঃখ নাই, দুঃখ থাকলেও সেজন্য সে আক্ষেপ করলে না। তার আক্ষেপ—পাপীর দণ্ড হ'ল না।

পানা এবং পানার স্ত্রী ভয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। এ সাজা বাবাঠাকুরের দেওয়া সাজা। এতে কথা বলবার নাই।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার বিধাতাপুরুষ কাহারপাড়ার লোকের 'নেকনে' অর্থাৎ লিখনে ষষ্ঠীপুজোর দিনে তার ভাগ্যফল 'নিকে' দেন। গত জন্মের যেমন কাজ তেমনি ভাগ্যফল দেন। নইলে চন্দ্রবোড়া সাপ এখানে বিরল নয়। যথেষ্ট আছে। তার বিষে মরছেও অনেক। কিন্তু পানার ছেলের এই মরণ, এই বাবাঠাকুরের থানে, বাবাঠাকুরের গাছ পড়ল যেদিন, সেই দিনেই এই মরণ—এর কার্যকারণ সব তো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। পানার ঘরের কুকুরে-ধরা উচ্ছিষ্ট পাঁঠা জরিমানা স্বরূপ আদায় ক'রে চৌধুরীবাবুরা বাবার থানে বলি দিয়েছে, শাস্তি যাবে কোথা? এ নিশ্চয় বাবাঠাকুরের দণ্ড; ভুল নাই তাতে, কোন ভুল নাই। এ মিত্যু বাপের পাপে বেটার মিত্যু।

বনওয়ারী মাথায় হাত দিয়ে বসল। বছর পার হয়েছে, তাতে দণ্ডকাল ফুরায় নাই। জন্মান্তরে শাস্তি হয়, যুগ পার ক'রে শাস্তি হয়, আদিকাল থেকে হাঁসুলী বাঁকের কর্মফলে কোন্ শাস্তি কবে আসবে কে জানে! তবে আসবে নিশ্চয়।

তিন

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মানুষেরা—অন্ধকার রাত্রে বটতলায় আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষের দল। এ রাত্রি আদ্যিকালে আরম্ভ হয়েছে, শেষ কবে হবে জানে না। তবে শেষ যেদিন হবে, সেদিন হাঁসুলী বাঁকেরও শেষ হবে। কাহার-জীবন যতদিন, এ রাত্রি ততদিন, হাঁসুলী বাঁকও ততদিন। তারপর হয়তো দহে পরিণত হবে কোপাইয়ের কোপে, নয়তো কিছু হবে, কি হবে কে জানে! রাত্রে আকাশে তারা খসে, বাদল নামে, কাহারেরা ফলভোগ করে, এর শেষ কি হয়? বনওয়ারী ভুল করেছিল, বছর শেষ হওয়ায় ভেবেছিল, বিপদ কেটে গেল। তাই কি হয়? বিপদ কাটে না। দু দণ্ড জ্যোৎস্না দেখে যে ভাবে, বাদল আর হবে না, আকাশে তারা আর খসবে না, কিছুই জানে না। বনওয়ারী জানে, জেনেও ভুল করেছিল। কাহারপাড়ার আরও অনেকে ভুল করেছিল। এই ঘটনাটিতে ভুল সকলের ভাঙল। তাতে একটি সুফল হ'ল কিন্তু।

পাঁচ জন ছাড়া করালীর দল সকলেই ছাড়ল। শেষাশেষি বহুজনই গোপনে গোপনে করালীর দিকে ঝুঁকে ছিল। বনওয়ারী সকলকে বার বার সাবধান ক'রেও মানাতে পারে নাই; এবার সব থমকে গেল। ফিরল।

রতন প্রহ্লাদ সকলেই ঘাড় নাড়লে। পাগল গান গাইলে—পুরনো গান—

মন চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না—
কেলি-কদমতলায়, বৃন্দে গো!
মানিক পেলে তুমিই নিয়ো—আমি চাইব না—
কালোমানিক কালায়, বৃন্দে গো!

ঠিক কথা। পাগল নইলে এ সকল কথা শোনায় কে, আর বাবাঠাকুরের শাসন ভিন্ন ভাঙর

পথ ধরায় কিসে ? পানার ছেলের এই সর্পাঘাত—বাবাঠাকুরের বাহন যে সাপটি, সেই বংশের সাপের দণ্ডাঘাতের দণ্ডে কাহারপাড়া থমকে গেল। করালীর হাসি, বেপরোয়া কথা, সাজসজ্জা—সবেরই রঙের উপর ভয়ের কালো রঙ মাখিয়ে দিলে। মাথার উপরের উড়ো-জাহাজের লাল নীল আলো বাবাঠাকুরের এক ফুঁয়ে নিবে যাবে একদিন—এই সত্য উপলব্ধি ক'রে সেই পুরানো কালের উদাস দৃষ্টি তাদের চোখে আবার ফিরে এল। ফলও হ'ল। ঘোষ-বাড়িতে বনওয়ারীর মুখ থাকল।

ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে সকলেই গেল শ্রদ্ধার সঙ্গে। কৌলিক কাহারধর্ম, সে কি ছাড়া যায়! শুধু করালীরা ক'জনে গেল না।

সে বললে—যা যাঃ! তোরা পতিত। কাহারপাড়াকে পতিত করলাম আমি। আরও ব'লে দিলে—ঘোষকর্তা যদি কারুরও কেরাচিনি বন্ধ করে, চিনি বন্ধ করে, তবে আমিও দেখব। সদরে দরখাস্ত দোব আমি। ম্যানকে নিয়ে চ'লে যাব ম্যাজিস্টর সাহেবের কাছে।

'ম্যান' মানে রাঙামুখো যুদ্ধের সাহেব, যে করালীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কাহারপাড়ায় আসে।

বনওয়ারী শুনে হাসে। পতঙ্গের পাখা উঠলে সে মাতঙ্গ হয় না বাবা! মাতঙ্গ দূরের কথা, পক্ষীও হয় না। বাবাঠাকুরের গাছতলাটি বাঁধানো হচ্ছে—বনওয়ারীই বাঁধিয়ে দিচ্ছে, সেইখানে ব'সে তদারক করতে করতে করালীর মাতঙ্গপণা দুবেলা সে দেখে। হেলেদুলে যায়, মধ্যে মধ্যে 'ম্যান' সাহেবটাকে সঙ্গে নিয়ে চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। লোকটা গলায় ঝুলানো একটা বাক্স নিয়ে কিলিক্ কিলিক্ ক'রে ছবি তোলে—'ফটোক্' অর্থাৎ ফোটো।

সেদিন বনওয়ারী মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল।

গোটা জ্যৈষ্ঠ কাঠফাটা রৌদ্র গেল। বৈশাখের সঙ্গে সঙ্গে পবনদেব ক্ষান্ত হয়েছেন। যোগাড়যন্ত্র ক'রে বাবাঠাকুরের গাছটিকে খাড়া ক'রে থানটি বাঁধাবার কাজ শেষ হয়েও হচ্ছে না। বিলাতী মাটির জন্যে চৌদ্দভুবন দেখলে বনওয়ারী। বিলাতী মাটি 'কণ্টোল' হয়েছে। 'রবশ্যাযে' অর্থাৎ অবশেষে তিন গুণ দাম দিয়ে দু বস্তা মাটি সে পেয়েছে। আষাঢ় এসেছে। আকাশ যেন কেমন করছে। চারিদিকটা মধ্যে মধ্যে থমথমিয়ে উঠছে, আবার ক্ষান্ত হচ্ছে। এইবার নামবারই কথা।

"চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর
জষ্টিতে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।"

হবার সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু আর দুটি দিন, বাবাঠাকুর, আর দুটি দিন—দু দিন হ'লেই ঠাঁইটি বাঁধানোর কাজ শেষ হবে। বিলাতী মাটি দেওয়া হচ্ছে আজ। কাল হ'লেই শুকিয়ে যাবে। বিলাতী মাটির ওই আশ্চর্য গুণ!

করালী এসে দাঁড়াল।

—কি ?

—একটা কথা বলতে এলাম।

—তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা না।

—তোমার নাই, আমার আছে। গোটা পাড়ার আছে।

—গোটা পাড়ার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ?

—তোমার যা সম্বন্ধ, আমারও তাই।

—না।

—'না' বললে আমি শুনব কেনে ?

—ভাল। কি বলছ বল ?

—বলচি, পাড়ার লোকের ঘরে ধান নাই, মনিবে ধান বন্ধ করেছে। তুমি হয় ব্যবস্থা কর, নইলে বল—ওরা কারখানাতে চলুক।

বনওয়ারী হুঙ্কার দিয়ে উঠল। করালী হাসলে, বললে—ই সব ভয় আমাকে দেখিও না। যা বলবার বললাম। যা করবার ক'রো।

গট গট ক'রে চলে গেল করালী। বনওয়ারী আক্রোশভরে চেয়ে রইল তার দিকে। কাল যুদ্ধ। যুদ্ধের গতিকে দু মাসের মধ্যে ধান পাঁচ টাকা থেকে দশ-বারোতে উঠেছে। সদ্‌গোপেরা হুড় হুড় ক'রে ধান বেচে টাকা করছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জল না-হওয়ার ছুতো ধ'রে ধান বন্ধ করেছে। পাড়ার লোকের অভাব হয়েছে সত্যি। কিন্তু সে কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

হঠাৎ চোখ ধেঁধে গেল। গুড় গুড় ক'রে ডেকে উঠল মেঘ। বনওয়ারী আশ্বস্ত হ'ল। বুকটা ফুলে উঠল। মেঘের এ ডাক বর্ষার মেঘের ডাক। বৈশাখে পবনদেবের মেঘ ডাকে—কড়-কড়-কড় শব্দে!

বর্ষার মেঘ ইন্দ্ররাজার মেঘ। এ মেঘ ডাকে গুড়-গুড়-গুড়-গুড় শব্দে। পশ্চিম থেকে দেয় মৃদু মৃদু বাতাস। ঝরঝর ঝরঝর ধারায় মেঘ যেন ভেঙে নেমে আসে মা-পৃথিবীর বুকে।

* * * *

উনপঞ্চাশে আবার নামল আষাঢ় কাড়ান। জয় বাবাঠাকুর! কাহারেরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হাঁসুলী বাঁকের মাঠে। হাল গরু নিয়ে ছুটল। পাগল পালাল গ্রাম ছেড়ে। কি করবে সে এখন আর গ্রামে থেকে ? কাহারেরা পড়েছে চাষ নিয়ে, সে গাঁয়ে একলা কাকে নিয়ে দিন কাটাবে ? গোটা কাহারপাড়া মাঠে—গরু-মানুষ-মেয়ে-পুরুষ সব।

যে জমিতে হাল চলেছে, তার চারিপাশে ঝাঁকবন্দী বক নেমেছে, লম্বা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লম্বা গলা বাড়িয়ে লম্বা ঠোঁটে জমির ঘোলা জলে ঠোকর মেরে ব্যাঙ পোকা কেঁচো কাঁকড়া ধ'রে খাচ্ছে, লাঙলের ফালে জমির মাটির তলার পোকা-মাকড় ভেসে উঠছে। মাথার উপর উড়ছে ফিঙে কাকের দল। তারাও ছোঁ মারছে। কাকে আর ফিঙেতে চিরকেলে ঝগড়া; খাবার লোভে তাও ভুলেছে ওরা। বনওয়ারী বলে—উদর এমনি বটে! উদরের দায় বড় দায়!

কাহারদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জমির আলের গর্তের ভিতর কাঁকড়া ধ'রে বেড়াচ্ছে। কাহার-মেয়েরা ঘরের পাট-কাম সেরে, গাই-গরুর দুধ দুইয়ে চন্নপুরে যারা দুধের যোগান দিতে যায় তাদের দিয়ে, মরদদের জন্যে জলখাবার নিয়ে মাঠে আসবে। সঙ্গে আছে ঝুড়ি কাস্তে, পুরুষদের জলখাবার খাইয়ে আলে আলে ঘাস কাটবে। বোঝা বোঝা ঘাস। কতক খাওয়াবে

নিজেদের গরুকে, কতক পাঠাবে চন্নপুরে বিক্রির জন্যে।

চন্নপুরে যাবার আলপথটি ঘাসে প্রায় ভরে গিয়েছে। ওই পথটার দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে খুশি হয় বনওয়ারী। ওপথে করালীর দল ছাড়া কাহারপাড়ার লোকেরা বড় কেউ হাঁটে না।

দুধ ঘাস ঘুঁটে যোগান দিতে যাওয়া ছাড়া ওপথে নিত্য কেউ হাঁটে না। তাও সে চন্নপুরের কলের কারখানার এলাকায় নয়। ভদ্রলোকের বাবু-মহাশয়দের পাড়াতে যায় তারা। মেয়েরাই যায়। পুরুষদের মধ্যে যার যেদিন মাঠের কাজ কম থাকে, সে যায় বিকেলবেলা আবগারীর পচুই মদের দোকানে। বড় একটা জালায় আনে রশি মদ, ধেনো পচাইয়ের সবচেয়ে তেজস্কর অংশটা। সেটা তারা জল মিশিয়ে পরিমাণে বাড়িয়ে যার যেমন পয়সার সামর্থ্য সে তেমনি ভাগ নিয়ে যায়। করালী চন্নপুর যাওয়া-আসার একটা নূতন আলপথ তৈরী করেছে। পথটা একেবারে মাঠের বুক চিরে সোজা চ'লে গিয়েছে।

করালীর পিছনে পিছনে মাথলা নটবর, তাদের পিছনে পিছনে আরও কজন ওই পথে যাওয়া-আসা করে। পিতিপুরুষের আমলের জাঙল-ঘেঁষা পথকে বাঁয়ে রেখে নতুন পথ ফেলেছে তারা। সে পথ কিন্তু আজও ঠিক হয়ে ওঠে নাই। মাথলা নটবর গোপাল ছাড়া আর সকলে সায়েস্তা হয়ে গিয়েছে, তারা আবার মাঠের কাজে লেগেছে। কাজ জুটিয়ে দিয়েছে বনওয়ারীই। কাজের ভাবনা কি? নতুন মাঠ হচ্ছে সায়েবডাঙায়। বাবুদের অঢেল পয়সা, জমি কাটিয়ে ফেলেছে অনেক, তাতে ঢেলেছে মরা পুকুরের পাঁক মাটি। চাষ চালিয়েছে জোর। কিন্তু বাবুরা তো নিজে হাতে চাষ করে না, চাষ করে কাহারেরা, আর করে কাহারদের মতই হাতেনাতে চাষ করতে যাদের নীচু কুলে জন্ম তারাই। এ হ'ল ভগবানের বিধান, বাবাঠাকুরের হুকুম। খাট, খাও। বুক পেড়ে দু হাতে খাট, সোনার লক্ষ্মীতে ভ'রে উঠুক হাঁসুলীর মাঠ; বাবু-মহাশয়ের, সদ্‌গোপ মহাশয়দের ভাগ্য আর তোমাদের হাতযশ। মনিবের খামারে ধান তুলে দাও, মনিবান শাঁখ বাজিয়ে জলধারা দিয়ে লক্ষ্মী ঘরে তুলুক। তুমি আঁচলে খামার ঝেড়ে তুলে নিয়ে এস মা লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। তাই তোমার ঢের, তার চেয়ে আর বেশি কি চাও? 'যেমন বিয়ে তেমনি বাজনা'। কাহারকুলে জন্ম যখন হয়েছে, তখন এ জনমের এই বিধান। চুরি কর, ডাকাতি কর, এর চেয়ে বেশি কিছুতেই হবে না। চুরি-ডাকাতি ক'রেও তো দেখেছে কাহারেরা। এই তো পরম—সেদিন পর্যন্ত ডাকাতি করেছে। কি হয়েছে? তাতেও এই। চুরি-ডাকাতি ক'রে মাল তুলে দাও সামালদার মহাশয়ের ঘরে, চুরির লক্ষ্মী তার ঘরে তুলে দিয়ে নিয়ে এস শুধু সেই লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। আর নিয়ে এস অধর্মের বোঝা। তার চেয়ে বহু ভাগ্যে চাষের পথ খুলে দিয়েছেন কর্তাঠাকুর, সেই পথে হাঁট, ধর্মকে মাথায় রাখ। সকাল সন্ধ্যে দেবতাকে প্রণাম ক'রে বল—এ জন্মে এই হ'ল, আসছে জন্মে যেন উঁচু কুলে জনম দিয়ো দয়াময় হরি হে!

গোপালীবালা এসে দাঁড়াল মাঠের আলের উপর। জলখাবার নিয়ে এসেছে। বনওয়ারী ঘোষেদের ভাগের জমির একটা কোণ 'চৌরস' অর্থাৎ সমান করছে, হাঁস-হাঁস শব্দে কোদাল চালাচ্ছে। সদ্‌গোপ মহাশয়দের গরুগুলি এই পথে নদীর ধারে চরতে যায়। জমিখানার একটি কোণকে খানিকটা যেন দুমড়ে দিয়ে গোপথটা চ'লে গিয়েছে। চারটি কোণ সমান একখানি

'দেখনসারি' অর্থাৎ দেখতে সুন্দর জমিতে পরিণত করবার জন্য বনওয়ারী প্রতি বৎসরই খানিকটা কেটে জমির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে থাকে অন্যের অগোচরে। জাঙলের সদ্‌গোপ মশায়দের গোচরে এলে তুমুল কাণ্ড করবে তারা। ঘোষ মশায়দের কানে উঠলেও তাঁরা বলবেন—কতবার তোমাকে বারণ করেছি বনওয়ারী। কি দরকার আমার খানিকটা জমি বাড়িয়ে নিয়ে? মেজ ঘোষ বলবে —আশ্চর্য! জমিটা যদি তোমার হ'ত তো বুঝতাম। এতে তোমার লাভ কি বল তো? বনওয়ারী এ সবের জবাব দিতে পারে না, মাথা চুলকোয়, কিন্তু চাষের সময় এলে খানিকটা বাড়িয়ে না নিয়েও তার মন পরিতুষ্ট হয় না।

গোপালীবালা বসল। বনওয়ারীর এখন কোন দিকে তাকাবার অবসর নাই। এই সময়টায় এদিকে কেউ নাই; কাহারেরাও না। এই উপযুক্ত সময়। কাহারেরা তার অনুগত বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বাস নাই। নিজেরা কিছু বলবে না, কিন্তু ফুস ফুস ক'রে সদ্‌গোপ মনিবের কানে তুলে দেবে। দশ-পনরো হাত লম্বা আলটার কোথাও আধ হাত, কোথাও তিন পোয়া জমি কেটে কুপিয়ে ছেঁটে জমিটার চষাখোঁড়া মাটির সঙ্গে মিলিয়ে বনওয়ারী উঠে মাথা ঝাড়লে। ঝাঁকড়া চুল থেকে জল ঝ'রে পড়ল—ঝ'রে পড়ল কালো বনওয়ারীর চুল থেকে মুক্তোবরণ টোপা টোপা জলের ফোঁটা। কোমরটা টাটিয়ে উঠেছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। বেঁকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চাইলে বনওয়ারী। জলখাবারের বেলা হয়েছে। আকাশে ঘন ঘোর মেঘ আজ। বেলা বুঝবার উপায় নাই। কাল রাত্রি থেকে জোর বর্ষা নেমেছে। বাঁশবাঁদির বাঁশবন বট পাকুড় শিরীষ গাছের মাথায় ছাইরঙের মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক যাচ্ছে, এক আসছে—কেউ ফুলছে, কেউ ফাঁপছে—ক্রমশ আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, কেউ বা ছুটে চ'লে যাচ্ছে সন-সন ক'রে কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে, কে জানে! কাহারপাড়ার চালে চালে বড় বড় গাছের গায়ে গায়ে বাঁশবনের ঘনপল্লবে কাহারবাড়ির উনোনের ধোঁয়া হাল্‌কা কুণ্ডলী পাকিয়ে জমে রয়েছে, যেন পেঁজা শিমুল-তুলোর রাশি জড়িয়ে দিয়েছে কেউ। মেঘে মেঘে এমন ঘোরালো হয়ে আছে চারিদিকে যে, বেলা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কেবল পেটে ক্ষিধে লেগেছে আর গরুবাছুরের ডাক শুনে মনে হচ্ছে যে, হাঁ, জলখাবারের বেলা হয়েছে। কিন্তু গোপালীবালাকে দেখে খুব খুশি হ'ল না বনওয়ারী। সুবাসী এল না কেন? সে এলে যে তাকে দু দণ্ড দেখতে পেত, দুটো হাসি-খুশির কথা হ'ত; পেট ভরার সঙ্গে মন-মেজাজ ভ'রে উঠত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী। সে কথা বলাই বা যায় কি ক'রে গোপালীবালাকে? তবে গোপালীবালা লোকটি বড় ভাল। সেই যে কুড়িটি টাকা নিয়ে বলেছিল, কোন আপত্তি অশান্তি করবে না—সে কথা সে রেখেছে, কোন আপত্তি অশান্তি করে না। ঘর দুয়ার গরু বাছুর হাঁস মুরগী নিয়ে আছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, গোবর কুড়িয়ে আনছে, ধান ভেনে চাল করছে। সুবাসী শুধু ঘর নিকোয়, বাসন মাজে, ভাত রাঁধে, আর নিজের তরিবৎ সাজসজ্জে নিয়েই আছে। চুল বাঁধছে, খুলছে, আবার বাঁধছে। রাত্রিবেলা দেখতে পায় না বনওয়ারী, ভোরবেলা যখন ওঠে, তখন নজরে পড়ে —সুবাসীর হাতে আলতার রঙের দাগ লেগে আছে, বনওয়ারীর নিজের অঙ্গেও তার দাগ লেগে থাকে প্রত্যহ। লজ্জার কথা। পাড়ায় ছেলেছোকরা মেয়েরা মুখ টিপে হাসে, রতন প্রহ্লাদ

গুপী দেখতে পেলে আর বাকি রাখে না। ঘোষবাড়ির বউঠাকুরুন্ সেদিন দেখে যে ঠাট্টাটা তাকে করেছেন, তাতে বড়ই লজ্জা পেয়েছে বনওয়ারী; তবু তো পাগল নাই। সে যে সেই কাড়ান লাগতেই গেরাম ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে, আর ফেরে নাই। সে থাকলে গান বাঁধত।

বনওয়ারী মাঠের ঘোলা জলেই হাত মুখ ধুয়ে আলের উপর বসল। গোপালী তার সামনে খুলে দিলে মস্ত একটা খোরায় রাশীকৃত মুড়ি, খানিকটা গুড়, দুটো লঙ্কা, দুটো পেঁয়াজ। একটা বড় ঘটি থেকে ঢেলে দিলে জল। ভিজিয়ে মোটা মোটা গ্রাসে খেতে লাগল বনওয়ারী।

—হ-হ-হ! অই-অই! বারণ করলে শোনে না! চলল দেখ, পরের ভুঁয়ের পানে, চলল দেখ। মেরে তোমার পস্তা উড়িয়ে দোব, পম্বা নড়িয়ে দোব।

বনওয়ারী শাসন করছিল গরু দুটোকে। সে দুটো জোয়ানেজোতা অবস্থাতেই অন্য একজনের বীজধানের জমির দিকে যাবার উদ্যোগ করছিল।

গোপালীবালা উঠল, গরু দুটোর জোয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বনওয়ারী কিছুটা মুড়ি ফেলে রেখেই উঠল। এই নিয়ম। ওই কটি খাবে পরিবার। গোপালীবালা বনওয়ারীর দিকে পিছন ফিরে ব'সে খেতে লাগল। বনওয়ারী বললে—মুনিববাড়ি হয়ে যেয়ো। কদিন যাই নাই আমি। পাট কাম থাকে তো ক'রে দিয়ে যাবা।

গোপালী ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই হবে।

গোপালী কেমন হয়ে গিয়েছে, সে কথা কয় না তেমন ভাল ক'রে। বনওয়ারী আবার বললে—একটা কথা বলছিলাম। যে টাকাটা দিয়েছি তাতে ধান কিনে আখ কেনে! যুদ্ধর বাজারে ধানের দর হু-হু ক'রে বাড়বে বলছে সবাই। তোমার ধান তুমিই 'আখবা', আমি তাতে হাত দোব না। লাভ যা হবে তুমিই নেবে।

গোপালী আবার ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই হবে।

বনওয়ারী রসিকতা ক'রে আবার বললে—তবে যদি অভাব অনটন পড়ে, লোব তোমার কাছে চেয়ে। তুমিই তো ঘরের গিন্নী, তুমিই তো নক্ষী আমার, তোমার দৌলতেই তো সব। আমি তো ভিখিরী, খাটি, খাই।

গোপালী এবার কথা বললে—তা লিয়ো।

বনওয়ারী বললে—ছুটকীকে ঘরে এনেছি আটপৌরের মেয়ে ব'লে, বুয়েচ?

গোপালী ঘাড় ঘুরিয়ে এবার মুখ মুচকে হেসে বললে—আর কালোশশীর বুনঝি, কালোশশীর মতন দেখতে শুনতে ব'লে!

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল। গোপালী এ কথা জানল কি ক'রে?

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে সে বললে—ইসব কি যা-তা বলছ তুমি?

—যা-তা লয়, ঠিক বলছি আমি। আমি শুনেছি।

—শুনেছ? কে—কে বললে?

গোপালী বনওয়ারীর দিকে চেয়ে ভয় পেলে খানিকটা, সে বললে—ই-উ-সি (এ-ও-সে) পাঁচজনায় বলে। আর কালোশশী আমাকে দেখে হাসত যে মুখ টিপে টিপে। আর মেয়েলোক

ঠিক বুঝতে পারে, বুয়েচ।

কালোশশী হাসত, নিশ্চয় হাসত, এবং গোপালী যত বোকা হোক সে হাসির মানে নিশ্চয় বুঝত। সে সম্বন্ধে কোন কথা ব'লে ফল নাই। পাঁচজনটা কে?

হঠাৎ কানে এসে পৌঁছুল একটা কান্নার শব্দ। মড়াকান্না। কে কাঁদছে? নয়ানের মা? চাষের সময় কাহারদের জোয়ান ছেলেরা চাষে খাটে, এ সময় জোয়ান ছেলের কথা মনে পড়ার কথা বটে। নিতাই মনে পড়বে। কিন্তু—কিন্তু কান্নাটা তো তেমন পুরোনো কান্না নয়। তেমন সুর ক'রে গানের মত বিনিয়ে বিনিয়ে তো কাঁদছে না!—ওরে আমার সোনা মানিক বাবাধন রে, কোথা গেলি রে? তোর জলভরা ভুঁই প'ড়ে বাবা, তু কোথা গেলি রে?—সে সব কথার তো কিছুই শোনা যাচ্ছে না? এ যে আছাড়িপিছাড়ি কান্না, যেন এখনই কারও কিছু হয়েছে। ওরে বাবা রে! ওরে মা রে! ও বাবা রে! ও ধন রে! বলে যেন বুক চাপড়ে কাঁদছে।

গোপালীবালা কান পেতে শুনে বললে—হেই মা!

—কার কি হ'ল বল দি-নি?

—মাথলাদের বাড়িতে গো।

—মাথলাদের বাড়িতে?

—হ্যাঁ, মাথলার বউয়ের গলা।

—কি হ'ল?

—তা তো জানি না।

—তুমি যাও দি-নি। একটা খবর দিয়ো।

মাথলার বাড়িতে কি হ'ল? মাথলার বাড়িতে তিনটি মানুষ—বউ, বেটা, নিজে। মাথলা চন্নপুরে। বউ কাঁদছে। তবে কি ছেলেটা—? কি সর্বনাশ! রোগ নাই, বালাই নাই, কি হ'ল হঠাৎ? কিছু হওয়ার মানে বাবাঠাকুরের রোষ। তবে কি করালীর ওপর বাবার রোষ গিয়ে পড়ল এইবার? মাথলা করালীর সঙ্গে চন্নপুরের কারখানায় গিয়েছে—কলির পাপপুরীতে। তবে কি—?

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে যেন কে ঢেঁকি কুটতে আরম্ভ ক'রে দিল। হে বাবা! হে বাবাঠাকুর।

ছুটতে ছুটতে এল একটি ছেলে। পেল্লাদের ছোটটা। মাথলার ছেলেকে কিসে কামড়েছে। মাঠে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল আলের গর্তের মধ্যে হাত পুরে। কিসে কামড়ে দিয়েছে। ছেলেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

বনওয়ারী ছুটল।

পাড়ার মাতব্বর গুণী লোক সে। সাপের কামড়ের ওষুধও দু-চারটে জানে সে। জানতে হয়। আর জানত পাগল। সে বড় ওস্তাদ।

বর্ষার সময় কাহারপাড়ায়—হাঁসুলী বাঁকে দু-চারটে এমন হয়। নিয়তি। 'সাপের লেখা বাঘের দেখা'। কপালের লিখনে না থাকলে সর্পাঘাত হয় না, আর বাঘ লিখন মানে না—দেখা হ'লেই খায়। তাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বাঘ সম্বন্ধে যত সাবধান হয়, সাপ সম্বন্ধে সাবধান

তত নয়। সাবধান হয় বইকি, কিন্তু ওটাকে তারা লিখন ব'লেই মানে। চিরকালই তো বর্ষার সময় কাঁকড়া ধরে কাহারেরা ; মধ্যে মাঝে এমন হয় একটা আধটা। কিন্তু সবাই তো মরে না। তা হ'লে হয় 'নিয়ৎ' অর্থাৎ নিয়তি, নয় দেবরোষ কি ব্রহ্মরোষ। রোজই তো সবাই আঁচল-ভর্তি কাঁকড়া নিয়ে ঘরে ফিরছে। লঙ্কা নুন দিয়ে চমৎকার হয় কাঁকড়ার ঝাল। শুধু ওই দিয়েই ভাত চ'লে যায়। হঠাৎ বনওয়ারী দাঁড়াল। একটা ওষুধ নজরে পড়েছে তার। ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে ব'লে সে শিকড় তুলতে বসল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ডাকলে ছেলেটাকে। আর একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে।—যা তো রে ঘোষ মাশায়দের বাড়ি—আমার মনিব বাড়ি। বড় ঘোষ মাশায়কে বলবি, মুরুব্বি পাঠালে সেই মিহিজামের ওষুধ—সপ্যাঘাতের ওষুধ, 'নিউনাইন-বোডের' ওষুধ যদি থাকে তো ছান।

ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর বড় ঘোষ মহাশয়ের হাতে বোর্ডের লোকেরা মিহিজামের সাপের ওষুধ দিয়েছে। এই কঠিন মাটির দেশে সাপের উপদ্রব বড় বেশী, তার মধ্যেও প্রকোপ বেশী হাঁসুলী বাঁকে। বাঁশবাঁদির ছায়ার মধ্যে শীতলতার আরামে এখানে আদিম কালের আবহাওয়া ভোরের ঘুমের মত এখনও বেঁচে রয়েছে। তার মধ্যে থাকতে ভালবাসে সাপ, বিছে, পোকা-মাকড়। মাছি মশাও এখানে ওই বাঁশপাতা-পচা ভাপানির মধ্যে ভন ভন করে। মানুষের দেহে সঞ্চারিত ক'রে দেয় নানা বিষ। কাহারপাড়ায় মানুষের দেহে যখন ছিল ভীমের মত বল, তখন সে সব বিষ তারা হজম করত। এখন শ্রাবণ মাস না আসতেই কাঁপন-লাগানো 'মালোয়ারী'তে পড়ে। তখন 'কুনিয়ানের' বড়িও পাওয়া যায় 'নিউনাইন-বোডের' মেম্বর ঘোষ মশায়ের কাছ থেকে। বনওয়ারী সুপারিশ ক'রে দেয়। কিন্তু এ বছর নাকি দুটোর একটাও আর দেবে না 'নিউনাইন-বোড'। যুদ্ধ লেগেছে। আক্রাগণ্ডার জন্য বোর্ডের খরচ চলাই দায় হয়েছে—সাপের ওষুধ, কুনিয়ানের বড়ি দেবে কোথা থেকে। তবু বনওয়ারী ছেলেটাকে পাঠালে— যদি পুরানো শিশিতে 'খানিক আদেক' পড়ে থাকে।

বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে কাছায় হাত দিলে। কাছাটা ঠিকই আছে। খুলে গেলে শিকড়ের ওষুধে কাজ হ'ত না। এ সব হ'ল ওস্তাদি তুক। আহা-হা! একটা তুক করতে ভুল হয়ে গেল! যে ছোঁড়াটা খবর নিয়ে এসেছিল, ওকে মেরে তাড়িয়ে দিতে হ'ত। যে খবর দিতে আসে, সে যদি ছুটে পালায়, তবে রোগীর বিষও ঘরে নামতে আরম্ভ করে। এঃ, বড়ই ভুল হয়ে গিয়েছে! কিন্তু কি সাপ? বাবাঠাকুরের রোষ হ'লে নিশ্চয় সেই বাহনের দাঁতের দংশন। হবেই যে! পানার ছেলেটাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এবার। না, মঙ্গল নাই। মঙ্গল নাই। মঙ্গল নাই।

চার

মঙ্গল নাই, মঙ্গল নাই।—ঘাড় নেড়ে বললে বনওয়ারী। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কাহারপাড়া ঘাড় নাড়লে, ঠিক বনওয়ারীর মত ক'রে। মঙ্গল নাই আর।

মাখলার ছেলেটা মরল। মুখে গ্যাঁজলা ভেঙে কালো ছেলেটাও কেমন কালচে হয়ে গিয়েছে;

হাতের তালু কালচে, ঠোঁট কলচে, নখগুলো পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। বাবাঠাকুরের বাহনের জাতের দংশন নয়, এ সম্ভবত খরিস অর্থাৎ গোখুর বা কালকেউটের দংশন। কালকেউটে হওয়াই সম্ভব।

রতনের ছোট ছেলে টেবা খুব 'টাটোয়ার' অর্থাৎ চতুর বুদ্ধিমান, দিগম্বর ছেলেটা নিজের ঘুনসী টানতে টানতে বললে—হেঁ গো! কালোপারা নিস্কেলে এই এতু বড়ি। সে দুই হাত মেলে দেখালে মধ্যম আকারের, এবং নিস্কেলে অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণ তার রঙ।

রতন বুক চাপড়ে কাঁদল। নাতিটির জন্য তার গভীর স্নেহ ছিল। ছেলে অর্থাৎ মাথলা তার সঙ্গে পৃথক হ'লেও ছেলেটা তার কাছেই প্রায় থাকত।

টেবা বললে—যেই গত্তের ভেতরে হাত ভরাল্ছে, অমনি কামুড়ে ধরেছে। ভাইপো বললে—কাকা রে, মোটা কাঁকুড়ি। খুব কামড়াল্ছে, তা কামড়াক; আমিও ছাড়ব না শালোকে। ব'লে বেশ জুৎ ক'রে ধরে টেনে বার ক'রে নিয়ে এল তো—সাপ। হাতে ঝরঝর ক'রে অক্ত পড়ছে। ছেড়ে দিলে ছাড়ে না শালা। তা'পরেতে জলে প'ড়ে শুঁষিয়ে চ'লে যেল সোঁ ক'রে।

না হোক বাবাঠাকুরের বাহনের জাত। তবু সর্পাঘাত। ওই মাথলার ছেলেকে সর্পাঘাত—সাবধান ক'রে দিয়ে গেল। প্রথমে পানার ছেলে, তাবপর মাথলার ছেলে। যার চোখ আছে সে দেখুক, যার জ্ঞান আছে সে বুঝুক। যার কান আছে সে শুনুক, বাবাঠাকুর বলছেন—সাবধান! সাবধান!

নইলে সাপের ভয় হাঁসুলী বাঁকে বড় ভয় নয়। এখানে সাপ প্রচুর। মনসার কথায় আছে 'লাগে-লরে' অর্থাৎ নাগে-নরে একত্রে বাস করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকে সম্ভবপর।

আদাড়ে সাপ, পাঁদাড়ে সাপ, ঘরে সাপ, মাঠে সাপ, গাছের ডালে সাপ—সাপ নাই কোথা, সাপ নাই কবে? সুচাঁদ বলে—বাঁসুলী বাঁকের পিতিপুরুষ ব'লে গিয়েছে, উনি সব্বত্র আছেন—মা-বসুমতীকে ধরে অয়েছেন মাথায় ক'রে।

সুচাঁদ পিসী বলে—ছেরকাল, ছেরকাল আছেন ওরা। মা-মনসার পল্লব ছড়িয়ে আছেন পিথিমীময়। বনে বাদাড়ে, ঘরে পাঁদাড়ে, ঘাটে মাঠে ঝোপে ঝাড়ে, জলে স্থলে সব্বত্ত। লাগ আর লর—ইনি ওকে এড়িয়ে চলেন, উনি ওকে এড়িয়ে চলেন। মাঝে মাঝে ছামু-ছামু প'ড়ে এ বলে—গেলাম, ও বলে—গেলাম। সেই সময় 'ধয্য' ধ'রো বাবা। হাতে তালি দিয়ে ব'লো—চ'লে যা, চ'লে যা। আর পেনাম ক'রো। ওঁরা সামাম্ভিতে অনিষ্ট করেন না; মাথায় পা, লেজে পা দিলে তবে ওঁরা চন্দ সুয্যিকে সাক্ষী এখে ছোবল মারবেন। আর মারেন কালের হুকুমে—বাবার হুকুমে, লইলে ওঁরা মন্দ লন। মানুষের উপকার করেন ইঁদুর ধ'রে। বাস্তু হয়ে কল্যেণ করেন ভিটের।

খুব মিথ্যে কথা বলে না পিসী। নইলে মানুষ যত সাপ মারে, সাপে কি তত মানুষ মারে? মারে না। এই সেদিন নয়ানের মা ঘাস কাটতে গিয়ে ঘাসের সঙ্গে একটা কালো সাপের বাচ্ছার মুণ্ডু কেটে নিয়েছে। একেই বলে—'নেকন'। ঘাসের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, নয়ানের মা ঘাসের সঙ্গে মুঠো ক'রে ঠিক ধরেছে মাথাটি। চারিদিকে ঘাস, মধ্যখানে ছিল মাথাটি—তাই কামড়াতে

পারে নাই। তারপর ঘ্যাস ক'রে কাস্তে দিয়ে কেটে ঝুড়িতে ফেলেছে। তখন বেরিয়ে পড়ে কাটা মুখটা; তখনও সেটা কামড়াবার জন্য হাঁ করছিল; ওদিকে মুণ্ডু-কাটা ধড়টা এঁকেবেঁকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল। হতভাগী ব'লেই সে বেঁচেছে, নইলে মরলে যে খালাস পেত; কিন্তু তা হবে কেন?

বনওয়ারীর নিজের বাড়িতে তো একটা বুড়ো খরিস প্রায় কুটুম্বিতে পাতিয়েছেন। প্রায়ই দেখা দেন। আসেন যান, ইঁদুর ধরেন, ব্যাঙ খান, পেট ফুলিয়ে মাঝ উঠানে পড়ে থাকেন। বনওয়ারী তাঁকে মারে না, মারবেও না। আবার নিজেও একটু সতর্ক হয়ে থাকে, গোপালী এবং সুবাসীকেও সতর্ক ক'রে দিয়েছে, হাতে তালি না দিয়ে যেন ঘরে না ঢোকে, বাইরে না বের হয়। হাতে তালি দাও তুমি, উনি স'রে যাবেন, যদি 'এগে' থাকেন তবে গুড়িয়ে সাড়া দেবেন, বলবেন—সাবোধান, আমি এগেছি। কাহারদের এ শিক্ষা আছে। ধৈর্য তাদের অপরিসীম। বনওয়ারীর ছেলেবেলায়, পরম আটপৌরের বাবার ধৈর্যের গল্প এ চাকলায় সবাই জানে। বর্ষার সময়, কোপাইয়ে হয়েছিল বড় বান, চারিদিক 'জলাম্পয়' অর্থাৎ জলময়; পরমের বাপ শুয়ে ছিল ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল কিসের ঠাণ্ডা পরশে। কিন্তু নড়ল না সে। প্রথমটা বুঝে নিলে—কার পরশের ঠাণ্ডা এটা। যাঁরা ম'রে গিয়ে 'বা-বাওড়' অর্থাৎ ভূত হয়েছেন, তাঁদের কেউ ঠাণ্ডা হাত দিয়ে তাকে ডাকছে, না 'লতা-টতা' কিছু? রাত্রে সাপের নাম করতে নাই, বলতে হয়—লতা। ততক্ষণে ঠাণ্ডা হিম একগাছা মোটা রশি তার কোমরের উপরে পেটের উপর দিয়ে কাঁধের কাছ বরাবর চলেছে। কাঠ হয়ে প'ড়ে রইল পরমের বাপ। আস্তে আস্তে তিনি চ'লে গেলেন পরমের বাপকে পার হয়ে। একবার পরমের বাপের একটা নিশ্বাস জোরে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন; তারপর যেই বুঝলেন, "পরমের বাপ তাঁর অনিষ্ট করতে চাইছে না—তখন আবার চলে গেলেন সরসর শব্দে পার হয়ে। বনওয়ারী নিজেই একবার বাড়ির দোরে 'মাঝলা' অর্থাৎ মাঝারি আকারের খরিসের ঠিক মাথার উপর পা দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল পায়ে। সে কী পাকের 'কষণ' অর্থাৎ পেষণ! তবু বনওয়ারী মাথার উপর পায়ের চাপ আলগা করে নাই। আলগা করলেই কামড়াত। শেষে কাস্তে দিয়ে সাপটাকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সাপকে ভয় নাই, ভয় বাবাঠাকুরের রোষকে আর কালের আদেশকে। ' ও দুটো মাথায় নিয়ে যখন সাপ বার হয়, তখন তাকে কেউ আটকাতে পারে না।

বাবার রোষ এবার ওঁরা যেন পেয়েছেন মনে হচ্ছে। ঢালাও হুকুম দিলেন নাকি বাবা? একটা অমঙ্গলের আঁচ যেন সকলের মনেই লেগেছে।

কাহারপাড়ায় একটা আতঙ্ক দেখা দিল। সাপের ভয় কাহারেরা করে না। কিন্তু এ যে বাবার কোপ ব'লে মনে হচ্ছে। বাবার কোপ কোন সময়ের বাঁধ মানে না। বলছ, বছর ঘুরেছে? কিন্তু তোমার বছর আর বাবার বছর তো এক নয়।

প্রহ্লাদ রতন গুপী বললে—বনওয়ারী, কৃপায় তোমাকেই করতে হবে। তোমার মুনিব

নিউনাইন বোডের হাকিম ; তুমি ধ'রে পেড়ে এক লম্প ক'রে কেরাচিনির ব্যবস্থা কর। আত-বিরেতে—মাথার গোড়ায় নিবানো অইল, জেসলাই অইল। সন্দ হ'লেই ফস ক'রে জ্বেলে ফেললাম।

যুদ্ধের জন্য কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না। বাবুদের পর্যন্ত টিকিট হয়েছে। যে যেমন ট্যাক্স দেয় 'নিউনিয়ন-বোর্ডে'—সে তেমন 'কেরাচিনি' পায়। কাহারপাড়ায় 'নিউনাইন-বোর্ডে'র কাজও নাই কর্মও নাই, রাস্তাঘাটও নাই, কাহারেরাও নগদ ট্যাক্স দেয় না, একদিন গতরে খেটে বেগার ট্যাক্স দেয় অন্য 'গেরামের' পথ ঘাট মেরামত ক'রে। তাদের জন্য টিকিটও নাই। লুকিয়ে চুরিয়ে তেল পাওয়া যায়, কিন্তু সে দাম পাঁচগুণ। চোরাই বিক্রি। করালী বলে—ওর নাম হ'ল 'বেলাক মারকাটি'। কে জানে কি নাম। ও নাম তাদের জেনেও কাজ নাই, ও দাম দিয়ে তেল কিনবার তাদের ক্ষমতাও নাই। করালী দু-একজনকে তেল দিচ্ছে। যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে, 'ধরমকে' বেচেছে, কুলকর্মকে ছেড়েছে, সে তেল পাচ্ছে। তেল পায়, চিনি পায়, আটা পায়, ঘি পায়, কাপড় পায়—পায় জলের দামে—বাজারে চালের দর ষোল টাকা উঠেছে—করালী পায় পাঁচ টাকায়। পায়, পেতে দাও। আর কেউ পাবার জন্য হাত পেতো না, মনে মনে আশও ক'রো না। সাবোধান! সাবোধান! তবে বনওয়ারীর কর্তব্য বনওয়ারী করবে। যাবে সে বড় ঘোষের কাছে। কাহারপাড়াকে বাঁচাতে হবে, বাবাঠাকুরের বাহনের রোষ থেকে বাঁচাতে হবে—মনে মনে তিন সন্ধ্যে তাঁকে ডাক, মাথার গোড়ায় 'লম্পও' রাখ। তার উপর পড়েছে বর্ষা—আরম্ভ হবে 'মালোয়ারী', 'কুনিয়ান' চাই, সাবু চাই, চিনি চাই। সাবু-চিনিও বাজারে পাওয়া যায় না। পেলেও ওই আগুনের দর ; যুদ্ধুর বাজার যে! এ বাজারে 'নিউনাইন-বোডের' হাকিমের হুকুমে কাজ হবে।

বিকেলবেলায় মাঠের কাজ ফেলেই সে গেল ঘোষ মশায়ের কাছে। সন্ধ্যের পর, কি রাত্রে মদ খেয়ে এসব কথা ঠিক গুছিয়ে বলা হয় না।

বড়কর্তা শুনে একটু হাসলেন—বললেন—কেরোসিন! পেলে আমি নিই।

বনওয়ারী কাতরকণ্ঠে বললে—আজ্ঞে, তা হ'লে আমরা কি করব? সপ্যভয়, আর কিছু নয়। সাধারণ সপ্যভয় হ'লেও হ'ত আজ্ঞে, এ হ'ল দেবকোপ!

—দেবকোপ?—বড়কর্তা একটু হেসেই প্রশ্ন করলেন। কাহারকুলের কৌতুকজনক কুসংস্কারের কথা শুনে আনন্দ আছে।

—আজ্ঞে বড়বাবু, বাবাঠাকুর দণ্ড দেবেন ব'লে মনে হচ্ছে। করালী মারলে বাবার বাহনকে, পানার কারণে খুঁতো পাঁঠা বলি হ'ল ওঁর কাছে, করালী বাবার শিমুলগাছে চ'ড়ে নিদ্রে-ভঙ্গ করল বাবার—

খুব সহৃদয় এবং গভীর উপলব্ধির ভান ক'রে বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়লেন—হু, তা বটে, কথাটা তুমি বাজে বল নি বনওয়ারীচরণ—

বনওয়ারীর চোখে জল এল তাঁর সহানুভূতিতে। চোখ মুছে বললে—বড়বাবু, চরম ধ্যানত হয়ে গেল বাবার বিল্ববিক্ষটি প'ড়ে গিয়ে। অ্যানেক কষ্টে তুললাম, গোড়া বাঁধিয়ে খাড়াও

একেছি, কিন্তু বাবা তো ইশারা দিলেন যে, বিমুখ হয়েছি আমি। চললাম আমি তোমাদের থান থেকে।

বনওয়ারীর সঙ্গে কৌতুক বড়কর্তার বেশিক্ষণ ভাল লাগার কথা নয়, তার উপর বনওয়ারী চোখ মুছতে শুরু করেছে, এর পর যদি হাউহাউ ক'রে কাঁদে তখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠবে! সময়ে সাবধান হয়ে তিনি গম্ভীর হলেন, বললেন—হ্যাঁ। তা একটু সাবধানে থাকবে তোমরা।

আবার এক ঝলক রসিকতা ঠেলে যেন বেরিয়ে এল, বললেন—এবার আর মাঠ থেকে ধানপান চুরি ক'রো-ট'রো না যেন। বুঝেছ?

—আজ্ঞে না। এবার বাবাঠাকুরের থানে হলপ করাব সব্বাইকে।

—ভাল। খুব ভাল। এখন বাড়ি যাও।

—আজ্ঞে, কেরাচিনি?

—কেরাচিনি তো নাই বনওয়ারী। গভীর দরদের সঙ্গে বড়কর্তা বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেরা প'ড়তে তেল পাচ্ছে না। এবার বুঝলে, চন্নপুরের বড়বাবু মাথা ঠুকে দু টিন কেরোসিন পেলেন না, শেষে বহুকষ্টে এক টিন। তা, বুঝেছ, কোথায় পাব আমি বল?

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। তা হ'লে আর কি হবে? যুদ্ধের ঢেউ এমন ভাবে কখনও বোধও হয় হাঁসুলী বাঁকে আছাড় খেয়ে পড়ে নাই।

বড়কর্তা বললেন—আর আলো জ্বেলেই বা কি করবে বনওয়ারী? বলছ বাবাঠাকুরের কোপ। তাই, হ্যাঁ, যা শুনলাম তাতে তা-ই বটে। তা হ'লে আলোই বল আর অন্ধকারই বল, সে কোপ কি এড়ানো যায়? একটু আধ্যাত্মিক হাসি হাসলেন বড়কর্তা, কপালে হাত দিয়ে বললেন—সব এই, বনওয়ারী, সব এই। লোহার বাসর-ঘরে লখাইকে কালনাগিনী দংশন করেছিল। দেবকোপ, ও কিছুতেই আটকায় না।

ঠিক কথা বলেছেন বড়কর্তা। বনওয়ারী ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই উঠে এল। পথে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে। তবু আলো—একটু আলো না হ'লে কি ভাবে চলবে? দেবকোপ বটে। কিন্তু মরণের আগে একটুখানি জল মুখে দেওয়া, একবার শেষ নজরের দেখা—আলো না হ'লে সেটুকু কি ক'রে হবে?

সে বাবাঠাকুরের থানে এসে দাঁড়াল।—হে বাবাঠাকুর! বহুক্ষণ সে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার সে তন্ময়তা হঠাৎ এক সময়ে একটা লালচে আভায় ঢেকে গেল। চোখে লাগল লাল ছটা। মাঠ ঘাট আকাশ সব লাল হয়ে উঠেছে—হুই দূরে দেখা যাচ্ছে কোপাইয়ের বাঁকের জলে লালচে ছটা ঢেউয়ের মাথায় স্রোতের টানে যেন নাচছে।

প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, একে বলে—'ঝিকিমিকি বেলা'। মেঘ কেটে গিয়ে লাল আলোয় ভ'রে গেল আকাশ। 'চাকি' অর্থাৎ অস্তোন্মুখ সূর্য এখনও ডোবে নাই; পাটে ব'সে লালবরণ রূপ নিয়ে হিলহিল ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরছে। আকাশের মেঘে লাল রঙ ধরেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বনওয়ারী একটু চিন্তিত হ'ল। কাল আবার জল নামবে। সকালবেলায় পশ্চিম দিকে 'কাঁড়' অর্থাৎ রামধনু উঠেছিল, সন্ধ্যাবেলা রক্তসন্ধ্যা। জল নির্ঘাত নামবে। এর উপরে

জল হ'লে কিন্তু চাষের ক্ষতি হবে।

পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ তুলে সে ভাবছিল। পিছন থেকে কে তাকে ডাকলে।—ব্যান্‌্যোমামা!

কে ডাকে? 'মামা' ব'লে কে ডাকে? গাঁয়ের কন্যের কোন ছেলে তো নাই গেরামে! সে ভ্রূভঙ্গি ক'রে মুখ ফেরাল। হ্যাঁ; সেই করালীই বটে! গাঁয়ের কন্যে বসনের কন্যে পাখীর সম্বন্ধ ধ'রে হারামজাদা বনওয়ারীকে মামা বলে আজকাল। ডাক শোনবামাত্র এই সন্দেহই তার হয়েছিল। সে কোন উত্তর দিলে না, গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

করালী হেঁকে বললে—পাড়ায় গিয়েছিলাম আমি, ব'লে এলাম সকলকে। আজকালের মধ্যে খুব জোর বিষ্টি হবে। পবল বিষ্টি! চন্নপুরে তারে খবর এসেছে।

বনওয়ারীর হাসি পেল। তারে খবর এসেছে বৃষ্টি নামবে! চন্নপুর থেকে করালীচরণ বিষ্টি বলছেন আজকাল! বল, বাবাধন বল। তারে খবর এসেছে! বনওয়ারীর তারের খবরে প্রয়োজন নাই বাবা কাহারকুলের পেল্লাদ। বনওয়ারীর কাছে বাবাঠাকুর আকাশময় খবর ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঝড়, বাদল—এর খবর কাহারেরা পিতিপুরুষ থেকে পেয়ে আসছে আকাশের কাছ থেকে, পিঁপড়ের কাছ থেকে, কাক-পক্ষীর কাছ থেকে, রামধনুর কাছ থেকে, বাতাসের গতিক থেকে; তুমি কাহারকুলের জাত হারিয়ে মেলেচ্ছ হয়েছে; তুমি চন্নপুরে টেলিগেরাপের খুঁটিতে কান লাগিয়ে শোন গিয়ে এসব খবর।

করালী প্রশ্ন করলে—শুনছ?

বনওয়ারী তাচ্ছিল্যভরে বললে—সে আমি জানি হে, সে আমি জানি।

করালী ঠোঁটটা ওল্টালে, ভুরু কোঁচকালে, তারপর ফিরল। কিন্তু আবার ফিরে বললে—মাথলার ছেলেটা সাপে খেয়ে মরল। যদি কেউ কোলে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যেতো।

বনওয়ারী কি বলবে এ বেহায়াকে! মাথলার ছেলেটা মরল! আরে, মরল তো তোরই পাপে, তোরই শয়তানির কারণে।

করালী বললে—এবার যদি এমন হয় তো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো মিলিটারি হাসপাতালে। সাপের বিষের ইনজেশন আছে।

এবার বিরক্তিভরে বনওয়ারী বললে—ওরে, তু যা যেখানে যেছিস যা, বুঝেছিস? যা, আপন পথে সোজা চ'লে যা।

—যাব, যাব! কেরাসিনের কি হ'ল সেই কথাটা শুনে যাই। কি বললে তোমার বড়কর্তা? চোরের একশেষ উটি।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল বনওয়ারী—করালী!

করালী গ্রাহ্য করলে না। হনহন ক'রে চ'লে গেল। যাবার সময় বললে—পাও নাই তা আমি জানি।

জল নামল। বনওয়ারীর পাওয়া খবরও সত্যি, তারের খবরও সত্যি। মিলে গেল।

সকালবেলা থেকেই নামল—রিমি-ঝিমি রিমি-ঝিমি। মেঘ যেন নেমে এল বাবার শিমূলগাছের মাথার গায়ে। মেঘের পর মেঘ, হু-হু ক'রে চ'লে যাচ্ছে। পাতলা কালচে কুণ্ডলী-পাকানো মেঘ। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ত্রিভুবন।

বনওয়ারী হালের মুঠো চেপে ধ'রে বলদ দুটোকে থামালে। ব্যাপার তো ভাল নয়। এ যেন প্রলয়ের মেঘ। দূরে হাল বইছিল প্রহ্লাদ, সে তাকে হাঁকল।

প্রহ্লাদ থমকে দাঁড়িয়েছে। সে বললে—হুঁ।

—নামবে নাকি? পেল্লাদ?

প্রহ্লাদ একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। নামবার লক্ষণ যেন মিলে যাচ্ছে। নামবে হাতী। আকাশ থেকে হাতী নেমে থাকে। দু-দশ বছর অন্তর নেমে থাকেন দেবরাজের হাতী। কাল সন্ধ্যাতে যেন তার লক্ষণ ছিল বনওয়ারীর বুঝতে পারা উচিত ছিল। সন্ধ্যেকালের সেই লাল ছটামাখা আকাশভরা মেঘের মধ্যে সিঁদুরের মত লাল গোল মেঘখানি বার বার ঠেলা দিয়ে উঠছিল। সে তো মেঘ নয়। দেবহস্তীর সিঁদুর-মাখানো গোল মাথা সেটি। দেবরাজও তবে এবার ক্ষেপলেন। ক্ষেপবেনই তো। বাবাঠাকুরের কোপ হয়েছে, উনপঞ্চাশ সালে পবন মেতেছেন, দেবরাজার কি না ক্ষেপে, না মেতে উপায় আছে? হাতী নামবে। নামবে কি? নামল। ওই—ওই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, সায়েবডাঙার মাঠের ওপারে বরমপালির খোয়াইয়ের পারে আকাশ থেকে নেমেছে—দেবহস্তীর প্রবল শুঁড়। মেঘ থেকে দশটা তালবৃক্ষের মত—মোটা গোল একটা থাম সোঁ-সোঁ ক'রে নামছে—মাটির দিকে। থাম নয়, হাতী! হাতীর শুঁড়! মাঠের মধ্যে রব উঠল—পালা—পালা—পালা।

—গরু খুলে দে, হাল থেকে গরু খুলে দে। গোবধ হবে।

খোলা পেতেই ভয়ার্ত গরুগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে লেজ তুলে ছুটল, ডাকছে—হাম্বা—হাম্বা।

গাই ডাকছে বাছুরকে। বাছুর ডাকছে গাইকে। ছাগলগুলো চেঁচাচ্ছে। ভেড়াগুলো নীরবে ছুটছে। হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক শব্দ ক'রে জল থেকে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকছে। চকিত হয়ে ভয়ার্ত পাখীগুলো একসঙ্গে কলরব ক'রে ডাকছে। গাছের শাখায় হনুমানগুলো ডাল আঁকড়ে ধ'রে ভয়ে কাঁপছে।

পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখে বনওয়ারীর বুকের ভিতরটাও গুর-গুর করে উঠল। চারিদিক জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লম্বা কালো প্রলয়স্তম্ভের মত বিরাট এবং গোল—দেবহস্তীর সে শুঁড় ঘুরপাক খেতে খেতে এক ভীষণ সোঁ-সোঁ-সোঁ ডাক ছেড়ে চ'লে আসছে:—পালাও পালাও। ওর মধ্যে পড়লে রক্ষে নাই। আছড়ে পাড়বে মাটিতে, দম বন্ধ ক'রে মেরে মাটিকে কাদার মত ঘেঁটে তার মধ্যে আধ-পোঁতা ক'রে দিয়ে যাবে। মাঠসুদ্ধ লোক ছুটে পালিয়ে গেল উত্তর মুখে; বনওয়ারীও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল জাঙলের আমবনের আশ্রয়ে।

দেবলোকের হাতী ইন্দ্ররাজার বাহন। জল দেন ইন্দ্ররাজা। হাতীতে চ'ড়ে মহারাজ মেঘের সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ান, তার বাহন মেঘের সাত সমুদ্র থেকে শুঁড়ে জল টেনে নিয়ে ছিটিয়ে দেয় চারিধারে—ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো। মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজা হাতের 'ডণ্ড'—তার নাম

'বজ্জডণ্ড' অর্থাৎ বজ্রদণ্ড, সেই 'ডণ্ড' দিয়ে মেঘের সমুদ্রে আঘাত করেন। তা থেকে ঝলকে ওঠে আগুনের লকলকানি। কড়-কড়-কড়-কড় শব্দে বাজ ডেকে ওঠে। কখনও কখনও পাপী-তাপীর উপর এসে পড়ে সেই বাজ। পাপী শুধু মানুষই নয়, গাছপালা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—সবার মধ্যেই পাপী আছে। কখনও কখনও ইন্দ্ররাজার ভাই পবনদেবও তাঁর সঙ্গে বার হন—এই ছিল নিয়ম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজার হাতীটা ক্ষেপে উঠে পিলখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘের সাত সমুদ্রে। তখন মেঘ কালো হয়ে তোলপাড় করতে থাকে। মনে হয়, দিন বুঝি রাত হয়ে গেল। তখন সেই ক্ষ্যাপা হাতী নামিয়ে দেয় তার লম্বা শুঁড় মাটি পর্যন্ত, দোলাতে দোলাতে চলতে থাকে। যেদিকে যায়, সেদিকে এমন জল দিয়ে যায় যে, মাঠ-ঘাট ভেসে সে এক প্রলয় কাণ্ড বেধে যায়। ধুয়ে মুছে ধান উপড়ে আল ভেঙে তাণ্ডব ক'রে তোলে। মাইতো ঘোষ বলেন—জলস্তম্ভ। হে বাবাঠাকুর, হে কালরুদ্র, মাইতো ঘোষের অপরাধ নিয়ো না।

হঠাৎ প্রহ্লাদ তার হাত ধ'রে টানলে। সে প্রহ্লাদের দিকে তাকাতেই প্রহ্লাদ বললে—কি হ'ল কি তোমার? আসছে যে!

এসে পড়েছে সেই প্রলয় জলস্তম্ভ। গোঁ-গোঁ গর্জন ক'রে আসছে। সমস্ত লোক মাটিতে শুয়ে প্রণিপাত জানাচ্ছে। বনওয়ারীর খেয়াল হ'ল, সে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম জানালে—নমো নমো নমো, হে দেবতার বাহন! তুমি কি এসেছ প্রভু বাবাঠাকুরের বাহনের মৃত্যুর শোধ নিতে? আগুন জ্বালিয়ে তাকে মেরেছে—তুমি জল ঢেলে তার শোধ নিতে এলে? সে ধীরে ধীরে শুধু মাথাটি তুললে।

হাতীটা আসছিল পশ্চিম দিক থেকে পূব মুখে। আকাশ আর মাটিতে একাকার ক'রে শুঁড় দুলিয়ে দেবতার ক্ষ্যাপা হাতী মাঠে ভুঁইয়ে জল ঢেলে ঠেসে মেরে চ'লে গেল জাঙলের কোল ঘেঁষে—বাবাঠাকুরের 'থান'টিকে বাঁয়ে রেখে, সোজা পূবমুখে হুই চ'লে গেল নদীর ধারে। ওঃ, মহাশব্দে ধ্বসিয়ে দিলে খানিকটা পাড়! ওই ওপারে গিয়ে ঘুরছে—ঘুরছে। ওই গিয়ে পড়ল মহিষডহরীর ডোমপাড়ার ধারে। ডোমপাড়ার শেষ প্রান্তে রামকালী ডোমের ওই ঘর। ক্ষ্যাপা হাতীর ক্ষেপামির কথা কে বলতে পারে। রামকালীর অপরাধের কথাই বা কে জানে? রামকালী ডোমের ঘরের উপর পড়ল আক্রোশ। চাপালে সেই ঘরের উপর তার 'পেল্লায়' শুঁড়। হুড়-হুড় ক'রে ঢাললে জল, দুড়দুড় ক'রে ভেঙে পড়ল ঘরখানা, ঘরের লাগোয়া ছিল একটা তালের গাছ, গাছটার গোড়া খুলে উপড়ে ফেলে দিলে সেটাকে। তার পর ওই চলল, ওই। কি হ'ল? থামল? হ্যাঁ হাতীকে থামতে হয়েছে, শুঁড় গুটাচ্ছে। বোধ হয় ক্ষ্যাপা হাতীর সন্ধানে বেরিয়ে 'ইন্দরাজা' ধরেছেন তার নাগাল; মাথায় মেরেছেন 'ডাঙশ'। ওই যে—কড় কড় ক'রে বাজ ডেকে উঠল। হাতী শুঁড় গুটিয়ে ওই চ'লে গেল স্বস্থানে।

যাক। বনওয়ারী এর মধ্যে একটা ভরসা পেলে। বাঁশবাদির কোন অনিষ্ট হয় নি। বাবাঠাকুর আছেন। যান নি। 'যাব' বললেই যেতে দেবে কে? কাহারপাড়া বিল্ববৃক্ষটিকে যেমন আঁকড়ে ধ'রে টেনে তুলেছে, তেমনি ভাবে আঁকড়ে ধরবে। বনওয়ারী কেঁদে ফেললে।

—হে বাবা, তুমিই ভরসা কাহারপাড়ার, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যদিই নামে আবার ক্ষ্যাপা হাতী,

তবে রক্ষে ক'রো তুমি। আঙুল দেখিয়ে ব'লো—ইধার নেহি, উধার যাও। ব'লে দিয়ো, দেখিয়ে দিয়ো—ওই চন্নপুরের কারখানাকে। আর ওই আকাশে উড়ে যাচ্ছে—দিন নাই, রাত নাই, বর্ষাবাদল নাই, ঝড়ঝাপটা নাই, ওই উড়ো-জাহাজগুলোকে। মাথার উপর দিয়ে গোঁ-গোঁ ক'রে আসছে যাচ্ছে, ওইগুলোকে শুঁড়ে ধরে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলতে হুকুম দিয়ো।

ওঃ, হ-হ-হ-হ! কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে মেঘের ভেতরে ভেতরে যাচ্ছে—বুঝবার উপায় নাই; কেবল গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

আঃ, ছি-ছি-ছি! কাহারপাড়ায় আবার 'ল্যাই' অর্থাৎ কলহ লাগালে কারা? তার তীব্রস্বর এরোপ্লেনের গোঙানিকেও ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁছল বনওয়ারীর। মেঘের দিকে চেয়ে উড়ো-জাহাজটিকে দেখা আর তার হ'ল না। পাড়ায় ছুটতে হ'ল।

পাড়াতেও তার যাওয়া হল না। বড় ঘোষের ডাক নিয়ে চাকরের সঙ্গে দেখা মাঝপথে। —এক্ষুনি। বড়কর্তা রাগে কাঁপছে।

সত্যিই রাগে কাঁপছেন বড়কর্তা। বড়কর্তার রাগই স্বভাব। ওই অমনি কেঁপেই থাকেন। সামান্য কারণেই ক্ষেপে যান।

চীৎকার ক'রে উঠলেন বড়কর্তা।—আমার উপরে নালিশ!

—নালিশ! আপনার উপরে? আমি?

—হ্যাঁ। কিছু জান না তুমি? করালীকে দিয়ে নালিশ করাও নি?

—আজ্ঞে? আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি কিছু জানি না। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে মাথায়। অঙ্গ খ'সে যাবে।

করালী চন্নপুরে ইউনিয়ন-বোর্ডের আপিসে নালিশ করেছে, দরখাস্ত করেছে—কাহারদের কেরোসিন দেওয়া হয় না কেন? যদি হয়, তবে সে তেল নেয় কে? তার খোঁজ করা হোক। এবং তাদের বরাদ্দ তেল দেওয়ার হুকুমনামা এই খোদ আপিস থেকে দেওয়া হোক।

বনওয়ারী মাথায় হাত দিলে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে উঠল। বললে—এর পিতি-বিধান আমি করব। চরণে হাত দিয়ে ব'লে গেলাম আপনাকে।

ফিরল সে পাড়ায়। ঝগড়া তখনও চলছে—তুমুল ঝগড়া।

আজ ঝগড়া বেধেছে সুচাঁদ এবং নয়ানের মায়ের মধ্যে। সর্বনাশ!

সুচাঁদ ধেই-ধেই ক'রে লাফিয়ে নাচছে, আর মোটা গলায় চীৎকার করছে—বেটার মাথা খেয়েছিস, এইবার চোখের মাথা খাবি। ভাতে হাত দিতে ছাইয়ের গাদায় হাত দিবি। ভূত হয় নাই বলছিস? দেখবি লো, দেখবি। সে ওই মাগীর ঘাড় ভাঙবে, ওই মিনসের ঘাড় ভাঙবে, তা'পরে তোর ঘাড়ে চাপবে। তু ঘাড় নাড়বি, চুল দোলাবি, আর বলবি—আমি কালোশশী। কথার শেষে সুচাঁদ সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দুই হাত নাড়া দেয় বার কয়েক।

ওদিকে নয়ানের মা তীব্র স্বরে ব'লে যাচ্ছে—সুচাঁদের বলার সঙ্গেই ব'লে যাচ্ছে—হে বাবাঠাকুর, তুমি ধ্বংস করো বাবা, যে তোমার বাহনকে মারলে, যে পরের ঘর ভাঙলে, গাঁয়ের বিধান না মেনে যে উঁচু ঘর বাঁধলে, তাকে ধ্বংস ক'রো—তাকে ধ্বংস ক'রো। যেমন ক'রে

উড়ো-জাহাজ পেড়ে ফেললে আজ, তেমনি ক'রে পেড়ে ফেলো।

চমকে উঠল বনওয়ারী। উড়ো-জাহাজ পেড়ে ফেললে কি?

নসুবালা সংবাদ এনেছে—সাঁইথিয়ার ময়ূরাক্ষীর ধারে একখানা উড়োজাহাজ আজ মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। নীচে নামছিল, হাতীর শুঁড়ে জড়িয়ে তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলছে। করালী গেল সাঁইথিয়া সেই 'ম্যান'দের সঙ্গে। বসনকে খবর দিয়েই সে বিলাপ করতে করতে ফিরেছে চন্নপুর।

জয় বাবাঠাকুর! জয় দেবরাজার হস্তী! জয় ধর্মের! বনওয়ারীর অন্তর অপরূপ শান্তিতে ভ'রে উঠল। বুকে বল পেলে।

সদর্পেই সে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হ'ল তাকে। ওদিকেও একটা ঝগড়া বেধেছে যেন। গোপালীবালার গলা মনে হচ্ছে। আর একটা সুবাসীর। পানাও নিজের ঘরে ব'সে গাল দিচ্ছে। কি হ'ল?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ঝগড়ার কারণ যত জটিল, তত বিচিত্র। আজ দুটো ঝগড়া একসঙ্গে পাকিয়েছে। একদিকে নসু খবর এনেছে উড়ো-জাহাজ ভেঙেছে। নয়ানের মা সেই শুনে উল্লাসে নাচছে। ওদিকে আজ বিকালে অর্থাৎ বনওয়ারী যখন মুনিব-বাড়িতে ছিল, তখন আর-এক কাণ্ড ঘ'টে গিয়েছে রমণ আটপৌরের ঘরে; রমণের স্ত্রী—সুবাসীর মাসী, কালোশশীর বোন—হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান অবশ্য হয়েছে, কিন্তু এখন সে ঘোরের মধ্যেই প'ড়ে রয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয় নাই লোকের। এলোচুলে লঙ্কা নুন পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত খেতে বসেছিল সে আজই ভরা দুপুরবেলায়, সেই সময়—। আজ শনিবার অমাবস্যে। ক্ষণের মুখে এই লোভনীয় খাদ্য খেতে বসায় এঁটো হাতের সুযোগে এবং এলোচুলের অপবাদে তাকে পেয়েছে কোন অশান্ত প্রেতলোকবাসী। এবং সে প্রেতলোকবাসী যে কে, বাবাঠাকুরের কৃপায়, হাঁসুলী বাঁকের উপকথার শিক্ষায় তাও কাহারদের জানতে বাকি নাই, সে আর কেউ নয়, সে হ'ল কালোশশীর প্রেতাত্মা। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার, 'অঙে'র খেলার সাধ মেটে নাই তার, অঙের খেলায় লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়ে নিজের স্পর্শে 'বাম্ভন'-তুল্য ছত্রি জাতের ভূপসিং মহাশয়ের জাতিপাত করার পাপ নিয়ে সে মরেছে, সে ওই দশা পাবে বইকি!

পানা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—সে আজও পুত্রশোক ভুলতে পারে নাই। সে যোগ দিচ্ছে—বাবার থানের ধূপ-পিদীম অপবিত্ত করে দিয়েছে। হবে না! আমি সাজা পেয়েছি, আরও কত জনকে পেতে হবে।

ওদিকে মৃত কালোশশীর সম্বন্ধে এই সকল তথ্যের প্রতিবাদ করছে তার বোনঝি সুবাসী। সে ঘরে এসে কাঁদতে বসেছিল। কান্নার মধ্যে সে মাসীর প্রেতাত্মাকে ডেকে বলেছিল—তুমি যদি তাই হয়ে থাক, তবে লাও—লাও, শত্তুদিকে লাও।

এই কান্নার প্রতিবাদ করেছিল বনওয়ারীর বড়বউ। বলেছিল—ভরাভর্তি বেলায় এমন ক'রে কেঁদো না তুমি।

এই প্রতিবাদে সুবাসী কেঁদে বলেছিল মৃত মাসীকে উদ্দেশ ক'রে—ওগো, কত ভালবাসতে

গো আমাকে তুমি, আমার রূপকার কর। লাও—লাও, আমার শত্তুকে লাও, তোমার শত্তুকে লাও। আমার কাঁটা তুলে দাও।

'কাঁটা' মানে সতীন-কাঁটা। সতীন মানেও শত্রু। সতীনের চেয়ে বড় শত্রু কে? এই লেগেছে ঝগড়া গোপালীবালা এবং সুবাসীর মধ্যে। পাড়ার সকলেই গিয়েছে দেখতে। এর মধ্যে সুবাসীর সঙ্গে পাখীর ভাব আছে ব'লে এবং কালোশশী বনওয়ারীর প্রিয়তমা ব'লে নয়ানের মা গোপালীর পক্ষ নিয়েছে। ঠিক সেই কারণেই সুচাঁদ নিয়েছে সুবাসীর পক্ষ। করালী এবং পাখীর উপর আর সুচাঁদের রাগ নাই। করালী তাকে পাকি মদ খাইয়েছে, কাপড় দিয়েছে, পায়ে ধরেছে, কোলে ক'রে নেচেছে। নয়ানের মা সুবাসীকে বলেছে—মরলে যদি ভূত হয়, আর ভূত যদি কথা শুনত, তবে স্বামী-পুত্তু শ্বশুর-শাশুড়ী একঘর ভূত থাকত আমার। আর যার ঘাড় ভাঙতে বলতাম, তারই ঘাড় ভাঙত। মরণ!

তার প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে করেছে সুচাঁদ—মরলে ভূত হয় না? তোর ঘাড়ে যখন চাপবে তখন বুঝবি।

এই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সুবাসী প্রতিবাদ করতে গিয়েছে তার মাসী কালোশশীর প্রেতত্ব বা পেত্নীত্ব প্রাপ্তির। কিন্তু তারই পক্ষ নিয়ে সুচাঁদ তীব্র প্রতিবাদে প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছে—কালোশশী নিশ্চয় পেত্নী হয়েছে এবং সুবাসীর শত্রুদের সে নিপাত করবে।

বনওয়ারীর নিজের বাড়ি অবশ্য এখন স্তব্ধ। গোপালীবালা, সুবাসী—দু'জনেই চুপচাপ শুয়ে আছে আপন আপন ঘরের দাওয়ায়। ভাত পর্যন্ত হয় নাই। বনওয়ারীর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল নিজের স্ত্রীদের উপর, সুবাসীর উপরেই রাগটা বেশী হ'ল। আজ সে জানতে পারলে, সুবাসীর সঙ্গে পাখীর নাকি ভাব আছে; তার উপর কালোশশীর প্রেতাত্মাকে ডেকেছে। একটা লাঠি টেনে নিয়ে তার চুলের মুঠো ধ'রে সে তাকে ঠেঙাতে আরম্ভ করলে। তাকে ঠেঙিয়ে সে ঠেঙালে গোপালীবালাকে। তাকেও দিলে অল্প কয়েক ঘা। তারপর সে লাঠি হাতে এসে দাঁড়াল সুচাঁদ এবং নয়ানের মায়ের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে সুচাঁদ পিছু হঠতে লাগল। কয়েক পা পিছু হঠে সে হনহন ক'রে চলে গেল মাঠের দিকে। সেখানে কোথাও বসে সে গাল দেবে, পরিশেষে সে কাঁদবে মৃত বাপকে স্মরণ ক'রে, কারণ বনওয়ারী ভাইপো হয়ে তাকে লাঠি দেখিয়েছে। নয়ানের মা কিন্তু পালাল না। সে বিড়ালীর মত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পানার উদ্দেশ নাই। সে ঘরে খিল দিয়েছে। তার বউ বললে—জ্বর হয়েছে, শুয়েছে।

—দাদা! ঠিক এই সময় কে পিছন থেকে ডাকল।

—কে?

—কে?

—আমি বসন।

হ্যাঁ, বসন। বসনের কোন অপরাধ নাই; তবুও করালী-পাখীর কারণে তাকে দেখে বনওয়ারী প্রসন্ন হতে পারলে না। গম্ভীর মুখে বনওয়ারী বললে—কি?

একখানা কাগজ তার হাতে দিয়ে বসন বললে—তোমার কাড।

—কাড ?

হঁ্যা। কেরাচিনি চিনি—এই সবের ছাড়। নেওনাইন-বোড থেকে দিয়েছে, নস্থ দিয়ে গেল আমাকে। সেকেটারি করালীকে দিয়েছিল। জাঙলের হেদো মণ্ডলের ছেলে আইছিল, সে সবারই দেখে সবাইকে দিয়েছে, এইটি তোমার।

কার্ডখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে বনওয়ারী। তারপর সে বার হ'ল পাড়ায়। নিউনাইন-বোডে এমন কথা বলতে করালীকে কোন্ কাহার বলেছে ?

কেউ বলে নাই।

সকলে চুপ ক'রে রইল।

—ফেলে দাও কাড।

প্রহ্লাদ বললে—ব্যানো ভাই!

—না।

—না লয়।—একটু শক্ত হয়েই সে বললে—সে ভাই অল্যায় হবে। ভেবে দেখ তুমি। কাড দিয়েছে নিউনাইন-বোড। আমরা বেগার দি। আমাদের কাড কেন ফেলে দোব ?

—হুঁ। কিন্তু যদি কেউ শুধায়, ঘোষ মশায় তোমাদের কেরাচিনি মেরে দিত কি না ?

—তা কেন বলব ? সে বলব কেন ?

—করালীকেও বলতে তোমরা বল নাই ?

—না, কেউ বলে নাই। মুখ থাকতে নাকে ভাত কেউ খায় নাকি ? বললে তোমাকে বলতাম আমরা।

—বাস্। বাস্। প্রহ্লাদ বনওয়ারীর ছেঁড়া কার্ডখানি এনে জুড়তে বসল।

বনওয়ারী বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে মনে মনে বাবাঠাকুরকে ডাকতে লাগল।

ঝম ঝম ক'রে জল নেমেছে আকাশ ভেঙে। আবার হাতী নামবে না কি ?

কে ডাকছে এর মধ্যে! কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! সুবাসী দরজা খুলতে গেল, কিন্তু ধমক দিয়ে বনওয়ারী বললে—অ্যা-ই!

কে জানে কে! মানুষ কি না তাই বা কে জানে! কালোশশী নয়, কে বলবে! আজ আবার কালোশশী সাড়া দিয়েছে।

—কে—কে তুমি ?

—কাঙাল, কাঙাল আমি। অমনকাকার বউ মারা গেল, খবর দিতে এসেছি।

মারলে তবে কালোশশী! বনওয়ারী বাবার নাম ক'রে বেরিয়ে এল।

পাঁচ

জয় বাবাঠাকুর! শাঙন পার হ'ল। চাষ ভাল। ভালয় ভালয় কেটে যাচ্ছে, বিপদ আসছে, কাটছে। এর চেয়ে আর ভাল কি হবে? ভাদ্র এল। ভাদুরে রোদে চাষী বিরাগী হয়। প্রচণ্ড রোদে জম-জমাট ধান-ক্ষেতের মধ্যে সারা অঙ্গ ডুবিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেতের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আগাছা নিড়িয়ে বেড়াতে হয়; ধানের চারার করকরে পাতার ঘর্ষণে সারা দেহ মেজে যায়, ফুলে ওঠে, ধানচারার ভিতরে ওই রোদের ভাপসানিতে শরীরে গলগল ক'রে ঘাম ঝরে। তখন মনে হয়, বাড়ি-ঘর কাজ-কর্ম ছেড়ে বিবাগী হয়ে চ'লে যায় কোন দিকে!

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় 'পিথিমীর' সব জায়গার মতই আষাঢ় যায়, শাঙন যায়, ভাদ্র আসে। আষাঢ় শাঙন যে কেমন ক'রে কোন্ দিক দিয়ে যায় তা কাহারেরা জানতে পারে না। কাদায় জলে হাঁসুলী বাঁকের ক্ষেতে বুক পেড়ে প'ড়ে থাকে, মাথার উপরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে, গুরু-গুরু শব্দে মেঘ ডাকে। শাঙন শেষ হ'লে খেয়াল হয়, ক্ষেতে রোয়ার কাজ শেষ হ'ল। রোয়া শেষ হ'লে বাবাঠাকুরকে প্রণাম করে, আর আয়োজন করে বাবাঠাকুর-তলায় ইঁদপুজোর। ইঁদ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষায় জল দিলেন, তাঁর স্বর্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর এক অংশ পাঠিয়ে দিলেন 'ভোমণ্ডলে' অর্থাৎ ভূমণ্ডলে। ইঁদপুজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, খেটেখুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়, মাতব্বরি করেন জাঙলের জোতদার মণ্ডল মহাশয়েরা। জমিদার দেন পাঁঠা, বাতাসা, মণ্ডা, মুড়কি, দক্ষিণে দু আনা; মণ্ডল মহাশয়েরা পাঁঠার 'চরণ' অর্থাৎ ঠ্যাঙ বৃত্তি পান, বাতাসা-মণ্ডার প্রসাদ পান, কাহারেরা শেষ পর্যন্ত ব'সে থাকে, ইঁদরাজার পুজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিসের থানটিতে বেদী বাঁধে, জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পুজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর পুজোতে কাহারপাড়ায় 'অঙখেলার' চব্বিশ প্রহর হয়ে থাকে, সে মাতনের হিসেবনিকেশ নাই। ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরী ক'রে লতায় পাতায় ফুলে সাজিয়ে, আকণ্ঠ মদ খেয়ে মেয়েপুরুষে মিলে গান করো আর নাচো। রাত্রে ঘুমোতে নাই, নাচতে হয়, গাইতে হয়,—জাগরণ হ'ল বিধি। পিতিপুরুষের কাল থেকে দেবতার হুকুম 'অঙে'র গান—'অঙে'র খেলা যার যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, কানে শুনলে দেখতে যাবে না। ওই দিনের সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলবে।

হারামজাদা করালী এবার জাঁক ক'রে চন্ননপুর থেকে এসে নিজের উঠানে কাহারপাড়ার পুরানো ভাঁজোর সঙ্গে আলাদা ক'রে ভাঁজো পাতলে। হেঁকে বললে—ঘর ভাঙলে থানাতে নালিশ করেছিলাম, ভাঁজো ভাঙলে মিলিটারি কোর্টে নালিশ করব। দুজনা লালমুখো সাহেব—সেই ওর 'ম্যান'রা এল করালীর সঙ্গে। ফটোক তুললে। তারাও ঠ্যাং ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচলে। তারা চ'লে গেল। চোলাই মদও খেয়ে গেল বোধ হয়। সায়েবে ঘেন্না ধ'রে গেল বনওয়ারীর। করালী সাহেব দেখালে বটে!

ওরে বেটা, বনওয়ারী ওসব দেখে ভয় পায় না। সাহেব! থুঃ!

বনওয়ারীও হুকুম দিলে—লাগাও জোর ধুমধাম ভাঁজোতে। এবার মাঠে প্রচুর ধান হয়েছে।

কোন রকমে আশ্বিনে একটা মোট বর্ষণ হ'লেই আর ভাবনা নাই। যুদ্ধের বাজারে ধানের দর চড়ছে, বিশেষ ক'রে শাঙন মাসে। চন্নপুরে, দেশ-দেশান্তরে স্বদেশীবাবুরা 'অ্যাল-লাইন' তোলাতুলির পর থেকে বাজার আরও লাফিয়ে চড়ছে। তা চড়ুক, তাতে কাহারেরা ভয় পায় না। নুন ভাত খাওয়া অভ্যেস আছে। তাই বা খাবে কেন? মাঠে মাছ হয়েছে এখন, মাছ আর ভাত, শাক-পাতেরও অভাব নাই। মাঠের জল শুকালে পুকুরে বিলে মা-কোপাইয়ের গর্ভে আছে শামুক-গুগলি কাছিম-ঝিনুক। ছেঁড়া কাপড় পরাও অভ্যেস আছে, সুতরাং যুদ্ধের আক্রা-গণ্ডায় হাঁসুলী বাঁকের ভাবনা নাই। বরং ধান এবার বেশি হবে—কাহারেরা ভাগেও বেশি পাবে, দর চড়লে লাভ হবে তাদের। সুতরাং করালীর সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগে যাও বুক ঠুকে। আগে পাল্লা হ'ত আটপৌরেপাড়ার সঙ্গে, এখন হবে করালীর সঙ্গে। বাবাঠাকুর বোধ হয় সদয়। হাসছেন বেশী, রোষ করলে সে ভুরুতোলা রোষ। ভাদরের মেঘ—রোদের খেলার মত। এইবার কাটবে মেঘ। কালারুদ্দুর গাজনে এবারও বনওয়ারী হয়েছিল ভক্ত, লোহার কাঁটা-মারা চড়ক-পাটায় চেপেছিল, বাবার মাথায় আগুনের ফুল চড়িয়েছিল; সে-সব কি বৃথাই যাবে?

বাবা পুজো হাসিমুখেই নিয়েছেন। তারই ফলে কাহারপাড়ার এবার সময় ভাল।

মোট কথা, ওদিক দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে বনওয়ারী। হাতী নেমে বাঁশবাঁদির ক্ষতি করে নাই, উড়ো-জাহাজ ভেঙে পড়েছে। এই দুটি কারণে ওদিক দিয়ে তার ভয় কেটেছে। তবে আছে একটা ভয়—সেই কালোশশীর ভয়। ও ভয়ও ভুলেছিল বনওয়ারী, কিন্তু রমণের বউকে মেরে যে আবার ভয় ধরালে নতুন ক'রে। তাও হাতে আছে মা-কালী বাবা 'কালারুদ্দু' কর্তাঠাকুরের মাদুলী। ভয় কাটার সঙ্গে এবারের এই মাঠভরা ধানের ভরসা তাকে সাহস দিয়েছে অনেক। এ কথাও তার মনে উঁকিঝুঁকি মারছে যে, মন্দ তার এখন হতেই পারে না; এইটাই তার চরম ভালর সময়, কপাল তার ফিরছে। সাহেবডাঙার 'আচোট' মাটির জমিতে এবার সবুজ ধান দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যাকে বলে—'চৌকস' ধান, তাই হয়েছে। ঘোষেদের ভাগের জমিতেও ধান খুব ভাল। এরই মধ্যে একবার ধানের পাতা কাটাতে হয়েছে। ধানের গোছা হয়েছে মহিষের পায়ের গোছার মত। বনওয়ারীকে এবার খামার বাড়াতে হবে। খামার বাড়বে, একটা মরাইও করবে শক্ত ক'রে। আর চাই 'পুত্তু'সন্তান, ওইটি হলেই তার বাসনা পূর্ণ হয়। বাঁচতে হবে অনেক দিন। ছেলেকে ডাগর ক'রে, মাতব্বরির গদ্দিতে বসিয়ে তবে বনওয়ারী নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারবে। এদিক দিয়ে ভয় তার করালীকে। এই যুদ্ধের বাজারে কলে 'ওজগার' করছে দু হাতে, আর গায়েও ক্ষমতা আছে, বুকেও আছে দুর্দান্ত সাহস। সে যদি ছেলেকে ছোট রেখে মরে, তবে করালী জোর ক'রে চেপে বসবে মজলিসের মাতব্বরির পাথরে। হয়তো মেরেও ফেলতে পারে কলে-কৌশলে। ওই কারখানার কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে দেবে কলের মুখে ঠেলে। তাকে অনেক দিন বাঁচতে হবে। কাহারপাড়ার মঙ্গল করতে হবে, তাদের দুঃখে-কষ্টে বুক দিয়ে পড়তে হবে, পর্বে-পার্বণে প্রচুর আনন্দ দিতে হবে। প্রচুর আনন্দ।

বড়লোক মহাশয়েরা, জাঙলের সদ্‌গোপেরা, বাউরী হাড়ি ডোম এদের বলেন—ছোটলোকের

জাত। সদাশয়েরা বলেন—গরিব দুঃখী, দুঃখ মেহনত করে খায়। দুটো কথাই সত্যি। গরিব দুঃখীরা আনন্দ ভালবাসে—আনন্দ পেলেই ছুটে যায়। আবার ছোট মনেরও পরিচয় দেয়, চিরকাল যেখানে আনন্দ ক'রে আসছে, সেখানের চেয়ে আজ অন্যখানে নতুন ক'রে বেশি আনন্দের ব্যবস্থা হ'লে—চিরকালের স্থান ছেড়ে সেইখানে ছুটবে। করালী আজ তাই করতে চাইছে। রোজকারের গরমে ভাঁজো পেতেছে নিজের 'আঙনেতে' অর্থাৎ আঙিনায়। আলো আনবে ভাড়া ক'রে; বেহালাদার আনবে, 'হারমনি' আনবে; চন্দনপুরের যত জাত-খোয়ানো মেয়েদের আনবে, তারা নাচবে নসুবালার সঙ্গে। সিধু আসবে, পাখী তো আসবেই। আরও কতজন আসবে।

আসুক। বনওয়ারীও আলো ভাড়া করেছে। খুব ভাল ঢোল-সানাই-কাঁসি ভাড়া করেছে। হুকুম দিয়েছে—বেবাক 'যোবতী' অর্থাৎ যুবতী কাহার-কন্যে-বউকে নাচতে হবে। সবুজ লাল হলদে রঙ এনে দিয়েছে, কাপড় ছুপিয়ে রঙিয়ে নাও। সুবাসীও নাচবে। সুবাসীকে একখানা রঙিন শাড়িই কিনে দিয়েছে সে। গোপালীবালাও নাচবে। তাকেও কাপড় কিনে দিয়েছে সে। ছোকরাদের হুকুম দিয়েছে—তুলে আন বেবাক পুকুরের পদ্ম আর শালুক ফুল। সাজাও ভাঁজোর বেদী। ঐ সমস্তের ভার দিয়েছে পাগল কাহারকে। সেই চাষের সময় পালিয়েছিল, হঠাৎ কাল—ভাঁজোর আগের দিন সে ঠিক এসেছে। ভর্তি-দুপুরে মাথায় আট-দশটা ডাঁটিসুদ্ধ শালুক ফুল জড়িয়ে মাঝখানে একটা কাঁচা কাশফুল গুঁজে বুড়ো-ছোকরা গান গাইতে গাইতে হাঁসুলী বাঁকে ফিরেছে—

কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখি হে!
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীর ই বাঁকে—
বাঁশবনে কাশবনে লুকালছ কোন্ ফাঁকে!
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
তোমার আ-ঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে!

পাগল-সাঙাতের বলিহারি আছে।

কুড়ুতাং-কুড়ুতাং-তাক্-তাক্-তাক্-তাক্ শব্দে ভাঁজো পরবের ঢোল বেজে উঠল। মাঠের কাজ নাই আজ, মনিববাড়ি নাই আজ, কাহারেরা কেউ আজ 'আজা'রও প্রজা নয়, মহাজনেরও খাতক নয়; কোপাইয়ের পুলের উপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময়সঙ্কেতের দিকেও কেউ কান দেবে না; উঠানে সূর্যঠাকুরের রোদ কোন্ সীমানা পার হচ্ছে, সেদিকেও কেউ তাকাবে না। দুধোল গাই-গরুর বাছুরগুলিকে আগেকার কালে এই দিনটিকে বাঁধাই হ'ত না; ওরা পেট ভ'রে দুধ খেত। আজকাল ভোররাত্রে দুধ দুইয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওদের ছেড়ে দাও হাঁসুলী বাঁকের ধারে —চরভূমিতে। ইচ্ছামত চ'রে খাক। তাতে দু-চারখানা জমির ধান খেয়ে নেয়—নিতে দাও। হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ 'রসিয়ে' উঠেছে ভাদুরে গরমে—ঢাকনি খুলতেই বাতাসে গন্ধ বেরিয়েছে। কাহারপাড়ার মাথার উপরে ওই গন্ধে কাকের দল কলরব করছে, মাটির দিকে চেয়ে দেখ—পচা

ভাতের কুটির জন্য পিঁপড়েরা সার ধরেছে, কুকুরগুলো ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাগল ঢোলের বাজনার বোলকে নিজের মনের মত ক'রে পাল্‌টে নিয়ে বলছে—'কাজকাম্' 'পাটকাম্' থাক্ থাক্ থাক্ থাক্! নাচ্ না কেনে মেয়েরা, নাচ্ না কেনে গো! চল্, কোপাইয়ের ঘাট থেকে ঘট ভ'রে আনি, নে 'পাঁচ আঁকুড়ি'র সরা মাথায় নে। 'পাঁচ আঁকুড়ি' অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুর।

বনওয়ারী নিজে মদ ছাঁকতে বসেছে। 'ম্যাতা' অর্থাৎ পচুই-ছাঁকা পচা ভাতগুলো ফেলে দিচ্ছে কুকুরগুলোকে; ডাব বেঁধে কতক দিচ্ছে ছেলেদের হাতে—দিয়ে আয় গরুগুলোর মুখের কাছে, বলদ গাই বাছুর—সবাইকে দিবি। থাক, আজকের দিনে সবাই খাবে। ভেড়া হাঁস মুরগী—ওদিকেও দে।

এইবার আয় তোরা, ব'সে যা। লে ঢকাঢক, লে ঢকাঢক। মেয়েরা, লে গো, তোদের ভাগ তোরা লিয়ে যা। লে ঢকাঢক। বায়েনরা লাও ভাই। বাজাও, বেশ মধুর ক'রে বাজাও! সানাইদার, দেখব তোমার এলেম—করালী হারামজাদা বেহালা হারমনি এনেছে, কানা ক'রে দিতে হবে। লে ঢকাঢক।

"ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আল্‌তার অঙের ছোপ মাটিতে দিব,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমার ধর লো ধরা"

এইটুকু গান হ'ল—মন্তরের মত। সব-দলকেই গাইতে হবে এটুকু। ওদিকে নসুবালার দল বার হয়েছে। করালী নিজে বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে। কাপড়-চোপড়ের ঘটা খুব ওদের। সব 'লতুন' কাপড়। চন্নপুরের পাপের পয়সা যে, হবে না কেন? কিন্তু তবু রঙের ছটা কাহার-পাড়ার মেয়েদের কাপড়েই বেশি। নতুন-ক'রে রঙ-করা পুরানো কাপড়গুলি রঙের গাঢ়তায় ঝকমক করছে।

কোপাইয়ের ঘাটে একদফা গালাগালি হয়ে গেল দুই দলে। গানে গানে গালাগালি। চিরকাল হয়ে আসছিল কাহারপাড়ায়-আটপৌরেপাড়ায়। এবার হচ্ছে কাহারপাড়ার আর করালীর দলের মধ্যে। এক দিকে পাগল, অন্য দিকে নসুবালা। এই ভাঁজোর দিনে নসু পাগলের কথায় ক্ষ্যাপে না, ভয় করে না। সমান মাতনে মাতে। মুখে মুখে গান বেঁধে গায় গালাগালি—যে কোন গালাগালি। তবে তার মধ্যে শাপশাপান্ত নাই। 'অঙে'র গাল—'অসে'র গাল।

তারপর ঘাট থেকে ফিরে আরম্ভ হ'ল আপন আপন এলাকায় নাচ আর গান। প্রথমেই নিয়ম—চিরকালের নিয়ম—বয়সওয়ালা মেয়েরা নাচতে আরম্ভ করবে। চিরকাল এ নাচ আরম্ভ করে সুচাঁদ। এবার সুচাঁদ গিয়েছে করালীর দলে। এখানে কে নাচবে?

পাগল ছুটে গিয়ে ধ'রে নিয়ে এল গোপালীবালাকে। গোপালীবালার নেশা ধরেছে, তবুও লাজুক মানুষ, বলছে—না না। তার উপর পাগলের তাকে সাঙা করতে চাওয়ার কথা মনে করে সে বেশী লজ্জা পাচ্ছে। মুখে 'অঙ' ধরেছে লজ্জাতে। সকলে খুব হেসে উঠল। —বলিহারি

ভাই—বলিহারি ভাই!

বনওয়ারীর মন কিন্তু উদাস হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ছে কালোশশীকে। তবু সে হাসছে, না হাসলে চলবে কেন? হঠাৎ তার নজরে পড়ল ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে নয়ানের মা। বড় মায়া হ'ল তার উপর। আহা, সব হারিয়ে নিরানন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! মনে প'ড়ে গেল সব কথা। সে এগিয়ে গিয়ে ধরলে তার হাত। বললে—এস, তুমি আমি আগে নাচব।

'ভাঁজোর পরব' সুখের দিন। মদের নেশায় মাথা ছমছম করছে, আকাশে মেঘ কেটেছে, নীলবরণ আকাশের তলায় ঝাঁকবন্দী সাদা দুধবরণ বক উড়ে চলেছে, নীলের বাঁকে 'গোরাকান্দার' মাঠে পদ্ম-শালুক ফুটেছে, পদ্মপাতার উপর জলের টোপা টলমল ক'রে রোদের ছটায় ঝলছে যেন মানিক-মুক্তোর মত; শিউলি ফুল ফুটে টুপ টাপ ক'রে ঝরে পড়ছে। স্থলপদ্ম গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে 'কাহারপাড়া আলো ক'রে', কোপাইয়ের বুকের বান নেমে গিয়েছে, ঘোলা জল সাদা হয়ে এসেছে; তবু নয়ানের মায়ের সুখ কোথায়? আউশধানে থোড় হয়েছে, দশ মাসের পোয়াতীর মত থমথম করছে আউশের মাঠ; পুকুরে পুকুরে শোলমাছেরা ঝাঁকবন্দী বাচ্চা নিয়ে বেড়াচ্ছে; ডালে ডালে পাখীরা কচি বাচ্চাদের ছাড়ান দিচ্ছে—যাও, তোমরা উড়ে বেড়িয়ে চ'রে খাও গিয়ে; জাঙলে চন্নপুরে মা-দুর্গার কাঠামোয় মাটি পড়েছে; কাল গিয়েছে জিতেষষ্ঠী। আজ কি নয়ানের মা নয়ানকে ভুলতে পারে? নয়ান যেদিন করালীর হাতে মার খেয়ে হাঁপাচ্ছিল, সেদিনও তার মনে পড়েছিল পুরানো কথা। সেদিনও যে বনওয়ারীর হাত ধ'রে টেনেছিল বাঁশবনের আঁধার রাজ্যের দিকে। কিন্তু আর না—আর না। সে বনওয়ারীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে চ'লে গেল নিজের ঘরের দিকে! তারপরে প্রথমে সে ডাকলে নয়ানকে।—ফিরে আয়, সবাই নাচছে, তুই নাই শুধু। ফিরে আয়। তারপর আরম্ভ করলে সে গোটা কাহারপাড়াকে অভিসম্পাত দিতে।

বনওয়ারী শুম্ভিত হয়ে গেল। এ কি হ'ল!

পাগল তার হাত ধ'রে টেনে বললে—কিছু নয়। ওদিকে কান দিস না। নাচ্। সে টেনে নিয়ে এল সুবাসীকে। মদের নেশায় সুবাসী টলমল করছে পদ্মপাতায় জলের টোপার মত। চোখে যেন আধখানা চাঁদ নেমেছে; গায়ে যেন জ্বরের মতন তাপ।

বাঁশের বাঁশি কে বাজায় রে? কে?

বনওয়ারী দেখলে, করালী কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের ভাঁজোতলায়, তার আর সুবাসীর নাচ দেখে হাসছে, গানের সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছে। ইয়া টেরি, পোশাকের বাহার কত, গায়ে খোসবয় উঠছে!

বনওয়ারী বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু পাগল ধরলে তাকে।—খবরদার! তু কত বড় মানুষ মনে আকিস। পিতিপুরুষের বাক্যি মনে কর্। আজ অঙের দিন—চোখ থাকতে দেখো না, কান থাকতে শুনো না, পরাণ যা চায় তা অমান্যি ক'রো না। লে লে, বাজা বাঁশি, করালী, বাজা বাঁশি।

করালী সুবাসীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পাগল তাকে দিলে খোঁচা।—বাজা না কেনে? দেখিস কি? সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। পানা হাসছে সবচেয়ে বেশি। কাঁসার বাসনের

আওয়াজের মত তার খনখনে আওয়াজের হাসি। সুবাসীও হেসে উঠল খিলখিল ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাচের চুড়িগুলোও ঝুনঝুন ক'রে বাজল।

বনওয়ারীর সারা অঙ্গ নিসপিস করছে। গায়ে তাপ বেরুচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই, পিতিপুরুষের বারণ। তবে সেও যাবে নাকি করালীর ভাঁজোতলায়? পাখীও তো নাচছে সেখানে! ছি-ছি-ছি! হে বাবাঠাকুর! হে ধরম রাখার মালিক, তুমি রক্ষা কর।

যার সঙ্গে ভাব নাই তার সঙ্গে কাহারেরা হাসে না, কিন্তু করালী চন্ননপুরের কারখানায় গিয়ে অন্য রকম হয়েছে। চন্ননপুরের বাবুরা ভাব না থাকলেও হাসেন। মুখুজ্জেবাবুরা এবং চাটুজ্জেবাবুরা চিরকাল মামলা-মকদ্দমা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক'রে আসছেন, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে বুঝবার জো নেই। এ বাবুরা ও বাবুর বাড়ি যাচ্ছেন সকালে, বিকালে ও বাবুরা এ বাবুদের বাড়ি আসছেন, হাসিখুশি রঙ-তামাশা গালগল্প গান-বাজনা করছেন। দেখে অবাক হয়ে যায় বনওয়ারী। করালীও দেখা যাচ্ছে, তাই শিখেছে। বনওয়ারীকে বললে ও—একবার আমার ভাঁজোর থানে এস মামা। পাকি মদ—

বনওয়ারী রূঢ়ভাবে মধ্যপথেই বললে—না।

করালী হাসতে হাসতেই চ'লে গেল। সে হাসি দেখে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল বনওয়ারীর। হারামজাদা চ'লে গেল কত রঙ্গ ক'রে, শিস দিতে দিতে, সারা ভাঁজোতলায় একটা সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে। বাবুদের মত 'আতর খোসবাই' মেখেছে!

পানা ছড়া কেটে উঠল।—"ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে 'রবখ্যাযে'—অজাতে পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে!"

বনওয়ারী রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে পানার দিকে, পানা আজ কিন্তু ভয় পেলে না। আসরটাই আজ ভয় পাবার আসর নয়, ভাঁজো সুন্দরীর আসর, 'অঙের' আসর, আনন্দের আসর, আজ ছোট-বড় নাই; তার উপর পেটে মদ পড়েছে প্রচুর। পা টলছে, মন চনচন করেছে। সাহস বেড়েছে। পানা বনওয়ারীর রূঢ়দৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রেই বললে—আমার দিকে তাকালে কি হবে বল? জাত আর থাকবে না, অজাত ঢুকেছে ঘরে। বানের জল ঘরে ঢোকালে—ঘরের জলও তার সাথে মিলে বেরিয়ে যায়। দেখ গা, করালীর আসরে বেবাক ছেলেছোকরারা জুটে যেয়েছে।

বনওয়ারী স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে ব'সে থেকে সে উঠল; উঠে গিয়ে মদের জালার কাছে ব'সে একটা ভাঁড় নিয়ে গলগল ক'রে গলায় মদ ঢালতে লাগল। দেখতে দেখতে পিথিমী যেন ঘুরতে লাগল—নাচতে লাগল তার চোখের সম্মুখে। মনে মনে সে ডাকতে লাগল বাবাঠাকুরকে। সুবাসী নাচছে, গোপালী নাচছে, প্রহ্লাদের মেয়ে, গুপীর বেটার বউ নাচছে, পাগল গান গাইছে। বনওয়ারী কিন্তু তা দেখছেও না। তার দৃষ্টি বাবাঠাকুরের থানের দিকে। শুক্লানবমীর চাঁদ অনেকক্ষণ ডুবে গিয়েছে, বাবাঠাকুরতলায় অন্ধকার থমথম করছে। কিন্তু বনওয়ারী দেখতে পাচ্ছে, বাবাঠাকুর বেলগাছটির ডালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাবা, শুধু দাঁড়িয়ে থেকো না। একবার হাঁক মেরে বল—সাবোধান—সাবোধান! নইলে ইশারা দাও। জানান দাও। চমকিয়ে দিয়ে সকলকে সাবোধান ক'রে দাও। চিরকাল দিয়ে

এসেছ বাবা, আজ এই সঙ্কটের সময় তুমি চুপ ক'রে থেকো না। হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় অনেক নজীর আছে। সুচাঁদ বলে—আটপৌরেপাড়ার দল যে-বারে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, সে-বারে বাবা সাবোধান ক'রে দিয়েছিলেন।

—আনার ঘুরঘুট্টি আত, শাওন মাস, আকাশে অল্প ছিলছেলানি ম্যাঘ। আটপৌরেরা ডাকাতি করতে বার হ'ল। অ্যাই অ্যাই জোয়ান। লাটি ঘোরাচ্ছে যেন বন্-বন্, বন্-বন্। তার আগুতে বাবাঠাকুরের হুকুম হয়েছে—চুরি ছাড়, চাষ কর। কাহারেরা চাষ ধরলে; আটপৌরেরা অক্তের ত্যাজে, মাথার গরমে মানলে না। একবার ডাকাতি, দুবার ডাকাতি, তিনবার—চার-বার ক্ষমা করলেন, পাঁচবারের বার শাওন মাসে যেই ফের বার হবে—এই দুখানা মাঠ পেরাল্ছে, অমুনি কড় কড় ক'রে বাজ পড়ল বাবার দহের ধারে শিমুলগাছের পাশে তালগাছের মাথায়। তবু মানলে না, না-মেনেই যেই যাওয়া অমুনি পিতিফল হাতে হাতে। তিনজনা আটপৌরে ধরা প'ড়ে গেল।

চৌধুরী মহাশয়দের, যেবারে জাঙল বাঁশবাদি মহল নীলাম হয়, সেবারে চৌধুরীদের নাচ-গানের আসরে আটচালার চালে আগুন জ্বলে উঠেছিল তোমার ইশারায়; যে আলো চিরকাল আসরে জ্বলত—পঞ্চাশবাতি আলো, সেই আলোই জ্বলছিল, সেই আলোর শিস গিয়ে লাগল দড়িতে, দড়ি বেয়ে আগুন লাগল চালে, পঞ্চাশবাতি আছাড় খেয়ে পড়ল। 'কেরাচিনির' তেল ছড়িয়ে পড়ল, জ্বলতে লাগল। বাবা ইশারা দিয়েছিলেন—সাবোধান! মা-লক্ষ্মী চঞ্চল হয়েছেন—নাচ গান মদ-মাতালির সময় নয় এখন। কিন্তু কাকে বলছ? কে শুনছে? চৌধুরীরা শোনে নাই—ছ মাসের মধ্যে নীলাম হয়ে গেল সব!

তেমনি ক'রে সাবধান ক'রে দাও। জ্বলে উঠুক করালীর ঘরের চাল, নইলে যারা গিয়ে জুটেছে ওই জাতনাশার আসরে—তাদের চালে। আমাদের ভাঁজোর আসরে আজই সাবধান ক'রে দাও বাবা সকলকে। না না বাবা, গাঁয়ের ভেতরে আগুন জ্বেলো না বাবা। তাতে কাজ নাই। গরিবের সর্মনাশ হবে বাবা। গাঁয়ের ধারে তালগাছের মাথায় ওই পরমার ঘরের কানাচে ওই সবচেয়ে উঁচু গাছটার মাথায় বাজ ফেলে দাও। না হয়, পরমার ঘরখানা পতিত পড়েছে,—পরমা ফেরার, কালোবউ মরেছে—ওই ঘরটায় আগুন জ্বলে তো জ্বলুক। হ্যাঁ বাবা, তাই জ্বলুক।

পাগল বললে—আর মদ খাস না বনওয়ারী। উঠে আয়। গোপালীবউকে ঘর নিয়ে যা, বে-এক্কার হয়েছে।

নাচতে নাচতে মাতাল হয়ে গোপালীবালা মাটিতে শুয়ে পড়েছে, বমি করছে।

বনওয়ারী উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠেছে, মদ খেয়ে চোখ অবশ্য সকলেরই লাল হয়েছে, কিন্তু বনওয়ারীর চোখে যেন লালের সঙ্গে ভর চেপেছে।

পাগল ভয় পেলে, ভয়ের সঙ্গেই ডাকলে—বনওয়ারী!

বনওয়ারী চোখের ইঙ্গিত ক'রে একটা আঙুলে নির্দেশ দিয়ে কি দেখালে, বললে—কত্তাবাবা, বাবাঠাকুর!

—কি? কি বলছিস?

—সাবোধান।—বাবা বলছে। বনওয়ারী টলতে টলতে চ'লে গেল বাবাঠাকুরের 'থানের' দিকে। সুবাসী নাচতে নাচতে থেমে গেল। বনওয়ারীর পিছনে পিছনে খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে সে ফিরল, কিন্তু ভাঁজোতলার দিকে নয়। ওদিকে ভাঁজোতলার সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। পাগল বললে—ভাগ্‌ শালো, বেজায় মদ খেয়েছে! লে—লে, সব গান কর্‌। আমি গোপালীবউকে বাড়িতে শুইয়ে দিয়ে আসি। উঁহু, ও পেল্লাদের বউ, তুমি যাও ভাই, গোপালীবউকে তুমিই ধ'রে নিয়ে যাও।

পেল্লাদের বউ মুচকে হাসল।—কেনে হে? ভয় নাগছে নাকি? অঙের ভয়?

পাগলও হাসল, সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলে—

যে অঙ আমার ভেসে গেল,
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ যেয়ে লেগেছে সই
লালশালুকের ফুলে হে!
(কোপাই নদীর জলে হে!)
সেই শালুকে মন মানালাম
সকল দুখো পাসরিলাম
তোমার মনের অঙের মলা
তুমিও দিয়ো ফেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)
নিত্য নতুন ফোটে শালুক
বাসি ঝ'রে গেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)

গান চলতে লাগল। মেয়েরা নাচছে। গোপালী বউ যেমন প'ড়ে ছিল, প'ড়েই রইল। ঘরে ধ'রে নিয়ে যাবার কথা সকলে ভুলে গেল মুহূর্তে।

ওদিকে করালীর আসর খুব জমেছে। ওদের গান হালফ্যাশানের গান। কলের গানের 'র‍্যাকডে'র গান। বাঁশের বাঁশি—বাঁশেরো বাঁ-শি, বাঁশেরো বাঁ-শি—খুব গাইছে মেয়েগুলো নসুবালার সঙ্গে। কিন্তু করালীর বাঁশি শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বনওয়ারী চীৎকার করতে করতে ফিরে এল—সাবোধান! সাবোধান! ওই দেখ ওই দেখ্‌।

বাঁশবাঁদির চারি পাশে রাত্রির অন্ধকার ঘন ঘুটঘুটি হয়ে রয়েছে, তারই মধ্যে এক জায়গায় জল-জল ক'রে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। ভাদ্র মাসের ভিজে খড়-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ। আগুন! আগুন! বনওয়ারী ধড়াস ক'রে প'ড়ে গেল ভূতগ্রস্তের মত। গোপালী উঠে বসল হঠাৎ। সে মদের নেশায় রাঙা চোখে বিভ্রান্তের মত চেয়ে রইল বনওয়ারীর দিকে।

পুরুষেরা সকলেই ছুটে গিয়ে পড়ল আগুনের ধারে। আটপৌরেপাড়ার—পরমের ঘরে নয়,

রমণের ঘরে। রমনের ঘরও শূন্য প'ড়ে আছে, সে থাকে বনওয়ারীর বাড়িতে। বউ মরার পর থেকেই সে অসুস্থ হয়ে শয্যা নিয়েছে বনওয়ারীর দাওয়ায়।

আগুন কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবে গেল। ছোট ঘরের চালে অল্প কিছু খড় তাও ভিজে, তাতেই আগুন লেগেছে, এদিকে কাহারপাড়া ও আটপৌরেপাড়ায় মরদের দল অনেক। আগুন নিবিয়ে আবার সব ফিরল ভাঁজোতলায়।

নয়ানের মা তীব্রস্বরে গাল দিচ্ছে—হে বাবা, সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দাও, যে আগুনে তোমার বাহনকে পুড়িয়েছে, সেই আগুনে সব শ্যাষম্যাস ক'রে দাও।

পাখী বললে—সে কই? সে? মানে করালী।

নসু বললে—তাই তো? সে আবার গেল কমনে?

করালী ফিরল আরও কিছুক্ষণ পরে। কারও কোন প্রশ্নের জবাব দিলে না, নাচতে লাগল, সে কি নাচ! পাখীকে টেনে নিলে সঙ্গে।

বনওয়ারীর চেতনা হ'ল সকালবেলায়। মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা আর একটা আতঙ্ক। গোপালীবালা কেশবেশ এলিয়ে অগাধ ঘুমে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে ঘরের দাওয়ায়। সকালবেলায় ভাঁজো ভাসিয়ে স্নান ক'রে ঘরে ঢুকল সুবাসী। যুবতী মেয়ে, শক্ত শরীর, মদ খেয়েও সে একেবারে অচেতন হয়ে পড়ে নাই। বনওয়ারী তার দিকে একবার তাকালে, কিন্তু কোন কথাই বললে না। তার মাথার মধ্যে ঘুমুচ্ছে যেন একটা ভয়।

সুবাসী তার দিকে তাকিয়ে হাসলে একটু।

স্নান করে এলেও সুবাসীর অঙ্গ থেকে একটা মৃদু সুবাস উঠছে যেন। কিন্তু বনওয়ারীর নাকের কাছে ভনভন ক'রে মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে—মদের গন্ধ উঠছে তার সর্বাঙ্গ থেকে।

ছয়

সমস্ত সকালটাই সে কেমন 'থম্ব' অর্থাৎ অসাড় হয়ে ব'সে রইল। সমস্ত পাড়াটা এখনও নিঝুম। বাসি ভাঁজো অর্থাৎ ভাঁজোর পরদিন এমন নিঝুম কোন কালে হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে ওই রমণের ঘরের ভিজে চালে আগুন লাগায় পাড়ার লোক ভয়ে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে। মদের নেশাকে যতক্ষণ আমোদের মাতন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় ততক্ষণ আমোদে বেশ মেতে থাকে কাহারেরা, কিন্তু মাতন বন্ধ হ'লেই অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মদ খেয়ে পাল্কী কাঁধে চলে দশ ক্রোশ—পাল্কী কাঁধ থেকে নামিয়ে গামছা পেতে শুলেই আসে মরণ-ঘুম।

পাড়ার সকলেই প্রায় সেই কাণ্ডের পর ঘুমিয়ে পড়েছে। বনওয়ারীর চোখের উপর এখনও স্বপ্নের মত ভাসছে—অন্ধকারে রাত্রির মধ্যে রমণের চালের রক্তরাঙা দগদগে আগুন। আর কানের পাশে বাজছে নিজের কণ্ঠস্বর—সাবোধান—সাবোধান!

তারপর মনে পড়ছে, সে গিয়েছিল বাবাঠাকুরের থানের দিকে—সেই গভীর রাত্রে। স্পষ্ট

মনে পড়ছে, কে যেন তাকে ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

বাবাঠাকুর বললেন—সাবোধান।

বনওয়ারী বলেছিল বাবাকে—ভরা কলি বাবা, একালে মানুষকে মানুষ মানে না। তুমি নিজে মাহাত্ম্য দেখাও বাবা। হাঁক মারো বাবা। বাঁচিয়ে তোল তোমার বাহনকে, তাকে বল বাবা, আকাশে তুলুক ফণা—করালীর, এই পাপ করালীর কোঠাঘরের মাথা নিশ্বেসে জ্বালিয়ে দিক বাবা, আর জ্বালিয়ে দাও পরমের ঘর, ওই ঘরে আছে সর্বনাশী কালোবউয়ের প্রেতাত্মা।

বাবাঠাকুর বলেছেন—হবে হবে। একে একে হবে।

কিন্তু পরমের ঘর না জ্বালিয়ে রমনের ঘর জ্বালালে কেন বাবাঠাকুর?

গরুগুলি ডাকতে শুরু করেছে। মায়েরা ডাকছে, ছাঁয়েরা সাড়া দিচ্ছে, মায়ের স্তনে দুধ জ'মে উঠেছে, বাঁটগুলি টনটন করছে, মায়েরা তাই ডাকছে। অথবা বাচ্চাগুলির ক্ষিদে পেয়েছে—তারা ডাকছে, মায়েরা সাড়া দিচ্ছে। বনওয়ারী এই ডাকে সচেতন হয়ে উঠল। টলতে টলতেই উঠে দাঁড়াল।

মাতব্বরের দায় অনেক। পাড়াকে জাগাতে হবে। ভাঁজো সুন্দরী শালুক ফুলের মালা গলায়, সিঁদুরের টিপ প'রে পায়ে মল বাজিয়ে কোপাইয়ের জলের তলা দিয়ে স্বস্থানে গেলেন, কাহারপাড়ার লোকের আর তো শুয়ে থাকলে চলবে না, উঠতে হবে। ঘর আছে, দোর আছে, গরু বাছুর ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী কাছে, ঘরদোর নিকুতে হবে, গরুর দুধ দুইতে হবে, ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী ঘর থেকে ছেড়ে দিতে হবে। দুধের যোগান দিয়ে আসতে হবে চন্নপুরে বাবু মহাশয়দের বাড়িতে। মাঠে সবুজবরণ ধান ডাক দিচ্ছে—আমার আশে-পাশে আগাছা জমেছে, তুলে দাও, নিড়িয়ে দাও। জাঙলের সদ্‌গোপ মনিব মহাশয়েরা রাগে দাঁত কিস-কিস করছেন। ভাদ্রমাসে এই ভাঁজো পরবের উপর তাঁদের ভয়ানক রাগ; চাষের সময় ঢোল বাজিয়ে মদ খেয়ে ধেই ধেই ক'রে নেচে গোটা একটা দিন কামাই তাঁরা কোন মতেই সইতে পারেন না। একদিন গোটা কামাই গিয়েছে, আবার আজ কামাই হ'লে আর রক্ষে থাকবে না। মারধোর গালমন্দকে তত ভয় করে না কাহারেরা, ভয় হ'ল পেটের, মনিব যদি ধান 'বাড়ি' অর্থাৎ ধার দেওয়া বন্ধ করেন, তবে সর্বনাশ হবে!

সে প্রথমেই ডাকল গোপালীকে।—বড়্‌কী, ওঠ্‌, ওঠ্‌। বড়্‌কী!

গোপালীর তবু কোন সাড়া নাই। একেবারে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। কি বিপদ! গাই দুইতে হবে, গরু ছাড়তে হবে। তার নিজের অনেক কাজ, সায়েবডাঙার জমিতে গিয়ে এবার পড়তেই হবে, নইলে আর নিড়ান দেওয়া হবে না। একে ভাঙা মাঠ, তার উপর নতুন জমি, জল শুকুচ্ছে হু-হু ক'রে। আকাশের মেঘ এবার ধরবে। ভাদ্র মাসে ইন্দ্ররাজা পনেরো দিন দেন চাষীকে অর্থাৎ রিমঝিমি জল দেন, আর পনেরো দিন দেন চর্মকারকে অর্থাৎ পনেরো দিন দেন কাঠা-ফাটা রোদ, সেই রোদে তারা বর্ষাকালে সংগ্রহ করা চামড়া শুকিয়ে নেয়। রোদ উঠলে দিন পনেরো কুড়ি ভীষণ রোদ হবে। সায়েবডাঙার জল আগে শুকুবে, তখন আর আগাছা টেনে তুলবার উপায় থাকবে না। বনওয়ারীকে সায়েবডাঙায় যেতেই হবে।

বনওয়ারী এবার এগিয়ে এসে গোপালীর গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলে—বড়্‌কী!

গায়ে হাত দিয়ে সে চমকে উঠল—ইস্, গা পুড়ে যাচ্ছে যে! এত উত্তাপ যে মনে হয়, গায়ে ধান পড়লে ফুটে খই হয়ে যাবে।

বনওয়ারী ডাকলে—বড়্‌কী! গোপালী!

গোপালী রক্তরাঙা চোখ মেললে—আঁ্যা! তারপর সে হঠাৎ ব'লে উঠল—সাবোধান! শুনে চমকে উঠল বনওয়ারী। সে বললে—কি বলছ? গোপালী ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল তার দিকে।

বনওয়ারী আবার বললে—জ্বর হল্‌ছে। উঠে ঘরে শো। সুবাসী! সুবাসী!

সুবাসী ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কাপড় ছেড়ে।—কি?

—ধর্, গোপালীর বেজায় জ্বর।

—জ্বর! সুবাসী মুখ বেঁকিয়ে বললে—হবে না, যে মদ খাওয়ার ধুম! পাগলা-পিরীত—এমুনি বটে!

বনওয়ারী ধমক দিল তাকে।—যা বলছি তাই শোন্! ধর্—ঘরে শোয়ায়ে দিয়ে দুধ আজ তুই দুয়ে ফেল্। অমনকাকাকে বল্—গরু মাঠে নিয়ে যাক।

—উঃ—উঃ! তোর গায়ে বাস উঠছে কিসের? আঁ?—গোপালীকে শুইয়ে দিয়েই বনওয়ারী জিজ্ঞাসা করলে।

সুবাসী বললে—গন্ধ কিসের উঠবে! মরণ! মদের গন্ধ উঠছে নিজের শরীর থেকে।

—না, মদের গন্ধ লয়। সুবাস উঠছে।

—তুমি ক্ষেপেছ?

—না।

—হ্যাঁ। তুমি ক্ষেপেছ! কাল এতে কি করেছ মনে আছে? না ক্ষেপলে ওই করে লোকে, না এমুনি বলে—সুবাস উঠছে তোর গা থেকে?

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বনওয়ারী সুবাসীর মুখের দিকে।

সুবাসী বললে—কাল এতে তুমি অমনকাকার ঘর পুড়িয়ে দিলে?

চমকে উঠলে বনওয়ারী।

—জয় বাবাঠাকুর—জয় বাবাঠাকুর—কালোবউ, অপরাধ নিয়ো না, বাবাঠাকুরের হুকুম।—ব'লে বিড় বিড় ক'রে বকছিলে, সব শুনেছি।

বনওয়ারীর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠল। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে সুবাসীর দিকে, মনে হচ্ছিল, চোখ দুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

সুবাসী ভয়ে পিছিয়ে গেল।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়তে লাগল—না না না।

ঘরের মধ্যে কাতরাচ্ছিল গোপালী—বিড় বিড় ক'রে বকছে জ্বরের ঘোরে।

সুবাসী বললে—যাও, যেথানে যাবে যাও। ভয় নাই। হাসতে হাসতে সে সতীনের ঘরে

গিয়ে ঢুকল।

বনওয়ারীর মনে হ'ল, আবার যেন বাবাঠাকুর তার ঘাড়ে 'ভর' করতে চাচ্ছেন। হাত-পা কাঁপছে, কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে, চীৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে—সাবোধান, সাবোধান। বনওয়ারী ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিলে, তারপর চলল পাড়ার ভিতর। কিন্তু সুবাসটা কিসের ?

ভাঁজোতলায় পাগল একলা ব'সে বায়েন ভাইয়ের ঢোলখানা নিয়ে কাঠির বদলে আঙুলের টোকা দিয়ে বাজিয়ে গুনগুন ক'রে গান করছে। বায়েনটা গাছতলায় পড়ে আছে। এখানে ওখানে শুয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে কাহারপুরুষেরা। মেয়েরা ঘুমাচ্ছে ঘরের দাওয়ায়। মেয়েদের মধ্যে নয়ানের মা জেগে ব'সে রয়েছে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। এখনও সে সমানে গাল দিয়েই চলেছে—হে বাবাঠাকুর! তোমার বাহনকে মারলে যারা, তাদের বাড়বাড়ন্ত কেন বাবা ? এ কি তোমার বিচার! একবার ক্ষেপে ওঠ বাবা! গাঁয়ের মধ্যে কোঠাঘরের মটকায় আগুন জ্বালো বাবা!

মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর ইচ্ছে হয়, এই মেয়েটার টুঁটি দুই হাতে টিপে ধ'রে তাকে চুপ করিয়ে দেয়। শুধু এই মেয়েটি সম্পর্কেই নয়, ঝগড়াটে মেয়েদের সম্বন্ধেই তার এই ইচ্ছে হয়। কিন্তু আজ সে ইচ্ছে হ'ল না। করালীকে অভিসম্পাত করছে করুক। ওই জন্যই তাকে সে ক্ষম করলে।

* * * *

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যা কিছু হঠাৎ ঘটে, তাই দৈব। দেবতার রোষ বিনা অপরাধে হয় না—এই কথা শাস্ত্রে আছে, সেই কথাই তারা বিশ্বাস করে। দেবতাদের রোষ হ'লে জানতে হবে, অপরাধ হয়েছে, সে তুমি জেনেই ক'রে থাক আর অজানতেই ক'রে থাক। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একথাও বিশ্বাস করে—'কে করলে ব্রহ্মহত্যে কার প্রাণ যায়!'

গোপালীবালা ওই অসুখে হঠাৎ তিন দিনের দিন মারা গেল। ওই কথাগুলির সবগুলিই বললে লোকে। সকলকেই বললে—হঠাৎ মৃত্যু আর এমন 'সাবোধান সাবোধান' ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে মিত্যু যখন, তখন দেবরোষ! দেবরোষের সাক্ষাৎ প্রমাণ—অভদ্রা বর্ষাকালে ভাঁজোর রাত্রে যে ঘরে মানুষ নাই, সেই ঘরের চাল জ্বলে ওঠা। বাবাঠাকুরের ক্রোধ হয়েছে। কিন্তু সে ক্রোধ গোপালীর উপর পড়ল কেন ? কেউ বললে—যখন পড়েছে, তখন নিশ্চয় অপরাধ আছে বৈকি! কেউ বললে—বনওয়ারীর অপরাধ কেউ দিতে পারবে না। অপরাধ আর কারুর।

নয়ানের মা শুধু কাকে যেন বলছে—নয়ানের ঘর ভেঙে পাখীর সঙ্গে করালীর বিয়ে দেওয়া অধম্ম লয়, অপরাধ লয় ? একশোবার, হাজারবার অপরাধ। তাই দিলেন বাবাঠাকুর ওরও পাতানো ঘর ভেঙে। এ নিচ্চয়, এ নিচ্চয়।

কিন্তু ঘর ভাঙল কই ? গোপালী গেল, সুবাসী আছে। বনওয়ারীর দুঃখ অল্প-স্বল্প হবে, কিন্তু দুই সতীনের হাঙ্গামা থেকে তো বাঁচল। অনেক ভেবে-চিন্তে তারা বললে—সুবাসীর কপাল, চার চৌকস সুখের কপাল।

নয়ানের মা তার উত্তরে বলেছে—ও সব আমি মানি না। আমি যা বলছি তাই ঠিক। রাবণের মা নেকষার মত ব'সে আছি আমি বেটার মাথা খেয়ে, আমি যে দেখতে পেছি সব।

এই তো কলির পেথম সন্‌জে। এই তো আরম্ভ। গোপালী বউ ছিল ভাগ্যবতী, তাই সে আগেভাগে ড্যাঙডেঙিয়ে চ'লে গেল। সাবোধান সাবোধান—ক'রে সে শেষকাল পর্যন্ত চেঁচিয়ে গেল কেনে তবে? বাবার বাহনকে মেরেছে যে তার সাজা হবে না? পাড়ার মাতব্বর তাকে সাজা দিলে না, মাতব্বরের সাজা হবে না?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় সবচেয়ে বুড়ী হ'ল সুচাঁদ। করালী আর পাখীর জন্য বসন-সুচাঁদের এখন বনওয়ারীর সঙ্গে ঝগড়া নয়; বনওয়ারী পাড়ার মাতব্বর, তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কাহার-পাড়ায় কে বাস করতে পারে? করালী যে করালী, যে নাকি এখন পল্টনী পোশাক প'রে জুতো পায়ে খটমট ক'রে বেড়ায় মাথায় বেঁকিয়ে টুপি প'রে, পকেটভরা যার রোজগার, সে পারলে বাস করতে এখানে? ঘরখানা আছে, মাঝে মাঝে আসে, দু দণ্ড থাকে, পরবে পার্বণে এক আধদিন এসে থেকে যায়, তাকে কি বাস করা বলে? বাস করে না বনওয়ারীর ভয়ে! সুতরাং বনওয়ারীর সঙ্গে পুরো ঝগড়া বসন-সুচাঁদের নাই! বনওয়ারীও তা করে না, মাতব্বরেরও একটা ধর্ম আছে, সে তা লঙ্ঘন করে না। তবুও মনের মিল নাই। আর প্রতি কাজে বনওয়ারী সুচাঁদের পরামর্শ নেয় না। সুচাঁদও আসে না আগেকার মত হাঁকডাক ছেড়ে প্রতিটি কাজে। বলে না—তু তো কালকের ছোঁড়া রে, আমার বুকে দুধ ছিল তাই পরাণে বেঁচেছিস। আজ কিন্তু সুচাঁদ বসন দূরে থাকতে পারলে না, সুচাঁদই সর্বাগ্রে ছুটে এল বুক চাপড়ে কাঁদবার জন্য। সে কাঁদলে বুক ভাসিয়ে, বলল—কিসের পাপ, কিসের অপরাধ! কিসের শাপ, কিসের শাপান্ত রে! পুণ্যবতী ভাগ্যবতী সিঁথের সিঁদুর নিয়ে ভরাভর্তি ভাদর মাসে ড্যাঙড্যাঙিয়ে চ'লে গেল রে! হাসতে হাসতে চ'লে গেল রে! ছ মাস সতীন-কাঁটার দুখ ভোগ করলে না রে! আর আমি প'ড়ে অইলাম রে!

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে শুনছিল। কারুর কোন কথাই সে অবিশ্বাস করতে পারছিল না। সবই মেনেই নিচ্ছে। নয়ানের মায়ের কথা গভীরভাবেই তার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সত্যিই তো, অপরাধ যদি না থাকবে, তবে এমনভাবে মরল কেন গোপালীবউ? ভাদ্র আশ্বিন মাসে পিত্তি পড়ে, অম্বল হয়, জরে পড়ে কাহারপাড়ার লোকেরা। বৈদ্যেরা বলে—পুরাতন জ্বর; ডাক্তারে বলে—'ম্যালোয়ারী'। কম্প দিয়ে জ্বর আসে, গলগল ক'রে পিত্তি বমি করে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। 'কুনিয়ান' খায়, পাঁচ দিন সাত দিন পর পথ্য পায়, বিছানা ছেড়ে ওঠে, আবার পনেরো-বিশ দিন পর পড়ে। এ কিন্তু তা নয়। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিকার। বিকার নয়, বাবা-ঠাকুরের আদেশ—'সাবোধান সাবোধান' ব'লে চীৎকার করলে শেষ পর্যন্ত। বনওয়ারীর মনে পড়ে, ভাঁজোর রাত্রের সেই কথা 'মন্দ স্বপনের' কথার মত। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে পড়ে সুবাসীর কথা। রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করে। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারে না।

আবার সুচাঁদ যখন কেঁদে বলে—পুণ্যবতী ভাগ্যবতী! তখন তাও সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে; সত্যিই তো ড্যাঙড্যাঙ ক'রে চলে গেল। কপালে এককপাল সিঁদুর, পায়ে আলতা দিলে, তার সবচেয়ে ভালো কাপড়খানি প'রে চ'লে যাচ্ছে গোপালীবউ; চারিদিক ভরাভর্তি ভাদ্রের শেষ, আকাশে রোদ ঝলমল করছে, গোটা হাঁসুলীবাঁকের মাঠে সবুজবরণ ধান দলমল করেছে, বাঁশবনের পাতায় গাছপালার ডালে পল্লবে সবুজ থমথম করছে, রোদের ছটায় ঝলক মারছে,

পুকুরগুলিতে পদ্মপাতা পদ্মফুল ফুটেছে, আঙিনাতে স্থলপদ্ম ফুটেছে, শিউলীফুল ঝরছে শিউলিতলায়, কোপাইয়ের জলের রঙ ফিরছে—লাল জল কাঁচবরণ হয়ে এসেছে। হাঁসুলীর বাঁক সবুজ হয়েছে, তাই সোনার হাঁসুলী রূপোর বরণ নিচ্ছে শোভার জন্যে। নদীর কূলে কূলে কাশ 'ফুলিয়েছে' অর্থাৎ ফুল ফুটেছে। জাঙলে চন্ননপুরে বোধনের ঢাক বেজেছে। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গনেশ সিংহ অসুর সঙ্গে নিয়ে মা-দুর্গা আসছেন। পুজোর উয্যুগ চলেছে, খামার পরিষ্কার হচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে আউশ ধান উঠবে—আউশের সবুজ রঙ ফিকে হয়ে 'লালি' অর্থাৎ লালচে আভা ধরেছে। এই ভরাভর্তি হাঁসুলী বাঁকে স্বামীকে রেখে সতীনকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল। লোকে ধন্য ধন্য করবে বইকি।

পাগল প্রহ্লাদ রতন—এরাই সকলে শ্মশানে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলে। বসন এগিয়ে এসে আলতা পরিয়ে দিলে। বললে—তুমি ভাগ্যিমানী। আঃ, আমার পেরমায় নিয়ে যদি তুমি বাঁচতে আর আমি যেতাম।

বনওয়ারীর ভারী ভাল লাগল বসনের একথাগুলি। বসন বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু করালীর জন্য বসন পর হয়ে গেল।

নসুবালাও এসেছিল। সেও মেয়েদের দলে মিশে কাঁদছে;—আঃ—আঃ—হায় হায় গো! গোপালীকাকী আমার মাটির মানুষ, সোনার পিতিমে গো! মুখে ঝরত অমিত্তি, কথা শুনে পরাণ জুড়াত, হাতে ছিল কোপাইয়ের ঠাণ্ডা পরশ, বুলিয়ে দিলে রঙ্গ জুড়িয়ে যেত। আঃ, কোথা গেলি মা গো—পাড়ার লক্ষ্মী মা রে!

সুবাসী এক পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ নসুবালাই বললে—আঃ সুবাসী, তোর বাছা করণ দেখে শরীলটা রি-রি করছে আমার। বলি—দে, সিঁদুর ঢেলে দে—সতীনের মাথায় সিঁদুর দে, বল্—সোয়ামীর দাবী ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি সিঁদুর দিলাম, আমার সিঁদুর তুমি বজায় একো।

পাগল ডাকলে—বনওয়ারী!

—কি?

—একখানা লতুন কাপড় চাই যে। শ্মশানে লাগবে। তা বাজারে তো মিলল না। বলে—কাপড় নাই।

বসন বললে—একটা কথা বলব বনোয়ারীদাদা? করালীর কাছে লোক পাঠাও, সে ঠিক বার করবে কাপড়। কোম্পানীর দোকান আছে কিনা—

—না। বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে বললে—কাপড় দরকার নাই। জাঙলে গিয়ে তাঁতীদের ঘর থেকে গামছা কিনে আন।

'যেমন কলি তেমনি চলি'। উপায় কি? কাল যুদ্ধ লেগেছে। বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। গতবার যুদ্ধ লেগেছিল, কাপড়ের দাম চড়েছিল—পাঁচ টাকা সাত টাকা জোড়া দাম হয়েছিল। এবার যুদ্ধে কাপড়ই নাই, মিলছেই না। গামছা প'রেই যাক গোপালী। তাই যাক। কি করবে বনওয়ারী! এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না!

দাহ শেষ করে ফিরবার পথে সাতবার সাত জায়গায় কাঁটা দিতে হয়। প্রেতাত্মা পিছনে আসে যে! ঘর-সংসারের মমতা মরলেই কি ছাড়া যায়? বনওয়ারী বড় বড় বাবলা-কাঁটা দিলে পথে। মনে মনে বললে—গোপালীবউ, তুমি তো পাপ কিছু কর নাই, স্বগ্‌গে তোমার ঠাঁই হবে। ঘরের লোভ তুমি ছাড়। তোমার জন্যে আমার অনেক দুঃখ। কিন্তু আমার এখন অনেক কাজ। কাহারপাড়া-আটপৌরেপাড়ার মাতব্বরি আমার ঘাড়ে। আমার—

মাথার উপর গোঙাতে গোঙাতে উড়ে আসছিল একঝাঁক উড়ো-জাহাজ। চলল বোধ হয় নতুন উড়ো-জাহাজের আস্তাবলে চন্নপুরের কারখানার পাশে—করালী হারামজাদার এলাকায়! হু-হু-হু-হু। বুকের ভিতরটা গুরগুর করছে।

গ্রামে ঢুকবার পথে বাবাঠাকুরের থানে সে উপুড় হয়ে শুয়ে মনে মনে বললে—গোপালীর দৃষ্টি থেকে অক্ষে কর বাবা। আমার এখন অনেক কাজ। কিন্তু ওটা কে? পাখী নয়? হ্যাঁ, সেই তো! গ্রামের বাইরে সেই কালোবউয়ের সঙ্গে দেখা-হওয়া বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে খুব কথাবার্তা বলছে। খুব হাত-পা নাড়ছে। কি কথা এত?

যাক, মরুক, যা বলবে বলুক, বনওয়ারীর এখন ওদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা নয়।

একা বনওয়ারীর নয়, শববাহক দলের সকলেরই দৃষ্টি পড়েছিল। পাগল বললে—আঃ, পাখী দেখি কলকলিয়ে বুলি বলছে!

পানা বললে—হাঁ, করালী পড়িয়েছে ভাল, সেই বুলি বলছে। ভাঁজোর আত্তিরে চন্নপুরে কাজের কথা বলেছে করালী। ছোঁড়ারা চুলবুল করছে সেই দিন থেকে। সেই সব কথা হচ্ছে। নিজে আসে নাই, পাখীকে পাঠিয়েছে।

বনওয়ারী কোন কথা বললে না। যত সে বাড়ির কাছে আসছে, ততই মনে পড়ছে গোপালীবউকে। গোপালীবউ যে তার জীবনটা জুড়ে বাস করত, তাই গোটা জীবনটাই আজ খালি ব'লে মনে হচ্ছে। যে যা করবে করুক, আজ আর কোন কথা বলতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না।

বাড়িতে ঢোকবার মুখেই কিন্তু সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। করালী ব'সে রয়েছে তার বাড়ির উঠানে। বনওয়ারী চমকে উঠল। দূর থেকেই সে বেশ দেখতে পাচ্ছে—শরৎকালের শেষবেলার রোদ পশ্চিম মাঠের ঘন সবুজ ধানের উপর প'ড়ে দ্বিগুণ ছটা নিয়ে পড়েছে তার আঙিনার দাওয়ার উপর—খানিকটা গিয়ে পড়েছে খোলা দরজার মুখে ঘরের মধ্যে। সেইখানে ব'সে আছে সুবাসী। বড়ই চতুর সে। 'সান কেড়ে' অর্থাৎ ঘোমটা দিয়ে বসেছে বিনা কারণে। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে করালীর দিকে। করালী বনওয়ারীর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, সে তার দিকে তাকাচ্ছে কি না দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝেছে, সেও সুবাসীর দিকে তাকাচ্ছে। ছোকরা খুব আসর জমিয়ে রেখেছে। চন্নপুরের শোনা গাল-গল্প জুড়ে দিয়েছে। সায়েব লোকে যুদ্ধ লাগিয়েছে—ইংরাজ আর জার্মানিতে। কামান বন্দুক বোমা, জার্মানি জিতছে, ইংরেজরা হারছে। উড়ো-জাহাজের লম্বা-চওড়াই গল্প করছে। তার কলকারখানা, ডানা, লেজ—হরেক রকম কথা।

ওরে হারামজাদা! যুদ্ধ জানে বনওয়ারী। ঘোষেদের বাড়িতে সেও শুনেছে। আরও

একবার যুদ্ধ লেগেছিল বাংলা একুশ সালে—সেকাল দেখেছে। যুদ্ধ লেগেছে তো তোর বাবার কি? হাঁসুলী বাঁকে তার কিসের গাল-গল্প? ধানচাল আক্রা হবে, কাপড়ের দর চড়বে। হয় হবে, চড়ে চড়বে। 'খানিক-আদেক' দুঃখকষ্ট হবে। মাথায় ধর্মকে রেখে পিতিপুরুষের 'গোনে গোনে' অর্থাৎ পথে পথে সাবধানে বারো মাসে এক এক পাক খেয়ে যে ক বছর যুদ্ধ চলে কাটিয়ে দেবে। কত্তাঠাকুর রক্ষা করবেন। তাঁর আশীর্বাদ কেটে যাবে কাল সুখে-দুঃখে। হাঁসুলীর বাঁকের মাঠে মা লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো নিলেই সকল অভাব ঘুচে যাবে।

বনওয়ারী ঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে বললে—করালীচরণ মহাশয় নাকি?

করালী বললে—হ্যাঁ মামা। মামীর মিত্যুর খবর শুনলাম। তা ছুটি না হ'লে তো আসতে পেলাম না। এই এলাম খবর করতে।

—তা বেশ করেছ। তাতে মানা নাই, এসব তো করবার কথাই; করতে হয়। কিন্তু বাপু যুদ্ধ-মুদ্ধ এখানে কেনে? কোথা কোন্ ছাশে যুদ্ধ লেগেছে তা হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশ-আদাড়ের ভেতরে কাহারপাড়ার কাহারদের কি? উ সব গল্পে তাক লাগিয়ে মেয়েছেলের মনে অঙ ধরানো যায়, কিন্তু উ সব এখানে চলবে না বাপু।

করালী ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললে—তার মানে? এ সব কি বলছ তুমি?

—বলছি ঠিক, তুমি বুঝছ ঠিক। তোমার পরিবার আসছে, ছেলেছোকরার কানে মন্তর দিচ্ছে—পিতিপুরুষের কুলকম্ম ছেড়ে জাতনাশা কারখানায় চল মজুর খাটতে। তুমি আসছ মেয়েদের মনে—

করালী চেঁচিয়ে উঠল—ভাল হবে না বলছি ব্যানোমামা।

বনওয়ারী বললে—জাতনাশা! বেজাত কোথাকার! তোর লজ্জা নাই, তোর মা ওই নাইনে কাজ করতে গিয়ে চ'লে গেল কুল ভাসিয়ে দেশ ছেড়ে, আর তুই ওই নাইনে কাজ করছিস? আবার পাড়ার ছোকরাদের মাথা খারাপ করতে এসেছিস? পয়সার গরমে কোট পেন্টুল প'রে মেয়েদের কাছে দেখাতে এসেছিস—কত বড় মরদ তু!

করালী উঠে দাঁড়াল, বললে—জাত কার আছে? কোন্ বেটার কোন্ বাবার আছে এখানে? ওই সুচাঁদ বুড়ী ব'সে রয়েছে, বলুক, ওই বলুক, শুনি। জাত! লজ্জাও নাই তোমাদের। সদ্জাতের—ভদ্দলোকের পা চেটে প'ড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ ক'রে মুখ বুজে সহ্য কর। লজ্জা! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ তোমরা? জাত! কুলকম্ম! কুলকম্ম তো জাঙলের চাষীদের মান্দেরি কৃষাণি রাখালি? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা! পেটে ভাত জোটে না, পরনে কাপড় জোটে না। কুলকম্ম! কুলকম্ম! তোমার কি? তুমি মাতব্বর, গুছিয়ে নিয়েছ, জমি করেছ, ধান বেঁধেছ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ। লজ্জা! বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই? মাতব্বর! লোকে গতরে খেটে পেট ভ'রে খাবার মত পরবার মত রোজকার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও! কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে? কেনে মানবে? আমি হাঁক দিয়ে বলে যাচ্ছি—যে যাবে কারখানায় খাটতে, আমি কাজ ক'রে দোব। দিন পাচ সিকে মজুরি। কোম্পানি দেবে সস্তা চাল, সস্তা ডাল, সস্তা কাপড়। যার খুশি চ'লে আয়। ওই বুড়োর কথা মানিস না।

—খবরদার! হাঁক মেরে উঠল বনওয়ারী। বনওয়ারী লাফ দিয়ে পড়ল এবার, অনেকক্ষণ সে হতভম্ব হয়ে শুনেছিল করালীর কথা, করালীর যুক্তি। এমন ধারা মুখের উপর কথা কেউ কখনও বলে নাই, আর এমন অন্যায় অথচ এমন আশ্চর্য যুক্তির কথাও সে কখনও শোনে নাই, তাই সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। 'ওই বুড়োর কথা মানিস না' বলতেই সে সচেতন হয়ে রাগে ফেটে পড়বার মত হয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—খবরদার! সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে করালীর সামনে এসে খপ ক'রে চেপে ধরলে তার লম্বা চুলের মুঠো। চুলের মুঠো ধরে সে তার মাথাটা টানতে লাগল মাটির দিকে। টেনে মাটিতে তার মাথাটা ঠেকিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেবে, মাথা ঝাঁকি দিয়ে কপালে চোখ তুলে কাহারপাড়ার বনওয়ারী মাতব্বরের সঙ্গে কথা বলার আইন নাই। বললে মাথা এমনি ভাবে মাটিতে ঠেকে যায়। নিষ্ঠুর আকর্ষণে টানতে লাগল বনওয়ারী। কিন্তু করালী চন্দনপুরের কারখানায় কাজ করে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা ভুলে গিয়ে সোজা মাথায় সেলাম করা অভ্যাস করেছে, তার উপর সেও লম্বা-চওড়া জোয়ান, গাঁইতি-হাতুড়ি পিটে শরীর হয়েছে পাথরের মত শক্ত; যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও করালী ঘাড় শক্ত ক'রে মাথা সোজা ক'রে রাখলে, কিছুতেই নোয়াবে না সে তার মাথা।

দাঁতে দাঁতে টিপে টানলে বনওয়ারী, করালী তবু নোয়াবে না মাথা, ঘাড় যেন লোহার মত কঠিন হয়ে উঠেছে। সে বললে—ছেড়ে দাও মাতব্বর। ছেড়ে দাও বলছি।

বনওয়ারী হুঙ্কার দিয়ে উঠল—না।

বসন চীৎকার ক'রে উঠল—ব্যানোদাদা! দাদা!

সুচাঁদ হাউমাউ করতে আরম্ভ করলে; নসুবালা বুক চাপড়ে 'হায় হায়' করতে লাগল—হায় হায় গো, কি অমানুষের পুরী! ছাড়িয়ে দাও গো, ছাড়িয়ে দাও। ওগো, তোমরা ছাড়িয়ে দাও।

সুবাসীর মাথা থেকে ঘোমটা খ'সে পড়েছে, সে বিস্ফারিত চোখে দেখছে। ঠিক এই মুহূর্তে ছুটে এল পাখী। সে প্রায় পাগলের মত বনওয়ারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্ঠুর আক্রোশে কামড়ে ধরলে বনওয়ারীর বাহুমূল।

লোকে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। সবিস্ময়ে তারা দেখছে বনওয়ারীর আক্রোশ, করালীর শক্তির পরিচয়। অবাক হয়ে গিয়েছে তারা। পাগল কোথায় ছিল, সে এল এতক্ষণে। সে এল, এসেই ছুটে গিয়ে বনওয়ারীর হাত ধ'রে বললে—বনওয়ারী! ছি! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। তোর বাড়িতে তত্ত্ব করতে এসেছে, তোকে জোড়হাত করতে হয়। করছিস কি? বনওয়ারী!

বনওয়ারীর হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এল। করালীর চুল ছেড়ে দিয়ে বললে—যা। ফিরেবারে আর জানে রাখব না তোকে।

করালীর ঘাড় সোজাই ছিল, সে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে মাথার লম্বা চুলগুলোকে পিছনের দিকে ফেলে দিয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে—ফিরেবারে তোমাকেও আর খাতির করব না আমি। আজ আমি স'য়েই গেলাম। তুমি মাতব্বর, তোমাকে আমার এই শেষ খাতির। তাও করতাম না। কি বলব, আজ তুমি শোকাতাপা হয়ে রয়েছ। আয় পাখী।

পাখীর দাঁতে ঠোঁটে রক্তের দাগ লেগেছে। বনওয়ারীর হাত কেটে তার দাঁত ব'সে

গিয়েছিল। পাখীর হাত ধ'রে যাবার সময় সে আবার হেঁকে ব'লে গেল—চন্নপুর কারখানায় যারা কাজ করবি, তারা আসিস। আমি ব'লে গেলাম।

সাত

বাবাঠাকুর কর্তাবাবা! তুমি কি বিরূপ হ'লে বাবা? বিরূপ হবার কথা বটে, তোমার বাহনকে যে মেরেছে তাকে সে ক্ষমা করেছে। কিন্তু তোমার বাহনকে যে মারলে, তার চেয়েও কি তার বেশি অপরাধ?

বনওয়ারীর মনে কথাটা প্রায়ই উঁকি মারছে। কাহারপাড়ার ছোঁড়ারা তাকে অমান্য করার লক্ষণ দেখাচ্ছে। তাকে অগ্রাহ্য ক'রে করালী জেদ ক'রে নিত্য সন্ধ্যায় এসে নিজের বাড়িতে আড্ডা জমাচ্ছে। সেখানে গিয়ে জমছে তারা।

আর বনওয়ারীর ঘরে ঢুকেছে কালসাপিনী। সুবাসী কালসাপিনী। তার মতিগতি দেখে বনওয়ারীর সন্দেহ হয়—ও-ই হয়তো কোন্ দিন তার বুকে মারবে ছোবল!

সুচাঁদ পিসি রূপকথা বলত—এক আজার কন্যেকে যে বিয়ে করত সে-ই মরত। কন্যের নাক দিয়ে আত্তিরে সুতোর মতো সরু হয়ে বের হ'ত এক সাপ, বের হয়ে সে ফুলত, কেমে কেমে ফুলে সে হ'ত রজগর। তারপর সে ডংশাত আজকন্যের স্বামীকে।

বনওয়ারী ভাবে, মেয়েটাকে দূর ক'রে দেবে। কিন্তু ভয়ে পারে না। ভয় কালোশশীর প্রেতাত্মার ভয়, ভয় গোপালীবালার প্রেতাত্মার ভয়। তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে—সুবাসী। মেয়ের প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচাতে পারে মেয়ের ভাগ্যি—মেয়ের এয়োত। সুবাসীকে বিদায় করলে, আবার তাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু এ বয়সে আবার বিয়ে! সে লজ্জা করে তার। তা ছাড়া কাহারদের মেয়ের রীতচরিত সবই প্রায় এক রকম। গোপালী-বালার মত আর কজনে হয়? তার উপর তার বয়স হয়েছে; আড়াই কুড়ি হ'ল বোধ হয়। তাকে বিয়ে ক'রে যুবতী কাহার-মেয়ের উড়ুক্ষু স্বভাব আরও খানিকটা উড়ুক্ষু হবেই। তাই সে সুবাসীকে বিদায় করে না। তা ছাড়া সুবাসীকে ছাড়ব মনে করলেও মনটা কেমন করে। সুবাসী তাকে বোধ হয় গুণ কি বশীকরণ করেছে। সুবাসীর ছলা-কলা অদ্ভুত। তাই, সুবাসীই বুকে তার ছোবল মারবে—সন্দেহ ক'রেও সুবাসীকে কড়া নজরে রেখেছে, ছাড়ে নাই। করালী যখন সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা জমায়, তখন বনওয়ারী সুবাসীকে সামনে নিয়ে ঘরে ব'সে থাকে। প্রহ্লাদ রতন গুপী প্রভৃতি প্রবীণেরা আসে, পানাও আসে—মজলিস হয়। কিন্তু পাগলের অভাবে মজলিস জমে না। কে গান গাইবে, ছড়া কাটবে। পাগল আবার চ'লে গিয়েছে 'গেরাম' ছেড়ে। গিয়েছে গোপালীবালার শ্রাদ্ধের পরের দিনই। পাগলের জন্য দুঃখ হয় বনওয়ারীর। পাগলের অভাবে মজলিসে হয় শুধু কাজের কথা! সুবাসীর রমণকাকা তামাক সাজে। কেরোসিন নাই, বিনা আলোতে মজলিস, শুধু জলে একটা ধুনি। আঙারের শিখার লালচে ছাপ পড়ে সকলের মুখের উপর। নানা কথার মধ্যে চাষবাসের কথা এসে পড়ে।

চাষের কথা এলে বনওয়ারীর সংশয়, মনের ছমছমানি খানিকটা ঘুচে যায়। এবার দেবতা 'পিথিমী'র উপর সদয়। হাঁসুলী বাঁকের বাবাঠাকুরও নিশ্চয় সদয়, নইলে পিথিমীতে এত ধান কেন? পিথিমীর মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে আবার সবচেয়ে বেশি ধান। বাবাঠাকুর সদয় না হ'লে এমন হয় কখনও? মাঠভরা সবুজ ধানে কালো মেঘের ঘোর লেগেছে। এক-একটি ধানের ঝাড় দু হাতের মুঠোতে ধরা যায় না।

সকলেই বলে—হঁ্যা, এবারে বছরের মতন একটা বছর বটে।

পানা বলে—ব্যানোকাকার ভাগ্যের কথা বল একবার। সায়েবডাঙার জমিতে এবারেই কোদাল ঠেকালে, এবারেই দেখ কি ধানটা পায়!

বনওয়ারী মনে মনে কথাটা স্বীকার করে, কিন্তু মুখে বলে—ভাগ্যি আমার লয়, ভাগ্যি বাবু মশায়দের, যুদ্ধের বাজারে লাখো লাখো টাকা ঘর ঢুকছে আমি শুনেছি। তাদের জমির পাশে আমার জমি, তাতেই—লইলে দেখতিস অন্য রকম হ'ত।

রতন বলে—উটি বললে শুনব না ভাই। সায়েবডাঙায় তোমার ধানই সবচেয়ে জোর। তারপর স্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে বলে—হঁ্যা, জবর ধান হয়েছে, গোছা কি।

পানা হেসে বলে—কাকী, এবার কিন্তু নবানে আমাদিগে খাওয়াতে হবে। কথাটা বলে সুবাসীকে। হারামজাদা পানা কম নয়; ছোকরা হয়েও মাতব্বর সাজলে কি হবে, বয়সের বদমায়েশি যাবে কোথায়? কোন মতে সুবাসীর সঙ্গে দুটো বাক্য বলবার ফাঁক পেলে হয়! সুবাসীকে উত্তর দেবার সুযোগ দেয় না বনওয়ারী, তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে—আচ্ছা আচ্ছা, পিঠে এবার খাওয়াব।

সুবাসী হাসে, সে বুঝতে পারে বনওয়ারীর মনের কথা। হাসতে হাসতে উঠে যায়, মৃদুস্বরে ব'লে যায়—মরণ! কাকে যে বলে, সে কথা ঠিক বুঝতে পারে না কেউ।

রাত্রিবেলা জিজ্ঞাসা করে বনওয়ারী—কাকে বললি সে কথাটা?

—কোন্ কথা?

—সেই যি বললি 'মরণ'?

—নিজেকে, আবার কাকে?

—না!

—তবে তোমাকে।

—কেনে?

কেনে? সুবাসী তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে—তা তুমি বুঝতে পার না? এমনি বোকা তুমি লও। ওই মর্কট পানার সঙ্গে কথা বললে আমি ক্ষয়ে যেতাম নাকি?

বনওয়ারী একটু চুপ ক'রে থাকে, তারপর বলে—পানা যদি মর্কট না হ'ত, করালীর মত অমনি লম্বাচওড়া ফেশানদুরস্ত হ'ত তবে?

সুবাসী বনওয়ারীর মুখের দিকে সাপের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ঠিক সাপের মত। চোখ দুটোই শুধু চকচক করে, মুখের মধ্যে কোন ভাব ফোটে না।

বনওয়ারী প্রশ্ন করে—রা কাড়িস না যে ?

সুবাসী কথা না ব'লে উঠে চলে যায় বিছানা থেকে। দাওয়ায় গিয়ে ব'সে থাকে। বনওয়ারীও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকে উঠে গিয়ে সুবাসীকে তোষামোদ ক'রে ফিরিয়ে আনে। একলা ঘরের মধ্যে ভয় অনুভব করে সে। গোপালীবালা, কালোশশী। বেশি ভয় গোপালীকে। প্রথম পক্ষের পরিবার মরলে বিয়ের 'কুম্ কলসী' অর্থাৎ জলভরা ঘট কাঁখে নিয়ে ফেরে। স্বামীর মৃত্যু না হ'লে সে কলসী ফেলতে পায় না। ঠিক মৃত্যুর কিছুকাল আগে সেই কলসী সে ফেলে দেয়। শব্দ ওঠে। কোথাও কিছু পড়ে না, অথচ একটা শব্দ শোনা যায়। পাড়ায় এখন কারও বাড়িতে বাসন পড়ার কোন শব্দ উঠলেই বনওয়ারী চমকে ওঠে, কৌশল ক'রে খোঁজ নিয়ে আশ্বস্ত হয়। সুবাসীকে ছুঁয়ে শুয়ে থাকে। সুবাসী বড় চতুর। বনওয়ারীর মনের কথাটি ঠিক বুঝতে পারে। বলে—ভয় নাই, বড়কী কোণে দাঁড়িয়ে নাই, ঘুমোও। টুঁটি টিপে মারবে না তোমাকে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে, ঘুম আসে না তার। অকালে সে মরবে কেন ? তাকে বাঁচতে হবে। ভরাভর্তি সুখের সময় তার এখন। সে এখন পাঁচ পাঁচ বিঘা জমির মালিক। সে জমিতে প্রথম বছরেই প্রচুর ফসল হয়েছে। নতুন বিয়ে করেছে।

সে উঠে বসে। সুবাসীর নাকের কাছে হাতের তালু রেখে নিশ্বাস অনুভব করে। সুতোর মত কিছু বের হচ্ছে কি না পরীক্ষা করে।

অন্ধকার কাটলে সকালে আলো ফুটলে বনওয়ারী হয় বীর বনওয়ারী। ছুটে চলে সে মাঠের দিকে।

* * *

কত কাজ, কত কাজ !

বর্ষা কেটেছে, আকাশ হয়েছে নীলবরণ। মা-দুর্গার চালচিত্তিরের ছবির ফাঁকে নীল রঙের মত ঘোরালো নীল হয়ে উঠেছে। কার্তিকের বাহন ময়ূরের গলার মত ঝকমক করছে। হাঁসুলী বাঁকের মাঠে হাতীঠেলা ধান বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে, সূর্যঠাকুরের রোদ যেন দুধে ধোওয়া। কাহারপাড়ার মরদেরা ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষেতে ক্ষেতে। দেড় হাত দু হাত উঁচু ধানের জমির মধ্যে ডুব দিয়েছে, হাঁটু গেড়ে ব'সে বুনো দাঁতালের মত চ'লে বেড়াচ্ছে, আগাছা তুলে ভেঙে মুচড়ে পুঁতে দিচ্ছে মাটিতে, প'চে সার হবে।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে আজকাল ব্যাঘাত ঘটছে কাজে ; মাথার উপর দিয়ে বড় বড় ভীমরুলের ঝাঁকের মত গোঁ-গোঁ শব্দ ক'রে উড়ো-জাহাজের দল চ'লে যায় ; তখন হাতের কাজ ফেলে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দেখে। বনওয়ারী পর্যন্ত দেখে।

ওঃ, কাল যুদ্ধ রে বাবা ! ওদিকে চন্নপুরে আর সব বাবু মহাশয়দের 'গেরামে' শহরে লেগেছে গান্ধীরাজার কাণ্ডকারখানা। লাইন তুলছে, সরকারী ঘর দোর জ্বালাচ্ছে ; পুলিসমিলিটারিতে গুলি করছে, গুলি খেয়ে মরছে, তবু ভয়-ডর নাই।

চাল-ধানের দর হু-হু ক'রে বাড়ছে। বলছে—আরও বাড়বে। ধানের দর বাড়লে ভাবনা নাই। এবার ধান প্রচুর হবে। শুধু আশ্বিন মাসটা পার করতে পারলেই হয়। 'এক 'আচাল'

অর্থাৎ এক পশলা বেশ জোরালো জল হ'লেই বাস্, আর চাই কি! আধ হাতের চেয়েও লম্বা শীষ বেরিয়ে দিনে দিনে পরিপুষ্ট হ'য়ে পেকে মাটিতে আপনার ভারে শুয়ে পড়বে। এবার মনিবদের দেনাপত্র মিটিয়ে ধান ঘরে আনবে কাহারেরা। বনওয়ারীর ইচ্ছে আছে, করালীকে ডেকে দেখাবে, বলবে—দেখ্! কাহারপাড়ার আদি মা-লক্ষ্মীকে দেখে যা। আশা আছে, ছোঁড়ারা যতই চুলবুল করুক এবার হাঁসুলী বাঁকের মা-লক্ষ্মী মাটিকে সেবা করার রস বুঝিয়ে দেবেন তাদের। তবু খটকা লাগছে।

যুদ্ধ তো শুধু ধানের বাজারে আগুন ধরায় নাই। সব কিছুর বাজারে আগুন ধরিয়েছে! কাপড় মিলছে না,—কাপড়ের কথা মনে করতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী। গোপালীবালার শেষ কাজে সে কাপড় দিতে পারে নাই। কাহারপাড়ার মেয়েগুলি চিরদিনের বিলাসিনী, তারা ফুলপাড় কাপড় পরতে ভালবাসে। কিন্তু তারা ময়লা কাপড় প'রে বেড়াচ্ছে।

কেরোসিন নাই। চিনি তারা খায় না, তবু অসুখ-বিসুখে পুজো-পার্বণে দরকার হয়। 'নিউনাইন-বোডে'র কার্ডেও আর পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যায়, দেশেই নাই। এদিকে 'মালোয়ারী' আরম্ভ হয়েছে বেশ জোরের সঙ্গে, কিন্তু 'কুনিয়ন' পাওয়া যাচ্ছে না। শিউলিপাতার রস সম্বল। আশ্বিনের এই কটা দিন যেতে না যেতে পাড়ার শিউলিগাছের পাতা অর্ধেক শেষ হয়ে এল। এখন থেকে জ্বরের আরম্ভ;—পড়বে উঠবে, আবার পড়বে, দু'একজন মরবে বিকার হয়ে। বেশি মরবে শীতকালে। বুড়ো-ঠারাই মরবে বেশি। চিরকালই এই হয়ে আসছে। এবার ভয়—'কুনিয়ান' নাই। এরই মধ্যে পড়েছে পূজোর কাজ—পূজোর ভাবনা। মা-দশভূজা আসবেন বেটা-বেটী-বাহন নিয়ে, সিংহীর উপর চড়া মা-জননী, তার সমারোহ কত! দেশ করবে কলকল কলকল, ঢাক বাজবে, ঢোল বাজবে, সানাই বাজবে, কাঁসি বাজবে; নাচবে গাইবে, খাবে পরবে। সে মায়ের ঘরের ওই দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে বলবে—অক্ষে কর মা, বিপদে আপদে, অণে বনে, জলে মাটিতে অক্ষে কর। ধম্মে মতি দাও, লোভের হাত থেকে বাঁচাও; আমরা ক্ষুদ্দু মানুষ, আমরা দুই হাতে পূজা করছি, দূর থেকে তুমি পেসন্ন দৃষ্টিতে দেখ, তোমার দশ হাতে আমাদিগে দিয়ে যাও। আমাদের পাপ তাপ সব খণ্ডন কর মা!

দশহাতওয়ালা মেয়ে, সে কি কম! তার পুজো! ঘর দোর নিকুতে হবে। নতুন কাপড় চাই। টাকাপয়সার টানাটানি। গেরস্ত বাড়িতে পুরানো ধান ফুরিয়ে এল, নতুন ধানের দেরি আছে; এই সময়ে খরচের পালা। এবার ওই যুদ্ধের জন্যে বিপদ হয়েছে বেশি। মনিব মহাশয়েরা বেশি ধান দিতে চাচ্ছেন না। ধান বেঁধে রাখছেন। খোরাকির উপর বেশি ধান চিরকাল মনিবেরা এ সময়ে দিয়ে থাকেন। এবার বলছেন—না।

করালীর কথা এক এক সময় সত্যি ব'লে মনে হয়। নিজের গরজ ছাড়া ওরা কিছু বুঝবে না। ধান চালের দর দিন দিন বাড়ছে, সুতরাং কৃষাণদের ধান দেবে না। একেবারে বন্ধ করলে তারাও চাষ বন্ধ করবে—কাজেই পেটে খাবার মত দাও। কাপড় কিনতে হবে, পূজো আসছে—সে বিবেচনা করবে না। রতন কালই বলেছে—বনওয়ারী, আর বুঝি জাত রাখতে পারলাম না। মনিব তো ধানের কথায় তেড়ে মারতে এল। বলে, কাপড়? কাপড় হ'ল

কি না হ'ল দেখবার ভার আমার নয়! তারপর গালাগালের চরম। শ্যাষে গদাগদ মার।

রতনের মনিব হেদো মণ্ডল এমনিই গোঁয়ার। পানার মনিব পাকু মণ্ডল হাতে মারে না, কথায় মারে। ফুরুৎ-ফুরুৎ ক'রে হুঁকো টানে আর বলে—হু; হু; হু। 'হু'ই পুরে যায়, শেষকালে বার করে হিসেবের খাতা। বলে—বাকিতে তো পাহাড় হয়েছে। এর ওপর বেশী ধান? তা খাবার মত দিতে হবেই, দোব। বেশি দিতে ব'লো না বাবা, পারব না।

পানা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ছেলেছোকরারা বনওয়ারীকে বলছে—তোমার কথায় আমরা চাষে লেগেলি। এর উপায় কর তুমি।

আড়ালে গজগজ করছে—এর চেয়ে কারখানায় কাজ করলে বেঁচে যেতাম আমরা।

বনওয়ারী চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জাঙল আর চন্ননপুর যাচ্ছে। জাঙলে যাচ্ছে চাষী মহাশয়দের কাছে, বেশি ধান কিছু দিতেই হবে, আর দিতে হবে সারের দাদন। জমির জন্য সার দেবে কাহারেরা। টাকার দরের চেয়ে এক গাড়ি হিসেবে বেশিই দেবে। নিমরাজী হয়েছেন তাঁরা। আর চন্ননপুরে যাচ্ছে দোকানদারদের কাছে, পুজোর সময় কাপড়ের দাম কিছু কিছু বাকি রাখতে হবে। ধান উঠলেই পাই-পয়সা মিটিয়ে দেবে কাহারেরা। আমি দায়ী থাকছি।

দত্ত মহাশয় রাজী হয়েছেন। ধানের কারবারের সঙ্গে তাঁর কাপড়ের কারবারও আছে। বাকিটা টাকায় নেবেন না, নেবেন ধানে, পৌষ মাসে। তবে বলেছেন—এই বাজারদরে ধান দিতে হবে।

বনওয়ারী প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। দত্ত মহাশয় কি ক্ষেপে গেলেন। আশ্বিন মাসে ধানের দর বছরের মধ্যে চড়া থাকে, নতুন ধান উঠলেই ধানের দর নেমে যায়। সুতরাং—। হঠাৎ চড়াৎ ক'রে কথাটা মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছে তার; ধানের দর চ'ড়ে চলেছে—চ'ড়েই চলেছে, তা হ'লে নতুন ধান উঠলেও ধানের দর নামবে না!

চার টাকা সাড়ে চার টাকারও উপরে উঠবে ধানের দর? এ তো ভূ-ভারতে কেউ কখনও শোনে নাই! ন টাকা চালের মণ! হে বাবাঠাকুর, কালে কালে এ কি খেলা খেলছ বাবা! ওঃ! তার পাঁচ বিঘে জমির ধানে এবার খামার ভ'রে যাবে। বিঘেতে তিন বিশ ক'রে ফলন হ'লে পনেরো বিশ ধান। ভাগের জমিতে ধান হবে তার চেয়ে বেশি, অবশ্য ভাগ হবে মনিবের সঙ্গে; আঠারো-বাইশ ভাগ। চল্লিশ ভাগ করে মনিব পাবেন বাইশ ভাগ, বনওয়ারী পাবে আঠারো ভাগ। তাতেও মনিবের দেনা শোধ দিয়েও ফিরে পাবে সে পাঁচ সাত বিশ। এক এক বিশে দু মণ দশ সের ধান। হিসেব করতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায় বনওয়ারীর। বুড়ো রমণকে ডেকে বলে—অমনখুড়ো, হেসেবটা কর দিনি।

বুড়ো দিনরাত ব'সে তামাকই খাচ্ছে—ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ। কাজের মধ্যে গরুগুলিকে নিয়ে মাঠে যাওয়া। বাস্, তারপর কুটোটি ভেঙে উপকার করবে না। ভাত খায় এক কাঁড়ি।

বুড়ো বলে—হেসাব? তবেই তো মুশকিলে ফেলালে। আটপৌরেপাড়ার লোকে ধান-চালের কারবার কখনও করেছে? বস্তায় ভ'রে ধান চুরি ক'রে এনেছি, সামালদারের ঘরে ফেলেছি, ঠাউকো দাম দিয়েছে। সুবাসীকে বল বরং, উ পারবে, চাষী মাশায়দের বাড়িতে তিন-চার বছর ধান ভানানী ছিল।

সুবাসী হিসাব মন্দ করে না। পনেরো বিশ, বিশে দু মণ—তা হ'লে দু পনেরো মণ আর পনেরো দশ সের। আঙুল গুনে হিসেব করে। হিসেব শেষ ক'রে হঠাৎ পা ছড়িয়ে ব'সে হাসতে হাসতে বলে—এইবার আমি কাঁদব। হঁ্যা।

ভারি ভাল লাগে বনওয়ারীর। হেসে বলে—কেনে খুকুমণি, কাঁদবা কেনে? কি চাই?

—এবার পূজোতে আমি ভাল কাপড় লোব—খুব ভাল।

বনওয়ারীও রসিকতা করে—না খুকু, কেঁদো না। আমি নিচ্চয় কিনে দোব, নিচ্চয় দোব।

সুবাসী হিসাব করে আঙুল গুনে—আর পূজোতে আছে রাম-দুই-তিন-চার—

* * *

সে দিনগুলিও ফুরিয়ে এল।

নয়ানের মা আর সুচাঁদের কান্না শুনে বুঝতে পারা যায়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এই হ'ল নিয়ম। পিতিপুরুষেরা ব'লে গিয়েছেন পূজোতে পরবে, বিয়েতে-সাদীতে সুখের দিনে সুখের কথা মনে করতে হয়; যারা ছিল নাকি তোমার আপন জন, যারা তোমাকে ভালবাসত, তুমি যাদের ভালবাসতে, যারা আজ নাই, তাদের মনে ক'রে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলো। টাটকা যারা যায় তাদের কথা আপনিই মনে পড়ে, সে শুধু হাঁসুলী বাঁকে নয়—চন্ননপুর পর্যন্ত পৃথিবীসুদ্ধ লোকেরই মনে পড়ে—বুক-ফাটানো কত কথা কান্নার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে, চোখ ফেটে আপনি জল ঝ'রে বুক ভাসিয়ে দেয়। নয়ানের জন্য তার মায়ের কান্না সেই কান্না, গোটা কাহার-পাড়াটির পূজোর আনন্দ তাতে লজ্জা পাচ্ছে। নয়ানকে মনে ক'রে চোখের জলে তার জিভের বিষ আজ ধুয়ে গিয়েছে। কাঁদছে এই পূজো উপলক্ষ্য ক'রে, যে দিন থেকে সে নয়ানকে ডাকছে, সেই দিন থেকে আর কাউকে শাপশাপান্ত করে নাই সে।

সুচাঁদ কাঁদে সেই নিয়মের কান্না। উপকথার হাঁসুলী বাঁকের সে-ই যে আদ্যিকালের বুড়ী। সে তার বাপের জন্যে কাঁদে, ভাইয়ের জন্যে কাঁদে, স্বামীর জন্যে কাঁদে, জামাইয়ের জন্যে কাঁদে, তারপর একে একে কাহারপাড়ার যত মরা লোকের নাম ধ'রে কাঁদে আর পায়ের হাড়ে হাত বুলোয়, পায়ে তার বাতের 'বেথা' 'কনকন' করছে। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করে, আঃ, আমি মরলে আর কাহারপাড়ার এ নিয়ম কেউ মানবে না। কালে কালে 'ঘ্যাশঘাট' বদলে গেল, তার সঙ্গে গেল মানুষও অনাচারী অধর্মপরায়ণ হয়ে। কথার শেষে আক্ষেপ প্রকাশ ক'রে বলে—আঃ! আঃ! হায় হায় রে!

আরও বলে—বনওয়ারী আমার পাখীকে করালীকে তাড়ালে—ধরমনাশা কুলনাশা ব'লে। তা চোখ তো আছে, তাকিয়ে দেখুক—ধরমকে কে একেছে, কুলকে কে একেছে। তবে হঁ্যা, করালীর একটি ঘাট হয়েছে। একশো বার বলব, হাজার বার বলব—ঘাট হয়েছে বাবার বাহনটিকে পুড়িয়ে মারা। বার বার সে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করে সেই মৃত সাপটিকে। প্রণাম করতে করতে হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ ক'রে স্মরণ করে—'চিত্তবিচিত্ত' অর্থাৎ চিত্রবিচিত্র রূপ নিয়ে বাবা পূজোর দিনে ফিরে এস রে! বাঁশবনে শিস দিয়ে ঘুরে বেড়াও মনের সাধে, ব্যাঙ খাও ইঁদুর খাও বাবা রে! গাঁয়ের মঙ্গল কর রে!

বনওয়ারী বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।—জ্বালালে রে বাবা! বুড়ী মরেও না।

রতন বললে—উ অমুনি বটে।

—অমুনি বটে—অমুনি বটে! বলতে বলতে রতনের হাত থেকে হুঁকোটা কেড়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করে।

প্রহ্লাদ বলে—তা হ'লে চল একদিন উ-পায়ের মোষভহরী মউটোর।

হঠাৎ মাঠের জলের অভাব ঘটে। আশ্বিনের প্রথম থেকেই বৃষ্টি ধরেছে, ক্ষেতের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। অথচ আশ্বিন মাসে ধানের পেটে 'থোড়' হয়েছে, এখন কানায় কানায় ভরা জল চাই। পিতিপুরুষে ব'লে গিয়েছেন—একটি ধানের ঝাড় দিনে পাঁচ ঘড়া জল টানে; মাঠে এবার হাতী-ঠেলা ধান। এ ধান নষ্ট হ'লে কাহারেরা বুক ফেটে ম'রে যাবে। ষোল বছরের পুত্রসন্তান মরলেও এত দুঃখ হয় না। তাই কথা হচ্ছে কোপাইয়ের বাঁধ বাঁধবার। কোপাইয়ের বুকে বাঁধ দিয়ে, কোপাইয়ের জলে মাঠ ভাসিয়ে দিতে হবে জাঙলের মনিবেরা হুকুম দিয়েছেন। সেই বাঁধের কথা হচ্ছে।

বনওয়ারী অনেক কথা ভাবছে। বাঁধ বাঁধতে গেলেই দু-চারজন যাবে। বাঁধ বাঁধতে জলের ধাক্কায় যাবে, তার উপর আছে দাঙ্গা। বাঁধ বাঁধতে গেলেই নদীর নীচে লোকেরা ফৌজদারি করতে আসবে। আসবে শেখেদের দল। এ সব ছাড়া, করালী নাকি বলেছে—মিলিটারিতে বাঁধ বাঁধতে দেবে না। তারা উড়ো জাহাজের আস্তানা করেছে, চন্ননপুরে ঘাটের খানিকটা তফাতে—সেখানে 'পাম্পু' বসিয়ে জল তুলছে। চান করে, উড়োজাহাজ ধোওয়া-মোছা হয়, রান্না-বান্নার বেবাক জল ওই কোপাই থেকে ওঠে। তারা নাকি বাঁধ বাঁধতে দেবে না।

বনওয়ারীর ধারণা—করালীই লাগান-ভজান ক'রে এইটি করিয়েছে। মনিবেরা বলেছেন—নাঃ। ও-বেটার সাধ্যি কি! তাঁরা গালাগাল দিচ্ছেন যুদ্ধকে আর সায়েব মহাশয়দিগে। তাঁরা বলছেন তাঁরা সায়েবদের কাছে যাবেন। কাহারদের উয্যুগ করতে বলেছেন। আর বলেছেন—পূজোটাও দেখ, মা এবার গজে আসছেন।

বনওয়ারী বললে—আমি বলি অতন, পূজোটা যাক। গজে আসবেন মা। দু-এক আচাল ছিটোবে না গজে? তা'পরে ধর—মোষ পাঁঠা খাবেন মা, মুখ ধুতেও তো হবে।

ষষ্ঠীর দিন উৎফুল্ল হয়ে উঠল কাহারেরা। এসেছে—এসেছে। মেঘ এসেছে।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। 'আউলি-বাউলি' অর্থাৎ এলোমেলো বাতাস বইছে। মধ্যে মধ্যে ফিন্ ফিন্ ক'রে বৃষ্টি যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেসে আসছে।

বনওয়ারী উৎসাহভরে কাহারদের বললে—চল্, কাপড় আনিগা চল্। আকাশে মেঘ উঠেছে, দত্ত মশায় নির্ভাবনায় কাপড় দেবে।

নসুবালা নতুন শাড়ি প'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হা-হা ক'রে হাসছে। বলছে—আমাদের কি মাঠের পয়সা? আমাদের পয়সা কলির কারখানার। ঝম্-ঝম্-ঝম্—নগদ নগদ। আমাদের কাপড় সম সম কালে নয়, আগে-ভাগে।

যাবার আগে সুবাসী বললে—আমি কিন্তু পাখীর মত কাপড় লোব।

বনওয়ারীর মাথায় যেন রক্ত চ'ড়ে গেল।—কার মতন ?

—পাখীর মতন।

—কেনে, কেনে, কেনে ? পাখীর মতন কেনে ?

অবাক হয়ে গেল সুবাসী। কয়েক মুহূর্ত সে স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। বনওয়ারী দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে—গোসা-ঘরে খিল দিলেন মানিনী। তিন লাথিতে দোব গতর ভেঙে। ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে সে চ'লে গেল। থাক, বন্ধ হয়েই থাক।

দোকানে গিয়ে কিন্তু সবচেয়ে ভাল শাড়িখানি কিনলে। তাতে কিছু বেশি ধার হয়ে গেল দোকানে। দত্ত মশায় পর্যন্ত রসিকতা করলেন। রতন প্রহ্লাদ হাসতে লাগল। ছেলেছোকরারা গোপনে পরস্পরের গা টিপে হাসলে। তা হাসুক। মনে মনে একটু লজ্জা হ'ল। দোকান থেকে বেরিয়ে আবার ফিরতে হ'ল। কত্তাবাবার পুজো আছে দশমীর দিন। বিজয়া-দশমীর দিন বলি হবে, পুজো হবে। তার কাপড় কিনতে হবে। মনে মনে আপসোস হ'ল—বাবার কাপড় কিনতে ভুল হয়েছিল তার। ছি! ছি! ছি!

এমন কাপড়ও কিন্তু সুবাসী হাসি মুখে নিলে না। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে তার মান ভাঙিয়ে বনওয়ারীকে শেষ স্বীকার করতে হ'ল—কাল সকালে উঠেই সে চন্নপুরে গিয়ে উড়ো-জাহাজ-পেড়ে 'অঙিন' কাপড় এনে দেবে পাখীর মতন।

হায় রে কপাল, কাপড়ের পাড়েও এল উড়োজাহাজ!

এবার সুবাসী আড়চোখে চেয়ে হেসে বললে—হুঁ। কাপড়খানা প'রে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব।

বনওয়ারী হাসলে। দুঃখও হয়, হাসিও পায়। সুবাসী এসে তার গলা জড়িয়ে ধরলে এবার। খিলখিল ক'রে হেসে বললে—একা যাব না, তোমাকে সমেত নিয়ে যাব পরীর মতন পিঠে ক'রে।

ভোরবেলায় সুবাসীই তাকে ঠেলে তুলে দিলে। পুজোর ঘট ভরতে যাবার আগেই তার কাপড় চাই। কিন্তু —এ কি ?

আকাশে ঘোর ঘনঘটা। বাতাস বইছে মাতালের মত। শব্দ করছে বুনো দাঁতালের মত। এঃ, দুর্যোগ হবে—বাদলা নামবে। আশ্বিনের শেষ, ধানের মুখে মুখে শিষ। যদি ঝড় হয়। মাথাভারি ধানগাছগুলিকে যদি ঝাপটায় মাঝখানে ভেঙে শুইয়ে জলে ডুবিয়ে দেয়, তবে সর্বনাশ হয়ে যাবে। হে বাবাঠাকুর। যদি আশ্বিনের সেই সর্বনাশা ঝড়ই হয়, তবে বাবাঠাকুর, একবার তুমি আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াও, বাঁশবাঁদির বাঁশের বেড়ে পিঠ দাও, বড় বড় বট পাকুড় শিমুল শিরীষের গাছগুলিকে ঠেলে ধর হাত দিয়ে। মিষ্টি হাসি হেসে অভয় দিয়ে কাহার-দের বল—ভয় নাই, আমি ধরেছি শক্ত ক'রে গাছপালার আড়াল, ঝড় উড়ে যাক মাথার উপর দিয়ে, রক্ষা হোক কাহারপাড়ার মনিষ্যিকুল, রক্ষা পাক গরু বাছুর ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী কীট-পতঙ্গ, সোজা দাঁড়িয়ে থাক মাঠের গলগলে-থোড়ভরা ধান—কাহারদের লক্ষ্মী। হে বাবাঠাকুর! শুধু বনওয়ারী নয়, গোটা কাহারপাড়া দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল—'দয়' বাবাঠাকুর।

অর্থাৎ দোহাই বাবাঠাকুর!

ঝড় বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গাছের মাথা যেন আছাড় খাচ্ছে, বাঁশের ঝাড়ে বাঁশ উপড়ে পড়ছে, কোপাইয়ের জলে তুফান উঠছে, মধ্যে মধ্যে দুটো একটা পাখী ঝাপটায় আছাড় খেয়ে এসে পড়ছে উঠানে-দাওয়ায়। যে পিথিমীর বুকে সদাই বাজে পঞ্চ শব্দের বাদ্য, সে পৃথিবীতে ঝড়ের গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। দশপূজার পূজা, চারিদিকে উঠবার আগে ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা শাঁখের শব্দ, তার জায়গায় শুধু শব্দ হচ্ছে—গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ, ঝড় গোঙাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে মড়-মড়-মড়-মড়, তারপরই উঠছে প্রকাণ্ড একটা শব্দ। গাছ ভেঙে পড়ছে।

হে বাবাঠাকুর!

এর মধ্যে কে যেন চীৎকার ক'রে বলছে! কে কি বলছে? কার কি হ'ল? সুবাসী ঝপ ক'রে দাওয়া থেকে নেমে পড়ল। বনওয়ারী এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ভাবছিল, সে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—নামিস না, নামিস না।

সুবাসী বললে—সেই ডাকাবুকো। লইলে আর এত সাহস কার হবে?

—কে?

—ওই যে, নাম করলে তুমি আগ করবা। এই ঝড়ের মধ্যেও সুবাসী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল। বনওয়ারী কঠিন বিরক্তিতে নেমে এল দাওয়া থেকে।

—ঝড় এসেছে। পে—ল—য় ঝড় আসছে, 'সাইকোলন' 'সাইকোলন'—কলকাতা থেকে চন্নপুরের ইষ্টিশানে তার এসেছে। ঘর থেকে কেউ বেরিয়ো না। খবরদার! গায়ে একটা তেরপলের লম্বা জামা আর মাথায় টুপি প'রে হেঁকে বেড়াচ্ছে করালী।

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল—হে বাবা, কত্তাবাবা!

করালী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে—বাবাঠাকুরের ডিঙে উল্টাল্ছে। বেলগাছ উপড়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে—দেখ্ গা। চেঁচাস না বেশি। ঘরে যা।

বনওয়ারী আতঙ্কে চমকে উঠল।

সুবাসী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। সুচাঁদ ঝড়ের বেগে পা পিছলে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গিয়েছে।

বনওয়ারী তার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে। সুবাসী তখন আরও হাসতে লাগল। বনওয়ারী ছুটল সেই ঝড়ের মধ্যেই বাবাঠাকুরের থানের দিকে।

বেলগাছটা সত্যই আবার উপড়ে পড়ে রয়েছে। গাঁথুনিটা দু ভাগ হয়ে ফেটে গিয়েছে। বনওয়ারীর সর্বশরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। শেষ পর্যন্ত বাবাঠাকুরের গাছ উপড়ে পড়ল! নিশ্চয় আর বাবাঠাকুর নাই; হাঁসুলী বাঁকের দেবতা, উপকথার বিধাতাপুরুষ চ'লে গিয়েছেন। তবে আর কি রইল তাদের? দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে আর দাঁড়াতে পারলে না বনওয়ারী, ব'সে পড়ল; কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে বাড়ির দিকে।

নয়ানের মা এই ঝড়ের মধ্যে ছেলের জন্যে কান্না ভুলে গিয়েছে, গায়ে কাপড় জড়িয়ে—ঝড়-

বাদলের আরামে—অলসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে পরমানন্দে বলছে—আরও জোরে বাবা, আরও জোরে। ভেঙে চুরে উপড়ে সব সমান করে দাও। হে বাবা!

ঝড়—ঝড়—ঝড়! গোঁ—গোঁ—গোঁ! দেওয়াল পড়ছে, গাছ পড়ছে, বাঁশ পড়ছে। জলের ঝাপটায় সব ঝাপ্‌সা। হুড়-হুড় শব্দে জলের স্রোত ব'য়ে চলেছে, কোপাই ফুলে ফুলে উঠছে, নীলবাঁধের মোহনা ভেঙেছে, গোটা হাঁসুলী বাঁকের মাঠ ঘোলা জলে থৈ-থৈ করছে, এবারে সেই হাতী-ঠেলা সবুজ-বরণ মন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো প্রাণ-মাতানো মাঠ-ভরা ধান জলে ডুবে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে জলের উপরে সবুজ পাতা ভেসে উঠছে, যেন হাত বাড়িয়ে ডাকছে ডুববার আগে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু মা-লক্ষ্মীকে কে তুলবে হাতে ধ'রে? বাবাঠাকুর নাই, কে তুলবে দেবকন্যেকে!

আট

তিন দিনের দিন প্রলয় ঝড় শেষ হ'ল। তবু কাহারেরা বাঁচল। চিরকাল বাঁচে। দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা ঝড় কতবার হয়েছে, কাহারেরা মরতে মরতেও বেঁচেছে। এবারও ঝড়ে কয়েকজন মরেছে, ঘায়েল হয়েছে কয়েকজন; সুচাঁদপিসী পা ভেঙে প'ড়ে আছে হাসপাতালে—করালী তাকে হাসপাতালে দিয়েছে। নয়ানের মায়ের হয়েছিল কঠিন অসুখ। কোন রকমে সেরে উঠেছে। বনওয়ারীই তাকে এক মুঠো ক'রে ভাত দিচ্ছে। ঘর দোর গিয়েছে, মাঠভরা ফসল বরবাদ হয়েছে, ফসলের শিষে ধান নাই, তুষ হয়েছে শুধু, শাঁস নাই—খোসা, শুধু খোসা ধরেছে। গাছ-পালা ডাল ভেঙে ন্যাড়া হয়েছে। বাঁশগুলো শুয়ে পড়েছে। গরু বাছুর ছাগল মরেছে। হাঁস ভেসে গিয়েছে জলের স্রোতে। এর পরেও যারা বেঁচে রয়েছে, তারা ভাবছে—তাদের বাঁচাবে কে? বাবাঠাকুর নাই, কে তাদের রক্ষা করবে?

বনওয়ারী চেষ্টা করছে। উল্টে পড়া গাছটিকে আবার খাড়া ক'রে গোড়াটা নতুন পাকা মসলা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে। খুব একটা বড় পুজোও দিলে। ফিরে এস বাবা, ফিরে এস।

ওদিকে হাঁ-হাঁ ক'রে এগিয়ে আসছে পেটের ভাবনা। মাঠের ধান তুষ হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া সে-তুষ গরু-বাছুরেও খেতে পারবে না। ধানের দর হয়েছে চার টাকা থেকে আট টাকা—চালের মণ ষোল টাকা! ভূ-ভারতে কেউ কখনও শোনে নাই এ কথা, মুনি ঋষিতে ভাবে নাই, পুরাণেও 'নেকা' নাই। যুদ্ধে নাকি খেয়ে নিচ্ছে সব। মনিবেরা লাফাচ্ছেন, ধান বিক্রি ক'রে টাকা করবেন। কৃষাণদের ধান দেবেন ব'লে মনে লাগছে না। শুধু তাগাদা দিচ্ছেন—তুষ হোক আর যাই হোক, ধান কেটে ফেল।

বুঝতে পারে বনওয়ারী তাঁদের 'রবিপ্রায়টি' অর্থাৎ অভিপ্রায়টি। ধান কাটলে খড় ঘরে উঠবে। খড়ের দরও চরমে উঠেছে ধানের মতই। চল্লিশ টাকা কাহন বিক্রি হচ্ছে, শেষ তক একশো দুশো টাকা পর্যন্ত উঠবে। বড় ষোল আনাই পাবেন মনিবেরা। কাহারদের শুধু তুষের ভাগ নিয়ে ঘর ঢুকতে হবে। যুদ্ধে তুষ খায় না?—রতন প্রহ্লাদ এরা সেই প্রশ্ন করে।

বনওয়ারীর কিছু প্রত্যাশা আছে। সায়েবডাঙার পাঁচ বিঘে নতুন বন্দোবস্ত নেওয়া জমির খড়টা পাবে। ভাগের জমিরও খড় কিছু পাবে। সায়েবডাঙা উঁচু মাঠের জমি, ওখানকার ধানও সমতল নীচু মাঠের মত জলে ডোবে নাই, ওখানে কিছু ধান পাবে সে। কিছু কেন, ভালই পাবে। কিন্তু অন্য কাহারেরা কি করবে?

পাশাপাশি জমিতে ধান কাটতে কাটতে রতন বনওয়ারীকে প্রশ্ন করলে। তখন কার্তিক শেষ হয়েছে, অগ্রহায়ণের প্রথম। এবার ওই জল-ঝড়ের জন্য শীত এরই মধ্যে ঘন হয়ে উঠেছে, তারপর ক্ষেতে ক্ষেতে এখনও সেই জলস্রোত বয়ে চলেছে; গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবে যাচ্ছে। মাথা কনকন করছে, নাকে টস-টস জল ঝরছে।

—কি হবে বল্ দিনি বনওয়ারী? খাব কি?

বনওয়ারী প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলে না। নিত্যই এই প্রশ্ন তার কাছে করছে পাড়ার লোক। কিন্তু বনওয়ারী তার কি উত্তর দেবে? আশ্বিনের প্রলয় ঝড়ে সব তছনছ ক'রে দিয়ে গেল।

হঠাৎ ছুটে এল প্রহ্লাদের সেই দিগম্বর ছেলেটা—ওগো, মাতব্বর গো, এ-ই মেলা সায়েব গো! মটর-গাড়ি গো!

—মেলা সায়েব?

—হঁ্যা গো, সাথে করালী রইছে।

—কোথা রে?

—জাঙলে। কালারুদ্দুতলায়।

—কালারুদ্দুতলায়?

—হঁ্যা। কালারুদ্দুর পাট-আগনেতে তাঁবু ফেলছে। আপিস হবে।

—আপিস হবে? হে ভগবান।

—যাবা না কি? বানো?—রতন প্রশ্ন করলে।

—যাব বইকি। চল, দেখি। কি নতুন ঢেউ এল?

কালারুদ্রের বাঁধানো অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। দশ বারো জন সাহেব। এরা ঠিক করালীর 'ম্যান' নয়। করালী বার বার সেলাম করছে তাদের।

বড় ঘোষও দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁরই বাড়িতে সায়েবেরা গিয়ে বসলেন। বনওয়ারী চুপি চুপি বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রশ্ন করলে বড় গিন্নীকে—কি বেপার ঠাকরুন?

—কালারুদ্দুতলায় যুদ্ধের আপিসের তাঁবু, পড়ছে দেওর।

—কালারুদ্দুতলায় যুদ্ধের আপিসের তাঁবু?

—যুদ্ধের আপিসের নয়। ঠিকাদারের তাঁবু, বাঁশ কিনবে, কাঠ কিনবে—

—বাঁশ, কাঠ? যুদ্ধে বাঁশ কাঠ লাগে?

মাইতো গিন্নী হেসে বললেন—দেওর, তোমার চটকদার দ্বিতীয় পক্ষটিকে সাবধান ক'রো হে। গাছ কাটতে এসে লতা ধ'রে না টান মারে।

বনওয়ারী চমকে উঠল। গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই বাড়ি ফিরিল। সত্যই সুবাসীকে

সাবধান। কাল যুদ্ধ! কাল যুদ্ধ!

আরও দিন চারেক পর। মাঠে ধান কাটতে কাটতে যুদ্ধের কথাই বলছিল সে রতনকে প্রহ্লাদকে।

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক উড়ো-জাহাজ যাচ্ছিল—সেই দিকে তাকিয়ে বনওয়ারী কথা বলছিল। পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধে, কতবার বেধেছে, শহরে দাঙ্গা হয়েছে, হৈ-চৈ কলরব হয়েছে, তাতে হাঁসুলী বাঁকের কিছু আসে যায় নাই। শোনা যায়, বড় বড় ভূমিকম্পে শহর ভেঙেছে, হাঁসুলীর বাঁকের ছোটখাটো ঘরগুলির তাতেও কিছু হয় নাই। ছোট বাচ্চার মত মায়ের বুক দু'হাতে আঁকড়ে, পৃথিবীর দোলনের সঙ্গে খানিকটা দুলে দিব্যি বেঁচেছে। যুদ্ধ এবার কালারুদ্রের শাসন ভেঙে বাঁশবাদিতে ঢুকল। ঘরে ঘরে টান দিচ্ছে। ঢুকিয়েছে করালী। পাপ করালীর কর্মদোষে দেবতারা বিমুখ হয়েছেন। দেবতাদের ক্ষমারও একটা সীমা আছে। বাবা কালারুদ্দুও এইবার অন্তর্ধান হবেন। কালারুদ্দুর মন্দিরও ভেঙে এসেছে, তার উপর উঠানে পড়ল যুদ্ধের ঠিকাদারবাবুদের তাঁবু। চন্নপুর থেকে বাঁশবাদির মুখ পর্যন্ত পাকা রাস্তা হচ্ছে, মোটর আসবে। আর বাকি কি রইল? পাকা রাস্তা ধ'রে মোটর চ'ড়ে যুদ্ধ আসছেন হাঁসুলী বাঁকে। কাঠ—বাঁশ—সব চাই তাঁর! হে ভগবান হরি! যুদ্ধে কি না খায়? বাঁশ-কাঠও খায়? শোনা যাচ্ছে গরু ছাগল ভেড়া ডিম এ সবও নাকি চালান যাবে। ওই যে চন্নপুরের পাশে উড়ো-জাহাজের আস্তানা, ওখানে দৈনিক একপাল গরু ছাগল ভেড়া মুরগী হাঁস লাগবে, ডিম লাগবে ঝুড়ি ঝুড়ি। তাতে অবশ্য কাহারদের কিছু লাভ হবে। ছাগল ভেড়া ডিমের দাম এরই মধ্যে অনেক বেড়েছে, আরও বাড়বে, দু পয়সা ঘরে আসবে। গরু তারা কখনও বেচে না কসাইকে, বেচবেও না। বনওয়ারী তা বেচতে দেবে না। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, রাখতে কি পারবে? কি হবে?

রতন আবার প্রশ্ন করে—বনওয়ারী?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী বললে—কি বলব অতন? অদেষ্টের হাল-হদিস কি আছে, তা বল্? নেকনে যা আছে তাই হবে।

– তোমাকে ভাই একটা কথা বলি নাই, তিন ছোঁড়া বউ নিয়ে পালাল্ছে—। নারদ, নোঁদা আর তোমার গিয়ে বেঁকা।

—পালাল্ছে? কোথায়?

—কে জানে ভাই, জিনিসপত্ত নিয়ে ভোর এতে পালাল্ছে। কাল সন্‌জেবেলায় এসে বলছিল—মনিবের ধান মনিব কেটে নিক, আমি ধানও কাটব না, ভাগও লোব না।

—তা বললে হবে কেনে? ই যে মহা অল্যায় কথা। আমরাই দায়িক এর জন্যে।

—অল্যায় তো বটে। কিন্তু আমরা কি বলব বল?

—তোমরা বারণ করলে না?

—বারণ! বারণ করলে শুনছে কে বল? তুমি তো বারণ করেছ। শুনলে?

খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল বনওয়ারী—শুনছে না। যে শুনছে না, সে চ'লে যাক। কিন্তু তোমরা? তোমরা কাল সন্‌জেতে যখন জেনেছিলে, তখন আমাকে বল নাই কেন দেখি?

—চ'লে যাবে বলছিল সব, তা আতাআতিই চ'লে যাবে, সে কি ক'রে জানব বল? তা ছাড়া আত তখন অ্যানেক। তুমি শুয়েছ! এতে ডাকলে তুমি আগ কর।

কথাটার মধ্যে একটু রসিকতা আছে। রাত্রে ডাকলে বনওয়ারী রাগ করে—এ কথার পিছনে তরুণী সুবাসীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত রয়েছে। কথাটা কিন্তু অর্ধসত্য। সুবাসীর উপর বনওয়ারীর সেই অবধি প্রখর দৃষ্টি, এবং তরুণী স্ত্রীর প্রতি আসক্তির কথা মিথ্যা নয়; কিন্তু আরও খানিকটা আছে, কালোবউ আর বড় বউয়ের প্রেতাত্মার শঙ্কায় রাত্রে সে উঠতে চায় না। কেউ ডাকলে কি বাইরে শব্দ হ'লে সে চীৎকার ক'রে প্রশ্ন করে—কে? কে?

বনওয়ারী ক্রুদ্ধ হয়েই জবাব দিল—কবে? কবে? কবে আগ করেছি রে শালো? কবে?

গাল খেয়ে রতন বিস্মিত হ'ল। বনওয়ারী তাকে গাল দিলে?

বনওয়ারী ঘস ঘস ক'রে ধান কেটে যেতে লাগল। এ ধরনের ব্যাপারটার সাড়া সে আবছা আবছা পেয়েছিল, কিন্তু এতটা বুঝতে পারে নাই। অভাবের কথা উঠলে সকলেই মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে চন্ননপুরের কারখানার টিনের ছাউনিগুলির দিকে, মা-কোপাইয়ের পুল বন্ধনের দিকে, লাইনের উপর পোঁতা সিগনালের হাতার দিকে, রাত্রে চেয়ে দেখে লাল নীল আলোর দিকে, এ কথা সে জানে। কিন্তু এমন হবে সে ভাবে নাই। মানুষ সব বেচে খায়, ধরম বেচে কেউ খায় না। বনওয়ারী সেই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল। গোপনে যে এমন ফাটল দেখা দিয়েছে তা বুঝতে পারে নাই। ফাটল ধরেছে, এইবার ধ্বস ছাড়বে। করালী! করালীর সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করতে হয়েছে। হয় সে-ই থাকবে, নয় বনওয়ারী থাকবে হাঁসুলীর বাঁকে। বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় ঝাঁকি দিলে বার কয়েক। তারপর নীরবেই আবার হেঁট হয়ে ঘস-ঘস ক'রে ধান কেটে চলল।

রতনও দাঁড়িয়েই রইল, সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। গতকাল রতনের মনিব হেদো মণ্ডল রতনকে খুব প্রহার করেছেন—অন্যায় ক'রে প্রহার করেছেন। রতনের একটা বাঁশঝাড়কে অন্যায় ভাবে নিজের ব'লে দাবি করায় রতন তার প্রতিবাদ করেছিল, সেইজন্য প্রহার করেছেন। মুখ বুজে প্রহার আর সহ্য হচ্ছে না রতনের। অনেক ঋণও রয়েছে তাঁর কাছে। ধানের ভাগও সে নেবে না, ঋণও সে শোধ করতে পারবে না। চ'লে যাবে চন্ননপুর। সে বনওয়ারীকে বললে—তু আমাকে গাল দিলি কেনে?

বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—গাল কি তোকে দিলাম? দিলাম তোর করণকে। তা তুও আমাকে দে কেনে গাল। আমি একবার বলেছি, তু তিনবার বল্—শালো—শালো—শালো!

বনওয়ারী ধান কাটা বন্ধ ক'রে তামাক সাজতে বসল। বাঁশের চোঙার মধ্যে থেকে তামাক, খড়ের নুটি, চকমকি, শোলা বার করলে। বললে—আয়, বস্। তামাক খাই।

আলের উপর ব'সে রৌদ্রে ভিজে পা শুকিয়ে বেশ খানিকটা আরাম বোধ করলে। রতন বললে—আঃ! গায়ে সান হ'ল এতক্ষণে।

—লে, খা! হুঁকাটি এগিয়ে দিলে বনওয়ারী। তারপর বললে—আগ কি সাধে হয় অতন!

অনেক দুঃখেই হয়। 'সব বেচে সবাই খায়, ধম্ম বেচে কেউ খায় না'। 'ধম্মপথে থাকলে আদেক এতে ভাত'। তা কলিকালে কেউ বুঝবে না—সব অধম্মের জন্যে, বুল্লি, সব পাপের জন্যে। কলিকালটাই অধম্মের কাল।

রতন হঠাৎ এক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ক'রে বসল—আচ্ছা, জাঙলের মণ্ডল মাশায়রা বলাবলি করছিল কলিকালের নাকি শ্যাষ—এইবারেই শ্যাষ?

বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে বললে—মাইতো ঘোষ বই এনেছে একটা 'চেতামুনি'।

—কি মুনি?

—চেতামুনি। মুনি বলছেন—এইবারেই কলির শ্যাষ।

—কি হবে? সব একেবারে লণ্ডভণ্ড ওলোট-পালোট তছনছ হেঁট-ওপর পুড়ে-ঝুড়ে হেজে-মেজে শ্যাষ নাকি?

—তাও হতে পারে। আবার ধর, আকাশ একেবারে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে সব চেপটিয়ে দেবে—চুরমার ক'রে দেবে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় প্রলয়ের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে পুরানো—আদিম কালের কল্পনা। এবং এইটির চেয়ে কোনটিকেই আজ কলিশেষের উপযুক্ত সংঘটন এবং মহত্তর আধ্যাত্মিক ব'লে মনে হচ্ছে না। বনওয়ারীর মুখে এমনই কিছু শুনতে চেয়েছিল রতন।

বনওয়ারী বললে—লক্ষণ তো সবই দেখা দিয়েছে। এই কি কার্তিক আগন মাসের হাঁসুলী বাঁক? কোথাও কোন চেহ্নৎ আছে?

কথা সত্য। কার্তিক-অগ্রহায়ণে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পলেনের মাঠের রঙ হয় সোনার বরণ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস; পাকা ধানের গন্ধে ভুরভুর করে। গোবিন্দভোগ বাদশাভোগ কনকচুর রামশাল সিঁদুরমুখী নয়ানকল্মা—কত রকম ধানের বাস! এক-এক ধানের এক-এক সুবাস, সকল সুবাসে মিলে সে এক সুমধুর বাস। সোনার বরণ ধান-ভরা মাঠের বুকে বেড় দিয়ে কাচ-বরণ জল রূপার হাঁসুলী টলমল—কোপাই নদীর বাঁক। কূলে পাকা কাশগুলির ডাঁটায় পাতায় সোনালী রঙের একটি পাড়। পুকুরে পুকুরে পদ্মগুলি শুকাতে শুরু করলেও পুরো ঝরে না, অল্পস্বল্প গন্ধও থাকে। খালে নালায় ঝিরঝিরে ধারা জল বয়, রূপার কুচির মত ছোট ছোট মাছ ঝাঁক বেঁধে নেমে চলে নদীর সন্ধানে। আউশের মাঠে আউশ-ধান উঠে গিয়ে রবি ফসলের সবুজে ভ'রে ওঠে। গম, কলাই, আলু, যব, সরষে, মসনে, তিষির অঙ্কুর-রোমাঞ্চ দেখা যায়। হিলহিলে বাঁশবনের মাথা উত্তরে বাতাসে দুলতে থাকে, কঁ্যা-কঁ্যা—কট-কট শব্দে, কখনও বা বাঁশীর মত সুর তুলে। আকাশে উড়ে নেচে বেড়ায় নতুন পাখীর দল। বালিহাঁসেরা উড়ে আসে উত্তর থেকে, সবুজবরণ টিয়াপাখীর ঝাঁক আসে পশ্চিম থেকে, কল-কল কলরবে আকাশ যেন নাচনে মেতে-ওঠা ছেলেমেয়েভরা পূজাতলার আঙিনা হয়ে ওঠে। পাখীর দল রাত্রিবেলা মাঠে নেমে ধান খায়, দিনের বেলা আকাশে ওড়ে, গাছে বসে, কলকল ক'রে বেড়ায়। দুপুরে রোদ চনচন করে, রাত্তিবেলা গা সিরসির করে।

এবার মাঠ এখনও জলে ভরা, শীত এরই মধ্যে কনকনে হয়ে পড়েছে। রোদের তেজ নাই।

পাখীরা এসেছে, কিন্তু কেউ থাকছে না, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে চলে যাচ্ছে। ধান নাই, থাকবে কেন ? ছেলের দলের মত মাঠলক্ষীর দরবারে প্রসাদ পেতে আসে,—লক্ষী নাই, প্রসাদ নাই, কাজেই চ'লে যাচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে। আউশের মাঠ এখনও জবজব করছে, পা দিলে পা ব'সে যায়, কাজেই মাঠে রবি ফসলের নাম নাই, মাঠ খাঁ-খাঁ করছে, কেমন এক কালচে বর্ণ ধরেছে। বাঁশবন —সেই আদ্যিকালের বাঁশবন, দুলবে কি,শুয়ে পড়েছে উপুড় হয়ে। 'নালাখালায়' এখনও ভরাভর্তি ঘোলাটে জল বইছে হুড় হুড় ক'রে, পুকুরে পদ্ম নির্মূল, সেই প্রলয় জলে পুকুর ভ'রে ডুবে হেজে প'চে গিয়েছে। কাশ বলতে একটি নাই। ঝড়ে বানে শেষ হয়ে গিয়েছে। সকল দুঃখের সেরা দুঃখ, বলতেও গলা ভেরে যায়, চোখ ভ'রে জল আসে, মাঠ-ভরা ধান খড় হয়ে গিয়েছে, সোনার অঙ্গে ঘোলাটে জলের ছোপ লেগে ধুলোকাদামাখা ভিখারিণীর মত নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন। চেতামুনি বলেছে—কলির শেষ। তা মুনি-ঋষির কথা কি মিথ্যা হয় ? লক্ষণ দেখা গিয়েছে।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—অতন্, তা যদি না হবেন, তবে বাবাঠাকুর চ'লে যাবেন কেনে ?

রতন চাইলে আকাশের পানে। কোথায় কি শব্দ হচ্ছে।

কাহারপাড়ার আকাশময় ডুগডুগ শব্দ উঠছে।

চমকে উঠল রতন বনওয়ারী দুজনেই। ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ শব্দে ঢেঁড়া পড়ছে। কি ব্যাপার ? কাহারপাড়াতেই যেন ঢেঁড়া পড়ছে। যেন কেন—নির্ভুল, কাহারপাড়াতেই। কিসের ঢেঁড়া ? গ্রামের দিকে তারা ছুটে গেল।

ঢেঁড়া দিচ্ছেন চন্নপুরের বড়বাবুরা।

সায়েবডাঙার জমি যারা ভেঙেছিল, তারা যেন এবার ধান কেটে বাবুদের খামারে তোলে। খাজনা নেবেন না বাবুরা, ধানের ভাগ নেবেন। সেলামী দিয়ে যারা জমি নিয়েছে, তাদের কথা বাদ। তার মানে জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়েরা, তাঁরা সেলামী দিয়ে পাকা দলিল ক'রে জমি নিয়েছিলেন। কথাটা বনওয়ারী আর আটপৌরেদের নিয়ে।

রতন শুনে বললে—দূরো! আমি বলি, কি বেপার রে বাবা! পিলুই চমকে উঠেছিল। সায়েবডাঙার জমির সঙ্গে তো তার কোন সম্বন্ধ নাই। সেই কারণে ব্যাপারটার গুরুত্ব নাই তার কাছে। কিন্তু জমি তার মনিব হেদো মণ্ডল নিয়েছেন, সে তাঁর পাকা বন্দোবস্ত। সুতরাং তার এই সময়টাই মাটি। সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরল মাঠে। বনওয়ারী কিন্তু নিজের বাড়ীর দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়ে বসল। তার পায়ে আর বল নাই।

কত সাধের সায়েবডাঙার জমি। কি পরিশ্রম ক'রে পাড়ার লোকের শ্রদ্ধার খাটুনি নিয়ে সে যে এই জমি তৈরি করেছে, সে বাবুরা জানেন না ; জানে সে, জানতেন বাবাঠাকুর ; জানেন ভগবান হরি। উঁচু মাঠ ব'লে এবার ওখানে দু মুঠো হয়েছে। বনওয়ারীর সব ভরসা যে এইবার ওইখানেই।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবু মহাশয়ের হুকুম জারি হয়ে গেল। সে চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সে উঠল। কই, সুবাসী গেল কোথায় ? ওই এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে

সে—নাচুনীর মত স্বভাব মেয়েটার। চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ফড়িং প্রজাপতির মত ফুরফুর ক'রে উড়ে বেড়ায়। এটা যত ভালও লাগে বনওয়ারীর, তত আবার মনের সন্দেহকেও উগ্র ক'রে তোলে। সন্দেহ হয় করালীকে নিয়ে। সে জানে—সে জানে—করালী তার মর্যাদা ইজ্জৎ নষ্ট করতে চায়। ধর্মনাশা করালী। কোন বিশ্বাস নাই তাকে—কোন বিশ্বাস নাই। ক্রমশ তার বিশ্বাস হচ্ছে, তাকে ধ্বংস করবার জন্যই করালী জন্ম নিয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের সর্বনাশ করতে জন্ম নিয়েছে।

ছোকরা যেমন ফ্যাশানী, তেমনি জোয়ান। সুবাসীকে সে চন্নপুরের পথে হাঁটতে দেয় না; কিন্তু করালী সন্ধ্যাবেলা আসে। সে সুবাসীকে ঠায় চোখের সামনে রেখে ব'সে থাকে, তবু সন্দেহ হয়। করালী এসে যখন পাড়া মাতিয়ে হাসে, তোলপাড় ক'রে হল্লা করে, সুবাসী তখন চমকে চমকে ওঠে। সেটুকু বেশ লক্ষ্য করেছে বনওয়ারী। করালীর এই কাহারপাড়া আসাটা বন্ধ করতে পারলে না বনওয়ারী—ওই মহা আপসোস র'য়ে গেল জীবনে। এইটা তার হার—পরাজয়।

সে জেদ ক'রে রোজ সন্ধ্যাতে আসে; প্রহর খানেক থাকে, ছেলে-ছোকরার কানে ফুসমন্তর দেয়, হল্লা ক'রে চ'লে যায়; আবার দিনের বেলাতেও কখনও কখনও আসতে কেউ কেউ দেখেছে। বলেছে মিলিটাবির কাজে এসেছি। হায় ভগবান, এত লোক ঝড়ে মরল, করালী মরল না!

কিন্তু সুবাসী গেল কোথায়? বুড়ো রমণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে তামাক খাচ্ছিল, সে বললে—কে জানে?

বুড়ো খাচ্ছে দাচ্ছে, বেশ আছে। কোন কাজ করবে না। তার উপর করছে চুরি। ওই তো বেশ দেখা যাচ্ছে, তাঁর ছেঁড়া কাপড়েব তলায় এক মুঠো ধানের শিষ।

এই সময় সুবাসীকে দেখা গেল, নদীব দিকের শুয়ে-পড়া বাঁশবনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল—কাঁখে একটা কলসী, মাথার কাপড় খোলা, খোঁপায় এক থোপা ফুল গুঁজেছে। ছাতিম ফুল।

সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল বনওয়ারীর। এ লক্ষণ তো ভাল নয়।

সুবাসী ঘরে আসতেই ফুলের থোবাটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। পিঠে গোটা দুই কিল বসিয়ে দিয়ে বললে—ফুল গুঁজেছে! খুন ক'রে দোব একদিন। দে, মুড়ি দে।

সুবাসী মেয়েটা আশ্চর্য। সে মার খেয়েও হাসতে লাগল। বললে—নাগরে দিয়েছিল, ফুলের থোকাটা ফেলে দিলা?

—এই ছা-খ? আবার? দোব কিল ধমাধম।

—গতরে বেথা করছে। দিলে আরাম পাব।

—খুন হবি তু কোন্‌দিন আমার হাতে।

সুবাসী বললে—তার আগে ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তোমাকেও মেরে দোব আমি। একথা ব'লেও হাসতে লাগল সুবাসী।

আতঙ্কিত হয়ে বনওয়ারী মুড়ির গাস চিবানো বন্ধ করলে। সুবাসী এবার জোরে খিলখিল ক'রে হেসে বললে—মুড়িতে বিষ নাই। মুড়ি খাও। তারপর বললে—তুমি খানিক

ক্ষ্যাপা পাগলও বটে। মাতব্বর ব'লে লোকে! মরণ! ব'লে সে গিয়ে আবার ছাতিম ফুলের গুচ্ছটা তুলে নিয়ে মাথায় গুঁজলে।

বনওয়ারী আর কোন কথা না ব'লে মুড়ি খেয়ে চন্নপুর রওনা হল। জানে কিছু হবে না, হাকিম ফেরে তবু হুকুম রদ হয় না। তবু গেল। এই বছরটার মত বাবুরা ক্ষমা করুন। আসছে বছর থেকে ভাগেই সে করবে।

কাঁধ বেঁকিয়ে ভারী পা ফেলে সে চলল।

জাঙল পার হয়ে খানিকটা এগিয়েই সে শুনতে পেলে—চন্নপুরে কল-কল শব্দ। এত শব্দ আগে ছিল না। রেল-লাইন হওয়ার সময় থেকে চন্নপুরের কলকলানি বেড়েছে। এবার আবার ভীষণ কাণ্ড! দোসরা লাইন পাতছে। উড়ো-জাহাজের আস্তাবলে শব্দ উঠছেই—উঠছেই। ওঃ, বড় ভীমরুলের চাকে ঢেলা মারলে যেমন গজগজ গোঙানি ওঠে, তেমনি শব্দ! মধ্যে মাঝে ফ্যাঁস-ফোঁস রেল-ইঞ্জিনের ফোঁসানি—ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ বাঁশী কান ফাটিয়ে বেজে উঠছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। আলপথের উপর সদ্যভাঙা কয়েকটা পাতা পড়ে ছিল, সেই দিকে সে চেয়ে রইল। ছাতিমপাতা। পিছনেও আরও যেন—একটা দুটো ছাতিমপাতা ফেলে এসেছে। এখানে অনেকগুলি প'ড়ে রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে দাঁড়াবার কথা নয় এতে। কিন্তু বনওয়ারীর মনে প'ড়ে গেল, সুবাসীর চুলে ছাতিম ফুল। তারপরই তার মনে হ'ল, ছাতিম গাছ আছে মা-কোপাইয়ের কূলে। জাঙলে নাই। আর কোথায় আছে? আর? মনে পড়ল না। তা হ'লে সুবাসীর সঙ্গে আরও কেউ ছাতিমতলায় ছিল। হয়, সে-ই ছাতিমফুল ভেঙে সুবাসীকে একটা দিয়ে নিজে একটা ডাল নিয়ে এই পথেই গিয়েছে, নয় সুবাসীই ফুল ভেঙে নিয়ে একটা নিজে খোঁপায় গুঁজে অন্য ডালটা যার হাতে দিয়েছে, সে-ই এই পথে গিয়েছে।

কোশকেঁধে বনওয়ারী কাহারের 'হাঁটন' হাঁটতে শুরু করলে। কাঁধে ভার না চাপলে সে কদমে হাঁটা ঠিক হয় না, তবু মনের আবেগে হাঁটলে।

সমস্ত পথে কেউ নজরে পড়ল না। চন্নপুরে ইষ্টিশানে লোকজন অনেক। সেখানে চারিদিক চেয়ে দেখে সে কোন হদিস পেলে না, চিন্তিত মনেই সে বাবুদের কাছারির পথ ধরলে। হঠাৎ দাঁড়াল। কাঁকর-পাথরের পথ। কয়েকটা কাঁকর পাথর তুলে নিয়ে গুনতে গুনতে চলল। বিজোড় যদি হয়, তবে পথের ছাতিম পাতার সঙ্গে সুবাসীর মাথায় গোঁজা ছাতিম ফুলের কোন সম্বন্ধ নাই—জোড় হ'লে আছে। এক দুই তিন, সাত আট নয়—বিজোড়। আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পথের ধারে একটা মোটা পাথর দেখে সে আবার দাঁড়াল। হাতের একটা পাথর নিয়ে ছুঁড়লে। ওই পাথরটায় লাগলে সুবাসীর দোষ নাই। না লাগলে নিশ্চয়ই দোষ আছে। লাগল ঠিক। আবার ছুঁড়লে। এবারও লাগল। আবার ছুঁড়লে। বার বার—তিনবার। এবার লাগলে বনওয়ারীর আর কোন সন্দেহ থাকবে না। এবার ঠিক লাগল না। তবে খুব কাছেই গিয়ে পড়ল। বনওয়ারী এগিয়ে এসে ঝুঁকে দেখলে। নাঃ, ঠিকই লেগেছে। ঠুই ক'রে না লাগুক, আস্তে 'সন্তপ্পনে' লেগেছে। যাক, বনওয়ারীর আর সন্দেহ নাই। সুবাসী আপন মনে খুশিতে ছাতিম ফুল ভেঙে চুলে পরেছে, আর-একজন কেউও আপন মনে খুশিতে

তুলে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার আর একটা পরীক্ষার কথা মনে হ'ল। সে মনে মনে ঠিক করলে বাবু যদি এবার ধান ছেড়ে দেন, তবে নিশ্চয় সুবাসীর দোষ নাই, ঘরে ধর্ম না থাকলে লক্ষ্মী আসেন না। লক্ষ্মী যদি ঘরে আসেন, তবে নিশ্চয় ধর্ম আছে। আর না হ'লে নিশ্চয় তাই, বনওয়ারী যা ভেবেছে তাই।

* * * *

নিশ্চিন্ত হ'ল বনওয়ারী। আঃ! বাঁচল বনওয়ারী।

বাবু বনওয়ারীকে এবারের ধান ছেড়ে দিলেন; শুধু বনওয়ারীকেই নয়, বনওয়ারীর দরবারের ফলে আটপৌরেদেরও সকলকেই ছেড়ে দিলেন। তবে আগামী বার থেকে ভাগচাষের শর্ত হয়েছে। ডেমিতে কবুলতি লিখে টিপ-ছাপ নিয়েছেন।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায়—দলিল নাই, দস্তাবেজ নাই, রেজেষ্ট্রী নাই, পাওনার তামাদি নাই। মুখের বাক্যিতে কারবার চ'লে আসছে আদ্যিকাল থেকে, পঞ্চজন সাক্ষী রেখে টাকা দেওয়া-নেওয়া চলে, কেনা-বেচা চলে। তকরার হ'লে কর্তার থানে বেলগাছের শিকড়ে হাত দিয়ে শপথ ক'রে বলতে হয়। কিন্তু বাবুদের দলিল দস্তাবেজ আছে, খাতাপত্র আছে, তাঁদের কারবার উপকথার কারবার নয়; সন, মাস, তারিখ, দলিলদাতার নাম, তস্য পিতার নাম, পেশা, নিবাস, বিক্রয়ের কারণ, স্বত্ব, শর্ত, আমুল মামুল চৌহদ্দী সকল বিবরণ লিখতে হয়—মায় শরীর সুস্থ, অন্তর খোলসা, এ কথাটিও থাকবে সে দলিলে।

বনওয়ারী বুড়ো আঙুলের তেল-কালি মাথার চুলে মুছে বেরিয়ে এল। জয় ভগবান হরি, জয় ধরমদেব! বনওয়ারীর ধন মান বাঁচালে বাবা। বড় আশার ধন তার। তা ছাড়া সুবাসী যে অন্যায় কিছু করে নাই, তাতে আর তার সন্দেহ রইল না। কোন সন্দেহ নাই। মনে হ'ল, কাল বোধ হয় বাবাঠাকুরের বেলগাছটিতে নতুন পাতার অঙ্কুরও দেখতে পাবে সে। বাবাঠাকুর ফিরবেন। কাছারি থেকে বেরিয়ে দেখলে, বেলা প'ড়ে এসেছে। আসবারই কথা। ও-বেলা জল খেয়ে বেরিয়ে, পথে ঢেলা গুনে, ঢেলা ছুঁড়ে যখন কাছারি এসে পৌঁছেছিল, তখন বারোটা পার হয়ে গিয়েছিল। তিনটের পর কাছারি বসেছে, ততক্ষণ বনওয়ারী খানিকটা শুয়েছে, খানিকটা বসেছে, বার কয়েক আরও কয়েক রকম পরীক্ষা করেছে—ছাতিম ফুলের সমস্যা নিয়ে। বাবুর দরবারে কাজ সেরে খুশী হয়ে বেরিয়ে বেলা পড়েছে দেখে সে গেল পচুইয়ের দোকানে।

সাহা মহাশয়দের দোকান গাঁয়ের বাইরে পুকুরপাড়ে। পচুই মদের গন্ধে মোহ-মোহ করছে। বাবুরা নাকে কাপড় দেয়, কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ গন্ধ প্রাণমাতানো গন্ধ—নাকে ঢুকলেই জিভে জল সরে, খাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। দলে দলে বসেছে সব। চন্নপুরের জেলেরা ছোট ছোট দলে বসেছে মাছ-পোড়া নিয়ে। সাঁওতালেরা এসেছে গোসাপ-ইঁদুর-পাখী মেরে নিয়ে, আগুন জেলে পুড়িয়ে নিচ্ছে। চামড়ার পাইকারেরা গো-সাপের চামড়া কিনছে। চারিদিকেই হাঁক উঠছে। ডাক উঠছে। যুদ্ধের বাজারে চামড়ার দর দেখে মনে হয় নিজের অঙ্গের চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করি। মাতন লেগে গিয়েছে অনেকের, গান চলছে—তকরার চলছে, মধ্যে মধ্যে 'ল্যাই'ও অর্থাৎ কলহও লাগছে টুকরো টুকরো। হাঁসুলীর বাঁকের লোকেরাও

এখানে দল বেঁধে বসত। তাদের জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে। পয়সা নাই, হাঁসুলীর বাঁকের লোকেরা মদ খাবে কোথা থেকে? হে ভগবান হরি! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী বসল। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের বিক্রম কত এখানে! কতদিন কত দলের সঙ্গে মারপিট ক'রে বাড়ি ফিরেছে। আজ এখানে বসতে ইচ্ছে হ'ল না। এক ভাঁড় মদ কিনে নিয়ে সে ফিরল। পথে খাবে। বাড়ি নিয়ে যাবে না, কাহারপাড়ার মাতব্বর সে, কোন্ মুখে এক ভাঁড় নিয়ে ঢুকবে সেখানে? কাউকে না দিয়ে ঘরের কোণে একা বসে মদ খাবে সে? সুবাসীই যদি এক ঢোক চায়,তবে? পথেই খাবে।

পথ চলতে চলতেই সে মধ্যে দাঁড়িয়ে খানিকটা ক'রে খেতে লাগল। অবশেষে পথের ধারে বড় ডাঙাটার মধ্যে সেই কাঁকড়া গাছতলাটা দেখে তার তলায় সে মদটুকু খেতে বসল। মনে পড়ল, এই গাছতলায় কত কাণ্ড করেছে সে! কালোশশী চন্নপুরে বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, তখন এইটিই ছিল তাদের মিলবার ঠাঁই। এইখানে কতদিন তার পাল্কী ব'য়ে এসে পাওনা ভাগ করেছে। আগেকার কালে নাকি এই গাছতলাতেই কাহারেরা চুরি করবার আগে জমায়েৎ হ'ত। শেষ কাণ্ড হয়েছে—এইখানেই হয়েছিল তার সঙ্গে পরমের যুদ্ধ।

আঃ, সে সব দিন কোথায় গেল! বাবাঠাকুর চ'লে যাওয়াতেই সব গেল। বাবাঠাকুর-থানের পাতা-ঝরে-যাওয়া বেলগাছটি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। তলাটা সে বাঁধিয়ে দিলে কি হবে, প্রতিদিন গাছটি শুকিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগেও সে আশা করেছিল, লক্ষ্মী যখন আসবেন তখন ধর্ম আছে, আর ধর্ম যে কালে আছে সে কালে বাবাঠাকুর বোধ হয় ফিরবেন। কাল নিশ্চয়ই সবুজ সুচের ডগার মত অঙ্কুর সে দেখতে পাবে। কিন্তু মদ খেয়ে তার মনে হচ্ছে—না না, আর হবে না। চন্নপুরে ওই অধর্মের ছটা ঝলমল করছে যে!

আবার সে এক ঢোক মদ খেলে। মদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, খানিকটা আছে মাত্র। দু ঢোক হবে, সেটাতে চুমুক দিতে গিয়ে সে ভাঁড়টা নামালে মুখ থেকে। ভাবতে লাগল, সুবাসীর জন্য এক ঢোক রাখবে নাকি? উঁহু। সুবাসী তো একা নয়, তার কাকা 'অমন' বুড়ো আছে। নয়ানের মা আছে। 'অমন' বুড়োর লম্বা লম্বা কথা। কাজের মধ্যে কাজ—গরু চরায়। আজকাল আবার বুড়ো চোর হয়েছে। বনওয়ারীর ধানের শিষ কেটে নিয়ে দোকানে দিয়ে বেগুনি ফুলুরি খেয়ে আসে। ওর চেয়েও বেশি চোর হয়েছে নয়ানের মা। লোকের বাড়ি চুরি ক'রে হেঁসেল থেকে তরকারি অম্বল খেয়ে বেড়াচ্ছে। ও দু'জনেই এই সামনের শীতে যাবে। দায় বনওয়ারীর। হায় রে মাতব্বর! সুচাঁদপিশীও যাবে নির্ঘাৎ। সে এখন হাসপাতালে। পা জোড়া দেবে ব'লে রেখেছে, কিন্তু ওই পা কি জোড়া লাগে? কাটবে, কেটে মারবে ওকে। এই একেই বলে—সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। করালী হারামজাদা—মন্দমতি, তার পাল্লায় প'ড়ে অবশেষে ঠ্যাঙ কেটে ইংরিজী ওষুধ খেয়ে জীবনটা যাবে। সাধে কি বনওয়ারী বলে—ওপথে হেঁটো না!

হঠাৎ কাদের কণ্ঠস্বর কানে এল।

কে? কারা? কারা আবার ঝগড়া লাগালে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাত্রিবেলা? একটি মেয়ের গলা, একটি পুরুষের গলা। 'অঙের খেলা'। হাসলে বনওয়ারী। 'মেয়েটি রেগেছে, মান

করেছে। কে? কার গলা? সোজা হয়ে বসল বনওয়ারী। পাখীর গলা। পাখী বলছে—না না না। তোর সব মিছে কথা। সব মিছে কথা। আমি সব বুঝেছি।

—কি, বুঝেছিস কি?—করালী বলছে। ওরা ফিরছে কাহারপাড়া থেকে, সন্ধ্যেবেলার আসর সেরে রোজ যেমন ফেরে।

—আমি সুবাসীর খোঁপায় ছাতিম ফুল দেখেছি।

—ছাতিম ফুল কোপাইয়ের ধারে আছে, পরেছে।

—পরেছে। দিয়েছে কে? তু সকালবেলা 'কাজ আছে' ব'লে চলে গেলি। তুপুরবেলা ফিরে এলি ছাতিম ফুল নিয়ে। আমার তখুনি সন্দ হয়েছিল, তু নিশ্চয় কাহারপাড়ায় গিয়েছিলি। আমাকে বললি—নদীর পুলের ধার থেকে এনেছি। কিন্তু তু পুলের ধারেই যাস নাই—আমাকে বলেছে নদীর ধারের গ্যাঙের লোকেরা। তবে তু কোথা পেলি ছাতিম ফুল? সুবাসীই বা আমার মাথায় ছাতিম ফুল দেখে কেন হাসলে, কেনে বললে—তোমাকে ছাতিম ফুল কে দিলে হে? কেনে বললে? সুবাসীর ঘরের উঠানে কেন ছাতিম ফুল পড়ে আছে? কে দিলে তাকে? বুঝি না কিছু, লয়?

—বুঝেছিস বুঝেছিস। জানিস, পোষ মাসে একটা ইঁত্রে দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পোষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশী হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।

পাখী চীৎকার ক'রে উঠল—কি বললি?

সঙ্গে সঙ্গে গাছের অন্ধকার তলাটাই যেন গর্জন ক'রে উঠল। মনে হ'ল বাঘের মত কোন ভয়ানক জানোয়ার চীৎকার ক'রে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। সে চীৎকারে করালী পাখী ভয়ে চমকে উঠল। অন্ধকার গাছটার ভিতরটায় ঘুমন্ত পাখীরা ভয়ে চমকে উঠে পাখা ঝটপট করতে লাগল। শন শন শব্দ তুলে কয়েকটা বাত্ড় উড়েও গেল। করালী 'চমকে উঠেও চকিতে ঘুরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, হাঁক দিল—কে?

গাঁ-গাঁ শব্দে জানোয়ারের মত গর্জন ক'রে লাফ দিয়ে তার সামনে দাঁড়াল বনওয়ারী। আকাশ ঘুরছে, মাটি তুলছে, বনওয়ারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুনের শিখা ছুটে বেড়াচ্ছে, আঙুলগুলো হয়েছে লোহার শিকের মত, নখ হয়েছে শড়কির ডগার মত। দাঁতে দাঁতে ঘষছে, কট কট শব্দ উঠছে। লাফিয়ে প'ড়েই সে খপ ক'রে চেপে ধরলে করালীর টুঁটিটা—ছিঁড়ে ফেলবে, সে ছিঁড়ে ফেলবে। চোখ জ্বলছে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে গোঙানি। ক্রুদ্ধ গর্জন।

করালীর মনে হ'ল, তার চোখের সামনে সব বুঝি মুছে গেল। তবু তাকে বাঁচতে হবে। শুধু বাঁচতে হবে নয়, এতদিনের অপমানের শোধ নিতে হবে, কাহারপাড়ার মাতব্বরি ঘুচিয়ে দিতে হবে। তার এতদিনের চাপা রাগ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সহ্য সে করবে না। বনওয়ারীর পেটে সে মারলে এক লাথি। এবার বনওয়ারীকে ছাড়তে হ'ল করালীর টুঁটি।

কয়েক মুহূর্ত তুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুজনের দিকে চেয়ে। বনওয়ারী যন্ত্রণায় কাতর। করালীরও অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা সামলে নিচ্ছে তুজনে। তারপর পরস্পরের দিকে ছুটে এলো

বুনো শুয়ারের মত। প্রথমে ছুটল বনওয়ারী, সঙ্গে সঙ্গে করালী। দুই বীর হনুমানের মত পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রমণে জড়িয়ে ধ'রে পড়ল মাটিতে; ডুবে গেল গাছতলার সেই অন্ধকারের মধ্যে। আঁচড়, কামড়, কিল, চড়, ঘুষি। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের ছায়ায় একদিন যুদ্ধটা শুরু হয়েও শেষ হয় নাই। আজ শেষ না ক'রে ছাড়বে না বনওয়ারী। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের অন্ধকার আকাশপথে ভেসে এসে ওই ঝাঁকড়া গাছটার শাখাপল্লব বেয়ে প্রতি মুহূর্তে তলায় নামছে, ওদের দুজনকে ঘিরে গভীর হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর প্রহারের শব্দ, হিংস্র গর্জন, কাতর মৃদু স্বর শোনা যাচ্ছে শুধু। পাখী মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। নড়তে পারছে না, চীৎকার করতে পারছে না। মাথার উপরে বাদুড় উড়ছে পাক দিয়ে। এদিকে ওদিকে টিক্-টিক্—টক্-টক্—কট্-কট্ শব্দে নানা রকমের সরীসৃপ ডাকছে। কিন্তু পাখীর কানে কিছুই যাচ্ছে না, বা দেখতেও পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে!

কতক্ষণ কে জানে! তবে অনেকক্ষণ পর অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। একজন প'ড়ে রইল অসাড় ভাবে।

এতক্ষণে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল পাখী।

যে জিতে উঠে এল সে কে? বনওয়ারী—হাঁসুলী বাঁকের মাতব্বর, কোশকেঁধের ছেলে? সে-ই হওয়াই তো সম্ভব। আজ তো তা হ'লে পাখীর আর নিস্তার নাই। করালীর প্রিয়া সে। তাকে আজ এই মুহূর্তে সে কখনই রেহাই দেবে না। ধর্ম সমাজ কিছু মানবে না। ছুটে পালাবার মতও শক্তি তার নেই, পা-দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে। তবু সে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় ক'রে ব'লে উঠল—তোমার পায়ে পড়ি, বাবাঠাকুরের দিব্যি—

হা-হা-হা-হা ক'রে হেসে উঠল করালী।—বাবাঠাকুর, না, কচু!

—তুমি?—আশ্চর্য হয়ে গেল পাখী।

—হ্যাঁ—ব'লেই করালী আবার ফিরল, একটা লাথি মারল বনওয়ারীর মাথায়। তারপর ফিরে এসে বললে—চল্!

গায়ে হাত দিয়ে পাখী চমকে উঠল—অক্ত না কি?

—হ্যাঁ।

সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। ক্ষতবিক্ষত-দেহ বিজয়ী বীর টলতে টলতে চ'লে গেল।

* * * *

অন্যজনও উঠল, দীর্ঘক্ষণ পরে।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারের প্রাণ অনাহারে, প্রহারে, দুর্ভিক্ষে, মড়কে, ঝড়ে, বন্যায় সহজে যায় না। সমস্ত জীবনই কাটে অর্ধাহারে। দুর্ভিক্ষে—ফ্যান উচ্ছিষ্ট কুখাদ্য অখাদ্য খেয়েও বাঁচে; দাঙ্গায় মাথা ফাটে, কোদালের কোপে পায়ের খানিকটা কেটে পড়ে, গাছের ডাল ভেঙে ঘাড়ে পড়ে। শয্যাশায়ী হয়ে প'ড়ে থাকে, দীর্ঘদিন ভোগে, লতাপাতা বেটে লাগায়—ধীরে ধীরে সেরে ওঠে; হয়তো অঙ্গের খানিকটা পঙ্গু হয়ে যায়, কিন্তু জীবন সহজে যায় না। বনওয়ারীও উঠল।

কাহারপাড়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ কোশকেঁধে বনওয়ারী বাবাঠাকুরের পরিত্যক্ত স্থানটিতে টলতে টলতে এসে লুটিয়ে পড়ে হা হা ক'রে কাঁদতে লাগল। বুক চাপড়াতে লাগল আহত আরণ্য বানরের মতো।

রাত্রি কত, তার ঠিক ছিল না। তবে কৃষ্ণপক্ষ, আকাশে চাঁদ উঠেছে—আধখানা চাঁদ, পোয়া আকাশ পার হয় হয়। বনওয়ারী খানিকটা ব'সে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এসেছে। এসে কত্তার থানে ঢুকেছে। কত্তার বাঁধানো থানটি চাঁদের আলোয় তকতক করছে। বনওয়ারী মাথা ঠুকতে লাগল সেই বেদীর উপর। চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল; হা-হা-হা-হা! বুক তার ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ মাথা তুলে চমকে উঠল। সামনেই শেয়ালের মত একটা কি যেন দাঁড়িয়ে। শেয়ালটা হাঁ করতেই তার মুখে দপ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল। আবার জ্বলে উঠল। দপ্-দপ্-দপ্। জ্বলছে আর নিবছে! বনওয়ারীর মাথার ভিতরেও ঠিক ওই ভাবে আগুন জ্বলতে লাগল; উঠে দাঁড়াল সে। শেয়ালটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাল। শেয়াল নয় ওটা। কখনও নয়। বাবাঠাকুর চর পাঠিয়েছেন। দপ্‌দপ্ ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল, ইশারা পেয়েছে সে, বাবার আদেশ। নিঃশব্দে চকমকির চোঙাটা নিতে হবে, সেটা বাইরেই দেওয়ালে ঝুলানো আছে। তারপর উঠতে হবে করালীর কোঠায়। অ-মেরামতি কোঠার উপরে কেউ থাকে না, নীচে থাকে নসুবালা। উপরে উঠে খড়ের ঝুটিতে আগুন ধরিয়ে—। কোঠাঘর জ্বলবে—চন্ননপুর থেকেও দেখা যাবে। বাবাঠাকুরের আদেশ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল। কে? কারা?

—হুঁ হুঁ হুঁ।

—হুম্। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

মৃদুস্বরে কারা কথা কইছে ওই শিরীষগাছের তলায়—বাঁশবনের ধারে? কে? কারা? ওরা কারা? বাঁশবনের ধারে তার বাড়ির পিছনে? হুঁ। তাকে ঘায়েল ক'রে সে এসেছে সুবাসীর কাছে। আসবারই তো কথা।

সন্তর্পণে এগিয়ে চলল বনওয়ারী। কুড়িয়ে নিলে একটা পাথর। লোহার অস্ত্র হ'লে ভাল হ'ত। কিন্তু সে ধৈর্যও নাই তার, অবসরও নাই। এই পাথরেই হবে—পাথরই যথেষ্ট। রেলের পুলের ধার থেকে কুড়িয়ে এনে এটা করালীই তাকে দিয়েছিল অনেকদিন আগে। সেই পাথর। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনে পাথর দিয়ে মাথা ছেঁচার অনেক উপকথা আছে। সুচাঁদ বলে—বনওয়ারীর বাবার বাবার বাবা আর আমার বাবার বাবা এক লোক তো! সে হ'ল আমার কত্তাবাবা। তা, সেই কত্তাবাবা আমার পেথম কত্তামায়ের—মানে, তার পেথম পরিবারের ঘর থেকে আটপৌরেদের একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখে শিল নোড়ার নোড়া দিয়ে মাথা ছেঁচে মেরেছিল। পরিবারের বুকে ব'সে নোড়া দিয়ে—

শুধু পরিবার সুবাসীর নয়—একটা নয় দুটো ছেঁচতে হবে। করালীর মাথা সমেত ছেঁচবে সে। আগে করালীর। তার পর সুবাসী। আকাশে আধখানা চাঁদ সত্ত্বেও, বহু পুরাতন বট-

পাকুড়-শিরীষের নিবিড় পল্লবের ঘন ছায়া—পাশের বাঁশবনের ছায়ার সঙ্গে মিশে সে যেন অমাবস্যার অন্ধকার। হাঁসুলী বাঁকের আদ্যিকালের অন্ধকার আদিকাল থেকে এখানে থমথম করছে। এখানে শুক্লপক্ষ নাই। পূর্ণিমা নাই। চিরদিনের অমাবস্যা এখানে। অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে নোড়াটা হাতে এগিয়ে চলল বনওয়ারী। শিরীষ গাছের অদূরে দাঁড়াল—কই? কোথায়? খুব আস্তে হুঁ হুঁ শব্দে কথা তো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একসময়ে উৎকণ্ঠিত বনওয়ারীর মদের নেশার ঘোরে অর্ধ আচ্ছন্ন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট যেন বেরিয়ে এল দুটি ছায়াছবি। স্পষ্ট দেখলে। বনওয়ারীর বুকটা লাফিয়ে উঠল। ওই—ওই চলেছে করালী আর সুবাসী। চলল সে পিছনে পিছনে। ওই চলেছে। ওই চলেছে—ওই। এই ক্ষণে তার চিত্তলোকে প্রস্তরযুগের আবেগ-বিশ্বাস-উচ্ছ্বাস বাসা গেড়ে বসেছে। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে পীড়িত-হৃদয়াবেগ-প্রভাবিত কল্পনার দুটি মূর্তি স্পষ্ট এগিয়ে চলেছে। চলছে, চলুক; কতদূর যাবে! বাঁশবন শেষ হয়ে এল। এবার দাঁড়াল সে। কই তারা, কই? হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে দুটো বড় পাখী হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দ ক'রে পাখা বিস্তার ক'রে উড়ে গেল তার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে। সে চমকে উঠল। ঠিক মনে হ'ল, মূর্তি দুটিই যেন অকস্মাৎ চন্দ্রালোকিত শূন্যলোকের শুভ্র স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে ভেসে চ'লে গেল। ক্রমশ উঁচুতে উঠে তারা সামনের কোপাইয়ের ধারে—দহের উপরে সেই শিমুল গাছটার ডালে গিয়ে বসল।

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল বনওয়ারী। শূন্যে ভেসে গেল। তবে—তবে তো করালী সুবাসী নয়। কে? ওরা কে?

ও দুটো নিশাচর পাখী। এ দেশে বলে হুমহুমে পাখী। ওরা রাত্রে এমন মুখোমুখি ক'রে ব'সে—'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুম হুঁ্যা-হুঁম' শব্দ ক'রে যেন পরস্পরের সঙ্গে কথা কয়। বনওয়ারী একথা জানে। কিন্তু আজ বনওয়ারীর মনে পক্ষবিস্তার ক'রে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ—সে আকাশের নীচে আদিমযুগের পৃথিবীতে বিচরণ করছে সে। তাই পাখী দুটো উড়ে গিয়ে শিমুলগাছে বসার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মত অন্য কল্পনা খেলে গেল। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কল্পনা। সম্মুখে জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে কোপাইয়ের চরভূমি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—কেউ কোথাও নাই। কিন্তু সে তো অন্ধকারের মধ্যে দুটি মূর্তি স্পষ্ট দেখেছে। স্পষ্ট কথা তাদের কইতে শুনেছে। অথচ আর কেউ নাই। কৃষ্ণমূর্তি দুটি অশরীরী হয়ে উড়ে গেল। রহস্যময় পক্ষ বিস্তার ক'রে ওই শিমুলগাছের ডালে গিয়ে বসল। ওই দহে মরেছে কালোশশী। ওইখানে পুড়িয়েছে গোপালীকে—। তবে কে, কে ওরা? তবে কি—?

আবার কেঁপে উঠল বনওয়ারী। কালোশশী? গোপালীবালা? তারাই কি দু'জনে তাকে আজ নিতে এসেছে? দেখাচ্ছে ওই শিমুলতলার শ্মশানভূমি? আতঙ্কের মধ্যে তার অন্ধবিশ্বাসী মন স্মরণ করলে তার হাতে বাঁধা মা-কালীর বাবাঠাকুরের মাদুলী দুটিকে। সে ডান হাতের কনুইটা নিজের বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। কই, মাদুলী কই? নাই তো! নাই তো! করালীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির মধ্যে মাদুলী ছিঁড়ে প'ড়ে গিয়েছে। কি হবে? কে আজ রক্ষা করবে? বাবাঠাকুর নাই। বেলগাছ শুকিয়ে গিয়েছে। কাকে ডাকবে সে? আকাশ বেয়ে

বিরাট সর্পবাহনে চ'ড়ে বাবাঠাকুর চ'লে গিয়েছেন। কে বাঁচাবে? অসহায় বনওয়ারীর চোখের সামনে শিমুলগাছের ডালে ব'সে গোপালী ও কালোশশী কথা বলছে—হুম্—হুম্—হুম্—

হুঁ—হুঁ—হুম্—হা—হা—হা—! উচ্চ শব্দে একটা পাখী ডেকে উঠল এবার। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চীৎকার ক'রে বনওয়ারী প'ড়ে গেল সেইখানে। জ্ঞান হারিয়ে গেল। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনের ওদিকে বসতির মধ্যে কাহারেরা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছে। এদিকে হেমন্তের শেষরাত্রে কোপাইয়ের জলের বুকে শরতের হালকা সাদা মেঘের মত কুয়াসা জেগে উঠেছে; চরভূমিতেও সেই সাইক্লোনের প্রচণ্ড বর্ষণসিক্ত গলিত পত্রজঞ্জাল ভরা মাটিতেও জেগে উঠছে অনুরূপ কুয়াসার এক-একটা পুঞ্জ, সে পুঞ্জ আশ্রয় করছে ঝোপঝাড়গুলিকে। তেমনি একটি কুয়াসার আস্তরণ হাঁসুলী বাঁকের বীর কোশকেঁধে বনওয়ারীর বিশাল দেহখানিকে ঘিরে ক্রমশ জেগে উঠতে লাগল।

শেষ পর্ব

সুদীর্ঘ ষাট দিন, অর্থাৎ দু মাস পর।

হাঁসুলী বাঁকের চারিপাশে কোপাই নদীর বাঁকে বাঁকে বিচিত্র শব্দ উঠছে। খট-খট-খট-খট। সে শব্দ ছুটে চ'লে যাচ্ছে নদীর গর্ভের মধ্য দিয়ে; ছুটে গিয়ে ওদিকের বাঁকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার এদিকে ফিরে আসছে। অকস্মাৎ শান্ত হাঁসুলী বাঁক শব্দমুখর হয়ে উঠেছে।

রোগশয্যার উপর বনওয়ারী আজ উঠে বসল। ষাট দিন শয্যাশায়ী ছিল; তার মধ্যে পঞ্চাশটা দিন কেটেছে চৈতন্যহীন অবস্থায়। চামড়া-ঢাকা মোটা হাড়ের কাঠামোখানা শুধু নিয়ে কোনোমতে সে উঠে বসল আজ।

ষাট দিন আগে কোপাইয়ের কূল থেকে জ্বরে অচেতন অবস্থায় কাহারেরা তুলে ঘরে এনেছিল। কারণ কেউ জানে না। বনওয়ারীর কিছু বলবার অবস্থা ছিল না। তবে প্রলাপের মধ্যে শুধু চীৎকার করেছে—বাবাঠাকুর, অক্ষা কর। আর চীৎকার করেছে—ওই কালোশশী, ওই গোপালী! আঃ—আঃ—ওরে আমি যে উড়তে প্যারি না।

চিকিৎসা! সে না-চিকিৎসা। জাঙলের সদ্‌গোপ কবিরাজের ওষুধ। কবিরাজ ষাট দিনের মধ্যে পাঁচ দিন ঘাড় নেড়ে বলেছেন—রাত পার হবে না বাপু।

তবু বনওয়ারী বেঁচে উঠে বসল। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের মধ্যে সবল জীবনীশক্তি-আহরণ-করা কাহার-মাতব্বরের জীবন, এত সহজে যাবার নয় ব'লেই বাঁচল। কিন্তু না বেঁচে এর চেয়ে মরলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। বনওয়ারী আজ নিজেই বললে এ কথা।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তার বেঁচে লাভ কি? কেন বাঁচালি আমাকে?—ব'লে বার বার সে গভীর হতাশায় ঘাড় নাড়লে। চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ল হাঁসুলী বাঁকের মাটির বুকে।

কথাটা বনওয়ারী সত্যই বলেছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। চিরকালের মত শেষ হয়েছে কিনা, সে কথা বলা অবশ্য যায় না ; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, শেষ হয়েছে বা হবে-হবে করছে।

পাপের ফলে দেবতা চ'লে গেলেন। বাবাঠাকুর চ'লে গিয়েছেন, কালারুদ্রের মন্দিরে যুদ্ধের আপিস বসেছে। কালারুদ্রও চ'লে গিয়েছেন। যুদ্ধ—কাল যুদ্ধ!

বনওয়ারীই বললে। মৃদু স্বরে গভীর দুঃখের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলে, বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল। বললে—যুদ্ধ লেগেই হাঁসুলীর বাঁককে সেরে দিয়ে গেল। হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে। মর্মান্তিক আক্ষেপ যেন ঘাড় নেড়ে সমস্ত হাঁসুলী বাঁকে ছড়িয়ে দিতে চাইলে সে।

পঞ্চাশ দিনে জ্বর ছেড়েছে, ক'দিন থেকেই অল্পস্বল্প চেতনা হচ্ছিল তার। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় ক্ষীণ দুর্বল। চোখ মেলে চেয়ে দেখেও যেন কিছু বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার চোখের পাতা কিছুর ভারে যেন নেমে পড়ে সে ঘুমিয়ে পড়ছিল। ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে চেতনা স্পষ্ট হয়ে এল।

তার বিছানা—বিছানা একখানা ছেঁড়া কাঁথা—সেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নসুবালা। হ্যাঁ তো, নসুবালাই। চেতনা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সে শুধু তাকেই দেখছে। সে গোঁফ-কামানো মুখ, মেয়েদের মত ভঙ্গিতে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরা, মাথায় খোঁপা বাঁধা, হাতে চুড়ি নোয়া শাঁখা পরা নসুবালা তার বিছানার পাশে অহরহ রয়েছে। সুবাসীকে দেখতে পাচ্ছে না। প্রথম কয়েকদিন মনে কোনও প্রশ্ন জাগে নাই, শুধু অতিপরিচিত কাউকে যেন পাচ্ছে না ব'লে মনে হয়েছিল। আর-একজনকে মধ্যে মধ্যে আবছা চিনতে পারছিল—পাগলকে। পাগল? মিতে?

প্রথম দিন সে চোখ মেলে চাইতেই নসুবালা তার মুখের সামনে ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—সোর হয়েছেন? চিনতে পারছ আমাকে?

—না।—ঘাড় নেড়েছিল বনওয়ারী। তারপর পাগল এসে পাশে বসেছিল। ব্যানো! ব'লে পরম স্নেহে তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল। বনওয়ারী তবুও তাকে চিনতে পারে নাই।

দ্বিতীয় দিন সে পাগলকে চিনেছিল।' নসুবালাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল—সুবাসী? নসু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে নসুকে চিনেছিল, বলেছিল—নসুবালা?

নসু একমুখ হেসে বলেছিল—চিনতে পেরেছ আমাকে? আঃ, বাঁচলাম। পরাণটা আমার উদ্‌ব্যাগে থলবল করছিল। আঃ, সেই শূরবীর মানুষ গো!

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে খুঁজে না পেয়ে বনওয়ারী জিজ্ঞাসা করেছিল—সে কই?

কথাটা শুনেই পাগল উঠে চ'লে গিয়েছিল। নসু প্রশ্ন করেছিল—কে?

—সুবাসী।

—সে আছে। আসছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নসুবালা বলেছিল—গিয়েছে কোথা। আসবে।

কিন্তু সুবাসী এল না। সমস্ত দিন চ'লে গেল—তবু এল না। বনওয়ারী বুঝতে পারলে এবার। আর জিজ্ঞাসা করলে না সে। কাহারপাড়ার উপকথার ধারা তো সে জানে। শুধু কাঁদলে খানিকটা। নসু বললে—কেঁদো না। চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটু জল দিলে তার মুখে, বললে—জল খাও এক ঢোক। তারপর ছড়া কাটলে—'বেঁচে থাকুক চুড়োবাঁশি, রাই হেন কত মিলবে দাসী'। ঝাঁটা মারি তার মুখে।

বনওয়ারী আর কোন প্রশ্ন করে নাই। তার মনেও পড়েছে সব, দশ দিনে তার বুদ্ধি এবং অনুমানশক্তির মধ্যে সজীবতা এসেছে। সুবাসী কোথায় সে কথা সে কল্পনা করতে পারছে। চুপ করে শুয়ে শুধু ভাবলে—আপনার যত পুরানো কথা। এই যে অবস্থা তার হয়েছে—এমন যে হবে, এ কোনও দিন সে মনে ভাবে নাই। আজকের এই দিনে নসু ছাড়া আর তার কেউ নেই। তার এই দিনগুলির জন্যেই কি বাবাঠাকুর দয়া ক'রে নসুকে নারীর স্বভাব দিয়ে গড়েছিলেন? গ'ড়ে বলেছিলেন—আমি যখন চ'লে যাব হাঁসুলী বাঁক ছেড়ে, বনওয়ারী যখন কুটোর মত তুচ্ছ লোক হবে, তখন তার ভার নেবার জন্যেই তোকে গড়লাম?

খট-খট-খট-খট! খটাং, খটাং, খটাং! শব্দ ছুটে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। আজ মনে হ'ল—খট-খট-খট-খট ক'রে কিসের একটা শব্দ উঠছে। শব্দটা বোধ হয় চেতনা হওয়ার পর থেকেই শুনছে, কিন্তু ওদিকে শব্দটা খুব স্পষ্ট ছিল না, কানে সে শুনতে পেত না; মনটাও ওদিকে যেত না। মন শুধু এ কদিন খুঁজে ফিরছে পুরানো কথা। আজ সে পুরানো কথা খুঁজে পেয়েছে। সব মনে পড়েছে। কানেও আজ শুনতে পাচ্ছে। শব্দটা আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। অনবরতই শব্দ উঠছে। নিঝুম তেপান্তরের মাঠে কে যেন কাঠের উপর কিছু ঠুকেই চলেছে—খট-খট-খট-খট!

কোপাইয়ের বাঁক থেকে শব্দটা ঘুরে আসছে—খট-খট খট-খট—খটাং, খটাং, খটাং। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—খটাং, খটাং, খটাং!

সে একলা শুয়ে ছিল ঘরে। শব্দটা শুনে শুনে তার মনে প্রশ্ন জাগল।

সে ডাকল—নসু! পাগল!

কেউ উত্তর দিলে না। ধীরে ধীরে সে চোখ বন্ধ করলে।

কি রকম যেন! কোথাও মানুষের কোন সাড়া শব্দ নাই, কেউ চীৎকার ক'রে কাউকে ডাকছে না, কেউ কাঁদছে না, কেউ হাসছে না, কেউ ঝগড়া করছে না, গাই বাছুরকে ডাকছে না, বাছুর মাকে ডাকছে না। ছেলেছোকরারাও কি গান ভুলে গেল?

কেবলই শব্দ উঠছে—খট-খট—খট-খট—খটাং—খটাং—খটাং—

শুধু খট-খট-খটাং-খটাং নয়। গোঁ-গোঁ—গোঁ—গোঁ! উড়ো-জাহাজ উড়ে যাচ্ছে বোধ হয়। শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়ল বনওয়ারী। এর পরের দিন বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বললে—দরজাটা ভাল ক'রে খুলে দে দেখি। দিনমণিকে একবার দেখি, ওঠ দেখি।

তারপর সে প্রশ্ন করলে—পুলের ওপর গাড়ি যেছে, লয়। এরই কিছুক্ষণ পর আবার সেই শব্দ উঠতে লাগল—খট-খট খট-খট খটাং-খটাং। ভুরু কুঁচকে সে নসুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—কি নসু? শব্দ?

—বাঁশ কাটছে।

বাঁশ কাটছে? সকাল থেকে সন্‌জে পর্যন্ত প্রতিদিনই বাঁশ কাটছে? হবে। জাঙলের ঘোষ মহাশয়েরা মালিক, ঘর দোর ছাওয়ানোর সময়। হবে।

কিছুক্ষণ পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

খাবার সময় নসু তাকে ডাকলে—সাবুটুকুন খাও।

শব্দ উঠছে—খটাং খটাং!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। ভাবতে লাগল, সুবাসীর কথা, তার দশার কথা, করালীর কাছে তার সেদিনের নিষ্ঠুর পরাজয়ের কথা। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। লুকাবার জন্য সে বিছানায় নিস্পন্দের মতো প'ড়ে রইল।

বিকালে পাগল ডাকলে—ওঠ্ ভাই, দুটো কথা বল্।

বনওয়ারীকে সে-ই ধরে উঠিয়ে বসিয়ে দিলে। এইবার তার কানে এল—খটাং-খটাং খটাং-খটাং! শব্দ ছুটছে হাঁসুলী বাঁকের এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।

পরের দিন আবার শব্দ উঠতে লাগল। খট্-খট্-খটাং—

সে আজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আজও বাঁশ কাটছে, নসুবালা? এত বাঁশ কে কাটছে? নির্মূল করলে বাঁশগুলান!

পাগল বললে—যুদ্ধুর ঠিকেদারেরা তামাম বাঁশ কিনেছে ভাই, জাঙলের সদ্‌গোপেরা বেচেছেন। টাকায় দুটি বাঁশ। তারাই কাটছে বাঁশ।

টাকায় দুটি বাঁশ? টাকায় আটটা বাঁশ দুটি দরে বিক্রি হচ্ছে? যুদ্ধুর ঠিকেদারে সব বাঁশ কাটছে? হে ভগবান! এ কি হ'ল? আগুন লেগে গেল দেশে? কিন্তু কেন?

আকাশের দিকে মুখ তুলে পাগল বললে—পিথিমীতে ভীষণ যুদ্ধ লেগেছে, এমন যুদ্ধ ভূভারতে কখনও হয় নাই। জাপানীরা খুব যুদ্ধ চালিয়েছে। কলকাতায় বোমা মেরে ভেঙে চুরমার করছে। সেখানকার লোকে কুকুর বিড়ালের মত পালিয়ে এসেছে। চন্নপুরের কুঁড়ের ভাড়া পাঁচ গণ্ডা টাকা! চন্নপুরে ঘর না পেয়ে জাঙলে সদ্‌গোপদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে দশ-বারো ঘর কলকাতার লোক। চালের মণ চল্লিশ টাকা, ধানের মণ চব্বিশ টাকা। আরও নাকি নানান দেশ থেকে লোকেরা পালিয়ে আসবে। যাবে শুনেছি চন্নপুরের রেললাইনের পাশের পাকা সড়ক দিয়ে। কাটোয়া দুমকা হয়ে চ'লে যাবে পশ্চিম দেশে। তারা পথে চন্নপুরে থাকবে; জিরোবে দুদিন, তার জন্য বাঁশের খড়ের ঘর তৈরী হচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাগল আবার বললে—সে-ই, ভাই, সে সন্ধান দিলে—বাঁশবাঁদির বাঁশের, হাঁসুলী বাঁকের কাঠের। সেই করালী! সব্বনেশে করালী!

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, সেই তো দেবে। তার ধরমই তো এই। কেউ গড়ে, কেউ ভাঙে। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—চন্নপুরে তাহ'লে খুব জমজমাট।

—খুব।

হাত পা নেড়ে ভঙ্গি ক'রে নসুবালা বললে—সে একখানা বড় গেরাম, বুল্লে কিনা। তার মধ্যে দশ-দশটা কাহারপাড়া ঢুকে যায়। বাবা রে, বাবা রে, বাবা রে, সে কত কাণ্ড গো। তার জন্যে ইঁদারা হয়েছে, ডাক্তার বসেছে, পাঁচ শো মণ চিঁড়ে তৈরি ক'রে এখেছে, জালায় জালায় মণ মণ গুড় এখেছে। সেই সব ঘরের জন্যে বাঁশ কাটছে। তা'পরেতে উত্তরে যে এললাইন বসেছে, যেখানে উড়ো-জাহাজের আস্তাবল হয়েছে, সেখানে সব কি হচ্ছে, তাতে বাঁশ লাগবে। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে—বাঁশ দিতে হবে, দাম যা চাও লাও। বড় বড় গাছ কেটে কাঠ ক'রে আখছে আন্নাবান্নার জন্য।

অবাকবিস্ময়ে ভাবতে লাগল বনওয়ারী। বুঝতে পারলে না। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ কখনও ঘটে নাই। বান এসেছে, ঝড় এসেছে, গাঁয়ে আগুনও লেগেছে, মড়কও হয়েছে, পৃথিবীও কেঁপেছে—তাও আছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়। দাঙ্গা আছে, ডাকাতি আছে, কালোবউ বড়-বউয়ের প্রেতাত্মা আছে, কিন্তু যুদ্ধ নাই। সে যুদ্ধে হাঁসুলী বাঁকের তন্দ্রা নষ্ট হয়, উপকথায় ছেদ পড়ে, এখনকার মানুষের জীবনস্রোত পৃথিবীর জীবনস্রোতের আকর্ষণে ইতিহাসের ধারায় মিশে যায়, সে যুদ্ধ উপকথার কল্পনায় নাই। বাবাঠাকুর কখনও বলেন নাই, স্বপ্ন দেন নাই। কালারুদ্দুও কখনও জানান নাই। কি ক'রে জানবে তারা? স্থূল-মস্তিষ্ক হাঁসুলী বাঁকের মানুষ বিরাটদেহ বনওয়ারী, যে কাঁধ বেঁকিয়ে চলে, ধপ ধপ শব্দ ওঠে যার অতিকায় পায়ের সবল পদক্ষেপে, তার মস্তিষ্কে এ কিছুতেই ঢুকল না।

পরদিন আবার শব্দ উঠতে লাগল। বনওয়ারী বললে—আমাকে একবার বাইরে নিয়ে যাবি নসু?

—বাইরে যাবা?

—হ্যাঁ। একবার মা-জমুনীকে দেখি।

—মা-জমুনী?

—হ্যাঁ রে। আমার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদি মা-জমুনীকে একবার দেখি, কি দশা করলে তার? আঃ-আঃ!—বুক ফেটে আক্ষেপ বেরিয়ে এল তাঁর।

—যেতে পারবা?

—ধর্, খুব পারব আমি। সে নিজেই উঠে বসল। উঠে দাঁড়াল। মটমট শব্দ ক'রে উঠল দীর্ঘদিন-শুয়ে-থেকে জাম-ধরা মোটা হাড়গুলি।

খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক, খাঁ-খাঁ করছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির বাঁশবন নির্মূল হয়ে গিয়েছে। শুধু বাঁশবন নয়, বড় বড় বটগাছ অশ্বত্থগাছ পর্যন্ত নাই। ঘর থেকে বার হতেই—তীব্র আলো চোখে এসে লাগল। আকাশের কোণে এতটুকু সবুজ নাই। এখানে ওখানে রয়েছে শুধু দুটো চারটে শীর্ণকায় পল্লবহীন শিরিষ-শ্যাওড়া-বেলগাছ। কোথাও কোন ছায়া নাই,

চোখে এসে লাগে ছটা, চারিদিকে খটখট করছে মাঘের রৌদ্র। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে নদীর কিনারা পর্যন্ত হাঁসুলী বাঁকের বেড়। নদী পার হয়ে ওপারে দেখা যাচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্তর। পথ চ'লে গিয়েছে কোন্ দেশ দিয়ে। সে হাঁসুলী বাঁকের কোন চিহ্নই আর নেই যেন। গাঁয়ে ঢুকে ছায়ার নেশায় একটা কেমন ঢুলুনির ঘোর লাগত। ছায়ায় ছায়ায় চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবনা ভাবতে ভাল লাগত। বাঁশবনের আর বট-অশ্বত্থে ঘন ছায়া মুছে যাওয়ার সঙ্গে সে সব ঘুচে গেল। আর গাছতলায় ব'সে চোখে তন্দ্রা নামবার অবকাশ হবে না, ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার স্বপ্ন রচনার ঠাঁই রইল না।

ফিরে তাকালে সে বাবাঠাকুরের থানের দিকে। বাবাঠাকুরের থান, আর তার মধ্যে ছিল আটপৌরেপাড়ার সেই বটগাছটি, যার তলায় আলো নিবিয়ে দিয়েছিল কালোশশী, যার তলায় সুবাসীকে দেখে তার কালোশশী ব'লে ভ্রম হয়েছিল। কই সে গাছ? বাবাঠাকুরের থানই বা কোন্ দিকে? ওটা কোন্ জায়গা? এত মোটর গাড়ি কিসের? কাদের? চন্নপুরের কারখানাটা এগিয়ে এল? গোঁ-গোঁ শব্দ করছে কখানা গাড়ি। কি বিশ্রী ধোঁয়ার গন্ধ! এখান পর্যন্ত এসে বনওয়ারীর নাকে ঢুকছে।

সে অসহায় আর্তের মত পাগলের দিকে চেয়ে বললে—পাগল, এ যে আমি কিছু ঠাওর পেছি না ভাই। বাবাঠাকুরের থান কোথা পেল? ওটা কোন্ জায়গা? এত গাড়ি? পাগল?

—ওই তো ভাই! বাবাঠাকুরের থান তো আর নাই। যুদ্ধুর মটরগাড়ির আড্ডা হয়েছে।

চিহ্ন নাই বাবাঠাকুরের স্থানের! বেলগাছ নাই, বাঁদরলাঠির গাছটি নাই, কুলগাছের ঝোপগুলি নাই, আলোকলতা নাই, তালগাছের বেড় নাই। লাল কাঁকর বিছানো চত্বর চারিপাশের সাদা রঙ-মাখানো ইটের ঘেরার মধ্যে ঝকমক করছে। মোটর গাড়ি যাচ্ছে আসছে গোঙাচ্ছে।

পাগল বললে—বাবার থানকে কেটেকুটে সমান ক'রে মটরগাড়ির আস্তানা করছে বনওয়ারী ভাই। কলির শেষ, আমাদেরও শেষ। ওইখানে থেকে বাঁশ কাঠ বোঝাই ক'রে নিয়ে যায় চন্নপুর। চন্নপুর থেকে হাঁসুলী বাঁক পর্যন্ত পাকা আস্তা করেছে। কিছু আর আখলে না।

ওই সেই রাস্তা। পাকা শাহী চওড়া রাস্তা! লাল কাঁকরে মোড়া সোজা চ'লে গিয়েছে হাঁসুলী বাঁক থেকে জাঙল হয়ে চন্নপুর; তীরের মত সোজা রাস্তা। রাস্তার গাঁটছড়াটা চন্নপুরের সঙ্গে হাঁসুলী বাঁককে বেঁধে দিয়েছে। ধানের জমি মেরেছে, খাল পুরিয়েছে, নালা বেঁধে সাঁকো তুলেছে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ ক'রে ওই পথে গাড়ি যাচ্ছে আর আসছে।

পাগল বললে—কোপাইয়ের ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে পথ। এইবার কোপাই পেরিয়ে ওপারে উঠবে। ওপারের গাছও সব কাটবে কিনা।

বনওয়ারী আর্তনাদ ক'রে উঠল এবার—কেনে বাঁচালি আমাকে পাগল? ওরে নসুবালা, এ তোরা কি দেখাতে বাঁচালি? আঃ, হায় রে, কেনে বাঁচলাম আমি?

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি তুলেই সে আবার কাহারপাড়ার দিকে তাকালে।

এতক্ষণে আর একটা জিনিস তার চোখে লাগল, মনে ধরা পড়ল।

খাঁ-খাঁ চারিপাশের দিকদিগন্তরই করছে না। হাঁসুলী বাঁকের বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার পুরী বাঁশবাঁদি গ্রাম—সেও যেন খাঁ-খাঁ করছে। ঘরগুলি রয়েছে, কিন্তু কলরব নাই, গরু নাই, বাছুর নাই, ছাগল নাই, ভেড়া নাই, মেয়েরা কলহ করছে না, বাঁধের জলে হাঁস চরছে না, ছেলেরা খেলা করছে না, এ কি হ'ল? এমন কি কাহারপাড়ার কুকুরগুলোও দেখা যায় না। হাঁসুলী বাঁকের বুকের মধ্যে উপকথার কৌটার ভিতর ভোমরা-ভোমরীর মত কালো কাহারদের মেয়ে-পুরুষেরা কোথায় গেল?

পাগল হাসলে, বললে—তারা আছে, সুখেই আছে। করালী তাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছে। চন্নপুরে কারখানায় মজুরি খাটছে—খাচ্ছে। কেউ কেউ সন্ধ্যেতে আসবে। কতক বা আসবে না। বেশির ভাগই আসে না। সুখেই আছে হে তারা।

বনওয়ারী আর কোনও আক্ষেপ প্রকাশ করলে না। থাক্, তারা সুখেই থাক্।—নসু বললে, কতক মরেছে, কেউ বা পালাল্ছে।

নসুবালা হিসেব দিলে। ব'লে গেল একে একে এক-একজনের কথা। তার মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে—সেই অমণ বুড়ো গো। সবচেয়ে আগে পালাল্ছে সেই অমণকাকা তোমার। তোমাকে যেদিন অসুখ হয়ে ঘরে নিয়ে এল, ঠিক তার দুদিন বাদেই।

বুড়ো রমণ তার দুদিন পরেই গরু চরাতে গিয়ে সেখানেই বনওয়ারীর একটা ভাল গাই পাইকারদের বিক্রি ক'রে দিয়ে মাঠের পথ ধ'রে পালিয়েছে। শোনা যায়, সে আছে কাটোয়ায়, লাঠি হাতে, কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে। বলে—শেষ দশা, তাই এলাম মা-গঙ্গার ধারে। হাড় কখানা গঙ্গায় পড়লে আসছে জন্মে উঁচুকুলে জনম-টনম হবে।

নয়ানের মা মরেছে। সে মরণ তার ভীষণ। অন্তত নসু তাই বললে—নবান্নের দিন, অগ্রহায়ণের শেষ মাসে গিয়েছে নবান্ন। নয়ানের মা জাঙলে সদ্গোপ মহাশয়দের চার বাড়িতে আকণ্ঠ এঁটোকাঁটার প্রসাদ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে হাঁস-ফাঁস ক'রে মারা গিয়েছে। নড়তে পারে নাই, কথা বলতে পারে নাই, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মরেছে।

নসুবালা হঠাৎ কেঁদে ফেললে—তার মনে প'ড়ে গেল সে কথা। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল নয়ানের মায়ের সেই মরণকালের ছবি। শিউরে উঠল সে। চোখ জলে ভ'রে উঠল। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে সে বললে—এই দেখ, ওইখানে ওই গাছতলাটিতে মরেছেল নয়ানের মা। একা প'ড়ে অইল, কেউ দেখলে না। তুমি অসুখে প'ড়ে, মাতব্বর নাই, মুরুব্বি নাই, অনাথাকে দেখবার গরজ কার, বল? তবে তোমাকে নিয়েও খুব হৈ-চৈ তখন, নোকে ভাবছে—কি হয়, কি হয়? নয়ানের মাকে কে দেখবে বল? আমি দেখে কাছে বসলাম। ভাবলাম—আহা, ভাতার যেয়েছে, যুগ্যি পুত যেয়েছে—অনাথা। মনে হ'ল কি জান? আমারও হয়তো শেষে এই দশাই হবে। আমারও তো কেউ নাই। আমাকেও এমনি ক'রে মরতে হবে। মুখে জল দেলাম তো খেলে, আবার হাঁ করলে। আবার দেলাম, আবার খেলে। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললাম—কি হয়েছে নয়ানের মা? তা মুখে কিছু বলতে লারলে,

শুধু অনেক কষ্টে হাতটি তুলে কপালে আখলো! বুল্লে কিনা, বললে—কপাল—নেকন। তা'পরেতে কোঁতালে লাগল। সে কি কোঁতানি মনে হ'ল, জীউটা বেরিয়ে গেলে খালাস পায়। তা কি সে সহজে যায়? অ্যানেক এতে আঁধারের মধ্যে কখন যে জীউটা বেরিয়ে গেল, তা বুঝতে লারলাম।

—আটপৌরেদের একজন মরেছে—ওই যে গো—বেশ নামটি। কিন্তু কিছুতেই মনে থাকে না।

পাগল বললে—বিশ্বামিত্ত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! বিশ্বামিত্ত।

'বিশ্বামিত্র' নামটা নসুর মনে থাকে না।

বিশ্বামিত্রের বাবা যাত্রায় পালাগান দেখে ওই নাম রেখেছিল ছেলের। বিশ্বামিত্র মরেছে জ্বরে। তারপর এর ওর ছেলে মরেছে, কচিকাচা মরেছে—সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নসু বললে—পায়ের হাতের আঙুলে গোনা যায় না ব্যানোকাকা, হিসেব দোব কি? একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠল—আর তোমার নিমতেলে পানার হয়েছে জেল। আহা! পানকেষ্ট কদমতলায় বিহার করতে যেয়ে গেল জেলখানাতে।

—জেল?

—হ্যাঁ, জেল। নসু খুব রঙ দিয়েই বললে—যেমন জেলাপীর পাক বুদ্ধি, তেমনি ফল। মনিবের সঙ্গে হিসেব নিয়ে ঝগড়া হ'ল। পানু আমার পানকেষ্ট; মনিবের শোধ নিতে—মনিবের উপো-বাঁধানো হুঁকো চুরি করেছিল। পানার মনিবকে তো জান! পেকো মোড়ল নাম! কাজেও পেকো মোড়ল।

পাগল বললে—ধরা পড়ত না ছোঁড়া। ধরা পড়ল পরিবারের টানে। ধরিয়ে দিলে করালী! পুলিসে খবর দিয়েছিল পেকো মণ্ডল। পানু তখন লুকিয়ে পড়েছে। কোথা যে লুকিয়ে থাকত কেউ জানত না। রাত্তে এসে ঘরে চারটি ক'রে খেয়ে যেত। তুমি তখন শয্যাশায়ী অজ্ঞান, করালী বুক ফুলিয়ে আসে যায়; ছোঁড়া এখন পানার পরিবারকে নানা রকম লোভ দেখাতে লাগল। বলে—চন্ননপুরে চল্, খাটবি খাবি। ভাল কাজ ক'রে দোব আমি। সেই লোভে মেয়েটা স্বীকার করলে রাত্রে পানা এসে খেয়ে যায় বাড়িতে। করালী শুনে রাত্রে তক্কে তক্কে ছিল—ধরলে একদিন চেপে। দিয়ে দিলে পুলিসে। পানা ব'লে গেল কি জান? বললে—যাক, কিছুদিন এখন নিশ্চিন্দি।

নসু বললে—পানার বউ এখন চন্ননপুরে আণ্ডামুখো সাহেবের উড়ো-জাহাজের আস্তানায় খাটে। খাটুনি, না মাথা। ওজকার খুব; ফেশান কি!

বনওয়ারী উদাস হয়ে চেয়ে রইল। চোখ গিয়ে পড়ল তার চন্ননপুরের রাঙা পাকা পথের উপর। রাস্তাটা ঝকঝক তকতক করছে। ওই পথে সব ছুটে যায় চন্ননপুরে খাটুনি খাটতে। পাঁচ সিকে দেড় টাকা মজুরি। যারা আবার রেলের তেরপল ঢাকা মালগাড়িতে লাইনের কাজে সেইখানেই দিনরাত্রি থাকে, তারা পায় বেশি। কয়লা পায়, রেলের লোকেরা কম দামে চাল ডাল দেয়।

হঠাৎ বনওয়ারী পাগলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—পাগল, কুলকম্ম সবাই ছাড়লে? অতন, গুপী, পেল্লাদ—সবাই?

কথার উপরেই কথা দিয়ে জবাব দিলে নসুবালা—সবাই—সবাই—সবাই। কেউ বাকি নাই। মেয়েপুরুষ সব চন্নপুরে ছুটছে ভোর না হতে। সময় নাই। রবকাশ নাই। কি করবে বল? পেটের দায়।

পাগল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ওদর, পেট—বনওয়ারী, উনিই সব।

নসুবালা বললে—ম'রে যাই। শুধু ওদর? লোভ পাপ, বুয়েচ ব্যানোকাকা, পাপ। পিথিমীতে পাপের ভারা ভরতে আর বাকি নাই। একটি নোক দেখলাম না যে ধম্মের মুখ তাকায়। ঘোষেরা—তোমার এতকালের মনিব ভাগের জমি ছাড়িয়ে নিলে। সায়েবডাঙায় জমি, তুমি উইকে এক পিট ভুঁইকে এক পিঠ দিয়ে ভাঙলে। চন্নপুরের বাবু তা সব কেড়ে নিলে। পাগলমামা যেয়েছিল একবার বাবুদের ঠেনে, তা—

বনওয়ারী পাগলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—পাগল!

পাগল মাটি খুঁটতে খুঁটতে বললে—যেয়েছে, সে সব যেয়েছে, ভাই। বাবুরা এক ছটাক ভাগ দিলে না!

বনওয়ারীর কাছে পিতিপুরুষের আমল থেকে যে জমি ভাগ দিয়েছিল, ঘোষেরাও তা ছাড়িয়ে নিয়েছে।

বনওয়ারী হাসলে। যাক, সর্বস্বান্ত হয়েছে তা হ'লে। নিশ্চিন্ত।

অনেকক্ষণ পর বনওয়ারী বললে, নিজের কথা বাদ দিয়ে কাহারদের কথাই বললে—তা লোকে কারখানায় গিয়ে ভালই করেছে। দোষ দেবার কিছু নাই।

নসুবালা ব'লে গেল—দুর্দশার দিনে করালী ওদের ডাকলে। নিয়ে গেল চন্নপুরের রেলের কারবারে কারখানায়। কাজ দিলে। সব সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল। তোমার এত বড় ব্যামো গেল, কেউ খোঁজও করলে না।

বনওয়ারী হাসলে—তা না করুক।

নসু বললে—না এলে দুঃখ হয় বইকি। দুঃখ হয় না?

পাগল হেসে বললে—দুঃখ ক'রেই বা কি করবে বুন?

বনওয়ারীর হাতপায়ের ডগাগুলি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

নসু বললে—আমি শুধু যাই নাই। ব্যানোকাকা, ওই মুখপোড়া করালীর উপর ঘেন্নায় লজ্জায় যাই নাই। যত ভালবাসতাম তাকে, তত বিষ হয়েছে তার ওপর। ছি-ছি-ছি! লজ্জায় মরে যাই! সে আবার সেপাইদের মতন পোশাক প'রে আজকাল বলে—মেলেটারি! জুতো পরে, টুপি মাথায় দেয়!

নসুবালা ব'লে যায় করালীর লজ্জাকর ঘৃণার্হ কীর্তিকলাপের কথা। বনওয়ারী কয়েকদিন তখন শয্যাশায়ী, এখন-তখন অবস্থা, সেই সময় একদিন সকালে দেখা গেল, সুবাসী নাই।

সুবাসী তার আগের দিন বনওয়ারীর চিকিৎসার খরচের অজুহাতে গরু-বাছুরগুলি বিক্রি করেছিল। সেও টাকাকড়ি সব নিয়ে বনওয়ারীকে ফেলে গভীর রাত্রে অদৃশ্য হ'ল। দুপুর নাগাদ খবর এল, সুবাসী চন্নপুরে—করালীর বাসায়। বনওয়ারীকে 'মামা' বলত করালী। সম্পর্ক বাছলে না—ছি-ছি-ছি! রোগা মানুষ বনওয়ারী, মেয়েটা চ'লে গেলে তার কি হবে, সে কথাও একবার ভাবলে না। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ঘৃণার্হ করালী। শুধু গায়ের জোরে, রক্তের তেজে, আর রোজগারের গরমে ধর্মকে পায়ে মাড়িয়ে গেল, রীতি-ব্যবহারকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে, থুথু দিলে। ছি! ছি!

বনওয়ারী মাটির দিকে চেয়ে রইল স্থিরদৃষ্টিতে। না বললেও সে এ কথা মনে মনে বুঝেছিল। তার অন্তর ব'লে দিয়েছিল—সুবাসী যখন পাশে নাই, ঘরে নাই, তখন করালী তাকে নিয়ে গিয়েছে। হাসতে হাসতে কালোবউয়ের মত রঙ্গ ক'রে করালীর সঙ্গে গিয়েছে, সে তা জানে। যাবেই—এই নিয়ম। হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় এই কথাটি পুরানো কথা। পাগল হাসলে, ঘাড় নাড়লে, সেও জানে—হাঁসুলি বাঁকে এই নিয়ম। নসু চোখ মুছছিল, চোখ মুছে সে আবার বললে—বলব কি ব্যানোকাকা, পাখীর মত মেয়ে, তার মুখের দিকেও চাইলে না সে। পাখী—আঃ—কি বলব ব্যানোকাকা—'চোখ গেল' পাখী যেমন 'চোখ গেল' ব'লে ডেকে সারা হয়, তেমনি ক'রে কাঁদলে, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদলে।

আবার কাঁদতে লাগল নসুবালা। চোখ মুছতে লাগল। বললে—আঃ আঃ, পাখীর কথা মনে হ'লে আমার হিয়েটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আবার চোখ মুছে বললে—আমি আর লারলাম কাকা। আমি করালীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে গাল দিয়ে চ'লে এলাম—গাঁয়ে চ'লে এলাম। ব'লে এলাম—জনমের মত হ'ল তোর সঙ্গে। গাঁয়ে এলাম। এসেই মনে পড়ল তোমার কথা। আঃ, তোমাকে কে দেখছে? ঘরে তো আর দ্বিতীয় জন নাই। সুবাসী পালিয়েছে, অমন পালিয়েছে, কে দেখবে? রোগা মানুষ, প্রলয় জ্বর, অচেতন অবস্থা—কি হবে মানুষটির? সম্বলহীন অবস্থা; যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে সুবাসী। সংসার নিয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত, মাথার ঘায়ে পাগল কুকুরের মত ছুটে বেড়াচ্ছে যারা, তাদেরই বা অবসর কোথায়। মেয়েরা দু-একজন আসছিল, যাচ্ছিল, দেখছিল; কিন্তু ঘরে তো আর স্ত্রীলোক ছিল না। শূরবীরের মত বিকারগ্রস্ত পুরুষ বনওয়ারী, পরের ঘরের স্ত্রীলোকেরা তাকে সামলায় কি ক'রে? তবে কি মানুষটা এতবড় শূরবীর, এতবড় মান্যের 'নোকটি'—বিনা সেবায় মরবে? রাত্রে জলের জন্য হাঁ ক'রে জল পাবে না, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে ছাতি ফেটে ম'রে যাবে? আমার মন বললে—তবে তু কি করতে আছিস? ভগবান যে তোকে পুরুষ গ'ড়েও মেয়ের মন দিয়েছে, মেয়ের মতন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, কেনে দিয়েছে? আর এক দণ্ডের জন্য ভাবলাম না। চ'লে এলাম, শিয়রে এসে বসলাম।

ভগবানকে প্রণাম করে নসু বললে—তা তাঁর চরণে পেনাম, তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি।

বনওয়ারী আবার বললে—কেনে বাঁচালি নসু?

—তোমার পেরমাই আর আমার হাত ধন্যি।

পাগল হেসে বললে—মরলেই তো ফুরুল বনওয়ারী। বহুভাগ্যের মনিষ্যি-জন্ম নয়ন ভ'রে

সাধ মিটিয়ে দেখে লে। মরণ আছেই। হঠাৎ সে গান ধ'রে দেয়—

হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায় ?
কোপাই নদীর জলে—কথা ভেসে যায়।

ওদিকে বাঁশ কাটা, গাছ কাটা চলছেই। খট-খট-খট-খট! খটাং খটাং! মড়-মড় শব্দে আছাড় খেয়ে পড়ছে গাছ, বাঁশ শুয়ে পড়ছে অল্প শব্দ ক'রে—মার-খাওয়া গরিব মানুষের মত। গাছ পড়ছে হাঁসুলী বাঁক পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

খট—খট—খট—খট—খটাং—খটাং শব্দ ছুটে চলেছে চারিদিকে। হাঁসুলি বাঁকের বেড়ের কূলে কূলে ছড়িয়ে যাচ্ছে ; দূরে দূরান্তরে, কোপাইয়ের পুলে ঘা খেয়ে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। হয়তো হাঁসুলী বাঁকের ভাবীকালে দেশদেশান্তরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘোষণা ক'রেও তার তৃপ্তি হচ্ছে না—প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে ফিরে এসে অতীতকালের কল্পে কল্পে যেন আঘাত হেনে চলেছে।

নসুর কথা ফুরাবার নয়। সে আবার আরম্ভ করলে—দুঃখ আমার পাখীর জন্তে। আঃ সোনার বরণ 'হলুদমণি' 'বেনেবউ' পাখী গো—সেই পাখী মনে পড়ে আমার পাখীর কথা মনে হ'ল। হ্যাঁ, মেয়ে বটে। বুঝলে, যেমনি সুবাসীকে নিয়ে গেল করালী, পাখী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। পাখীর কান্না দেখে আমি তো গালি-গালাজ ক'রে পালিয়ে এলাম। সেই দিন সন্জে-বেলায় এই খানিক আঁত হয়েছে, এমুনি সময় পাখীও পালিয়ে এল গাঁয়ে মায়ের কাছে। কাপড় অক্তেতে আঙা হয়ে যেয়েছে। পাখীর চোখ জ্বলছে।

জ্বলবে বই কি! কাহার-মেয়ে ক্ষেপে উঠেছিল যে! সে যে তখন দু-কূলভাঙা কোপাইয়ের মত ভয়ঙ্করী।

সন্ধ্যাবেলা কান্না শেষ ক'রে পাখী ঝগড়া আরম্ভ করেছিল করালীর সঙ্গে। তারপর একখানা কাটারি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে গিয়ে হঠাৎ সে ব'লে উঠল—একা মরব কেন ? করালী চেষ্টা করেছিল তার হাত ধরতে, তবু পাখী কাটারি বসিয়ে দিল করালীর মাথায়। শুধু করালীর মত পুরুষ আর তার হাত ধ'রে ফেলেছিল ব'লেই বেঁচেছে করালী, নইলে তাকে বাঁচতে হ'ত না। তবু খানিকটা চোট লেগেছিল করালীর মাথায়। সেই রক্ত মেখে পাখী এখানে পালিয়ে এল পাগলিনীর মত। পরদিন সকালে করালী এল কাহারপাড়ায় মাথায় ডাক্তারখানার ফেটা বেঁধে। তখন পাখী সাধের খাঁচায় ম'রে প'ড়ে আছে। তার সাধের কোঠাঘরের সাঙায় দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে ; তবে হ্যাঁ, করালীর কপালে পাখী চিরস্থায়ী দাগ এঁকে দিয়ে গিয়েছে। পাখীকে ভুলবার পথ রাখে নাই পাখী।

বসন—পাখীর মা চিরকালের ভাল মানুষ। আর চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে প্রেমের কথা তো সবাই জানে। কাহারপাড়ার বিচিত্র মেয়ে বসন্ত। ওই চৌধুরীর ছেলেকে সে যে ভাল-বেসেছিল, তারপর সে আর কারও দিকে ফিরে তাকায় নাই। কাহারপাড়ার নীল বাঁকে শালুকের বনের মধ্যে পদ্মকলি যেমন উদয়াস্ত সূর্যের দিকেই চেয়ে থাকে, তেমনি ওই একজনের দিকেই ছিল তার মন প্রাণ চোখ সব। চৌধুরীদের ছেলের মৃত্যুর পর সে থাকত সৎজাতের গৃহস্থ ঘরের বিধবার

মত। শান্ত মৃদুভাষী বসন্ত—মেয়ের মৃত্যুর পর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওই ভাঙা চৌধুরী-বাড়িতে। সেইখানেই এঁটোকাঁটার প্রসাদ খায়, আর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প'ড়ে থাকে।

বসন্তের মা সুচাঁদ চন্ননপুরে আছে। রেলের হাসপাতালের আশ্চর্য চিকিৎসা! পা কাটতে হয় নাই। বুড়ী বেঁচেছে। লাঠি ধ'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়ায় ভিক্ষে ক'রে। চন্ননপুরের ভদ্রলোকদের বাড়ি গিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে, ইষ্টিশানের গাছতলায় ব'সে বলে। কেউ থাকলেও বলে, না থাকলেও বলে, ব'লেই যায়, বলেই যায়—বাঁশবনে-ঘেরা তন্দ্রা-মাখা স্বপ্নসুলভ ছায়াচ্ছন্ন হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। ফুলে ভরা, বিষে ভরা, রঙে স্নিগ্ধ, বেরঙে উগ্র, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বসন্ত তার সাদা রঙের তুলির দাগ, পাখী তার রক্তলেখা। এই কথা সে নিজের ভাষায় বলে। সম্ভবত হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে নিজে হ'ল আদ্যি-কালের বুড়ী; করালী হ'ল দৈত্য কিংবা শয়তান—কিংবা সে-ই হ'ল রাজপুত্র, নতুন কালের মাতব্বর। যুদ্ধকে ওই ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশি ক'রে ঢোকালে হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায়। সে-ই ঠিকাদারদের খবর দিলে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে আদ্যিকালের বুড়োবট রয়েছে। কেটে ফেললে সেই বটগাছটা। প্রথমে এসেই তারা কাটলে সেই বটগাছ। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার হাড়-পাঁজরা-মেরুদণ্ড কাটিয়ে এনে তৈরি করছে যুদ্ধের হুকুম মত ইতিহাসের ছাদে ঘরবাড়ি।

মড় মড়—দুম! প্রচণ্ড উচ্চ শব্দে চকিত হয়ে উঠল হাঁসুলী বাঁক। এক ঝাঁক পাখী কলরব ক'রে উঠল। অল্প এক-ঝাঁক। ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য পাখীর দলের বাসা ঘুচে গিয়েছে হাঁসুলী বাঁক থেকে। দাঁতালের দুটো একটাও এ শব্দে ছুটে বার হ'ল না। ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ভয়ার্ত গরু ছুটে এল না, ছাগলও না। ছেলেরা ছুটে বেরিয়ে গেল না দেখতে, এত কিসের শব্দ! ছেলেদের নিয়েই যে খাটতে যায় কাহারেরা চন্ননপুরে। তা ছাড়া থাকলেও হয়তো তারা এ শব্দে বিস্মিত হ'ত না; চন্ননপুরের ধ্বনির উচ্চতা এবং বৈচিত্র্য এর চেয়ে যে অনেক বেশী সমৃদ্ধ।

ছাগল গরু নাই-ই আর কাহারপাড়ায়। যুদ্ধ লেগেছে। চালান যাচ্ছে। দু টাকার ছাগল দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দশ টাকার গাইয়ের দাম তিরিশ টাকা। পঁচিশ টাকার বলদ একশো টাকা। দুধের দাম নয়, হেলের শক্তির দাম নয়, মাংসের দাম। যুদ্ধ কাহারদের গোসেবা দুধ বিক্রি ভুলিয়ে দিলে, ও ব্যবসাটাই ঘুচিয়ে দিলে।

নসু উঠে দেখলে, ব্যাপার কি? গালে হাত দিয়ে শিউরে উঠল সে।—মা গো, দহের ধারে সেই শিমুলবৃক্ষটিকে কাটলে গো! মড়মড় শব্দে প্রচণ্ডবেগে পড়ছে আদিকালের বনস্পতি। তার পড়ার বেগের ঝটকা তখনও বাতাসে ব'য়ে চলেছে। বোধ হয় শুধু বেগের মধ্যে দিয়ে ব'লে যাচ্ছে—আমি যাচ্ছি।

খট-খট-খট—খট-খট-খট। বাঁশ কাটছেই। আজ একটা পাশ একেবারে সাফ হয়ে হাঁসুলী বাঁক মিলে গেল—দূর দেশান্তরের সঙ্গে! হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় শেষকালে শুধু গাছকাটার শব্দ। মানুষেরা চন্ননপুরে চ'লে গিয়ে শহরে বাজারে রাজপথে চলমান দ্রুতধাবমান জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়েছে। স্থাণু স্থাবর বনস্পতি, যারা সর্বপ্রথম গড়েছিল হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ছায়াচ্ছন্ন শান্ত-তন্দ্রালু গ্রামখানি, তারাই যাচ্ছে এবার, তারা হচ্ছে বিগত। তারই মধ্যে ব'সে আছে

সে যুগের শেষ মানুষ বনওয়ারী, স্থাবরের মত।

খুঁটি ধ'রে সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চারিদিকে এবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। কিছুই নাই—কিছুই নাই—হাঁসুলী বাঁকের সে কাহারপাড়ার আর কিছুই নাই। বাঁশবনের বেড় নাই, আদ্যিকালের বৃক্ষ নাই, মানুষ নাই, জন নাই; পশু নাই, পক্ষীরা পর্যন্তও নাই। পক্ষীর মধ্যে আছে কাকেরা, তারা উচ্ছিন্ন বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল থেকে গৃহহীন পতঙ্গগুলিকে ধ'রে খাচ্ছে। চারিদিকে শুধু শক্ত বাঁধানো লাল কাঁকড়ের পথ। আছে শুধু কোপাইয়ের বেড়, হাঁসুলী বাঁকের মাটি, আর পুরানো আমলের পড়-পড় জনহীন ঘরগুলি। ওগুলির দিকে তাকিয়ে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালে—শূন্য বাঁশঝাড়ের দিকে। একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ও ঘরগুলিও থাকবে না।

সন্ধ্যার সময় সে পাগলকে বললে—দেহ এইবার আখি, কি বলিস ?

—দেহ রাখবি ?—পাগল চমকে উঠল।

—আর বাঁচব না। বেঁচেও লাভ নাই। দেখার লোভ তোর আছে, তু দেখ, নয়ন ভ'রে দেখ্‌।

পাগল তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে—মন খারাপ করিস না ভাই।

—মন খারাপ নয় পাগল, মন আমার পাষাণ হয়ে যেয়েছে। কথা তা নয়। আমার ডাক এসেছে। বুঝেচিস—বেশ বুঝতে পারছি। একলা থাকলেই অন্তর আমাকে বলছে—চল্‌।

—ও তোর মনের ভুল।

—উঁহু! ঘাড় নাড়লে বনওয়ারী।

আজ আবার খানিক জর হয়েছে। বনওয়ারীর কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল পাগল।

বনওয়ারী বললে—আমার একটি সাধ ছিল পাগল, অ্যানেক দিনের সাধ। কত জনকে জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে গিয়েছি। মনে আছে তোর, কাঁদরা যেয়েছিলাম বিয়েতে, আটমঙ্গলায় বরকনে পৌঁছিয়ে দিয়ে খালি পাল্কি কাঁধে ফিরে আসছি—গাছতলায় এক বুড়ো বাবাজীর সাথে দেখা হয়েছিল ?

—মনে আছে বইকি। মহাপুরুষ। মনে থাকবে না! দুপুরে ওদে গাছতলায় ঠেস দিয়ে ব'সে ছিলেন, গলা দিয়ে রব বেরোয় না। তু জল দিলি। জোড় হাত ক'রে বললি—নীচ জাত, জল দিয়েছি মুখে, আমার অপরাধ লেবেন না বাবা। বাবা বললেন—আমার নিজেরই জাত নাই বাবা, আমি জাতহারা বোষ্টম, বৈরাগী। মনে আছে বইকি।

—আমি শুধালাম—এই দেহ নিয়ে পথে কেন বেরিয়েছেন বাবা ? বাবা বললেন—বাবা, দেহখানা আর বইছে না ব'লেই ওকে রাখতে চলেছি। মনে আছে ? বললেন—অনেক দিন ও আমাকে বয়েছে বাবা, আমিও ওকে অনেক ভালবেসেছি। কত সাজিয়েছি, কত মাজ্জনা করেছি, ওর গরবে কত গরব করেছি, তাই যেখানে সেখানে ওকে ফেলে যেতে আমার মন সরছে না। চলেছি মা-গঙ্গার কূলে, জলে শোব, মাথাটি রাখব কূলে—প্রভুকে ডাকতে ডাকতে চ'লে যাব, ওকে মা-গঙ্গার জলে দিয়ে যাব। মনে আছে ? আমরা তখন ধরলাম—বাবা চলুন, এই পাল্কীতে আপনাকে বহন ক'রে নিয়ে যাব। বাবা হাসলেন।—চল, নিয়ে চল।

একটু চুপ ক'রে থেকে বনওয়ারী আবার বললে—জানিস, গঙ্গাতীরে বাবাকে আমি শুধিয়ে-

ছিলাম, তোরা ছিলি না কাছে, একা পেয়ে শুধালাম—বাবা, আপনার তো ওগ কিছু নাই, তা কি ক'রে বুঝছেন ? বাবা বললেন —বাবা, মন বলছে আমার। এই রাতদুপুরে—হ্যাঁ। তারপর হেসে বললেন—বাবা, মন বাইরের মায়ায় ভুলে থাকে ব'লে ভিতরের খবর পায় না। মোটা কথা ধর না বাবা, চাষে যখন মেতে থাক, তখন ক্ষিধে বুঝতে পার না। খেতে মনে থাকে না। মন যদি বাইরের থেকে চোখ ফিরিয়ে আপনার ভিতরের মনের সঙ্গে কথা বলে,তবে সে ঠিক বলবে—ভাই, এইবার আমি যাব। তা আমার বাইরের নেশা ছুটেছে ভাই। আমি ভিতরের জনের কথা শুনতে পেছি যে। বলছে—আমি যাব।

পাগলের চোখ দিয়ে দরদরধারায় জল পড়ছিল। বনওয়ারী বললে—কাঁদিস না মিতে। জ্ঞানগঙ্গা কাহারের ভাগ্যে হবার নয়। তবে আমার মা-কোপাই তো অয়েছেন, আমি যখন বলব রে, তখন যেন কোপাইয়ের কূলে আমাকে তোরা দুজনে ধ'রে নিয়ে যাস। বুয়েছিস ?

সে পাগলের হাত দুটি চেপে ধরলে।

পাগল বললে—যাব।

—আর কাহারদিগে একবার খবর দিবি। যদি আসে, তো একবার দেখে যাব নয়ন ভ'রে।

সে হাসলে।

পাগল অনেকক্ষণ পর বললে—নটে গাছটি মুড়িয়ে গেল, হাঁসুলী বাঁকের কথা শেষ হয়ে গেল। হাঁসুলী বাঁকেরও শেষ হয়ে গেল।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়লে—না।

না। বাকী আছে। কত্তা বলেছেন, কালরুদ্রের খেলা, হরির বিধান, বান না এলে শেষ হবে না হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। প্রলয়ঙ্কর বান। কোপাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ক্ষ্যাপা কাহার-মেয়ের মত ; কোপাই ক্ষেপে উঠে হাঁসুলী বাঁককে শেষ ক'রে দিয়ে যাবে।

এল বান। তেমনি ক্ষ্যাপা বান। হুড় হুড়—দুড় দুড়—কল কল—খল খল শব্দে ভেসে উঠল কোপাইয়ের দু কূল। সেই বাবাঠাকুর যেবার খড়ম পায়ে দিয়ে বন্যার জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, তার চেয়েও বড় বান। প্রলয় বান। এবার কিন্তু কাহারেরা ডুবে মরল না। গাছেও চড়ল না। এবার তারা ছিল চন্নপুরে। হাঁসুলী বাঁক বন্যায় ডুবে গেল। বাঁশবনের বেড় নির্মূল হওয়ায় কোপাইয়ের বান এবার শতগুণ বেগ নিয়ে ব'য়ে গেল কাহারপাড়ার উপর দিয়ে। ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে গেল গোটা কাহারপাড়া। একখানি ঘরও রইল না দাঁড়িয়ে। নীল বাঁধ পুরে গেল বালিতে। সায়েবডাঙার জমিগুলি পলিতে সোনা হয়ে উঠল। সায়েবদের কুঠি শেষ হয়ে গেল, চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

বন্যার কথা উপকথা নয়, ইতিহাসের কথা। ১৩৫০—ইংরিজি ১৯৪৩ সালের বন্যা। তেরশো পঞ্চাশের যে বন্যায় রেল-লাইন ভেসে গেল, সেই বন্যা। ইতিহাসে আছে তার কথা। দামোদরের অজয়ের ময়রাক্ষীর কোপাইয়ের বন্যায় শুধু রেল-লাইন ভাসে নি, হাঁসুলী বাঁকের মত অগণিত স্থানের উপকথার পটভূমি ভেসে গিয়েছে, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ইতিহাস অবশ্য কর্তার বাণী,

কালরুদ্রের খেলা, হরির বিধান মানে না। সে বলে—আকস্মিক, কাকতালীয়। বলুক—সত্য যাই হোক, কাহারেরা একে সত্য বলেই মানে।

পাগল বলে—বনওয়ারী জানত। সে হেসেছিল কাটা বাঁশবেড়ের দিকে চেয়ে। তার সে হাসি আমি চোখে দেখতে পেছি।

বনওয়ারী প্রবল বন্যার আগেই দেহ রেখেছে। ঠিক যেমনটি তার সাধ ছিল, তেমনটি ক'রেই রেখেছে। মৃত্যুর তিন দিন আগে—কোপাইয়ের গর্ভে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে শয্যা পেতেছিল। গোটা কাহারপাড়াকে ডেকে, তাদের নয়ন ভ'রে দেখে, হাসতে হাসতে দেহ রেখেছে সে। শুধু দেখা হয় নাই করালীর সঙ্গে। করালী –ডাকাবুকো করালী, সে-ই শুধু আসে নাই। এল তার মৃত্যুর পর। বনওয়ারী আরও বলেছিল—ওই দহের ধারে আমাকে দাহ করিস। যেখানে কালোবউ দহের জলে পড়েছিল, যেখানে তার বড় বউকে দাহ করা হয়েছিল—সেইখানে। তাই হয়েছিল। সেই দাহের সময় সে এসে দাঁড়াল। নিয়ে এসেছিল পাকা শাল কাঠ আর ঘি। তাতেই চিতা সাজিয়ে বনওয়ারীকে চাপিয়ে তার পায়ের পরশ নিলে মাথায়। বললে—যাও, চ'লে যাও সগ্‌গে।

উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।

কাহারেরা এখন নতুন মানুষ। পোশাকে-কথায়-বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে। মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্নপুরের কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে। কিন্তু তার জন্যে বাবাঠাকুরকে ডাকে না! ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে—বাতাস-দেখার যন্ত্রটার দিকে।

তবু চন্নপুরের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্স থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে। কিন্তু কি ক'রে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে?

হাঁসুলী বাঁক বসতহীন হয়ে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। বন্ধ্যা মেয়ের মত নতুন সন্তান-সন্ততির জন্য তপস্যা করছে। বন্যায় চাপানো বালির রাশি—হাঁসুলী বাঁকের সোনার মাটির উপর চেপে ধু-ধু করছে, সেখানে শুধু নসুবালাই যায়। নিত্যই যায়। তার না গেলে চলে না। সে যায় ওই বাঁকে গোবর কুড়াতে, কাঁকড়া মাছ ধরতে, কাঠ ভাঙতে। চারিদিক তাকিয়ে দেখে আর পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদে—মা জন্মনী গো! আমার মা জন্মনী গো!

পাগল গান গায় গাঁয়ে গাঁয়ে, দোরে দোরে—ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে—

হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়!

পাগল গান গায়, ঢোলক বাজায়, তার সঙ্গে নসুবালা কাঁচা পাকা চুলের বেণীতে লাল ফিতে জড়িয়ে খোঁপা বেঁধে নূপুর পায়ে নাচে। ঘুঙুর পছন্দ করে না নসু।

পাগল আর ক্ষ্যাপায় না নসুকে। নসুও ক্ষ্যাপে না। হাসে। দুজনে মিলেছে সেই

বনওয়ারীর ঘর থেকে।

পাগল গায়—

যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশের হয় বাঁশি
বাঁশবাঁদির বাঁশগুলিরে তাই তো ভলোবাসি।

নসু নাচতে নাচতেই গান ধরে।

বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার-কুলের পিতা
বাঁশবনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা
পরাণ-ভ্রমরে সে থাকত আগুলি,
(ও হায়) তারে দাহন ক'রে মারল করালী!
বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার-কুলের পরাণ-ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ের ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি—
কাহারেরা, হায় রে বিধি, হ'ল ভ্রমণকারী।
ঘর-ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়!

পাগল গান ধরে—

জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়ার খেলা দেখে যা রে ভাই।

পাগল গানের মধ্যেই কাহারপাড়ার আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত সুচাঁদের হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে গান গেয়ে ব'লে যায়। সর্বাগ্রে বলে—সৃষ্টিতত্ত্ব; শেষে বলে সেই শেষ কথা—দুঃখই বা কিসের, চোখের জলই বা ফেলছ কেনে? ভাঙা গড়া—হ'ল বিধাতা বুড়োর খেলা। একটা ভাঙে একটা গড়ে—এই চলছে আদিকাল থেকে। ছেলেরা যেমন বালি দিয়ে ঘর গড়ে আবার ভাঙে, মুখে বলে—হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম, ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি!

সুচাঁদ গাছতলায় ব'সে ব'লে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। শ্রোতারা কেউ শোনে গোড়াটা, কেউ মাঝখানটা, কেউ বা শেষটা। অর্থাৎ খানিকটা শোনে, তারপর উঠে চ'লে যায়। বুড়ী আপনমনেই ব'লে যায়। গল্প শেষ ক'রে বলে—বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিস যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে; তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত। তা তো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই এ উপকথার শেষ। তবে পার তো নিকে রেখো। আঃ—হাঁসুলী বাঁকও শেষ—আমিও শেষ,কথাও শেষ। আঃ—আঃ!

কিন্তু—। বলতে বলতে থেমে যায় সুচাঁদ। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে। ভাবে, শেষ কি হয়? কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে? চন্দ সূয্যি যত কাল, তার পরেও তো শেষ নাই; তার

পরে আছেন মহাকাল। বাবা কালারুদ্দের চড়ক পাটার ঘোরা। সে ঘোরার শেষ নাই। আলো নাই, অন্ধকার নাই, তবু পাটা ঘোরার শেষ নাই। সেই ঘোরাতেই তো কখনও প্রলয়, কখনও সৃষ্টি। আঁধারে সৃষ্টি ডোবে, আবার আলোতে ওঠে। তবে শেষ কি ক'রে হবে? সে ভাবে।

হঠাৎ একদিন ছুটে এল নসুবালা। প্রায় বছর দুয়েক পর। বললে—ওলো দিদি, দিদি লো! আমার নূপুর জোড়টা দে লো। আমি নাচব।

দিদি তখন কথা শেষ ক'রে বলছে—সব শেষ লো—সব শেষ।

নসু হেসে ঢলে প'ড়ে ব'লে উঠল উচ্চ কণ্ঠে—না লো দিদি, শোন্। আমি কি দেখে এলাম শোন্। দেখে এলাম, বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। আর কি কচি কচি ঘাস! আর দেখে এলাম সেই ডাকাবুকোকে।

—বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে!

—হ্যাঁ।

—আর সেই ডাকাবুকোকে দেখে এলি? করালীকে?

—হ্যাঁ লো পিসী। লুকিয়ে একা গিয়েছে—গাঁইতি হাতে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে আর কি খুঁজছে। খানিক খুঁজছে। আবার উঠছে, আবার খুঁড়ছে। শুধালাম—কি খুঁজিস? বললে—মাটি। ঘর কর আবার। নতুন কাহারপাড়া হবে। নতুন বাঁধ দেবে।

সুচাঁদ দু'হাত তুলে সানন্দে বলে—আবার নতুন বাঁশের বেড়া উঠবে—

নসু বললে—না, বাঁশের বেড় দেবে না। এবার বালি মাটি স্তুপ্যুইমান ক'রে বাঁধ দেবে। দিয়ে, তার গায়ে শরবন লাগাবে। বাঁশের বেড়ে আঁধার হয়! সে আমাকে অনেক কথা বললে পিসী—অনেক কথা। এক ঘর কথা।

পাগল ঘাড় নাড়তে লাগল। তার মনে গান এসেছে। নতুন গান

যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে, যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে;—
ভাঙা গড়ার কারখানাতে, তোরা, দেখে আয় রে উঁকি মেরে।

নসু সঙ্গে সঙ্গে পায়ে নূপুর বেঁধে নাচতে লেগে গেল—

তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী
ননদিনীর শাসনে, চরণের নূপুর থামিতে চায় না।
তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন!

হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

পরম শ্রদ্ধেয়

কবি কালিদাস রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দাদা,

রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
আষাঢ়, ১৩৫৫

তারাশঙ্কর

হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে। দেবতা কি যক্ষ কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহারেরা।

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে—তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এই জন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজাবাঁশবাঁদি, লাট্ জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর-তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ—কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর, এবং তন্তুবায় দু ঘর। জাঙলের সীমানা বড়; হাসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিতও অনেক—নীলকুঠির সাহেবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিন শো বিঘা।

সম্প্রতি জাঙল গ্রামের সদ্‌জাতির ভদ্রলোক বাবু মহাশয়েরা বেশ খানিকটা ভয়ার্ত হয়ে উঠেছেন। অল্প আড়াই শো বিঘা সীমানার বাঁশবাঁদি গ্রামের অর্থাৎ হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা বলছে—বাবু মশায়েরা 'তরাস' পেয়েছেন। অর্থাৎ ত্রাস। পাবারই কথা। রাত্রে কেউ যেন শিস দিচ্ছে। দিনকয়েক শিস উঠেছিল জাঙল এবং বাঁশবাঁদির ঠিক মাঝখানে ওই হাঁসুলী বাঁকের পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকিতে—বেলগাছ এবং স্যাওড়া ঝোপে ভর্তি, জনসাধারণের কাছে মহা-আশঙ্কার স্থান ব্রহ্মদৈত্যতলা থেকে। তারপর কয়েকদিন উঠেছে জাঙলের পূর্ব গায়ে কোপাইয়ের তীরের কুলকাঁটার জঙ্গল থেকে। তারপর কয়েকদিন শিস উঠেছিল আরও খানিকটা দূরে—ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে স'রে। এখন শিস উঠছে বাঁশবাঁদির বাঁশবনের মধ্যে কোনখান থেকে।

বাবুরা অনেক তদন্ত করেছেন। রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ করেছেন, দু-একদিন লাঠি-সোঁটা বন্দুক নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে হৈ-চৈ করেছেন, খুব জোরালো হাতখানেক লম্বা টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিক দেখেছেন, তবু কিছুরই সন্ধান হয় নাই। কিন্তু শিস সেই সমানেই বেজে চলেছে। ক্রোশখানেক দূরে থানা। সেখানেও খবর দেওয়া হয়েছে; ছোট দারোগাবাবুও এসেছিলেন দিন তিনেক রাত্রে, কিন্তু তিনিও কোন হদিস পান নাই। তবে নদীর ধারে ধারে শব্দটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা ঠিক। এইটাই তিনি সমস্ত শুনে ঠাওর ক'রে গিয়েছেন।

দারোগাবাবু পূর্ববঙ্গের লোক—তিনি ব'লে গিয়েছেন, নদীর ভিতর কোন একটা কিছু হচ্ছে। 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস।' ভাবেন, খানিকটা ভাবেন। সন্ধান মিললে পর খবর দিবেন।

'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস'—কথাটা অবশ্য ডাকপুরুষের বচন—পুরুষানুক্রমে চ'লেও আসছে দেশে। সে কথা কখনও মিথ্যা নয়, কিন্তু দেশভেদে বচনেরও ভেদ হয়, তাই ও-কথাটা হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির জাঙল গ্রামে ঠিক খাটে না। বাংলাদেশের এই অঞ্চলটাতেই খাটে না। সে হ'ল বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল। জাঙল গ্রামের ঘোষ-বাড়ির এক ছেলে ব্যবসা করে কলকাতায়। কয়লা বেচা-কেনা করে, আর করে পাটের কারবার। বাংলাদেশের সে অঞ্চল ঘোষবাবু ঘুরে এসেছে। সে বলে—সে দেশই হ'ল নদীর দেশ। জলে আর মাটিতে মাখামাখি। বারোটি মাস ভরানদী বইছে; জোয়ার আসছে, জল উছলে উঠে নদীর কিনারা ছাপিয়ে সবুজ মাঠের মধ্যে ছলছলিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; জোয়ারের পর আসছে ভাঁটার পালা, তখন মাঠের জল আবার গিয়ে নামছে নদীতে; নদীর ভরা কিনারা খালি হয়ে কূল জাগছে। কিন্তু তাও কিনারা থেকে বড়জোর দু-আড়াই হাত; তার বেশি নামে না। সে নদীও কি এমন-তেমন, আর একটি-দুটি? সে যেন গঙ্গা-যমুনার ধারা, থৈ-থৈ করছে, থমথম করছে; এপার থেকে ওপার পারাপার করতে এ দেশের মানুষের বুক কেঁপে ওঠে। আর সে ধারা কি একটি? কোথা দিয়ে কোন্ ধারা এসে মিশল, কোন্ ধারা কোথায় পৃথক হয়ে বেরিয়ে গেল—তার হিসাব নাই। সে যেন জলের ধারার সাতনরী হার, —হাঁসুলী নয়। নদীর বাঁকেরই কি সেখানে অন্ত আছে? 'আঠারো বাঁকি' 'তিরিশ বাঁকি'র বাঁকে বাঁকে নদীর চেহারা সেখানে বিচিত্র। দু ধারে সুপারি আর নারিকেল গাছ;—সারি নয়—বাগিচা নয়—সে যেন অরণ্য। সঙ্গে আরও যে কত গাছ, কত লতা, কত ফুল,—তা যে দেখে নাই, সে কল্পনা করতে পারবে না। সে দেখে আশ মেটে না। ওই সব নারিকেল-সুপারির ঘন বনের মধ্য দিয়ে বড় নদী থেকে চ'লে গিয়েছে সরু সরু খাল, খালের পর খাল। সেই খালে চলেছে ছোট ছোট নৌকা। নারিকেল-সুপারির ছায়ার তলায় টিন আর বাঁশের ছেঁচা বেড়া দিয়ে তৈরি ঘরের ছোট ছোট গ্রাম লুকিয়ে আছে। সরু খালগুলি কোন গাঁয়ের পাশ দিয়ে, কোন গ্রামের মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ও-দেশের ছোট নৌকোগুলি এ দেশের গরুর গাড়ির মত। নৌকাতেই ফসল উঠছে ক্ষেত থেকে খামারে, খামার থেকে চলেছে হাটে-বাজারে, গঞ্জে-বন্দরে; ওই নৌকোতেই চলেছে এ গাঁয়ের মানুষ ও-গাঁয়ের কুটুমবাড়ি, বহুড়ী যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, মেয়ে আসছে বাপের বাড়ি;' মেলা-খেলায় চলেছে ইয়ারবন্ধুর দল। চাষী চলেছে মাঠে—তাও চলেছে নৌকোতেই, কাস্তে নিয়ে লাঙল নিয়ে একাই চলে নৌকো বেয়ে। শরতের আকাশের ছায়াপথের মত আদি-অন্তহীন নদী,—সেই নদীতে কলার মোচার মত ছোট্ট নৌকোর মাথায় ব'সে—বাঁ হাতে ও বাঁ বগলে হাল ধ'রে, ডান হাতে আর ডান পায়ে বৈঠা চালিয়ে চলেছে। ঘোষের ছেলে শতমুখে সে দেশের কথা ব'লে ফুরিয়ে উঠতে পারে না। এ নদীর ধারে বাস—ভাবনার কথাই বটে। ভাবনার কথা বলতে গিয়ে ঘোষের ছেলের চোখে ভয় ফুটে ওঠে—সময়ে সময়ে শরীরে কাঁটা দেয়। ওই নদীর সাতনরী হার আরও নীচে গিয়ে এক হয়ে মিশেছে। তখন আর নদীর এপার ওপার নাই। মা-লক্ষ্মীর গলার

সোনার সাতনরী হয়ে উঠেছে যেন মনসার গলার অজগরের বেড়; নদী সেখানে অজগরের মতই ফুঁসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে-ফুলে উঠছে, যেন হাজার ফণা তুলে দুলছে। এরই মধ্যে কখনও ওঠে আকাশে টুকরো খানেক কালো মেঘ—দেখতে দেখতে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় তার উপর, যেন কেউ আগুনে-গড়া হাতের আঙুলের ঘা মেরে বাজিয়ে দেয় ওই কালো মেঘের 'বিষমঢাকি'র বাজনা। যে বাজায় তার মাথায় জটার দোলায় আকাশ-পাতাল দুলতে থাকে। অজগর তখন তার বিরাট অঙ্গ আছড়ে আছড়ে হাজার ফণায় ছোবল মেরে নাচে—ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে মাতনে মাতে। নদীর জলে তুফান জাগে। সে তুফানে বাড়ি ঘর গ্রাম—গোলা-গঞ্জ বন্দর—মানুষ গরু কীটপতঙ্গ সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। আবার তুফান নাই, ঝড় নাই, বাইরে দেখতে-শুনতে সব শান্ত স্থির, কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ নদীর ধারে গ্রামের আধখানা কাঁপতে লাগল, টলতে লাগল—দেখতে দেখতে কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল অজগরের মত নদীর অথৈ গর্ভে। মানুষকে সেখানে বারো মাস এক চোখ রাখতে হয় আকাশের কোলে—কালো মেঘের টুকরোর সন্ধানে, আর-এক চোখ রাখতে হয় সবুজ ঘাসে-ফসলে-ঢাকা চন্দনের মত মাটির বুকের উপর—ফাটলের দাগের খোঁজে। ভাবনা সেখানে বারো মাসই বটে।

ছোট দারোগা সেই দেশের মানুষ, তাই ও-কথা বলছেন। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের দেশ আলাদা। হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। এ দেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি। 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধূ-ধূ করে বালি—এক পাশে মাত্র একহাঁটু গভীর জল কোনমতে ব'য়ে যায়—মা-মরা ছোট মেয়ের মত শুকনো মুখে দুর্বল শরীরে, কোনমতে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ; ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে ওঠে আগুনে-পোড়া লোহার মত; কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। খাল বিল পুকুর দীঘি চৌচির হয়ে ফেটে যায়। তখন নদীই রাখে মানুষকে বাঁচিয়ে; জল দেয় ওই নদী। নদীর ভাবনা এখানে বারো মাসের নয়।

নদীর ভাবনা এখানে চার মাসের। আষাঢ় থেকে আশ্বিন। আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভ'রে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট পাটকেল পাথর, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালী ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী। ক্ষমা নাই—ঘেন্না নাই, দিগম্বরীর মত হাঁক ছেড়ে, ডাক্ পেড়ে, শতমুখে কলকল খলখল শব্দ তুলে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। গ্রাম বসতি মাঠ শ্মশান ভাগাড়, লোকের ঘরের লক্ষ্মীর আসন থেকে আঁস্তাকুড়—যা সামনে পড়ে মাড়িয়ে

তছনছ ক'রে দিয়ে চ'লে যায়। সেও একদিন দুদিন। বড়জোর, কালে-কস্মিনে, চার-পাঁচদিন পরেই আবার সম্বিৎ ফেরে। কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ ক'রে গাঁয়ের ধারে ব'সে থাকে, তারপর এক-পা, দু'পা ক'রে এসে বাড়ির কানাচে শুয়ে গুনগুন ক'রে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না—তেমনই ভাবে কোপাইও দু'দিন বড়জোর চারদিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে কুল-কুল শব্দ ক'রে বয়ে যায়। চার মাসের মধ্যে এমনটা হয় পাঁচবার কি সাতবার, তার বেশি নয়। তার মধ্যে হয়তো একবার, কি দু'তিন বৎসরে একবার ক্ষ্যাপামি করে বেশি। কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে।

তবে কন্যার পাপে কুল নষ্ট। কোপাইয়ের বন্যায় ঘরদোর না ভাঙলেও ভুগতে হয় বইকি। জল সরে গেলে ভিজে মাটি থেকে ভাপ উঠতে আরম্ভ করে—মাছিতে মশাতে ভ'রে যায় দেশ। মানুষ চলে, মানুষের মাথার উপর ঝাঁকবন্দী মশা সঙ্গে চলে ভনভন শব্দ তুলে, মানুষের শরীর শিউরে ওঠে, তাদের কামড়ে অঙ্গ দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে। গরুর গায়ে মাছি ব'সে থাকে চাপবন্দী হয়ে, লেজের ঝাপটানিতে তাড়িয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা অনবরত শিঙ নাড়ে, কখনও চার-পা তুলে লাফাতে থাকে। তাকে সাহায্য করে চাষী, তালপাতা চিরে ঝাঁটার মত ক'রে বেঁধে তাই দিয়ে আছড়ে মাছি মারে, তাড়িয়ে দেয়। এর কিছুদিন পরেই আরম্ভ হয় 'মালোয়ারী'র জ্বর।

আরও আছে—কোপাইয়ের বন্যার দুর্ভোগ। সাঁওতাল পরগনার পাহাড়িয়া নদী কোপাইয়ে ওই দু'তিন বৎসর অন্তর যে আকস্মিক বন্যা আসে—যাকে বলে 'হড়পা বান', সেই বন্যার স্রোতে প'ড়ে কচিৎ কখনও একটা-দুটো 'গুলবাঘা' ভেসে এসে হাঁসুলী বাঁকের এই খাপছাড়া বাঁকে, বাঁশবাঁদি গাঁয়ের নদীকূলের বাঁশবনের বেড়ার মধ্যে আটকে যায়। কখনও মরা, কখনও জ্যান্ত। জ্যান্ত থাকলে বাঘা এই বাঁশবনেই বাসা বাঁধে। আর আসে ভালুক ; দুটো-একটা প্রতি বৎসরই আসে ও-বেটারা। কিন্তু আশ্চর্য, ও-বেটারা ম'রে কখনও আটকে থাকে না বাঁশবনে। জ্যান্ত বাঘ কদাচিৎ আসে, মরাও ঠিক তাই। গোটা এক পুরুষে দু'টো এসেছে—একটা মরা, একটা জ্যান্ত। মরাটাকে টেনে বের ক'রে জেলার সায়েবকে সেটার চামড়া দেখিয়ে জাঙলের ঘোষেরা বন্দুক নিয়েছে। জ্যান্তটাকে কাহাররাই মেরেছিল, সেটা দেখিয়ে বন্দুক নিয়েছে গন্ধবণিকেরা। ভালুক এলে কাহারেরাই মারে, প্রতিবার বন্যার পর বাঁশবন খুঁজে-পেতে দেখতে পেলে লাঠি-সোঁটা খোঁচা বল্লম তীর-ধনুক নিয়ে তাড়া ক'রে মেরে হৈ-হৈ ক'রে নৃত্য করে ; নিজেদের বীর্যে মোহিত হয়ে প্রচুর মদ্য পান করে। আর এখানেই আছে বুনো শুয়োর, কাহারদের লাঠি-সোঁটা খোঁচা বল্লম সত্ত্বেও এখানে বুনো শুয়োরের একটা দস্তুরমত আড্ডা-আড়ত গ'ড়ে উঠেছে। অবশ্য বাঁশবাঁদির বাঁশবেড়ের জঙ্গলে নয়, এখান থেকে খানিকটা দূরে সাহেব ডাঙায়। কাহারদের দৌরাত্ম্যে ওরা বাঁশবাদির এলাকায় বাসা বেঁধে রক্ষা পায় না। ওদের বড় আড্ডা হ'ল প'ড়ো নীলকুঠির কুঠি-বাড়ির জঙ্গলে। রাত্রে শূকরের দল ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে নদীর ধারে ছুটে বেড়ায়, দাঁতে মাটি খুঁড়ে কন্দ তুলে খায়। কখনও কখনও দুটো

একটা ছটকে এসে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। অকস্মাৎ কেউ কেউ সামনে প'ড়ে জখম হয়। তখন কাহারেরা ওদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে। অস্ত্র নয়, ফাঁদ। বুনো শুয়োর মারবার আশ্চর্য কৌশল ওদের। হাতখানেক লম্বা বাখারির ফালির মাঝখানে আধ হাত লম্বা শক্ত সরু দড়ি বেঁধে প্রান্তভাগে বাঁধে ধারালো বঁড়শি। বঁড়শিতে টোপের মত গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা। এমনই আট-দশটা ছড়িয়ে রেখে দেয় পথে প্রান্তরে। মদের ম্যাতার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শুয়োর বেটারা মাটি শুঁকে শুঁকে এসেই পরমানন্দে গপ ক'রে মুখে পুরে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শি গেঁথে যায় জিভে অথবা চোয়ালের মধ্যে। তখন পায়ের খুর দিয়ে টেনে বঁড়শি ছাড়াতে চেষ্টা করে—তাতে ফল হয় বিপরীত, চেরা খুরের মধ্যে বঁড়শির দড়ি ঢুকে গিয়ে শেষে আটকায় এসে বাখারির ফালিতে। একদিকে বঁড়শি আটকায় জিভে, অন্যদিকে দড়ি-পরানো খুর আটকায় বাখারিতে, বেটা শুয়োর নিতান্তই শুয়োরের মত ঠ্যাঙ তুলে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে কাহারেরা আসে লগুড় হাতে, এসেই দমাদম ঠেঙিয়ে মেরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজনযজ্ঞে লাগিয়ে দেয়।

আর আসে মধ্যে মধ্যে কুমীর। প্রায়ই সব মেছো কুমীর। কুমীর এসে জাঙলের বাবু-ভাইদের মাছ-ভরা পুকুরে নামে। সে আর উঠতে চায় না। বাবুরা বন্দুক নিয়ে দুম-দাম গুলি ছোঁড়ে, কুমীর ভুস ক'রে ডোবে আবার এক কোণে নাকটি জাগিয়ে ওঠে। কাহারেরা পাড়ের উপর ব'সে হুঁকো টানে আর আমোদ দেখে; তবে হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাদির ঘাটের পাশে যে দহটা আছে, সেখানে আসে সর্বনেশে মানুষ-গরু-খেকো বড় কুমীর—এখানকার লোকে বলে, 'ঘড়িয়াল'। তখন কাহারেরা চুপ ক'রে ব'সে থাকে না। তারা বের হয় দল বেঁধে; সর্বাঙ্গে হলুদ মাখে, সঙ্গে নেয় কোদাল কুড়ুল লাঠি সড়কি, বড় বড় বাঁশের ডগায় বাঁধা শক্ত কাছির ফাঁস। নদীর ধারে ধারে খুঁজতে থাকে কুমীরের আস্তানা। পাড়ের ধারে গর্তের মধ্যে শয়তানের আস্তানার সন্ধান পেলে মহা উৎসাহে তারা গর্তের মুখ বন্ধ ক'রে উপর থেকে খুঁড়তে থাকে সেই গর্ত। তারপর গর্তের নালার মধ্যে অবরুদ্ধ শয়তানকে তারা হত্যা করে। কখনও সুকৌশলে ফাঁস পরিয়ে বেঁধে টেনে এনে নিষ্ঠুরভাবে দু-তিন দিন ধরে ঠেঙিয়ে মারে। গর্তে কুমীর না পেলে গোয়ালপাড়ার গোয়ালাদের মহিষের পাল এনে সেগুলোকে নামিয়ে দেয় দহে। মহিষে জল তোলপাড় ক'রে তুলে ঘড়িয়ালকে বের করে। তারপর কুম্ভীরবধের পালা। সে প্রায় এক দক্ষযজ্ঞ। কুম্ভীর বেটাকে দক্ষের সঙ্গে তুলনা করা কখনই চলে না, কিন্তু কাহারদের মাতন—সে শিবঠাকুরের অনুচরদের নৃত্য ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

মোট কথা, এ দেশে—হাঁসুলীর বাঁকে নদীর ভাবনা খুব বেশি নয়; যেটুকু আছে, তার একটুমাত্র 'মালোয়ারী'র পালাটা ছাড়া সকল ভাবনার ভার একা বাঁশবাঁদির কাহারদের উপর। কিন্তু এবারের এই শিস দেওয়ার ব্যাপারে তারাও হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। প্রথম প্রথম তাদের ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা চোরডাকাতের নয়, ব্যাপারটা বৃন্দাবনী ধরণের কিছু। তারা ক্ষেপেও উঠেছিল। কারণ এই অঞ্চলের বৃন্দাবনী ব্যাপারে নায়িকারা এক শো জনের মধ্যে নিরেনব্বুই জনই হয় তাদের ঘরের মেয়ে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের এ ধারণা

পাল্‌টে গিয়েছে। এখন তাদের ধারণা ব্রহ্মদৈত্যতলার 'কর্তা' কোন কারণে এবার বিশেষ রুষ্ট হয়েছেন। হয়তো বা তিনিই ওই বেলবন ও শ্যাওড়াজঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে চ'লে যাচ্ছেন—শিস দিয়ে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে চলেছেন হাঁসুলী বাঁকের অধিবাসীদের। এ নিয়ে তাদের জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ঘরে ঘরে কুলুঙ্গীতে সিঁদুর মাখিয়ে পয়সাও তুলেছে তারা, এবং এ বিষয়ে জাঙলের ভদ্রলোক মহাশয়দের উদাসীনতা দেখে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছে। বেচারী কাহারদের আর সাধ্য কি? জ্ঞানই বা কতটুকু? তবু একদিন সন্ধ্যায় ওরাই বসালে মজলিস। কিন্তু কাহারদের আবার দুটি পাড়া, 'বেহারা'-পাড়া আর 'আটপৌরে'-পাড়া। বেহারা-পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী আটপৌরেদের সম্পর্কে ঘাড় নেড়ে হতাশা প্রকাশ ক'রে বললে—বছরে একবার পূজো, তাই ভাল ক'রে দেয় না। তা 'লতুন' পূজো দেবে।

নিমতেলে পানুর ভাল নাম প্রাণকৃষ্ণ। পাড়ায় দুজন প্রাণকৃষ্ণ থাকায় এ প্রাণকৃষ্ণের বাড়ির উঠানের নিমগাছটির অস্তিত্ব তার নামের আগে জুড়ে দিয়ে নিমতেলে পানু ব'লে ডাকা হয়। সে বললে—জান মুরুব্বি, কথাটা আমি বাপু, ভয়ে বলি নাই এতদিন। তা কথা যখন উঠল, বুয়েছ কিনা, আর কি বলে যেয়ে—কাণ্ড যখন খারাপ হতেই চলেছে, তখন আর চেপে থাকাটা ভাল লয়। কি বল?

গোটা মজলিসটির লোকের চোখ তার উপর গিয়ে পড়ল। বনওয়ারী ব'সে ব'সেই ঘেঁষড়ে খানিকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছেন বল্ দিকিনি?

মুখ খুলেছিল পানু, কিন্তু তার আগেই একটা সুচালো বাঁশীর শব্দ বেজে উঠল। সেই শিসের শব্দ। শব্দটা আসছে—বাঁশবাঁদি গাঁয়ের দক্ষিণের বাঁশবন থেকে। সকলে চকিত হয়ে কান খাড়া করে চুপ ক'রে রইল। বনওয়ারী ব'সে ছিল উত্তর মুখ ক'রে, বাঁ হাতে ছিল হুঁকো—সে ডান হাতটা কাঁধের উপর তুলে, পিছনে তর্জনীটা হেলিয়ে ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিলে সকলকে। পিছনে দক্ষিণ দিকে বাঁশবেড়ের মধ্যে শিস বাজছে।

আবার বেজে উঠল শিস। ওই।

কাহার-বাড়ির মেয়েরা সব উদ্বিগ্ন মুখে উঠানে নেমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে। কারও হাতে রান্নার হাতা; কেউ ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিল, তার কোলে ছেলে; কেউ কাঁকুই দিয়ে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছিল, তার বাঁ হাতে ধরা রইল চুলের গোছা, ডান হাতে কাঁকুই; কেউ কেরোসিনের ডিবে জেলে ঘরের পিছনে দেওয়াল থেকে ঘুঁটে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিল, সে কেরোসিনের ডিবে আর খানচারেক ঘুঁটে হাতেই ছুটে এসে দাঁড়াল দশজনের মধ্যে। কেবল বন্ধকালা বুড়ী সুচাঁদ কাহারনী সকলের মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল; সে, উপরের অঙ্গের কাপড়ের আঁচলটা নিঃসঙ্কোচে খুলে কাঁথা-সেলাই-করা সুচে পুরানো কাপড়ের পাড়ের কস্তা পরিয়ে একটা লম্বা ছেঁড়া জুড়ছিল, ভুরু কুঁচকে নীরব প্রশ্ন তুলে সকলের দিকে চেয়ে সে শুধু ব'সে রইল। কিছু বুঝতে না পেয়ে অবশেষে সে তার স্বাভাবিক মোটা গলায় অভ্যাসমত চীৎকার করে প্রশ্ন করলে—কি?

সুচাঁদের মেয়ে বসন—অর্থাৎ বসন্ত, মায়ের বধিরত্বের জন্য লজ্জা পেয়ে পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—মর তুমি।

সুচাঁদ আবার প্রশ্ন করলে এবং আরও বেশি একটু চীৎকার ক'রেই বললে—বলি, হ'ল কি? উঠে দাঁড়ালি যে সবাই?

এবার নাতনী পাখী—অর্থাৎ বসন্তর মেয়ে পাখী এসে তার মুখের কাছে চেঁচিয়ে বললে—শি—স।

—শিস? তা ওই জাঙলের ছোঁড়ারা কেউ দিচ্ছে।

—না—না। হাত নেড়ে বুঝিয়ে বললে—সেই শি—স।

এই মুহূর্ত্তটিতেই আবার শিস বেজে উঠল।

পাখী দিদিমাকে ঠ্যালা দিয়ে বললে—ওই শোন। কিন্তু সুচাঁদ চকিত হয়ে পাখীর মুখে হাত চাপা দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বসল। শুনতে পেয়েছে সে। এবং সে উঠে দাঁড়াল; প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা দিয়ে অবধি সে গাঁয়ে-ঘরে বুকে কাপড় নামমাত্রই দিয়ে থাকে, তাও দেয় মেয়ে বসন্তের অনুরোধে। এবং সেই উদ্দেশ্যেই আজ এই মুহূর্তে ছেঁড়া আঁচলটা সে সেলাই করছিল—কিন্তু ছেঁড়া আঁচলটা টেনে গায়ে তুলতে সে ভুলেই গেল। আঁচলটা টানতে টানতেই এসে বনওয়ারীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে খুব চীৎকার ক'রে বললে—দেবতার পুজো-আচ্চা করাবি, না, গাড়েপাড়ে যাবি?

বনওয়ারীও খুব চীৎকার ক'রে বেশ ভঙ্গি ক'রে হাত-পা নেড়ে বললে—দেবতার পুজো কি আমা-তোমাদের থেকে হয় পিসী? বাবুরা কিছু না করলে আমরা কি করব?

— তবে মরবি? মরতে যে তোদের মরণই হয় আগে।

—তা কি করব বল? ভগবানের বিধেন যা তাই তো হবেন। গাঁয়ের দখিন দিক আগুলে যখন আছি, আর আমরাই যখন কি বলে—ছিষ্টির ওঁচা, তখনআগেই আমাদিগে মরতে হবেন বইকি।

নিমতেলে পানু ব'লে উঠল—না মুরুব্বি। এবার খ্যানত হ'লে আগে তোমার ওই চৌধুরী-বাড়িতেই হবেন। তা আমি জানি।

বনওয়ারী ভুরুতে এবং দৃষ্টিতে সুগভীর বিস্ময় ও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলে বললে—ব্যাপারটা কি বল্ দি-নি?

সুচাঁদ বললে—কি? কি বললি?

—কিছু লয় গো। তোমাকে বলি নাই। ব'স দিকি তুমি।

পাখী এসে সুচাঁদকে হাতে ধ'রে টেনে সরিয়ে নিয়ে বললে—ব'স এইখানে।

পানু বললে—ইবারে যে পুজোটি গেল মুরুব্বি, তার পাঁঠাটি খুঁতো ছিলেন।

সবিস্ময়ে সকলে ব'লে উঠল—খুতো ছিল? মেয়েরা শিউরে উঠল—হেই মা গো!

পানু বৃত্তান্তটি প্রকাশ করলে। পানুর ছাগলের একটি বাচ্চাকে খুব ছোটতে কুকুরে কামড়েছিল।—হেই এতটুন বাচ্চা তখন তোমার, তখন এক শালার কুকুর খপ ক'রে ধরেছিল পেছাকার পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল লটবরের মা, হাতে ঝাঁটা ছিল—কুকুরটাকে এক

ঝাঁটা মেরে ছাড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তুক দুটি দাঁত বসে গিয়েছিল। হলুদ-মলুদ লাগিয়ে সেরে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—ওটাকে খাসী ক'রে দেব। তা তোমার এখন-তখন ক'রে হয় নাই, বড় হয়ে গেল। তখন ভেবেছিলাম, কেটে-মেটে একদিন পাড়ায় ভাগা দিয়ে খেয়ে লোব। ই বছর বুঝলে কিনা, একদিন শালার পাঁঠা করেছে কি—চ'লে গিয়ে ঢুকেছে চৌধুরীবাড়ী; আর খাবি তো খা—বাবুদের শখ ক'রে লাগানো—কি বলে বাপু, সেই ফুলের গাছ। এখন ধ'রে বেঁধে রেখেছিল। খোঁজে খোঁজে আমি গেলাম। গেলাম তো চৌধুরীদের গোমস্তা মারলে আমাকে তিন থাপ্পড়। তারপর সেই গাছ দেখিয়ে বললে—কলকাতা থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কলম এনেছিলাম। তোর দাম দেওয়া লাগবে কলমের। আমি কি বলব? দেখলাম—বেটা পাঁঠা গাছটার পাতা-ডাল খেয়েই ক্ষ্যান্ত হয়ে নাই—টেনে-উপড়ে একেবারে গাছের নেতার মেরে দিয়েছে। আমি তো পায়ে হাতে ধরলাম। শেষ-মেষ পাঁঠাটাকে দিয়ে খালাস। আমি বললাম—কিন্তু দেখেন মশায়, খুঁতো পাঁঠা, কেটে ফিষ্টি-মিষ্টি ক'রে খাবেন, কিন্তুক দেবতা-টেবতার থানে যেন পুজো টুজো দেবেন না মশায়। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, নিজের বেটা ওই লটবরের মাথায় হাত দিয়ে কিরে ক'রে বলতে পারি মুরুব্বি, আমি দুবার বলেছিলাম—খুঁতো পাঁঠা, খুঁতো পাঁঠা হেই মাশায়, যেন দেবতা-থানে দেবেন না। তা এবার বেহ্মদত্যিতলায় কত্তার পুজোতে দেখি—পেরথম চোটেই চৌধুরীবাবুদের সেই পাঁঠা পড়ে গেল। 'এশ্বর' জানেন—আমার দোষ নাই।

সুচাঁদ খুব বেশি স'রে যায় নাই। কাছেই ব'সে একদৃষ্টে পানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলি শুনছিল; তারই হাতের ডিবেটার আলো পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল পানুর মুখের উপর। সে এবার প্রায় কথাগুলিই বুঝতে পেরেছে। সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।

সমস্ত মজলিসটা থমথম ক'রে উঠল। মনে হ'ল, সুচাঁদের মুখ দিয়ে যেন দেবতাই ওই কথাগুলি বললেন—ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল।

সেই থমথমে মজলিসে সুচাঁদ আবার আরম্ভ করলে—এই বাবার দয়াতেই হাঁসুলী বাঁকের যা কিছু। ওই চৌধুরীরা তিন পুরুষ আগে তখন গেরস্ত, সাহেবদের নীলকুঠির গমস্তা। কুঠিরও তখনও ভাঙা-ভাঙটা অবস্থা। সেবার এল কোপাইয়ে 'পেলয়' বান। সে অনেক দিন আগে, তখন আমরা হই নাই; বাবার কাছে গল্প শুনেছি। দুপুর বেলা থেকে ভাসতে লাগল কোপাই। রাত এক পহর হতে তু-ফা-ন। 'হদের' পুকুরের শাহী পাড় পর্যন্ত ডুবে গেল। নীলকুঠির সাহেব মেম গাছে চড়ল। তারপর সমস্ত রাত হড়-হড়-হড়-হড় বান চললই—বান চললই। চারদিক আঁধার ঘুরঘুটি। আর ঝম-ঝম জল। সে রাত যেন আজ পার হয়ে কাল হবে না। এমন সময়, রাত তখন তিন পহর চলছে,—হাঁসুলী বাঁকের অনেক দূরে নদীর বুকে যেন আলো আর বাজনা আসছে ব'লে মনে হ'ল। দেখতে দেখতে পঞ্চশব্দের বাদ্যি বাজিয়ে নদীর বুক আলোয় 'আলোকীন্নী' ক'রে এক বিয়েসাদীর নৌকোর মত নৌকো এসে লাগল

হাঁসুলী বাঁকের দহের মাথায়। সায়েব দেখেছিল—সে ঝাঁপিয়ে নামল জলে। মেম বারণ করলে। সায়েব শুনলে না। তখন মেম আর কি করে। মেমও নামল। সায়েব এক কোমর জল ভেঙে চলল নৌকো ধরতে। হঠাৎ ওই বাবার থান থেকে বেরিয়ে এলেন কত্তা। বলতে কাঁটা দিয়ে উঠছে গায়ে।—সত্যিই শিউরে উঠল সুচাঁদ।—এই ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম—কত্তা জলের ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে এগিয়ে এসে বললেন—কোথা যাবে সায়েব? নৌকো ধরতে? যেয়ো না, ও নৌকো তোমার লয়। সায়েব মানলে না সে কথা। বললে—পথ ছাড়, নইলে গুলি করেঙ্গা। কত্তা হাসলেন,—বেশ, ধরাঙ্গা তবে নৌকো। বাস্, যেমনি বলা অমনি সায়েব মেমের এক কোমর জল হয়ে গেল অথৈ সাঁতার, সঙ্গে সঙ্গে এক ঘুরনচাকিতে পাক দিয়ে ডুবিয়ে কো-থা-য় টেনে নিয়ে গেল—সোঁ ক'রে। চৌধুরী ছিল সায়েবের কাছেই আর একটা গাছের ডালে ব'সে। কত্তা এসে তাকে ডাকলেন—নেমে আয়। চৌধুরী তখন ভয়ে কাঁপছে। কত্তা হেসে বললেন —ওরে বেটা, ভয় নাই, নাম্। তুই ডুববি না। বললে না পেত্যয় যাবে বাবা—চৌধুরী নামল, তো এক হাঁটুর বেশি জল হ'ল না। কত্তা হাসলেন, তা'পরে আঙুল দেখিয়ে বললেন. —নৌকো লেগেছে দেখেছিস? ও নৌকো তোর। আমার পুজো করিস, দেবতার কাছে মাথা নোয়াস, অতিথকে জল দিস, ভিখিরীকে ভিখ দিস, গরীবকে দয়া করিস, মানুষের শুকনো মুখ দেখলে মিষ্টি কথা বলিস। যখের কাছে ছিলেন লক্ষ্মী, তোকে দিলাম। যতদিন আমার কথা মেনে চলবি—উনি অচলা হয়ে থাকবেন। অমান্যি করলে ছেড়ে যাবেন, আর নিজেই ফলভোগ করবি। তাকেই—সেই কত্তাকেই—এত হতচ্ছেদ্দা! মা-লক্ষ্মী তো গিয়েছেন। অধর্মের তো বাকি নাই। শেষ-মেষ সেই কত্তার থানেই খুঁতো, কুকুরে-ধরা, এঁটো পাঁঠার পুজো! এতে কি আর দেবতা থাকেন! দেবতাই বটেন—দেবতাই শিস দিচ্ছেন। চ'লে যাবেন, তাই জানিয়ে দিচ্ছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন গাঢ় হয়ে উঠছিল ক্রমশ। হাঁসুলী বাঁকের নদীর চরে, গ্রামের কোল ঘেঁষে নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বেঁকে চ'লে গিয়েছে গ্রামের বাঁশের বেড়। হাঁসুলীর মত গোল নদীর বেড়, তাই তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে যে বাঁশবেড় বা বাঁশের বাঁধ সেও গোলাকার। বাঁশবাঁদিকে ঘিরে রেখেছে সবুজ কন্তার ডুরি মালার মত। সেই বাঁশবন থেকে অন্ধকার গোল হয়ে এগিয়ে আসছে কাহারপাহাড় বসতিকে কেন্দ্র করে। উঠানের মজলিসের আলোটার মাথার উপরে এসে আলোর বাধা পেয়ে যেন থমথম করছে। প্যাঁচাগুলো কর্কশ চেরা গলায় চীৎকার ক'রে উড়ে যাচ্ছে। বাদুড় উড়ছে—পাখসাটের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে। মধ্যে মধ্যে দুটোতে ঝগড়া ক'রে পাখসাট মেরে চিলের মত চিৎকার করছে। এরই মধ্যে সুচাঁদের এই গল্পে সেই বেলবন ও শ্যাওড়াবনের কর্তার মহাত্ম্য, তাঁর সেই গেরুয়াপড়া ন্যাড়ামাথা, রুদ্রাক্ষ ও ধবধবে পৈতেধারী চেহারার বর্ণনা শুনে এবং সেই কর্তার কাছে কুকুরে-ধরা পাঁঠা দেওয়ার অপরাধের কথা মিলিয়ে সকলে একেবারে নিদারুণ ভয়ে আড়ষ্ট পঙ্গু হয়ে গেল। কার একজনের কোলের ছেলেটা কেঁদে উঠল। মজলিসসুদ্ধ লোক বিরক্তিভরে ব'লে উঠল—আঃ!

ছেলেটার মা স্তন মুখে দিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সাহস হ'ল না একা ঘরের ভিতরে যেতে।

সুচাঁদ হঠাৎ আবার বললে—পানা, অপরাধ কিন্তু তোমারও বটে বাবার থানে।

পানু এমন অভিযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তা ছাড়া ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কেন কে জানে ভয় তারই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সুচাঁদের কথা শুনে সে উত্তর দিতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

তারপর বনওয়ারী সুচাঁদকে সায় দিয়ে বললে—তা ঠিক বলেছ পিসী। পাঁঠাটি তো পানুর ঘরের।

সুচাঁদ এতক্ষণ ধ'রে নিজে একাই কথা ব'লে আসছিল--কানে না-শোনার সমস্যা ছিল না। বনওয়ারী কথা বলতেই সমস্যাটা নতুন ক'রে জাগল। এমন গুরুতর তত্ত্বে রায় দেবার অধিকার কাহারপাড়ায় প্রাচীন বয়সের দাবীতে সুচাঁদ তার নিজস্ব ব'লে মনে করে। তাতে কেউ বাদ-প্রতিবাদ করলে, সে 'অপমান' সুচাঁদের সহ্য হয় না। এ দিক দিয়ে তার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। বনওয়ারীর কথা কানে শুনতে না পেয়ে সে ধারণা করলে—বনওয়ারী তার কথার প্রতিবাদ করছে, তার কথাকে সে মৃদুস্বরে কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে সে বনওয়ারীর দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে হাত নেড়ে বললে--তোর মত বনওয়ারী, আমি ঢের দেখেছি —বুঝলি! তুই তো সেদিনের ছেলে রে। মা ম'রে যেয়েছিল 'মাওড়া' ছেলে—অ্যাই ডিগডিগে 'প্যাট'। আমার দুধ খেয়ে তোর হাড়-পাঁজরা ঢাকল। আমার গতর তখন ভাগলপুরের গাইয়ের মতন, বুকের দুধও তেমনি অ্যাই মোষের গাইয়ের মতন। তু আজ আমার ওপর কথা কইতে আসিস? এই আমি ব'লে রাখলাম, তু দেখিস—গাঁয়ের নোকেও দেখবে—বছর পার হবে না, পানুর 'প্যানত' হবে।

পানু শিউরে উঠল। পানুর বউ দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে—মেয়েদের মধ্যে;—মৃদু অথচ করুণ সুর তুলে সে কেঁদে উঠল।

বনওয়ারী এবার চীৎকার করে বললে—তাই তো আমিও বলছি গো! তুমি যা বলছ, আমিও তাই বলছি।

—তাই বলছিস?

—হ্যাঁ। বলছি, পাঁঠাটি যখন পানুর ঘরের, তখন পানুর অপরাধ খণ্ডায় কিসে?

সুচাঁদের ঘোলাটে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বুদ্ধিমত্তার তৃপ্তির একটা হাসিও ফুটে উঠল মুখে, সে বললে—অ্যা-অ্যাই! খণ্ডায় কিসে?

পানু কাতর হয়ে প্রশ্ন করলে—তাই তো বলছি গো, খণ্ডায় কিসে তাই বল? শুনছ? বলি—'পিতিবিধেন' কি বল? তারস্বরে চীৎকার ক'রে বললে শেষ কথা কটি।

—পিতিবিধেন?

—হ্যাঁ।

একটু ভাবলে সুচাঁদ। বনওয়ারী প্রমুখ অন্য সকলে আলোচনা আরম্ভ করলে।—তা

কাল একবার চল সবাই চৌধুরী বাড়ি। বলা যাক সকল কথা খুলে।

সুচাঁদ বললে—আর একটি পাঁঠা তু দে পানু। আর পাড়া-ঘরে চাঁদা তুলে বাবার থানে পুজো হোক একদিন। জাঙলের নোকে যদি 'ধবহেলা' করে—আমরা আপনাদের কত্তব্য করি। না, কি বলিস বনবিহারী ? আর পিতিবিধেন কি আছে বল্ ? কত্তা তো দেবতা,—তিনি তো বুঝবেন আমাদের কথা।

বনওয়ারী বার বার ঘাড় নাড়লে। হ্যাঁ, তা বটে, ঠিক কথা। কি বল হে সব ?

সকলেই ঘাড় নাড়লে। প্রহ্লাদ, গোপীচাঁদ, পাগল, দু নম্বর পানু, অমণ, সকলেই সম্মত হ'ল,—হোক, পুজো হোক।

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারটা একটা নিষ্ঠুর চীৎকারে চিরে যেন ফালি ফালি হয়ে গেল। কোন জানোয়ারের চীৎকার। সে চীৎকার তীব্রতায় যত যন্ত্রণাকর, তীক্ষ্ণতায় সে তত অসহনীয়। বুনো শুয়োরের বাচ্চার চীৎকার। সম্ভবত দল থেকে ছিটকে পড়েছিল কোন রকমে, সুযোগ বুঝে শেয়ালে ধরেছে। শুয়োরের বাচ্চার মত এমন তীরের মত চীৎকার কেউ করতে পারে না। আর পারে খরগোশে—বুনো মেটে খরগোশ। এ চীৎকার খরগোশেরও হতে পারে।

ঠিক এই সময়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে শব্দ করে ছুটে এল একটা কুকুর। কালো রঙের প্রকাণ্ড বড় একটা কুকুর দৃপ্ত ভঙ্গিতে, সতেজ চীৎকারে পাড়া মজলিস চকিত ক'রে মজলিসের মাঝখান দিয়ে লোকজন না মেনেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওই চীৎকার লক্ষ্য ক'রে। কুকুরটার গায়ের ধাক্কা লাগল সুচাঁদের গায়ে। ধাক্কা খেয়ে এবং ঠিক কানের কাছে ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে সুচাঁদ চমকে উঠল। পরমুহূর্তে সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—এই দেখ বনওয়ারী, এই আর এক পাপ। ওই যে হারামজাদা বজ্জাত—ওই ওর পাপের পেরাশ্চিত্তি করতে হবে সবাইকে, ওই হারামজাদার জরিমানা কর্ তোরা। শাসন কর্। শাসন কর্। শাসন কর্।

বনওয়ারী কিছু উত্তর দেবার আগেই মেয়েদের মধ্য থেকে ফোঁস ক'রে উঠল সুচাঁদের নাতনী—বসন্তের মেয়ে পাখী। সে ব'লে উঠল—ক্যানে, সে হারামজাদা আবার করলে কি তোমার ? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! যত রাগ সেই হারামজাদার ওপর।

মেয়েরা এবার মুখ টিপে হাসতে লাগল। আশ্চর্য নাকি মানুষের জীবনে 'রঙে'র ছোঁয়াচের খেলা। এ দেশের এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালবাসাকে বলে 'রঙ'। রঙ নয়—বলে, 'অঙ'। ওরা রামকে বলে 'আম', রজনীকে বলে 'অজুনী', রীতকরণকে বলে 'ইতকরণ', রাতবিরাতকে বলে 'আতবিরেত'। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে র থাকলে সেখানে ওরা র-কে অ ক'রে দেয়। নইলে যে বেরোয় না জিভে, তা নয়। শব্দের মধ্যস্থলের র দিব্যি উচ্চারণ করে। মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা হ'লে ওরা বলে—অঙ লাগায়েছে দু'জনাতে। রঙ-ই বটে। গাঢ় লাল রঙ। এক ফোঁটার ছোঁয়াচে মনভরা অন্য রঙের চেহারা পাল্টে দেয়। যে মেয়েরা এতক্ষণ আশঙ্কায় কাজকর্ম ছেড়ে নির্বাক হয়ে মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে সুচাঁদের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছিল এবং আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল

না, তারাই পাখীর কথার মধ্যে সেই রঙের ছোঁয়াচ পেয়ে মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল, মুখে হাসি দেখা দিল। ব্যাপারটার মধ্যে 'রঙ' ছিল।

সুচাঁদের ওই 'হারামজাদা'টির নাম করালী। করালী এই পাড়ারই ছেলে। চন্দনপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে করালী। কথায়বার্তায় চালেচলনে কাহারপাড়ার সকলের থেকে স্বতন্ত্র। কাউকেই সে মানতে চায় না, কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। যেমন রোজগেরে, তেমনই খরচে। সকালে যায় চন্দনপুর, বাড়ি ফেরে সন্ধ্যায়। আজ বাড়ি ফিরে শিস শুনেই সে কুকুর আর টর্চ নিয়ে বেরিয়েছে। এই করালীর সঙ্গে পাখীর মনে মনে রঙ ধরেছে। তাই পাখী দিদিমার কথায় প্রতিবাদ ক'রে উঠল। ওদের এতে লজ্জা নাই। ভালবাসলে সে ভালবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়াপড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই ঢাকতে জানে না কাহারেরা। সে অভ্যাস ওদের নাই, সে ওরা পারে না। সেই কারণেই মধ্যে মধ্যে কাহারদের তরুণী মেয়ে বানভাসা কোপাইয়ের মত ক্ষেপে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ায়। তার উপর পাখী বসন্তের মেয়ে, বসন্তের ভালবাসার ইতিহাস এ অঞ্চলে বিখ্যাত। তাকে নিয়ে সে এক পালা-গান হয়ে গিয়েছে এক সময়। গান বেঁধেছিল লোকে, "ও—বসন্তের অঙের কথা শোন।"

সে অনেক কথা। তবে বসন্তের মেয়ে পাখীর কথা এদিক দিয়ে আরও একটু স্বতন্ত্র। এই গাঁয়েই তার বিয়ে হয়েছে। কাহারপাড়ার পূর্বকালের মাতব্বর-বাড়ির ছেলের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য মন্দ—সে রুগ্ন, হাঁপানী ধরেছে এই বয়সে। এদিকে পাখী ভালবেসেছে করালীকে। করালীকে সমাজের মজলিসে এইভাবে অভিযুক্ত করায় সে মজলিসের মধ্যেই দিদিমার কথার প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

দিদিমাও পাখীকে খাতির করবার লোক নয়; সেও সুচাঁদ। সুচাঁদও পাখীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠল—ওঃ, অঙ যে দেখি মাখামাখি। বলি ওলো ও হারামজাদী! আমি যে নিজের চোখে ছোঁড়াকে ওই কত্তার থানে ওই কেলে কুকুরটাকে সাথে নিয়ে বাঁটুল ছুঁড়ে ঘুঘু মারতে দেখেছি।

ঠিক সেই সময় মজলিসের পিছন থেকে কেউ, অর্থাৎ করালীই ব'লে উঠল—কত্তা আমাকে বলেছে, তু যখন আমার এখানে বাঁটুল ছুঁড়ছিস, তখন আমি একদিন ওই বুড়ী সুচাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব দড়াম ক'রে। তু সাবধান হোস বুড়ী, বিপদ তোরই। সে হা-হা ক'রে হেসে উঠল। তার হাসির দমকায় মেয়েদের হাসিতে আরও একটু জোরালো ঢেউয়ের দোলা লাগল।

বনওয়ারী হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল—অ্যাই করালী!

করালী হেসে উঠে বললে—ওরে 'বানাস্' রে! ধমক মার যে?

—ব'স্ ব'স্। হারামজাদা, তু ব'স্।

—দাঁড়াও, আসছি আমি।

—কোথা যাবি?

—যাব।—হেসে বললে—দেখে আসি কাণ্ডটা কি? তাতেই তো কুকুরটাকে ছেড়ে দিলাম।

—না। কাণ্ড কি সে তোমার দেখবার পেয়োজন নাই। সে আমরা জানি। তোমাদের পাপেই সব হচ্ছে।

হা-হা ক'রে হেসে উঠল করালী।—কি? ওই বেহ্মদত্যি ঠাকুর? উহু।

—খবরদার করালী! মুখ খ'সে যাবে।

—এই দেখ! আমার মুখ খ'সে যাবে তো তোমাদের খবরদারি কেন?

ওদিকে বাঁশবনের মধ্যে কোথাও কুকুরটার চীৎকারের ভিতর হঠাৎ যেন একটা সতর্ক ক্রুদ্ধ আক্রমণোদ্যোগের সুর গর্জে উঠল। এই মুহূর্তে সে নিশ্চয় কিছু দেখেছে, ছুটে কামড়াতে যাচ্ছে। করালী একটা অতি অল্প-জোর টর্চের আলো জেলে প্রায় ছুটেই পুকুরের পাড় থেকে নেমে বাঁশবাদির বাঁশবেড়ের গভীর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোটা মজলিসটা স্তব্ধ হয়ে গেল। করালীর কি অসীম স্পর্ধা, কি দুর্দান্ত দুঃসাহস! শুধু পাখীই খানিকটা এগিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে, ডাকলে—যাস না। এই, যাস না বলছি। ওরে ও ডাকাবুকো! এই দেখ্। ওরে ও গোঁয়ার-গোবিন্দ! যাস না! যাস না!

তার কণ্ঠস্বর ঢেকে গেল কুকুরটার একটা মর্মান্তিক আর্তনাদে।

বনওয়ারী বললে—হারামজাদা মরবে, এ তোমাকে আমি ব'লে দেলাম সুচাঁদপিসী।

কুকুরটা আর্তনাদ করতে করতে ছুটে ফিরে এল। সে এক মর্মান্তিক আর্তনাদ।

পিছন পিছন ফিরে এল করালী। কালুয়া, কালুয়া!

কালুয়া মনিবের মুখের দিকে চেয়ে স্থির হবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্থির হতে পারলে না সে। কোন ভীষণতম যন্ত্রণায় তাকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পাক দিয়ে ফিরতে লাগল কালুয়া। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে পড়ে গেল মাটিতে, মুখ ঘষতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গোঙাতে লাগল।

করালী তার পাশে ব'সে গায়ে হাত বুলাতে লাগল, কিন্তু কুকুরটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে, মনিব করালীকেও কামড়াতে এল। ছটফট করতে লাগল, মাটি কামড়াতে আরম্ভ করলে, কখনও মুখ তুলে চেঁচালে—অসহ্য যন্ত্রণা অভিব্যক্ত করলে, তারপরই মাটিতে মুখ ঘষতে লাগল।

করালী স্থির হয়ে ব'সে দেখছিল। তার টর্চটার দীপ্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। হঠাৎ সে মৃদুস্বরে ও বিস্ময়ে আতঙ্কের সঙ্গে বললে—রক্ত!

—রক্ত!

—হ্যাঁ।

সে আঙুল দেখালে—কালুয়ার নাকের ছিদ্রের দিকে। মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে। শেষে ঘটল একটা বীভৎস কাণ্ড। হঠাৎ চোখ দুটো ফুলে উঠে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারা পড়ল কালো রোমের উপর দিয়ে। সমস্ত কাহারপাড়া দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল।

বনওয়ারী ভয়ার্ত বিজ্ঞস্বরে বললে—কর্তা!

কর্তা বোধ হয় খড়ম-সুদ্ধ বাঁ পা-টা কুকুরটার গলায় চাপিয়ে চেপে দিলেন।

দুই

সেই দিনই, শেষরাত্রে, তখন ভোরবেলা।

ঘুমের ঘোরের মধ্যে আর্তনাদ ক'রে উঠল বনওয়ারী। তার স্ত্রী গোপালীবালা চমকে জেগে উঠে তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলে—ওগো, বলি—ওগো! ওগো!

ফাল্গুন মাসের শেষ, বিশ তারিখ পার হয়ে গিয়েছে। কঠিন মাটির দেশ। এরই মধ্যে এখানে বেশ গরম পড়েছে, সন্ধ্যাবেলা বেশ গরম ওঠে; কিন্তু শেষরাত্রে শীত-শীত। বনওয়ারী বলে—গা-সিরসির করে। সমস্ত রাত্রি বনওয়ারীর ভাল ঘুম হয় নাই। শেষরাত্রে গায়ে কাঁথাটা টেনে নিয়ে আরামে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বু-বু ক'রে চীৎকার করে উঠল। গোপালীবালা তাকে ঠেলে তুলে দিলে—ওগো! ওগো!

বনওয়ারী ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর উঠে বসল।

গোপালীবালা জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল? স্বপন দেখছিলা না কি গো? এমন করে চ্যাচালা কেনে গো!

সেও কাঁপছিল ভয়ে।

—হুঁ। একবার তামুক সাজ্ দেখি।

—কি স্বপন দেখলা বল দি-নি? এমন ক'রে তরাসে বুঝিয়ে উঠলে কেনে গো?

—কত্তা আইছিলেন। হাত দুটি জোড় ক'রে কপালে ঠেকালে বনওয়ারী।

—কত্তা! শিউরে উঠল গোপালী।

—হুঁ, কত্তা। পিসীর কথাই ঠিক গোপালী। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—লে, শিগশির তামুক সাজ্! খেয়ে আটপৌরে-পাড়া হয়ে তবে যাব নদীর ধারে। লইলে হয়তো ওদের কারোর দেখা পাব না।—বাবার পুজো দিতে হবে। আটপৌরে-পাড়ার চাঁদা চাই।

পরম কাহার আটপৌরে কাহারপাড়ার মাতব্বর। তার কাছে যাবে বনওয়ারী।

বাঁশবাদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম—গ্রাম ঠিক নয়, ওই জাঙল গ্রামেরই একটা পাড়া। তবে জমিদারী সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন ব'লে—ভিন্ন গ্রাম বলেই ধরা হয়। দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহারপাড়া। বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে কাহার। বেহারা-কাহারপাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশি, প্রায় পঁচিশ ঘর বসতি; পূব দিকে নীলের মাঠের বড় সেচের পুকুর নীলের বাঁধের চার পাড় ঘিরে বেহারাদের বসবাস। কোশকেঁধে-বাড়ির বনওয়ারী বেহারাপাড়ার মুরুব্বি। বেহারা-কাহারেরা পাল্কী বয়। বনওয়ারীর পূর্বপুরুষ এক কাঁধে পাল্কী নিয়ে এক ক্রোশ পথ চ'লে যেত, কাঁধ পর্যন্ত বদল করত না – তাই ওদের বাড়ির নামই 'কোশ-কেঁধেদের' বাড়ি। ওদের বংশটাই খুব বলশালীর বংশ। লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা, কিন্তু গড়ন-পিটনটা কেমন যেন মোটা হাতের; অথবা গড়নের সময় ওরা যেন অনবরত নড়েছে, পালিশ তো নাই-ই।

বেহারা-পাড়া থেকে রশিখানেক পশ্চিমে আটপৌরে কাহারদের বসতি। 'গোয়ার বাঁধ' ব'লে মাঝারি একটা পুকুরের পাড়ের উপর ঘর কয়েক আটপৌরে-কাহার বাস করে। আটপৌরেরা পাল্কী কাঁধে করে না, ওরা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় ব'লে জাহির করে। খুব ভাল কথা ব্যবহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। বলে—আটপৌরে হ'ল অট্টপহরী। অর্থাৎ 'অষ্টপ্রহরী'।

আসল অর্থ পাওয়া যায় চৌধুরীদের বাড়ির পুরানো কাগজে। সে সব কাগজ এখন প্রায় উইয়ে খেয়ে শেষ ক'রে এনেছে। উইয়ে-খাওয়া কাগজের স্তূপের মধ্যে কিছু কিছু এখনও পুরো আছে। তার মধ্যে ১২২৫-২৬ সালের থোকা জমাওয়াসিল বাকি থেকে পাওয়া যায়—গোটা বাঁশবাঁদি-মৌজাটাই ছিল পতিত ভূমি—ওখানে কোন পুকুরও ছিল না, বসতিও না। জাঙল গ্রামে মোটমাট দশ ঘর বাস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়, সবাই তারা ছিল চাষী সদ্‌গোপ। ১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায়—এক নতুন জমাপত্তন—নীলকর শ্রীযুক্ত মেস্তর জেনকিন্স সাহেবের নামে। সেই জমার মধ্যে সেই জাঙলের যাবতীয় পতিত ভূমি, তার সঙ্গে গোটা বাঁশবাঁদি মৌজাটাই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। জাঙলের পশ্চিম দিকে উঁচু ডাঙার উপর এখনও কুঠি-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং হ্রদের পুকুর ব'লে একটা পুকুর দেখা যায়। ওই হ্রদের পুকুরের জল পাকা নালা বেয়ে এসে নীল পচানোর পাকা চৌবাচ্চাগুলি ভর্তি ক'রে দিত। সেখানটা এখন জঙ্গলে ভ'রে গিয়েছে এবং ওইখানেই বুনো শুয়োরের একটা উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে। বাঁশবাঁদি মৌজা বন্দোবস্ত নিয়ে সায়েবরাই ওখানে পুকুর কাটায়, এবং বাঁশবাঁদির সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল ক'রে তোলে। সেই হাঁসিল করবার জন্যই এই কাহারপাড়ার লোকেরা বাঁশবাঁদিতে আসে। এসেছিল অনেক লোক। তার মধ্যে এই কাহার কয়েক ঘরই এখানে বসবাস করে। কয়েকজন পেয়েছিল কুঠি-বাড়িতে চাকরি, লাঠি নিয়ে ঘুরত-ফিরত, আবার দরকারমত সাহেব মহাশয়দের ঘরদোরের কাজ করত; এজন্য তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল, এবং এখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার কাজের জন্য চাকরানভোগী হিসেবে খেতাব পেয়েছিল—অষ্টপ্রহরী বা আটপৌরে। বেহারা-কাহারেরা নীলের জমি চাষ করত এবং প্রয়োজনমত সাহেব-মেমদের পাল্কী বইত। নীলের জমি সেচ করবার জন্য পুকুরটা কাটানো হয়েছিল ব'লে ওটার নাম 'নীলের বাঁধ', আর 'গোরার বাঁধ' নামটা হয়েছে 'গোরা' অর্থাৎ সাহেবদের বাঁধ ব'লে। পুকুরটার জল ভাল—এই পুকুরে সেকালে কারও নামবার হুকুম ছিল না, ওখান থেকেই যেত সাহেবের ব্যবহারের জল, মধ্যে মধ্যে কুঠিয়াল সাহেবের কাছে সমাগত বন্ধুবান্ধব গোরা সাহেবেরা এসে স্নান করতে নামত। স্নান করত নাকি উলঙ্গ হয়ে। সেই আমল থেকে কাহারদের কয়েকটা ঘরে রূপ এসে বাসা বেঁধেছে। পরম কাহারদের গুষ্টিটার রঙই সেই আমল থেকে ধবধবে ফরসা। সুচাঁদপিসীর কর্তাবাবা অর্থাৎ বাবার বাবার রঙ একেবারে সাহেবের মত ছিল। সুচাঁদ-পিসীর রঙও ফরসা। মেয়ে বসন্ত খুব ফরসা নয়। কিন্তু ওর মেয়ে পাখী তো একেবারে 'হলুদমণি' পাখী; চৌধুরীবাড়ির কর্তার ছেলে অকালে ম'রে গেল মদ খেয়ে, নইলে যুবতী

পাখীর এখনকার মুখের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল দেখা যেত। তেমনিই বড় বড় চোখ, তেমনই সুডৌল নাক, চুলের সামনেটা পযন্ত তেমনিই ঢেউখেলানো। চৌধুরীকর্তা আজ নিঃস্বও বটে, তার উপর হাড়কৃপণও বটে, তবু তিনি বসন্তের মেয়ে পাখীকে মায়া-মমতা করেন। বসন্তের ও-বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ আজও ঘোচে নাই, সে আজও ও-বাড়ি যায়, খোঁজ-খবর করে, দুধের রোজ দেয়, কিন্তু টাকার তাগাদা করে না।

এই চৌধরীকর্তার বাবার বাবা ছিলেন সাহেবদের নায়েব। তিনি নাকি ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, আর তেমনই নাকি ছিলেন জবরদস্ত জাঁহাবাজ বেটাছেলে; তাঁর দাপে নাকি বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেত। তাঁকেই দয়া করেছিলেন এই বেলবনের মহারাজ—যিনি নাকি এখানে 'কর্তা' ব'লে পরিচিত—গেরুয়া কাপড় প'রে, খড়ম পায়ে, দণ্ড হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষ আর ধবধবে পৈতের শোভায় বুক ঝলমলিয়ে, ন্যাড়া মাথায় যিনি রাত্রে চারদিকে ঘুরে বেড়ান। চন্দনপুরে ভদ্রলোকেরা বলে—ও-কথাটা নেহাতই কাহারদের রচনা করা উপকথা। আসল কথা নীলকুঠী সব জায়গায় যেমন ভাবে উঠেছে এখানেও তেমন ভাবেই উঠেছে, তবে কোপাইয়ের বান আর কুঠী-ওঠা ঘটেছে একসঙ্গে। যে সময় কুঠীয়াল সাহেবদের খারাপ সময় চলছিল, কারবার উঠিয়ে দেবার কথা হচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কোপাই ভাসল। তেমন ভাসা কোপাই নাকি কখনও ভাসে নাই। সে বান কুঠী-বাড়ি পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল। লোকে বলে, সাহেব-মেম সেই বানে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু সুচাঁদপিসী যে-কথা বললে, সেইটাই হ'ল আসল কথা। সেই কথাটাই বিশ্বাস করে বনওয়ারী। ওই কর্তার কথা অমান্য করতে গিয়েই সাহেব মহাশয় মেমকে নিয়ে তলিয়ে গেল ঘুরনচাকির মধ্যে প'ড়ে। নইলে সাহেব মেম—যারা সাত সমুদ্দর পার হয়ে ভাসতে ভাসতে আসে, তারা কোপাইয়ের বানে ম'রে যাবে? কর্তার লীলা, কর্তার ছলনা সব। চৌধুরীকর্তা দেবতার দয়ায় শুধু যখের ধনই পেলেন না, সাহেব কোম্পানীর তামাম সম্পত্তিও পেয়ে গেলেন জলের দামে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

চৌধুরীকর্তাদের আমলেও কাহাররা বেহারার কাজ করেছে। চৌধুরীদের পাল্‌কী ছিল দুখানা। ডুলি ছিল খানচারেক। আটপৌরেরা তাঁদের বাড়িতেও আটপৌরের কাজ করেছে।

* * * *

পুরানো কথা যাক; আজকের কথাই বলি। বনওয়ারী পরমের বাড়ি এসে দেখলে, এই ভোরবেলাই পরম বেরিয়ে গেছে। পরমের বউ কালোশশী এই গাঁয়েরই দৌহিত্রী। আটপৌরেদের গোরাচাঁদের বেটীর বেটী। এই গাঁয়েই মানুষ হয়েছে কালোশশী। গোরা-চাঁদের ছেলে ছিল না—বড় মেয়ের মেয়েকে নিয়ে মানুষ করেছিল। সুতরাং কালোশশীর সঙ্গে কথা বলতে বউমানুষের সঙ্গে কথা বলার সঙ্কোচ ছিল না। তার উপর এককালে বনওয়ারীর সঙ্গে তার নাকি মনে মনে 'রঙ ছুঁই ছুঁই' এমন অবস্থা হয়েছিল। সে অনেক কথা। কাহার-কন্যে কালোশশীর জন্যে সেকালে বোধ হয় দেবতারাও পাগল হয়েছিল। কিন্তু তার মন কেউ পায় নাই। পেয়েছিল বনওয়ারী। কিন্তু হায় রে 'নেকন'! আটপৌরে-কাহার-কন্যে বেহারা-

কাহারের ঘরে আসে কি ক'রে ? হায় রে 'নেকন' !

সে-দিনের কথা মনে পড়লে বনওয়ারীর এই বয়সেও বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে ওঠে। রাত্রে উঠে দু'জনে গিয়ে মিলত কোপাইয়ের কূলে। গান গাইত কালোশশী। আকাশে উঠত 'চন্দ্রশশী'।

আটপৌরে-পাড়ার ছোঁড়ারা পাহারা দিত ; বনওয়ারীকে পাকড়াও করবার জন্যে তাদের সে কি চেষ্টা ! কিন্তু লবডঙ্কা ! একদিনও ধরতে পারেনি তারা। বনওয়ারী হাসত আর গান করত —'সুরুৎ করে চলে যাব গিরগিটির মতন, চোখে চোখে রাখবি কতক্ষণ !' ওরা আক্রোশে জ্বলত। ওদের সর্দার পরম পথে-ঘাটে ছুতোনাতা ক'রে ঝগড়াও করত। কতবার যে দু-চারটে করে কিল চড় আদান-প্রদান হয়েছে পরমের সঙ্গে তার ঠিক নাই। শেষে পরমের হাতে পড়ল কালোশশী। কপাল কালোশশীর। পরমের হাতে প'ড়ে ওর আর দুর্গতির শেষ নাই। কালো-বউকে বিয়ে ক'রে পরম ভালবাসলে এক ভিনজাতের কন্যাকে ; তার উপর মন্দ-সঙ্গে মিশে ধরলে ডাকাতি। কালো-বউ মনের আক্রোশে চন্দনপুরে রেজা খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল। পরমের দ্বীপান্তরের সময় চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ির ঝি-বৃত্তি করলে, আর বাবুদের চাপরাসী সিংজীর অনুগৃহীতা হয়ে রইল।

পরম দ্বীপান্তর থেকে ফেরার পর কালোশশী গাঁয়ে এসেছে। কালোশশীর অনেক দুর্নাম, অনেক কলঙ্ক,—মানুষটা যত বড়, তার চেয়েও বড় তার কলঙ্ক।

আজ কালো-বউ একগাল হেসে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বললে—কি ভাগ্যি, সকালেই তোমার মুখ দেখলাম। ব'স।

—পরমদাদা গেল কম্‌নে, তাই কও।

—দাদার তরেই আইছিলা তা হ'লে ? হাসলে কালোশশী।—তা সে তো তোমার এই খানিক আগে বেরিয়ে গেল। ওই হুঁকোর মাথায় কল্কিতে আগুনও নেবে নাই এখনও। খাও কেনে তামুক।

—কি বেপদ দেখ দি-নি।

—কেন ? বেপদটা কি হ'ল ? ব'স, আমার সাথে খানিক গল্প কর নিশ্চিন্দি। মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল কালো-বউ।

—বলি, হাসি তোমার আসছে ?

—কেনে ? তোমাকে দেখে হাসি আসবে না কেনে ?

—বলি কাল 'আতে' সনজে-কালে শিস শোন নাই ?

কালো-বউ এবার শঙ্কিত হয়ে উঠল।—হাঁ, তা শুনেছি ভাই।

—তবে ?

তবের ব্যাপারটা হ'ল—রাত্রির অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাটা কালো-বউ ভুলে গিয়েছে।

বনওয়ারী এবার বসল। হুঁকোটা নিয়ে টানতে টানতে সবিস্তারে কালোশশীকে বললে

করালীর কুকুরটার রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা। বললে—তোমাকে বলব কি ভাই, একেবারে মুখে 'অক্ত' তুলে মাথা কাছড়ে ম'রে গেল। শেষকালে হ'ল কি—

মুখের কাছ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে ধরলে বনওয়ারী—তার চোখে মুখে ফুটে উঠল অপরিসীম আতঙ্ক, গায়ের রোমগুলি কাঁটার মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

কালোশশী মুখ হাঁ ক'রে শুনছিল। হাতে ঝাঁটা নিয়ে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বনওয়ারী বললে কুকুরটার চোখ ফেটে যাওয়ার কথা। বললে—ফোস্কার মত ফুলে উঠে ফ-টা-স ক'রে ফেটে গেল। আর গলগল ক'রে অক্ত।

শিউরে উঠল কালোশশী—ওঃ, মাগো!

বনওয়ারী বললে—তাই এয়েছিলাম পরমদাদার কাছে; পিতিবিধেন তো করতে হবে।

—তা হবে বইকি! কত্তার 'আশ্চয়ে' বাস ক'রে কত্তার কোপে প'ড়ে বাঁচব কি ক'রে?

—সেই তো। তা তোমরা করছ কি?

—আমরা? হঠাৎ কালোশশী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল তার স্বামীর উপর।—আমার কপালে ঝাঁটা আর তার কপালে ছাই—বুঝলা দেওর, তার কপালে ছাই। এ পাড়ার অদেষ্টই মন্দ। বুঝলা না? মাতব্বর যদি মাতব্বরের মত হয় তো দশের জন্যে ভাবে। সে কি আর তুমি ভাই! সে হ'ল—'ফরম' আটপৌরে। 'আতদিন' নিজের ভাবনা, জমি-পয়সা আর ওই পয়সা-জমি। কাল আতে সবাই শুনেছে শিস। ভয়ও সবাই পেয়েছে। কিন্তু কি হবে? মাতব্বর গেল চন্নপুরে, বড়বাবুদের কাছারিতে। তামাম সাহেবডাঙা কিনেছে বাবুরা, শুনেছ তো?

চমকে উঠল বনওয়ারী। কথাটি তার কাছে একটা মূল্যবান কথা। সে প্রশ্ন করলে—সকালে উঠে সেখানেই গিয়েছে বুঝি?

—আবার কোথা? বলব কি দেওর, 'আতে' স্বপন দেখে কথা কয়—বিড়বিড় ক'রে ওই কথা। 'নয়ানজুলি', 'ছেঁচের জল', 'দে কেটে দে', 'কোদালে ক'রে মাথা কুপিয়ে দোব'—এই কথা।

বনওয়ারী অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চন্নপুরের বড়বাবুরা রাজাতুল্য লোক, মস্ত কয়লার ব্যবসা। তাঁরা হঠাৎ জমির উপর নজর দিয়েছেন। পতিত জমি যেখানে যা আছে কিনে চলেছেন। জমি কাটাবেন। কতক নিজেরা কাটিয়ে চাষ করবেন, কতক প্রজাবিলি করবেন। পরমদাদা ভারী বুদ্ধিমান লোক। খোঁজখবর অনেক রাখে। সে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে বাবুদের দরবারে। আর সে কি করছে? নাঃ, ছি ছি ছি!

বনওয়ারীর সমস্ত বৈষয়িক কাজগুলি মনে প'ড়ে গেল। জাঙলে মনিববাড়ি যেতে হবে। ধান পিটানো শেষ হয়ে গিয়েছে—এখনও বছরের দেনা-পাওনার হিসাব হয় নাই। সেখানে একবার যাওয়া উচিত। তারপর একবার চন্নপুর যেতেই হবে। কালো-বউয়ের কথাগুলি বনওয়ারীর কানে আর যাচ্ছেই না প্রায়।

কালোশশী ব'লেই চলেছিল—পাশে আমি যে একটা মানুষ শুয়ে থাকি, তা অসুখ বিসুখ

কি দেহ খারাপ হ'লে যদি কাতরে কাতরে ম'রেও যাই, তবুও তার ঘুম ভাঙে না। বললে বলে কি জান? বলে—নাক ডাকে, তাতেই শুনতে পাই না। সে নাক ডাকা যদি শোন।

কালোশশী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

বনওয়ারী হঠাৎ উঠে পড়ল। হুঁকোটা ঠেসিয়ে রেখে দিয়ে বললে—আমি ভাই তা হ'লে ওঠলাম।

—ব'স, ব'স। আর একবার না হয় তামুক সেজে দি।

—আমারও তো কাজকম্ম আছে ভাই। মুনিববাড়ি যেতে হবে। তা' পরে—। থেমে গেল বনওয়ারী। চন্নপুর যাওয়ার অভিপ্রায়ের কথাটা আর বললে না সে। হাজার হলেও কালোশশী পর।

কালোশশী তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে আক্ষেপের একটা শব্দ ক'রে বললে—হা-রে, হা-রে! সব পুরুষই এক! ওই কাজ কাজ আর কাজ! মুখে তার এক বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

বনওয়ারী একটু অপ্রস্তুত হ'ল। সে হাসতে চেষ্টা ক'রে বললে—তা ভাই, কাজ করলেও সে তো সবই তোমাদের জন্যেই। 'ওজগার' ক'রে 'সমপ্পন' তো তোমাদের হাতেই।

বলতে বলতে সে বেরিয়ে এল পরমের বাড়ি থেকে। নইলে এ কথাতেও কালোশশীর কথায় ছেদ পড়বে না।

কাজ অনেক। বনওয়ারীর একদণ্ড ব'সে থাকলে চলে? ভাই কালোশশী, তোমাকে ভাল তো বাসি, কিন্তু উপায় কি? রঙের ছাপ একবার মনে লাগলে কি আর ওঠে? হোক না দেখা এক যুগ পরে, দেখা হ'লেই দুজনের ঠোঁটেই হাসি ফোটে। ওই রঙটার রকমই হ'ল পাকা। একবার ছুঁলে, ঘষে ঘষে 'তিয়ে' ক্ষ'য়ে ফেললেও ওঠে না। কিন্তু যার উপায় নাই, তার জন্যে কেঁদে কেটে মনখারাপ ক'রেই বা লাভ কি? তোমার মায়ের বাপ যে তখন 'বেহারা-কাহার' ব'লে তোমাকে দিলে না বনওয়ারীর হাতে। আর পরমের সঙ্গে যখন তোমার বিয়ে হয়ে গেল, তখন বনওয়ারী আর হেসে দুটো কথা ক'য়ে করবে কি? আর তেমন জাতের মানুষ নয় বনওয়ারী। কর্তব্যধর্ম ব'লে একটা কথা আছে। একটা পাড়ার মাতব্বর সে। হরিবোল! হরিবোল! 'পভু', তুমিই বনওয়ারীকে বাঁচিও। বাঘ-শুয়োর-সাপ-ঝড়-বান—এসব থেকে বাঁচাতে বলে না বনওয়ারী, বনওয়ারীকে তুমি এই সব অন্যায় কারণ থেকে বাঁচিও।

কাজ অনেক। পাড়ায় ফিরে সুচাঁদপিসীকে বলতে হবে—যেন প্রতি বাড়ি ঘুরে পুজোর চাঁদা আর চাল তুলে রাখে। যে মেয়েগুলান ঘুঁটে মাথায় ক'রে দুধ নিয়ে চন্নপুরে যাবে, দুধ ও ঘুঁটে বেচে তারপর সারাদিনটা সেখানে বাবুদের ইমারতে মজুরনী খাটবে, তাদেরই বলে দিতে হবে—অবসর ক'রে কেউ যেন কাছারিতে পরমের সঙ্গে দেখা ক'রে সকাল সকাল তাকে বাড়ি ফিরতে বলে। যদি তার চন্নপুরে যাওয়া আজ না-ই হয়, মুনিববাড়িতে যদি আটক পড়েই যায় কোন রকমে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা ঠাওরালে সে। মুনিব বাড়িতে তো রকমের

অভাব নাই। খামারটা সাফ কর্, নয়তো কাঠের গুঁড়িটা থেকে কতকগুলো কাঠ ছাড়িয়ে দিয়ে যা; নয়তো গরুর জাব-খাওয়া ভাবরগুলোর গায়ে মাটির লেপন দে; নিদেন কলার ঝাড়ের মধ্যে পুরনো 'এটে' পচেছে, খুঁড়ে তুলে ফেল্। আর হিসেবে? হিসেব বসলেই তো এক বেলা।

আটপৌরে-পাড়া থেকে নিজেদের পাড়ায় ফিরে প্রথমেই তাকে দাঁড়াতে হ'ল করালীর বাড়ির উঠানে। করালী উঠানেই একটা গর্ত খুঁড়ছে, আর পাখী করালীকে তিরস্কার করছে।

—প'চে গন্ধ উঠবে যে।

করালী মাটি কুপিয়েই চলেছে। ছোঁড়াটার দেহখানা শক্ত বটে। আচ্ছা জোয়ান হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে শরীরের—বিশেষ ক'রে বুকের পিঠের হাতের পায়ের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, তার উপর ঘেমেছে—চক্ চক্ করছে সর্বাঙ্গ। আজ রবিবার—ছোঁড়ার ছুটি, তাই চন্নপুর না গিয়ে কালুয়া কুকুরটার জন্যে সমাধি খুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

পাখী চেঁচিয়েই চলেছে—কথা শুনছিস? না কানে যেছে না?

—চেঁচাস না মেলা বকবক ক'রে। করালী মাটি কোপাতে কোপাতেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে। কালুয়া কুকুরটাকে সে এইখানেই সমাধি দেবে। কালুয়ার হাড় মাস যে চিল-শকুন-শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে, সে করালীর সহ্য হবে না।

—বাড়িতে টেকা দায় হবে। ভাতের গরাস মুখে তুললে বমি আসবে বদ 'ঘেরানে'।

—তা তোর কি? আমার বাড়ি আসিস না তুই?

—ওরে মুখপোড়া, ওরে নেমকহারাম! তোর মতন নেমকহারাম বজ্জাত কেউ আছে নাকি? বলে যে সেই—'যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি', তাই তোর বিত্তান্ত। তা আমার ঘেরান না লাগুক, আমি তোর বাড়িতে না আসি, নসুদিদিও তো মানুষ। সে থাকতে পারবে কেনে?

বনওয়ারী করালীর বাড়ি না ঢুকে পারলে না। বনওয়ারীকে দেখেই পাখী ব'লে উঠল —এই দেখ মামা; কি করছে দেখ। বাড়িতে কুকুর পুঁতবে—'সামাজ' দেবে। বাংণ কর তুমি। নসুদিদি নাই, উ যা-খুশি তাই করছে।

বনওয়ারী বলে—এই, বলি, হচ্ছে কি? বাড়ির উঠোনে ভাগাড় করে কে? তুই কি খ্যাপা না পাগল?

করালীর টামনার কোপে মাটিতে একটা ফাট দেখা দিয়েছিল—ফাটলে টামনার চাড় দিয়ে সেই মাটির একটা চাপ ছাড়াবার চেষ্টা করছিল দাঁতে দাঁত টিপে, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ ক'রে। সে কোনও উত্তর দিলে না। পাখী বললে—আবার বলছে কুকুর পুঁতে যাবে বাঁশবেড় খুঁজতে।

—বাঁশবেড় খুঁজতে! বিস্ময়ের সীমা রইল না বনওয়ারীর।

—হ্যাঁ। কিসে শিস দেয়, কিসে মেরেছে ওর কালুয়াকে, তাই খুঁজে দেখবে।

—সর্বনাশ! হে ভগবান! হে বাবা কত্তাঠাকুর—তোমার লীলাখেলার নিরাকরণ করতে চায় ছোঁড়া! একের পাপে দশ নষ্ট হবে! মুহূর্তে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

—করালী।

করালী এ আওয়াজ শুনে চমকে উঠল, টামনাটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে খানিকটা স'রে দাঁড়াল। ঘুরে তাকালে সে বনওয়ারীর দিকে।

বনওয়ারীর এই কণ্ঠস্বরকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। বনওয়ারী সহজে অত্যন্ত ভালমানুষ লোক, পাড়ার মাতব্বর হ'লেও মাতব্বরির কোন ঝাঁজ নাই, কোন অহঙ্কার নাই। হাসি-খুশি নাচ-গান মিষ্টি কথা নিয়েই আছে, কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া-বিবাদ হ'লে দু'জনকেই বুঝিয়ে-সুজিয়ে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয়; দেখে মনে হয় গরজ যেন বনওয়ারীরই। কিন্তু আর এক বনওয়ারী আছে; কালেকস্মিনে সে দেখা দেয়। সে দেখা দেবার আগে প্রথমেই এই আওয়াজ তুলে সে সাড়া দেয়, সেই বনওয়ারী জাগছে।

সে বনওয়ারী জাগলে বিদ্রোহীকে তৎক্ষণাৎ অসুরের মত শক্তিতে আক্রমণ ক'রে মাটিতে ফেলে, বুক চেপে ব'সে, বাঁ হাতে গলা টিপে ধরে, ডান হাতে টেনে ধরতে চেষ্টা করে জিভ। তখন পাঁচ-সাতজন জোয়ান ভিন্ন সে বনওয়ারীকে টেনে সরানো যায় না।

বনওয়ারীর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। সে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলে করালীর দিকে। পাখী এবার সামনে এসে ভয়ার্ত স্বরে বললে—না, মামা, না। ও আর সে সব করবে না।

করালী কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্থিরদৃষ্টিতে বনওয়ারীকে দেখছে। মুহূর্তে চোখে ফুটছে শঙ্কা, আবার পর-মুহূর্তে জ্বলে উঠছে বিদ্রোহ।

বনওয়ারী পাখীকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। পাখী পিছন থেকে তার হাত ধরতে চেষ্টা করলে—মামা! মামা! তবু বনওয়ারী নীরবে এগুচ্ছে।

শেষে নিরুপায় হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পাখী—ও দিদি, দিদি গো! ও দিদি! দিদি অর্থাৎ সুচাঁদ। এ সময়ে এক সুচাঁদ পারে বনওয়ারীর সামনে দাঁড়াতে।

বনওয়ারী উত্তরোত্তর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, এমন ভাবে আজও কেউ তাকে অপমান করে নাই। সে এগিয়ে চলল। তবু করালী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

করালী কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, হঠাৎ যেন সাহস তার ভেঙে পড়ল, মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে উঠানের বেড়াটা ডিঙিয়ে ওপাশে প'ড়ে ছুটে পালাল মাঠে। বনওয়ারী খানিকটা ছুটল, কিন্তু বয়স হয়েছে বনওয়ারীর, ছুটলে হাঁপ ধরে। এমনি পাল্কী কাঁধে 'সওয়ারী' বহনের অভ্যস্ত চালে কাঁধ বদল ক'রে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিয়ে দশ ক্রোশ হাঁটতে পারে, কিন্তু এমনভাবে ছুটতে আর পারে না। থামতে হ'ল বনওয়ারীকে। ওদিকে গাঁয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সুচাঁদপিসী হাঁকছে। মেয়ে ছেলে সব জ'মে গিয়েছে। প্রহ্লাদ রতন এগিয়ে আসছে। বনওয়ারী অগত্যা ফিরল। যাক হারামজাদার বাচ্চা—এখন যাক; কিন্তু যাবে কোথা? ফিরতে হবে, না ফিরতে হবে না? কার এলাকায় ফিরবে?

ফাল্গুন মাসের সকালবেলা, তাই কাহারেরা বাড়িতে ছিল। কাহারপাড়ায় কাজকর্মের চাপ এখন কম; মাঠে ক্ষেতে চাষ-কর্ম এখন বন্ধ, খামারে ধান মাড়াইও শেষ হয়ে গিয়েছে;

রবি ফসলের পালাও প্রায় শেষ; গম কারও পেকেছে, কারও পাকতে শুরু করেছে, ছোলা-মসুর-সরষে এ সবেরও ওই অবস্থা। আলুর জমির কাজও আর নাই। কেবল তুলতে বাকি। চৈত্রের প্রথম থেকে এক দফা ভিড় লাগবে আবার। কারও কারও আখ আছে—নাবি চাষের আখ, সেও মাড়াই হবে চৈত্র মাসে। এখন একমাত্র কাজ মুনিব-বাড়ির দেনাপাওনার হিসেব—সে হিসেব মুনিবদের হাতে। কাজেই পুরুষেরাও সকলে বাড়িতেই ছিল। তাই রক্ষা হ'ল।

প্রহ্লাদ রতন বনওয়ারীর সমবয়সী। ওরা এগিয়ে এসে বনওয়ারীর হাত ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। প্রহ্লাদ বললে—করালীর বিহিত যদি না হয় অতন, তা হ'লে তো কাণ্ড খারাপ। কেউ আর কাউকে মানবে না।

রতন বললে—তা হ'লে গেরামের 'পিতুল' নাই—এ একেবারে 'ধ্রোব' কথা।

বনওয়ারী কোন কথা বললে না।

যে দিক দিয়ে ওরা পাড়ায় ঢুকল, সে দিক দিয়ে নিমতেলে পানুর ঘর সামনেই পড়ল। পানু নিমতলার পশ্চিম দিকে ছায়াটি যেখানে পড়ে, সকাল বেলা সেইখানটিতে তালপাতার চাটাই বিছিয়ে তামাক সেজে মাতব্বরদের অভ্যর্থনা করলে।—ব'স বনওয়ারীদাদা, অতনদাদা, পেল্লাদখুড়ো,—ব'স, তামুক খাও।

একে একে জুটল সকলেই। সুচাঁদও এসে দাঁড়াল। বললে—বেশি 'আগ' করিস না বাবা বনওয়ারী, ছোঁড়াকে এনে তোর পায়ে ফেলে দিচ্ছি আমি।

বনওয়ারী এতেও কোন কথা বললে না।

সুচাঁদ বললে—আমার হয়েছে এক মরণ, বুঝলি বাবা—এই বুড়ো বয়েসে হারামজাদী বেটীর বেটী নিয়ে এ এক বেপদ। গলায় কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটা ওঠেও না, নামেও না, তাই। সর্বনাশীর করালী ছাড়া সারা 'তিভুবন' খাঁ-খাঁ—খাঁ-খাঁ করছে। বুড়ীর সে হাত নাড়া দেখে এবার সবাই হেসে উঠল। শুধু হাত নাড়াই নয়, খানিকটা নেচেও দিলে বুড়ী। সে দেখে বনওয়ারীর মুখেও এবার অল্প একটু হাসি দেখা গেল। পানু ঘরের ভিতর থেকে একটা পাঁঠার কান ধ'রে টেনে এনে বললে—এই দেখ বনওয়ারীদাদা, এইটি। কাল 'আতে' এসেই আমরা 'স্তি-পুরুষে' এইটিকে কত্তার পূজোয় দোব ঠিক করেছি। এইটিই তোমার সবচেয়ে বড়, আর গায়েও বেশ আছে। বেশ তেজালো পাঁঠা।

বনওয়ারী পাঁঠার গায়ে হাত বুলিয়ে মেরুদণ্ডটা টিপে দেখে বললে, বেশ সাবধানে যতন ক'রে আখিস বাপু দুটো দিন। পূজো পরশু দোবই। শনিবার আছে; বারও পাব।

রতন বললে—আটপৌরে-পাড়ায় বলবে না?

বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে হতাশা প্রকাশ ক'রে বললে—তবে আর 'মেজাপ' খারাপ হ'ল কেনে! সকালে—সেই ধর পেথম—কাক কোকিল ডাকতে ঘুম ভেঙেছে। সমস্ত 'আত' ভাবনায় ঘুম হয় নাই। ভোর 'আতে' চোখ লেগেছেল খানিক— তা তোমার, সঙ্গে সঙ্গে স্বপন হয়ে গেল। দেখলাম যেন, ঠিক কত্তা এসে দাঁড়িয়েছেন মাথার 'ছিয়রে'। বু-বু ক'রে ঘুম ভেঙে গেল। উঠলাম। উঠেই গেলাম পরমের বাড়ি। তা পরম সেই ভোরেই বেরিয়েছে। তা বলে এলাম কালো-

বউকে—বলি, ব'লো পরম এলে।

রতন প্রহ্লাদ দুজনেই একটু হাসলে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে। মজলিসের সকলে—স্ত্রী-পুরুষ সকলে হাসলে। তারা অবশ্য গোপন ক'রে হাসলে।

বনওয়ারী অনুভব করতে পারলে গুপ্ত হাসির ধারার সরস স্পর্শটুকু। সে কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যই বললে—সে গিয়েছে তোমার চন্নপুরে বাবুদের বাড়ি। বাবুরা নাকি গোটা সায়েবডাঙা কিনেছে। ডাঙা ভেঙে জমি করবে। 'খানিক আদেক' জমি বিলিও করবে শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে সবার মন ঘুরে গেল; বনওয়ারীও কালো বউয়ের কথা থেকে লুব্ধ হয়ে ছুটল জমির দিকে।

এটা একটা খবর বটে। নীলকুঠির সাহেবদের সেই ডাঙাটা, যেখানে বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য তারা ঘর-দোর করেছিল, কুঠি করেছিল, সেই ডাঙাটা ভেঙে জমি হবে? বিলিও করবে কিছু জমি? এবং তাদেরই একজন সে জমি বিলি নেবার জন্য ভোরবেলায় গিয়ে ধরনা দিয়ে বসে আছে? মুহূর্তে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল। জমি! জমি!

বনওয়ারী বললে, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। শুনছ অতন-ভাই, পেল্লাদ-খুড়ো!

রতন প্রহ্লাদ উৎসুক হয়ে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে ব'সেই খানিকটা কাছে এগিয়ে এল।—কি বল দি-নি? কথাটা কিন্তু সকলেই বুঝতে পেরেছে। এক চাপ ছোলা-কলাই যখন ভিজে ফুলে ওঠে, তখন যেমন সবগুলি ছোলা থেকেই অঙ্কুর বার হয়ে মাটি ফাটিয়ে উপরের দিকে একসঙ্গে ওঠে, তেমনিভাবে এই খবরের অন্তর্নিহিত আশার সরসতায় সকল কাহারের অন্তর থেকে একই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাছাকাছি ব'সে পরস্পরের মনের খবর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে পরস্পরকে ছুঁয়ে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে। কিন্তু তবু কথাটা বনওয়ারীর কাছে থেকে আসাই ভাল। বনওয়ারীরও কথাটা বলাই ভাল। কথাটা একদিন প্রকাশ পাবেই, এবং নিজে জমি নিয়ে সে যদি কথাটা কাহারদের কাছে গোপন ক'রে রাখে, তবে সেটা তার অধর্ম হবে এবং মাতব্বরেরও যোগ্য হবে না। সে বললে, আমাদেরও সব চল কেনে চন্নপুর। জাঙলের সায়েবডাঙার জমি তো তোমার ধরগা চেয়ে কম লয়; সেরেস্তায় তিন শো বিঘের ডাক। আমরা সবাই মিলে দু বিঘে এক বিঘে ক'রে—। বনওয়ারী সকলের মুখের দিকেই তাকালে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, চোখগুলি জলজ্বল করছে—কয়লার মধ্যে পড়া আগুনের ফিন্‌কির মত।

কি বল?

সুচাঁদ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নাই। সে দূরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে, করালীর আচরণের সকল বিরক্তি এবং রাগ মুছে গিয়ে সকলের মুখে হঠাৎ যেন একটি প্রসন্ন দীপ্তি ফুটে উঠল। কোন্ সে বিস্ময়কর সংবাদ, যার মধ্যে সর্বজনীন প্রসন্নতার কারণ লুকানো আছে? তার উপর বনওয়ারীর কথা বলবার ভাবের মধ্যে বেশ একটি শলাপরামর্শ করার ভঙ্গিও সে দেখতে পেলে।

এগিয়ে এসে সে বললে—কি ? কি রে বনওয়ারী। কি বলছিস তোরা ?

প্রহ্লাদ হেসে বললে, লাও ঠ্যালা ! এখন ঢাকঢোল বাজিয়ে পাড়া গোল ক'রে বল।

সুচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মস্করা করছিস আমার সঙ্গে পেল্লেদে, মুখপোড়া ছুঁচো ?

শুনতে না পেলেও বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখনাড়া এবং মুখভঙ্গি থেকে সুচাঁদ নির্ভুল ধরতে পারে যে তাকেই তারা ঠাট্টা করছে। এবার নিশ্চয় চীৎকার ক'রে কেলেঙ্কারি করবে বুড়ী। একমাত্র উপায় ব্যাপারটা বলা : বললে বুড়ী মস্করার জ্বালাটা ভুলতে পারে। সুতরাং কথাটা তাকে বলতে হয়, তাই বললে বনওয়ারী। কাছে বসিয়ে চীৎকার ক'রে হাত নেড়ে বুঝিয়ে বললে সব। সুচাঁদ বললে—হ্যাঁ, তা ভাল যুক্তি বটেন। ওই নদীর উ পারে বুঝলি কিনা—

বনওয়ারী উঠে পড়ল। সুচাঁদপিসীর 'বুঝলি কিনা' বুঝতে গেলে এ বেলা কাবার হয়ে যাবে। এমনিতেই করালী-শয়তানের পাল্লায় প'ড়ে দেরি হয়ে গিয়েছে। ভেবে-চিন্তে হঠাৎ সে উঠে পড়ল। তারপর চীৎকার ক'রে সুচাঁদকে বললে—তুমি তা হ'লে পূজোর পয়সা চাল আদায় ক'রো পিসী, বুঝলে ?

—পূজোর ? কত্তার পুজোর ?

—হঁ্যা গো। নাহ'লে কল্যেণ নেই।

—অ্যা—অ্যাই। না হ'লে কল্যেণ নাই। সে কথা বুঝবে কে ? তা শোন্, আর একটি কথা বলি।

—কি ?

—জমি যদি লিবি, তবে পূজোতে আর একটি পাঁঠা জুড়ে দে। কত্তার আজ্ঞে নিয়ে করবি ; আখোঁড়া পিথিবীর অঙ্গে চোটাবি ;—কত কি না-জানা না-চেনা না-শোনা 'রোপোদ্দরব' আছে ; —বুঝলি কিনা—না, কি বলিস ?

কথাটা মনে নিলে সকলের। সকলে বনওয়ারীর দিকে চাইলে। সুচাঁদও চেয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। বনওয়ারীও ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ একটা কথার মত কথা। হ্যাঁ। ভাল বলেছ পিসী।

—কি বলছিস ?

চিৎকার ক'রে বনওয়ারী বললে—তাই হবেন গো

সুচাঁদ খুশি হয়ে বললে—আ-চ্ছা। এই দেখ্, সে তো বাপের আমলের কথা—

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে বাধা দিয়ে বললে—সাতটার টেন পুল পেরিয়ে গেল। উ বেলায় শুনব।

রেলের লাইনটা চ'লে গিয়েছে গাঁয়ের পুবদিক দিয়ে। চন্ননপুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাইনটা কোপাই নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চ'লে গিয়েছে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির নীলের-বাঁধ পুকুরের পাড় থেকে বেশ দেখা যায় ব্রিজটা। ওই ব্রিজে যে গাড়িগুলো পার হয়, তাই ধ'রে চলে কাহারপাড়ার জীবনের ঘড়ি। সকালে ছয়টায় একটা গাড়ি। তারপর সাতটায় গাড়ির সিগনাল পড়লেই পুরুষেরা কাজে বের হয়। আজ তাদের দেরি হয়ে গিয়েছে। তারপর যেই ওই

সিগনাল দেখে সাতটার গাড়ি আসে—অমনি মেয়েরা বের হয়, খাটতে যায়, ঘুঁটে বেচতে যায়, দুধ বেচতে যায়।

সুচাঁদ ট্রেনের দিকে চেয়ে রইল। পুলে গাড়ি চাপলে যে শব্দ ওঠে, সে শব্দও তাকে কান পেতে মনোযোগ সহকারে শুনতে হয়। গুরুগম্ভীর ঝমঝম শব্দের যে ক্ষীণ ধ্বনি তার কানে প্রতিধ্বনি তোলে, সেটুকু ভারি মিষ্টি ব'লে মনে হয় সুচাঁদের। সুচাঁদ বলে—আতে যখন গাড়ি পুল পেরোয়, ঘরে চোখ বুজে শুয়ে আমার মনে হয় কেত্তনের দলের খোল বাজছে।

পুরুষেরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

বনওয়ারী ব'লে দিল সকলকে—পরশু আসতে পারব না, আগাম আজ থেকে ব'লে 'এখো' যেন, হঁ্যা। নইলে আবার মনিবেরা বলবে—আগে বলিস নাই কেনে, আমার কাজ চলবে কি ক'রে ?

*　　　*　　　*

জাঙলের ঘোষ-বাড়ির ভাগজোতদার বনওয়ারী। বনওয়ারীর বাপের আমল থেকে দু-পুরুষ ধরে সম্বন্ধ। জাঙলের ঘোষ-বাড়ির যখন নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা, তখন থেকে বনওয়ারীদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ। বুড়ো ঘোষ-কর্তা যিনি এই সেদিন মারা গিয়েছেন, তখন তাঁর অল্প বয়স—ছোকরা মানুষ, তখন তিনি সদ্য পিতৃহীন হয়ে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াতেন আর ওই চন্নপুরে বড়বাবুদের নতুন শখের থিয়েটারে মেয়ে সেজে বক্তৃতা করতেন। বাড়িতে ছিল বিধবা মা আর অল্পবয়সী স্ত্রী ও বিধবা বোন। কিন্তু দিনগুজরানের কোন উপায় ছিল না। জমি না, জেরাত না, কোন চাকরি না। ছেলে ভাবে না, ভাববার সময় নাই; তাই দিন চালানোর জন্য অনেক ভেবে বিধবা মা বনওয়ারীর বাপের কাছে একটি ঢেঁকি পাতবার কাঠ চেয়ে নেয়। এই হ'ল সম্বন্ধের সূত্র। বনওয়ারীর বাপ সেবার কোপাইয়ের বানে একটা বেশ বড় কাঠ ধরেছিল, তারই একটা অংশ সে নিয়েছিল। বউয়ের কানের মাকড়ি বিক্রি ক'রে ছুতোর ডেকে সেই কাঠে ঢেঁকি পেতে ধানভানার কাজ নিয়েছিল ঘোষগিন্নী। এ কাজেও তাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করত বনওয়ারীর মা। এই অবস্থায় ছেলেকে বার বার রোজগারে মন দেওয়ার জন্য অনেক মিনতি ক'রে হতাশ হয়ে অবশেষে তিনি পাগলের মত এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। একদিন অনেক রাত্রে থিয়েটারের আড্ডা থেকে ছেলে গান গাইতে গাইতে ফিরে এসে যখন ভাত চাইলে, তখন মা একখানা ভাঙা থালায় এক মুঠো সত্যি সত্যি ছাই এনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—খাও। ছেলে মায়ের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেল পাঁচ বছরের মত। সেই অবস্থায় বনওয়ারীর বাপ মা ঘোষ-সংসারের দুঃখের সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়ল। আগে বনওয়ারীর মা, তারপর স্ত্রীর টানে বনওয়ারীর বাপ। বনওয়ারীর বাপ চন্নপুরের বাবুদের বাড়ি থেকে চাল করে দেবার জন্য ধান আনত এবং ঘোষেরা চাল তৈরি করলে চন্নপুরে চাল পৌঁছে দিয়ে আসত। নিতান্তই এক তরফা ব্যাপার। কারণ ধান থেকে চাল করার মজুরী চাল ঘোষেরাই পেত। এ ছাড়াও যে-কোন দরকারে ঘোষ-মা,

ঘোষ-দিদি নিজেরাই যেত বনওয়ারীর বাবার কাছে। কাঠ তালপাতা মাঠের মাছ ঝুড়ি-ভর্তি গোবর ঘোষ বাড়িতে দিয়ে আসত—আর কি দিতে পারে বনওয়ারীর মত লোকেরা? তাই দিত তারা, এবং তাই ছিল ঘোষেদের সংসারের পক্ষে প্রচুর সাহায্য। ঘোষ-মা দিতেন ব্যান্নন। মায়ের হাতের রান্না 'অমরেতো'। তারপর ঘোষ একদিন ফিরল রোজগার ক'রে। সেই ঘোষেদের ঘরে লক্ষ্মী এলেন। ঘোষ একটি জোত কিনলেন—জাঙলের ওই চৌধুরীদের কাছে। নদীর ধারের জমি, গোপথের ধার; বান এলে তো ডুবে যায়ই, তার উপর গোপথের গরুর পাল নিত্য মুখ দেয় ফসলে। দশ বিঘে জমি, তার দু বিঘে জমির ধান পেটেই যেত চিরকাল। তবে রক্ষা এইটুকু যে, খাজনাটা ঠাণ্ডা—দশ বিঘে জমির বছরসাল খাজনা সাড়ে বারো টাকা, বিঘা-পিছু পাঁচ সিকি নিরিখ। ঘোষের মা বললেন—তারিণী আমার বড় ছেলে। ওই করবে জমি। ওকেই ভাগে জমি দাও।

বনওয়ারীর বাপের নাম ছিল তারিণী।

সংসারে লক্ষ্মী হ'লেই নাকি সব হয়, শ্রীভ্রষ্ট কুৎসিত মানুষও শ্রীমন্ত হয়—একটা রূপ দেখা দেয় তার চেহারায়, কুমতি ঘুচে সুমতি হয়, বিষমাখা জিভের বিষ ঘুচে মধুর মত অমৃত উথলে উঠে। মায়ের কথায় ঘোষ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—তোমার কথার কি 'না' হতে পারে? তারিণী আমার দাদা। তারিণীদাদাই আমার জমি করবে, বুঝেছ তারিণী?

তারিণী হেসে বলেছিল—এই দেখেন মা, আমাকে কি 'ফ্যারে' ফেলেছেন দেখেন! আমার হাল-বলদ কোথা গো? আপনারা বরং হাল-বলদ করেন, আমি কৃষাণ থাকব।

—হাল-বলদ কর। আমি টাকা দিচ্ছি তোমাকে। ভয় কি, ক্রমে শোধ দেবে—ঘোষ বলেছিলেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিল তারিণী; সৎজাতিকে সেবা ক'রে অমন পুরস্কার পেয়ে সে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে এসে কেঁদেছিল সেদিন। সেই অবধি বনওয়ারীদের ঘরে হাল-বলদ। সেই অবধি বনওয়ারীরা ঘোষেদের জমি চাষ করছে। বাপ তারিণী মারা গিয়েছে, ঘোষকর্তাও নাই, ঘোষকর্তার ছেলেদের এখন জমজমাট সংসার। মেজ ছেলে ব্যবসা ক'রে দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়ায়, দু হাতে টাকা রোজগার ক'রে 'বেঙ্কে' জমিয়ে রাখে। ঘোষেদের বাড়িতে বনওয়ারী যে বনওয়ারী তারও এখন কেমন ভয়-ভয় করে। এখন আগের মত সরাসরি বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকতে পারে না, বড় ঘোষকে এখন আর তেমন উপদেশ দিতে পারে না। সারের টাকার জন্য সে-ভাবে জোর ক'রে দশটা কথা বলতে পারে না। হিসেবের জন্য তাড়া, তাই বা কেমন ক'রে দেয়? বনওয়ারী সেখানে গিয়ে দেখলে, বড় আর মেজ দুজনে চা খাচ্ছে আর খুব মন দিয়ে শলা-পরামর্শ করছে। সে প্রণাম ক'রে বসল উবু হয়ে দাওয়ার উপর। কিছুক্ষণ পর একটা থামে ঠেস দিয়ে ভাল ক'রে বসল। তারপর ঢুলতে লাগল। সারারাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই—সকালের মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম আসছিল। দক্ষিণ দিক থেকে ভারি আমেজী হাওয়া দিচ্ছে। সকালে সূর্য উঠে এরই মধ্যে ভোরের শীত-শীত ভাবটা কেটে গিয়েছে। পাতলা ঘুমের মধ্যেই নানা এলোমেলো স্বপ্ন দেখছে সে। কালোশশী, করালী, পরম—আরও কত লোক সায়েবডাঙায়

জমেছে সব। সায়েবডাঙার কুঠিবাড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে এক মহিষের বাচ্চার মত বড় এবং কালো বুনো দাঁতাল শুয়োর, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে তীরের মত ছুটে আসছে। দিলে ফেঁড়ে করালীকে। পরম পালাচ্ছে। বনওয়ারীকে জড়িয়ে ধরেছে কালোশশী। বনওয়ারী কি কালোশশীকে ঝাপটা দিয়ে ফেলে পালাতে পারে। খটখট শব্দ ক'রে পিছনে কে এল? বনওয়ারী বুঝতে পারলে, তিনি কে। কর্তা আসছেন। আর ভয় নাই। ভয়ের মধ্যে আশ্বাস পেয়ে বুনো শুয়োরটাকে ধমক দিয়ে সে বিক্রমভরে হাঁক মেরে উঠল, আ—প্।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের আমেজ ছুটে গেল। সে প্রথমটা ফ্যালফ্যাল ক'রে চারিদিকে দেখে তাল সামলে নিয়ে বসল। ঘোষ-ভাইয়েরা হাসছেন।

—কি রে বনওয়ারী, চেঁচিয়ে উঠলি কেন?

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বনওয়ারী বললে—আজ্ঞে, উ একটো হয়ে গেল আর কি।

—একটো হয়ে গেল আর কি! কি হয়ে গেল?

চুপ ক'রে রইল বনওয়ারী। লজ্জা লাগে বইকি—স্বপ্ন দেখে অমনি চীৎকার করেছি এ কথা বলতে।

—কি রে? স্বপ্ন দেখেছিলি বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন মেজ জনা। প্রশ্ন করলেন—কি স্বপ্ন রে?

—আজ্ঞে, স্বপ্ন দেখেছিলাম, দাঁতাল শুয়োরে তাড়া করেছে।

আবার দুজনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বনওয়ারীও হাসতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা চুলকাতে লাগল। বললে—দাঁতাল বেটারা ভারী পাজী গো! আপনারা জানেন না। তারপর তাঁদের হাসি থামলে সুযোগ পেয়ে বললে—আমার হিসেবটা আজ্ঞে, একবার দেখে মিটিয়ে ছান। আবার লতুন চাষকর্ম এসে গেল।

—হিসেব। তা হবে। কাল আসিস। না হয় পরশু।

—কাল পরশু আসতে লারব আজ্ঞে।

—কেন? কাল পরশু কি করবি?

—আজ্ঞে, পাড়াতে চাঁদা তুলে কত্তার পূজো দোব।

—কর্তার পূজো! অসময়ে? কি ব্যাপার?

বনওয়ারী সবিস্তারে বলতে চেষ্টা করে ব্যাপারটা। ইচ্ছে—কিছু চাঁদাও আদায় করবে মেজ ঘোষের কাছ থেকে। কিন্তু মেজ ঘোষই খানিকটা শুনেই বললেন—তোদের সেই—'অন্ধ জাগো! না, কিবা রাত্রি কিবা দিন!' সেই এক কালই চলেছে রে তোদের। হুঁ, কর্তাবাবা শিস দিচ্ছে! যত সব—হুঁ!

দ'মে গেল বনওয়ারী। কিন্তু সামলে নিয়ে সে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হ'ল না, দুই কানের পাশে হাত দিয়ে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠে বসল। হঠাৎ দূরে একটা কোলাহল উঠছে ব'লে মনে হ'ল।—আগুন! আগুন!

আগুন! ছুটে বেরিয়ে এল বনওয়ারী। কোথায় আগুন? কোলাহলের দিক লক্ষ্য ক'রে সে ছুটে এল গ্রামের বাইরে। হঁ্যা, হঁ্যা, বাঁশবাঁদির ওই দক্ষিণ মাথা থেকেই তো প্রচুর ধোঁয়া উঠছে আকাশে। বাঁশবেড়ের বাঁশের মাথাগুলি ঢেকে গিয়েছে কুণ্ডলী পাকানো রাশি রাশি ধোঁয়ার মেঘে; আষাঢ়ের মেঘের মত জমাট ধোঁয়ার মেঘ।

বনওয়ারীর বুকটা তোলপাড় করে উঠল;—'কত্তার কোধ'!

* * *

নাঃ—কাহারদের ভাগ্য ভাল। কোধের মধ্যেও কত্তা কিঞ্চিৎ দয়া করেছেন।

গ্রামে আগুন নয়। আগুন লেগেছে বাঁশবেড়ের বাঁশবনের তলায়। মাঘে পাতা ঝরেছে বাঁশের। নিবিড় বাঁশবনের অজস্র পাতা স্তূপীকৃত হয়ে জ'মে আছে তলায়। সেই ঝরা শুকনো পাতায় আগুন লেগেছে। কি ক'রে লাগল কে জানে? বেলা প্রখর হয়ে উঠেছে, পাতাগুলির উপরে রাত্রের শিশির শুকিয়ে গিয়েছে; আগুন খোরাক পেয়েছে ভাল। সবুজ দেওয়ালের মত যে বাঁশবন, সে বাঁশবন ধোঁয়ায় প্রায় ঢেকে গিয়েছে।

বাঁশবাঁদির ধারে লোকজন স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে কারও সাহস নাই। নিমতেলে পানু, প্রহ্লাদ জাঙ্গল থেকে বনওয়ারীর আগেই ফিরে এসেছে। তারা ঢুকেছিল, কিন্তু পালিয়ে এসেছে ভয়ে এবং যন্ত্রণায়। ভয়—সেই শিস উঠছে। যন্ত্রণা—ধোঁয়ার।

কর্তার রোষ শেষে আগুন হয়ে জ'লে উঠেছে গাঁয়ের ধারে, সাবধান করে দিচ্ছেন। বনওয়ারী থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—কত্তার কোপ! কত্তার কোধ!

প্রহ্লাদ বলে—না, করালী আগুন লাগিয়েছে, বাঁশের পাতায় 'কেরাচিনি' ত্যাল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে। সে রয়েছে ওই ধোঁয়ার মধ্যে।

মুহূর্তে ক্ষেপে গেল বনওয়ারী, নেমে গেল ধোঁয়ায়-ভরা বাঁশবনের মধ্যে।

হঁ্যা, শিসও উঠছে। কর্তাও ক্ষেপেছেন। এগিয়ে গেল বনওয়ারী শব্দ লক্ষ্য ক'রে।

যেখানে শব্দটি উঠছে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে করালী। বুক চিতিয়ে নির্ভয়ে এক দৃষ্টে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুছছে আর উপরের দিকে চেয়ে দেখছে। নীচে আগুন নাচছে শুকনো পাতার স্তূপে। উত্তাপে বাঁশবেড় যেন অগ্নিগড় হয়ে উঠেছে, আঁচ লাগছে গায়ে, করালীর সেও গ্রাহ্য নাই।

বনওয়ারী এগিয়ে গেল ভয়ঙ্কর মূর্তিতে।—হে কত্তা, মাপ কর তুমি। আমি হতভাগাকে ফেলে দিচ্ছি ওই আগুনে। তুমি নিজের মহিমায় আগুন নিবিয়ে দাও। বাঁচাও তুমি বাঁশবাঁদিকে, বাঁচাও হাঁসুলীর বাঁককে—বাঁচাও। সে সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠে ডাকলে—করালী!

করালী তার দিকে চকিতের মত চেয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বনওয়ারীকেই ইশারা ক'রে ডাকলে—এস, এস। এতটুকু নড়ল না সে। বনওয়ারীর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সে অগ্রসর হ'ল, মনে মনে বলল—যাই যাই, দাঁড়া।

দূরে পিছন থেকে ভেসে আসছে আর একট আওয়াজ—মামা! মামা! মামা! পাখীর

গলা। আর্ত-উৎকণ্ঠা যেন ফেটে পড়ছে কণ্ঠস্বরে। কিন্তু বনওয়ারী আজ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কাহারপাড়ার বিচারকর্তা সে। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের মত সর্বময় কর্তা—দণ্ডদাতা।

বনওয়ারী দুর্দান্ত ক্রোধে করালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোশকেঁধের বাড়ির ছেলে, বিধাতার মোটা হাতে পাথর কেটে গড়া বনওয়ারী।

করালী কিন্তু নড়ল না, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বনওয়ারীর হাত থেকেও মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে নিলে একটা হাত। সেই হাতে সে দুর্দান্ত বিক্রমে আক্রমণ করলে বনওয়ারীকে। আশ্চর্য, বনওয়ারী অনুভব করছে—করালীর শক্তি যেন তার চেয়ে বেশি। না, বনওয়ারীর পায়ের তলায় বাঁশের পাতাগুলি পিছলে স'রে যাচ্ছে। সেই অসুবিধার জন্যই করালী তাকে বাগে পেয়েছে। হঠাৎ করালী চীৎকার ক'রে উঠল—ছাড়—ছাড়—পড়ছে। ছাড়।

উৎসাহের প্রাবল্যে তার শক্তি যেন শতগুণ বেড়ে গেল। সে অনায়াসে বনওয়ারীকে নীচে ফেলে দিয়ে তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নাচতে লাগল সে। ওই—ওই—ওই শালা পড়ছে। বনওয়ারী উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে করালী এসে তার হাতে ধ'রে টেনে ঝাঁকি দিয়ে বললে—ওই—ওই দেখ, তোমার কর্তা পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে! হুই—হুইয়ো!

বাঁশের ঝাড়ের মাথা থেকে আগুনের উত্তাপে ধোঁয়ায় ক্লিষ্ট অবসন্ন হয়ে এলিয়ে নীচে পড়ছে একটা প্রচণ্ড সাপ। পাহাড়ে চিতির মত মোটা, তেমনই বিচিত্র তার বর্ণ, কিন্তু লম্বা খুব বেশি নয়। পাহাড়ে চিতির সঙ্গে ওইখানেই সেটার পার্থক্য।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে বনওয়ারী বললে—পে-কা-ও চন্দ্রবোড়া! হ্যাঁ, ওদের গর্জন খুব বটে।

—এটা কত বড় দেখছ না? তাতেই শিসের শব্দ হয়। শালা!

আগুনের মধ্যে প'ড়ে সাপটা ছটফট করছে! মরছে। করালী তারই উপর দমাদম ঢেলা ছুঁড়ে মারছে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

—মামা! মামা! এদিক থেকে পাখী ডাকছে। ধোঁয়ার মধ্যে বুঝতে পারছে না সে, এরা কোন দিকে রয়েছে। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সে ডাকছে। ডাকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী ওদের খুঁজে ফিরছে।

চীৎকার ক'রে সাড়া দিলে করালী—এই দিকে—এই দিকে। আয়। আয়। ডাক্ সব পাড়ার নোককে। দেখে যা তোদের কত্তা পুড়ছে। দেখে যা। ডাক্ সব লোককে। ডাক্—ডাক্।

ওদিকে সাপটার পেটটার একটা মোটা অংশ ফেটে গেল আগুনের আঁচে। বেরিয়ে পড়ল একটা কি। এগিয়ে গেল করালী, বনওয়ারীও গেল। ঝুঁকে দেখতে লাগল, ওটা কি? ওঃ, একটা বুনো শুয়োরের বাচ্চা। ওটাই কাল রাত্রে সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার করেছিল।

পাখী ছুটে এসে করালীর হাত ধরলে। সে হাঁপাচ্ছে।

করালী বললে—ওই দেখ্। সাপটা দেখে পাখী অবাক হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ভেঙে এল গোটা কাহারপাড়ার লোক। বিস্ময়ে কৌতূহলে অবাক হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর কলকল

ক'রে বাঁশবাঁদি মুখরিত ক'রে তুললে।

করালী হাসতে হাসতে ব'লে উঠল—মুরুব্বি, কত্তার পূজোটা সব আমাকে দিয়ো গো। সে হা-হা করে হাসতে লাগল।

পাখী ধমক দিয়ে বললে—চুপ কর।

করালী তবুও হাসতে লাগল। সে যেন এক অপার কৌতুক।

পাখী করালীর পিঠে একটা কিল মেরে বললে—ডাকাবুকো, ডারপাড়, লঘুগুরু জ্ঞান নাই তোমার?

তিন

গোটা কাহারপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা স্তম্ভিত এবং স্তব্ধ হয়ে গেল করালীর কথা শুনে আর সকৌতুক উচ্চহাসি দেখে। করালী বলে কি? 'কত্তার পূজোটা আমাকে দিয়ো গো!' এত বড় স্পর্ধা তার! হে ভগবান, হে বাবা কালারুদ্র, হে বাবাঠাকুর!

বনওয়ারী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল করালীকে। আজই যেন সে করালীকে নতুন ক'রে দেখলে। নোড়ার কাজের জন্যে কুড়িয়ে-আনা নুড়িটাকে আলোর ছটায় জ্বলতে দেখে মানুষ যেমনভাবে সবিস্ময়ে সাগ্রহে সসম্ভ্রমে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তেমনই ভাবে দেখলে তাকে বনওয়ারী। ছোঁড়ার চেহারাটা ছেলেবেলা থেকেই মিষ্টি চেহারা। আজও তাকে দেখে সেই মিষ্টি চেহারার আস্বাদই মনে জাগে, আজ বনওয়ারী তাকে দেখে নতুন আস্বাদ পাচ্ছে। গোটা কাহারপাড়াই পাচ্ছে যেন।

লম্বা দীঘল চেহারা, সাধারণ হাতের চার হাত খাড়াই তাতে কোন সন্দেহ নাই, সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশীবহুল হাত, সোজা পা দুখানি, লম্বা আমের মত মুখ, বড় বড় চোখ, নাকটি খাঁদা; কিন্তু তাতেই চেহারাখানিকে করেছে সবচেয়ে মিষ্টি, তারও চেয়ে মিষ্টি তার ঠোঁট আর দাঁত। হাসলে বড় সুন্দর দেখায় করালীকে।

তরুণের দলের অবশ্য এ চেহারা চোখে ঠেকেছে। পাড়ার ছোকরারা মনে মনে অধিকাংশই করালীর অনুগত। কিন্তু এ চেহারা সকলের চেয়ে ভাল ক'রে দেখেছে পাখী। করালীর দেহের রূপ বীর্য সে দেখে মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। তার কাছে জীবনে সব এক দিক আর করালী এক দিক।

বনওয়ারীও দেখছিল করালীর দেহের শক্তির শোভা। হ্যাঁ, ছোকরা জোয়ান হয়েছে বটে। করালী যখন ঘরে কুকুরটার জন্যে সমাধি খুঁড়ছিল, তখন চকিতের মত যেন চোখে পড়েছিল এ চেহারা। কিন্তু বনওয়ারী তখন দেখেও দেখে নাই। আজ এই মুহূর্তে তাকে না দেখে বনওয়ারীর উপায় নাই। মনে পড়ছে বনওয়ারীর— বাঁশবনে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল করালীর উপর, নিষ্ঠুর ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ইচ্ছে ছিল—বুকে চেপে ব'সে গলাটা টিপে ধরবে, ম'রে যদি যায় দেবে ফেলে

ওই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু—। বনওয়ারীর ভাল মনে পড়ছে না, কি ক'রে হয়েছিল। বাঁশ-পাতায় পা পিছলে গিয়েছিল ?

ধোঁয়ায় মাথা ঘুরে গিয়েছিল ? হয়েছিল একটা কিছু। করালীই চেপে বসেছিল তার উপর ? সে ভাবছিল, করালী হয়তো উচ্চহাসি হেসে এই সমবেত কাহারদের কাছে বলবে, বাবাঠাকুরের চেলা বনওয়ারী মুরুব্বিকেও দেখে নিয়েছি—

পাখী এগিয়ে এল বনওয়ারীর কাছে। ডাকলে—মামা!

বনওয়ারী তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ হেসে বললে—করালীর বুদ্ধি আছে। ও ঠিক ধরেছে।

করালী উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠল—রেল লাইনের আটাশ মাইলে ঠিক এমনি হয়েছিল। বুঝেছ—আটাশ মাইলে—খুব জঙ্গল, সেখানে গেলবারে ঠিক এমনি শিস উঠত। সন্ধ্যাবেলা টলি ঠেলে আসছি, টলিতে আছে সায়েব। হাতে বন্দুক। বুঝেছ, শিস শুনেই বললে—রোখো টলি, তা'পরেতে টর্চ মারতে লাগল, মারতে মারতে এক জায়গায় টর্চ পড়তেই দেখতে পেল সাপ। বাস্, বন্দুক তুলে গুড়ুম।

প্রহ্লাদ বললে, লে, এখন সাপটাকে ভাল ক'রে পুড়িয়ে দে। খরিস গোখরা লয়, চিতি বটে—তা বড় চিতি। বেরাস্তন না হোক, বদ্যি কায়স্থ-টায়স্থ তো বটেনই। সৎকার করতে হবে তো!

নিমতেলে পানু বয়সে করালীদের বয়সী হ'লেও জ্ঞানবৃদ্ধ প্রহ্লাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। সে সর্বাগ্রে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল—একশো বার। শুধু কি সৎজাত পেহ্লাদদাদা ? পবীন, পবীন সাপ। তা বয়স তোমার অনেক হবেন গো।

করালী বললে—না। ও আমি নিয়ে যাব। দেখুক, পাঁচজনায় দেখুক। সন্জে হতেই সব কিসের ভয়ে জুজুমানা হয়ে ঘরে খিল দিত। দেখুক।—ব'লে আবার সে হেসে উঠল।

নিমতেলে পানু বনওয়ারীর দিকে চেয়ে বললে—মুরুব্বি!

বনওয়ারী বললে—তা—। সে বুঝতে পারলে না, কি বলা উচিত।

—কি ? বল ? 'তা' ব'লে যে থেমে গেলা!—পানু বিরক্তিভরেই বললে, 'শান্ত' যা বটে, তা করতে হবে ? না—কি ?

—তা করবে। মড়া ম'লে সঙ্গে সঙ্গেই তো পোড়ায় না। পাঁচজনা আসে, দেখে। কাসমড়া না হ'লে হ'ল। তা এখন নিয়ে যেয়ে রাখুক—তা পরে 'আত্তি' কালে নদীর ধারে দেবে পুড়িয়ে।

খুব খুশি হয়ে উঠল করালী। বললে—এই না হ'লে মুরুব্বি বলবে কেনে ?

বনওয়ারী বললে—তু তো মানিস না রে মুরুব্বি ব'লে!

করালী এবার লজ্জিত হ'ল। সুন্দর হাসি হেসে সে বললে—মানি গো খুব মানি, মনে মনে মানি। বুঝলে ?

নিমতেলে পানু বললে—তা আবার মানিস না। কাহারপাড়ার পিতিপুরুষের রোপদেশে নাতি মেরে মুরুব্বির মুখের ওপর বুড়ো আঙুল লেড়ে দিয়ে চন্দনপুরে মেলেচ্ছো কারখানায় কাজ

করছিস। মেলা রোজগার করছিস—

করালী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—হারামজাদা!

বনওয়ারী দুই হাত বাড়িয়ে আগলে বললে—না।

করালী থমকে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বনওয়ারীর মুখের উপর রেখে চেয়ে রইল।

বনওয়ারী বললে—মারামারি করতে নাই। পেনোর অন্যায় বটে। ওকে আমি শাসন ক'রে দোব।

করালী তার অনুগতদের বললে—একটা বাঁশ আন্‌। চাপিয়ে তুলে নিয়ে যাব।

প্রহ্লাদ বললে—বেশ পেশস্ত জায়গায় 'আখ'। অ্যানেক লোক দেখতে আসবে।

এ সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা আছে। দাঁতাল শুয়োর মারা এখানে তো সাধারণ ব্যাপার; এ বিষয়ে শিক্ষাও তাদের পুরুষানুক্রমিক; কখনও কখনও দু-একজন জখমও হয় দাঁতালের দাঁতে। বছরে দু-তিনটে দাঁতালে মারেই, আর এখানকার লোকের স্বভাব হ'ল—খবর পেলেই ছুটে দেখতে আসবে। দাঁতালটাকেও দেখে, আবার জখম মানুষটাকেও দেখে। বাঘ কি কুমীর হ'লে তো কথাই নাই। প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে একটা চিতা এসেছিল, ওই কোপায়ের বানে ভেসে এসে বাঁশবেড়েয় আটকে যায়। সেটা ছিল জ্যান্ত। সে বলতে গেলে বনওয়ারীর বাপের আমল। কর্তা ছিল তারাই। বনওয়ারী প্রহ্লাদ—এদের তখন করালীর বয়স, এরা ছিল কর্মী। কর্তাদের পরামর্শে বাঘটাকে তারাই বাঁশের খাঁচা তৈরী ক'রে ধরেছিল। শক্ত পাকা বাঁশ আধখানা ক'রে চিরে শিকের মত গেঁথে খাঁচা তৈরি করেছিল তারা; লোহার শিক দিয়ে তৈরি খাঁচার চেয়ে সে বেশি শক্ত। সেই খাঁচার মধ্যে পাঁঠার বাচ্চা বেঁধে বাঁশবাঁদির বনে খাঁচা পাতা হ'ল। এক দিন, দু দিন, তিন দিনের দিনই বাঘা বন্দী হ'ল। তখন খুঁচিয়ে মারার ব্যবস্থা। মারার পর ভেঙে এল চাকলার লোক। ঘোষকর্তা আগেই এসে মরা বাঘের উপর মারলে এক গুলি। রগে নল রেখে গুলি। তারপর লোকের ভিড় দেখে জাঙল থেকে আনালেন একটা উঁচু তক্তাপোশ, সেইটার উপরে রেখে দিলেন। সে কি ভিড়! কেউ বাঘটাকে ঢেলা মারলে, কেউ লাঠি দিয়ে খোঁচালে, কেউ লেজ ধ'রে টানলে, দু-চারজন ছোকরা তো বাই ঠুকে লাফিয়ে উপরে পড়ে মারলে দমাদম ঘুষি। কেউ বা সেটাকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়েই পড়ল মনের আনন্দে। সেই সব ভেবেই চিরদিনের চলিত প্রথা অনুযায়ী কথাটা বললে প্রহ্লাদ-রতনের দল। জায়গার জন্য ভাবনারও কোন প্রয়োজন নাই। চিরকাল যেখানে নামানো হয়, সেই বনওয়ারীর খামার প'ড়ে রয়েছে—মস্ত ফাঁকা জায়গা।

কিন্তু করালীর মতিগতিই ভিন্ন। হাত ছয়েক লম্বা একটা বাঁশের উপর সেটাকে ঝুলিয়ে আর একজনের সাহায্যে কাঁধে তুলে ব'য়ে বনওয়ারীর খামার পার হয়ে চলতে শুরু করলে নিজের বাড়ির দিকে। প্রহ্লাদ রতন পানু বললে—নামা এইখানে।

করালী বললে—উঁহু। আমার বাড়িতে নিয়ে যাব আমি।

প্রহ্লাদ রতন পানু স্তম্ভিত হয়ে গেল করালীর স্পর্ধা দেখে। তারা বনওয়ারীর মুখের দিকে চাইল।

বনওয়ারী এতক্ষণে হাসলে। তাচ্ছিল্যভরেই বললে—যাক, যাক, ছেলেমানুষ। তা ছাড়া কাণ্ডটি তো ওরই বটে বাপু। তারপর করালীর পিঠে কয়েকটা আদরের চাপড় মেরে বললে—হঁ্যা। বীর বেটাছেলে বটিস তুই।

করালী হাসলে। স্মিতমুখে আনন্দের হাসি হাসলে। সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন লজ্জিত হ'ল। মনে হ'ল, বনওয়ারী খুড়োকে খানিকটা সম্মান দেখানোর প্রয়োজন আছে। সে বললে—তুমিও এস কিন্তুক।

—আচ্ছা। যাব, চল্।

বাড়ির উঠানে ফেলে করালী বীরদর্পে সকলের দিকে চাইল। মাতব্বর-মুরুব্বিরা কেউ আসে নাই। অপমান বোধ না করলেও তারা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। করালী এই সুযোগে কৌতুক করে অকস্মাৎ ভান ক'রে চমকে উঠে ব'লে উঠল—ওরে বাবা, লড়ছে যে!

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের দল আতঙ্কে চীৎকার ক'রে ঠেলাঠেলি ক'রে পিছু হঠতে লাগল। পুরুষেরা ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলে। করালী অট্টহাসি হেসে উঠল। বললে—যত সব ভয়তরাশের দল—ভয়েই মরবে, ভয়েই মরবে।

তারপর বললে—পালাও সব, পালাও বলছি। নইলে ভাল হবে না। পালাও। পাখী, বার কর্।

অর্থাৎ মদের বোতল। বিজয়ী বীর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদ্যপান করবে। কাহারপাড়ায় তরুণদের নিয়ে তার একটি দল আছে, সে দল বাইরে বনওয়ারীর মাতব্বরি মেনে চললেও অন্তরে অন্তরে করালীই তাদের দলপতি। এদের মধ্যে রতনের ছেলে নটবরই প্রধান।

নটবর একবার বীরদর্পে সাপটার চারদিক ঘুরে বললে—কই, একটি ক'রে পয়সা আন্ দেখি নি। হুঁ-হুঁ বাবা, তার বেলাতে লবডঙ্কা!

একটি মেয়ে বললে—মরণ! সাপ মেরে গিদেরে যেন কি করছে! অর্থাৎ অহঙ্কারে।

করালী বললে—ধর্ ওকে নটবরে, আমরা গান করব, ওকে নাচতে হবে। ধর্।

মেয়ের দল এইবার পালাল। চ্যাঙড়ার দলকে বিশ্বাস নাই, তার উপর মদের বোতল বেরিয়েছে। কয়েক ঢোক পেটে পড়লে হয়!

নটবর বললে—আঃ, নসুদিদি নাই রে আজ!

করালী ইতিমধ্যে খানিকটা খেয়েছে। সে বললে—ওঃ, সে থাকলে মাতন লাগিয়ে দিত। হারামজাদীর কুটুম্বিতে লেগেই আছে।

নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গিতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত। মাথায় মেয়েদের মত চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছবি পরে, কানে মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাঁচের চুড়ি লাল রুলি, মেয়েদের মত শাড়ি পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবড় কুড়ায়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্নপুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট—গান গায়

নাচে। গান আর নাচ—এই তার সবচেয়ে বড় নেশা। ঘেঁটুর দলে নাচে, ভাঁজোর নাচনে সে-ই মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা নাচিয়ে। মেয়েদের সঙ্গেই সে ব্রতপার্বণ করে। করালীর ঘরে সেই গৃহিণী। করালী বিয়ে করে বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, বউ তার পছন্দ হয় নি, আবার বিয়ে করবে। নসুরও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নসুও বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, সে আর বিয়ে করবে না। করালীর ঘরে বোন হয়ে, করালীর বউয়ের ননদ হয়ে থাকবে—এই তার বাসনা। পাড়ার বিয়েতে নসুবালাই বাসরে নাচে, গান গায়। শুধু পাড়ায় নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে যে কোন ঘরে ধুমধামের বিয়ে হলেই নসুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর দেয়। নসু খোঁপা বেঁধে, আলতা প'রে, রঙিন শাড়ি প'রে, কপালে সিঁদুর ঠেকিয়ে অর্থাৎ টিপ প'রে রওনা হয়, আবার উৎসব মিটলে ফেরে। করালীর জন্যে কিছু-না-কিছু নিয়ে আসে।

এই নসুবালার অভাবই করালী সবচেয়ে বেশি অনুভব করলে আজ।

নসুদিদি নাই তো পাখী নাচুক কেনে?—কথাটা বললে করালীর অপর অনুগত শিষ্য মাথলা। মাথলার আসল নাম রাখাল বা আখাল, কিন্তু দেহের অনুপাতে মাথাটা মোটা ব'লে কাহারেরা তাদের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্ভবত ওয়ালা প্রত্যয় ক'রে করেছে—মাথলা।

কথাটা মন্দ বলে নাই মাথলা। কিন্তু তবু ভ্রূ কুঁচকে উঠল করালীর। পাখী তাকে ভালবাসে, একদিন হয়তো তাকেই সে সাঙা করবে। সে নাচবে এই এদের সামনে?

পাখীর চোখেও রঙ ধরেছে, সেও খানিকটা পাকি মদ খেয়েছে, করালীর গৌরবে তারও নাচতে মন যাচ্ছে; তবু সে করালীর মুখের দিকে চাইলে। চেয়েই সে বুঝতে পারলে করালীর মন, সে তৎক্ষণাৎ বললে—না। তোর বউকে ডাক্ কেনে?

ঠিক এই সময়েই কাছাকাছি কোথাও সুচাঁদের কর্কশ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, মুহূর্তে সমস্ত পাড়াটা চকিত হয়ে উঠল।

—ওরে বাবা রে! ওরে মা রে! আমি কোথায় যাব রে!

করালী হা-হা ক'রে হেসে উঠল, বললে—'বিত্যেন' দেখ বুড়ীর! অর্থাৎ ভয়ে চেঁচানি দেখ বুড়ীর। তারপর সকৌতুকে ব'লে উঠল—নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, ওই বুড়ীকে নিয়ে আয়—ও-ই নাচবে। তুর্কী নাচন নাচাব বুড়ীকে। ব্যাঙ দেখে নাচে, সাপ দেখে নাচবে না?

ডাকতে হ'ল না, এক-গা কাদা মেখে খাটো-কাপড়-পরা সুচাঁদ এসে দাঁড়াল করালীর উঠানে। তার পিছনে আরও কয়েকজন প্রৌঢ়া মেয়ে। স্থির দৃষ্টিতে সে মরা সাপটাকে কিছুক্ষণ দেখে হঠাৎ বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল। শঙ্কাতুর অমঙ্গল ঘোষণার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বরে।

—ওগো বাবাঠাকুর গো! ওরে, আমার বাবার বাহন রে! ওরে, কি হবে রে! হায় মা রে!—বলতে বলতে সে থরথর করে কেঁপে মাটির ওপরে বসে পড়ল।

সমস্ত কাহারপাড়ার আকাশে একটা আশঙ্কার আর্তবাণী হায়-হায় ক'রে ছড়িয়ে পড়ল। করালী পাখী নটবর মাথলা সকলেই বেরিয়ে এল—কি হ'ল?

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-ঘেরা আলো-আঁধারির মধ্যে গ্রামখানি। সে গ্রামের উপকথায়—এ

দেশের কতকাল আগের ব্রতকথায় আছে, "গাঁয়ে ছিল এক নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত করত, ধর্মকর্ম করত, গাঁয়ের দুঃখে দুঃখ ক'রেই তার ছিল সুখ। কারও দুঃখে কাঁদতে না পেলে বুড়ী পশু-পক্ষীর দুঃখ খুঁজে বেড়াত। এমন দিনের সকালে ব'সে ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বলত—"কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আত্মি মিটছে, মহাবনে হাতী মেরেছে, যাই; তার গলা ধ'রে কেঁদে আসি।"

হাঁসুলী বাঁকে সুচাঁদ বুড়ী বোধ হয় সেকালের সেই বুড়ী। সাপটা যখন মরে তখন বুড়ী বাড়ি ছিল না। থাকলে যে কি করত, সে কথা বলা যায় না। সে গিয়েছিল ঘাস কাটতে। বাঁশবাঁদির কাহার-বুড়ীরা, প্রবীণরা, যারা মজুরনী খাটতে পারে না, তারাও বসে খায় না—পিতি-পুরুষের নিয়ম এই, যেমন গতর তেমনই খাটতে হবে। তারা দুপুরবেলা গোরু-বাছুর-ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে, কাস্তে নিয়ে চ'লে যায় হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে—কোপাইয়ের অপর পারে গোপের পাড়ায় 'মোষদহরী'র বিলে ঘাস কাটতে। মস্ত বিলটার চারিপাশে প্রচুর ঘাস জন্মায়। তার সঙ্গে পানিফল তুলে আনে, কল্মি শুসনি শাক সংগ্রহ করে, আর দু-চারটে পাঁকাল মাছ—তাও ধরে আনে। তাই বুড়ী গিয়েছিল ওই মোষদহরীর বিলে। ফিরে এসে সমস্ত কথা শুনে ছুটে এসেছে সাপটাকে দেখতে। দেখে চীৎকার করে পাড়াটাকে শঙ্কায় সচকিত করে দিলে।

সাপটার সামনে বুড়ী চোখ বিস্ফারিত ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বাবাঠাকুরের থানের দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে বললে—হে বাবা, হে বাবা, হে বাবা!

অ্যাই বুড়ী!—চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ ক'রে উঠল করালী। পাখী বললে—মরণ! ঢঙ দেখ! দোপরবেলায় কাঁদতে বসল দেখ! সাপ আবার বাবা হয়!

হয় লো, হয়।—বুড়ী কেঁদে উঠল। সুর ক'রে কেঁদে কেঁদে বুড়ী ব'লে গেল—ও যে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে! ওর মাথায় চ'ড়ে বাবাঠাকুর যে 'ভোমন' করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে! দহের মাথায় বাবাঠাকুরের শিমুলগাছের কোটরে সুখে নিচ্চে যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পরশু দেখেছি রে!

এর পর আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না। বাবাঠাকুরের শিমুলগাছ, দহের মাথায় প্রাচীনতম বনস্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক শিস-দেওয়া বিচিত্রবর্ণ বিষধর যখন থাকত, তখন বাবাঠাকুরের আশ্রিত, তাঁর বাহন—এতে আর সন্দেহ কোথায়! সমবেত কাহারপাড়ার নর-নারী শিউরে উঠল, মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল—হেই মা রে!

করালী শঙ্কিত হয়ে উঠল, আবার ক্রুদ্ধও হয়ে উঠল। সে অনুমান করতে পারছে, এর পর কি হবে। পাড়া জুড়ে হায় হায় রব উঠবে। তার সকল বীরত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু সে ভেবে পেল না, কি করবে! তার সঙ্গীদের মুখ শুকিয়ে গেছে। তারাও যেন ভয় পেয়েছে। তার ইচ্ছে হ'ল, সে ছুটে চলে যায় চন্নপুরে। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে আসে তাদের ছোট সাহেবকে, যে সেদিন এমনই একটা সাপ মেরেছে রেল-লাইনের ধারে,

যে সায়েব নিজে হাতে কোপ মেরেছে নদীর ঘাটে পেত্নীর আশ্রয়স্থল পুরানো শ্যাওড়াগাছটায় ; সে এসে মরা সাপটাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারুক, গোটা কাহারপাড়াকে সায়েস্তা করে দিক।

হঠাৎ পাখী চীৎকার ক'রে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে মাতামহীর সামনে এসে বললে—এই দেখ্ বুড়ী, এই ভর তিন পর বেলাতে তু কাঁদতে লাগিস না বললাম।

কালা সুচাঁদ শুনতে পেলে না কথা। সে আপন মনেই আক্ষেপ ক'রে চলল—সব্বনাশ হবে রে, সব্বনাশ হবে। ই গাঁয়ের পিতুল নাই। আঃ—আঃ—হায়—হায় রে।

পাখী এবার আর বৃথা চীৎকার করলে না। এসে বুড়ীর হাত ধ'রে টেনে তাদের ঘরের সীমানা থেকে বার ক'রে এনে চীৎকার ক'রে বললে—এইখানে ব'সে কাঁদ্।

হাত ধ'রে টানাতেও বুড়ী প্রথমটা বুঝতে পারে নাই পাখীর মনের ভাব। এবার কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না। সে মুহূর্তে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল, এবং এক মুহূর্তে সে অলৌকিক লোক থেকে নেমে এল লৌকিক বাঁশবাঁদির ইতিহাসে। তা নইলে যেন পাখীকে ধরা যায় না, পাখী এবং করালীকে দেবতার ভয় দেখিয়ে মানানো যায় না। তাই সে আরম্ভ করলে পাখীর জন্মকাণ্ডের কাহিনী, তা নইলে ওর চরিত্র এমন হবে কেন ?

চীৎকার ক'রে পাখীর জীবনের জন্মকাণ্ড হতে এ পর্যন্ত যত অনাচারের কথা আছে তাকে সাতকাণ্ড ক'রে আকাশ-লোককে পর্যন্ত শুনিয়ে দিলে। অবশেষে শাসন ক'রে বললে—হারামজাদী বেজাত—বদজাত—বদজম্মিত, এত বড় বাড় তোমার ? আমার বাড়ি থেকে আমাকে বার ক'রে দাও তুমি ?

তারপর সে বললে—তাই বা কেন ? এত বড় স্পর্ধা এই পাখী ছাড়া আর কার হতে পারে ? বসন্তের এই কন্যাটি ছাড়া আর কার হতে পারে ? সুচাঁদের নিজের কন্যা হ'লে কি হয় ? সুচাঁদ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবে না। নিজের কন্যা ব'লে সে তার খাতির ক'রে না। বসন্তের যে মতিগতি মন্দ ; যখন ওই জাঙলে চৌধুরীবাবুর মাতাল ছেলের সঙ্গে মনে রঙ লাগায়, তখন সে জানে এর দুর্ভোগ তাকেই ভুগতে হবে। আজও পর্যন্ত বসন্ত সেই রঙের নেশায় বিনা পয়সায় বারোটি মাস চৌধুরী-বাড়িতে দুধ যোগায়। তাও কিছু বলে না সে। এই হারামজাদী পাখী যখন বসন্তের পেটে এল, তখন খুঁজে খুঁজে সুচাঁদ নিয়ে এসেছিল এক জরাজীর্ণ খোঁড়া কাহারের ছেলেকে ; এনে অনেক ঘুষ দিয়ে পাখীর পিতৃত্বের দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে বসন্ত এবং পাখীকে রক্ষা করেছিল। অন্যায় হয়েছিল—তার অন্যায় হয়েছিল। বসন্তকেই পথে বার ক'রে দেওয়া উচিত ছিল। অথবা এ পাপকে ভ্রূণ অবস্থায় বিনষ্ট করতে বসন্তকে বাধ্য করা উচিত ছিল তার। এ পাপ যে এমন হবে, সে তো জানা কথা। ওই চৌধুরীদের এবং বসন্তের রক্ত তার দেহে, তার রঙের নেশা এমনই হবে যে। করালীর নেশায় পাগল হয়েছে পাপ পাখী। সেই নেশায় অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় দেখছে বজ্জাত বেজাত।

পাখী হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠল—হারামজাদী, আমার শরীলে লয় চৌধুরীদের অক্ত আছে, তাতেই না হয় আমার নেশা বেশি। কিন্তুক তোর প্যাটের মেয়ের নেশা কেনে আজও ছাড়লো না শুনি ? বলি, তোর বসন্তের শরীরে কার অক্ত আছে তা বল ? শুনি।

পাখীর চিৎকারে ঠিক মাথার উপরে আকাশে উড়ন্ত চিলটাও বোধ করি চমকে উঠল, অন্তত তাই মনে হ'ল। ঠিক মাথার উপরে যে চিলটা স্থির পাখা মেলে ভেসে চলেছিল ব'লে মনে হচ্ছিল, সেটা এই মুহূর্তেই সজোরে পাখা আন্দোলিত ক'রে দ্রুততর বেগে অতিক্রম ক'রে গেল স্থানটা। সুচাঁদের কানেও একটি কথা অস্পষ্ট রইল না। সুচাঁদ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কিছু যেন খুঁজতে লাগল।

পাখী বললে—আমি জানি না তোমার বেবরণ; লয়? তুমি নিজে মুখে আমাকে বল নাই তোমার অঙের কথা?

সুচাঁদ ছুটে গিয়ে নিমতেলে পানুর নিমতলা থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ছুটে এল।—তোর বিষ ঝেড়ে দোব আমি আজ।

পাখী ছুটে গিয়ে নিয়ে এল মস্ত লম্বা একখানা বাঁশের লাঠি।—আয়, তু আয়। দেখি আমি তোকে।

হঠাৎ এই সময় এসে পড়ল বনওয়ারী। চীৎকার বেড়ে গেল সুচাঁদের। পাখী চীৎকার বন্ধ করে লাঠিখানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ব্যাপারটা হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার অতি সাধারণ ব্যাপার। এমনিই এখানকার ধারা—এমনিভাবেই কলহ বাধে, এমনিভাবেই মেটে। দপ ক'রে আগুনের মত যেমন জ্বলে উঠেছিল, তেমনই থপ ক'রে নিবে গেল। বনওয়ারী এলে এমনিভাবেই ঝগড়া থামে।

বনওয়ারীর মুখ গম্ভীর। তার ভাবে ভঙ্গিতে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যস্ততা, সে বললে—চুপ, সব চুপ।

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে উঠল আবার—ওরে বাবা রে—

বনওয়ারী ঝুঁকে কানের কাছে চীৎকার করে বললে—শুনব ইয়ের পরে।

—ইয়ের পরে?

—হ্যাঁ। মাইতো ঘোষ আসছেন সাপ দেখতে।

—কে আসছে?

—জাঙলের মাইতো ঘোষ। আমার মনিব।

বুড়ীও সন্ত্রস্ত হ'ল। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে জাঙলের পথের দিকে চেয়ে রইল। পানু পিছন থেকে হাঁকলে—সর্, সর্, স'রে যাও। পথ দাও।

দু ফাঁক হয়ে গেল জনতা। জাঙলের ঘোষ এসে দাঁড়ালেন।

চার

করালীর চোখ জলে উঠল।

জাঙলের মাইতো ঘোষকে দেখলে যত তার ভয় লাগে, মনে মনে তত তার ক্ষোভ জেগে ওঠে। চন্নপুরের কারখানায় কাজ করার জন্য তায় মনে যত অহঙ্কার, তার অজ্ঞাত কোন গোপন মনে তার চেয়েও বেশি বেদনাও জ'মে আছে। ওই চন্নপুরের কারখানায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন এই মাইতো ঘোষ। ওই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার মায়ের ইতিহাস। লজ্জা এই হাঁসুলী বাঁকের আলো-আঁধারিতে কম। কিন্তু তবুও মায়ের লজ্জাই সবচেয়ে বড় লজ্জা। তার সঙ্গে আরও আছে মা-হারানোর বেদনা। আর আছে এই বাঁশবাঁদি ছেড়ে যাওয়ার প্রথম দিনের বেদনার স্মৃতি।

সে সব অনেক পুরানো কথা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার একটা টুকরো গল্প, গোটা পাঁচালির মধ্যের কয়েকটা ছড়া। সে ছড়া বলতে বনওয়ারীর মত মাতব্বরেরা লজ্জা পায়। ছোঁড়ারা আনাচে-কানাচে বলে। মেয়েরা বলে নিজেদের মধ্যে, রঙের কথা উঠলে ফিসফাস ক'রে। কেবল চীৎকার ক'রে বলে সুচাঁদ। সে বলে—"আঃ, তার আবার লাজ কিসের? বলে যে সেই 'বেগুনে কেনে খাড়া? না, বংশাবলীর ধারা'।" এই তো কাহারদের পুরুষে পুরুষে চ'লে আসছে। তারা অকপটে ব'লেও আসছে এই কাহিনী। করালী তখন ছেলেমানুষ, বাপ মারা গিয়েছিল তিন বছর বয়সে। পাঁচ বছর বয়স যখন তার, তখন তাকে ফেলে তার মা পালিয়ে যায় ওই চন্নপুরে ইষ্টিশানের একজন লোকের সঙ্গে। তখন ওই রেললাইন তৈরি হচ্ছে, দেশ-দেশান্তর থেকে লোক এসে লাইন বসাচ্ছে, কোপাইয়ের উপরে পুল তৈরি করছে, সে যেন এক মস্ত ব্যাপার ক'রে তুলেছে। হাঁসুলী বাঁকের মেয়েরা খাটতে যেত চন্নপুরের বাড়িঘর তৈরির কাজে। রেল-লাইনের ওই মস্ত ব্যাপারে যাওয়া ছিল তাদের বারণ বনওয়ারীই তখন মাতব্বর। বারণ ছিল তারই। ওখানে গেলে জাত যায়—ধর্ম থাকে না। চাষ ক'রে খায় যারা, তারা ওই কারখানার বাতাস গায়ে লাগালে তাদের মঙ্গল হয় না। ওই বাতাস, ওই 'ঘরাণ'। অর্থাৎ ঘ্রাণ সহ্য করতে পারেন না চাষীর লক্ষ্মী। যাক সে কথা। করালীর মা বিধবা হয়ে চন্নপুরে বাবুদের বাড়ি মজুরনী খাটতে গিয়ে পয়সার লোভে ইষ্টিশানে কারখানার লোকদের সঙ্গে 'গোপ্ত' যোগাযোগ পাতায়। তারপর সে একদিন সন্তানের মায়া পর্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল কোথায়। কে-ই বা খোঁজ করবে? আর খোঁজ করেই বা কি হবে? করালী কাঁদতে লাগল। তবে হাঁসুলী বাঁকে এটা কোন নূতন ব্যাপার নয়। এমন অনেক ঘটে, অনেক ছেলে কাঁদে; আত্মীয়স্বজনে টেনে নেয় কাছে। আত্মীয়স্বজন না থাকলে মাতব্বর নেয় টেনে। অনাদরের মধ্যেই কোন রকমে বড় হয়। দশ বারো বছর বয়স হ'লেই আর ভাবনা থাকে না; সে তখন সক্ষম হয়ে ওঠে, নিজের অন্নবস্ত্র নিজেই রোজগার করতে পারে। জাঙলে সদ্‌গোপের বাড়িতে ভাত কাপড় আর মাসিক চার আনা মাইনে বাঁধা। গরুর রাখালি কর্মে ঢুকে পড়ে।

করালীর তিনকুলে থাকার মধ্যে ছিল এক পিসী—ওই নসুর মা, সে-ই করালীকে টেনে নিলে। লোকে করালীকে বলত—ভূতুড়ে ছেলে। করালী খুঁজে বেড়াত তার মাকে। খুঁজতে যেত মহিষ-ডহরির বিলে, খুঁজত কোপাইয়ের তীরের বনে বনে, দয়ের ধারে, শিমুলগাছের তলায়, ওই বাবাঠাকুরতলায়; কোন-কোনদিন চ'লে যেত চন্ননপুরের আলপথ ধ'রে মাঝপথ পর্যন্ত। কাঁদত 'মা মা' ব'লে। তারপর কোন খেলা আবিষ্কার ক'রে তাই নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ত, অথবা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। বাবাঠাকুরতলায় ব'সে ব'সে সে দেখত বেলগাছে পিঁপড়ের সারি, গোড়ায় উইয়ের ঢিপি। বেলগাছ-ঢাকা অপরাজিতার লতা থেকে পাড়ত ফুল। কাহারেরা যেদিন বাবাঠাকুরের থানে পুজো দিত, সেদিন পুজোর পরে সে সেখানে যেত—গিয়ে ভোগ-দেওয়া বাতাসা পাটালি কুড়িয়ে খেত, পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ত। ভাঁড়ে দুধ রেখে আসত কাহাররা, সে সেটুকু খেত। ওই দহের শিমুলগাছতলায় ব'সে সে দেখত বাঁকবন্দী টিয়াপাখীর খেলা—লেজ নাচিয়ে তারা উড়ত, রাঙা ঠোঁটে ব'য়ে আনত ধানের শিষ, কত দিন লড়াই করত তারা ছানা-আক্রমণকারী সাপের সঙ্গে। করালী সাহায্য করত টিয়াপাখীদের, সে ঢিল ছুঁড়ে মারত, সাপটাকে বিব্রত করত। দু-একটা সাপকে ঢেলা মেরে নীচে ফেলেও দিয়েছে। হঠাৎ এক সময় খেলার নেশা ছুটত, তখন সে আবার মাকে খুঁজত। ক্রমে বয়স বাড়ল, মায়ের ইতিহাসের লজ্জা তাকে স্পর্শ করল, তখন মাকে খোঁজা ছাড়লে সে। তখন একদিন—বারো বছর বয়স হতেই বনওয়ারী তাকে রাখালি কর্মে ঢুকিয়ে দিলে ঘোষ মহাশয়দের বাড়ি। গরু চরাত, গোবর কুড়াত, ফাইফরমাস খাটত। মধ্যে মধ্যে মেজ ঘোষকে ইষ্টিশানে গাড়িতে চড়িয়ে দিলে প্রতিবারেই মেজ ঘোষ তাকে একটি ক'রে আনি দিত।

করালীর ভারি ভাল লাগত মাইতো অর্থাৎ মেজ ঘোষকে, ভয়ও লাগত তেমনই। এমন যার বাক্সবিছানা, এমন যার সাজপোশাক, যে লোক এমন ক'রে অবহেলায় ফেলে দিতে পারে একটা আনি, যে লোক রেলগাড়িতে চ'ড়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তাকে কাহারদের যত ভাল লাগে, তত ভয় লাগে। হঠাৎ একদিন এই ভাল-লাগাটা বিষ হয়ে উঠল।

ঘোষ তাকে জুতোর বাড়ি মারলেন। ঘাড়ে ধ'রে তার মাথাটা নুইয়ে ধরলে বনওয়ারী, আর মেজ ঘোষ মারলেন পিঠে চটাচট চটিজুতোর পাটি। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। মেজ ঘোষের এক খদ্দের পাঠিয়েছিল এক ঝুড়ি খাস আম। সেই আমের ঝুড়ি করালী আনতে গিয়েছিল চন্ননপুর ইষ্টিশান থেকে। মাস্টার-মশায়ের মত এমন ভাল লোক আর হয় না। এত জিনিস আসে ইষ্টিশানে, রাজ্যের সামগ্রী; সব মাস্টারই তার থেকে কিছু কিছু নিয়ে থাকে। কিন্তু সে মাস্টার কখনও কারুর জিনিসে হাত দিতেন না। শুধু মালের রসিদ-পিছু তাঁর যে পার্বণীটি পাওনা—সেইটেই নিতেন। ঘোষের আমের ঝুড়ি বেশ ক'রে চট দিয়ে মুড়ে সেলাই করাই ছিল। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতের ল্যাংড়া আমের সুগন্ধে মালের ঘরখানা একেবারে মৌ-মৌ করছিল। ঢুকলেই সে গন্ধে মানুষের নাক থেকে বুক পর্যন্ত ভ'রে উঠেছিল, জিবের তলা থেকে জল বেরিয়ে মুখটাকে সপসপে সরস ক'রে তুলছিল। মাস্টারের একটি ছোট মেয়ে সেই গন্ধে লুব্ধ হয়ে আম খাওয়ার জন্য বায়না ধরে শেষ পর্যন্ত কান্না জুড়ে দিয়েছিল। মাস্টার তবু একটি আমও বার ক'রে নেন নি। কিন্তু

করালী থাকতে পারে নি। সে নিজে দুটি আম বার ক'রে মেয়েটির হাতে দিয়েছিল। বলেছিল—আমার মুনিব তেমন নয়, মাস্টার-মশায়। তারপর ইষ্টিশান থেকে বেরিয়ে আসতেই জমাদার ধরেছিল করালীকে। সে দুটো আম না নিয়ে ছাড়লে না। শুধু ছাড়লে না নয়, পকেট থেকে ছুরি বার ক'রে একটা আম কেটে খেয়ে আমের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে এক চাকা আম করালীকে আস্বাদন করিয়ে তবে ছাড়লে। তাই তার অপরাধ। চারটে আম কম-বেশিতে ঘোষ করালীকে ধরতে পারত না, ধরলে করালীর হাতের ও মুখের গন্ধ থেকে। আমের ঝুড়িটা মেজ ঘোষই ধ'রে তার মাথা থেকে নামাচ্ছিল। নামিয়েই সে করালীর ডান হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে নাকের কাছে টেনে নিয়ে শুঁকলে, তারপর বনওয়ারীকে ডেকে বললে—মুখটা শোঁক তো বনওয়ারী। হারামজাদা ঝুড়ি থেকে আম বের ক'রে খেয়েছে পথে। বনওয়ারী লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইল প্রথমটা। এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়? করালী তার জাত-জ্ঞাতের ছেলে, সেই তাকে এনে এ বাড়িতে চাকরি ক'রে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা যে পাড়ার সে মাতব্বর, সেই পাড়ার ছেলে করালী। প্রজার পাপ জমিদার-রাজাকে অর্সায়, সেই জন্যই তো জমিদার-রাজার প্রজাকে শাসনের অধিকার। সমাজের পাপ মণ্ডলকে মাতব্বরকে অর্সায়, সেই জন্যই মণ্ডল-মাতব্বরের কাজ হ'ল—অধর্মের পথে পুরুষ-মেয়েকে যেতে 'নেবারণ' করা। ছি-ছি-ছি। দেবতা আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, বাড়ির মালিক আছেন—তাঁরা তোর মনিব, তাঁরা খেয়ে তবে না তোকে প্রসাদ দেবেন। বনওয়ারীর ইচ্ছা হয়েছিল, একটা লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে তার জিভে ছেঁকা দেয়। কিন্তু মেজ ঘোষ নিজেই তাকে সাজা দিলেন। তাকে বললেন—ধর্, বেটার ঘাড় ধ'রে মাটিতে মাথাটা নুইয়ে ধর্। তাই ধরলে বনওয়ারী। মেজ ঘোষ নিজেই পায়ের চটি খুলে 'পেচণ্ড' পেহার দিলেন। এবং করালীকে তাড়িয়েও দিলেন মেজবাবু। মাইনে কিছু পাওনা ছিল, সেও দিলেন না। কথাটা কানে গিয়েছিল স্টেশন-মাস্টারের। তিনি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন, এবং তিনিই করালীকে ডেকে দিলেন ইষ্টিশানের গুদামে কুলির কাজ। কিন্তু ছোট স্টেশনে এ কাজে উপার্জন নাই। কায়ক্লেশে একটা লোকের পেট চলে। তাই লাইন-ইন্সপেক্টারকে ব'লে শেষে ঢুকিয়ে দিলেন কুলী-গ্যাঙের মধ্যে। সেই জন্যই না করালী আজ এই করালী, এবং এই সবের জন্যই সে অন্য দশজনের মত বনওয়ারীকে খাতির করতেও চায় না এবং ঘোষ-বাড়ির ছায়াও মাড়াতে চায় না। হোক না কেন এসব অনেক দিনের কথা, এবং দশে বিচার ক'রে বলুক না কেন অন্যায় তারই, তবু করালী সে কথা ভুলতেও পারে না, এবং অন্যায় তার ব'লে মানতেও পারে না।

মেজ ঘোষকে দেখে করালীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা নেচে উঠল। বনওয়ারী তার ঘাড় ধরেছিল, মেজ ঘোষ তাকে মেরেছিল। আজ বনওয়ারী তাকে তারিফ করছে, মেজবাবু এসেছে তার মারা সাপটা দেখতে। মেজ ঘোষ কি বলে, কি রকম ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে প্রশংসা-ভরা দৃষ্টিতে, সে আজ তা একবার দেখবে।

উঠানে নেমে সে সত্যই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। ঘোষ দাঁড়িয়ে ছিলেন সাপটার কাছেই। বনওয়ারী সামনের ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে। করালী কিন্তু এগিয়েও এল না, প্রণামও করলে না। সে নটবরের সঙ্গে কি একটা কথা নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিলে।

বনওয়ারী বার কয়েক চোখের ইশারায় তাকে এগিয়ে এসে ঘোষ মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ করতে ইঙ্গিত করলে। করালী দেখলে, কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পেলে না, এই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। কান কিন্তু তার খুব সজাগ ছিল, কে কি বলছে, তার প্রতিটি কথা সে শুনছিল। অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিল মেজ ঘোষের মুখে কি কথা বার হয়—সেইটুকু শুনবার জন্য। সকলেই খুব বিস্ময় প্রকাশ করলে, করালীর বীরত্বের তারিফ করলে। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখে শুনে একটু হেসে মেজ ঘোষ বললেন, নাঃ, খুব বড় না। এর চেয়ে অনেক বড় পাহাড়ে চিতি চিড়িয়াখানাতেই আছে। আসামের জঙ্গলে তো কথাই নাই। সেখানে এত বড় সাপ আছে যে, বাঘের সঙ্গে লড়াই হ'লে বাঘ মেরে ফেলে। রেল-লাইনের উপর যদি কোন ট্রেন যাবার সময় পড়ে তো ট্রেন আটকে যায়।

বনওয়ারী সায় দিলে কথাটায়, বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঝারি সাপ।

করালী এবার উদ্ধতভাবেই এগিয়ে এল। সাপটাকে এখনই এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে সে। নিয়ে যাবে চন্দনপুর স্টেশনে, সেখানে বাবুদের দেখাবে, সায়েবকে দেখাবে। তাদের কাছে ঘোষের দাম কানাকড়ি। জাঙলের একজন ভদ্রলোকের ছেলে বললে—কিন্তু এ তো পাহাড়ের চিতি নয়—এ হ'ল চন্দ্রবোড়া। চন্দ্রবোড়া এত বড় কিন্তু কেউ কখনও দেখে নি। আর সাপও ভীষণ সাপ।

ঘোষ একটু হেসে বললেন—জাত ওই একই হে, চিতির জাত। তারপর করালীর দিকে চেয়ে দেখে বললেন—হুঁ। জোয়ান তো হয়েছিস বেশ। বুদ্ধিরও একটু ধার আছে মনে হচ্ছে। কি করিস এখন ?

করালী বেশ মাথা উঁচু ক'রে গম্ভীরভাবেই জবাব দিতে চেষ্টা করলে, অ্যাল-লাইনে কুলী-গ্যাঙে কাজ করি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গম্ভীর আওয়াজ তার গলা দিয়ে একেবারেই বার হ'ল না। উত্তর দিতে গিয়ে বার দুই ঢোক গিলে সে চুপ ক'রে রইল। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। উত্তর দিলে বনওয়ারী, বললে—এ এখন অ্যাল-লাইনের কুলী খাটে।

ও। আচ্ছা। তা হ'লে তো অনেক দূর এগিয়েছিস রে। আর কি করছিস ? রাত্রে চুরি ? যে রকম শরীরটা বেঁধেছে আর বুদ্ধিতে যেমন বঁড়শীর বাঁকা ধার, তাতে তো ও-বিদ্যেটায় পণ্ডিত হতে পারবি।

করালীর শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মাথা হেঁট ক'রে রইল সে। কথা বলার ভঙ্গিই এমন মেজ ঘোষের যে, সকলেই মুখ টিপে হাসতে লাগল। বনওয়ারী হেসে বললে—আজ্ঞে না, চুরি-টুরি করে না। সে সব আমার আমলে হবার জো নাই কাহারপাড়ায়। সে যিনি করবেন, তাঁকে গাঁ থেকে উঠে যেতে হবে। তবে করালী বজ্জাত খুব। যত বজ্জাত, তত ফিচলেমি বুদ্ধি।

মেজ ঘোষ হাসতে হাসতে বলল—তা হ'লে চোর হওয়া ওর অনিবার্য। যদি চোর না হয় তবে পয়লা নম্বরের লোচ্চা হবে—এ আমি বলে দিলাম বনওয়ারী। তারপর পকেট থেকে চামড়ার বাহারে মনিব্যাগ বার ক'রে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—নে।

সঙ্গে সঙ্গে মেজ ঘোষ সমস্ত লোকের কাছে আশ্চর্য রকমের সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। তারপর

বললেন—উঠিয়ে নিয়ে যা ওটা। গন্ধ উঠেছে এর মধ্যে। সকলেই জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে লাগল কথাটা শুনে। গন্ধ উঠছে নাকি? গন্ধ? বনওয়ারীও নিশ্বাস টানলে জোরে জোরে। করালী একটা রুদ্ধ অথবা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও সিকিটাকে উপেক্ষা করলে না, সিকিটা নিয়ে কোঁচড়ে গুঁজে সঙ্গীদের বললে—লে, তোল্। নিয়ে যাব চন্নপুর ইষ্টিশান। তোল্।

আজ এই মুহূর্তটিতে আবার করালীর আক্ষেপ হ'ল—নসুদিদি নাই, সে থাকলে জবাব দিতে পারত ঘোষকে। সে থাকলে কোমরে কাপড় বেঁধে মেজ ঘোষকে দেখে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়েও ঘোষের কথার উত্তর না দিয়ে ছাড়ত না।

ঘোষ বললে—নাঃ, খুব বড় না।

নসু সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিয়ে জবাব দিত—হেই মাগো! বড় তবে আর কাকে বলে মাশায়?

ঘোষ বললে আসাম না কোথাকার জঙ্গলে পাহাড়ে চিতির কথা।

নসু হাত নেড়ে ব'লে উঠত—গোখুরা কোথা পাব বাবা? আমাদের এই হেলেই গোখুরা। আসাম না বেলাত কোথাকার কথা বলছেন, সেথাকার রজগর সেথাকেই থাকুক। আমাদের এই রজগর, ওই আমাদের খুব বড়; লঙ্কায় বলে সোনা সস্তা, সেখানকার নোকের সব্ব অঙ্গে সোনা, আমাদের ঘাশে কাঁচের চুড়ি, রুপদস্তার চুড়িই সোনার চুড়ি।

আরও কত ছড়া কাটত। করালীর বার বার মনে হ'ল নসুবালার কথা। আর, আজ নসুদিদি থাকলে বড় ভাল হ'ত। এতবড় একটা কীর্তির গৌরব-উৎসাহ ম্লান ক'রে দিল মেজ ঘোষ। ঘোষ চোখের অন্তরাল হতে তবে তার সাহস খানিকটা ফিরে এল। সে মাথলাকে ধমক দিয়ে বললে—কি রে, কানে কথা যায় না, লয়? লে, তোল্। সাপটাকে ব'য়ে নিয়ে যাবার বাঁশের এক দিকে কাঁধ দিয়েছিল মাথলা, অন্য দিকে 'লটা' অর্থাৎ নটা, মানে নটবর।

ঘোষ বাড়ি থেকে চ'লে গেলে কোঁচড় থেকে সিকিটা বার ক'রে করালী বললে—দেখ্ দি-নি রে—সিকিটা আবার চলবে তো? মেকি-ফেকি লয় তো? মাথলা এবং নটবর সাপটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে ব'য়ে নিয়ে যাবে, তাদেরই বললে সে। তারা কেউ বলবার আগেই এগিয়ে এল নিমতেলে পানু। বললে—কই, দে দেখি।

দেখে বললে—না, চলবে। ভালই বটে। তা ছাড়া মাইতো ঘোষ মাশায়ের বেগের সিকি। লতুন চকচকে ছাড়া রাখেই না তিনি টাকা পয়সা।

করালী বললে—হুঁ।

পানু বললে—আমাকে সেবার পয়সা দেবার তরে বেগটা ঢাললে তক্তপোশের ওপর। একেবারে সোনার পয়সার মত চকচকে লালবন্ন পয়সা—সে এই এত।

পানুও তাদের সঙ্গ নিলে বেহায়ার মত, সেও যাবে চন্নপুর ওদের সঙ্গে। চন্নপুরে যে অনেক পয়সা মিলবে তাতে সন্দেহ নাই। করালী তাতে আপত্তি করে নাই। আসুক বেটা ছুঁচো। পানুই দিলে একটা কাঁধ। অজগর চললেন চন্নপুর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ করালী দূরে দাঁড়িয়ে পানুর গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে আচমকা—শালো, কানার মত চলছ যে বড় ? কানার মত চলছ যে ? পায়ে পায়ে টক্কর দিলি যে বড় ? আমাদের আর চোখে দেখতে পাও না, লয় ? শালো! সোনার পয়সার মত চকচকে 'লালবন্ন'। শালো, যাও না কেনে, সেইখানে যাও না। আমার সাথে কি বটে তোমার ?

মাথলা বললে—ঠিক বলেছে করালী। আজ আমাদের সাথে কি বটে হে তোমার ? মুরুব্বির কাছে তো সাতখানা ক'রে লাগাও তুমি। আজ কি বটে আমাদের সাথে ?

নটবর তাকে সাবধান ক'রে দিলে—অ্যাই, চুপ কর। মুরুব্বি আসছে কিনা দেখ্ আবার।

ওদের দুজনের ঘাড় ফেরাবার উপায় ছিল না, একে আলপথ, তার উপর কাঁধে সাপ ঝুলানো বাঁশ।

মাথলা তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললে—না। কই ? আসে নাই সে।

করালী বললে তার বিদ্যাসম্মত হিন্দীতে—যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাঁম কেয়ার করতা নেহি হ্যায়। হুঁ। তারপর হঠাৎ বললে—কাহারদের ছেলে পাল্কি বওয়ার হাঁক ধর্ না কেনে শালোরা। হাঁক ধর্ কেনে। কথাটা ভারি মনে লাগল মাথলাদের। মরা সাপটাকে পাল্কির আরোহী ধ'রে নিয়ে তারা হাত দুলিয়ে হাঁক ধরলে—প্লো হিঁ—প্লো হিঁ—প্লো হিঁ। হঠাৎ পিছন থেকে বনওয়ারীর মোটা গলার হাঁক তারা শুনতে পেলে, দাঁড়া—দাঁড়া। এ-ই! দাঁড়া। থেমে গেল সকলে। থেমে যেতে হল। পা আর উঠল না। শুধু করালী উঠল অধীর হয়ে। এ কি কাণ্ড! এ কি জুলুম!

বনওয়ারীর মুখটা হয়ে উঠেছে হাঁড়ির মত। সে এসে দাঁড়াল। বললে—ফিরে আয়।

—ফিরব ? কেনে ?

—দাহ করতে হবে।

—সে তো 'আত্তে' করব বলেছি।

—না। এখুনি হবে দাহ। গোটা কাহারপাড়াকে চান করতে হবে। তারপর হঠাৎ আক্ষেপভরা আক্রোশভরা কণ্ঠে সে ব'লে উঠল—তুই গাঁয়ের সর্বনাশ করবি রে—তুই সব অনথের মূল।

করালী স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে—ফিরে আয়। যা করেছিস, তার পিতিবিধেন করতে হবে।

করালী বললে—না। ওঠা রে সব, ওঠা।

কিন্তু কেউ ওঠাতে সাহস করে না। দাঁড়িয়ে রইল মাটির পুতুলের মত।

করালী আবার বললে—শুনছিস ? ওঠা।

কেউ যেন শুনতেই পাচ্ছে না। বনওয়ারী বললে—মুখ দিয়ে অক্ত উঠে যদি মরতে না চাস তবে ফেরা।

এবার সাপ উঠল। চলল সকলে সাপ কাঁধে ক'রে বাঁশবাদিতে ফিরে। ফিরল না শুধু

করালী। সে হনহন ক'রে চলতে শুরু করলে চন্ননপুরের দিকে।

বনওয়ারী ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফিরল।

কাহারপাড়ার আদ্যিকালের যত বিধান সুচাঁদের কাছে। সেই বিধানই চিরদিন বলবতী হয়েছে এখানে, আজও হ'ল।

মেজ ঘোষকে বিদায় ক'রে বনওয়ারী বাড়ি ফিরে দেখলে, সুচাঁদ ব'সে আছে। সুচাঁদ পাখীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে। পাখীকে ব'লে এসেছে—এ বাড়িতে যদি আর ফিরি, তোর মায়ের গতরের ওজগারের রন্ন যদি খাই, তবে আমার জাত নাই, আমি বেজাত। আমি বনওয়ারীর বাড়িতে থাকব।

বনওয়ারী সম্মান করতে জানে। সে বললে—বেশ তো পিসী। ছেলেকালে অ্যানেক দোধ্ব তুমি দিয়েছ আমাকে। তুমি থাকবে সে তো ভাগ্যি আমার গো। কি, হ'ল কি?

সুচাঁদ সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা ক'রে বললে—বনওয়ারী, উনি যদি কত্তার বাহন না হন, কি মা-মনসার বেটী না হন, তো আমি কি বলেছি।

বনওয়ারীর—কাহারপাড়ার মাতব্বরের দৃষ্টি যেন এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, এবার জেগে উঠল। খুশিও হ'ল সে। অত্যন্ত খুশি হ'ল। মনের মধ্যে সাপ মারার সেই স্মৃতির বেদনা যেন ঘন হয়ে উঠছে। সে পিসীর পায়ের ধুলো নিলে।

পিসী আশীর্বাদ করলে—ছেরায়ু হ বাবা। আমার মাথার চুলের মতন তোর পেরমাই হোক। তারপর কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বললে—আহা, আগুনে দগুধে গিয়েছেন মা আমার, তবু কি বরের বাহার, কি গড়ন। আঃ! সর্বনাশ ক'রে দিলে বাবা।

বনওয়ারীর মন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিধানের জন্যই বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রতিবিধান—বাবাঠাকুরের পূজা। মদে-মাংসে ঢাকে-ঢোলে আতপে-চিনিতে বস্ত্রে-সিঁদুরে পূজা। সকল কর্মের উপরে হ'ল তার মাতব্বরির দায়িত্ব, গ্রামের ভাল আগে দেখতে হবে তাকে। হে বাবা কর্তা। গ্রামের মঙ্গল কর তুমি। সাজা দিতে হয়, যে দোষ করেছে তাকে দাও। করালীকে কিন্তু শাসন করা দরকার হয়েছে। বড়ই বৃদ্ধি হয়েছে। জোয়ান বয়সের রক্তের তেজ। হঠাৎ ক্রোধে ফুলে উঠল বনওয়ারী। আজও ওই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাঁশবনের মধ্যে—। আফসোসের সঙ্গে মনে করতে চেষ্টা করলে বনওয়ারী, বাঁশপাতার উপর অসাবধানে কেমন ক'রে তার পা পিছলে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও সে তার অপমান। সে তার পরম লজ্জার কথা।

বনওয়ারী মাতব্বর কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে বাবাঠাকুরকে। উপরের দিকে চাইলে একবার, তারপর মনে মনে মানত করলে ঠাকুরকে—হে ঠাকুর, পুজো দেবার কথা তো হয়েই আছে। আবারও মানত করছি—এর জন্যে একটি নতুন পাঁঠা দেব আমি। তুমি কাহারদের রক্ষা কর।

সুচাঁদ প্রশ্ন করলে—কি করছিস তা বল্?

বনওয়ারী বললে—এর তরে আমি পুজো দোব পিসী, আলাদা পাঁঠা মানত করছি।

—কি করছিস? আরও একটা পাঁঠা?—স্থিরদৃষ্টিতে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে সুচাঁদ প্রশ্নচ্ছলে কথাটার পুনরুক্তি করলে।

বনওয়ারী আবার বুঝিয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মানত করছি—মানত।

—মানত?

—হ্যাঁ। দুটো পাঁঠা দিয়ে কত্তার পুজো দোব।

আঙুল দেখিয়ে সুচাঁদ বললে—দুটো পাঁঠা দিবি?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ। কিন্তুক, অ্যানেক কল্যেণ করতেন উনি বাবা—ওই উনি। আঃ, কি শিস।

বনওয়ারী বললে—দাহ হবে বাবার বাহনের। কাহারপাড়ার সবাইকে চান করতে হবে। ব'লে দাও সব। আমি চললাম ডাকতে। সে ছুটল।

কোপাইয়ের তীরে চিতা সাজিয়ে দাহ হ'ল বাবার বাহনের। গোটা কাহারপাড়া চান ক'রে ফিরল। বনওয়ারী প্রণাম ক'রে এল বাবার থানে।—হে বাবা! রক্ষা কর বাবা! পাষণ্ডকে দলন কর বাবা। কাহারদের মালিক, কাহারদের রক্ষা কর।

পাঁচ

ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডাং-ড্যাডাং—এর্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌—ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডাং-ড্যাং—

বাবাঠাকুরতলায় ভোরবেলায় 'ঝুঁজকি' থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকী ভোরের বাজনা ধুমুল বাজাতে শুরু করলে। রবিবার অবামস্যা—ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পুজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিঁদুরে, ধুপে প্রদীপে, আতপে চিনিতে, দুধে রম্ভায়, মদে মাংসে কাপড়ে দক্ষিণায়—সমারোহ ক'রে পুজো।

ঢাক বাজবার আগেই ওঠে কাহারপাড়া—মেয়ে পুরুষে। ঘুমিয়ে থাকে শুধু ছেলেরা। তারাও আজ উঠে পড়ল। কলরব ক'রে তারা যেতে চায় বাবাঠাকুরের থানে। সুচাঁদ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—খবরদার, এ তো বছরশালি পুজো নয়,—আমোদ নেই এতে। অপরাধের পুজো, একেই বাবা মুখ ভার ক'রে আছেন, তারপর ছেলেরা যাবে, চেঁচামেচি করবে ল্যাইক লহ করবে, ধুলো ছিটোবে, অবলার জাত—নোংরা ময়লা করবে—অপ্‌রাধের ওপর অপ্‌রাধ হবে। খবরদার! আগে পাঁঠা দুটি নিব্বিঘ্নে কাটা হোক, বাবাঠাকুর পুজো লেন হাসিমুখে; তারপর লাচন-কোদন, গান-বাজনা, মাল-মাতালি—সব হবে।

বনওয়ারী পাড়ায় পাড়ায় ব'লে এল—সাবোধান, সব সাবোধান! করালীর অপ্‌রাধের সাজা গোটা পাড়াকে ভুগতে হচ্ছে বাবা সকল; আর অপ্‌রাধ বাড়িয়ো না। অনেক মাশুল লাগল। আর না।

প্রহ্লাদ বললে—সোজা খরচ!

বনওয়ারী খরচ করছে, পানু মনে করে হিসেব রাখছে। এসবে নিমতেলে ছোকরা খুব লায়েক। দেহখানি—ওরা বলে, সরিঙ্গী অর্থাৎ কাঠির মত; কিন্তু মাথা নাকি খুব। মনে

রাখতে পারে খুব। পানু মুখে মুখে হিসেব দিলে—খরচ তোমার অনেক। নগদ তিন টাকা বারো আনার ওপর দু পয়সা।

এর উপরে আরও খরচ আছে, ঘর থেকে দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে, তার দামই বেশি। দুটো পাঁঠা, একটা ভেড়া, বারোটা হাঁস, দশ-বারো সের চালও দিতে হয়েছে—বায়েন কর্মপ্রকার পুরোহিত মহাশয়দের সিধার জন্য। এ সবের দাম অনেক। সকালবেলা থেকে তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত মজুরি খেটে যারা পাঁচ আনা রোজ পায় অর্থাৎ মাসিক ন টাকা ছ আনা মাত্র যাদের আয়, তাদের কাছে অনেক'বইকি! সুতরাং কাহারদের জীবনে এ একটা সমারোহ এবং রোমাঞ্চকরও বটে।

রোমাঞ্চটা আরও প্রবল হয়ে উঠল বাবাঠাকুরের থান পরিষ্কারের সময়। সেয়াকুলের ঝোপ কাটবার সময়, ওই ঝোপগুলির ভিতরের উইঢিপি থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন-তিনটে আল-কেউটে। কেউটেকে ওরা খুব ভয় করে না। কোপাইয়ের তীরে, জাঙলের মাঠে আল-কেউটের বাস চিরকাল। ওদের সঙ্গেই একরকম বাসই করে কাহারেরা। কেউটেরাও ওদের মধ্যে মধ্যে তাড়া করে, ওরাও কেউটেদের তাড়া ক'রে পাঁচন-লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তবে জাত-সাপ নাকি ব্রাহ্মণ, ওদের মেরে তাই সম্মান ক'রে আগুনে 'ডাহ' অর্থাৎ দাহ করে। বাবাঠাকুরের থানে কেউটের কিন্তু অন্য অর্থ হ'ল। বিশেষ ক'রে এই অজগর তুল্য চন্দ্রবোড়াটিকে বাবার বিচিত্র-বর্ণ বাহন ব'লে জানার পর, এই কেউটেগুলিকে তার সঙ্গী সাথী না ভেবে পারলে না বনওয়ারী। সে বললে—খবরদার! হাত দিয়ো না গায়ে।—ব'লে নিজেই সে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলে। সাপ তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ফোঁসাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মাটিতে ছোবল মারছে। কিন্তু এগিয়ে আসতে তাদেরও সাহস নাই। বেদে জাতের গায়ের গন্ধে সাপ তাদের বেদে ব'লে জানতে পারে, ভয় পেয়ে ছুটে পালায়; কাহারদের গায়ের গন্ধে ওরা তেমনিই বোধ হয় ভয় পায়, এগিয়ে আসতে চায় না সহজে।

বনওয়ারী সাপদের বললে—যা যা, যা বাবারা, চ'লে যা। খানিকটা স'রে যা। নরে-নাগে অর্থাৎ নরে-নাগে বাস করতে নাই, এখন তোরা স'রে যা। তোমাদের প্রভু, আমাদের বাবাঠাকুর, তাঁর পুজোটি সেরে লি, তা'পরেতে তোমরা আবার স্বস্থানে পরমেশ্বরী হ'য়ো না কেনে।

সাপগুলো স'রেই গেছে। কাহারেরাও সাবধান হয়ে রইল। কি জানি, হোক না কেন বাবাঠাকুরের বাহনের সঙ্গী সাথী, তবু ও জাতকে বিশ্বাস নাই।

তবে ওই সে ঢাকের শব্দ—ড্যাডাং-ড্যাডাং, ওতেই ওরা স'রে যাবে অনেক দূর। তার উপর ধূপ-ধুনো, অনেক মানুষের আমাগোনা।

নগদ খরচের মধ্যে পুরুত মহাশয় নিলেন আট আনা; কাপড় একখানা সাত হাত—দাম পাঁচ সিকে জোড়া হিসেবে দশ আনা; পাকি 'কারণ' সওয়া পাঁচ আনা; বাতাসা কদমা মণ্ডা ও অন্যান্য জিনিস,—বনওয়ারীরা এক্ষেত্রে জিনিসকে বলে 'দব্য'—তার দাম সওয়া পাঁচ আনা; বলিদানের ছেত্তাদার ছ আনা; দেড় গোলা মদ আঠারো আনা, এবং ঢাকী নিয়েছে চার আনা, বাকি চার আনায় তেল সিঁদুর ধূপ ধুনো ধুনুচি প্রদীপ ইত্যাদি। ছাগলের দুটো

মুড়ির একটা নিয়েছে পুরুত, একটা ছেত্তাদার, ঢাকী নিয়েছে ভেড়ার মাথাটা। কাপড়খানা পুরুত নিয়েছে। সকলেই খুশি হয়ে গিয়েছে, ব'লে গিয়েছে—পূজো নিখুঁত হ'ল মুরুব্বি। শুধু একদিন দেরি হয়ে গেল এই যা। শনিবারটা পাওয়া গেল না। তা হোক। পুরুত বললেন—রবিবার অমাবস্তে—খুব ভাল। অমাবস্তে রবিবার, মৎস্ত খাবে তিনবার। কত্তা খুশি হয়ে মদ মাংস খাবেন।

তা বাবাঠাকুর খুশি হয়ে পেসন্ন মনে দু হাত ভ'রেই মদ-মাংসের পূজো নিলেন। বলিদানে একটু খুঁত হ'ল না। তিন প্রহরের সময় বলিদানের ঢাক বাজল—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ডেনাক-ড্যাডাং—লাগ-ড্যাং-ড্যাং-ড্যানা—

কাহারদের মাতব্বরেরা তখন বাবার পেসাদী 'কারণের' প্রসাদ নিয়েছে—উপোস-করা পেটে অল্প 'কারণেই' বেশ জমিয়ে তুলেছে; মাথা ঝিমঝিম করছে। তারা সব জোড় হাত ক'রে দাঁড়াল। সুচাঁদ রাঙা-আঁটির মত চোখ বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে চেঁচাতে লাগল,—হে মা—হে মা—হে মা।

ছেলেরা মুখে বাজনার বোল বলতে লাগল—ধা-জিং-জিং জিনাক জিজিং লাগ জিং জিং জিনা—

বলির সঙ্গেই পূজা শেষ। দেখতে দেখতে বলি হয়ে গেল—নিখুঁত বলি। হাঁসগুলোকে কেটে উড়িয়ে দিলে। হাঁসগুলোকে কেটে ধড়টাকে ছুঁড়ে দিলে। তারা খানিকটা উড়ে গিয়ে পড়ল।

পানুর পাঁঠা তো ছিলই, বনওয়ারী নিজে একটা পাঁঠা দিয়েছে। রতন দিয়েছে ভেড়াটা। বনওয়ারী দিলে ওই সাপটিকে মারার অপরাধের জরিমানা। করালী করলে পাপ, সে করলে প্রায়শ্চিত্ত। না করলে কে করবে? করালীর যা হবে হোক, কিন্তু পাড়ার মঙ্গল, গাঁয়ের মঙ্গল তাকেই দেখতে হবে যে। সমস্ত পাড়ার লোক বনওয়ারীকে এর জন্য প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিয়েছে। রতন ভেড়াটি দিয়েছে নিজের অবাধ্য সন্তানের জন্য—লটা করালীর সঙ্গী, সেই হতভাগাই বাঁশে ঝুলিয়ে ওই অলৌকিক সাপটিকে ব'য়ে নিয়ে গিয়েছে। সুচাঁদ দিয়েছে একটি হাঁস। নিছক ভক্তির বশবর্তী হয়েই সে দিয়েছে। বসন্তও দুটি হাঁস দিয়েছে, ডাইনে বাঁয়ে বলি দেবার মত দু পাশে দুটো হাড়কাঠ ছিল না—তবু ওই মানসেই সে দুটি হাঁস দিয়েছে। পাখী করালীকে সমর্থন করে। বসন্তের গোপন মানস ছিল একটি হাঁস পাখীর জন্য, অন্যটি করালীর জন্য। একটি পাঠিয়েছে কালোশশী—গোপনে পাঠিয়েছে। এ পূজোয় আটপৌরে-পাড়ার সকলে যোগ দিলেও পরম মাতে নাই এতে। বনওয়ারীর সঙ্গে তার সৌহার্দ্য নাই। বনওয়ারী মাতব্বর হয়ে যা করে, তাতে পরম যোগ দিতে দেয় না আটপৌরেদের। এ ক্ষেত্রে আটপৌরেরা পরমের কথা মানে নাই। কিন্তু পরম যোগ দেয় নাই। তবে নিজের পাড়ার লোকেরা যখন তার কথা না শুনেও যোগ দিলে, তখন নেহাত পাড়ার মাতব্বরি করতে উপস্থিত হয়েছিল মাত্র। বাকি আটটা হাঁস আর আট ঘর থেকে এসেছে। যার হাঁস ছিল, সে না-দেওয়া হয় নাই। যার নাই, সে কি করবে? কত্তাকে পূজো দিতে সাধ কার না হয়, প্রসাদ পাওয়ার ভাগ্য কে চায় না? সকল বাড়ি থেকেই মণ্ডা, বাতাসা পাঁচ পয়সা হিসেবে দিয়েছে। এ ছাড়া মদ। ঘোষ মহাশয় তিন গোলার দাম দিয়ে

ছিলেন, কিন্তু বনওয়ারী দেড় গোলার বেশি কেনে নাই। দেড় গোলা কিনে তারই আবরণে ভেণ্ডরকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামেই তারা আরও তিন গোলা মদ নিজেরাই ক'রে নিয়েছে।

পূজো হয়ে গেল। এইবার নিশ্চিন্ত। চল সব, চল, বাবাঠাকুরের বাতাসা পেসাদ লাও, জল খাও, রান্নাবান্না কর। জয় বাবাঠাকুর! হে ভগবান! মঙ্গল কর তুমি।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালে করালী। তার হাতে তিনটে হাঁস। পিছনে নসুবালা আর পাখী।

—মাতব্বর, আমি তিনটে হাঁস বলিদান দোব।

বনওয়ারী দুঃসহ ক্রোধে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। এ কি উৎপাত; এ কি বিঘ্ন! রাগে তার মুখে কথা ফুটল না, গোটা কাহারপাড়াই স্তব্ধ হয়ে রইল। এগিয়ে এল পানু। সে তার শীর্ণ লম্বা হাতখানা লম্বা ক'রে বাড়িয়ে রাস্তা দেখিয়ে বললে—ভাগো।

—ভাগো?—করালী প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ। লিয়ে যাও তোমার হাঁস। তোমার বলি লেয়া হবে না।

—লেয়া হবে না?

—না।

করালী চীৎকার ক'রে উঠল—মাতব্বর!

বনওয়ারী এগিয়ে এল এবার। বললে—চিচ্‌কার কিসের? চিচ্‌কার কিসের?

—পানার মুখ ভেঙে দোব আমি। কি বলছে শুনছ?

—কি বলছে?

—আমার হাঁস লেবে না। বলি দিতে দেবে না।

—হ্যাঁ, লেবে না—আমার হুকুম।

—কেনে? লেবে না কেনে?

—না, না। লেবে না। তোমাকে নাকে খত দিতে হবে—

বাধা দিয়ে বলল করালী—নাকে খত দিতে হবে?

—হ্যাঁ। জরিমানা দিতে হবে। সকলের ছামুনে—

—থাক্, থাক্। এই করলে তবে লেবে আমার হাঁস?

—হ্যাঁ।

—লইলে লেবে না?

—না।

করালী আর কোন কথা না ব'লে পট পট ক'রে হাঁস তিনটের মুণ্ডু দুহাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন তাই কর। আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।—ব'লে মুখে বলিদানের বাজনার বোল আওড়াতে আওড়াতে চ'লে গেল—খা—জিং জিং—জেনাক পূজো—

মুণ্ডুগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁসগুলোকে নিয়ে সে চ'লে গেল। গোটা পাড়াটা স্তম্ভিত হয়ে

দাঁড়িয়ে রইল।

শুধু বনওয়ারী হেঁকে উঠল—যাক, যেতে দাও ওকে। চল সব, বাড়ি চল, জল খাও। একবার বাবাকে ডাকো। ব'লেই সে ডেকে উঠল, ব'লো শি-বো—ধর্ম রক্ষো।

সবাই সমবেত কণ্ঠে হেঁকে উঠল।

ঢাক বাজতে লাগল পুজো শেষের—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ড্যাং ড্যাং—। লম্বা ক'রে বাজনা। শেষ হ'ল। পুজো শেষ।

অশুভক্ষণে করালী, অশুভক্ষণে ওর জন্ম; এমন পূজোটিতে কেমন অস্বস্তি এনে দিলে। দিক। সে ভাববার অবকাশ নাই বনওয়ারীর। পূজো শেষ হ'লেই কাজ শেষ হল না। অনেক কাজ। মাতব্বরি সহজ নয়। অনেক বিবেচনা করতে হয়। অনেক ভাবতে হয়। প্রসাদ বিলি করতে হবে। মিষ্টির প্রসাদ, বলিদানের প্রসাদ, কারণের প্রসাদ। যে সব লোকের বাড়ি থেকে হাঁস অথবা অন্য বলি যায় না, তাদের বাড়িতে দেবার জন্য প্রত্যেক বলি থেকে দুটি ক'রে পা কেটে নিয়ে একত্র ক'রে কুটে তাই ভাগ ক'রে পাঠিয়ে দাও তাদের বাড়ি বাড়ি। নিজের বলিটির আর দুটি পা ছাড়িয়ে ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি পাঠাতে হবে। নিজেই সে চলল সে-দুটি নিয়ে। তার আগে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদটি সে ভাল ক'রে দেখে নিলে। বাঃ, বেশ হয়েছে। ঠিক আছে। পরনে আজ তার পরিষ্কার একখানি হাঁটু-বহরের কাপড়, তার কোঁচাটি উল্টে নিয়ে কোমরে গুঁজেছে, কাঁধে পরিষ্কার করা গামছাখানি পাট ক'রে ঝুলিয়েছে, কপালে পরেছে সিঁদুরের ফোঁটা। মাংস পেয়ে ঘোষ খুশী হলেন খুব, একটা সিগারেট দিলেন বনওয়ারীকে। বললেন—হ্যাঁ, আজ একটা মণ্ডল মাতব্বর ব'লে মানাচ্ছে বটে। তা এর সঙ্গে একটা সিগারেট না হ'লে চলবে কেন?

বনওয়ারী সেটিকে কানে গুঁজে ভক্তিসহকারে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরল। দু বাটি মদ সে এর আগেই খেয়েছিল। একটু বেশ নির্ভয়-নির্ভয় ঠেকছিল দিন-দুনিয়া; সে বললে—আশীর্ব্বাদ —সব আপনকারদের আশীর্ব্বাদ। ঘোষবাড়ির 'নক্ষীর' এঁটো-কাঁটায় বনওয়ারীর পিতিপুরুষের 'জেবন'। আবেগে কেঁদে ফেললে বনওয়ারী।

সান্ত্বনা দিতে গেলে ফ্যাসাদ বাড়বে—ও অভিজ্ঞতা মেজ ঘোষের স্বোপার্জিত; ধমক দিলেও ওদের মনে বড়ই লাগে তাও অজানা নয়। সুতরাং তিনি সংক্ষেপে বললেন—সে হবে বনওয়ারী, কাল হবে সে সব কথা। ওদিকে তোমার পাড়ায় আজ অনেক কাজ। দেখো, যেন কোন অঙ্গহীন না হয়।

বনওয়ারীকে এখন বিদেয় করতে পারলেই বাঁচেন ঘোষ। একে কাহার, তাতে মাতাল হয়েছে, গায়ে দুর্গন্ধ উঠছে। কিন্তু মাতাল বনওয়ারীর কথা সহজে শেষ হবে কেন, সে বললে— আজ্ঞে হ্যাঁ। একশো বার। জ্ঞানবানের কথা। তবে বনওয়ারীর জেবন থাকতে সেটি হবেন না। খুন-খারাবি হয়ে যাবে। ওই করালী—ওই যে হারামজাদা বদমাশ—অক্তের ত্যাজে মেরে ফেলালে দেবতুল্য সপ্যটিকে, ওর আমি কি করি দেখেন। তাড়াব—ওকে আমি এখান থেকে তাড়াব।

বড় ঘোষবউ বললেন—বেশ বেশ, এখন বাড়ি যাও। সন্ধ্যে হয়ে গেল, আজ পুজো দিয়েছ,

কত্তার ওখানে আজ একটা পিদীম দিয়ে, ঢাকীটাকে একবার ধুমুল দিতে ব'লো যেন। যাও। এখন ব্যবস্থা কর গিয়ে।

বনওয়ারী এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। একটি ব্যবস্থা তার ভুল হয়ে গিয়েছে। ঠিক কথা, ওঁরা জ্ঞানবান লোক, অনেক বিদ্যা ওঁদের 'ওদরে'র মধ্যে আছে, এমন প্রয়োজনীয় কথা ঠিক ওঁদের মনে পড়বেই তো! সে হাত জোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে আমি আজ যাই।

—হ্যাঁ, এসো—এমন ক্ষেত্রে গম্ভীর ভাব রক্ষা করতে মেজ ঘোষ অদ্বিতীয়। অন্য সকলেই অল্প অল্প হাসছিল, কিন্তু ঘোষ একেবারে গম্ভীর, যেন কোন সম্পত্তি নিলামে ওঠার সম্পর্কে চিন্তান্বিত মুখে আলোচনা করছেন তাঁর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সঙ্গে।

বনওয়ারী চ'লে গেল, খুব দ্রুতপদে হনহন ক'রে চলল। প্রদীপ দিতে হবে, ঢাকীকে বলতে হবে বাবার স্থানে ধুমুল দেওয়ার জন্য। তার হয়েছে এক মরণ। এই যে মাতব্বরি, এর চেয়ে ঝক্‌মারির কাজ আজ আর কিছু নাই। রাজার দোষে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের দোষে গ্রাম নাশ; প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গ্রামের পাপে মণ্ডলের মাথায় বজ্রপাত। হে ভগবান!

পাড়ায় এসেই হাঁকডাক শুরু ক'রে দিলে, পিদীম—পিদীম চাই একটা। কাচা কাপড়ের সলতে দে। ভাঁড় ছেঁকে ত্যাল দে, অন্নশালের ত্যাল দিস না যেন।

পান্নুকে সে পাঠালে বায়েনপাড়া। ধুমুল দিতে হবে।

প্রদীপটি নিয়ে সে দু পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাতাস দিচ্ছে। তার স্ত্রী গোপালীবালা এগিয়ে এসে একটি 'টোকা' অর্থাৎ চুপড়ি হাতে দিলে।

বনওয়ারী বললে—বাঃ! হ্যাঁ, এ সব কাজে মেয়েদের বুদ্ধিই খেলে ভাল। ঠিক হয়েছে। প্রদীপটিকে টোকার আড়াল দিয়ে সে চলল। কত্তার থানে যেতে হ'লে পথে আটপৌরেপাড়ার উত্তর প্রান্তের ঝাঁকড়া বটগাছতলাটা পার হতে হয়। বড়ই অন্ধকার স্থান। টোকার আড়ালে প্রদীপের আলো ঢেকে গেছে। গাছতলাটা থমথম করছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে বনওয়ারী থমকে দাঁড়াল। কে ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদছে যেন?—কে?—কে গা?

গাছতলায় একটা সাদা মূর্তি ব'সে রয়েছে। এগিয়ে গেল বনওয়ারী।

—কে? প্রদীপটার উপর থেকে টোকাটা সরিয়ে নিয়েই সে চমকে উঠল।—কালোবউ? কালোশশী? এ কি? এ কি? হ্যাঁ, সে কালোশশীই বটে। বুকের ভিতর যেন ঢাক বেজে উঠল। অন্ধকার এই গাছতলায় একা কালোশশী!

মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে এসে কালোশশী কাঁদছিল। পরম তাকে বেশ ঘাকতক দিয়েছে। গোপনে সে যে হাঁসবলি পাঠিয়েছিল বনওয়ারীর কাছে, সে কথাটা পরমের কাছে গোপন থাকে নাই। কেউ ব'লে দেয় নাই, কিন্তু পরম নিজেই ধ'রে ফেলেছে। কত্তার ওখানে পরম একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, পূজো না দিলেও প্রণাম জানাবার জন্য গিয়েছিল; সেই সময় বলি দেবার জন্য যখন হাঁসটার মাথায় সিঁদুর দিচ্ছিল পুরুত, তখনই তার সন্দেহ হয় হাঁসটা তার বাড়ির হাঁস ব'লে। কিন্তু সেখানে কোন গোল করে নাই। বাড়ি এসে হাঁসের হিসেব ক'রে দেখেছে একটি হাঁস কম। অমনি বাক্যব্যয় না ক'রে কালোশশীকে ঘরে পুরে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে,

এবং এই গোপন পুজো দেওয়া যে কালোশশীর কর্তার প্রতি ভক্তির জন্য নয়, পুজোর উদ্যোক্তা বনওয়ারীর প্রতি প্রীতির আতিশয্যের নিদর্শন, সেই কথাটা অত্যন্ত কুৎসিত ভঙ্গি ক'রে পরম তাকে বার বার ক'রে বলেছে—আমি কবে মরব তাই জানি না, লইলে সব জানি, সব বুঝি, বুয়েছিস ? পরিশেষে কয়েকটা কুৎসিত অশ্লীল সম্বোধনে সম্বোধিতও করেছিল কালোশশীকে। প্রহারের বেদনার জন্যই সে রাগ করেছে, এবং সেই ক্ষোভের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে তার অভিমান জেগে উঠেছে তার অদৃষ্ট এবং বিধাতার উপর। তাই ঘর ছেড়ে গ্রামের বাইরে গাছতলায় ব'সে সে কাঁদতে এসেছে।

বনওয়ারীর সঙ্গে সে কিন্তু ছলনা করলে। আসল কথা গোপন করলে. বললে—এসেছিলাম কত্তাকে পেনাম করতে। মানত করলাম একটা।

বনওয়ারী বললে—তা কাঁদছিলা কেনে ভাই ?

—কাঁদছিলাম মনের বেথায়।

—মনের বেথায় ?—কেঁদে ফেললে বনওয়ারী। কালোশশীর মনের ব্যথা। সে ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারীর মদ্যসিক্ত নরম মনকে ব্যাকুল ক'রে তুললে।—কি তোমার মনের বেথা ভাই ?

—আমার বেথা আমার কাছে ভাই ; যাকে বলবার, যার বুঝবার, সেই বুঝবে। বললাম —আমার যেন 'মিত্যু' হয়।

—কেনে ভাই ? এমন মানত কেনে করলে ভাই ? কি তোমার বেথা, কি তোমার অভাব— আমাকে বলবে না ?

—কি হবে বেঁচে ? ছেলে নাই, পুলে নাই। সোয়ামী, না, কসাই—

বনওয়ারী তার মাথায় হাত দিয়ে বললে—হবে—হবে। আমি বলছি, তোমার সন্তান হবে। দেখো তুমি।

হঠাৎ প্রদীপের আলোটা নিবে গেল। চুপড়ির আড়ালের মধ্যে থেকে প্রদীপটার বাইরের বাতাসে নেববার কথা নয়। বাতাস নয়, ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে দিলে কালোশশী। ব্যাকুলভাবে সে বনওয়ারীর খালি হাতখানি জড়িয়ে ধরলে। কালোশশীর মুখেও মদের 'বাস' উঠছে।

হাঁসুলী বাঁকে বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকার বাসা বেঁধে থাকে। সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ধেয়ে ঘনিয়ে আসে সে, অন্ধকার বাঁশবন থেকে বসতির মধ্যে। প্রদীপটা নিবে যেতেই সে অন্ধকার ছুটে এল যেন কোপাইয়ের বুক থেকে হড়পা বানের মত। সেই তমসার মধ্যে মদের নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারী এবং কালোশশী বিলুপ্ত হয়ে গেল। এতক্ষণে কালোশশী সব কথা বললে বনওয়ারীকে। বনওয়ারী অনেক কাঁদল। তার ব্যথার কথাও সে বললে। তারও সন্তান নাই। সে জানে সন্তানহীনতার দুঃখ। এত বড় মাতব্বর সে, দু-দু বিঘে জমি, খানিকটা ঘাসবেড়, এতগুলি গরু, হাল, বলদ, এ সব কি হবে ? কি দাম এ সবের ? কিন্তু আজ আর তার কোনও উপায় নাই। তা ছাড়া আজ এই এমন মুহূর্তে কালোশশীর কাছে সত্য গোপন করবে না ; তার স্ত্রীকে সে কখনই কালোশশীর মত ভালবাসে না। কিন্তু কি করবে

সে ? তাদের মধ্যে সাঙার রেওয়াজ আছে, কিন্তু ওর পক্ষে—ঘাড় নাড়লে বনওয়ারী। অন্য কেউ হ'লে তার পক্ষে সম্ভব ছিল এমন কাজ। সে বনওয়ারী—পাড়ার মাতব্বর।

কালোশশী বললে—আমারই কি আর তাই সাজে ভাই! সে কথা আমি বলি নাই। হঠাৎ কালোশশী চমকে উঠল। বললে—কে যেন গেল! আমি বাড়ি যাই। তুমি যাও, ঠাকুরতলায় পিদীম দিয়ে পাড়ায় যাও।

—দাঁড়াও, পিদীম আবার জ্বেলে আনি।

এইবার কালোশশীই বললে—পিদীম নিয়েছ, ধূপ কই ? শুধু পিদীমে সন্জে দেওয়া হয় নাকি ?

ঠিক কথা। ঠিক বলেছে কালোশশী। কালোশশী যে চন্নপুর-ফেরতা মেয়ে; এ কথা কালোশশী ছাড়া আর কে বলতে পারবে ?

চন্নপুরে বাবুদের বাড়িতে কালোশশী অনেকদিন 'ছোটলোক' ঝিয়ের কাছ করেছে। বাবুরা বলে—ছোটলোক ঝি। এদের মেয়েরা এঁটো-কাঁটা আঁস্তাকুড় ধোয়, বাসন মাজে, ছেলেপিলের ময়লা কাপড় সাফ করে, দু'বেলা খেতে পায়, বছরে দু'খানা কাপড়ও মেলে, মাইনে চার আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত—যার যেমন বাড়ি, যেমন কাজ। কাহারপাড়ার মেয়েরা জাঙলে সদ্‌গোপদের বাড়িতে ভোরবেলায় গিয়ে কাজ ক'রে বাড়ি ফেরে। চন্নপুর এখান থেকে অনেকটা দূর, সেখানে যাওয়া চলে না এবং সেখানেও অনেক 'ছোটজাত' আছে, তারাই করে সেখানকার কাজ। কেবল কালোশশীই চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়ি কাজ করেছে বছর দুয়েক। সেবার একটা ডাকাতির মকদ্দমায় পরমের আড়াই বছর জেল হয়েছিল। সেই সময় কালোশশীকে চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়িতে কাজ ঠিক ক'রে দিয়েছিল বড়বাবুদের হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ভূপসিং মহাশয়। সেইখানেই থাকত তখন কালোশশী। ভূপসিং মহাশয় তখন কালোশশীর মালিক হয়েছিলেন। ব্যাপারটায় নিন্দা অবশ্যই আছে, নিন্দাও হয়েছিল; কিন্তু নিন্দনীয় কর্মমাত্রই অমার্জনীয় অপরাধ নয় সমাজে। ওদের সমাজে এটা এমন নিন্দনীয় কর্ম নয়, যার মার্জনা নাই। কারণ ভূপসিং মহাশয় জাতিতে উচ্চবর্ণ, ছত্রী, গলায় পৈতে আছে, তা ছাড়া তিনি বাবুদের বরকন্দাজ। যাক সে কথা। পরম ফিরে এসে কালোশশীকে ঘরে এনেছে। এ সব রীতিনীতি কালোশশী সেখানেই শিখে এসেছে।

বনওয়ারী আবার পাড়ায় ফিরে ধূপ প্রদীপ নিয়ে গেল।

প্রদীপটা কয়েক মুহূর্ত জ্বলেই নিবে গেল বাতাসে।

ধূপটা পুড়তে লাগল, কর্তাতলার সরীসৃপসঙ্কুল প্রান্তরের মধ্যে বাতাসের সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ওদিকে গ্রামের মধ্যে তখন মাতন লেগেছে, ঢোলক বাজছে, গান চলছে সমবেত কণ্ঠে। আঃ, তবু আজ পাগল কাহার নাই। পাগল কাহার বাঁশবাঁদির গায়েনদার, গান বাঁধে, গান গায়, সে থাকলে আরও জমত। এও বেশ জমেছে। বয়স্কদের মোটা গলার সঙ্গে ছেলেদের মিহি জোরালো মিঠে গলার সুর; শিঙের সঙ্গে সানাইয়ের মত মিহি-মোটা সুরের শিল্পময় বুনন বুনছে। মেয়েরাও মদ খেয়েছে। তাদেরও বসেছে স্বতন্ত্র আসর। সে আসরের মূল গায়েন সুচাঁদ; সে

আজ খুব খুশী। কত্তার পূজো হয়ে গিয়েছে, পূজোর মত পূজো, বলিদান, ঢাক, মদ—কোন খুঁত নেই। পাকি আধ সের দুধ ধরে, এমন বাটির তিন বাটি মদ খেয়েছে সে। সুচাঁদ নাচছে কখনও, গান গাইছে কখনও, কখনও বলছে সেকালের রোমাঞ্চকর গল্প। তাদের আমলের মনে মনে রঙ-ধরাধরির কথা, কে ছিল কার ভালবাসার মানুষ—উচ্চ হাসি হেসে সেই সব কথা ব'লে যাচ্ছে। কখনও বলছে, নীলকুঠীর আমলের সাহেবদের গল্প, কুঠী উঠে গেলে কাহারদের কষ্টের কথা।

—কাহারপাড়ার সে এক 'মনন্তরা'। আমার মা বলত, বাবার মা বলত, সে এক 'ভেষণ' অবস্থা। হাড়ির ললাট—ডোমের দুগ্‌গতি। বান এল, সেই বানে কুঠী ভাসল—তা কাহার-পাড়া। কাহারপাড়ায় সাগর জল। সে জলের 'সোরোত' কি! ঘর-দুয়োর প'ড়ে গেল। গরু-বাছুর-ছাগল ম'রে ঢোল হয়ে ফুলে বাঁশবনে আটকে থাকল কতক, কতক ভেসে গেল। লোকেরা গাছে উঠে ব'সে থাকল চি-পুত্ত-মা-বুন নিয়ে। মায়ের কোল থেকে কচি ছেলে ঘুমের ঘোরে হাত থেকে খ'সে টুপুস ক'রে প'ড়ে গেল বানের জলে। আমাদের বনওয়ারীর এক জ্যেঠা ছিল—বাবার বড় ভাই, সে তখন দু'বছরের ছেলে—সে প'ড়ে যেয়েছিল। আরও যেন কার কার ছেলে যেয়েছিল প'ড়ে। গাছের ডালেই ঠুকুস ক'রে ঘাড় লটকে ম'রে গেল পেহ্লাদের কত্তাবাবা। ওই হারামজাদা করালীর কত্তাবাবা ছিল তখন মায়ের প্যাটে। ভর্তি-ভর্তি দশ মাস। গাছের ডালেই পেসব হ'ল ছেলে। তাতেই নাম হ'ল—ষষ্ঠীদাস। গাছটি ছিল ষষ্ঠীগাছ। ডাকত নোকে 'গেছোষষ্ঠী' ব'লে। ওই হারামজাদা করালী এমন ডাকাবুকো কেন? গেছো-ষষ্ঠীর ঝাড় ব'লে।

তার পর সে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

বসন বললে—মরণ, এর আবার হাসি কিসের?

পাখী নেশায়-রঙিন চোখ বিস্ফারিত ক'রে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, বাইরে সে মজলিসটিকে লক্ষ্য করছে, মনে মনে স্বপ্ন রচনা করছে। ওর কান রয়েছে করালীর বাড়ির আসরের ধ্বনির দিকে। করালীর বাড়িতে করালী আলাদা আসর বসিয়েছে। করালী কাউকে ভয় করে না, সে কারও কাছে হার মানে না, ঘোষকেই সে আজ প্রণাম করে নাই, তো বনওয়ারী! সেই মুণ্ডু-ছেঁড়া হাঁস তিনটে রান্না হয়েছে। চন্নপুর থেকে বোতলবন্দী পাকি মদ এসেছে। নসুবালা নাচছে। জ'মে উঠেছে তাদের আসর। পাখীর মন নাচছে। আষাঢ় মাসে ঘনঘটা ক'রে মেঘ এলে তালচড়ুই যেমন নেচে নেচে ওড়ে, তেমনই ভাবে উড়ে যেতে ইচ্ছা করছে। তার মনে রঙের সঙ্গে মদের নেশায় উত্তেজনা যোগ দিয়েছে। সে যাবেই করালীর বাড়ি। এদের মজলিসটা ভাঙলে হয়, কি নেশাটা আরও খানিক জ'মে উঠলে হয়। ওদিকে সেই ডাকাবুকোর অর্থাৎ করালীর মজলিস ভাঙলে হয়। তার সঙ্কল্প আজ দৃঢ়।

সুচাঁদ গাল দেবে—দিক। বনওয়ারী শাসিয়েছে—শাসাক। সে মানবে না কারও শাসন। সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বুকে।

বনওয়ারী আজ পাড়ার মজলিসে ব'লে দিয়েছে—যদি আপন আপন থাকতে চাও তো সে ভাল কথা; যার যা খুশি কর; কারুর দায় হায় কারুর নাই, কে মরল, কে থাকল দেখাদেখি নাই, বাস্, ভাল কথা; আমি বাঁচি, মাতব্বরি আমি চাই না, করব না। আর তা যদি না হয়, দায়

যদি পুরতে হয় আমাকে, তা হ'লে আমার কথা মেনে চলতে হবে। ওই করালীর মতন চাল-চলন—এ চলবে না। কথাটা সে বলবার সময় দু-তিনবার পাখীর দিকে চেয়ে কথা বলেছে। বলুক।

নিমতেলে পানু—ওই লিকলিকে চেহারা, ধূর্ত চাউনি-ভরা চোখ—ওই দুষ্টটাই সর্বাগ্রে সমর্থন করেছে বনওয়ারীকে। যত নষ্টের মূলে হ'ল ওই। করালীর নামে ওই সাতখানা ক'রে লাগিয়েছে। সেদিন চন্নপুরে সাপটা নিয়ে যাবার সময় কি সব কথা করালী বলেছিল, তা-ই একটাকে সাতখানা ক'রে লাগিয়েছে। ওই নষ্টই তুলেছিল পাখীর কথা।

কূট কেটে বলেছে—বসন আর পাখীকে শুধাও কথা। তারা তোমার কথা মানবে তো করালীর উঠানে পাখীর যে ফাঁদ পাতা আছে। হি-হি ক'রে সে হেসেছে।

পাখী পাখা ঝাপটে নখ-ঠোঁট মেলে আক্রমণ করত পানুকে, কিন্তু তার আগেই বসন্ত তাকে থামিয়ে দিয়েছে। পাখীর ওই একটা দুর্বলতা। মাকে সে দুঃখ দিতে পারে না। কি ক'রে দেবে? মা তো তার শুধু মা নয়—তার পরাণের সখী। এমন মা কারও নাই। পাখী অকপটে বলে সকল কথা তার মাকে। বসন কখনও মেয়েকে তিরস্কার করে না। সে তার চুল বেঁধে মুখ মুছিয়ে দেয়। ঠাট্টা ক'রে বলে—ভাল হয়েছে কি না করালীকে শুধাস। এই মায়ের অপমান সে করতে পারে, না, তাকে দুঃখ দিতে পারে?

সে জানে, করালীর ঘরে সে গেলে কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তার মা বসনকে সবাই বিঁধে মারবে। সেই ভয়েই এতদিন সে কিছু করে নাই। তবে আজ আর নয়। আজই সে যাবে, আজ যেন মন বলছে, যেতেই হবে।

ওঃ। কি আষাঢ়ে এক গল্প ফেঁদেছে দিদি-বুড়ী অর্থাৎ সুচাঁদ, তার আর শেষ নাই। টুকরো টুকরো ক'রে এই গল্প—এই আঠারো বছর বয়সের গোটা জীবনটাই শুনে আসছে পাখী। অরুচি ধরেছে তার ওই গল্পে, বিশেষ ক'রে আজ এই মুহূর্তে।

হা-হা ক'রে হাসছে সুচাঁদ—সে হাসি আজ রাত্রে আর থামবেই না বোধ হয়। করালীর বাবার বাবা বন্যার সময় গাছের উপর জন্মেছিল, সেই নিয়ে বুড়ী হাসছে। তা নিয়ে এত হাসি কিসের? বুড়ী ডাইনী ডাকিনী, করালীকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

সেজন্য কিন্তু হাসে নাই সুচাঁদ। বন্যার দুর্যোগে—গাছের ডালে জীবন বাঁচাতে মানুষ যখন বিব্রত, তখনও কিনা কাহার-কাহারনীর মন-মাতানো রঙের খেলা। সেই কথা বলতে গিয়ে সুচাঁদ না হেসে পারে। হায় হায় রে। কাহার-কুলের মনে রঙের খেলার বিরাম নাই। কি মনই তাদের দিয়েছিল বাবাঠাকুর। বলতে বলতে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করে সুচাঁদ। গাছের ডালে ব'সে মানুষ অনাহারে রয়েছে, শীতে কাঁপছে, হু-হু করে বাদলের বাতাস বইছে, নীচে পাথার বান, কোপাইয়ের বুকে গোঁ-গোঁ করে ডাক উঠেছে, সেই সময়ে কিনা ওই নিমতেলে পানুর ঠাকুরদাদার বাবার তৃতীয় পক্ষের পরিবার রঙ লাগালে আটপৌরেদের পরমের কত্তাবাবার সঙ্গে। ওরা ছিল এক গাছে, এরা ছিল এক গাছে। চোখে চোখে কি খেল হ'ল, কখন হ'ল দু'জনার, কে জানে। সেই দুর্যোগে—কে-ই বা উদিকে মন দেয়। পরমের কত্তাবাবার তখন ছোকরা বয়েস; তার উপর কুঠীর সাহেবদের আটপৌরে; খাতির যত, হাঁক-ডাক তত।

আর ছুঁড়ীরও তখন অল্প বয়েস, বুড়ো স্বামী—ইংলি-বিংলি সতীনপোর ঝাঁক, সে থাকবে কেনে তার ঘরে? এমনিতেই থাকত না।. আশ্চর্যের কথা মা, তার ছুদিন তর সইল না, ওই গাছের উপর ব'সেই চোখে চোখে অণ্ড খেললে! ভোরবেলা সবাই ঢুলছে; শব্দ উঠল—ঝপ। ব্যস্। কেবল বনওয়ারীর কত্তামা—ছেলের 'শোগে' ঘুমোয় নাই, সে চেঁচিয়ে উঠল। সবাই জাগল—দেখ্ দেখ্, কে পড়ল! নিমতেলে বুড়ো কেঁদে উঠল—ও মাতব্বর, আমার বউ পড়েছে। পড়েছে তো পড়েছে, যে গেল সে যাক। কি করবি বল্? আর করবেই বা কি? বুড়ো কাঁদতে লাগল। ওমা! সকাল হ'লে লোকে দেখলে, আটপৌরেদের গাছে পরমের কত্তাবাবার ডালে ব'সে আছে সে মেয়ে।

আবার হাসতে লাগল সুচাঁদ।

রতনের স্ত্রী বললে—তা হ'লে মজার 'মনন্তরা' বল?

সুচাঁদ এক মুহূর্তে হাসি থামিয়ে মদের নেশায় লাল, চোখ বিস্ফারিত ক'রে মুখ তুলে চাইলে, মাঝ উঠানে জ্বলছিল যে কাঠের পাতার ধুনিটা তার ছটা পড়ল মুখে, হাঁড়ির মত বুড়ীর মুখখানা কেমন হয়ে উঠেছে যেন। সে বললে—মজা! হ্যাঁ, সে মজা যেন আর কখনও না হয়। মজা হ'ল তা'পরেতে। বান নেমে গেল। ভিজে দেয়াল 'ওদ' আর বাতাস পেয়ে ছড়দাড় ক'রে ধসতে লাগল। গাঁয়ের মাটি ভিজে সপসপ করছে, চার আঙুল ক'রে পলি পড়েছে, দাঁড়াবার থান নাই। গরু মরেছে, বাছুর মরেছে, ছাগল মরেছে, শুয়োর মরেছে, মানুষ মরেছে; চারিদিকে পচা দুগ্‌গন্ধ; ধান চাল ভেসে গিয়েছে, কাঁথা-কানি ভিজে ভবভব করছে। কুঠীর সায়েবের চাকর ছিল বেয়ারারা, সায়েব মেম মরেছে, কুঠী ভেসে গিয়েছে। কে গুরু, কে গোঁসাই তার ঠিকানা নাই। মুনিব নাই। মুনিব নাই, 'অক্ষে' করবে কে? আগের কালে বান আসত, কাহারপাড়া ডুবত, সায়েবরা ছিল—তারা বড় বড় তক্তা বেঁধে ভেলা ক'রে কাহারদের নিয়ে যেত কুঠীবাড়িতে। চাল দিত, ডাল দিত, হুকুম দিত—খিচুড়ি রাঁধ, খাও। ঘর ভাঙলে ঘরের খরচ দিত, খোরাক দিত। কাহারেরা ছিল পাহাড়ের আড়ালে। ঝড় আসুক, ঝাপ্‌টা আসুক, বান আসুক, কাহারদের ভাবনা ছিল না। আর এবার কাহারদের পিথিমী অন্ধকার হয়ে গেল। সায়েব ম'ল, মেম ম'ল, কুঠী বিকিয়ে গেল। তার ওপর সেবার সে কি 'ওগ'! সে এক মহামারণ। জরজ্বালা, প্যাটের ব্যামো; কে কার মুখে জল দেয়—এমুনি হাল। দু-তিন ঘর 'নিব্যুনেদ' হয়ে গেল। তখন সব যে যার পরাণ নিয়ে পালাতে আরম্ভ করলে। কেউ গেল কুটুমবাড়ি, কেউ গেল ভিখ করতে হেথা-হোথা। বিদেশ-বিভূঁয়ে কত জনা যে ম'ল তার ঠিকেনা নাই। তা'পর দেশ ঘাট শুকুলো, মা দশভুজার পূজোর সময় যারা বেঁচে ছিল একে একে ফিরল গাঁয়ে। ফিরল যদি তো—সে আর এক বেপদ। সে বেপদের কাছে বানের বেপদ কোথা লাগে। সায়েবদের কুঠী উঠে যেয়েছে, বেবাক জমিদারী 'হকহুকুক' কিনেছে চৌধুরী। সেই যে যখের ধন দিয়েছিলেন কত্তা, সেই টাকায় সায়েবদের সব কিছু কিনেছে তখন চৌধুরী। ঘর নাই, দুয়োর নাই, 'আশ্চয়' নাই, চাকরি নাই, কাহারেরা এসে 'অত্তান্তরে' পড়ল, চোখে পিথিমী অন্ধকার হয়ে গেল। কি হবে? কোথা যাবে? কে চাকরি দেবে?

সায়েবদের আমলে দুখানা পাল্কি, কুঠীতে চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতে হ'ত, ষোলো জন বেহারা মোতায়েন থাকত। সায়েবরা কি বেহারাকে জমি দিয়েছিল দশ বিঘে ক'রে আর বাস্তু-ভিটে। জমি চাষ কর, খাও দাও, আর সায়েব-মেমকে নিয়ে সাওয়ারী কাঁধে বেড়াও। তার ওপর 'বকশিশ' ছিল, হেথা হোথা বিয়ে-সাদীর বায়না ছিল। আরও ছিল তোমার নীলের চাষ। তাও সবাই খানিক-আধেক দুবিঘে পাঁচবিঘে করত। তা'পরে তোমার সায়েবদের যখন দাঙ্গা হ'ত—এই ধর কোন 'ভদ্দ-লুদ্দ্দের' জমির ধান ভেঙে নীল বুনতে হ'ত, কি পাকা ধান কেটে নিতে হ'ত তখন কাহারেরা ছিল সায়েব মশায়দের ডান হাত। সায়েবদের লেঠেল যেত, ওই আটপৌরেরাও লেঠেলদের সঙ্গে লাঠি নিয়ে যেত। তারা পাহারা দিত, আর বেহারা-কাহারেরা হাল গরু নিয়ে দিত পোঁতা জমি ভেঙে, চ'ষে-ম'ষে তছনছ ক'রে নীল বুনে দিত, পাকা ধান হ'লে কেটে-মেটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তুলে নিয়ে চ'লে আসত বাড়ি। ধান যে যা আনত সে তো পেতই, তার ওপর ছিল নগদ নগদ 'বশকিশ'। সে ছিল কাহারদের সোনার আমল। সায়েবরা গেল, কাহারদের কপাল ভাঙল। চোখে অন্ধকার দেখবে না কাহারেরা? আমলই পালটিয়ে গেল। চৌধুরী বেবাক চাকরান জমি খাস করে নিয়েছে এখন। বললে—আমার তো পাল্কি বইতে হবে না বারো মাস, বেহারাদের চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতেও হবে না—চাকরান জমি আমি দোব কেনে? কেড়ে নিলে মা জমি। জমি বাড়ি ঘর সব গেল। অন্ধকার, তিভুবন অন্ধকার মা। বুক চাপড়িয়ে কেঁদেছিল কাহারেরা। আমার মা বলত, তখন আমার মা ভরাভরতি সোমত্ত মেয়ে; তার এক বছর পরে আমি প্যাটে হই। মা বলত—কাহারেরা বুক চাপড়িয়ে কেঁদেছিল, সে কান্নায় পুজো-বাড়ির ঢাকের বাদ্দি ঢাকা প'ড়ে যেয়েছিল। যে প্যাটের জ্বালায় গাঁ ছেড়ে দিয়ে ভিখ মাগতে গিয়েছিল কাহাররা, কুটুমবাড়িতে 'নেনো' হয়ে ছিল এতদিন মা, সেই প্যাটের জ্বালা পাসরণ হয়ে গেল। হাঁড়ি চড়ালে না; 'আন্না-বান্না' দূরে থাক্, পুজো-বাড়ির পেসাদ—সেও কেউ মাগতে গেল না। তা'পরে হ'ল কি মা, শেষকালে 'নউমী' পুজোর দিনে সে এক অবাক কাণ্ড! হঠাৎ চৌধুরী বললে—যা, ভিটেগুলো তোদের ছেড়ে দিলাম, ভিটে থেকে তোদের বাস তুলে দোব না, সে বজায় রাখলাম। ওই চাকরানটুকু রইল, কালে-কস্মিনে পাল্কির দরকার হ'লে বইতে হবে। তবে জমি পাবি না। হ্যাঁ, কৃষাণি মান্দেরী কর্—থাক্। কাহাররা তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পিতিপুরুষদের ভিটে থাকল 'মনস্তরায়', এই ভাগ্যি। চৌধুরীকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ ক'রে বিজয়া দশমী থেকে ঘর তুলতে লাগল সব প'ড়ো ভিটেয়। সেও তোমার ওই কত্তামশায়ের দয়া। চৌধুরীকে তিনি স্বপন দিয়ে দিয়েছিলেন অষ্টমির 'আত্তে'—মানুষকে ভিটেছাড়া করতে নাই, কাহারদিগে তুলে দিলে আমার 'ওষ' হবে তোর ওপর। তাতেই 'নউমীর' দিন সকালে উঠে চৌধুরী ভিটে ছেড়ে দিলে।

থামল সুচাঁদ। সমস্ত মজলিসটা হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শুনে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মত হ'য়ে আছে, মদের নেশায় আবেগপ্রবণ মস্তিষ্কে সেকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার মধ্যে নেশার স্রোত ছুটছে কোপাইয়ের হড়পা বানের মত। সেই বানের উপর কল্পনায় সেকালের নৌকো ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে চৌধুরী-বাড়ীতে ভেসে আসা সেই যক্ষের নৌকোর মত।

পঞ্চ-শব্দের বাজনা বাজিয়ে আলো ঝলমল হয়ে যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে নড়ছে। সব ভাম হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ ঢুলছে, কার যেন নাক ডাকছে। শব্দ উঠেছে নানা রকমের, হাসি আসে শুনে।

বসন বড় ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে, সে মদও কম খেয়েছে—মৃদু হেসে রতনের স্ত্রী কুসুমকে বললে—মরণ, নাক ডাকছে কার লো ?

কুসুমও চারিদিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—কে লো, কার নাকে শুয়োর ঢুকল বটে ? ঘোঁত ঘোঁত করছে কে লো ?

সুচাঁদ ওদের মুখ নড়া দেখতে পেয়ে মুখটা এগিয়ে এনে প্রশ্ন করলে—অ্যাঁ ?

পাখী এবারে উঠে পড়ল বিরক্ত হয়ে। নাঃ, এরা আর ঘুমোবে না। ওদিকে করালীর ঘরেও মজলিসে তেহাই পড়বে না। সে উঠে মাকে বললে—আমি শুতে চললাম মা।

—খেয়ে শুবি। আর খানিক ব'স।

—না।

কুসুম চিমটি কাটলে বসনের পায়ে। কুসুম বসন্তের সখী, সে সবই জানে ভিতরের কথা। বসন্ত একটু হেসে বললে—যা তাই। ঘুমোস না যেন।

সুচাঁদ একটু বিরক্ত হয়ে বললে—কি বলছিস লো ? অ্যাঁ ?

চীৎকার করে বসন্ত বললে—পাখী শুতে চলল। তাই বলি—ঘুমোস না যেন।

সুচাঁদ সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দু'হাত নেড়ে একটা ছড়া কেটে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা জোর হাঁক জেগে উঠল কোথা থেকে। হাঁসুলী বাঁকের অন্ধকার চমকে উঠে সতর্ক হ'ল ; ওঃ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে। সুচাঁদও চমকে উঠেছিল—পাখীকে কথাটা তার বলা হল না, তার বদলে বিস্মিত হয়ে বললে—ও মা গো! থানাদার হাঁক দিচ্ছে ? ইয়ের মধ্যে ? বলি হা বসন, ট্যান পুল পেরিয়ে গেল কখন! কই বাস্তির মত শব্দ তো ওঠে নাই ?

সত্যিই ট্রেন যাওয়ার শব্দ এখনও ওঠে নাই।

পাখী যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে ব'লে গেল—মদ খেয়ে মেতে আনন্দের আর সীমে নাই। আজ অবিবার মনে আছে ? আজ সেই ভোরবেলাতে গাড়ি।

তাই বটে, সে কথা কারও খেয়াল নাই। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেন যায় না, যায় ভোর রাত্রে।

—কি ?

—আজ 'অবিবার'।

হ্যাঁ, মনে পড়ল সুচাঁদের। পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে বললে—তা শ্যাল ডেকেছে পহরের ? শুনেছিস ?

—কই, না। যে গল্প তুমি বলছিলে।

ঠিক এই সময়েই খানিকটা দূরে শোনা গেল কার খুব গম্ভীর গলার আওয়াজ—পরম।

পরম। পরম আটপৌরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা জোরালো টর্চের আলোর লম্বা ফালিতে আটপৌরে-পাড়ার অন্ধকার চিরে ফেললে। সকলে আশ্বস্ত হ'ল। না, রাত্রি বেশি হয় নাই। থানার বাবুরা কেউ এসেছে 'দাগী' দেখতে। মধ্যে মধ্যে সপ্তাহে একদিন ক'রে আসে থানার বাবুরা। ওরা এই সকালো সকালোই আসে। পরম আটপৌরে দাগী। এই জাঙলে সদ্গোপ-বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল কয়েক বছর আগে। পরম ডাকাতির দলে অবশ্য ছিল না, কিন্তু তুলুক-সন্ধান সে-ই দিয়েছিল। মালও বেরিয়েছিল তার ঘরে। জেল হয়েছিল পরমের। পরম দাগী আসামী।

সকলেই ভাল হয়ে বসল। পুরুষদের মজলিসে গান বাজনা গোলমাল সংযত হ'ল। করালীর বাড়ির মজলিসের বাজনা একেবারে থেমে গেল। থানার বাবু এ পাড়া পানেও আসবে একবার। আটপৌরে পাড়ায় এলে এ পাড়াও ঘুরে যায়। এ পাড়ায় দাগী এখন কেউ নাই, কিন্তু এককালে ছিল। এককালে কাহারপাড়ার সকলেই দাগী ছিল বললেই সত্য কথা বলা হবে। সে কারণেও বটে, তা ছাড়া—'অজ্ঞান' জাত, কার কখন মতিভ্রম হয় কে বলতে পারে? তাই বোধ হয় বাবুরা দেখে যান। বনওয়ারী বলে—ওঁরা যে আসেন, তাতে আমি খুশি। নিজের চোখে দেখে যান আমাদের রীতকরণ, আর আমাদের মধ্যে যারা মনে মনেও 'চুলবুল' করে তারাও জ্ঞান পাক, 'সতর' হোক, মনকে সামাল দিক।

এই যে করালীর মত বেহেট-বেতরিবৎ ছোকরা, এদের শাসন কি শুধু মাতব্বর থেকে হয়? বনওয়ারী ঠিক করে রেখেছে আজ বলবে—দারোগা হোক, ছোট দারোগা হোক, যে আসবে তাকেই বলবে করালীর কথা। রতনকে সে বললে—তোর সেই বড় 'কুকুড়ে'টা ঠ্যাঙে বেঁধে নিয়ে আয় দিনি।

বাবুরা যেদিন আসেন, সেই দিন কুকুড়ে অর্থাৎ মুরগী আর হাঁস—কিছু না হলে কয়েকটা ডিম কাহারেরা ভেট দিয়ে থাকে। আজ বড় মুরগী একটা দিতে হবে ঠিক করলে বনওয়ারী। রতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল। উপায় নাই, মাতব্বরের কথা, তা ছাড়া তার ছেলে লটা লচ্ছার করালীর দলে জুটেছে। লটা শাসনের বাইরে; বাপের সঙ্গে ভিন্নই হয়েছে তো শাসন। কিন্তু তবু তো তার বাপের পরাণ। কি জানি, কখন কুদৃষ্টিতে পড়বে বাবুদের। আগে থেকে একটু বলে রাখা ভাল।

বনওয়ারী হাঁকলে—শিগ্‌গির কর। বাবু আসছে।

নীলের বাঁধের উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর আলোর ছটা উঠে হেঁড়ে তালগাছটার মাথায় গিয়ে পড়েছে। দুটো প্যাঁচা ছটা পেয়ে ক্যাঁ-চ ক্যাঁ-চ শব্দ ক'রে উড়ে গেল। বাবু মাঠ থেকে পাড়ের উপর উঠছেন। জুতোর শব্দ বাজছে পাষাণের মত কঠিন মাটিতে। এইবার সামনাসামনি আসছে টর্চের আলো। বাবু এসে পড়েছেন।

বাবু এসে দাঁড়ালেন। প্রণাম করলে সব। নিমতেলে পানু ছুটে গিয়ে একটা মোড়া নিয়ে এল। বাবু বসেন না ওটাতে, পা দিয়ে দাঁড়ান। বাবু হেসে বললেন—কি রে, আজ যে খুব ধুম দেখি।

নতির স্বীকৃতি জানিয়ে বনওয়ারী একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে মুখের সামনে বাঁ হাতের আড়াল দিয়ে জবাব দিলে—পাছে মুখের 'আব' অথবা গন্ধ গিয়ে লাগে তাই সতর্কতা ; বললে—আজ্ঞেন হুজুর, আজ কত্তার থানে পুজো দিলাম কিনা।

বাবু বললেন—আচ্ছা, ভাল।

রতন বড় মুরগীটা এনে নামিয়ে দিলে সামনে। টর্চের আলোটা সেটার উপর ফেলে বাবু খুশি হয়ে বললেন—বেশ বড় জাতের যে রে, অ্যাঁ ?

—আজ্ঞেন হ্যাঁ। আজ কত্তার পুজো দিলাম ; আপনাকে কি আর যা-তা 'দব্য' দিতে পারি ?

—বেশ। বেশ। তা তোদের মধ্যে করালী কার নাম ?

মনে মনে বিস্মিত হ'ল সকলে। বনওয়ারী চকিতে অনুভব করলে বাবাঠাকুরের অদ্ভুত মাহাত্ম্য। ওঃ। এরই মধ্যে করালীর বদ রীতি-চরিত্রের কথা দারোগাকে তিনি জানিয়েছেন। মনে মনে বাবাকে প্রণাম ক'রে বনওয়ারী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোঁড়াটা বড়ই আজ্ঞেন—বেজায় আজ্ঞেন—

করালীকে অভিযুক্ত করার মত বিশেষণ খুঁজে পেলে না বনওয়ারী।

কিন্তু দারোগা বললেন উল্টো কথা—হ্যাঁ, বাহাদুর ছোকরা। ছোকরাকে পাঠিয়ে দিবি থানায়। বকশিশ পাবে কিছু। গোটা পাঁচেক টাকা পাবে।

—বকশিশ পাবে ?

—হ্যাঁ। আমরা শিসের কথা ডায়েরি করেছিলাম, ওপরেও গিয়েছিল খবর। এখন যখন সাপটাই শিস দিচ্ছিল, আর সেই সাপ ওই ছোকরা মেরেছে—সে খবরও পাঠিয়েছি। পাঁচ টাকা বকশিশ ও পাবে।

বাবু চ'লে গেলেন। মুরগীটা নিয়ে গেল চৌকিদার।

কাহারপাড়াটা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদের বিস্মিত মনের দৃষ্টির সামনে করালী যেন নতুন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে হাসছে। গোলালো বুক ফুলে উঠেছে, গালে টোল খেয়েছে, সুন্দর মিষ্টি হাসিতে সুন্দর সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিক করছে।

মেয়েদের মজলিসে হঠাৎ গোল উঠল।

করালীর বকশিশের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল, হঠাৎ তাদের সুমুখ দিয়ে কে ছুটে পালিয়ে গেল।

হাতের চুড়ি রিন রিন শব্দে বেজে উঠল।

—কে ? কে ?

—পাখী। পাখী। একজন জবাব দিলে—পাখী ছুটে চ'লে গেল।

—পাখী। পাখী। ও পাখী।—বসন্ত ডাকলে তারস্বরে।

পাখী শুতে যাবার জন্য উঠছিল, এই সময়েই এলেন ছোট দারোগা। সে দরজার মুখে ঢুকছিল, ছোট দারোগা করালীর নাম করতেই থমকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা শুনে সেও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে মজলিসকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সাদা কাপড়ের দোলায় বাতাসে খানিকটা ঝলক তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বসন্ত ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এল—পাখী শোন্। পাখী!

দূর অন্ধকারের ভিতর থেকে জবাব এল—না। আমি চললাম।

পাখী বললে—যার ওপর আমার মন পড়েছে, আমি তারই ঘরে চললাম।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় তুফান বানে ঝাঁপ খেয়ে যুবতী বউ পালায় যার উপরে মন পড়ে তার কাছে, তার গাছের উপরে তার পাতা সংসারেই গিয়ে উঠে বসে। পাখীর মা বসন্ত যৌবনে নিত্য রাত্রে বেশভূষা ক'রে একাই চ'লে যেত চৌধুরীবাবুদের গাঁয়ের ধারের বাগানে, কোনদিন ফিরত গভীর রাত্রে, কোনদিন ভোরবেলা। পাখীও আজ চ'লে গেল ছুটে করালীর বাড়ি।

এর পর আসছে একটা কুৎসিত ঝগড়ার পালা। তারপর হয়তো লাঠি—মারপিট—মাথা-ফাটাফাটি। করালী তো হটবার পাত্র নয়!

ঝগড়ার পালাটা জমিয়ে তুললে সুচাঁদ। কর্কশ কণ্ঠে উচ্চ কণ্ঠে সে গালি-গালাজ আরম্ভ করলে। করালীর নিজের মা বোন কি কোন স্ত্রীলোক আত্মীয়া নাই। কিন্তু নসুদিদি আছে। নসুদিদি এতক্ষণ নাচছিল, পায়ে নূপুর বেঁধেই সে বেরিয়ে এল ঝগড়া করতে। মেয়েদের মত কোমরে কাপড় জড়িয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে, অঙ্গ দুলিয়ে সুচাঁদের সঙ্গে সমান জোরাল ভাষায় ঝগড়া জুড়ে দিলে।

সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ ক'রে নিমতেলে পানু। হঠাৎ সকলে চমকে উঠল। একটা কঙ্কালসার মানুষ টলতে টলতে এসে দাঁড়িয়েছে মজলিসের সামনে। এখনও টলছে। কে? কে?—ও, নয়ান এসেছে। হেঁপো রোগী নয়ান। ওই নয়ানের সঙ্গেই ছেলেবেলায় পাখীর বিয়ে হয়েছিল। তখন অবশ্য নয়ান হাঁপানীর রোগী ছিল না, এবং নয়ান তখন ছিল পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাল পাত্র। নয়ানের ঠাকুরদাদা ছিল সে আমলে কাহার-পাড়ার মাতব্বর। সেই আমল থেকেই চৌধুরী-বাড়ির ভাগজোতদার নয়ানেরা। দু'বিঘা নিজের জমিও আছে নয়ানের। সেই সব দেখেই বিয়ে দিয়েছিল সুচাঁদ। হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে নয়ান ঘায়েল হয়ে গেল প্রথম যৌবনেই। সারল, কিন্তু হাঁপানী ধরে গেল। পাখী বলে—যে গন্ধ ওর 'নিশেষে' আর যে বুকের ডাক! সে সহ্য করতে পারে না, তার ভয় লাগে। সে কিছুতেই যাবে না ওর বাড়ি। আজ দু'বৎসর ধ'রেই এই বিরহের পালা চ'লছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় নাই। আজ হয়ে গেল। মৃতপ্রায় নয়ান এমন ক্ষেত্রে না বেরিয়ে পারলে না। টলতে টলতে এসে ব'সে পড়ল, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে চাপড় মেরে বনওয়ারীকে বললে—তুমি এর বিচার কর। বিচার কর তুমি।

কিন্তু বনওয়ারী ব'সে রইল মাটির পুতুলের মত। সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। করালী এবং পাখীর ঘটনায় তার বার বার মনে পড়ছে সন্ধ্যার কথা; মনে পড়ছে কালোশশীকে। সে উৎসাহ পাচ্ছে না। সে যেন মাথা তুলতে পারছে না।

নয়ান কান্নায় চীৎকার করে উঠল—মাতব্বর!

বনওয়ারী হতভম্বের মত বললে—কি বলব?

রতন বললে—না না। এ ভারি অন্যায়। তুমি চুপ করে থাকলে হবে না বনওয়ারী।

গাঁ সুদ্ধ ছেলে মাটি হ'ল ওই হারামজাদার সঙ্গে জুটে।

বনওয়ারী তবু স্তব্ধ।

ওদিকে হঠাৎ মেয়েদের ঝগড়ার আসরের সুর পালটে গেল। অকস্মাৎ সুচাঁদ আর্তনাদ ক'রে উঠল—মর্মান্তিক আর্তনাদ। কি হ'ল? নসু মারলে নাকি ধ'রে? প্রহ্লাদ, রতন, নিমতেলে পানু ছুটে গেল। কি হ'ল?

সুচাঁদ আর্তনাদ করে লাফাচ্ছে। মুখে একটা ভয়ার্ত শব্দ শুধু। চোখের দৃষ্টিতে বিভীষিকার ছায়া। সে যেন মৃত্যুকে দেখছে চোখের সম্মুখে।

বুঝতে বাকি রইল না কারও কিছু।

ব্যাঙ দেখেছে সুচাঁদ। ব্যাঙকে সুচাঁদ মৃত্যুদূতের মত ভয় করে। ব্যাপারটা ঘটেছে এই—

সুচাঁদ প্রচণ্ড চীৎকারে গালিগালাজ করছিল। করালী হঠাৎ এসে শাসিয়ে তাকে বলে—চুপ কর্‌, নইলে দোব ছেড়ে।

অর্থাৎ ব্যাঙ ছেড়ে দেবে।

সুচাঁদ মানে নাই সে কথা। ব্যাঙ যে কেউ তার গায়ে ছেড়ে দিতে পারে—এ তার ধারণার অতীত ছিল। চন্নপুরে বাবুদের ছেলেরা কখনও কখনও এমন ঠাট্টা করে; কিন্তু এ গাঁয়ে এমন সাহসই বা কার, এমন হৃদয়হীনই বা কে? করালীর যে সেই সাহস সেই হৃদয়হীনতা আছে, তা সে জানত না। কিন্তু করালী সত্যিই একটা ব্যাঙ ধ'রে এনেছিল। সুচাঁদ ক্ষান্ত হ'ল না দেখে, সেটাকে সে তার উপর ছুঁড়ে দিয়ে নসুকে টেনে নিয়ে বাড়ি চ'লে গিয়েছে।

পাখী খিলখিল ক'রে হাসছে করালীর বাড়িতে।

এদিকে বসন্ত দুই হাতে জাপটে ধরেছে মাকে। সুচাঁদ তবু লাফাচ্ছে। মেয়েরা সব মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে। প্রহ্লাদ ব্যাঙটা ফেলে দিয়ে এক বাটি মদ এনে সুচাঁদের মুখের কাছে ধরলে।—খাও পিসী। চোখ বন্ধ ক'রে তৃষ্ণার্তের মত পান ক'রে নিলে সুচাঁদ, তারপর বুকে হাত দিয়ে প্রহ্লাদের কোলের মধ্যেই নিজেকে এলিয়ে দিল।—আঃ—আঃ। তারপর হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

প্রহ্লাদ বললে—ভয় নাই, ফেলে দিয়েছি, ফেলে দিয়েছি ব্যাঙ।

ওদিকে করালী পাখীকে নিয়ে তখন বেরিয়ে পড়েছে বাঁশবাঁদি থেকে। এই রাত্রির অন্ধকারেই তারা যাবে চন্নপুরে। নসুদিদিও চলল। বনওয়ারীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে কাহারপাড়ার সকলকে বিরোধী ক'রে থাকতে তার সাহস হ'ল না।

দূরে রেল-লাইনের উপর সিগ্‌নালের লাল আলো জ্বলছে। ওই চন্নপুর। করালীর দুর্গ ওইখানে। ওখানে যেতে কাহারদের সাহস নাই। নসুবালা হঠাৎ গান ধরলে। করালী ধমক দিয়ে বললে—চুপ কর্‌। সে ভাবতে ভাবতে চলছে, কেমন ক'রে এর শোধ তুলবে সে। শোধ তাকে তুলতেই হবে।

ওদিকে বনওয়ারী ভয়ঙ্কর মূর্তিতে করালীর বাড়িতে এসে দেখলে, করালী নেই—বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

কয়েক দিন পর।

হাঁসুলী বাঁকে পৃথিবীর সঙ্গেই যথানিয়মে রাত্রি প্রভাত হয়। সেখানে ব্যতিক্রম নেই। গাছে গাছে পাখী ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে। বাঁশবনের মাথা থেকে, বনশিরীষ নিম আম জাম কাঁঠাল শিরীষ বট পাকুড়ের মাথা থেকে টুপটাপ ক'রে শিশিরবিন্দু ঝ'রে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুলই ফোটে। পূর্ব দিকে নদীর ধার পর্যন্ত অবারিত মাঠের ওপারে—কোপাইয়ের ওপারের গ্রামে গোপগ্রামের চারিপাশে গাছপালার মাথায় সূর্য ওঠে। কিন্তু কাহারেরা জাগে সূর্য ওঠার অনেক আগে। পূর্বের আকাশে তখন শুধু আলোর আমেজ লাগে মাত্র, পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা জলজল করে। কাহাররা ওঠে সেই সকালে। আপন আপন প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে মেয়েরা ঘরে দোরে জল দেয়, মাড়ুলি দেয়, সামান্য যে বাসন কয়েকখানি রাত্রে উচ্ছিষ্ট হয়ে থাকে—সেগুলি মাজে। গরু ছাগল বার করে তাদের জায়গায় বাঁধে। হাঁসগুলিকে ছেড়ে দেয়, কলরব ক'রে তারা ছুটে গিয়ে নামে নীলের বাঁধের জলে, নেমেই ছুটে আসে ঘাটে, এঁটো বাসনের খাদ্যকণাগুলো মুখ ডুবিয়ে খুঁজে খুঁজে খায়। মুরগীগুলোকে ছেড়ে দেয়, তারা ছুটে যায় আঁস্তাকুড়ে, সারের গাদায়। পুরুষেরা প্রাতঃকৃত্য সেরে এই সকালেই ঘরে দোরে যে মাটির কাজগুলি থাকে, কোদাল নিয়ে সেই কাজগুলি সেরে ফেলে। পাষাণের মত মাটি—মেয়ে-পুরুষে আগের দিন সন্ধ্যায় কলসীতে ভ'রে জল তুলে ভিজিয়ে রাখে, সকালে কাহার মুনিষ তার উপর কোদাল চালায়। মাটির কাজ কিছু-না-কিছু থাকেই। পুরোনো দেওয়াল মেরামত চলতে থাকে ধীরে-সুস্থে। নূতন ঘর যদি কেউ করে, তার কাজ চলে দীর্ঘদিন ধ'রে। কিছু না থাকলে বাড়ির ধারে শাক-পাতার ছোট ছোট ক্ষেত কোপায় তারা। বাড়ির গাছা পেটের বাছার মতই গেরস্থের সহায়। গোটা শীতকালে এই ধারা।

এই সব সেরে তারপর কাহারেরা কাজে বার হয়।

সুচাঁদ ভোরে ওঠে। ঝাঁটা দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করতে করতে তারস্বরে গাল দিচ্ছে। আজ আর তার ভাষা অশ্লীল নয়—মর্মান্তিক অভিশাপ-তীক্ষ্ণ, এবং সে অভিশাপের মধ্যে দুঃখ লাঞ্ছনা, নিয়তির নিপুণ বিধানের মত স্তরে স্তরে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজানো।

—যে 'অঙ্কের' 'ত্যাজে' এমন বাড় হয়েছে, সে অঙ্ক জল হয়ে যাবেন তোমার। 'গিহিনী' 'ওগ' হবে, 'ছেরউগী' হয়ে প'ড়ে থাকবে, ওই পাথরের মত ছাতি ধসে যাবে, হাড় পাঁজর ঝুরঝুর করবে। যে গলার ত্যাজে হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ফিরছ, সেই গলা তোমার নাকী হয়ে পাখীর গলার মত চিঁ-চিঁ করবে। যে হাতে তুমি আমাকে ব্যাঙ দিয়েছ, যে হাতে তুমি

বাঁশবনে আগুন লাগিয়ে মা-মনসার বিটীকে পুড়িয়ে মেরেছ, সেই হাতদুটি তোমার প'ড়ে যাবে, কাঠের মত শুকিয়ে যাবে। ভাবতাকে যদি আমি পুজো ক'রে থাকি, অতিথকে যদি আমি সেবা ক'রে থাকি, তবে আমার কথা ফলবে—ফলবে—ফলবে। হে বাবা কত্তা, হে মা মনসা, হে বাবা জাঙলের 'কালারুদ্দু', হে মা চন্নপুরের চণ্ডী, হে মা বাকুলের বুড়ীকালী, হে বাবা বেলের ধম্মরাজ, তোমরা এর বিচার ক'রো—বিচার ক'রো।

বোধ করি হঠাৎ সুচাঁদের মনে প'ড়ে গেল চোখের কথা—চোখ নিয়ে তো কোন অভিশাপ দেওয়া হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নিয়ে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করলে। ওই যে তোমার ড্যাবা চোখ, ওই চোখ তুমি হারিও। দিন 'আত' জল ঝ'রে ঝ'রে ছানি পড়ুক। কানা হ'য়ো তুমি—কানা হ'য়ো তুমি—কানা হ'য়ো। ওই ড্যাবা চোখ তোমার, 'আণ্ডা' 'অক্তের' ডেলার মতন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে 'বিভীষ্‌কার' হয়ে যায় যেন।

এটি একটি বিশেষত্ব হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ার। ঝগড়া হ'লে সে ঝগড়া একদিনে মেটে না। দিনের পর দিন তার জের চলতে থাকে এবং প্রাতঃকালে উঠেই এই গালিগালাজের জেরটি টেনে তারা শুরু ক'রে রাখে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে থামে। আবার জিরিয়ে নিয়ে অবসর-সময়ে নিজের ঘরের সীমানায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষ পক্ষের বাড়ির দিকে মুখ ক'রে এক-এক দফা গালিগালাজ করে। এবং কাহারদের ঝগড়ায় এই গালিগালাজের এই বাঁধুনিটি পুরুষানুক্রমে চ'লে আসছে,—একে কলহ-সংস্কৃতি বলা চলে। তবে সাধকভেদে মন্ত্রের সিদ্ধি—এই সত্য অনুযায়ী সুচাঁদ এই বৃদ্ধ বয়সেও সর্বশ্রেষ্ঠা। ওদিকে আরও একজন গাল দিচ্ছে করালীকে—সে হ'ল নয়ানের মা। সে গাল দিচ্ছে করালীকে একা নয়, পাখীকেও শাপ-শাপান্ত করছে।

হাঁপানীর রোগী নয়ান উঠে ব'সে কাশছে আর হাঁপাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বুকের উপর ধর্মরাজের এক মোটা মাদুলি—হাঁপানীর আক্ষেপে চামড়া-ঢাকা পাঁজরার সঙ্গে সঙ্গে উঠছে আর নামছে। তার বাড়ির সামনেই একই উঠানের ওদিকে রতনের বাড়ি। রতন কোদাল চালানো শেষ ক'রে ব'সে হুঁকো টানছিল আর গালাগালি শুনছিল।

হাঁপানীটা একটু থামতেই নয়ান দাওয়ার বাঁশের খুঁটিটা ধ'রে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টিতে তার অমানুষিক প্রখরতা ফুটে বেরুচ্ছে। এইসব দীর্ঘ দিনের রোগীর চোখের রঙ বোধ হয় একটু বেশি সাদা হয়। নয়তো জীর্ণ দেহ এবং কালো রঙের জন্যই নয়ানের চোখ দুটো বেশি সাদা দেখাচ্ছে।

রতন বললে—উঠলি যে ?

—হুঁ।

—কোথায় যাবি ?

—যাব একবার মুরুব্বির কাছে।

—যেতে হবে না। ব'স।

—না। এর একটা হেস্তনেস্ত—

—মুরুব্বি বেরিয়ে যেয়েছে।

—বেরিয়ে যেয়েছে। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে রতনের দিকে, যেন অপরাধটা রতনের।

নয়ান আবার প্রশ্ন করলে—এই 'সোমকালে' গেল কোন্ ভাগাড়ে? কেউ তো এখনও যায় নাই?

রতন বললে—মাইতো ঘোষ এই সকালের 'ট্যানেই' কোথায় যাবে; ঘোষেদের চাকর এয়েছিল, ভারী মোট আছে—নিয়ে যেতে হবে চন্নপুরের ইষ্টিশান।

—তা হ'লে? হতাশ হয়ে পড়ল এবার নয়ান।

—তা হ'লে আর কি করবি? বাড়িতে ব'সে আগে জল গরম ক'রে আরসোলা 'সিজিয়ে' খা। হাঁপটা নরম পড়ুক।—হাজার হলেও রতনের বয়স হয়েছে, মাতব্বরের বয়সী, বন্ধুলোক; খোদ মাতব্বর না হলেও প্রবীণ। স্নেহবশেই সে উপদেশ দিলে।

নয়ানের মা বাসন মাজতে মাজতে গাল পাড়ছিল, সে হঠাৎ ছাইমাখা হাতে এগিয়ে এসে হাত দুটো রতনের মুখের কাছে নেড়ে বললে—তুমি তো মাতব্বরের ডান হাত। সলা-শুলুক-গুজগুজ তো খুব! বলি, মাতব্বরের এ কোন্ দিশী বিচার, এ কোন্ ঢঙের মাতব্বরি, শুনি? এ অন্যায়ে একটি কথাও বললে না তোমার মাতব্বর? বিচার করবার ভয়ে সকালে উঠে পালাল?

রতন বললে—তা আমি কি বলব? তোমরাই তাকে ব'লো।

—বলব বইকি, একশো বার বলব। ছাড়ব আমি? জমিদারের কাছে যাব, থানা-পুলিস করব।

—তা যা খুশি তুমি করতে পার। তবে সকালে উঠে বিচারের লেগে মাতব্বর ব'সে থাকবে—এ তোমাদের ভাল 'নেকরা' বটে।

নয়ানের মা বলল—মাতব্বর তোমার খুব 'আঁতের' নোক—তুমি বল কেনে, শুনি।

বিরক্ত হয়ে রতন হুঁকাটি রেখে গামছাখানা টেনে গায়ে চাদরের মত ফেলে বেরিয়ে পড়ল। সূর্য উঠে পড়ছে গোপগ্রামের গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে। রোদ এসে বাঁশবাদির ঘরগুলির চালের উপর পড়েছে; বনওয়ারীর সদ্য-ছাওয়া চালের নতুন খড়ের উপর যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে।

একা রতন নয়, গ্রামের পুরুষেরা সকলেই বেরিয়েছে—নীলের বাঁধের উত্তর পাড় থেকে সরু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নামছে জাঙলে যাবার মাঠে পথে।

মেয়েরাও সব এর পর বার হবে। সাতটার ট্রেন তাদের নিশানা।

হাঁসুলী বাঁকের এই জীবনই স্বাভাবিক জীবন। মন্থর গতিতে পায়ে-হাঁটা আলপথে পদাতিকের জীবন তাদের। কথাটার মধ্যে একবিন্দু অতিরঞ্জন নাই। হাঁসুলী বাঁকে গরুর গাড়ির পথ পর্যন্ত নাই। জাঙল গ্রাম পর্যন্ত গরুর গাড়ির পথ এসে শেষ হয়েছে। বহু আগে এগুলি ছিল চারণভূমিতে গরু নিয়ে আসবার পথ। 'নিয়ে আসবার' বলছি এই জন্য যে, বহু প্রাচীন ভদ্র মহাশয়দের গ্রাম—ওই চন্দনপুর থেকে সেকালে গরু চরতে আসত এই হাঁসুলী বাঁকের চরে। জাঙল পর্যন্ত ছিল রাস্তা—গো-পথ, তারপরই ছিল হাঁসুলীর ঘেরের মধ্যে গোল তক্তির মত চারণভূমি। তারপর নীলকুঠীর সাহেবেরা এসে ডাঙায় কুঠী ফাঁদলে, গো-চরভূমি ভেঙে জমি ক'রে সেচের পুকুর কাটিয়ে বাঁশবাদির মাঠে নীল-চাষ ও ধান-চাষের পত্তন করলে, এই পুকুরপাড়ে কাহারবসতি বসালে। যে পথে চন্দনপুরের গরুর পাল আসত, সে পথে গরু আসা বন্ধ হ'ল। ওই পথকে মেরামত ক'রে তার উপর চলতে লাগল নীলকুঠীর মালের গাড়ি এবং

সাহেবদের পাল্কি ও ঘোড়া। চন্দনপুরের ভদ্র মহাশয়দের জাঙলের মাঠে জমিজেরাত আছে চিরকাল, তাঁদের গরুর পালের সঙ্গে গাড়ি যাতায়াত করত এই পথে—মাঠের ধান ঘরে নিয়ে যেত, সেই গরুর গাড়ির যাতায়াত বজায় রইল শুধু। আজও সে পথে তাঁদের ধান-কলাই-গুড়-বোঝাই গাড়ি চলে। বাঁশবাঁদির কাহারদের,পায়ে-চলা-পথের চেয়ে ভাল পথের দরকারও ছিল না কোন কালেই। তারা পায়ে হেঁটেই চলে, সে হিসাবে পদাতিক, কিন্তু সেকালে তারা পদাতিক ছাড়া আরও কিছু ছিল; পেশা হিসাবে ছিল বাহক,কাঁধে পাল্কি নিয়ে সাহেব-মেমদের বইত, বর-কনে বইত। কখনও কখনও জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাবার জন্য বায়না আসত। সকলের আগে যে বেহারা থাকত, সে সুর ক'রে বলত সওয়ারীর ছড়া, অন্য সকলে সমস্বরে হাঁকত—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। চারিদিক সরগরম ক'রে তারা চলত দ্রুতবেগে। আজকাল তাদের এ পেশাটা গৌণ হয়েছে। বিয়ে ছাড়া ওদের আর ডাক পড়ে না এই কর্মের জন্য। তবে বহনের কাজটা বজায় আছে, পাল্কি-বহা কাঁধে ভার বয়। সে দেড় মণ বোঝা নিয়ে যায় দশ ক্রোশ পর্যন্ত। বিশ ক্রোশও যায়, তবে পথে এক রাত্রি বিশ্রাম করতে হয়। মাথায় বোঝা বইতে হয় আজকাল বেশি। বাহকত্ব ছাড়া চালকত্ব-গৌরবও আছে; হালের বলদ চালায়, গরুর গাড়িও চালায়। সুতরাং সে গতি আরও মন্থর, তাই পায়ে-চলা-পথ ছাড়া অন্য পথের অভাব তারা অনুভব করে না।

পথ চলতে চলতে হুঁকো টানে, মধ্যে মধ্যে হাত বদল ক'রে গল্প হয়। এই মন্থর জীবনের গতানুগতিক কথাই হয় পরস্পরের মধ্যে। রোমন্থন বলা যায়। আজ কিন্তু সকলেই একটু উত্তেজিত। আজ কথা চলছে—গত কয়েক দিনের ঘটনার আলোচনা। তার মধ্যে বনওয়ারীর ব্যবহারের সমালোচনাই বেশি। বনওয়ারীর অন্যায় হয়েছে—এ কথা সকলেই একবাক্যে বলছে। নিমতেলে পানু বেশ গুছিয়ে এবং চিবিয়ে কথা বলতে পারে। সে-ই বলছিল—

—মাতব্বর যদি শাসন করতে 'তরাস' করে,তবে দুষ্ট নোকে 'অল্যায়' করলে তার শাসন হবে কি ক'রে? 'আজা' হীনবল হ'লে 'আজ্য' নষ্ট। এতবড় 'অল্যায়ে' মুরুব্বি বাক্যিটি বার করলে না মুখ থেকে!

—'নিচ্চয়'। তবে চলুক এই করণ কাণ্ড; তোমার 'পরিজনকে' আমি টেনে নিয়ে যাই। আমার পরিজন গিয়ে উঠুক 'অতনার' ঘরে।—কথাটা বললে প্রহ্লাদ।

রতন পিছন থেকে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—আমার নাম মাইরি ক'রে না বলছি। আমি কাল 'সব্বাগ্যে' মাতব্বরকে বলেছিলাম, এ 'অ্যালয়' হচ্ছে মাতব্বর। তবে নিজের নিজের বউ-বিটী নিজে নিজে না সামলালে মাতব্বরই বা করবে কি? মাতব্বর পাহারা দিয়ে ব'সে থাকবে?

প্রহ্লাদ চীৎকার ক'রে উঠল—বলি হা শালো, মাতব্বর করালীকে শাসন করতে লারত?

সকলের পিছনে নীলের বাঁধের ঘাটের উপর থেকে চীৎকার ক'রে কেউ বললে—কার দশ হাত ল্যাজ গজালছে রে শুনি, করালীকে শাসন করবে তার নাম কি?

শব্দ লক্ষ্য ক'রে সকলে চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে, বক্তা করালী নিজে।

নীলের বাঁধের উত্তর পূর্ব কোণের পথটা বেয়ে ঘাটে করালী উঠছে। চন্দনপুর থেকে আসছে নিশ্চয়। সেই সেদিন রাত্রে পালিয়েছে পাখীকে নিয়ে, ফিরছে আজ সকালে। সম্ভবত কোন

জিনিসপত্র নিতে এসেছে। দাঁড়িয়ে হাসছে। সঙ্গে তার পাখী ও নসুদিদি।

রতন প্রহ্লাদ পানু এবং অন্য সকলেই করালীর কথায় ফিরে দাঁড়াল।

তবু তাচ্ছিল্যভরে হাসছে করালী। পানু অন্য সকলকে বললে—দেখ সব, একবার ভাল ক'রে দেখ। পিতিকার করতে না পার, তোমরা গলায় দঁড়ি দাও গা।

চীৎকার ক'রে উঠল প্রহ্লাদ—কিলিয়ে তোমার দাঁত ভেঙে দোব গা।

করালী হা-হা ক'রে হেসে বললে—এস কেনে একা একা, কেমন মরদ দেখি!

পাড়ের উপর থেকে পানুদের দলের অনুসরণ ক'রে নেমে এল মাথলা এবং নটবর। ওদেরও গন্তব্যস্থল জাঙল, ওরাও সেখানে কৃষাণি করে।

রতন বললে—চল্ চল্। এখন আর পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের 'খিটকাল' করতে হবে না।

সে ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চায়। করালীর দলে রতনের ছেলেও রয়েছে যে।

করালী কিন্তু অকুতোভয়, কারও ভয়ে সে চাপা দিয়ে রাখতে চায় না। সে চেঁচিয়েই ব'লে দিল—তোমাদের মাতব্বরকে দেখেছি সেদিন। তোমরাও দেখতে চাও তো এস।

ঘাড় নেড়ে ভুরু নাচিয়ে সে বললে—সেদিন একহাত মুরুব্বির সঙ্গে হয়ে যেয়েছে।

সকলের কাছে এ উক্তিটা একটা অসম্ভব সংবাদের মত। বনওয়ারী কোশকেঁধেদের বংশের ছেলে, পাকা বাঁশের মত শক্ত মোটা হাড়ের কাঠামো তার। কাহারপাড়ায় কেন, কাহারপাড়া, আটপৌরেপাড়া জাঙল তিন জায়গায় তার মত জোরালো মুনিষ নাই; বনওয়ারী শক্ত মুঠোয় লাঙল ক'ষে টিপে ধরলে টানতে মাঝারি বলদের পিঠ ধনুকের মত বেঁকে যায়, ঘাড় লম্বা হয়ে যায়। তার সঙ্গে একহাত হয়ে গিয়েছে করালীর? বলে কি শয়তান ডাকাত? শুধু তাই নয়, শয়তানের কথার ভঙ্গির তাচ্ছিল্যের মধ্যে যে ফলাফলের ইঙ্গিত রয়েছে, সে কি কখনও হতে পারে—না, হয়। কিন্তু সকলের মধ্যে মুখের সামনে জোর গলায় যে একটা স্পষ্ট সত্যের ঘোষণা রয়েছে তাও তো মিথ্যে ব'লে মনে হচ্ছে না। সকলে অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইলে।

করালীকিঙ্কর এতেও ক্ষান্ত হ'ল না; সে আরও একদফা হেসে নিয়ে বললে—তোদের মাতব্বর তো মাতব্বর, তোদের কত্তার বাহনকেই দেখে লিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে শাসন ক'রে পাখী বললে—আবার! আবার! আবার!

হি-হি ক'রে হাসতে লাগল করালী। নসুদিদি তো হেসে উলটে পড়ল। পাখীকে সে বললে—দে বুন, দে, আরও ঘা কতক দে। আমি লারলাম ওকে বাগ মানাতে—আমি লারলাম। তু দেখ্ বুন এইবার। গদাগদ কিল মারবি, আমি ব'লে দিলাম।

করালীর এই চরম স্পর্ধিত উক্তিটি প্রত্যক্ষ সত্য। কত্তার বাহন অর্থাৎ ওই চন্দ্রবোড়া সাপটাকে মারার কথা তো সকলে চোখে দেখেছে। কিন্তু সে কথাটাকে এমন স্পর্ধায় শাণিত ক'রে বলায় সকলে আশ্চর্য রকম সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

করালী পাখী নসু কিন্তু উল্লাস করতে করতেই চ'লে গেল। কোন কথা না ব'লে মাথলা নটবরও মাঠে নেমে পাশ কাটিয়ে তাদের অতিক্রম ক'রে চ'লে গেল। ওরা নীরবেই গেল—নটবর হুঁকোটা টানছিল, বাপকে দেখে একটু খাতিরই দেখালে, কাছ বরাবর এসে নামালে হুঁকোটা

একবার। ওরা চলে যেতেই রতনের দলের চমক ভাঙল। সে-ই ছিল সর্বাগ্রে—সে চলতে আরম্ভ করলে সকলেরই পা চলল সঙ্গে সঙ্গে। চলল কিন্তু নীরবে। খবরটা শুনে যেন সকলের কথা হ'রে গিয়েছে।

হঠাৎ একটা ডাক এল সামনে থেকে। জাঙলের আমবাগান পড়ে সর্বাগ্রে। ওই বাগানের মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ। পথের উপর দাঁড়িয়ে হেদো মোড়ল তার খুব মোটা গলায় ডাকছে—অ্যাই! অ্যাই বেটা রতনা! হারামজাদা! ও-রে—গু-খোড় বেটা!

রতন জোরে হাঁটতে শুরু করল। প্রহ্লাদ বললে—ওরে বাবা রে, মোড়ল 'এগে' যেয়েছে লাগছে!

রতন বললে—পাঁচিল দেবার 'জাওন' খারাপ হয়ে যেছে, কাল দিন যেয়েছে পাঁচিল দেবার।

পানু ব'লে উঠল—আমার মুনিব মশায় আবার কি করলে কে জানে? আলু তুলতে হবে; পরশুই লাগবার কথা। কত্তার পুজোর 'পাট' পড়ে গেল। বললাম তো ব'লে দিয়েছে—উ সব আমি জানি না। আলু খারাপ হ'লে আমি নগদা মুনিব লাগাব। তোমার ভাগ থেকে কাটব।

প্রহ্লাদ পানুকে বললে—হা রে পানা, তোর মুনিবের পাল-বাছুরটার ক দাঁত হ'ল রে?

—দু দাঁত।

—এবারে জোঁয়াল গতাবে?

—তা খানিক-আধেক ক'রে না গতিয়ে রাখলে, চার দাঁত হ'লে তখন কি আর উ জোঁয়াল লেবে ঘাড়ে?

—ত্যাজ কেমন হবে বুঝছিস?

—ওঃ, বেপযয় ত্যাজ! 'লেঙুড়ে' হাত দেয় কার সাধ্যি! পাঁচন পিঠে ঠেকলে চার পায়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঘুরবে। ওকে বেচে মুনিব পিটবে একহাত।

প্রহ্লাদ বললে—আমার মুনিবকে আমি বলছিলাম বাছুরটার কথা।

—লতুন গরু কিনবে নাকি তোর মুনিব?

—হ্যাঁ। এবারে কিনবে। তিন বছর ব'লে ব'লে এ বছর 'আজী' করালছি।

—অ্যানেক টাকা লেবে আমার মুনিব। মাটি থেকে তুলতে হবে টাকা তোর মুনিবকে।

—ওরে মা। আমার মুনিব মাটিতে পুঁতলে আর তোলে না; আধ 'বাখার' ধান ছেড়ে দেবে। ধানও ছাড়তে হবে না, আলুর টাকাতেই হয়ে যাবে, লাগবে না। তিন বিঘে আলু রে! সোজা কথা! কাঠা-ভুঁই দু পন্থরি খোল দিয়েছে, 'সালপেট আলুমিনি' দিয়েছে। কাঠাতে ফলন—দু মণ, তা হেসে খেলে—হ্যাঁ, তা খুব।

ওরা অ্যামোনিয়াকে বলে—'আলুমিনি', অ্যালুমিনিয়মকে বলে—'এনামিলি'।

—অতনকাকার মুনিবের আলু কেমন গো? গাছ তো হলছিল বাহারের!

রতনের উত্তর দেবার অবসর নাই। খুব দ্রুতপদেই সে হেঁটে চলেছে। ইচ্ছে হচ্ছে এক লাফ দিয়ে গিয়ে মনিবের সামনে হাজির হয়। সত্যিই তার মনিবের ক্ষতি হয়েছে। মাটির 'তাক' ভারি হিসাবের জিনিস। তা ছাড়া পরিশ্রমই কি কম? গোটা একদিন মাটি কেটে, তাতে

জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরের দিন ফের দুপুর কি তিন পহরের সময় আবার একদফা জল ঢালা হয়েছে, পরের দিন ফের কাটা, জল দেওয়া এবং পায়ে খুব ক'রে ছাঁটা হয়েছে—তার উপর আবার জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সেই জল শুষে, সেই জলে ভিজে মাটি তৈরি হয়। বেশি নরম থাকলে চলে না, বেশি শুকিয়ে গেলে তো 'কাজ খারাবি'ই হয়ে গেল। সেই আবার নূতন ক'রে পাট করতে হবে। নিজের হয় তো সে কথা আলাদা, এ হ'ল মনিবের কাজ। খারাপ হ'লে মানবে কেন মনিব ? তার উপর তার মনিব যে লোক। একবারে মোষের 'কোধ'। রাগ হ'লে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। প্রকাণ্ড পাথুরে গড়নের ভারী চেহারা, মোটা গলা, থ্যাবড়া নাক, কোঁকড়া চুল, আমড়ার আঁটির মত চোখ—তাও আবার 'লালবন্ন', মোটা বেঁটে আঙুল, বাঘের মত থাবা, বুনো দাঁতাল শুয়োরের মত গোঁ। রাগ হ'লেই গাঁ-গাঁ শব্দে চীৎকার করে দমাদম কিল মারতে আরম্ভ করবে। ঠিক যেন মা-দুর্গার অসুর।

রতনও বেশ মজবুত মুনিষ। লম্বা চেহারা—লম্বা ঢঙের ইস্পাতে গড়া মানুষ। বয়স কম হয় নাই, দু কুড়ি পার হয়ে গিয়েছে—আড়াই কুড়ি হবে, কি হয়ে গিয়েছে। তবু এখনও পর্যন্ত গায়ের চামড়া কেউ চিমটি কেটেও ধরতে পারে না। সকাল থেকে হালের মুঠো ধরে, দুপুরবেলা হাল ছেড়ে কোদাল ধরে—সাড়ে তিনটের ট্রেন কোপাইয়ের পুলে উঠলে তবে কাজ ছাড়ে। ধান রোয়ার সময় হ'লে কোদাল ছেড়ে তখন নামে বীজের জমিতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত বীজ মেরে তবে ওঠে। দেড় মণ বোঝা ভার চাপিয়ে বেশ সোজা হয়েই কাঁধ দুলিয়ে দোলনের তালে তালে একটানা চ'লে যায় ক্রোশখানেক রাস্তা। এই রতনও মনিবের কিলকে ভয় করে। মনিব রাগে, চীৎকার করে, আর কিল মারে। চীৎকার ক'রে যতক্ষণ কাশি না পায়, গলা না ভাঙে, সে ততক্ষণ এই কিল চালায়। সে কিল আস্বাদন করা আছে রতনের, একটি কিলেই পিঠখানি বেঁকে যায়, দম আটকে দায়। এর ওষুধও কিন্তু ওই দম বন্ধ ক'রে থাকা আর চুপ ক'রে থাকা। কিল খাবার আগে থেকেই দমটি বন্ধ ক'রে রাখতে হয়। তা হ'লে আর কিল খেলে দম আটকায় না এবং লাগেও কম। ঘোষ মহাশয়ের ছেলেদের একটা 'বল' আছে, পিতলের পিচকারি দিয়ে বাতাস ভ'রে দেয়, ইটের মত শক্ত হয়ে ওঠে বলটা, তাতে কিল মারলে যেমন বলটার কিছু হয় না, লাফিয়ে ওঠে—তেমনি হয় আর কি। আর কিল খেয়ে যত চুপ ক'রে থাকবে, মনিব তত চীৎকার করবে রাগে। তাতে সহজেই গলা ভাঙে, কাশি পায় মনিবের। কাশি পেলেই মনিব ছেড়ে দিয়ে নিজের গলায় হাত দিয়ে কাশতে শুরু করবে।

রতন কাছে আসতেই মনিব হেদো মণ্ডল মহাশয় বললেন—ওরে বেটা শুয়োটা কাহার, বেলা কত হয়েছে রে বেটা ? কত্তার পূজো দিয়ে মদ মেরে তুই হারামজাদারা 'কেডামাতন' করবি—আর আমার 'জাওন' শুকিয়ে কাঠ হবে না কি ?

রতন ঘাড় হেঁট ক'রে কান টানতে লাগল। এটা কাহারদের সবিনয় অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গি। এর সঙ্গে, মুখে একটু হাসিও থাকা চাই—নিঃশব্দ দন্তবিকাশ। তা অবশ্যই ছিল রতনের মুখে। ওই হাসিটুকুর অর্থ হ'ল এই যে, মনিবের তিরস্কারের অন্তর্নিহিত সদুপদেশ এবং স্নেহ সে অনুভব করতে পারছে।

তা মনিব মহাশয়েরা 'ন্যাহ' করেন বইকি। তা করেন। বিপদে আপদে মনিবেরা অনেক করেন। কাহারেরা স্বীকার করে মুক্ত কণ্ঠে—অ্যানেক, অ্যানেক করেন। অসুখ-বিসুখে খোঁজ করেন, কিছু হ'লে দেখতে পর্যন্ত আসেন, পয়সাকড়ি ধার দেন, পথ্যের জন্য পুরনো মিহি চাল, আমসত্ত্ব, আমচুর এমনিই দেন; বিঘটন কিছু ঘটলেও তত্ত্বতল্লাস করতে আসেন। রতনদের দুঃখে নিজেও হেদো মণ্ডল মহাশয়েরা কাঁদেন, আপ্তবাক্য বলেন, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, তাতে সত্যই অন্তর জুড়িয়ে যায় রতনদের। আবার অন্য কোন ভদ্র মহাশয় যদি কোন কারণে-অকারণে রতনদের উপর জুলুমবাজি করতে উদ্যত হন, তাতেও মনিব মহাশয়েরা আপন আপন কৃষাণদের পক্ষ নিয়ে তাদের রক্ষা করেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে দরকার হ'লে ঝগড়াও করেন, প্রতিপক্ষ তেমন বড় কঠিন লোক হ'লে অর্থাৎ চন্দনপুরের বাবুরা হলে তখন মনিবেরা রতনদের পিছনে নিয়ে বাবুদের কাছে গিয়ে মিটিয়ে দেন হাঙ্গামাটা। ভদ্র মহাশয়দের বলেন—আপনার মত লোকের ওই ঘাসের ওপর রাগ করা সাজে? ঘাসও যা, ও-বেটাও তাই।

কখনও বলেন—পিঁপড়ে। ও তো ম'রেই আছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কি আপনার সাজে?

তারপর রতনদের ধমক দিয়ে বলেন—নে বেটা উল্লুক কাহার কাঁহাকা, নে ধর্‌, পায়ে ধর্‌। বেটা বোকা বদমাশ হারামজাদা!

পায়ে ধরিয়ে বলেন—নে, কান মল্‌, নাকে খত দে।

তাতেও যদি না মানেন—বড় কঠিন লোক বাবু মহাশয়, তবে মনিব নিজেই হাত জোড় ক'রে বলেন—আমি জোড়হাত করছি আপনার কাছে। আমার খাতিরে ওকে ক্ষমা-ঘেন্না করতেই হবে এবার। 'না' বললে শুনব না।

মোট কথা, যেমন ক'রে হোক রক্ষা করেন রতনদের।

সেই মনিব মহাশয় 'আগ' করেছেন। আজ রাগ খুব বেশি। হবারই কথা। দু দিন কামাই, তার উপর মাটি খারাপ হয়ে গিয়েছে; আজও দেরি হয়েছে খানিকটা। রতন খুব দ্রুতপদেই চলল। মাঠ পার হয়েই কুঠীর সাহেবদের আমবাগান—সেই পুরানো কালের আমবাগানের মধ্য দিয়ে জাঙলে ঢুকতে হয়। বাগানের ভিতরে ঢুকতেই মাথার উপরে আমগাছের পাতার মধ্য থেকে অজস্র পোকা উড়ে মাথায় মুখে লাগল। এবার আমগাছের মুকুলও বেশি, মধুর গন্ধে চারিদিক ভুর-ভুর করছে, পোকাও হয়েছে অসম্ভব রকমের বেশি।

হেদো মোড়ল চীৎকার করতে করতেই চলল—হারামজাদা, নেমখারাম ছোটলোক জাতেরই দোষ—তোর আর দোষ কি?

পানু বললে প্রহ্লাদকে—খুব বেঁচে গেল্‌ছে অতনকাকা, আমি বলি—লাগালে বুঝি 'আঘিড়ে' কিল গদাম ক'রে।

প্রহ্লাদ বললে—কিল খেয়ে অতনার অভ্যেস হয়ে যেয়েছে। মারলেও কিছু হত না।

আমবাগান পার হয়ে অপর প্রান্তে জাঙলের বসতি আরম্ভ হয়েছে। বালি-প্রধান একটা পথ। বর্ষায় হুড়-হুড় ক'রে জল যায় রাস্তাটা বেয়ে, তখন এটা নালা। জল চলে যায় ঘণ্টাখানেকের

মধ্যে, তখন এটা পথ। পথটা এসেছে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের কুঠীডাঙা থেকে। থমকে দাঁড়াল প্রহ্লাদ। পানু বললে—দাঁড়ালে যে গো?

প্রহ্লাদ বললে—উটো কে রে? পরমের পারা লাগছে না?

দুরে সায়েবডাঙার উপরে দুটি লোক ঘুরছে—প্রহ্লাদ দেখালে।

—তেমুনি তো লাগছে।

—সাথে কে বল দিনি?

—বড়বাবুদের সেই মোচাল চাষবাবু লয়? সেই যে গো, চুল কোঁকড়া—মিচ্ছি মাশার।

প্রহ্লাদ বললে—পরমা আমাদের তক্কে তক্কেই আছে। কোথা জমি, কোথা পয়সা—

—জমি?

—সেদিন মাতব্বরের কাছে শুনিস নাই? চন্নপুরের বড়বাবুরা কুঠীডাঙা কিনেছে, জমি করবে। বন্দোবস্তও করবে খানিক। পরম সেই তক্কে ঘুরছে।

পানু হেসে বেশ রসিয়ে বললে—ঘুরুক শালো তক্কে তক্কে পরের দুয়ারে, উদিকে শালোর ঘরে কুত্তা ঢুকে—

হাসতে লাগল পানু, যে হাসির অনেক অর্থ এবং সে অর্থ কাহারেরা 'বেদের সাপের হাঁচি চেনা'র মতই চেনে।

—কে? বাবুদের চাপরাসী মাশায় এসেছিল? তা ও তো জানা কথা।

পানু ঘাড় নেড়ে বললে—সিংয়ের কথা বলছি না। সে পুরানো কথা। সে আর কে না জানে? ভূপ সিং মাশায় ছত্তিরি বেরাম্ভন, সে কি আর কুত্তা হয়? সে হ'ল বাঘা। বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে? হুঁ-হুঁ, অন্য লোক। কাল সনজে বেলাতে—। সে এক মজার কথা।

সে হাসতে লাগল।

ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করলে প্রহ্লাদ—কে? কে? কে রে?

খুব হাসতে লাগল পানু।

—কে রে?

—সে বলব মাইরি উ বেলাতে। অ্যানেক সময় নাগবে। গতকাল সন্ধ্যায় আটপৌরে-পাড়ার বটগাছের তলায় সেই অন্ধকারের মধ্যেও পানু আবিষ্কার করেছে মাতব্বর এবং কালোবউকে একসঙ্গে। সেও ঠিক সেই সময় ওই দিকে গিয়েছিল আটপৌরে পাড়ায় তার এক ভালবাসার লোকের সন্ধানে।

বাঁশবাঁদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম কালের অন্ধকার। সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন করে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক চলে, ওদের চোখেও তখন জেগে ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নিআবিষ্কারের পূর্বযুগের মানুষের চোখের অন্ধকার-ভেদী আরণ্য-জন্তুর দৃষ্টি।

মাতব্বরের রঙের খেলা দেখে পানু অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করেছে। কৌতুকেরও বেশি একটু কিছু আছে। অন্য লোক হ'লে ওই কৌতুকের বেশি কিছু হ'ত না। কিন্তু বনওয়ারী

মাতব্বর, তা ছাড়া মানুষটাও যেন একটু অন্য ধরনের। কৌতুকের সঙ্গে জেগেছিল বিস্ময়। তাই সে কথাটা গোপন ক'রে রেখেছিল। প্রকাশ করতে সাহস পায় নাই। এবং গতকাল হঠাৎ পাখী ও করালীর কাণ্ডটা ঘটায় এ কাণ্ডটার কথাটা মনেই ছিল না বলতে গেলে। হঠাৎ পরমকে দেখে মনে প'ড়ে গেল তার আজ। আজও তার বলতে গিয়েও বলতে সাহস হ'ল না। তা ছাড়া, কথাটা বলবে কি না তাও পানু ভাবছে মাঝে মাঝে। ওটাকে নিজস্ব ক'রে রাখলে ভাঙিয়ে কিছু কিছু আদায় করতে পারবে মাতব্বরের কাছে।

পানু দল ছেড়ে গলি-পথে ঢুকল। গলির ও-মাথায় তার মুনিববাড়ি।

প্রহ্লাদ প্রমুখ কজন কিন্তু মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

কি মজার কথা! কি মজার কথা! পরমের ঘরে কে ছিল?

কথাটার কল্পনাতে সারাটা দিনের কাজ হাল্‌কা হয়ে গেল কাহারদের।

প্রহ্লাদ, ভূতো প্রভৃতি এরা কজন গম ঝাড়াই করলে। শীষ পিটিয়ে স্তুপ ক'রে তুললে। জলখাবার নিয়ে আসবে মেয়েরা, কুলো দিয়ে পাছড়ে, খোসা ঝেড়ে গম বার করবে।

জলখাবার—অন্তত দু সের মুড়ি, খানিকটা গুড়, পেঁয়াজ, লঙ্কা আর এক ঘটি জল।

পানা তুললে আলু। খুব মোটা আলু হয়েছে পানার মনিবের। পানার স্ত্রী জলখাবার নিয়ে আসবে, সেও আলু তুলবে। চারটে মোটা আলু পানা খোঁড়া-মাটি চাপা দিয়ে একটা চিহ্ন দিয়ে রেখে দিলে। পরিবারকে বলবে, পেট-আঁচলে পুরে নিয়ে যাবে! মোটা আলু বেছে মনিবই নিয়ে থাকে। মোটা আলুও খাওয়া হবে ভাত দিয়ে, নিজের ভাগে বেশি কিছু পাওয়া হবে। এই বেশি পাওয়ার আনন্দটাই এক্ষেত্রে বেশি। আর প্রহ্লাদকে দেখাতে হবে। প্রহ্লাদ বলে, বিঘে ভুঁই দু পসুরি খোল, আর 'আলুমিনি' সার দিয়েছে ওর মনিব, আলু ইয়া মোটা হয়েছে। গল্প করা প্রহ্লাদের স্বভাব। পানুর মনিবের বাছুরটা কিনবে নাকি প্রহ্লাদের মনিব! আলুর টাকা থেকেই নাকি তার টাকা হয়ে যাবে! তাই দেখাবে ওকে ওর কৃষানির জমির আলু—মনিবের সম্পদ।

নিজের মনিবকে বললে পানু—মনিব মাশায়, পল্লাদে আজ আমাদের পাল বাছুরটার কথা শুধাচ্ছিল। বলে—কত দাম? ওর মুনিব এবার গরু কিনবে?

পানুর মনিব লগন্দ অর্থাৎ নগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় বিচক্ষণ হিসাবী লোক; নাক মুখ চোখ বেশ পাতলা পাতলা চোখা গড়নের, মানুষটিও পাতলা ছিপছিপে; বেশ বাবু-মহাশয়ী ছাপ আছে। মনিব মহাশয় কিন্তু পানার কথার জবাব না দিয়ে উঠে এলেন জমিতে। যেখানটায় পানা আলুগুলি মাটি চাপা দিয়েছিল, সেখানকার মাটি খুঁড়ে আলু চারটে তুলে গামছায় বেঁধে বললেন—ভাল ক'রে দেখে খোঁড়্‌ রে বেটা, দেখে খোঁড়্‌, বাদ দিয়ে চললি যে, তাতে তোরই লোকসান। আমার আলু তো আমার জমিতেই থাকবে, সে তো আমি মাটি সরালেই পাব। হ্যাঁ, এ আলু কটির ভাগ তুই পাবি না, বুঝলি? তোর নজরের দোষের জরিমানা—ব'লে জমি থেকে উঠে আলের ওপর ব'সে আবার হুঁকো টানতে লাগলেন নিশ্চিন্ত হয়ে। ভাবটা যেন কিছুই হয় নাই। পানার বুকটা গুরগুর ক'রে উঠল। তেষ্টা পেয়ে গেল।

ওই জলখাবার আসছে। কোপাইয়ের পুলের ওপর দশটার ট্রেন শব্দ ক'রে পার হয়ে গেল। বেশ শব্দ। ঝমর-ঝম্, ঝম্-ঝম্!

ইচ্ছে ছিল জলখাবার নিয়ে গাঁয়ের বাইরে আমবাগানে সকলে ব'সে জমিয়ে গল্প করবে। বনওয়ারী-কালোশশীর কথাটা সকলে শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তারও ইচ্ছে খুব। কিন্তু মনিবের কাছে ধরা প'ড়ে পানুর সব উৎসাহ নিবে গেল। মাঠে ব'সেই জল খেতে লাগল সে। হঠাৎ বউটার উপর পড়ল তার রাগ। পানুর সন্দেহ হয়, বউটা করালীর দিকে তাকিয়ে থাকে ঘোমটার মধ্যে দিয়ে। সে তাকে রূঢ় ভাষায় গাল দিতে লাগল।

দুই

বনওয়ারী গিয়েছিল চন্দনপুর ইষ্টিশানে মনিবের সঙ্গে।

মাইতো ঘোষ ট্রেনে চাপলেন। বনওয়ারীকে চার আনা বকশিশ ক'রে বললেন—খুব ট্রেন ধরিয়েছিস। ও, বুড়ো বয়সে এখনও খুব জোর তোর। প্রশংসা করলেন তিনি।

বনওয়ারী হেঁট হয়ে প্রণাম করে হাসতে লাগল। বললে—তা আজ্ঞেন, আরও কোশখানেক এই গমনে যেতে পারি আজ্ঞেন।

ঘোষ বললেন—বাপ রে বাপ, ছুটতে হয়েছে আমাকে।

—কি করব আজ্ঞেন! চা খেতে দেরি ক'রে ফেলালেন আপুনি। সতর গমনে না এলে এনারে ধরতে লারতেন। উনি তো দাঁড়ান না। টায়েন হ'লেই ছেড়ে ছ্যান।

হাসতে লাগলেন ঘোষ। বনওয়ারী গামছা দিয়ে কপালের শরীরের ঘাম মুছলে। স্থূল গড়নের পাথরের মূর্তির মত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। কানের পাশ দিয়ে জুলপী বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে সন্তস্নান করানো কষ্টিপাথরের মূর্তির মত।

ট্রেন ছেড়ে দিলে; বনওয়ারী আবার প্রণাম ক'রে বললে—আমার 'নেবেদনটা' তা হ'লে—

—হবে। দাদাকে ব'লে দিয়েছি। আমগাছ ক'টা আর বাঁশঝাড় পাঁচটা লিখে দিস্।

—তা দিতে হবে বইকি আজ্ঞেন।

—বেশ।

গাড়ি চ'লে গেল। বনওয়ারী ইষ্টিশানের নিমগাছতলাটায় ছড়ানো ইটগুলোর মধ্যে দু'খানা টেনে উপরে উপরে রেখে একটু উঁচু ক'রে নিয়ে বসল। আর তাড়া নাই। জিরিয়ে নিয়ে একটি কাজ আছে, সেই কাজটি সেরে তবে ফিরবে। বেশ ফুর ফুর ক'রে হাওয়া দিচ্ছে; হাওয়ার সঙ্গে রয়েছে মিঠে গন্ধ—বন আউচ ফুলের সুবাস। এখানকার মাঠের আলের উপর, রাস্তার ধারে অনেক বন-আউচের গাছ। ইষ্টিশানের দক্ষিণ দিকটা একেবারে জাঙল-বাঁশবাঁদি পর্যন্ত খোলা। চন্দনপুরের মাঠ একেবারে খালি—কাটা ধানের গোড়া ছাড়া আর কিছু নাই। খাঁ-খাঁ করছে বাবুলোকের গ্রাম। এ গ্রামের মাঠে অন্য ফসল হয় না এখন। হয়, তবু বাবু মহাশয়দের ওদিকে

খেয়াল নাই। ধান ছাড়া আর সবই তাঁরা খরিদ ক'রে খান। মেলা পয়সা, বিস্তর টাকা—কেনই-বা এই সব চাষের হাঙ্গামা তাঁরা করবেন! এই যে চন্দনপুরের বড় বাবুরা জাঙলের কুঠীডাঙাটা কিনলেন, ওখানে কি ওঁরা এই সব চাষ করবেন ব'লে কিনলেন? চৌধুরীদের অবস্থা খারাপ হয়েছে—মা-লক্ষ্মী ছেড়েছেন, ওরা সবই বিক্রি করছে, পতিত ডাঙাটাও বিক্রি করলে। মাইতো ঘোষ নিজে ব'লে গেলেন—ঘোষেরা কিনতে চেয়েছিলেন ওটা। কিন্তু ঘোষেদের কাছে বিক্রি করতে চাইলে না চৌধুরীরা। হাজার হ'লেও জাতজ্ঞাত তো। শেষে সেধে দিয়ে এল চন্দনপুরের বাবুদের; এখন বাবুরা যে অংশটার মাটি ভাল, অল্প-স্বল্প ডোবে, মানে—পলি পড়ে অথচ ফসল নষ্ট হয় না, সেই অংশটা কাটিয়ে জমি করবেন, বাকিটা বিলি করবেন; কতক কতক প্রজাবিলি করবেন সেলামী নেবেন, খাজনা নেবেন। সে সব নেবেন জাঙলের মোড়ল মহাশয়েরা। বাকি যা থাকবে তাই পাবে পরম, বনওয়ারী, জাঙলের হাড়ীরা, চন্দনপুরের শেখেরা। তাদের বন্দোবস্তের শর্ত আলাদা; শর্ত হল—কড়ারী খাজনার শর্ত। সেলামী নেবেন না। তবে তারা পতিত ভেঙে যে জমি করবে দশ বছর পরে সে জমিদারের হবে। খাজনার শর্ত হ'ল—প্রথম দু' বছর বা তিন বছর খাজনা নেবেন না, তারপর এক বছর সিকি খাজনা, তার পরের বছর আধা খাজনা নেবেন, তারপর চলবে পুরো খাজনা। এগারো বছরের বছর জমি হবে জমিদারের। কারণ, বারো বছর হ'লেই নাকি তার স্বত্ব হয়। এগারো বছরের পরে আর-একটা বন্দোবস্ত হবে আর দশ বছরের জন্য। বিক্রি করতে পাবে না, করলেও তা আইনে টিকবে না, জমিদার কেড়ে নেবেন। তবে বিক্রি না ক'রে চাষ ক'রে যাও, খাজনা দাও, জমিদার মহাশয়ের সঙ্গে বনিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে চল, কেউ কিছু বলবে না—যতদিন খুশি ভোগ ক'রে যাও। বাস্। সেইজন্যই তো 'পিতিপুরুষে' ব'লে গিয়েছেন—'আশ্চয়' করবি লক্ষ্মীমন্তকে, মালক্ষ্মী মনিবের ঘরে ঢুকবেন, মনিবের উঠানে মায়ের পায়ের ধুলো অবশ্যই পড়বে, তাই কুড়িয়ে মাথায় ক'রে আনবি, তাতেই তোর 'গোগুষ্ঠী'র 'প্যাট' ভরবে। এতটুকু মিথ্যে নয় পিতিপুরুষের কথা। এই বনওয়ারীদের কথাই ধরো না! ঘোষ মহাশয়ের ঘরে লক্ষ্মী এলেন। বনওয়ারীদের বাপ তাকে আশ্চয় করলে—সেই কল্যাণেই বনওয়ারীর বাবা হ'ল কাহারপাড়ার মাতব্বর। ঘোষবাড়ির লক্ষ্মীর পায়ের ধুলোয় বনওয়ারীর বাপের অবস্থা সচ্ছল হ'ল। নইলে তখন তো মাতব্বর ছিল ওই হেঁপো রোগী নয়ানের বাবা। নয়ানের কর্তাবাপের নিজের দু'বিঘে জমি, চৌধুরীবাড়ির 'আশ্চয়ে' বাস, তাদের সোনা-ফলানো জমি ওরা ভাগে করত। নয়ানের ঠাকুরদা মরদও ছিল জব্বর, হাঁক-ডাকও খুব। 'ঘরভাঙারাই' তখন মাতব্বর। নয়ানদের বংশটার নাম সেকালে ছিল 'ঘরভাঙাদের গুষ্টি'। আগের আমলে ওদের ঘর ছিল নীলের বাঁধের দক্ষিণ পাড়ে সব থেকে নীচু জায়গায়; আশ্চর্যের কথা, গোটা ঘরে বাস করা ওদের কখনও ঘটত না, প্রতি বছরই বর্ষার সময় ঘর ভাঙত। কোন বার পুরো ঘরটাই ভাঙত, কোন বার একটা দেওয়াল, কোন বার বা আধখানা দেওয়াল; এ ভাঙতেই হ'ত। সেই অবধি ওদের বাড়ির নাম—ঘরভাঙাদের বাড়ি। তারপর যখন নয়ানের কত্তাবাবা জাঙলের চৌধুরী মহাশয়দের 'আশ্চয়ে' এল—চৌধুরী-বাড়ির মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো কুড়িয়ে এনে নতুন ঘর করলে তখন আর মায়ের কৃপায় সে ঘর ভাঙল না। তবে নয়ানের

ঠাকুরদাদা পিতিপুরুষের কথা মেনেছিল, ঘরখানা গোটা ক'রেও দেওয়ালের মাথায় হাত চারেক লম্বা হাত খানেক চওড়া জায়গা দেওয়াল সম্পূর্ণ না ক'রে মজবুত বাঁখারির বেড়া দিয়ে রেখেছিল। ভাগ্যমন্তের 'আশ্চয়'—চৌধুরীবাড়ির মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলোর কৃপা ছাড়া সেটা আর কি? চৌধুরী-বাড়ির পতন হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরভাঙা কাহারবাড়ির মাতব্বরি গেল। মাতব্বর হ'ল বনওয়ারীর বাপ। বাপের পর বনওয়ারী মাতব্বর হয়েছে। ঘোষেদের 'আশ্চয়ে' রয়েছে, ঘোষেদেরও চলছে বাড়বাড়ন্ত, বনওয়ারীরও যে বাড়বাড়ন্ত চলবে তাতে বনওয়ারীর সন্দেহ নাই। এখন সেদিন ওই কালোবউয়ের কাছে সায়েবডাঙা বন্দোবস্তির কথা শুনে ওই জমি খানকটা নেবার মতলব হয়েছে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে আর-একটা কথা তার মনে হয়েছে। চন্নপুরের বড়বাবুদের এখন এ চাকলার মধ্যে বাড়বাড়ন্ত, বাবুদের 'আশ্চয়' যদি একটু পায়, যদি ওঁদের মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো আঙুলের ডগায়ও একটু তুলে আনতে পারে, তবে তো তার ঘরেও মা-লক্ষ্মী উথলে উঠবেন।

বনওয়ারীর মনে এটি অতি গোপন কথা। এ কথা কাউকে বলতে পারে না। ঘোষ মহাশয়রা জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে ভাগ্যটা ভালই মনে হচ্ছে। মাইতো ঘোষ সাধারণত ইষ্টিশানে যেতে তাকে ডাকেন না। মাল তো তাঁর বেশি থাকে না। কি বলে 'বেগ' না 'সুটক্যাস' আর তেরপলের মত মোটা কাপড়ের খোলে বাঁধা 'বেছনা'। এবার মাল নিয়েছেন বেশি। তাই ডাক পড়েছে 'কোপকেঁধে' বাড়ির বনওয়ারীর। ভালই হয়েছে, চন্নপুরে যে কালে এসেছে, সে কালে বড়বাবুদের কাছারি হয়েই যাবে। বনওয়ারী উঠল। মাইতো ঘোষ যে সিগারেটটি দিয়েছিলেন, কানে যেটি গোঁজা ছিল, সেটি হাতে নিয়ে ইষ্টিশানের বাইরে পান-বিড়ি-চায়ের দোকানের দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিয়ে চন্নপুর গ্রামের পথ ধরলে। প্রথমেই ইষ্টিশান এলাকা। পথে পা বাড়িয়েও সে থমকে দাঁড়াল। মনে প'ড়ে গেল তার খুড়তুত বোন সিধুকে। ঘুরল সে।

ইষ্টিশানের এলাকাটি বেশ বড়।

ছোট 'নাইন' হলে কি হয়, চন্নপুরের ইষ্টিশানের সীমানা-সহরদ্দ মস্ত। লাইন তো তৈরী হয়েছে সেদিন—বনওয়ারীর চোখের সামনে হ'ল এসব। এই লাইনে খাটতে এসে কজন মেয়ে ঘর ছেড়েছে—পাঁচী খুকী বেলে চিত্ত নিম্মলা। খুকী আর বেলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে—দুজন মুসলমান রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে। আর চিত্ত পাঁচী গিয়েছে একজন হিন্দুস্থানী লাইন-মিস্ত্রীর সঙ্গে। নিম্মলাও গিয়েছে আর একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে। ওই নিম্মলারই ছেলে করালী। পাঁচ বছরের ছোট করালীকে পর্যন্ত ফেলে হারামজাদী চ'লে গিয়েছে। ওঃ, রঙের নেশার কি ঘোর, সন্তান পর্যন্ত ভুলে যায়! সিধু আর 'জগধাত্তি' এরাও দুজনে ঘড় ছেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভালবাসার লোক তাদের সঙ্গে নিয়ে যায় নাই। তারা এখনও রয়েছে চন্নপুরে, এই ইষ্টিশান এলাকাতেই থাকে। মাষ্টারদের বাড়িতে ঝিয়ের 'পাটকাম' করে, ইষ্টিশানে পোড়া কয়লা কুড়োয়, কয়লা-চুনের ডিপোতে কামিনের কাজ করে। আবার রাত্রিকালে অন্য রূপ ধরে। বনওয়ারীই আর তাদের গাঁয়ে ঢুকতে দেয় নাই। সিধু তার নিজের খুড়োর কন্যে; সিধুকে সে ভালবাসত। এই সিধুর জন্য আজও তার মন 'বেথা' পায়। আপন খুড়োর মেয়ে, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। হঠাৎ এখানে

এসে আজ তার ইচ্ছে হ'ল, একবার সিধুকে দেখে যাবে। সিধুর ওখানে করালী-পাখীর খবরও পাবে।

ঘুরল বনওয়ারী। ইষ্টিশানের এলাকার মধ্যে ঢুকল। লম্বা—এই এখান থেকে সেখান পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে সারি সারি ঘর। পাকা ঘর, পাকা মেঝে, সামনে খানিকটা উঠান; এক এক ঘরে এক এক সংসার বেশ আছে। থাকবে না কেন? সায়েবসুবোর কারখানা, তাদের 'আশ্চয়ে' আছে; কিন্তু বড় ঘুপ্‌চি। পাকা ছাদ, পাকা দেওয়াল, পাকা মেঝে হলেও এর মধ্যে থাকতে হ'লে বনওয়ারীর হাঁপ ধ'রে যেত। তাদের ঘর এর চেয়ে অনেক খারাপ, কিন্তু উঠানটি খোলা। তা ছাড়া এদের সংসারের ঘরদোরের গন্ধ যেন কেমন কেমন। এ গন্ধই নাকে লাগে। তাদের ঘরের গন্ধটির মধ্যে গোবর-মাটির গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, ধানের গন্ধ, কাঠ-ঘুঁটে-পোড়ার গন্ধ, সারগাদার গন্ধ, পচাই মদের গন্ধ, বাড়ির আশপাশের বাবুরি তুলসী গাছের গন্ধ মিশে এক ভারি মিষ্টি প্রাণ-জুড়ানো গন্ধ। আর এখানকার গন্ধ আলাদা, ভারি কটু গন্ধ, ইঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা আর জলে মিশে একটি ভাপানী তেজিয়ান গন্ধ এসে নাকে ঢোকে। ডাক্তারখানার তেজী ওষুধের গন্ধ ছাড়া আর কোথাকারও গন্ধ এমন তেজী নয়।

সিধু এই সকালবেলাতেই চুল আঁচড়াচ্ছে। যে অন্ন গেঁজে প'চে যায়, সে অন্নের গন্ধ সকাল বিকেল সব সময়ে এক। বনওয়ারী মনে মনে দুঃখের হাসি হাসলে। সকালবেলাতেই 'ব্যাশ' করতে বসেছে! বনওয়ারীকে দেখে সিধু ব্যস্ত হয়ে চুল আঁচড়ানো বন্ধ ক'রে হেসে বললে—এস, দাদা এস, কি ভাগ্যি আমার!

—এলাম একবার। মাইতো ঘোষের মোটঘাট নিয়ে এসেছিলাম। তা বলি, একবার সিধুকে দেখে যাই।

সিধু উঠে তাড়াতাড়ি একখানা বস্তা পেতে দিলে—ব'স।

চন্দনপুরে থেকে সিধু তরিবৎ শিখেছে। আসন পেতে দিতে হয়—সভ্যতার এ রীতি জেনেছে। তাদের পাড়ায় অভ্যাগতেরা নিজেরাই ফুঁ দিয়ে অথবা গামছা দিয়ে ধুলো-কুটো ঝেড়ে নিয়ে মাটিতেই বসে। গণ্যমান্য কেউ এলে বনওয়ারীর ঘরে দুটো মোড়া আছে, তাই এনে পেতে দেয়—যেমন দারোগাবাবু কি জাঙলের মনিব মহাশয়েরা কেউ। বনওয়ারী বসল বস্তাখানার উপর। বললে—তারপরে, ভাল আছিস?

—ভাল আর মন্দ! হেসে উঠল সিধু।—যেদিন খাটি সেদিন খাই, যেদিন খাটতে নারি সেদিন পেটে আঁচল বেঁধে প'ড়ে থাকি। জগধাত্তি কি কেউ যদি এক মুঠো দেয় তো খাই। আপনজন কে আছে যে, তার উপর দাবি করব, বল?

বনওয়ারী চুপ ক'রে রইল। সিধুর কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ রয়েছে, তার সমস্তটাই এসে পড়ছে বনওয়ারীর উপর।

সিধু আবার বললে—তবু তোমার করালী ছোঁড়া লাইনে কাজ করা অবধি খোঁজখবর করে। পিসী ব'লে এসে বসে। তোমাদের খবর তার কাছেই পাই।

এতক্ষণে বনওয়ারী বললে—তা তুও তো মধ্যে-মাঝে যেতে পারিস উদিক পানে।

সিধু বললে—কে জানে বাপু, ভয় তো কাউকে নয়, ভয় তোমাকেই।

বনওয়ারী দুঃখের হাসি হেসে মাথা নামিয়ে রইল। সিধু হেসে বললে—তোমাকে বাপু বড় ভয় লাগে।

বনওয়ারী বললে—ছোটকালে বড় মারতাম তোকে, লয়?

সিধু হেসে বললে—বাবা রে! তারপর গম্ভীর হয়ে বললে—তার লেগে লয়, তুমি বাপু ভারি কড়া লোক। কি ব'লে দেবে কে জানে? হয়তো বলবে—সিধুকে কেউ বাড়িতে ঢুকতে দিয়ো না।

বনওয়ারীর চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে চেয়ে কোনরকমে আত্মসম্বরণ ক'রে সে উঠে পড়ল। ঘোষ যে চার আনা পয়সা তাকে দিয়েছিলেন, তারই একটি দুয়ানি সিধুকে দিয়ে সে বললে—রাখ, মিষ্টি কিনে খাস।

সিধু বললে—দাঁড়াও। ব'লে ঘরে ঢুকে একটি পাকি মদের বোতল এনে বললে—খানিক আছে, খাও।

বনওয়ারী একবার ভাবলে, তারপর বোতলটি নিয়ে গলায় ঢেলে দিলে।

সিধু বললে—সেদিন করালী সাপ মেরেছিল, মেরে এখানে অনেক খরচ করেছিল। দু বোতল এনে সবাই মিলে খেলাম। ওইটুকুন ছিল। তারপর হঠাৎ তার একটা সরস কথা মনে প'ড়ে গেল, সে বেশ কৌতুক-পুলকিত স্বরে ব'লে উঠল—ওই দেখ, আসল কথাই শুধোতে ভুলে গিয়েছি—করালী-পাখীর রঙের কথা!

—হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড হয়ে যেয়েছে। ছোঁড়াকে শায়েস্তা না করলে হবে না।

সিধু বললে—তারা এখানে পালিয়ে এসে দিব্যি রয়েছে। করালী তো লাইনে কাজ করে, একখানা ঘর পেয়েছে, সেইখানে রয়েছে। কি আর শায়েস্তা করবা তুমি? সে বলছিল—যাবেই না আর তোমার এলাকাতে।

চমকে উঠল বনওয়ারী।

সিধু বললে—ওই সব-শেষের ঘরখানায় রয়েছে তারা। এর পরে মুখে কাপড় দিয়ে হাসি ঢেকে বললে, ওদের রঙ দেখলাম খুব জমজমাট। করালী বলে—গাঁয়েই যাব না, লাইনে খাটব, এইখানেই থাকব, কারুকে গেরাহ্যি করি না আমি। নতুন নোয়া এনে পরিয়ে দিয়েছে পাখীকে। ঘর পেতেছে, ধুম এখন চলছেই—চলছেই।

চন্দনপুরে এসে সিধুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রঙকে সে অঙ বলে না, নতুনকে লতুন বলে না। চলকো ক'রে চুল বাঁধে।

—বিড়ি লাও একটা, বিড়ি।—সিধু বললে।

—থাক্। বনওয়ারী হঠাৎ উঠে পড়ল।

বেরিয়ে এসে সে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ পাখী এবং করালীর ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছে। ভাল কথা নয়, গ্রামেই যাবে না—এ মতলব ভাল নয়। বদমাশ হোক, দুষ্টু হোক, পাপী হোক—ছোঁড়া এখনও এমন অন্যায় কিছু করে নাই, যাতে তাকে গাঁ থেকে দূর ক'রে

দিতে হবে। পাখীর সঙ্গে ব্যাপারটার মত ব্যাপার তো চিরকালই ঘ'টে আসছে। তা রঙ যখন পাকা, তখন নয়ানের সঙ্গে পাখীর ছাড়পত্র হয়ে যাক, সাঙা হোক করালীর সঙ্গে। গাঁয়ে-ঘরেই থাকুক। এখানে সর্বনাশ হবে। পাখী-করালী জানে না, বুঝতে পারছে না, কিন্তু চোখ তো আছে—চেয়ে দেখুক ওই সিধুর দিকে, জগদ্ধাত্রীর দিকে।

খুব জমিয়ে বসেছিল ওরা। পাখী করালী নসুদিদি জগদ্ধাত্রী আর করালীর লাইনগ্যাঙের দু'জন সঙ্গী। মধ্যে একরাশ তেল-মাখানো মুড়ি-লঙ্কা-পেঁয়াজ, কতকগুলো বেগুনি ফুলুরি আর মদের বোতল। খুব গরম গরম কথা চলছে। পাখী কলরব করছে বেশি। দরজার মুখ থেকে তারই কথা শুনতে পেলে বনওয়ারী। পাখী বলছিল জগকে—'যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন'—ইয়ের আবার শাসনই বা কি মাতব্বরিই বা কি। ওই হেঁপো উগীর ঘরে আমি থাকব না, পালিয়ে এসেছি আজ ছ'মাস। এখন একজনার সাথে আমার মনে অঙ ধরল, আমি তার ঘরে এলাম। এ কি লতুন নাকি কাহারদের ঘরে? না, কি বল জগমাসী?

জগ বললে—ইয়ের আর বলব কি লো?

করালী বললে—মামলা যদি থাকে তো আমার সাথে ওই নয়না শালোর। তা আসুক নয়না, তার সাথেই বোঝাপড়া হোক। ঠেঙা আনুক, লাঠি আনুক, নিয়ে যাক পাখীকে কেড়ে।

পাখী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—মর্ মুখপোড়া, তোকে লাঠি-সোঁটা মেরে আমাকে লিয়ে যেতে চাইলেই আমি যাব নাকি?

নসুদিদি ব'লে উঠল—তা ব'লো না হে, তা ব'লো না, সেই 'কিল্ ধমাধম পড়ে সই—কিল ধমাধম পড়ে গো', লাঠি-সোঁটা মেরে নিয়ে যেতে ক্ষ্যামতা থাকলে চুলের মুঠোতে ধ'রে নিয়ে যাবে। তুমি হাত পা ছুঁড়ে বড় জোর চেঁচিয়ে 'রবশ্যাষে' গলা ধরিয়ে কাপড়ের খুটে চোখ মুছে ভাত রাঁধতে বসবা, 'হেনসেলে' যাবা। মরদের কিলে বাবা ভুলে যায়, তা অঙের নোক!

পাখী বললে—না হে, না। অঙ যার পাকা হয়, অঙের নোকই পিথিবীর মধ্যে 'ছেষ্ট'।

হি-হি ক'রে হেসে উঠল নসুদি।

'এ কি পাকা অঙ লাগল মনে মনে—ও সজনি!'

এই সময়ে ঘরে ঢুকল বনওয়ারী। এক মুহূর্তে আসরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। করালীর মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। শুধু পাখী বার বার ঘাড় নেড়ে ব'লে উঠল—আমি যাব না, আমি যাব না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে।

বনওয়ারী ডাকলে করালীকে—শোন।

করালী এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বুকটা ফুলিয়ে নিয়ে উঠে এসে উদ্ধতভাবেই বললে —কি?

বনওয়ারী বললে—ছুটি হ'লে বাড়ি যাস পাখীকে নিয়ে। এখানে থাকবার মতলব ভাল নয়। উ-সব ছাড়্। বাড়ি যাস; সাঙার ব্যবস্থা ক'রে দেব। বুঝলি?

করালী শান্ত ছেলেটির মতই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

বাড়ির বাইরে এসে আবার করালীকে ডাকলে বনওয়ারী, আর একটা কথা মনে পড়েছে—থানায় গিয়েছিলি ? বশকিশটা এনেছিস ?

—না।

—আয় আমার সাথে। দারোগাবাবুর কাছে তোকে সনাক্ত দিয়ে যাব।

—সনাক্ত ?

—হ্যাঁ রে। তুই যে করালী ; দারোগা তা জানবে কি ক'রে ? সেই সনাক্ত দিয়ে যাব। তা'পরে আপনার বশকিশ তুই লিস যবে দেবে। আয়।

তিন

দারোগার কাছে করালীকে সনাক্ত ক'রে দিয়ে সে বড়বাবুদের কাছারি হয়ে বাড়ি ফিরল। বেলা তখন দুপুর গড়িয়েছে। ঘোষের বাকি দু' আনা পয়সা—ছ' পয়সার মুড়ি, দু পয়সার পাটালী কিনে গামছায় বেঁধে বাবুদের কেষ্ট দীঘির জলে ভিজিয়ে আমগাছের ছায়ায় ব'সে খেয়ে নিয়েছে, আঁজলা ভ'রে জল খেয়েছে। সিধুর পাকি মদের বোতলটিতে নেহাত কম 'দব্য' ছিল না, জিনিসটাও ছিল খাঁটি—এখনও পর্যন্ত অল্প-অল্প নেশায় বেশ ফুর্তি রয়েছে বনওয়ারীর। তার উপর মনটাও খুব খুশি রয়েছে। দিনমানটা আজ ভালই বলতে হবে। সেদিন পুজোটি কর্তা প্রসন্ন হয়েই নিয়েছেন মনে হচ্ছে তার। করালীর ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে, ভালই হয়েছে। তার মনের মধ্যে ভারি একটা অশান্তি ছিল। 'কোধ' অবশ্য খুবই হয়েছিল তার। গুরুবলে খুব সামলে গিয়েছে। নইলে হয়তো কাণ্ডটা একটা 'বেপয্যয়' ঘটিয়ে ফেলত। ছোঁড়াটার গায়ে ক্ষমতা হয়েছে, হ্যাঁ, তা হয়েছে ; মানতেই হবে বনওয়ারীকে। বাঁশবনে সে তার নীচে পড়েছিল —এজন্য বলছে না, ওটা বেকায়দায় প'ড়ে হয়ে গেল, ঝরা বাঁশপাতার গাদায় পাতা স'রে গিয়ে পিছলে প'ড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু বনওয়ারীর বুকে যখন উঠে বসেছিল করালী, তখন তার ক্ষমতার আঁচটা পেয়েছে সে। 'ভাঁটো মরদ' হবে ছোঁড়া। তবে মদে—বদখেয়ালীতে না মাটি হয়ে যায়! সেই জন্যই তো বনওয়ারী তাকে নষ্ট হতে দেবে না। এ কদিন কয়েকবারই তার মনে হয়েছে, ছোঁড়াকে ফেলে বুকে চেপে বসে। বসলে হয়তো মেরে ফেলত তাকে। তা, তা থেকে রক্ষে করেছেন গুরু আর কর্তা। আজ ওই সিধুকে দেখে পাখীর জন্য তার মন কাঁদল। করালী আর পাখীকে ফিরিয়ে আনাই 'কত্তব্য' মনে হ'ল। তার মত লোকের কি ওই ছেলেমেয়ের উপর রাগ করা ভাল দেখায় ? রাম, রাম, লোকের কাছে সে মুখ দেখাত কি ক'রে ? যাক, ছোঁড়াও শেষটা বুঝতে পেরেছে, পাখীকে নিয়ে ফিরে যাবে বলেছে। থানায় ছোঁড়া পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। হতভাগা, বদমাশ কোথাকার। হতভাগা যে শেষে বুঝেছে, এতেই বনওয়ারী খুব খুশি। নিমতেলে পানু প্রহ্লাদ নয়ান এরা খানিকটা মাথা নাড়বে, তা নাড়ানাড়ি করুক। বুঝিয়ে দিতে হবে। বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ এই মাতব্বরের কাজ। দশ

ডাইনী

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্তমান ;—ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় ; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নাম-গৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া ওঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের সীমারেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর! শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম্রধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটার এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্ঠকগুল্ম। কোনো বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না, কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম ; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে, কোন অতীতকালের এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমাণ পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা-পাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানগরের গ্রামের মধ্যে।

সে নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ! তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জরতার উপরে আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা, অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরণা জাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর ক্রূর একটা বৃদ্ধা ডাকিনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর ; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে-ছাওয়া বারান্দা—সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার

কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটা বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে; সেরখানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক চাল বিক্রি করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর একবার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই-চারিটা শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন-চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জন রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে। নির্জনতা উহারা ভালোবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে তাহার অনিষ্ট-স্পৃহা জাগিয়া উঠে! ঐ সর্বনাশী লোলুপশক্তিটা সাপের মত লকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে। না হইলেও সে তো মানুষ।

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে। বহুকালের পুরানো একখানি—আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মত একটা ঝকঝকে ধার। জরা-কুঞ্চিত মুখ,শণের মত সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানার চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রঙ, আর কি পালিশই না ছিল! আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চকচকে পুকুরের জলের মত। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত। ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নিচেই টিকোল নাক; চোখ দুইটি ছোটই ছিল—চোখের তারা দুইটিও খয়রা রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত। কিন্তু তাহার বড় ভালো লাগিত,ছোট চোখ দুইটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত,আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরুণ দিয়া চেরা, ছুরির মত চোখে, বিজলীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভালো লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে কি হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়!

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

বুড়া শিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রাণার উপর সে দাঁড়াইয়া ছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া-বাকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মত দশ-এগারো বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুন-বাড়ির হারু সরকার আসিয়া তাহার চুলের

মুঠি ধরিয়া টানিয়া সান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনী,তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

—আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল, তবে সে-কথা বললি না কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ, লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

—হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট-বেদনায় ছট্‌ফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, সে হারু সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভালো করে দাও, ওকে ভালো করে দাও। কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম। আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণ পরে বার-দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল, ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নী একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল, ছাই দেব হারামজাদীর মুখে। মা-বাবা-মরা অনাথা মেয়ে বলে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দিই। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল, কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নি। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি,আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দৃষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পালাইয়া গিয়াছিল। সেদিন রাত্রে সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ির দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়াশিবতলায়। অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টিকে ভালো করে দাও, না-হয় আমাকে কানা করে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মত নিস্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি, আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে, গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির-দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না, কোনও মতে বহুকষ্টে বলিত, দুটি ভিক্ষে

পাই মা! হরিবোল!

—কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে! খবরদার!

—না মা, ঘরে ঢুকব না মা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও উঠে। কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা-হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

—এই—এই! হারামজাদী বেহায়া! উঁকি মারছে দেখ! সাপের মত!

ছি ছি ছি! সত্যিই তো সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালার সমস্ত আয়োজন তাহার নরুণ-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে। মুখের ভিতর জিবের তলা হইতে ঝরনার মত জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মূর্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাট-ধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল; অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল—বাঁ হাতে শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে-কথা সারাজীবন ধরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়।

কিন্তু সে তার কি করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে, তার কি করিবে, কি করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরীয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জন করিয়া উঠে, ঠিক তেমনই ই-ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মত চুলগুলাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুণ-চেরা চোখে চিলের মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস, বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ-ভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মত কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা ফুৎকার যদি সে দেয়, তবে মাঠের ধুলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট সাদার মত ওটা কি নড়িতেছে যেন! মানুষ? হ্যাঁ, মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধুলা উড়াইয়া, দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মত হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না-না-না। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধুলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

নাঃ, ওদিকে আর সে চাহিবেই না। তাহার চেয়ে বরং উঠানটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙিয়া-পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল। জড়ো-করা পাতাগুলা ফর-ফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে

টানিয়া-আনা ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়ীকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে-চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলা তাহাকে যেন সর্বাঙ্গে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জারীর মত ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটাগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো।

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্তটাকে আঘাত করতে চেষ্টা করিল, আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধুলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধুলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা! এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘুরণপাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে। একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার ছিল না। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

—কে রইছ গো ঘরে? ওগো!

জলে-পচা নরম মরা-ডালের মত বৃদ্ধা বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়া ছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল, কে?

ধূলিধূসর দেহে শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোনো একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা-হা বাছা রে! আয়, আয়। বস।

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার একপাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো!

মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল,সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরা পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্কুসী মাঠে কি বলে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম একেবারে মধ্যিখানে।

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু! গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে নেতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল, দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে-মুখে জল দে!—মেয়েটি ছেলের মুখে-চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে তাকাইয়া রহিল; স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মত নরম, সরস। দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম-গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে।

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি—? কিন্তু সে তাহার কি করিবে? কেন ও তাহার সামনে আসিল? কেন আসিল? ঐ কোমল নধরদেহ শিশু ময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—। জীর্ণ জরজর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ! যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম—ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢকঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এটা তবে রামনগর? তুমি সেই—?—সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন্ মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না, সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কি করিয়া? ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও উঠে; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধ হয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে। তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছে। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি!

ঠিক এমনি ভাবেই, ঠিক আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল, ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া, ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত, এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল, বলি ওলো, আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে ভাবীসাবীর সঙ্গে মস্করা জুড়েছিস! আমার বাছার যদি কিছু

হয়, তবে তোকে বুঝব আমি—হ্যাঁ।

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, বেরো বলছি, বেরো। হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি!

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীরে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার বার সে মনে মনে বলিয়াছিল—ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলই বা সে ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল—তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালোবাসি!

কিন্তু অপরাহ্ণবেলা হইতে-না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টিক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুর-ভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের শ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। বার বার মুখের থুথু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল—কোথায় রক্ত। গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বারদুয়েক বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা—শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেই দিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে—সেদিন বোধ হয় চতুর্দশীই ছিল, হ্যাঁ চতুর্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবীতলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা-তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দেব। —কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন দুঃখে-হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন্ নিরুদ্দেশলোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারায় অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি-ফাটার মাঠ ধুলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর ধুলায় গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটা এ গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল! কে আবার? ঐ সর্বনাশী। মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে, কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম

গো। আমি কি করলাম গো।

লোক শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। একবার জনকয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝরনাটার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুঁসিয়া উঠিল—সে তাহার কি করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরল লাবণ্যকোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে একসময় চিলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চীৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধা অজগরীর মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদগার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি-হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে—বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে আজ একটা গোটা শিশু-দেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে!

ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাশের মত পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখী অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গে-ল। চোখ গে-ল! আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনের ঝরনার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে। আবার সেই ছেলেগুলা তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউরীদের সেই স্বামী-পরিত্যক্তা উচ্ছলা মেয়েটা আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউরী ছেলেটা।

মেয়েটা বলিতেছে, না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল, হেঁ! এখানে আসছে নোকে; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

—তা হোক। তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেনে থাকব আমি?

ছি ছি ছি। কি লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে। যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে, তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কি? কি বলিতেছে ছেলেটা?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল, তোতে আমাতে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দের! ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভালো লাগিল! তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুটি ছোট, তারা দুটি খয়রা রঙের; কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বৈকি। আয়নার দিকে তাকাইয়া

সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না তো তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে কখনও কোনোদিন দেখে নাই।—আরে, তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি? —লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছে। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢঙটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কি?

—আমার কি? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস কিল?

ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মত নিটোল শরীর। জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোনো উত্তর না দিয়া তীব্র তির্যক ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে-হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মত নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল; বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই। ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চমকিয়া উঠিল। সেই লোকটা! সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল—হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত—সে বলিয়াছিল, কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, তুমি যাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।

—চেঁচাবি? দেখছিস পুকুরের পাঁক, টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দোব ঐ পাঁকে।

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল, ধে-ৎ!

সে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটার হি-হি করিয়া সে কি হাসি! সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দূর-রো, ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার! ভাগ!

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা নাকি?

—না, না, মারব কেনে? তোকে শুধালাম—কুথায় বাড়ি তোর, তু একেবারে খ্যাঁক করে উঠলি। তাথেই বলি —

বলিয়া আবার সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

—আমার বাড়ি অ্যানেক ধুর, পাথরঘাটা।

—কি নাম বটে তোর? কি জাত?

—নাম বটে আমার সোরধনি, লোকে ডাকে সরা বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম।—তা ঘর থেকে পালিয়ে এলি কেনে?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল; সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, কি বলিবে?

—রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

—না।

—তবে?

—আমার মা-বাবা কেউ নাই কিনা? কে খেতে পরতে দিবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

—বিয়ে করিস নাই কেনে—বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহাকে—তাহার মত ডাইনীকে—কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধুলা-কাঁকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে,—মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কি মশা! মৌমাছির চাক ভাঙিলে যেমন মাছিগুলা মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্তা তো আর শোনা যায় না! চলিয়া গিয়াছে! সন্তর্পণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মত আর নিরিবিলি জায়গা কোথায়? এ চাকলার কেহ আসিতে সাহস করিবে না। তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালোবাসায় কি ভয় আছে!

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল। আচ্ছা, ঐ ছোঁড়াটাকে সে খাইবে? শক্ত-সমর্থ জোয়ান শরীর!

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল, না, না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে! আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, এই ছাতিফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে। জানিলে কিন্তু ভালো হইত। গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু-হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলো শোনা হইত না। উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

হি হি হি! ঠিক আসিয়াছে! ছোঁড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া

পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবে রে, সে আসিবে।

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সেই জোয়ানটা ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহার আগেই আসিয়া বসিয়াছিল, পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতেছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

—এসেছিস ? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা, সে তাহাকে এই কথাটাই বলিয়াছিল। ওঃ, ঐ ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথাটিই বলিতেছে! মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ; নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সেদিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল। তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, কাল তোর মুড়ি পড়ে গিয়েছিল। লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকের দুর্দান্ত লোভ—সাপের মত তাহার ডাইনী মনটা বেদের বাঁশী শুনিয়া যেন কেবলই দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কি করিয়াছিল ? হ্যাঁ, মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না পারে ? ও মাগো! ঠিক তাই। এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কি তুলিয়া দিতেছে! বুড়ী দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল। সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি সরা ?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, হাত-পা ঘামিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অ্যানেক। তা জাতে পতিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি ?

ঝরনার ধারে প্রণয়ী যুবকটি বলিল, এই গাঁয়ে সবাই হাঁ-হাঁ করবে—আমার জাতগুষ্টিতেও করবে, তোর জাতগুষ্টিতেও করবে। তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনায় সাঙা করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তব্ধ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহারাও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল,—মাড়োয়ারীবাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারি করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লা' না কি বলে—সেই প্রকাণ্ড পিপের মত কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরি ছিল সকলের চেয়ে বেশি।

ঝরণার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উ হবে না। আগে আমায়

রুপোর চুড়ি আর খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে, তবে আমি যাব। নইলে বিদেশে পয়সা অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।

ছি ছি, মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়। এত বড় একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনোদিন! মরণ তোমার! রূপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখা-বাঁধা উঠবে তোমার হাতে। ছি!

ছেলেটি কথার কোনো জবাব দিল না, মেয়েটিই আবার বলিল, কি, রা কাড়িস না যি? কি বলছিস বল? আমি আর দাঁড়াতে লারব কিন্তুক।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কি বলব বল্? টাকা থাকলে আমি তোকে দিতাম, রুপোর চুড়িও দিতাম, বলতে হত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

—যা।

—আর যেন ডাকিস না।

—বেশ।

অল্প একটু দূর যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে যেন মিশিয়া গেল। ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরনার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল! শেষ পর্যন্ত ছেলেটা যে কি করিবে—কে জানে! হয়ত বৈরাগী হইয়া চলিয়া যাইবে, নয়ত গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে। বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার রূপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা, না-হয় পাঁচটা সে দিতে পারে। তাহাতে কি হইবে? মেয়েটা আর বোধ হয় আপত্তি করিবে না! আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, শখের সময়—আহা! ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপার চুড়ি ও টাকা সে দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে!

মাটিতে হাতের ভর দিয়া কুঁজীর মত সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল, বলি, ওহে নাগর, শুনছ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধারও একটা অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধা মার্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল, মর-মর—তুই মর। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। পরমুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ঐ ঝরনার ধারে; মানুষের

দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মত নিঃশব্দে পদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। জানিতে পারিয়া ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত! তাহার পরই প্রবল জ্বর; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে!

কিন্তু সে তাহার কি করিবে?

কেন সে পলাইতে গেল? পলাইয়া যাইবে? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে? সেই তাহার মত শক্তিমান পুরুষ—যে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিত—শেষ পর্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানি মাছের কাঁটার মত।

কে এক গুণীন নাকি আসিয়াছে। বলিয়াছে, এই ছেলেটাকে ভালো করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাকাসে হইয়া সে মরিয়াছিল। রোগ—ঘুষঘুষে জ্বর, কাশি। তবে রক্তবমি করিয়াছিল কেন সে?

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিস্পন্দ শবদেহের মত। সমস্ত মাঠটার মধ্যে আজ আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিত, কোনোদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা!

হি-হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে সে হাসিয়া উঠিল। উঃ, কি ভীষণ হাঁপ ধরিতেছে তাহার! দম যেন বন্ধ হইয়া গেল। কি যন্ত্রণা, উঃ—যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। ঐ গুণীনটা বোধ হয় তাহাকে মন্ত্রপ্রহারে জর্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কর, তোর যথাসাধ্য তুই কর।

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে। তাহার মৃত্যুর পর বোলপুরের লোকে যখন উহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল, তখন কি দুর্দশাই না উহার করিয়াছিল। সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কলের সেই হাড়ীদের শঙ্করীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে একদিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর সে গ্রামের বাহিরে একধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গায় যে সে ফিরিল! আবার যে কোথায় যাইবে!

ও কি! অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সন্ধ্যার মুখে সে একটি ছোট পুঁটলি লইয়া ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে—সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিথর, স্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ে পায়ে ধূলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনী পলাইয়া যাইতেছিল। কতকটা দূর আসিয়া সে বসিল, চলিবার শক্তি যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, তুমি ফিরে এস গো!

উঃ, তাহার নরুণ-দিয়া-চেরা ছুরির মত চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পায়ের ধূলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দান্ত ঘূর্ণিঝড়। সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি।

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা ভাঙা ডালের সূচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখির মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।